এই সত্যে ইহারই ভিতর আমার যে একটা বিশেষত্ব আছে, এই সাম্যের ভিতরই যে একটা চিরন্তন বৈষম্য ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাকে নষ্ট করে না। সেইরূপ আমার মনের গঠনে এবং চিন্তার প্রণালীতেও এমন কিছু আছে, যা'তে আমার চিন্তাকে, আমার বিচারকে, জীবনের জটিল সমস্যা আমি যেভাবে ভেদ করিতে যাই, তাহাকে, অপর লোকের চিন্তা, অপর লোকের বিচার, অপর লোকের বিশ্ব সমস্যার মীমাংসা হইতে পৃথক করিয়া রাখে। আমাদের চিন্তা যখন এক হয়, তখনো সে চিন্তার অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া, আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের নিজেদের মত করিয়া সে সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি ও অপরের নিকট প্রয়োজন মত তাহাকে প্রতিষ্ঠিত কবিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। আমাদের কণ্ঠেব যেমন একটা সুর আছে, এ সুর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র; একই কথা বলিতেছি, একই বর্ণ উচ্চারণ করিতেছি, উচ্চারণও সমভাবে সাধু হইতেছে, অথচ আমার সুর আমার, তোমার সুর তোমার, ইহা যেমন সত্য; সেইরূপ আমাদের মনেরো একটা সুর আছে। আমাদের অভিজ্ঞতা এক, আমাদের মত এক, আমাদের বিশ্বাস এক, আমাদের সিদ্ধান্ত এক,—এ সকলই হয়ত এক; কিন্তু তথাপি এই একই অভিজ্ঞতা, একই মত, একই বিশ্বাস একই সিদ্ধান্ত যখন আমি প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, তখন তার ভিতরে আমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তাহাই বাজিয়া উঠে, আর তোমার মনের যে নিজস্ব সুরটুকু আছে, তোমার চিন্তাতে, তোমার বিচারে, তোমার অভিব্যক্তিতে তাহাই বাজিয়া উঠে। এই মনের সুরটার নামই ভাষা। আমাদের ভাষাতে, যেভাবে আমরা শব্দ-যোজনা করি, যেরূপে আমরা কথাবার্ত্তা কহি, যে প্রণালীতে আমরা বিবিধ বিষয়ের বিচার-আলোচনা করি, এককথায় আমাদের লেখার ধরণে, রচনার প্রণালীতে, সর্ব্বদাই আমাদের মনের এই সুরটি ফুটিয়া বাহির হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির রচনার গাঁথুনীর দ্বারা তাঁর মনেরো গাঁথুনীর পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁর চিন্তা লঘু, তাঁর ভাষাও লঘু হয়। যাঁর চিন্তা সতেজ, শক্ত, যুক্তি পরম্পরার উপরে সর্ব্বদা আপনার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, যাঁর ভিতরকার মনের স্বভাব এরূপ, তাঁর ভাষাতেও ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই ভাষাটুকু আমাদের প্রত্যেকেরই আলাহিদা। রচনার কোনো বিশেষত্ব নাই, এমন লোকও আছেন। তাঁরা যখন যে বই পড়েন, তখন সেই লেখকের ভাষাই লেখেন ও বলেন। এরূপ তুলারাশি লোকের মনের বিশেষত্ব ফুটে নাই, ভাষারো বিশেষত্ব ফুটে নাই। তাঁদের মনেরো একটা বিশেষত্ব আছে, সত্য। কালক্রমে উপযুক্ত অনুশীলনে সে বিশেষত্বটুকু ফুটিয়া উঠিবে। আর তখন তাঁদের ভাষাও তাঁদের নিজস্ব বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁদের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁদের লেখাতে সর্ব্বদাই তাঁদের নিজস্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু ফুটিয়া বাহির হয়। অনেক লোকের ছবির মাঝখানে পরিচিত বন্ধুর ছবি যেমন সহজেই চেনা যায়, অনেক লেখকের রচনার ভিতরেও সেইরূপ

পরিচিত লেখকের লেখাটা সহজেই চিনিতে পারা যায়। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বিপুল সাহিত্য সংগ্রহের ভিতর হইতেও তাঁদের পক্ষে এই দুই সাহিত্যরথীর রচনা পৃথক্ করা একটুও কঠিন কাজ নহে। আর ইহাও কি সত্য নহে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যখন পড়ি, তখন তার বর্ণে বর্ণে, পংক্তিতে পংক্তিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-রূপ আমাদের মানসচক্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়? রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন পড়ি, তখন কেবল তাঁর লেখা নয়, উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের মনের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন? প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্ঠে যেমন এক একটা বিশেষ সুর আছে, আর এই সুর যেমন তাঁর নিজস্ব বস্তু, ইহাতে তাঁর বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকুকে প্রকাশ করে; সেইরূপ প্রত্যেকের ভাষাতেও একটা বিশেষ সুর আছে, এ সুর কণ্ঠের নহে, মনের; আর তাঁদের মনের, চিন্তার যে বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বটুকু আছে, তাহাই এই মনের সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর এই যে ভাষার সুর, ইহার ভিতর কোন্ দিক্ দিয়া এই বিশাল বিশ্বসমস্যার মীমাংসা করিতেছেন, কে কোন্ ভাবে এই জগৎটাকে দেখিতেছেন, এটিও স্বল্পবিস্তর বুঝিতে পারা যায়। কারণ এই বিশ্ব-সমস্যাই আমাদের চিন্তার মূল বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই ইদং ও এই অহং—এই দুই বিরাটতত্ত্ব লইয়াই মন দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। এই অহং ও ইদংএর জটিল সম্বন্ধের অর্থ কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেই মানুষের সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-সাহিত্য, ও শিল্পবিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের লঘুগুরু, ক্ষুদ্রবৃহৎ, সকল আলোচনা ও সকল সমস্যার পশ্চাতেই এই বিশাল বিশ্বসমস্যা সতত দাঁড়াইয়া আছে। আমরা তাহাকে জ্ঞানে সকল সময় ধরিতে পারি না, সত্য; কিন্তু ধরি আর না ধরি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্রবৃহৎ, বিশেষ-নির্ব্বিশেষে, কোনো সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। কোনো জ্ঞানই, ফলতঃ সম্ভব হইতে পারে না।

আমাদের শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে এই যে এক একটা বিশেষত্ব বা নিজত্ব আছে, যে বিশেষত্ব বা নিজত্বটুকুতে তোমাকে আমা হইতে, আমাকে তোমা হইতে পৃথক্ করিয়াছে, ও আমাদের উভয়কে, ও জগতের প্রত্যেক মানুষকে, অপর সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব। এইটুকুই আমাদের মৌলিকত্ব। ইহাই আমাদের নিজস্ব বস্তু। আর ব্যষ্টিভাবে, তোমার আমার এই যে ব্যক্তিত্ব, সমষ্টিভাবে, তাহাই প্রত্যেক জাতির জাতিত্ব। আমাদের প্রত্যেকের চেহারা যেমন স্বতন্ত্র, আমাদের সুর যেমন আলাহিদা, আমাদের চিন্তার ধরণ যেমন পৃথক্ পৃথক্, সেইরূপ সমষ্টিভাবে জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিরো চেহারা স্বতন্ত্র, সুর স্বতন্ত্র, সমাজগঠন ও চিন্তার ধরণ, এ সকলই স্বল্পবিস্তর স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। এই যে স্বাতন্ত্র্য, এই যে বিভিন্নতা, এই যে বিশেষত্ব ইহারই নাম জাতিত্ব। আর এই যে জাতিত্ব, ইহা প্রত্যেক জাতির শারীর ধর্ম্মে ও মানস ধর্ম্মে, উভয়ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির চেহারা যেমন আর এক ব্যক্তির চেহারা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ

জগতের ভিন্ন জাতি সমূহেরো পরস্পরের চেহারা বিভিন্ন। শরীরের বর্ণে ও গঠনে, এক জাতি অপর জাতি হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। জাপানের লোকের চেহারার সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকের চেহারার মিল নাই। হিন্দুর চেহারার সঙ্গে কাফ্রির চেহারার মিল নাই। অতিশয় কালো হিন্দুকেও কৃষ্ণকায় কাফ্রি বলিয়া কেহ কখনো ভুল করিতে পারে না। আমেরিকাতে এমন প্রায়ই দেখা যায় যে রং দেখিয়া হঠাৎ কোনো হিন্দুকে লোকে কাফ্রি ভাবিয়াছে, কিন্তু মুখের দিকে চাহিয়াই, অপরাধীর মত, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। শরীর-গঠনে যেমন, মনের গঠনেও সেইরূপ প্রত্যেক জাতির এক একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব তাহাদের ভাষার গঠনে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কতকগুলি ভাষাতে অহং প্রত্যয়ের জ্ঞান প্রবল, কতকগুলিতে ইদং প্রত্যয়ের উপরেই ঝোঁক বেশী। সংস্কৃত ও সংস্কৃতের সঙ্গে যাদের মৌলিক সম্বন্ধ আছে, লাটিন, গ্রীক্ প্রভৃতি আর্য্যভাষাতে, অহং আমি, আমি আছি, এই পদ সিদ্ধ হয়, অপর জাতির ভাষাতে ইহা সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ অস্তিত্বের জ্ঞান স্মরণাতীত কাল হইতে,—ইতিহাস যে কালের খোঁজ পাইয়াছে,—তার বহু পূর্ব্ব হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, এই সকল জাতির ভিতর আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়াছিল, তাই তাদের ভাষায় শুদ্ধ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক, অহং অস্মি ইত্যাকার পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। এমন ভাষাও আছে, যাহা এই অস্তিত্বকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে তাহাকে যুক্ত করিয়া দেয়। আমরা যেখানে বলি, রাম আছে, সেখানে তারা বলে রাম বসিয়া আছে, বা দাঁড়াইয়া আছে, ইত্যাদি। এই যে বিভিন্ন জাতির আপন আপন ভাষার গঠনে এক একটা মৌলিক বিশেষত্ব আছে, ইহাতে এদের নিজস্ব চিন্তার ধরণটা প্রকাশিত হই-তেছে। যে যে ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষা সেইরূপই হয়। ইহা ব্যক্তির সম্বন্ধে যেমন সত্য, জাতিসমূহের সম্বন্ধেও সেইরূপ সত্য।

১৪। চিন্তা ও ভাষা।

ভাষার মুখ্য অঙ্গ তিনটী; কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া। এ তিনের মধ্যে যে ভাষায় যেরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে,তাহারই দ্বারা সেই ভাষা যাহারা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণা জানিতে পারা যায়। কোনো জাতির ভাষায় কর্ত্তার উপরেই ঝোঁক বেশী, যাবার কোনো ভাষায় কর্ম্মের প্রতিই দৃষ্টি বেশী। এমন ভাষাও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে কর্ত্তার উপরেও নয়, কর্ম্মের উপরেও নয়, কিন্তু শুদ্ধ ক্রিয়ার উপরই চিন্তার সকল জোরটা যেন আসিয়া পড়িয়াছে। রাম আঘাত করিয়াছে, সকল আর্য্য ভাষাতেই এরূপ পদ নিষ্পন্ন হয়। এখানে রাম কর্ত্তা, রামই এখানে মুখ্য শব্দ। কাকে আঘাত করিয়াছে, কিরূপে আঘাত করিয়াছে, এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বাদৌ কে আঘাত করিযাছে, মন এখানে তারই সন্ধান লইয়াছে। যে জাতির ভাষায় এই পদ নিষ্পন্ন হয়, সে জাতির চিন্তাতে কর্ত্তা বা অহংএর জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। আবার এমন ভাষাও আছে, যাহাতে এই

একই অভিজ্ঞতা অন্যভাবে ব্যক্ত হয়। যদি কোনো ভাষায়, "রাম যদুকে আঘাত করিয়াছে, এরূপ পদ নিষ্পন্ন না হইয়া কেবল এই হয় যে, "যদু আহত হইয়াছে," তবে সেই ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের চিন্তায় ও জ্ঞানে কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ম্মের জ্ঞানই যে আদিকাল হইতে অধিকতর প্রবল ছিল, এ সিদ্ধান্ত সহজেই উপলব্ধি হয়। আবার এমন ভাষাও আছে, যাতে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েরই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কেবল ক্রিয়ার জ্ঞানটাই নিরতিশয় প্রবল। এরূপ ভাষা আদিম কাল হইতে যে জাতি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের চিন্তার ধরণ যে অপরের চিন্তার ধরণ হইতে স্বতন্ত্র হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

১৫। বিশ্বসমস্যা।

এই বিশ্বের মুখ্য তত্ত্ব দুটী—অহং ও ইদং। অহং কর্ত্তা, ইদং কর্ম্ম। অহং বিষয়ী, ইদং বিষয়। এই অহংএর সহিত এই ইদং এর সম্বন্ধ কি ? ইহাই বিশ্বের বিশাল ও সনাতন সমস্যা। এদের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে যাইয়াই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, শাস্ত্র সাহিত্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সকলই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে জাতি অনাদিকাল হইতে যে ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে, ধরিয়াছে, তার যেরূপ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সে ভাবেই সেই জাতির ধর্ম্ম ও দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য, এক কথায় তার সাধনা ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। আর প্রত্যেক জাতির ভাষার মৌলিক গঠনের মধ্যে, সে জাতি এই বিশাল বিশ্বসমস্যাকে কিরূপে দেখিয়াছে ও ধরিয়াছে, তার মূল সূত্রটী খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কোথাও বা মানুষ অহংকে সকল অবস্থাতেই ইদং এর উপরে প্রভুত্ব করিতে দেখিয়াছে, সেখানে তার সাধনা ও সভ্যতা অহংমুখীন বা অন্তর্মুখীন হইয়াছে। সেখানে সে সর্ব্বদাই বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে খুঁজিয়াছে, বিষয়-জাল ছেদন করিয়া, বিষয়ীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তার ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক, তার দর্শন অদ্বৈত, তার শিল্প অন্তর্মুখীন, তার সকলই একটা বিষয়াতীত, অতীন্দ্রিয় প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। আবার কোথাও বা মানুষ বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিষয়ের প্রভাবে তার জ্ঞান এমনই অভিভূত হইয়াছে যে সে কিছুতেই বিষয়ীকে বিষয়ের উপরে একান্তভাবে স্থাপন করিতে পারে নাই। যে জাতি এইরূপে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়, তার ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য সকলই অতিমাত্রায় বহির্মুখীন ও বিষয়াধীন হইয়া পড়ে। মানুষ আদিকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই বিশ্বসমস্যাকে দেখিয়াছে। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। এই জন্য তাদের সভ্যতাও পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। এই চেষ্টা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৬। জাতিত্ব ও মনুষ্যত্ব।

কিন্তু জগতের বিভিন্ন মানুষের একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন জাতির একটা বিশেষ জাতিত্ব বা জাতীয়তা আছে বলিয়া যে তারা পরস্পরে সমান নহে, এমনো বলা

যায় না। জগতের সর্ব্বত্রই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ও সাম্যের মধ্যেই বৈষম্য রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেমন এক একটা বিশেষ জাতিত্ব আছে, তেমনি অপর সকলেরই মধ্যে একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্ব রহিয়াছে। সকলেই মানুষ। মানুষে মানুষে আকারে বিভিন্নতা, গঠনে বিভিন্নতা, চাল্‌-চলনে বিভিন্নতা, ভাবে ও চিন্তাতে বিভিন্নতা, একের আকার অপর হইতে পৃথক্, একের মনের গতি অপরের মনের গতি হইতে পৃথক্, একের প্রকৃতি অপরের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র; কেহ বা তামসিক, কেহ বা রাজসিক, কেহ বা সাত্ত্বিক, কিন্তু এ সকল বৈষম্য সত্ত্বেও সকলেই মানুষ। স্বরূপতঃ সকলেই এক। সকলেরই মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। আর এই মনুষ্যত্ব বস্তু পূর্ণ বস্তু, অখণ্ড বস্তু; তার ভাগ বাটোয়ারা হয় না। কারো মধ্যে এই সাধারণ মনুষ্যত্ব বেশী ফুটিয়াছে, কারো মধ্যে এখনো পরিমাণে ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। এইরূপে প্রকাশের অভিব্যক্তির ইতর-বিশেষ ভেদ আছে; কিন্তু মূল বস্তুর তারতম্য নাই। স্বরূপতঃ সকলে পরিপূর্ণ বস্তু। আর তাই বলিয়াই স্বরূপতঃ সকলে এক। আর স্বরূপতঃ সকলে এক বলিয়াই তারা পরস্পরকে জানিতে পারিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে, পরস্পরের সঙ্গে ঐ এক ও অদ্বৈত স্বরূপের ভিতর দিয়া অশেষ প্রকারের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিতেছে। এক ব্যক্তির মধ্যে যাহা প্রকট, অপরে তাহা অপ্রকট; এদের ভিতরে ইহাই পার্থক্য। সেইরূপ এক জাতির মধ্যে যাহা ব্যক্ত, অপরে তাহা এখনো অব্যক্ত রহিয়াছে। নতুবা মূলে তারা সকলে *একই ছাঁচে ঢালা, একই পূর্ণতার প্রকাশ,* একই অদ্বৈত অখণ্ড বস্তুর অভিব্যক্তি। এই অদ্বৈত, অখণ্ড পরিপূর্ণ অব্যক্ত বস্তু, ভিন্ন ভিন্ন আধারের ভিতরে থাকিয়া, সেই সকল বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। এজন্য এই বিশ্বের বিপুল অভিব্যক্তিতে ঋণের বা দানের প্রয়োজন নাই, স্থানও নাই, প্রত্যেকেরই একটা নিজত্ব, একটা বিশেষত্ব, একটা ব্যক্তিত্ব আছে বলিয়া, অপরের নিকট হইতে সে কখনো আপনার জীবনের মূল বস্তু-গুলি ধার করিয়া লইতে পারে না। এক রাজ্যে যেমন অপর রাজ্যের টাকাকড়ি চলে না, ভারতের টাকা বা পয়সা যেমন ফরাসীস দেশে রূপার বা তামার বাজার দরে বেচিতে হয়, টাকা বা পয়সা বলিয়া সেখানে তার কোনো দাম নাই, সেইরূপ এক ব্যক্তির সত্য ও ধর্ম্ম অপর ব্যক্তির জীবনে ও কর্ম্মে চলে না, সেখানে তার নিজস্ব মূল্যে বিকাইতে পারে না। সেইরূপ এক জাতির সভ্যতা এবং সাধনাও অপর জাতির ভিতরে তার নিজের দরে বিকায় না, বিকাইতে পারে না। সেখানে তাহাকে সাধারণ সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের ওজনে মাপিতে হয়, ও এই মনুষ্যত্বের দরে তার দাম-দস্তুর হইয়া থাকে। সেখানে তার বিশেষ মূল্যটুকু আর থাকে না। সেই মূল্যটুকু জোর করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, তাহা ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধারকর্জ্জও আর চলে না। তাহাতে লোকসান বই লাভ কখনো হইতে পারে না। আর এরূপ ধার-কর্জ্জের কোনো প্রয়োজনও নাই। কারণ সকলের ভিতরে যখন একই পূর্ণ, অদ্বৈত,

অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে, সেই একই পূর্ণ ও অদ্বৈত বস্তু যখন নানাভাবে, নানা আকারে, সকল আধারের ভিতর দিয়াই আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তখন এক ব্যক্তি বা এক জাতি তার নিজস্ব ধনের জন্য অপরের দ্বারে কেনই বা প্রার্থী হইতে যাইব? এই জন্যই এ বিশ্ব-বিবর্ত্তনে দানের কণামাত্রও স্থান নাই, অনুকরণ একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

১৭। মনুষ্যত্বের ইতিহাস।

সকল অপূর্ণের ভিতরেই যে পূর্ণ বস্তু রহিয়াছে, সকল দ্বৈতের মূলেই যে অদ্বৈত বস্তু, সকল ভাগবিভাগের ভিতরেই যে এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য তত্ত্বপদার্থ নিহিত রহিয়াছে, এবং বিশ্ববিবর্ত্তনে অনন্তভাবে, অনন্ত আধারে, অনন্তরূপে সেই নিত্য স্বরূপ বস্তু আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন, য়ুরোপ এই সত্যকে এখনো ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। আর তারই জন্য য়ুরোপ অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াও এখনো পর্য্যন্ত মানবসমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। য়ুরোপ প্রাচীন কালের বহু সাধনা ও সভ্যতার আলোচনা করিয়াছে ও করিতেছে। সমাজের অতি প্রাচীন সময়ের অনেক লুপ্ততত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছে ও করিতেছে, বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শাস্ত্র সাহিত্য, আচার পদ্ধতি, এ সকলের অনেক সংগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু এমন সুন্দর, এমন মূল্যবান, এরূপ বিরাট আয়োজন ও উপকরণ সত্ত্বেও, মানব সমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাসের পত্তন পর্য্যন্ত করিতে *পারে নাই। সমগ্র মানবমণ্ডলীকে য়ুরোপ* এপর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড ভাবেই দেখিয়াছে। আর একটা কল্পিত, অলীক সূত্রে এ সকল খণ্ড বস্তুকে গাঁথিয়া তাহাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক একত্ব প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের যেমন পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা হয়; প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়া যাইয়া আপনার পরিণতি ও পরিপক্কতা লাভ করে, আর এক এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া, মানুষ যেমন অপর পূর্ণতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সমগ্র মানবজাতিও ধারাবাহিকরূপে, সমাজ-পবিবর্ত্তনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ্ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। ভারতে ও মিশরে, লুদিয়ায় ও ব্যাবিলনে, এই "বিশ্ব-মানব" পৌগণ্ড ও বাল্যদশায় ছিলেন। গ্রীসে ও রোমে যৌবনের প্রথম প্রান্ত প্রাপ্ত হন। আধুনিক য়ুরোপে যৌবনের পূর্ণতা ও জীবনের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং য়ুরোপের বাহিরে যারা পড়িয়া আছে, আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার যারা অধিকারী নহে, তারা বালকরূপে স্নেহ, কৃপা, ও অনুকম্পার পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সমকক্ষরূপে কখনো সমাদৃত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় পাণ্ডিত্য এইভাবেই মানবসমাজের একটা সার্ব্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়াছে ও করিতেছে।

কিন্তু পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি একই ব্যক্তির জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এক জনে পৌগণ্ডাবস্থা শেষ হইয়া, আর এক জনে বাল্যের সূচনা, ও তাহার বাল্যাবস্থার অবসানে তৃতীয় ব্যক্তির যৌবনের প্রতিষ্ঠা

কখনো হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ক্রমটা কখনো ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় না। যার পৌগণ্ড, তারই বাল্য, তারই আবার যৌবন, সেই একই ব্যক্তি আবার যৌবনের পর ক্রমে জরা প্রাপ্ত হয়। এই যে একত্ব, ইহাই এই বিবর্ত্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। ভারতের পৌগণ্ড, বাল্য, যৌবন, জরা, এ সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি। কারণ এ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া, ভারতে একত্ব বল, নিজত্ব বল, জাতিত্ব বল, তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারতের সমাজ-জীবনে কোন ভঙ্গ, কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। সেইরূপ বিলাতেরও পৌগণ্ড যৌবনাদি অবস্থাভেদ, ও এই সকলের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি হইয়াছে, ইহা বুঝি। কিন্তু মিশরে বাল্য ছিল, আর আজ মিশরের পুরাতন পৌগণ্ড মার্কিনের যৌবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা অতি অদ্ভুত কথা। অথচ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপরই মানবসমাজের সার্ব্বজনীন ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে মিশর, ভারত, পারস্য, চীন, আসিরীয়, ব্যাবিলন—এ সকল "বিশ্বমানবের" বিকাশের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। বর্ত্তমান য়ুরোপ সেই বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনের সকলের শেষ অবস্থার প্রমাণ দিতেছে। এজন্য য়ুরোপীয় সাধনা প্রাচীন হিন্দু বা ইহুদীয় সভ্যতা ও সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপীয় সাধনার মাপকাটি দিয়া জগতের প্রাচীন সাধনা সকলের ভাল মন্দের বিচার করিতে হইবে। মিশর, ভারত, পারস্য, ব্যাবিলন্ প্রভৃতি প্রাচীন জাতি সকলের জীবনের ও ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিসকলের যদি একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগ ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইত, তবেও বা এই সিদ্ধান্ত কিয়ৎ পরিমাণে দাঁড়াইবার স্থান লাভ করিত। আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের এরূপ একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়সাধনার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বর্ত্তমান য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য সকলই বহুল পরিমাণে, প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীস ও রোমের অর্জ্জিত সম্পদেই আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার বিভবগৌরব রচিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে কিয়ৎপরিমাণে, গ্রীস ও রোমকে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাধনা ও সভ্যতার বাল্য বা প্রথম যৌবনের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মিশর বা চীন বা পারস্য বা ভারতের প্রাচীন সাধনার সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাধনার সে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান য়ুরোপ এখনো প্রাচীন ভারত বা চীনের সাধনার উত্তরাধিকারী হয় নাই। সে সাধনাকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্ত করিয়া, তাহারই উপর এক নূতন সাধনা গড়িয়া তোলে নাই। এ অবস্থায় ভারত বা চীনকে য়ুরোপীয় সাধনার পূর্ব্বতন পৌগণ্ড বা বাল্য অবস্থা বলা যাইতে পারে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আশা-হত।

১

বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাসের ব্রে খেলা চলিতেছিল। ইস্কাবনের বিবির ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এমন সময় প্রভাস আসিয়া উপস্থিত।

আমি কহিলাম, "কি হে, কি মনে করে ?"

প্রভাস কহিল, "বিশেষ দরকার আছে। একটু নিরিবিলিতে বলব।"

সে বাজি শেষ হইলে প্রভাসকে লইয়া পাশের নিভৃত কক্ষে গেলাম। প্রভাস কহিল, "একখানা নাটক লিখেছি!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আমাকে বুঝি সমজদার পেয়েছ, তার ? হায়, হায়!"

প্রভাস একটু অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা নয়, তবে তোমার সঙ্গে না ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের ম্যানেজারের আলাপ আছে, কুঞ্জ বলছিল—তাই যদি একবার তাদের দেখিয়ে সুবিধা করে দিতে পার! তা ছাড়া, তোমাকেও একবার দেখাতে চাই, তোমার মতটা জানবার জন্য! কাউকে পড়িয়ে শোনাই নি' এখনো!"

আমি গণিতের অধ্যাপক। সাহিত্যরসের আস্বাদ-বোধ কি আমার সাধ্য! প্রভাসের কথায় মনে একটু গর্ব্ব হইল! আমি কহিলাম, "বেশ কথা—আজ রাত্রে পড়া যাবে! এখানেই খাওয়া-দাওয়া করো—সে সময়টা বেশ নিরিবিলিও থাকি!"

মলিন শালের মধ্য হইতে একখানি মোটা বাঁধানো খাতা লইয়া প্রভাস আমার হাতে দিল—আমি সেটি টেবিলের ড্রয়ারে রাখিয়া দিলাম। প্রভাস আমার সহপাঠী! ক্লাশে তাহার সহিত বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দিতা চলিত! প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়া আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল। সেই আক্রোশে আমার ছাত্রজীবন এমন কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সরস্বতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপহার গুলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নাই!

বি, এ, পরীক্ষার ব্যূহভেদ করিতে না পারায় প্রভাসের ছাত্রজীবনের গতি মন্থর হইয়া পড়িল!

বাঙ্গালা সাহিত্যের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! ছেলেবেলা হইতেই কেমন-একটা স্বপ্নময় অস্পষ্টভাবে তাহাকে ঘেরিয়া থাকিত। ক্রমে সেই ভাব তাহার চারিধারে এমন একটি সুনিবিড় জাল রচনা করিল যে, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাহার অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল! কাব্যের ইন্দ্রজালময় রহস্যালোকে তাহার চিত্ত কিসের সন্ধানে ফিরিত, সেখানে সে কি সুখের স্বাদ পাইত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারিতাম না! তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইলেও, কল্পনার কমলবনে বাণীদেবী তাহার জন্য স্নেহ আসন বিছাইয়া দিতেছিলেন! সহসা একদিন দেখা গেল, তাহার বন্ধুবান্ধব যখন ছাত্র-জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন

সে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার কুহক-রচনার মধ্য দিয়া একটা সুপ্রতিষ্ঠ স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই!

সাহিত্য আর যে আনন্দই দান করুক না কেন,—শূন্য উদর কিম্বা দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন পন্থাই সে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের জন্য বাঙ্গালার উদীয়মান সাহিত্যিক সংবাদ-পত্রের অফিসে কর্ম্মের উমেদার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল! লক্ষ্মীদেবী কৃপা করিলেন—সহজেই প্রভাসের চল্লিশ টাকার একটা চাকুরি মিলিল!

কিন্তু এ কি অসহ্য দুঃখ! তীব্র পরিহাস! মন যখন কল্পনা-কুঞ্জে পুষ্প-সুরভির জন্য আকুল হইয়া উঠে, গোপন ঊর্দ্ধলোকে আদর্শের সন্ধানে ফিরে, কর্ত্তব্য তখন খুন-ডাকাতের বীভৎস রিপোর্ট লিখিবার জন্য তাগাদা দেয়! ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সার-সঙ্কলন, গরিলা-বনমানুষের বিচিত্র বার্ত্তা-সংগ্রহ, ও গ্রীণলণ্ডের রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া ত এমন একঘেয়ে হীন জীবনও বহন করা যায় না! কিন্তু উপায় নাই! লোকে আদর্শ বা কাব্য পড়িতে চাহে না, কারণ, তাহা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। কাজকর্ম্মের অবসরে এইরূপ দুই-চারিটা উদ্ভট সংবাদ পাইলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়!

রাত্রে প্রভাস কহিল, "খপরের কাগজে ত আর টেঁকা যায় না—জীবনে যেন ক্রমেই কালো কালি মাখছি! চাকরি রাখা দুষ্কর হয়েছে!"

প্রভাস পরচর্চ্চা বা গ্লানির কথা লিখিতে পারে না, কড়া দুই চারিটা সমালোচনায় সহ-যোগীর প্রতিষ্ঠা সে দূর করিতে পারে না, তোষামোদ করিয়া লেখনীর সাহায্যে ধনীর শিরে সে পুষ্পবৃষ্টিও করিতে পারে না, কাজেই স্বত্বাধিকারী বিরক্ত, পাঠকের দলও আগ্রহশূন্য!

প্রভাস কহিল, "শুনেছি থিয়েটারওলারা পয়সা দিয়ে বই নেয়—মোটা বাঁধা মাহিনাও দেয়—তাই বহু চেষ্টায় এই নাটক লিখেছি!"

আমি কহিলাম, "তুমিও যেমন—থিয়েটারে কেবল হীন রুচি, সেখানে নাটক জোগানো কি তোমার মত লোকের কাজ! কতকগুলো পচা অশ্লীল ইয়ারকি, আর নাটকের মাথায় লাঠি মেরে সেখানে নাটক লিখতে হয়!"

প্রভাস কহিল, "তবু তুমি একবার দেখ না!"

প্রভাস নাটক পড়িতে লাগিল—নাটকের নাম,"রাজকন্যা।" যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমনি ভাবভঙ্গীর সহিত সুর খেলাইয়া সে স্বরচিত নাটক পড়িতে লাগিল! রচনায় এমন একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, আমার নীরস গণিতচর্চ্চারত মস্তিষ্কও মুগ্ধ হইয়া গেল! করুণরসের স্নিগ্ধ ধারায় আমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতে-ছিল, অজানা লোকের দুঃখিনী রাজকন্যার মর্ম্মবেদনায় অন্তরটা হা-হা করিয়া উঠিতেছিল! যখন নাটক পাঠ শেষ হইল, তখন আমার মনে হইল, যেন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!

সাহিত্যের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না, তবু এটুকু বুঝিলাম, যাহা সচরাচর পাঠ

করা যায় "রাজকন্যা" তেমন নহে! ইহাতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না! চরিত্রগুলিতে একটা অসাধারণত্ব ছিল!

২

আমার পিতৃব্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের এটর্ণি ছিলেন। সেই সূত্রে ম্যানেজারের সহিত আমার অল্প আলাপ ছিল!

প্রভাসকে লইয়া ম্যানেজার রামকালী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুদক্ষ অভিনেতা ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামকালীর বাবুর নাম আর কে না শুনিয়াছে? রীতিমত আগ্রহের সহিত রামকালীবাবু প্রভাসের নাটকখানি হাতে লইলেন। বলিলেন, "দশ বারো দিন পরে সংবাদ দিব।"

আমি তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলাম, "বহিখানা সাধারণ নাটকের মত নয়।"

রামকালীবাবু বলিলেন, "সাহিত্যে প্রভাস বাবুর নাম কে না জানে?"

দুই সপ্তাহ পরে রামকালী বাবুর বেহারা আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল! পত্রের মর্ম্ম,—প্রভাসবাবুর নাটক সাহিত্য-হিসাবে সুন্দর হইলেও অভিনয়ে তেমন জমিবে না—দৃশ্যপটাদি অঙ্কনেও বিস্তর ব্যয় হইবে। নূতন গ্রন্থকারের জন্য সহসা এত টাকা ব্যয় করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় না। ওথেলো হ্যামলেট আজকাল অভিনীত হইলেও দর্শক জুটে না—তেমনি প্রভাস বাবুর নাটক দৃশ্য-কাব্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নহে। কাজেই তিনি দুঃখের সহিত নাটকখানি ফেরত পাঠাইয়াছেন।

প্রভাস প্রত্যহই আপনার অদৃষ্ট-ফলের কথা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিত। সেদিনও আসিয়াছিল! রামকালীবাবুর পত্র দেখিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তার মুখ সাদা হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়াই সে খাতাখানি লইয়া চলিয়া গেল! আমি ডাকিলাম, কিন্তু সে ফিরিয়াও একবার চাহিল না! বেচারার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল!

এই সময় চৌবাড়ীর জমিদার ক্ষিতীশ চৌধুরীরা এক সখের থিয়েটারের দল খুলিল। তাহারা নূতন নাটকের সন্ধান করিতেছিল। আমি প্রভাসের নাটকের কথা বলিতে সে পাঁচ শত টাকা দিয়া নাটকের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইতে উদ্যত হইল! আমি গিয়া প্রভাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলাম।

প্রভাস কহিল, "সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। "সে কি? তার নকল নাই?"

"না—তার কোন চিহ্ন রাখিনি! ব্যর্থতার সাক্ষ্য রেখে লাভ কি?"

ক্ষোভে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল!

প্রভাস কহিল, "কাল আমি ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে গেছলাম—নাটক দেখতে। যা দেখলাম—কদর্য্য!"

আমি কহিলাম, "রামকালীবাবুর নাটক?"

"না।"

"রামকালীবাবুর নাটক একদিন দেখে এস, কি রকম ধরণটা ওরা চায়!"

"দাসত্ব করতে বল, তুমি?"

"তা নয়, ঠিক! তবে ষ্টেজের জন্যই যদি

দেখ, তা হলে ষ্টেজকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এতগুলো দর্শকের রুচি তুমি ত আর একরাত্রেই হঠিয়ে দিতে পারচ না?”

“তা বলে তাদের কুৎসিত রুচির অনুসরণ করতেও পারব না—এতে না খেয়ে সপরিবারে মরি যদি, সে-ও ভালো!”

৩

কিছুদিন পরে প্রভাস আসিয়া আবার সহসা দর্শন দিল। কহিল, “আজ থিয়েটারে যাবে? একখানা নূতন বই আছে।”

থিয়েটার দেখার প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না! রাত্রি জাগরণ সহ্য হইত না,—তাহার উপর, হেদুয়ার ধারে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিতাম, সারারাত্রি বায়ু ও আলোক-হীন, অন্ধকূপের মত, থিয়েটার হইতে দর্শকের দল শীর্ণ মুখে শুষ্ক চোখে গৃহে ফিরিতেছে—এই নিষ্ঠুর আমোদ প্রিয়তা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। থিয়েটারের নামে আমার কেমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল।

তাই আমি কহিলাম,“সারারাত্রি গারদঘরে আটক থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না!”

প্রভাস কহিল, “সারারাত্রি না-ই বা থাকলাম—একখানা নূতন নাটকের অভিনয় হবে—রামকালীবাবুর লেখা!”

একখানিমাত্র নাটক! “জেলে খুন”, “কালো ভূত” প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসনে পাঁচ ফুলের সাজির ব্যবস্থা হয় নাই শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য ও আশ্বস্ত হইলাম!

প্রভাস আরো কহিল, “রামকালীবাবুর লেখার ধরণটা কেমন—দেখব!”

আমি কহিলাম, “কি নাটক?”

প্রভাস একখানা হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া দিল! কেমন করিয়া আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে হয়, হ্যাণ্ডবিলখানি তাহার চূড়ান্ত পরিচয়! এমন নাটক আর কখনো প্রকাশিত হয় নাই—নাটকের রাজ্যে একেবারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে ইত্যাদি বাগাড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না এবং খুব মোটা চিত্র-বিচিত্র অস্পষ্ট অক্ষরে নাটকের নাম লেখা—“কমলাবতী”,—নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নায়ক বিনায়ক সাজিবেন, নাট্যকার স্বয়ং,—বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের আর্ভিং, শ্রীযুক্ত রামকালী হালদার।

রাত্রে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। দুইখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে গেলাম। কি ভিড়! কলিকাতার যত লোক যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একই রাত্রে এত লোকের থিয়েটার দেখিবার সখ জাগিয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। রামকালীবাবু গর্ব্বস্ফীত বক্ষে টিকিট-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন—আমরা সাবধানে তাঁহার দৃষ্টিটুকু এড়াইয়া আসিলাম!

ঐক্যতান-বাদনের পর পটোত্তোলন হইল—প্রথম দৃশ্যে এক সুবিস্তীর্ণা নদী—দুই কূল দেখা যায় না! নদীবক্ষে একখানি সুদৃশ্য তরণী! তরণীর উপর বসিয়া রাজকন্যা কমলাবতী বাঁশী বাজাইতেছেন! দৃশ্যপটের আড়ম্বরে ও রাজকন্যার সুদক্ষ বাঁশীর সুরে কেমন-একটা বিভ্রম আনিয়া দিল! তাহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকের গতি ত্বরিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল! দুই-চারিটা দৃশ্যের পর আমি চমকিয়া উঠিলাম,—এ যে প্রভাসের নাটক! কেবল নামগুলা ও দৃশ্য-যোজনায়

একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে! রচনার ভাব, ভঙ্গী, উপাখ্যানের অভিনবত্ব, সমস্তই প্রভাসের! আশ্চর্য্য হইয়া আমি প্রভাসের দিকে চাহিলাম। অভিনয়ের মধ্যে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল! প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে, প্রভাস কহিল, "আমার 'রাজকন্যার' মত মনে হচ্ছে, না?"

আমি কহিলাম, "হুবহু তাই বলে ত আমার মনে হয়!"

চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া প্রভাস সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল! আমি কহিলাম, "আর একটু দেখা যাক! ভদ্রতায় না হয়, কোর্ট আছে!" প্রভাস কথা কহিল না!

তার পর দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল! কথাবার্ত্তায়, ভাবে-ভাষায় এতটুকু আর প্রভেদ রহিল না—হুবহু প্রভাসের রচনা! কেবল ঐ নামগুলাই যা বদলাইয়া দিয়াছে!

অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল মাতিয়া উঠিল! এমন নাটক বাঙ্গালা থিয়েটারে কখনো অভিনীত হয় নাই! যেমন উচ্চভাব, গানগুলিতেও তেমনি কবিত্ব,—থিয়েটারী সাহিত্যে যে দুটি জিনিস একান্তই দুর্লভ!

পার্শ্বস্থ জনৈক দর্শক কহিল, "রামকালীবাবু কি আশ্চর্য্য নূতন ভাবে লেখার স্রোত ফিরিয়েছেন!"

আর একজন কহিল, "প্রতিভার লক্ষণই ত এই!"

প্রভাস ক্ষেপিয়া উঠিল। সে কহিল, "চুরি! আমার লেখা বেমালুম চুরি করেছে!"

লোক দুইজন অবাক হইয়া গেল! এমন অদ্ভুত কথা তাহারা শুনিবে বলিয়া কখনো আশাও করে নাই!

আমি কহিলাম, "কথাটা সত্য!"

তাহারা কহিল, "হুঁঃ! বলেন কি মশায়?"

উৎসাহী দর্শকের সঘন করতালিবর্ষণে প্রভাস অস্থির হইয়া পড়িল!

তখন তৃতীয় অঙ্ক চলিতেছিল। দৃশ্যটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল! নায়ক বিনায়ক যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে—রাজা হংসবাহন বিপুল ভাবনা ও দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—জয়মাল্য লইয়া রাজকন্যা কমলাবতী সম্মুখে উপস্থিত! এমন সময় ষড়যন্ত্রকারী কতিপয় রাজ অনুচরের প্রচুর প্রমাণে বিনায়কের বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—রাজা শিহরিয়া বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিলেন! রাজকন্যার কর হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এ অসম্ভব কথায় সভাসদগণ অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাজা নিরুপায়, প্রমাণ পাইয়া দোষীর দণ্ডবিধান না করিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে! বিনায়ক অবিচলিত হৃদয়ে সমস্ত অপবাদ মাথায় বহিয়া কারাগৃহে যাইবার সময় ধীরস্বরে করুণ আক্ষেপবাণীতে দর্শকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রভাস দাঁড়াইয়া উঠিল!

পিছন হইতে অধীর দর্শকের দল একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল—"আঃ বসুন না, মশায়—আপনি ত transparent নন যে, দেখতে পাব!"

প্রভাস ধীরস্বরে কহিল, "চোর—চোর! আমার বই চুরি করেছে—নিলর্জ্জ চোর কোথাকার!"

আকস্মিক রসভঙ্গে অভিনেতাও স্থির হইল। চারিধারে রীতিমত গোল বাধিয়া

গেল! গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিল—"দূর করে দাও, মাতালটাকে—দূর করে দাও!

আমি প্রভাসের হাত ধরিলাম! প্রভাস কহিল, "বল, তুমিই বল, চুরি কি না! আমি মাতাল নই, অজ্ঞান নই—এ নাটক আমার লেখা। রামকালী বাবুকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল—তিনি ফেরত দিয়ে বলেন, ভালো হয়নি—তার পর সেই বই নিজে আগাগোড়া চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছেন—চোর কোথাকার! প্রমাণ অবধি রাখিনি, আমি! ওঃ! সে খাতা পুড়িয়ে ফেলেছি!"

'দূর করে দাও', 'পাগল', 'মাতাল' শব্দে চারিধারে যেন বজ্রনিনাদ উঠিল! মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবখানা!

নায়ক বিনায়ক মঞ্চ হইতে হাঁকিলেন—"গার্ড!"

ষ্টেজের গার্ড আসিয়া প্রভাসের হাত ধরিল! প্রভাস কহিল, "ছেড়ে দাও—অসভ্য, বেয়াদব্।"

প্রভাসকে শান্ত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। থিয়েটারের দুইচারি জন লোক আসিয়া প্রভাসের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিল। আমি কোনমতে গোল থামাইয়া প্রভাসকে লইয়া বাহিরে আসিলাম!

রাস্তার ধারে আসিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতেছি, এমন সময় ভিতরে তুমুল রবে করতালির ধ্বনি উঠিল! প্রভাস তখন আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তর্কী।

তর্কী ইংলণ্ডের দক্ষিণে ডিভনসায়ারে সমুদ্রতীরের উপর অবস্থিত একটি স্বাস্থ্য নিবাস। ষ্টেসনে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। সকলেই প্রায় তর্কীতে যাইবার জন্য ব্যস্ত। সকলেরই হাতে এক একটি হ্যাণ্ডব্যাগ—তাহাতে দুই তিন দিনের মত তাঁহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা,—শার্ট কলার রুমাল ইত্যাদি। আহার ও বাসোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যাদি সেখানকার হোটেলেই মিলিয়া থাকে। আমাদের এক দিন বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইলে কত ভাবনা হয়—কি খাইব, কোথায় থাকিব। কিন্তু এই সব দেশে সে কথা কিছুই ভাবিতে হয় না বলিয়া আমোদ বা ব্যবসার জন্য দেশ-ভ্রমণে কত সুবিধা।

যাত্রীর এত ভিড় যে সব গাড়ি গুলিই ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেপিলে লইয়া বাপ মা আনন্দ করিতে করিতে চলিয়াছেন। কেহ বা লাল রঙের ধ্বজা উড়াইয়া গান গাহিতে গাহিতে ষ্টেসন ও রেলগাড়ি প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে। ছেলে মেয়েদের প্রায় সকলের বুকেই এক একটি ফুল গোঁজা।

এই স্থানে ষ্টেসনে ডাক্তার কার্ণিজী

ব্রাউন সাহেবের সহিত দেখা হইল। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের রোগ নিরাকরণ করিবার জন্য যে সমিতি আছে, ইনি তারই সেক্রেটারী। সাদরে আলাপ করিয়া—লণ্ডনে ফিরিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়া তিনি তাঁহার নামের কার্ড আমাকে দিলেন। ঠিকানা ৩২ নং হারলী ষ্ট্রীট। সেখানে ডাক্তারের আপিস বাটী, কিন্তু তিনি থাকেন হ্যামষ্টেড্ নামক লণ্ডনের একটি নির্জ্জন পল্লীতে। এই মনোহর স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া সকালে কর্ম্ম-স্থানে আসেন ও সারা দিন সেখানেই কাজ করিয়া রাত্রে বাটী ফিরিয়া যান। মাঠের নীচে দিয়া যে রেল-লাইন গিয়াছে তাহার সাহায্যে আধ ঘণ্টায় যাতায়াত হয়। সে দেশে আমাদের এদেশের মত এত গাড়ি ঘোড়ার খরচ নাই। সবাই পথে চলে ও সাধারণ লোকের সঙ্গে যাতায়াত করে; তাহাতে অপমান বোধ করে না। অনর্থক খরচ নিবারণ করা সে দেশের রীতি। তাই তাহাদের এত স্বচ্ছল অবস্থা।

সেই গাড়িতে ডিভনসায়ারেরই এক কৃষক ও কৃষকবধূর সহিত আলাপ হইল। তাঁহারাও দুই দিনের অবসরে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রাম ও বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতেছেন। তাঁহাদের খুব সরল ভাব। রমণীটি ক্ষীণাঙ্গী এবং দেখিতেও বেশ সুশ্রী। তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিবার সময় দেখিলাম—তাঁহার হাতগুলি চাষার ঘরের মোটা কাজ করিয়া, শক্ত হইয়া গিয়াছে—মোটেই কোমল নহে। তাঁহারা আমাদের দেশের কথা সাগ্রহে শুনিতে চাহিলেন।

আর একজন সহযাত্রী ছিলেন তিনি কারিগর। মজবুৎ লোহার তোরঙ্গ তৈয়ার করাই তাঁহার কাজ। কারখানার ভিতরটা বড়ই উত্তপ্ত—তাহারই মধ্যে তিনি দিনে প্রায় আট ঘণ্টা কাজ করেন। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন ছুটি পান। আর সেই দুই দিন কালীঝুলী মাখা পোষাক ত্যাগ করিয়া আমোদ করিয়া বেড়ান। সপ্তাহে ছয় পাউণ্ড আয়। স্ত্রী আছেন, ও একটি দুই বছরের ছেলে আছে। স্ত্রী এখন ছেলেটিকে লইয়া তর্কীতেই রহিয়াছেন। আজ এক মাস পরে দুইজনের দেখা হইবে।

খোলা মাঠ, শস্যক্ষেত্র, ঘরবাড়ি, ও ষ্টেসনের পর ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া গাড়ি অচিরে সমুদ্রের ধারে পৌঁছিল। তীরে কত ছেলে মেয়ে ও নরনারী শুধু পা করিয়া হাতের কাপড় গুটাইয়া বালি ঘাঁটিয়া ঝিনুক কুড়াইতেছে। কেহ বা ছোট নৌকায় করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতেছে। সকলেই একটি না একটি খেলায় ব্যস্ত—কেহই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অপরের খেলা দেখিতেছে না!

তর্কীতে পৌঁছাইয়া সেখানকার নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে আহার করিলাম। পরে রেলের গুদামঘরে আমার হাতব্যাগটী জিম্মা রাখিয়া দেশ দেখিতে বাহির হইলাম। সে সব স্থানে ষ্টেসনেই মানুষের মোটঘাট জমা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। দুই এক পেনি দিলেই তাহারা একদিনের জন্য জিনিষপত্র জমা রাখে। ইহাতে কত সুবিধা,—মোটঘাটপত্র লইয়া বিব্রত হইতে হয় না।

এ ষ্টেসনটিও সমুদ্রের ধারে। সেখান হইতে সুনীল সমুদ্র অনেকদূর অবধি দেখা

যায়। দূরে দুই একটি ছোট দ্বীপ বুকে লইয়া নীল সমুদ্র নীল আকাশে মিলিয়া আছে। সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট জাহাজগুলি এদিক ওদিক করিয়া যাত্রী পার করিতেছে। নিকটেই ব্রাইটনের ঘাট। সমুদ্রে স্নান করিবার ছোট ছোট ঢাকা গাড়ির সারি। তাহার মধ্যে কাপড় ছাড়িয়া কৌপীন পরিয়া জলে নামিতে হয়। অনেক স্থলে Mixed bathing বা স্ত্রী পুরুষে একত্রে স্নানের আড্ডা আছে। সেগুলিতেই বেশি ভিড়। সাঁতার শিখার উপলক্ষ করিয়া যত অযথা ঘটনা হয় তার সব ছবি-ছাপা কাগজ বাজারে বিক্রয় হয়। এখন এ প্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সমুদ্রের ধারে-ধারে পাথর-বাঁধান রাস্তা। তার তলায় কত সুন্দর জলজ উদ্ভিদ ভাসিয়া আছে। চলিতে চলিতেই সে সব দেখা যায়। কত জেলী মাছ দেখিলাম। ধীবরদের নৌকাগুলিতে বলিষ্ঠকায় ছেলেরা ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছে। আর সমুদ্রের ধারে ধারে অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর বড় বড় বাড়ী। সেখান হইতে অসীম সমুদ্রের দৃশ্য কি সুন্দর! পাহাড়ের ধারে ধারে অসংখ্য ফুল গাছ। এ সব স্থান আমাদের ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানেরই মত প্রায় গরম। এমন কি—তাল গাছ অবধি দেখা যায়। রৌদ্রে বাহির হইলে মাথা ঢাকা দিতে হয়, তাই শীতকালেই এই স্থানে যাত্রীর এত জনতা। এই স্থানে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি চিকিৎসাশালা আছে। সেখানকার চিকিৎসার ব্যবস্থা ঔষধ খাওয়ানো নহে। নির্ম্মল বায়ু সেবন, নিয়মিত ব্যায়াম, ও সূর্য্যালোকে সারা দিন থাকাই নিয়ম। নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা চাই। এইরূপ ব্যবস্থায় যক্ষ্মা কাশের রোগীরা যত শীঘ্র ও যত বেশি আরাম পায়, অন্য কোন প্রকারে তাহা পায় না। তাই এখন সকল সভ্য দেশে এইরূপ চিকিৎসারই বেশি চলন হইতেছে। আমাদের দেশে রোগী কেবল ঔষধ খাইয়াই তাহা মারা যায়!

স্থানটি ছোট ও সেখানে দেখিবার জিনিস অল্পই আছে। এবং দৈনিক খরচ প্রায় পনেরো শিলিং—এই কারণে সেই দিনই সেখান হইতে ফিরিবার মনস্থ করিলাম। কখন ট্রেণ পাওয়া যায়, জানা ছিল না;—ষ্টেসনে আহারের ঘরের তত্ত্বাবধান মেয়েরাই করেন, তাঁহারা বই দেখিয়া সমস্ত খবর আমাকে বলিয়া দিলেন। বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য ও উন্নতিশীল স্থানে মেয়েদের উপযোগী সকল কাজে কেবল মেয়েদিগকেই নিযুক্ত করা হয়, যথা পোষ্ট আপিস, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন্ সংক্রান্ত কার্য্য, আহারের তত্ত্বাবধান, কেরাণীগিরি ইত্যাদি! এ সব না করিয়া রমণীরা পরমুখাপেক্ষী হইলে কেমন করিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতা থাকিবে! এই সব কাজ রমণীগণ দিব্য সুচারুরূপে ও এমন সুব্যবস্থার সহিত সম্পন্ন করিতে পারেন দেখিয়া তাঁহাদিগকে অন্য কাজ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ করিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছুটি পান। তখন সুন্দরভাবে সাজ সজ্জা করিয়া তাঁহারা আমোদ-প্রমোদ করিতে বাহির হন। সেই সুন্দর পোষাকগুলি সবই প্রায় অবসর সময়ে তাঁহাদের নিজের হাতের তৈরী। সুতরাং সজ্জাতে তত অর্থ

ব্যয় করিতে হয় না—তাঁহারা নিজেরা শিক্ষিত ও নিপুণ বলিয়া তাঁহাদের কত দৈনিক খরচ বাঁচিয়া যায়।

সেইদিনই বৈকালে ট্রেণে চড়িয়া রাত্রি নয়টার সময় আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

পোষ্যপুত্র

৩৩

সারারাত্রি জাগিয়া ভোরের সময় ঘুমাইবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অকৃতকার্য্য হইয়া বিরক্তচিত্তে নীরদকুমার বিছানা ছাড়িয়া জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় বাহিরে দরজায় ঘা পড়িল। কোন ছাত্র হয়ত কোন প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে এই কথাই তাহার মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রবেশ করিল যোগেন্দ্র। যোগেন্দ্র এখন আর একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলও দুইচারি গাছা সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বেশ ভূষার পারিপাট্যও তখনকার মত কিছু নাই, তবু তাহার মুখে সেই সরল প্রাণখোলা হাসিটুকুর অভাব ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া একবার মাত্র বন্ধুর মুখের দিকে চাহিতেই যোগেন্দ্রের মুখে হাসির পরিবর্ত্তে ঘোর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর না হইয়া সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি! তোমার কি হয়েচে?"

নীরদ তাহার বিস্ময়ের কারণ কতকটা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি মুখের ভাব বদলাইবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি? ভূত দেখলে নাকি?" "ভূত আমি দেখচি কি, কাল রাত্রে তুমি ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলে তাত ঠিক বুঝতে পারচিনে! যাহোক তোমার কি কোন বেশি রকম অসুখ করেছে?" সত্যই খুব বড় একটা কঠিন পীড়া মানুষকে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন কত বৎসরের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া যায়, নীরদের মুখে সেই রকম একটা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির আক্রমণ শতচিহ্নে সুপরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু বিচলিতভাবে সে সরিয়া আসিল। আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "হাঁা, মাথাটা ভারী ধরেচে।" "সেইজন্য বুঝি কাল খেলে না? ঠাকুর বল্লে তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আছ,—আর ওদিকে বড়—বুঝেছ তো! আমিতো জানিনা তোমার অসুখ করেচে—একি! একবারও বিছানায় শোওনি নাকি? ঐ জন্যেই তো বলিরে দাদা, সাধু সন্ন্যাসীতে কি আর তোমার আমার ধাত বোঝে? সারা দিনরাত্রি ধরে যোগ-যাগ হচ্ছিল বুঝি?"

যোগেন্দ্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া নীরদ একটু হাসিল, বলিল, "পাগল নাকি! কে যোগ শিখচে? রজ্জুতে সর্পভ্রম করে যখন তখন খুব শিউরে উঠতে পারো, যাহোক!"

যোগেন্দ্র যেন গম্ভীর হইয়া কহিল "বাঁচালে,

সর্পেতে রজ্জুভ্রম করিনে ত, সেইটেই সাংঘাতিক” নীরদ হাসিয়া ফেলিল “ও একই কথা মোদ্দা ভ্রমতো বটেই”।

“আচ্ছা না হয় আমারি ভ্রম, কিন্তু সেই যে মথুরার অমন্ হাসিখুসি, আমোদ আহ্লাদ, খাসা বাড়ি, তোফা ব্যবস্থা, চা-কফি, পাঁঠা পাখী, কোথাও কোন ফাঁকটি ছিল না;—দেশের কাজ,নিজের সুখ একসঙ্গে সবি ছিল,—হুড়হুড় করে টাকা আসছিল,—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত হঠাৎ কোথা থেকে এক দৈত্য এসে তোমার ঘাড়ে চাপলো বল দেখি? রাতারাতি একেবারে সন্ন্যাসী!”

যোগেন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

নীরদ পরিহাস করিয়া বলিল “সে কষ্ট যে আর ভুলতে পারচো না? শুনেছিলুম সময়ে সকলি সহিয়া যায়। তোমার দেখচি ঠিক বিপরীত”।

“ভুলতে দিলে কৈ বলে, সেওতো ঐ তোমারি কীর্ত্তি! মাছ—এমন তোফা টাট্‌কা মাছ চোখের ওপোর দিয়ে জেলে ব্যাটারা ধরে নিয়ে যাবে রোজ দুবেলা—তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখচি। উপায় নেই! জিভে যত চোখে তত জল ঝরতে থাকে। কাছে কেউ থাকলে বলি চোখে কি একটা পোকা না কি পড়ল। নিজেতো আলো চাল ধরেছ, যেন মা কি বাপ—”

নীরদ সকৌতুক হাস্যে যোগেন্দ্রের দুঃখ-কাহিনী শুনিতেছিল; শেষের দিকটায় অকস্মাৎ চমকিয়া সে বাধা দিল; “যোগেন যা খুসী তাই বলে বসোনা ওসব কি কথা—”

যোগেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বন্ধুর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া সে বলিল “এ কি তুমি যে একেবারে আমায় অবাক করে দিলে? তামাসা করে কি নাকি একটা কথা বলেছি, তাতে চটবার এতো কি পেলে? এতেই বলে—উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত বল্লে মানুষ রুষ্ট—। সত্যিই তো আর তোমার স্বর্গগত বাপ দ্বিতীয়বার তোমাকে কাছা পরাবার জন্যে স্থানচ্যুত হয়ে আসচেন না! ভক্তি কত? বৎসরান্তে এক গণ্ডূষ জলও তো দিতে দেখিনে।—”

নীরদকুমার যোগেন্দ্রের পিঠের উপর একটা অধীর চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, “ও সব কথা ছেড়ে দাও যোগেন, তুমি যদি সত্যসত্য এখানে ক্লান্ত হয়ে থাক তা হলে সেকথা স্পষ্ট করে বলেই কেন অবসর নাওনা, জোর তো কিছু নেই! আর জোর করলেই বা মানবে কেন? আর পার যদি”, নীরদ একটু হাসিল, “এই হতভাগা স্কুলটাকে সিডিসনের আড্ডা বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা রিপোর্ট করে দিও, খুব উন্নতি হয়ে যাবে এখন।”

যোগেন্দ্র এই বিদ্রূপে শিহরিয়া উঠিল, “বলে নাও; ভগবান মুখ দিয়েছেন যত পার বলো। জানো কিনা হতভাগাটাকে বঁড়শিতে বিঁধে রেখেছ, ওর আর কোথাও এক পা নড়বার জো নেই—তাই মাঝে মাঝে খেলিয়ে দেখে নেওয়া বইত না! তাই যদি পারবো নীর, তাহলে আর মথুরার তেমন চাকরীটে খুইয়ে তোমার সঙ্গে এসে

বনবাসী হই? স্ত্রীপুত্র সব ছাড়িয়েছ, আরও তুমি বলো তোমায় ছেড়ে যেতে চাই?"

নীরদ মনে মনে অনেকখানি লজ্জা বোধ করিল, যোগেন্দ্র যাহা বলিতেছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য। যোগেন্দ্রের স্বার্থত্যাগ ও বন্ধুপ্রেম যথার্থই অনুকরণীয়। নীরদ জানিত যে কয়জন যুবক তাহার এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যোগেন্দ্র-নাথ তাহাদেরই মধ্যে একজন নহে। অন্য সকলে দেশকে ভালবাসিয়া কর্ত্তব্যকে ভাল-বাসিয়া যশ ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া তাহার সহিত যোগদান করিয়াছেন কিন্তু যোগেন্দ্র স্বেচ্ছায় এ কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে, সুধু তাহাকে ভালবাসিয়া! ইহার জন্য সে বেচারা ঘরে অনেকখানি নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকে। পাছে নীরদ মণিমালার চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা জানিতে পারে সেই ভয়েই যে সে এই কয়মাস তাহাকে এখানে আনিতে পর্য্যন্ত সাহসী হয় নাই, একথাও নীরদ যে একটু একটু না বুঝিয়াছিল, এমন নয়। দুএকবার সে একটু আভাষ দিয়াও সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। "গিন্নির কাছে অভিশপ্ত করো না ভাই, দেখো।"

নীরদ চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র আরও একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল! অবশেষে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, আজ নীরদ অসুস্থ, এবং তাহার আহার হয় নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে সে বিরুদ্ধ ভাব হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল ইহা ভাবিয়া অনুতাপের ধিক্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তারকে একবার ডাকতে পাঠাই তা হলে?" নীরদ মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না ডাক্তার কি হবে? তেমন কিছুতো হয়নি"। "সে কি! মুখের চেহারা দেখলে যে ভয় করে! তবে না হয় থার্ম্মোমিটারটা আনি। নিশ্চয়ই তোমার শরীর বেশি খারাপ আছে।" যোগেন্দ্র উঠিল,—নীরদ ডাকিল, "না, না ও সব কিছু করতে হবে না,—যোগেন, শোন শোন—এসোনা একটু গল্প করা যাক। একটা কথা আছে—" যোগেন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, "অসুখটা বাড়িয়ে কি হবে?"

"বেশতো তোমরা না হয় একটু সেবা যত্ন করবে! পারবে?" "রা আর আছি কই?" নীরদকুমার হাসিয়া বলিলেন "হওনা কেন তোমরা,—আমি কি বারণ করেছি? বিরহের পালা-অন্তে মিলনের নাট্য রচনা করো, আমি দেখে যাই।"

"কি বল্লে, দেখে যাই? অস্থার্থ?"

"ঐ যে আগে বল্লুম একটা কথা আছে, এটা তারি সূচনা।"

"সূচনা শুনেইতো হৃৎকম্প উপস্থিত! আরম্ভ করো তবে—দেখা যাক কোথায় গিয়ে শেষ—!"

৩৪

সেইদিন প্রাতঃকালে নীরদকুমারের গুরু বিদায় লইয়া গিয়াছেন। বৈকালে পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া একটুখানি অন্যমনস্ক হইবার আশায় নীরদকুমার ঘরটার চারিদিকে একবার প্রত্যাশিতনেত্রে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। ঘরের দুই কোণে দুইটা আলমারিতে

পুস্তক ভরা আছে, বাংলা সংস্কৃত ইংরাজি সকল ভাষার কিছু না-কিছু ভাল বই তাহার সংগ্রহে ছিল। ম্যাক্সমূলারের "অমিতাভ বুদ্ধ" একবার হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া যখন সে ঈষৎ ক্লান্তভাবে উপরের তাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তিকা নিজের পূর্ব্বস্মৃতির সবটুকু মধুরতা ঢালিয়া দিয়া উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে হাসিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যন্ত্রচালিতের মত বইখানা তুলিয়া লইয়া নীরদ আলমারি বন্ধ করিয়া ঘরের মাঝখানে টেবিলের কাছে ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর সাদা কাপড়ের আস্তরণ বিছানো ও তাহার উপর কাশীর পিত্তলের সুন্দর কারুকার্য্য খচিত ফুলদানিতে এক গুচ্ছ হাসনাহানা ফুল তাহার শুষ্ক হৃদয়টির ভিতর হইতে ঘরখানিকে ক্ষীণ শেষ সুরভি দান করিয়া যেন সফলতার গৌরবে চাহিয়া দেখিতেছিল। আসন্ন মরণের পানে চাহিয়া সে যেন হাসিয়া বলিতেছে, "দেখ সবটুকু দিয়া দিয়াছি,—অনুতাপ করিবার কিছু নাই।" বাতাস তাহারি সুরভি স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া প্রাণপণে তাহাকে তাজা রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে-ও শুধু লইয়া সন্তুষ্ট নয়, কিছু দিতে চাহে। বইখানা খুলিতে প্রথমেই নীরদের চোখে পড়িল,

All look for thee Love, Light and Song,
Light in the sky deep red above
Song in the Lark of pinions strong
And in my heart true Love.
Apart we miss our nature's goal
Why strive to cheat our destinies ?
Was not my love for thy Soul ?
Thy beauty for mine eyes !
No longer sleep oh listen now !
I wait and weep, But where art thou ?"

অত্যন্ত ভাল লাগিল। *And in my heart, true Love.* সে দুইবার উচ্চারণ করিল, True Love ? "হাঁ সত্যই তাই! ইহাকেই True Love বলে! স্বার্থসিদ্ধি, রূপের মোহ, মিষ্টতার স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে সব কি প্রেম? ভুল, ভুল, সে সব ভুল! সত্য বলিয়া পূর্ণ মিথ্যাকে আশ্রয় করিতে সবেগে দুই হাত সে উর্দ্ধে তুলিয়াছিল, তাই সত্যের অধীশ্বর তাহার সে বাতুলতা সহ্য করিতে পারেন নাই! তাঁহার অমোঘ বজ্রনিক্ষেপে তাহার গতি প্রতিহত করিয়া দিয়া সত্যের গৌরব রক্ষা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। অন্তরের মধ্যে একটা স্থানে যেন নীরদ একটু হাল্কা বোধ করিল। যাহা বজ্রাহত বলিয়া ভয় ছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিল তাহা উপরের সামান্য আঁচড়মাত্র,—ভস্মচিহ্ন নয়।

পিছন হইতে যোগেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হরি তুমি সত্য! দেখো এতদিন তুমি আছ কি না আছ এ বিষয়ে বিষম সন্দেহ পোষণ করে এসেছিলাম; আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্ব্বো যে তুমি আছ, আছ, আছ, এই পৃথিবীতেই আছ"। নীরদ হাসিয়া মুখ ফিরাইল, "হঠাৎ বেল্লিকের মুখে হরিধ্বনি শুনলে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! লক্ষণ তো বড় শুভ মনে হচ্ছে না, যোগেন"! যোগেন্দ্র নীরদের পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল, "শুভ লক্ষণ বলে তোমার মনে হচ্ছে না?

আমার কিন্তু এখনকার লক্ষণটা বড্ডই সু বলে মনে হচ্ছে! কি বলব দাদা যদি তোমার মত ছিপছিপে শরীরখানি আজকের জন্য পেতাম তাহলে একবার আহ্লাদটা প্রকাশ করে দেখাতাম। আমার ইচ্ছে করচে আনন্দে হয় নেচে, নয় গলা ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি।"

"কেন হঠাৎ তোমার হলো কি, বলো দেখি? শ্রীমতী মণিমালা তবে আজই আসছেন, কেমন?"

"তিনি আসছেন, কাল। কিন্তু তা নয় নীরদ, তোমার এই রুচি পরিবর্ত্তন দেখে আমার আজ যে আনন্দটা হচ্ছে ভাই তা আর কি বল্‌ব!" যোগেন্দ্র খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া আবার বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল,"বেঁচে থাক, ভাই, আমার বড্ড ভাবনাই হয়েছিল, এখন আবার আশা হচ্ছে—।"

নীরদ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া সরিয়া গেল। ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল "বেওয়ারিস্ মাল পেয়েছ, যোগেন! পিঠখানা ভেঙ্গে দেওয়ায় বিশেষ কোন লাভ তোমার নেই! হঠাৎ অতটা উচ্ছ্বাস ভাল নয়, একটু রেখে খরচ কর—।"

যোগেন্দ্র নীরদের পাশে আসন গ্রহণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "যাই বল, ভাই আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম,— গম্ভীর মুখ আর ভাষ্য ভস্ম আমার প্রাণটাকে একেবারে চেপে মেরে ফেলবার যোগাড় করেছিল! নীর তোমার মুখে শেলি, বার্ণস্, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত মিষ্ট শোনায়! ও গলা কি মোহ মুদগর আবৃত্তি করবার জন্য, ভাই! তুমি যে খোদার উপরেও খোদাগরি করেছিলে!—আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম অতটা বিদ্রোহ তোমার বরদাস্ত হবে না। এখন, কি কথাটা বলবে বলেছিলে—শুনি?"

নীরদ এতক্ষণ যোগেন্দ্রের কথায় বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছিল। শেষ প্রশ্নে সহসা সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। "বলবো 'খন"।

"কখন বলবে, পাঁজিপুঁথি আনতে হবে নাকি? তারপর দুখানা নৈবেদ্য একটা শাঁক ফুল ও চন্দন?"—নীরদ হাসিয়া ফেলিল, "জ্বালিও না, থামো, কি বলবো?"

"যা বলবে বলেছিলে!" নীরদ অত্যন্ত সহসা বলিয়া উঠিল, "কি বলা উচিত, বুঝতে পারচি না"—তাহার মুখ চোখ গরম এবং লাল হইয়া উঠিল; মাথা ও মুখের ভিতর উত্তপ্ত রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। যোগেন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইটী স্কুলের ছেলে ঘরে আসিয়া নত-মস্তকে দাঁড়াইল। নীরদ দরজার দিকে ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলচো সুধীর, বিনয়?" সুধীর সোজা নীরদের মুখের দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আপনি আজও কি বাগানে যাবেন না? রোজ রোজ আপনি না থাকলে কেমন করে চলবে?" বালকের এই কথা কয়টা আচমকা নীরদকে যেন আঘাত করিল। ছি, ছি, সে স্বার্থপর নিতান্ত কাপুরুষের মত নিজের অন্তর্দাহ লইয়া এ কোণে ও কোণে লুকাইয়া বেড়াই-তেছে! নীরদের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "আজ নীরদের শরীর ভাল নেই সুধী, বিনু, তোমরা খেলতে যাও।

কাল থেকে তোমাদের খেলার সময় আমরা ঠিক উপস্থিত থাকব দেখো”। বালক দুইটি একসঙ্গে নীরদের স্তম্ভিত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। বিনয় ধীরে ধীরে ব্যথিত নেত্র নামাইয়া বলিল,—“তবে থাক্—এসো সুধীর!”

তাহারা ফিরিল, কিন্তু তাহাদের মৌন অভিমানের প্রচ্ছন্ন ব্যথা নীরদের অপরাধী চিত্তকে তাহাদের মত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিল না। সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, “না না চলো আমি যাচ্চি। আজ তোমাদের ম্যাচ আছে, না?” বিনয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে উত্তর করিল, “সেতো কাল হয়ে গেছে।” সুধীরের মুখ হইতে তখনও অভিমানের ছল-ছল ভাব চলিয়া যায় নাই। সে মুখ না ফিরাইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, “আপনার শরীর ভাল নেই। আজ থাক’ “তা হোক আমার কিছু কষ্ট হবে না এসো।” এই বলিয়া নীরদ দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল; যোগেন্দ্র একটু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—তারপর কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেল। খেয়ালী-লোকদের চরিত্র বোঝা তাহার সাধ্যের অতীত, সে কথা সে পুনঃপুনঃই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। আজ আর নূতন কি বলিবে?

ছেলেরা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল; যাহারা খেলা না করিতেছিল, তাহারা আপনা-আপনি দাঁড়াইয়া হাসি গল্প করিতেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি বিকাল বেলার বাতাসে তাজা হইয়া ধীরে ধীরে মাথা কাঁপাইতেছিল, অদূরে নদীর পারে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা কিরণটুকু যেন ঋষিপত্নীর ক্ষৌম বসনের রাঙা পাড়টির মত আসন্ন সন্ধ্যার তলে ফুটিয়া রহিয়াছে। নীরদ সুধীরের হাত দৃঢ় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি না দেখলে তোমাদের খেলতে ভাল লাগে না?” সুধীর এখন অভিমান ভুলিয়া গিয়াছিল; সে সেই হাতখানার উপর অল্প একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, “একটুও না”।

এই পৃথিবী এমন সুন্দর! এই স্নিগ্ধ বায়ু, প্রসন্ন সূর্য্যকিরণ, ঐ আকাশের গায় মিশিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে যে ছোট ছোট পাখীগুলি, নদীতীর হইতে ভাসিয়া আসা, সহজ হাস্য মিশ্র কলরব, এখানকার কিছুই তো নিরাশার অন্ধকার গায় মাখে না! উত্তাপে তাহারা ম্লান হয়, আবার বাতাসে হাসিয়া উঠে। অন্ধকারে ঘুমাইয়া থাকে, আলো আসিলেই জাগিয়া উঠে। তবে এই সজীব শান্ত আলোকিত জগতের মাঝখানে ইহাদেরি সঙ্গে মিশিয়া সে কেন এক হইয়া যাইতে পারে না! আরো, তাহার উপর অন্য সকলের এই যে নিঃস্বার্থ ভালবাসাটুকু, এই যে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি, ইহাই কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সে তো অনেক পাইয়াছে। তাহার জীবন ব্যর্থ নহে, সে ধন্য!

৩৫

সেদিন ও তার পরদিনটা পর্য্যন্ত নীরদ যোগেন্দ্রের হাত এড়াইয়া কোন রকমে আত্ম-রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আবশ্যক তাহার নিজের,—কথাটা প্রথম সেইই তুলিয়াছে,—বলিবার প্রয়োজন এখনও বিদ্যমান, অথচ যোগেন্দ্রকে দেখিলেই বুক যেন কাঁপিয়া

উঠে! হাত পায়ের তলাগুলা অসাড় হিম হইয়া আসিতে থাকে।

মণিমালা তাহার দুইটি পুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া আসিয়া পৌঁছিলে যোগেন্দ্রের হাত হইতে আপাতত রক্ষা পাইল মনে করিয়া নীরদ কতকটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা ছেলেদের লইয়া গল্প করিয়া রাত্রে যখন সে শয়ন করিতে গেল,—কল্যাণময়ী জননীর মত সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার শ্রান্ত ললাটের উপর কোমল হাতখানি বুলাইয়া দিলেন।

প্রভাত আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া আসিল। আবার সেই জীবন-সংগ্রামে হৃদয়ের সহিত ধস্তাধস্তি! বিদ্রোহী চিত্তকে সহজ প্রলোভনে ভুলাইয়া বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা!

তখনও ঠিক প্রভাত হয় নাই। দূরে পূর্ব্বাকাশের একটি প্রান্ত সবেমাত্র লাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাখীরা সদ্য জাগ্রত হইয়া আপনাদিগের শিশু শাবকগণের সহিত আলাপ শেষ করিয়া দিবসের মত বিদায় লইতেছিল। দুইটী পক্ষী-দম্পতী একটি গাছের ডালের কাছাকাছি বসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বালকদের সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সংস্কৃত স্তব আবৃত্তির গাম্ভীর্য্যময় ঝঙ্কার স্তব্ধ প্রভাতের বাতাসে-আকাশে কম্পিত হইতে লাগিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরদ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন এক সময়ে আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল।

সেই দিন আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন কানন-পথে ফিরিতে ফিরিতে গ্রামের বৈরাগী যখন খঞ্জনী বাজাইয়া আপন মনে গাহিয়া চলিয়াছিল, "সামাল মাঝি এই পারাবারে বান ডেকেছে সাগরে। এবার তোমার দফা, হল রফা, পড়ে গেলে ফাঁপরে"—তখন পাশে বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া নীরদ আপনার মনের সহিত শত-শত প্রশ্নোত্তর করিতেছিল। যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কল্য প্রভাতেই জীবন-ব্যাপী মহাসমরের সমাপ্তি—তার পর? তারপর কি অপূর্ব্ব শান্তি, অটুট সুখ! লুব্ধ বালকের মত আপনাকে আপনি সে ভুলাইতেছিল। গান একটা সামান্য ভিক্ষাজীবি গ্রাম্য বৈরাগীর অশিক্ষিত কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরমাত্র, সারাদিনের ধূলি-রৌদ্রমাখা ক্লান্তচিত্তের একটুখানি আত্মতৃপ্তি, কিন্তু নীরদের কানে ইহা আজ সংসারের মধ্যে সব চেয়ে মিষ্ট ও মধুর ঠেকিল। বৈরাগী যেন তাহার সঙ্কট বুঝিয়া দুরন্ত পারাবারে ভাসমান নৌকাখানিকে প্রাণপণে সামলাইতে বলিতেছে! বান ডাকিয়াছে, যদি সে সাবধান না হয়, তাহার ক্ষুদ্রতরী রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

কয়দিন সমস্ত মানসিক শক্তি খরচ করিয়া করিয়া আর সব মীমাংসা একরকম সে করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু একটা অদম্য লজ্জা সে কিছুতে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। লক্ষ্মীপুরে সে কাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে? সে যে শান্তির স্বামীকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া দিয়াছে। আবার কি সে দান ফিরাইয়া লইবে? নীরদের আরক্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার চঞ্চল হৃৎপিণ্ড পুনঃপুনঃ নিশ্চল হইয়া পড়িতে লাগিল। ঘড়িতে যেন দম আর একটুও নাই। সামলান বুঝি দায় হয়, যাত্রী

এবার ফাঁপরেই পড়িল! সদ্য ফোটা ফুলের মত আকাশভরা নক্ষত্রগুলা সকৌতুকে তাহার লজ্জাক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া রহিল; শীতের কনকনে বাতাস গায় তীরের মত বিঁধিয়া ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিল, অনেক দূর হইতে ক্ষীণ সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও শুনা যাইতেছিল কিন্তু বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে অদূরস্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন কলাঝাড়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুদীঘ নিশ্বাসে সুগভীর লজ্জাকে যেন জোর করিয়া সে পরিত্যাগ করিতে চাহিল "আমার যেতে হবে, আমি যাবো,—তার সম্মুখে দাঁড়িয়েই আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে,—তাই করব,—আমার যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।"

নীরদ যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখনও অপর দিকের ঘরগুলি হইতে ছেলেদের পাঠের সাড়া আসিতেছিল। তাহার ঘরে টুলের উপর একটি তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছিল ও যোগেন্দ্র আলোর কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া খপরের কাগজ হইতে পুনঃপুনঃ চোখ তুলিয়া দরজার দিকে চাহিতেছিল। নীরদ ঘরে ঢুকিতেই কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল "হ্যালো ম্যান! তোমার যে পাত্তাই পাওয়া যায় না—হলো কি? কেবলি ঠাণ্ডা বাতাস, আর দীর্ঘশ্বাস!—না, আর কিছু?" নীরদ যোগেন্দ্রের চৌকি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, "না আর কিছু না।"

"I wait and weep but where art thou? সুধু তাই?"

"তাই, কিন্তু যোগেন, তামাসা যাক, কাজের কথা বলো, আমার কথার উত্তর কই? আমি চলে গেলে আমার কাজের ভার তুমি নেবেত?"

"আমার প্রশ্নটারি উত্তর কেন প্রথমে হোক না! তোমার মতলব কি?"

"কার মনে কখন কি মতলব ওঠে, তা কি সব সময় খুলে বলা যায়? তবে এই পর্য্যন্ত বলচি, মন্দ কিছু নয়,গুরুদেবের আদেশে আমি যাচ্ছি।"

"ঐ তো ওখানেই যে গলদ! তাঁর যে একটি তল্পি বয়বার চেলার দরকার হয়নি, তা ভরসা করব কি করে?"

মাথা নীচু করিয়া নীরদ কহিল, "তা হলে ত আমার সৌভাগ্য!"

বন্ধুর অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস যোগেন্দ্র শুনিতে পাইল না। সে মাথা নাড়িয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওটাও যে একটা দুর্লক্ষণ! এ বোঝনা—মহা মহা পাপীরাই তো শেষ কালটায় বড় বড় সাধু হয়। জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামের গুণে তরে গেল। আর জানো তো মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব্ব ইতিহাসটা? যত দেখবে মস্ত জটা, ততই তাঁর পূর্ব্বলীলার সন্ধান নিতে থাক, দেখবে যে কেউ আর বাদ পড়চেন না—"

আর একটু গাম্ভীর্য্যের চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাহলে এখন ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক—ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তুমি আপাততঃ কোন অজ্ঞাত মতলবে কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হচ্চো—না হয় পর্য্যটনেই বেরুচ্চো! এখন তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা এখানকার সব দায়ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করি, তোমার অনুরোধ—এই, না? আমার এখন জিজ্ঞাস্য, এই ভারবাহী গর্দ্দভের গলায় কত দিন আর এ রকম শিকল বাঁধা থাকবে?"

নীরদ একটু ভাবিয়া বলিল "তাতো জানি না। হয় তো খুব শীঘ্রও হতে পারে আর নয় তো অনেক দেরিও হয়ে যেতে পারে। কি জানি যোগেন কি হবে!" নীরদের স্বর কম্পিত হইতেছিল! যোগেন্দ্র জানিত ভাবুক লোকের কথা বার্ত্তা চাল চলন সাধারণ লোকের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। সে কহিল "তোমার আদেশ কবে অগ্রাহ্য করেছি। কিন্তু একটা কথা—এই বৎসবৃন্দ নিয়ে দিন রাত গোষ্ঠলীলা করতে করতে যে সময় প্রাণটা পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে সেই সময়টিতেই যে ঠিক মানভঞ্জনের পালা গাইতে খুব ভাল লাগবে এমন তো ভরসা করা যায় না। তাই ভাবচি ওপরের ঘরগুলো ওঁদের খাসমহল করে দিয়ে তোমার এই নারীবর্জ্জিত গৃহে আস্তানা গেড়ে একবার জিরিয়ে নেওয়া যাবে, নৈলে ত আর পারা যায় না।"

নীরদ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গ করিল, "যো খায়া উওভি পস্তায়া!—আর যো নেহি খায়া—উওভি পস্তায়া! তা ত দেখতে পাচ্চি মশায়! এখন বল দেখি কোথায় যাচ্চ, কোন দেশে?"

নীরদ হঠাৎ ঘামিয়া উঠিল, তাহার বুকের মধ্যে এত জোরে জোরে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল যে তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া পড়িবার মত হইয়া আসিল। মাটির দিকে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে মৃদু স্বরে সে উত্তর করিল, "মাপ করো ভাই, আজ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না।"

যোগেন্দ্র মনে মনে বিস্মিত হইল কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল "এত লুকোচুরি কিসের বলো তো শুনি? তা যাও যাও যদি সঙ্গিনী-সংগ্রহের ইচ্ছা হয়ে থাকে তো বলে যাও আমি মণিকে দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে রাখি। ও কি চমকালে যে? ঠিক ধরেছি নাকি? দেখ আজ তোমায় বলি—শান্তিকে ভালবেসেও তুমি যখন তাকে পাবার চেষ্টা করলে না তখনি আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল যে তোমার আত্মলীলার কোথাও কোন গলদ আছে। কে সে ভাগ্যবতী শুনি এতদিন পরে যার কপাল ফিরলো? নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্ম মেয়ে হবে নৈলে কে আর এখনও আইবুড় বসে আছে। নীরদ নীরদ! ও কি? রাগ কল্লে?" যোগেন্দ্রনাথ সহসা লজ্জাতাড়িত আবেগে এই কথা বলিয়া তাহার হাত ধরিবার জন্য নীরদের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বন্ধু তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া বেত্রাহতের মত চমকিয়া দ্রুত পদে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সেথায় স্তব্ধভাবে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার দৃশ্যের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

যদি তাহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ তখন হতবুদ্ধি না হইয়া গিয়া উঠিয়া আসিয়া একটা আলো হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিত কারণ সে মুখে লজ্জার যে নিবিড় ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অমার্জ্জনীয় অপরাধেরই চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার বন্ধুকে ঠিক দেবতার মত পবিত্র বলিয়া জানে সে যখন জানিবে যে বাস্তবিক সে তাহা নয়!

ক্রমে অন্ধকার কাটিয়া গিয়া কুয়াশা-

ছন্ন ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াইয়া আকাশে চাঁদ উঠিল, জানালার নীচে টবের মধ্য হইতে চন্দ্রমল্লিকার গন্ধ আসিতে লাগিল, শাখা বিরল সজিনা গাছের উপর হইতে একটা নিশাচর পক্ষী কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করিতে করিতে বাতাসে ডানা মেলিয়া জানালার নিকট দিয়া উড়িয়া গেল।

ধীরে ধীরে নীরদ পূর্ব্বকক্ষে ফিরিয়া আসিল। সে ঘরে যেখানে সে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল—ঠিক সেইখানটিতে সেই অবস্থায় যোগেন্দ্র তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। অনুতাপের গ্লানিতে তাহার মুখ পরিপূর্ণ। নীরদ ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল "যোগেন্‌ তাই বলো, বরণডালা সাজাতেই বলো, আমি আমার স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।" তাহার জিহ্বায় তখন আর একটুও জড়তা ছিল না। যোগেন্দ্রের কণ্ঠ মধ্য হইতে অস্ফুট চীৎকারের মত বাহির হইয়া পড়িল "তোমার স্ত্রী!"

নীরদ উত্তর করিল, "হাঁ আমার পরিত্যক্তা অত্যাচারিতা, স্ত্রী শিবানী।" সম্মুখে কোন অশরীরি মূর্ত্তির ছায়া দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পলাইতে যায় তেমনি ভাবে পিছাইয়া গিয়া অস্ফুট কণ্ঠে যোগেন্দ্র কহিয়া উঠিল, "তবে তুমি, তবে তুমি শান্তির—" পরিত্যক্ত চৌকিখানা সরাইয়া বসিয়া নীরদ স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল "হাঁ। কিন্তু যোগেন ওসব কথা নিয়ে আলোচনা এখন থাক। প্রতিজ্ঞা কর, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি কারু কাছে এ কথা বলবে না?"

প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে যোগেন্দ্র কহিল "আচ্ছা।"

একই

একই সুরে সবাই বাঁধা
জান বা আর না জান।
একই তারে সবাই গাঁথা
মান বা আর না মান।
একই মরণ, সবাই মরে
মরতে চাও আর নাই বা চাও।
একই জনম সবাই ধরে
ধরতে চাও আর নাইবা চাও।
একই কথা সবাই বলে
ভাষা যতই হোক্ না কো।
এক রাগিণীই সবাই ভাঁজে
সুরের তফাৎ থাক না কো।

এক জোড়নে সবাই জোড়া
বাঁধা সবাই এক তাঁতে।
দশার ফেরে যতই ফিরুক
আগ্-পিছুতে এক সাথে।
এক নিয়মে গড়ছে সবাই
যতই কর কোলাহল।
ভাঙ্গতে তারে পারবে না কেউ
কারিকরের এম্‌নি কল।
একই ধরম একই করম
একেরই সব কারখানা।
এক ছাড়া দুই নাই রে ও ভাই
যতই কর কল্পনা।

দো-সতীনা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'দে পাড়া' একটি ক্ষুদ্রায়তন পল্লীগ্রাম। তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েকঘর কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও ক্ষৌরকার মাত্র হিন্দু; অবশিষ্ট সকলে মুসলমান। গ্রামের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র এবং তার পরেই দুইটি সুপ্রশস্ত পুষ্করিণী পথিকের মনে সুদূর অতীতের কোনো প্রাচীন স্মৃতি স্বতঃই জাগাইয়া তোলে। এই সুবৃহৎ প্রসিদ্ধ সরোবর দুইটিই "দো-সতীনা" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত। এই পুরাতন বিখ্যাত সরোবর দুইটির সম্বন্ধে যে প্রবাদ-কথা প্রচলিত আছে তাহা ঐতিহাসিক মূল্যরঞ্জিত না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক, ভাবিয়া নিম্নে তাহা প্রকাশিত করিলাম।

প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল, 'দেবপল্লী', এবং এখানে দেবপাল নামক একজন ভূপতি বাস করিতেন। তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় পাওয়া যায় না—তিনি যে কত বৎসর যাবৎ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। রাজা দেবপাল প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তি, তরুণ বয়স ও অসাধারণ রূপলাবণ্য দৃষ্টে লক্ষ্মীকান্ত নামে জনৈক রাজা আপন কন্যা ইলাকে দেবপালের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। দেবপালও ইলার অপরূপ রূপ-মাধুরী দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিনও স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবপাল বরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণসহ রাজা লক্ষ্মীকান্তের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীর দলে পরস্পরে আলাপ-পরিচয় হইতে লাগিল, উভয় পক্ষের অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের বিচার ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বর সম্প্রদান স্থানে আনীত হইলেন। পুরমহিলারা শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন,—বাহিরে শানাইএর সহিত নহবৎ বাজিতে লাগিল; বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা পীঠোপরি উপবিষ্টা পাত্রীকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনা হইল। পুরোহিত ঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সম্প্রদানকার্য্য আরম্ভ করিলেন। এমন সময় সহসা রণভেরীর ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই সেইদিকে উৎকর্ণ হইলেন। দেখিতে দেখিতে বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যপাদভরে সম্প্রদান-ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। অগণ্য সেনা ভীমরবে সকলের প্রাণে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিয়া তোরণ-দ্বার হইতে বিবাহ স্থান অবধি দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। বিবাহ আর হইতে পারিল না। সৈন্যগণ ইলাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাহারো মুখে একটি কথা নাই। ক্ষণকাল পরে বাড়ির ভিতর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল, কয়েকজন দস্যুদলের অনুসন্ধানে ছুটিল। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিলে, দেবপাল উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা 'মালতী' ও 'মাধবী' নাম্নী ইলার দুই সখীকে লইয়া

গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যথারীতি তাহাদের দুজনকেই বিবাহ করিলেন। কিন্তু ঐ দুজনের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণকন্যা নহে; একটি কর্ম্মকার ও অপরটি কুম্ভকারের কন্যা। এই কথা প্রচার হইবামাত্র গ্রামস্থ সকলেই দেবপালের উপর অসন্তুষ্ট হইল। অনন্তর রাজা দেবপাল স্বীয় প্রাসাদের পূর্ব্ব-প্রান্তে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইলেন এবং উহার মধ্যস্থলে এক-একটি বাড়ি প্রস্তুত করাইয়া দুই স্ত্রীকে তথায় রাখিলেন। তদবধি ঐ দুই দীঘির নাম "দো-সতীনা" বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল। অতঃপর কেহই আর দেবপালকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করিত না এবং তাঁহার সংশ্রবে থাকিলে জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সেই অবধি ঐ গ্রাম ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছে। রাজা দেবপাল দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোনো পুত্রকন্যা জন্মে নাই। কালক্রমে ঐ দেবপল্লীর নাম 'দে-পাড়া' হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসীদের নিকট রাজা দে পালের নাম ও অনেক বিচিত্র কাহিনী শুনা যায়। তাহাদের কথিত দে পালই যে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দেবপাল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ এই "দো-সতীনা" দীর্ঘিকা আজ অবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শারদ-লক্ষ্মী।

পুলক-ঢালা আকাশ-নীলে ছায় কি তব স্পর্শ?
উড়িয়ে-চলা মেঘের কোলে বেড়ায় ছুটে হর্ষ?
ছড়িয়ে-পড়া সোনার রোদে ভাসে মুখের দীপ্তি?
আকাশ বন সমীর চুমি ভায় কি তব তৃপ্তি?
সবুজ ধানে ঢেউ তুলিয়ে বহ কি তুমি বহ গো?
কৃষাণ-বধূ পরাণ মধু চুমিয়া তুমি রহ গো?
মদিরঘন শেফালিবাসে বিকাশে হৃদি-বেদনা?
কল-আরাবে কুহরে কি গো মুখর শত কামনা?
পরাণ আজি করুণ বাজি খুঁজিয়া ফিরে তোমারে,
নয়ন-মনে পরশসুখে চাই যে তব দেখা রে?
কপোতগলে বরণ-মালে চকিতে যাও মিলায়ে,
কাশের ফুলে ধরিতে গেলে যাও যে মেঘে পলায়ে!
ফাটিয়ে-টুটা চকিতে-ছুটা তোমার পাব দেখা কি?
বাঁধন-হারা কণাগুলির কোথাও আছে মেলা কি?

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

প্রেম ও মিলন।

প্রেম চায় মিলনের নিবিড় সংযোগ,
অনিবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার অবিচ্ছেদ ভোগ;
মিলন কাঁদিয়া ফিরে সরমের মাঝে,—
প্রেম-কণ্ঠে নিরাশার ভগ্নবীণা বাজে!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

সন্ন্যাসী।

১

ঘাটের ধারে বৃদ্ধ বটগাছের ছায়ায় যে জীর্ণপ্রায় পরিত্যক্ত কুটীর বহুদিন শূন্য পড়িয়াছিল, হঠাৎ একদিন প্রাতে গ্রামবাসীগণ বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানে এক সন্ন্যাসী!

রং গৌরবর্ণ, মাথায় দীর্ঘ জটা, পরণে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড; এই সন্ন্যাসী একদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রামবাসীর কৌতূহল আকর্ষণ করিল।

সন্ন্যাসী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া সমস্তদিন ধরিয়া হোম করে, মাথার উপর রৌদ্র যখন খর হয় তখনও তাহার বিরতি নাই, এবং সব চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভোজনের জন্ত তাহার কোন প্রয়োজন বা চেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় না।

এত বড় একটা অদ্ভুত প্রাণী সচরাচর মেলে না—বিশেষ এই ললিতগাঁয়ে।

গ্রামবাসীরা সমস্ত দিন তাহার দুয়ারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে বেলা-অবসানেও যখন তাহারা কিছুতে সন্ন্যাসীর লক্ষ্য আকর্ষণ করিতে পারিল না, তখন ফিরিয়া গেল।

২

পরদিন এক বৃদ্ধা আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর"—

সন্ন্যাসী কহিল, "কি?"

"আপনি কে আমাদের দয়া করে এখেনে এসেছেন?" সন্ন্যাসী একটু হাসিল, "আপনাদেরই মত মানুষ—বোধ হয় তাও নয়—"

বৃদ্ধা জিভ কাটিল, "অমন কথা বলবেন না—আপনি দেবতা—"

হোমের আগুন লক্ লক্ করিয়া উঠিল, সন্ন্যাসী কহিল, "মা, যাকে তাকে দেবতা বলে পাপের ভাগী করবেন না—দেবতা কি সহজে হয়?"

বৃদ্ধা আর একবার গড় করিল, "একটা কথা বলব?"

সন্ন্যাসী কহিল, "বলুন"—

"আপনার সেবার জন্যে কিছু এনেছি, যদি দয়া করে গ্রহণ করেন"—বলিয়া একথাল অন্ন এবং অন্যান্য ভোজ্য সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল।

সন্ন্যাসীর মুখে আবার হাসি দেখা দিল, "গ্রহণ করব বৈ কি মা! পরের দেওয়া অন্নে আট বৎসর উদর পূর্ত্তি কচ্ছি, আজ আর তা নইলে আমার চলে না।"

সেইদিন হইতে প্রত্যহ গ্রামবাসীগণ সন্ন্যাসীর জন্য অন্ন দিয়া যাইত।

৩

সন্ন্যাসীর কুটির হইতে খানিকটা দূরে জমিদার বিপিনবাবুর বাটি।

নবীন যৌবনে বিপিনবাবুর উদ্দাম চরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর সহসা একদিন কোথা হইতে তিনি কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া কলিকাতাবাসী হইলেন। চার-পাঁচ বৎসর কলিকাতায় থাকার পর যখন তিনি দেশে ফিরিলেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে আসিল তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার ছোট ফুটফুটে মেয়ে মন্দা।

এই বিবাহ সম্বন্ধে কি একটা গোলযোগ

উঠিয়াছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত অস্ফুট, কারণ বিপিনবাবু জমিদার!

কলিকাতায় যখন বিপিনবাবু ছিলেন তখন দেশের লোকে বাঁচিয়াছিল—তিনি যখন ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রমাদ গণিল।

৪

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কতকগুলি ভক্ত এবং বন্ধু জুটিয়া গেল। জমিদারকন্যা মন্দা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত।

দুপুরবেলা একটা ছিন্ন বই হাতে লইয়া মন্দা আসিয়া উপস্থিত, "সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

সন্ন্যাসী ধ্যান-মগ্ন ছিল, চোখ খুলিয়া বলিল "মা এসেছ?—এই দুপুর রৌদ্রে ঘুমোলেনা কেন?"

মন্দা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "নাঃ,—কত পড়েছি আপনাকে তাই দেখাতে এলাম,—আর একটা জিনিষ এনেছি সন্ন্যাসী ঠাকুর—"

ধ্যান অগত্যা বন্ধ রাখিতে হইল। সন্ন্যাসী কহিল, "কি, দেখি?"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা পুতুল বাহির করিয়া মন্দা কহিল, "এ হচ্ছে বড় বৌ। আরো মেজ বৌ, সেজ বৌ, ন বৌ, ছোট বৌ, ঘরে আছে, নিয়ে আসব?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিল, "না থাক্, আজ আর আন্‌তে হবে না, কাল এ না।"

তখন বড় বৌকে কোলে রাখিয়া মন্দা তার ঘরকন্নার কথা পাড়িল। 'ওদের বাড়ীর কুন্দর ছেলের সহিত বড় বৌএর মেয়ের এই সে দিন বিবাহ হইয়া গেছে—তাতে কত ঘটা কত আমোদ!' ছোট দুইখানি হাত ঘুরাইয়া মন্দা তাহারই কথা বলিতে লাগিল!

সন্ন্যাসীর কঠিন হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, চোখে জল আসিয়াছিল। এই একটা অবোধ ছোট মেয়ে,—কি জানি কেন এর এত মোহ! সে তার ছোট দুখানি হাতে এমন সুদৃঢ় বন্ধন রচনা করিয়াছে যে, এই দীর্ঘ আট বৎসরের কঠিন সংযমের পরও সন্ন্যাসী সে বন্ধনে বদ্ধ হইয়া প'ড়তেছিল। ওই তার সুন্দর মুখখানি—সে কাহার কথা মনে করাইয়া দেয়! কিসের একটা আভাষ—কিসের একটা স্মৃতি! নদীর জল ছলছল করিতে থাকে, গাছের পাতায় হাওয়া সির্ সির্ করিয়া উঠে, চোখের জল কোন রকম করিয়া ঢাকিয়া সন্ন্যাসী মন্দাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, "যাও মা, বাড়ী যাও, বেলা পড়ে আসছে।"

অনর্গল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ মন্দা থামিয়া যায়—"সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনার চোখে জল কেন?"

সন্ন্যাসী হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে "আমার কি চোখে জল আসে মা? ঐ হোমের আগুনে সব শুকিয়ে গেছে—"

মন্দা গলা জড়াইয়া ধরে "কিন্তু ঐ ত' রয়েছে—!" তখন অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মন্দার মুখচুম্বন করিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

৫

বাড়ীতে ইহার জন্য মন্দাকে অল্প লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। তাহার ঠাকুমা দেখিবামাত্র তাহাকে শাসন করিতেন, কহিতেন,

"কোথা গিয়েছিলি-রে?"

মন্দা একটা ঢোক গিলিয়া বলিত, "ঘাটের ধারে।"

"সন্ন্যাসীর কাছে বুঝি ?"

মন্দা চুপ করিয়া থাকিত।

তখন ঠাকুমা গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন "এমন মেয়েও ত দেখিনি! সন্ন্যাসীর কাছে দিবারাত্র পড়ে থাকা এমন ত শুনিনি! হতভাগা মেয়ে,—তারা কত কি জানে, তাদের কাছে কি থাকতে আছে,—তারা নজর দিলে অনাছিষ্টি হয়—অসুখ বিসুখ করে দিয়ে মেরে ফেলে,—কতবার বলি—রাক্ষুসী মেয়ে তবু শোনে না!"

মন্দা কহিত "না ঠাকুমা, সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে কত ভালবাসেন, কত গল্প বলেন, —কত আদর করেন—"

ঠাকুমা সভয়ে বলিতেন, "ঐ রে, মেয়েটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিপাকে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি—"

সন্ন্যাসীরও বিপদের অন্ত ছিল না। মন্দার মত দুএকটি বন্ধু ছাড়া তাহার অসংখ্য ভক্তও জুটিয়াছিল। সময়ে সময়ে তাহাদের ভক্তিস্রোত যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তখন সন্ন্যাসী প্রমাদ গণিত।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ ছিল এই যে, ভক্তের প্রার্থনা প্রায় ঔষধ-বাঞ্ছারূপেই প্রকাশ পাইত। "সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমার মেজবৌমার হজম হয় না"। "আমার ছেলেটার পিলে হয়েছে", "নাতিটা জ্বর-বিকারে মর মর", "মেয়েটা কেমন রোগা হয়ে যাচ্চে" ইত্যাকার রোগের বিবরণ ও তাহার পর ঔষধ প্রার্থনা, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত —ইহার বিরাম থাকিত না।

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিত, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহার এ অধিকার কবে হইতে! এতগুলা লোকের বিশ্বাস সে কেমন করিয়া বিনা প্রমাণে জন্মাইয়া দিয়াছে! এবং এ বিশ্বাসের মূলই বা কি ?

সে কিছুতেই ঔষধ দিতে সম্মত হইত না, কিন্তু ভক্তেরা নাছোড়বন্দ। অগত্যা প্রত্যেক প্রার্থীকেই একটু করিয়া হোমের ভস্ম দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

তাহার ফল এই হইত, যাহারা বাঁচিবার তাহারা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতেই সন্ন্যাসীর খ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং ঔষধ-প্রার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ হইয়াছিল, মন্দাকে লইয়া। সে এমন করিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া দেয় কেন,—সন্ন্যাসীর কঠিন প্রাণকে এমন করিয়া স্নেহ-কোমল প্রেম-আর্দ্র করিয়া দেয়, কিসের মোহে! ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে মন্দার মুখ; মন সমস্ত দিন উন্মুখ হইয়া থাকে, মন্দার লঘু-পদ-শব্দের প্রতীক্ষায়! সংসারের মায়া কাটাইয়া এ কি মায়াবিনীর মোহ-পাশে আজ নূতন করিয়া বন্ধন!

দুই হাত জোড় করিয়া সে কহে "দেবতা আমার! যেমন করিয়া আমাকে সেবার সংসার হ'তে মুক্তি দিয়েছিলে, তেমনি করে এ নতুন বন্ধন কেটে দিয়ে আমাকে তোমার পায়ের তলায় নিয়ে চলো!"

সন্ন্যাসীর চারিপার্শ্বে দেশের লোক যে বিরক্তি এবং মন্দা যে আকর্ষণ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সন্ন্যাসী একদিন স্থির করিল তাহা হইতে আপনাকে সেই রাত্রে সে মুক্তি দিবে।

কিন্তু মন্দা! দু'দিন মন্দা আসে নাই, তাই তাহার জন্য প্রাণ ছটফট করিয়াছে! কেন? আজ রাত্রে সে মুক্ত হইবে, বন্ধনহীন হইবে—তবে আর কাহার জন্য চিন্তা। সে আজ চিত্ত দৃঢ় করিয়াছে!

কিন্তু হায়, তবু মন বলে, মন্দা!

৬

সন্ধ্যার সময় বন্দনা শেষ করিয়া সন্ন্যাসী বসিয়াছে। আজ গভীর রাত্রে সে ললিতগাঁ ত্যাগ করিবে।

এমন সময় মন্দার ঠাকুমা আসিয়া প্রণাম করিল, "ঠাকুর, মন্দার বড় অসুখ করেছে, একবার তাকে দেখ্‌বেন চলুন।"

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিল, "মন্দার অসুখ—কি অসুখ?"

"বসন্ত হয়েছে।"

সন্ন্যাসী কাঠের মত বসিয়া রহিল। এ কি পরীক্ষা! আজ সে যখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতেছিল, তখন সব চেয়ে কঠিন বন্ধনের কি এ নিদারুণ আকর্ষণ! মন্দা তাহার কেহ নয়, বিশেষ সে চিকিৎসক নহে, কি হবে মন্দাকে দেখিয়া? আর নহে, আবার নূতন করিয়া সে ধরা দিতে রাজী নহে।

"আমি গৃহীর বাড়ীতে যাই না ত আপনাকে আমি এই ছাই দিচ্ছি, এতেই ভাল হবে।"

বৃদ্ধা অনেক অনুনয় করিল, কহিল, "ঠাকুর তোমারই কাছে সে আস্‌ত, এখানেই কি অপরাধ করে সে রোগগ্রস্ত হয়েছে,—তুমি দয়া করলেই সে সেরে উঠ্‌বে—একটিবার চলো।"

সন্ন্যাসী কহিল, "না"—।

৭

হোমের আগুণ নিভিয়া গিয়াছে—এইবার গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। অদূরে মন্দাদের বাড়ী, একটা ঘর হইতে আলো আসিতেছিল—বোধ হয়, ঐ ঘরে মন্দা আছে।

সেই দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীর চোখে জল আসিল,—কিন্তু না!

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উঠিল, এইবার সে ললিতগাঁ ও তাহার স্মৃতির সহিত সমস্ত সম্বন্ধ শেষ করিবে।

এমন সময় কুটিরের দ্বারে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইল,—বস্ত্রে সমস্ত দেহ সংবৃত, মুখ খোলা।

বিস্মিত সন্ন্যাসী কহিল, "কে?"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া সে কহিল, "কমলা—"

মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসী দশ হাত সরিয়া গেল,—ক্ষীণ আলোকে একবার মুখখানা দেখিয়া লইল—"কমলা?"

বোধ হয় দাঁড়াইবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল—সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল। "এ কি?"

দুই পা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কমলা কাঁদিতে লাগিল "এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা আমাকে কি পাপের মাঝখানে এনে ফেলেছে—তা তোমাকে কি বলব? তোমার সমস্ত হোমাগ্নির দাহর চেয়ে তীব্র জ্বালা আমাকে দিনরাত্রি পুড়িয়ে মারচে—উপায় নেই,—উপায় নেই—"

সন্ন্যাসী পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল—"আমাকে স্পর্শ করোনা—"

কমলা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"তোমাকে ছেড়ে এসে অবধি কি চিতার আগুনে আমি পুড়চি তা বলতে পারবো না। সারাজীবন তেমনি পুড়তে হবে; তোমার পায়ের তলায় আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য তার বিরাম হয়েছে,—দয়া করো, এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমাকে বঞ্চিত করোনা,—তুমি দেবতা, তোমার স্পর্শ আমাকে ভিক্ষা দাও!"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমি এখনি এ গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাব—"

কমলা কহিল "তবে বিলম্ব কবোনা—আমার ক্ষমা নেই, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত দাহ, জানি,কিন্তু তোমার ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, সেই তোমার একমাত্র স্মৃতি, যাকে বুকে করে তোমাব কথা মনে করে, প্রাণ জুড়োই,—ত'কে তুমি বাঁচাও, তুমি মনে করলে, তুমি দয়া করলে সে নিশ্চয় বাচবে। একমাসের মেয়ে,—তাকে কোলে করে আমি বেরিয়ে ছিলাম—"

সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে কহিল, "চুপ কর, চুপ কর, সে কাহিনী শুন্‌লে, বাতাস নিশ্চল হবে, গাছপালা শিউরে উঠবে!"

সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রাখিয়া কমলা কহিল, "তবে থাক্। কিন্তু তুমি চলো—তাকে বাঁচাও, দয়া করো, দয়া করো।"

যন্ত্রচালিতের মত সন্ন্যাসী কহিল, "চল"।

৮

মন্দার মাথার শিয়রে আসিয়া যখন সন্ন্যাসী বসিল, তখন মন্দার ঠাকুমা কহিলেন, "ঠাকুর, আমার প্রার্থনা শুনে অবশেষে যে তুমি মন্দাকে দেখ্‌তে এসেছ, এতেই আমার মনে হচ্ছে, মন্দা নিশ্চয় বাঁচবে।"

সন্ন্যাসী কহিল, "বাঁচবে বৈ কি—বাঁচবে। ভেবেছিলাম আস্‌বনা—কিন্তু মন্দাকে না দেখে থাকৃতে পারলাম না—"

ঠাকুমা কহিলেন, "তার ওপর এই দয়া চিরকাল রেখো, ঠাকুর।"

সে কি অক্লান্ত সেবা! দিন এবং রাত্রির মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গেল—বিনিদ্র, নিরলস ভাবে সন্ন্যাসী সাতদিন মন্দার মাথার শিয়রে কাটাইয়া দিল। যে রাত্রে মন্দাকে সে দেখিতে আসে,—সে রাত্রের কথা একটা স্বপ্ন-কাহিনীর মত, ঐ ছোট মেয়ে মন্দা, যে আজ ব্যাধির প্রকোপে সংজ্ঞাহীন, সে তারই, সে সেই ছোট এক মাসের মেয়ে, যে তার ক্রোড়-চ্যুত হয়েছিল! তার ব্রণাঙ্কিত অধরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চুম্বন দান করে,—সেবার মধ্যে দিবারাত্রি প্রার্থনা করে, "হে ঠাকুর মন্দাকে বাঁচাও, পতিতার, আশ্রয়হীনা কলঙ্কিনীর সেই একটি মাত্র শীতল সান্ত্বনা, একটিমাত্র স্মৃতি! তাকে ফিরিয়ে দাও!"

সাতদিনের পর যখন মন্দা রোগমুক্ত হইল, তখন সন্ন্যাসী বলিল, "এখন তবে যাই!"

ঠাকুমা কহিলেন, "ঠাকুর আপনাকে কি বলব, কি দেবো, জানিনে! আপনি দেবতা।"

সন্ন্যাসী কহিল,"আমাকে আর কিছু দিতে হবে না, শুধু মুক্তি দিন, আর আবার যদি কখনও ফিরি, মন্দাকে দেখ্‌তে দেবেন।"

ঠাকুমা কহিলেন, "মন্দা ত ঠাকুর, আপনারই! আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন, সে আর আমাদের নয়। তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে কল্লেই দেখতে পাবেন—এ ত ছোট কথা!"

বিদায়ের সময় মন্দাকে বুকের মধ্যে লইয়া সন্ন্যাসী বার-বার আদর করিতে লাগিল—

ছাড়িতে ইচ্ছা করে না,—তার পর অশ্রুজল রোধ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইল!

৯

ললিতগাঁ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বাহির হইল,—সমস্ত অঙ্গে নিদারুণ বেদনা! সাত দিন ও রাত্রির পরিশ্রমের জন্য শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল—তবু আর একদণ্ড থাকিবে না। স্মৃতি আবার তাহার ভাগ্যে সত্যরূপ ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে—সুতরাং আর না!

ললিতগাঁ হইতে সে বেশী দূর হইবে না, এক ক্রোশের মধ্যেই,—ততদূর গিয়া আর চলিতে পারিল না, একটা গাছের তলায় সন্ন্যাসী বসিয়া পড়িল।

কেন,এমন হইল? আপনার দেহের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, বসন্ত-গুটিকায় সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে!

চোখ বুজিয়া সন্ন্যাসী ভাবিল, "আঃ—এই ত ভাল! আমার মত অভাগার মৃত্যু লোকালয়ে শোভা পেত না, তাই ভগবান মনুষ্যের সম্পর্ক থেকে দূরে এইখেনে আমাকে এনে ফেলেছেন! এখানকার মুক্ত বাতাস, গভীর স্তব্ধতা, এই ত সন্ন্যাসীর মৃত্যুর উপযোগী!"

গাছের একটা শিকড়ে মাথা রাখিয়া সন্ন্যাসী শয়ন করিল।

নিদ্রার মধ্যে,চেতনা-হীনতার মধ্যে একটি মাত্র মুখ ভাসিয়া উঠে, সে মন্দার! সেই একমাসের ছোট মেয়ে মন্দার, তাহার স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়-শায়িতা মন্দার, আটবৎসর পূর্ব্বেকার লতাপাতাঘেরা আনন্দ ও প্রেমোজ্জ্বল গৃহের মন্দার!

১০

কতদিন এমন ভাবে কাটিয়াছিল স্থির নাই। যেদিন সন্ন্যাসী চোখ খুলিল, সেদিন তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া সুনিবিড় হইয়া আসিয়াছিল।

একটা গরুর গাড়ী যাইতেছিল, গাড়োয়ান সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নামিয়া আসিল। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিল, ললিতগাঁর সেই সন্ন্যাসী যে তাহার প্লীহা আরাম করিয়াছিল।

হাতজোড় করিয়া সে কহিল, "ঠাকুর আপনার এ দশা কেন? আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?"

সন্ন্যাসী কহিল, "দয়া করে যদি একটি কাজ করো। তোমার ঐ গাড়ীতে আমাকে একটু জায়গা দিয়ে ললিতগাঁর বিপিনবাবুর বাড়ীতে পৌছে দাও—একবার মন্দাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া সন্ন্যাসী রোয়াকে উপবেশন করিল।

ভাল আওয়াজ বাহির হয় না,—কম্পিত-কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিল, "মন্দা---ও মন্দা—"

শুনিয়া মন্দার ঠাকুমা মুখ বাড়াইলেন, "ওমা সন্ন্যাসী ঠাকুর যে! বসন্ত হয়েছে দেখছি—এমন অবস্থায় এখেনে এলেন কেন, —ছেলেপুলের বাড়ী—"

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিল, "একবার মন্দাকে দেখতে এসেছি—"

ঠাকুমা স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন, "না, না, সে কাহিল, এখন সে উঠতে পারবেনা,—তাকে এখন দেখা হতে পারে না—"

গোলমাল শুনিয়া বিপিনবাবু বাহিরে আসিলেন, "কি হয়েছে ?"

তাঁহার মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একবার মন্দাকে ত ঐ অসুখে ফেলেছিলেন, আবার এই অবস্থায় তাকে দেখতে চান,—কেন, বাপু, তার ওপর এত নজর—"

বিপিন বাবুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী কহিল, "মরবার আগে একটিবার শুধু চোখের দেখা দেখব—দয়া করুন—"

ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী রোয়াকে শুইয়া পড়িতেছিল।

বিপিনবাবু ক্রোধের ভরে বলিলেন,"না—না, তা হবে না। মন্দা, মন্দা, সমস্ত দিন শুধু মন্দা, মন্দার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ—?"

সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধে চাহিল,"তিনি জানেন !"

আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপিনবাবু কহিলেন, "যাও, যাও, ও সব হবে না বল্‌ছি, আমার বাড়ী থেকে বেরোও—"

চোখের জল বাধা মানিল না। "এক-বার, একটিবার, শুধু—তারপর চলে যাবো—"

ক্রোধের তখন পরিসীমা ছিল না, বিপিন-বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন,"তবু যাবে না—দারোয়ান, এই পাগলটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দে !"

শুনিয়া সন্ন্যাসী দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল,—অবলম্বনহীন মস্তক দুই হাতের মাঝখানে ঝুলিয়া পড়িল,—তবু সে চেষ্টা করিতে লাগিল,—এবং অদূরে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় মন্দার হাত ধরিয়া মন্দার মা সেই কোলাহলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর শির আপনার কোলের উপর রক্ষা করিয়া তাহাকে শয়ন করাইল, তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নিশ্বাস-সৌরভে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া লইল, এবং তাহার ব্রণাঙ্কিত কপোলে বারবার চুম্বন দান করিয়া কহিল,"ঐ এসেছে, তোমার মন্দা এসেছে,—আমি তাকে এনেছি—"

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া কমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর মন্দার হাত আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া আবার চোখ বুজিল !

বিস্মিত দর্শকের দল নিস্পন্দ নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিল !

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাপানের সহর।

যখন আমরা জাপান যাই তখন মনে করিয়াছিলাম যে তথায় কলিকাতার চেয়েও কত বড় বড় হর্ম্ম্যমালাসুশোভিত নগর দেখিতে পাইব। হয়ত কত গগনভেদী অক্‌টারলোনী মনুমেণ্ট জাপানের নব উচ্চতালাভের পরিচয় প্রদান করিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; হয়ত লাটভবন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতির ন্যায় কত বড় বড় মনোহর প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের দৃষ্টি স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে! যে জাপান বাস্তবিকই রুষিয়ার ন্যায় একটি ইউরোপের অতি প্রধান শক্তিকে জলে স্থলে পরাভূত করিল, অট্টালিকাগৌরবে ইয়োরোপের কোন

সহরের অসমতুল্য হইবে না ইহাই আমরা কল্পনা করিয়াছিলাম। যখন আমাদের জাহাজ ইয়োকোহামা বন্দরে পৌঁছিল এবং সিঙাপুর ছাড়িয়া আমরা ঠিক দুই সপ্তাহ পরে লোকালয়ের দর্শন লাভ করিলাম তখনও জাপানের সহর সম্বন্ধে একেবারে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হই নাই। প্রকাণ্ড ইয়োকোহামা সহর দেখিয়া মনে করিলাম রাজধানী তোকিও সহর নিশ্চয়ই ইহার চেয়ে অধিক জাঁকাল এবং জাতীয় ঐশ্বর্য্য-জ্ঞাপক! কিন্তু যখন তোকিও সহরে গিয়া পৌঁছিলাম,তখন পূর্ব্বকল্পনা লোপ পাইতে লাগিল। কয়েকদিন সহরের আদ্যন্ত খুঁজিয়াও চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ, ডালহৌসী-স্কোয়ার প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাইলাম না, আর সে মাড়োয়ারীদের অত্যুচ্চ আকাশস্পর্শী হর্ম্ম্যরাজিও দেখিতে পাইলাম না। পক্ষান্তরে দেখিতে পাইলাম বাড়ী ঘর ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে, রাস্তা ঘাট তুলিতে অঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায়। দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর, লর্ড, রাজমন্ত্রী, ক্রোরপতি প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত দীন-দরিদ্র মুটে মজুরও সমভাবে ইডেন গার্ডেনে আনন্দ উপভোগ করিতেছে। সেখানে ইডেন্-গার্ডেন্ নামে কোন গার্ডেন না থাকিলেও সেইরূপ গার্ডেন এবং পার্ক অনেক আছে। সকলেই এক আসনে উপবেশন করিয়া আলাপ করিতেছে; এবং একই মঞ্চে দাঁড়াইয়া দেশের কথা, দশের কথা এবং প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতেছে। আর এক বৈশিষ্ট্য, সহরের ভিতর ছোট বড় অধিকাংশ বাড়ীতে এবং দোকানে ছোটখাট ধরণের কোন জিনিষ প্রস্তুতের কারখানা; আর দেখিলাম সহরতলীর চারিধারেই সারি সারি বড় বড় ফ্যাক্টরীর অসংখ্য চিম্‌নির ধূম মেঘের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি-বিকাশ প্রতিবন্ধক জন্মাইতেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন কলের মত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া কাজ করিতেছে। নিভৃত পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতায় গিয়া রাস্তায় লোকজনের দ্রুততা দেখিয়া যেমন অবাক হয় তেমনি কলিকাতার লোক জাপানের এই অতিস্ফূর্ত্তিময় ভাব দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকিতে পারে না।

কলিকাতার রাস্তায় দলে দলে লোক ছোটে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকের বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের ছায়া প্রকটিত। যাঁহারা ভদ্রসন্তান এবং যাহাদের উদরান্নের কথঞ্চিৎ সংস্থান আছে তাঁহারাও উপর-ওয়ালার তাড়না ও গঞ্জনার ভয়ে বিষণ্ণ স্ফূর্ত্তি-হীন মনে আফিসপানে ছুটিতেছে। স্কুল কলেজের ছেলেরাও যেন গারদে বা মসানে যাইবার পথে থরথর করিয়া চলিতেছে। এই স্থলে কবিবর নবীনচন্দ্রের একটি কথা মনে পড়িল। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় করালবদনী নৃমুণ্ড-মালিনী কালিকাদেবীর ন্যায় পরীক্ষারূপ তরবারি দ্বারা সহস্র সহস্র সবলপ্রকৃতি তরুণ যুবকদের মস্তক ছেদন করিতেছে।" তারপর অপর সাধারণ উদরান্নচিন্তাভারগ্রস্ত হইয়া যেন চক্ষে সরিষাফুল নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভাবনায় সকলেরই স্বাস্থ্য বসিয়া গিয়াছে, হৃদয় দমিয়া পড়িয়াছে। আর জাপানের রাস্তায় সকলকেই যেন রাম-মূর্ত্তিবৎ দেখিতে পাইলাম। যেমন হৃষ্টপুষ্ট শরীর, তেমনি বদনমণ্ডলে স্ফূর্ত্তি সংজ্ঞাপক

ভাব। অন্ন চিন্তা কাহার নাই? কিন্তু তাহাই তাহাদের প্রধান চিন্তা নহে, জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে সকলেই ব্যস্ত। পশুর ন্যায় শুধু উদরান্নের সংস্থানে মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অন্যান্য জন্তুর চেয়ে তাহাদের জীবনের অপর কর্ত্তব্য আছে। তাই তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই রাস্তায় ঘাটে কলের ন্যায় দ্রুতভাবে কর্ত্তব সাধনে ব্যস্ত।

জাপানী সহরের ঘরদরজার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম উহা কত সামান্য ধরণের। কাষ্ঠ নির্ম্মিত একতালা কি দোতালা—বড় জোর ক্বচিৎ দুই একটা তিনতালা দালান দেখিলাম। ইয়োকোহামা এবং কোবে সহর দুটী সমুদ্রতীরস্থ বড় বন্দর। এই দুই সহরেই বৈদেশিক বণিকদের অত্যন্ত বড় বড় আমদানী রপ্তানীর কারবার রহিয়াছে। তাই এ সহর দুটী অনেকটা ইউরোপীয় সহর অর্থাৎ কতকটা কলিকাতার ধরণের। তোকিও সম্পূর্ণ জাপানী সহর। ইয়োকোহামা এবং কোবে বাদে অন্যান্য সকল সহরই জাপানী সহর। জাপানী সহরে নীরস কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরই প্রাবল্য অধিক। সহরের ভিতর কত পার্ক, গাছপালা এবং বাগান। অনেক সহরের ভিতর ছোট ছোট পাহাড় এবং হ্রদ ও সরিৎ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরিয়া রহিয়াছে। আবার জাপানের অধিকাংশ প্রধান প্রধান সহরের পাদদেশই প্রশান্ত মহাসাগরে বিধৌত হইতেছে, বাস্তবিক জাপান যেন প্রকৃতি দেবীকে আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; প্রকৃতি দেবীও প্রিয় সন্তানগণের মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিনিয়ত তাহাদের সম্মুখে নানারূপ বেশভূষায় অলঙ্কৃতা হইয়া বিরাজিতা। জাপানীরা গাছপালা, লতাপাতা, ফুল প্রভৃতির যেরূপ সমাদর করিয়া থাকে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তেমন করে কিনা জানি না। তাহারা সহরের নীরস ক্ষেত্রকেও কুঞ্জবনে পরিণত করিয়া তাহাতে বাস করে, প্রায় সকলের বাড়ীর সম্মুখেই অন্ততঃ ছোট একটী বাগান আছে। যাহাদের বাড়ীর সম্মুখে বাগানের স্থান নাই তাহারা কতকগুলি টবের সাহায্যে বারেন্দায় অতি ক্ষুদ্র একটী বাগান রচনা করিয়া রাখে।

জাপানে যে সহরের লোক-সংখ্যা বিশ হাজারের উপর তাহাকে সি অর্থাৎ নগর এবং তন্নিম্নে মাচি অর্থাৎ সহর বলা হয়। ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় জাপানে নগরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। উত্তর দক্ষিণে প্রায় বারশত মাইলের মধ্যে অধিকাংশ প্রধান সহরই আমি দেখিয়াছি। তন্মধ্যে তোকিও, ওসাকা, কিওতো, কোবে, নাগোইয়া, ইয়োকোহামা, ছেনদাই, মোরিওকা, আওমোরি হাকোদাতে, ওতারু, ছাপ্পোরো, ইয়োকোসুকা এবং মোজি বিখ্যাত। নাগাসাকি, হিরোসিমা এবং ওকাইয়ামা সহরত্রয়ও বেশ কারবারী। স্থূল কথা একটী সহর দেখিলেই সকল জাপানী সহরেরই ধারণা করা যায়। জাপানে ৪৬টী জেলা সহর, উহার প্রত্যেকটীর লোক সংখ্যাই প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর। সংক্ষেপে রাজধানী তোকিও সহরের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ তোকিও উপসাগরের উপর সহরটি অবস্থিত। আয়তনে ৬৪ বর্গ মাইল। জাপান টাইম্‌স্ রিপোর্টে দেখিয়াছি আয়তনে তোকিও সহর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বা-

পেক্ষা বড়; আর তোকিও সহরে দৈনিক তাড়িতের খরচ লণ্ডন অপেক্ষাও অধিক। ঘুরিয়া ফিরিয়া সহরের কূলকিনারা ঠিক পাওয়াও মুস্কিল। কাষ্ঠনির্ম্মিত একতালা বাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; সহরের ভিতর কয়েকটি বড় বড় পার্ক আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড় আছে। এই সকল কারণে সহরটি অনেক জায়গা জুড়িয়া আছে। সহরের ভিতর দিয়া হুগলী নদীর চেয়ে কিঞ্চিৎ অল্প পরিসর বিশিষ্ট ছুমিদানদী প্রবাহিতা। নদীর দুই তীরেই সহর। চারিটি সেতুর উপর দিয় লোকজন গাড়ী ঘোড়া এবং ট্রাম নদীর অপর তীরে যাতায়াত করিতেছে। ছুমিদানদীর ছোট ছোট শাখা সহরের ভিতরে চলিয়া যাওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। একখানি গ্রন্থে দেখিয়াছি এই সকল খালের উপর দিয়া চলাচলের সুবিধার জন্য তোকিও সহরে ছোট বড় অন্যূন তিন সহস্র সেতু (bridges and culverts) রহিয়াছে। প্রতিদিনই সহরের চতুষ্পার্শ্বের আয়তন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত আদম সুমারীর পর লোক-সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এখন লোকসংখ্যা একুশ লক্ষের উপর, আমার মনে হয় বিশ লক্ষের কম নহে।

হিরিয়া, শিবা, উয়েনো, আছাকুছা এবং কুদান এই পাঁচটী পার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাটের বাড়ী এবং হিরিয়া পার্কের মধ্যে কেবল পরিখা মাত্র ব্যবধান। এই পার্ক সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার পাশেই মিকাদোর বাড়ী, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার হাউস্ অব লর্ডস্ এবং হাউস্ অব্ কমন্স্, এবং তোকিও সহরের গবর্ণরের অফিস। নিকটেই সমরবিভাগের অফিষ, চেম্বার অব কমার্স, শিক্ষাবিভাগের অফিষ, বড় বড় সংবাদপত্র অফিষ, পিয়ার্স ক্লাব; ইম্পিরিয়াল হোটেল, নিষ্টল ইউমেন কাইমা অপিস, সেণ্ট্রাল ও শিম্বাসী রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বিখ্যাত গিঞ্জা ষ্ট্রীট। পার্কের ভিতরে স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার এবং ভোজনালয় রহিয়াছে। রাস্তাগুলি ধব্‌ধবে; কোন যায়গায় ফুলের বাগান আবার কোথাও বা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী ও কুঞ্জবন। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে নানা রঙের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। ফোয়ারায় জল উঠিতেছে, কোথাও তালে তালে ব্যাণ্ড বাজিতেছে। স্থানে স্থানে যুবকের দল জিমখানাতে ব্যায়াম করিতেছে। কোথাও ব্যাটবল খেলিতেছে। ব্যাটবল জাপানের প্রধান খেলা। ইহারা আমেরিকা হইতে এই খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ইহা প্রধান খেলা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আবার স্থানে স্থানে ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের উপর বসিবার আসন রহিয়াছে, রাত্রিবেলায় তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত পার্কটী নন্দনকানন বলিয়া মনে হয়। পরিষ্কার দিনে সন্ধ্যাবেলায় বিশেষতঃ বসন্তের সন্ধ্যায় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় যখন প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতেছিল, পার্কে দিন রাত সমভাবে আনন্দের ছড়াছড়ি চলিত। আমরাও কোন কোন দিন সে আনন্দে যোগ দিতাম। পার্কের চারিধারেই প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ট্রাম চলিয়া থাকে।

হিরিয়া পার্ক হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে শিবা পার্ক, দুই মাইল দূরে উয়েনো পার্ক। শিবা পার্কে কতকগুলি অত্যুচ্চ প্রাচীন বৃক্ষ আছে। ক্ষুদ্র পাহাড়ের একটী স্থান বেশ উঁচু। তাহার উপর একটি ধ্যানস্থ দেবমূর্ত্তি রাখিয়াছে। ঐ উচ্চ স্থানে উঠিলে অদূরে সমুদ্রের দৃশ্য এবং চতুর্দ্দিকস্থ সহরেব দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। শিবাপার্কের দেব মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী স্থায়ী প্রদর্শনী (কাঙ্কোবা) বিশেষ বিখ্যাত। শিবার দেব মন্দিরেই সব চেয়ে মূল্যবান প্রস্তর এবং ধাতব পদার্থ রহিয়াছে। সময় সময় সম্রাট এবং সম্রাট পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি তথায় গিয়া থাকেন।

উয়েনো পার্ক একটি দেখিবার জিনিস। উয়েনোপার্কের পাদদেশে হ্রদ। হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপের উপর বিখ্যাত বেন্তেন দেবীব মন্দির,

উয়েনো পার্কের নিকটবর্ত্তী হ্রদ।

বিশ্রামাগার, এবং দ্বীপে যাইবার রাস্তা। পার্কটী অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উহার একধারে একটী হ্রদ এবং দুই ধারে রেলের রাস্তা আর অপর পার্শ্বে পল্লী। হ্রদের চতুর্দ্দিকে বেড়াইবার প্রশস্ত রাস্তা আছে। জুন মাসে হ্রদের ভিতর পদ্মফুল ফুটিলে সৌন্দর্য্যের তুলনা থাকে না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় লোকের ভিড় হইয়া থাকে। এই হ্রদের তীরে জয়মাল্যে ভূষিত প্রত্যাগত মার্শ্যাল ওইয়ামাকে অভ্যর্থনা করা হয়। সে দিন অবিরল বৃষ্টিপাতেও যেরূপ লোক সমাগম দেখিয়াছি জীবনে কোন সমারোহ-ব্যাপারে

তেমনটি দ্বিতীয়বার দেখিব বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। এই হ্রদের তীরেই যুদ্ধের পর জাপানের বিখ্যাত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যুদ্ধের পর ঐ রাস্তা হ্রদের অপর তীর পর্য্যন্ত প্রস্তর সেতুর সাহায্যে যোগ করা হইয়াছে। উয়েনো পার্কের গাছপালাগুলি বেশ বড় বড়. এখানে সাকুরা বা চেরি পুষ্পের সময় বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। চেরি পুষ্প সম্বন্ধে অন্য কোনো সময় লিখিবার আশা রহিল। পার্কের ভিতরে যাদুঘর; চিড়িয়াখানা, ২৫ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, অনেকগুলি ধর্ম্ম মন্দির, মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষার আঙ্গিনা, আর্টস্কুল এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী রহিয়াছে। প্যানোরামা মন্দির সর্ব্বসমক্ষে রুষ জাপান যুদ্ধের জীবন্ত দৃশ্য ধরিয়া আছে। পার্কের নীচেই প্রসিদ্ধ উয়েনো রেল ষ্টেশন। নিকটেই উয়েনো কাঙ্কোবা বা স্থায়ী প্রদর্শনী।

আছাকুছা পার্ক আমোদ-প্রমোদের প্রধান স্থল। তথায় পদস্থ ব্যক্তির ততদূর সমাগম দেখা যায় না। দিন রাত থিয়েটার সার্কাস্, বায়োস্কোপ, পুতুল নাচ, পাখীর

আছাকুছা পার্ক।

গান, কুস্তি, জীবন্ত চিত্র টেব্লো, গেইসা নাচ, নানারূপ জুয়াখেলা, প্যানোরামা দৃশ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য সকালে বিকালে কোন সময়েই জনস্রোতের বিরাম নাই। পর্ব্বদিনে লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। কারণ, ঐ দিন কল কারখানা অফিষ প্রভৃতি বন্ধ থাকায় সকলেরই ছুটি। একটি পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে ঐ সকল আমোদ উৎসব হইয়া থাকে। ফোয়ারার পিছনে ক্ষুদ্র মন্দির, অদূরে প্রকাণ্ড এবং বুদ্ধদেবের

এক বিখ্যাত মন্দির। অনেক সময় স্ত্রীলোকে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধার সংখ্যাই অধিক। সকলেই ভক্তি গদগদ চিত্তে হাত জোড় করিয়া নিবিষ্ট মনে পুরোহিত মহাশয়ের উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য ঐ মন্ত্র স্ত্রীলোকদের কেন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও বুঝিয়া উঠা মুস্কিল; যেহেতু উহা পালি এবং দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন জাপানী, কোরিয়ান এবং চীনা ভাষার সংমিশ্রণ। অনেক দিন কলেজের জাপানী বন্ধুদের সহিত আমি মন্দিরে গিয়া দেখিয়াছি ইঁহারাও সে মন্ত্র বোঝেন না। বৃদ্ধারা বুদ্ধদেবের সম্মুখস্থ অগ্নিপাত্রে ধূপ ধূনা নিক্ষেপ করিতেছেন, কেহ বা মোমের বাতি জ্বালাইতেছেন। কেহ কেহ পাইন-বৃক্ষের পল্লব, পুষ্প বিশেষতঃ পদ্মফুল ফলমূল, এবং নানারূপ মিষ্ট দ্রব্যে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন। এবং মাঝে মাঝে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অস্পষ্টস্বরে কি বলিতেছেন। অনেকেই জানেন যে জাপানীদের নাক চেপটা। ধর্ম্মমন্দিরের স্থানে স্থানে বুদ্ধদেবের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত অনেককে তাহার নাকের সহিত নিজ নিজ নাক স্পর্শ করাইতে দেখিয়াছি। তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধাদের নিকট শুনিয়াছি সমুন্নত নাকের প্রত্যাশায় প্রাচীন কাল হইতেই জাপানীরা এইরূপ করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ এই দাঁড়াইয়াছে যে ঘষিতে ঘষিতে বুদ্ধদেবের নাক একেবারে লোপ পাইয়াছে। এই মন্দিরের অনতিদূরেই জুনিকাই অর্থাৎ বারতালা উচ্চ স্তম্ভের ন্যায় সঙ্কীর্ণ দালান বিশেষ! উহার উপর উঠিলে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তোকিও সহরের দৃশ্য অতি বিশাল দেখায়।

হিরিয়া পার্কের বিপরীত দিকে সম্রাটের বাড়ীর অপর পার্শ্বে কুদান পার্ক অবস্থিত। কুদান পার্কের ভিতর একটী মিউজিয়ম আছে। এখানে গত রুষ জাপান এবং চীন জাপান-যুদ্ধে লব্ধ বন্দুক, কামান, তরবারি এমন কি সেনাপতির খাট ও বিছানাপত্র সর্ব্বসাধারণকে দেখাইবার জন্য সুন্দরভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। পার্কের ভিতর প্রসিদ্ধ শিন্তো মন্দির। প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে এই মন্দিরে মৃত সৈনিক পুরুষদের বার্ষিক শ্রাদ্ধ-উৎসব হইয়া থাকে। স্বয়ং সম্রাট সেনাপতিগণ সহ উপস্থিত থাকিয়া প্রথম দিন ক্রিয়া আরম্ভ করেন। তিন দিনে এই ব্যাপার শেষ হয়। দিবসত্রয় প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সেই লোক-সমুদ্রে একবার শরীর ঢালিয়া দিলে যেন পদ-সঞ্চালনের দরকার হয় না; অনায়াসে পার্কের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চলিয়া যাওয়া যায়। সে তিন দিন তথায় সার্কাস, থিয়েটার প্রভৃতির অবধি নাই। রাত্রে আতস বাজীর মহা ধূম। শোকে অভিভূত হওয়া জাপানে কাপুরুষতার লক্ষণ। মৃতব্যক্তির সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধ দিনে বিশেষতঃ সৈনিকের শ্রাদ্ধে তাহারা আমোদ উৎসব করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অন্য কোন সময়ে বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। শিন্তো মন্দিরের পশ্চাৎভাগে অন্যান্য পার্কের ন্যায় এ পার্কেও পুকুর ফোয়ারা, কুঞ্জবন প্রভৃতি যথেষ্টই আছে।

এই কয়েকটী উল্লেখযোগ্য পার্ক ছাড়া আরও ছোট ছোট পার্ক যথেষ্ট আছে।

অনেক ভদ্রলোকের বাগানগুলিও কতকটা পার্কের অনুকরণে রচিত। তোকিও সহরের উশিগোম অঞ্চলে বোটানিকাল গার্ডেন আছে। জাপানের সহর গ্রাম সকলই গাছ-পালায় সজ্জিত বলিয়া সর্ব্বত্রই যেন বোটানিকাল গার্ডেন। উশিগোমের বোটানিকাল গার্ডেন, আমাদের শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের চেয়ে অনেক ছোট। আশ্চর্য্যের বিষয় জাপানের ছাত্রগণ এমন কি মেয়েরা এবং সাধারণ লোক পর্য্যন্ত অনেকে সাধারণ গাছ পালার বোটা-নিকাল শ্রেণী বিভাগ বেশ বুঝিতে পাবে।

উয়েনো পার্কের ভিতর যে যাদুঘরের কথার উল্লেখ করিয়াছি উহাই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুঘর। উহা আমাদের কলিকাতার যাদুঘর অপেক্ষা অনেক ছোট। কলিকাতার যাদুঘর পৃথিবীর মধ্যে একটী উল্লেখ যোগ্য যাদুঘর। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ব্রায়ান সাহেব উহাকে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান প্রদান করিয়াছেন। জাপানের প্রত্যেক জেলা সহরেই একটী করিয়া যাদুঘর আছে। এক তোকিও সহরেই বলিতে গেলে অনেকগুলি যাদুঘর। উয়েনোর ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম ছাড়া গবর্ণ-মেণ্টের কৃষি এবং বাণিজ্য বিষয়ক একটী মিউজিয়ম (নোশোমুখো) রহিয়াছে। তা ছাড়া সুন্দর সুন্দর প্রকাণ্ড বাড়ীতে সহরের স্থানে স্থানে কাঙ্কোবা নামক প্রদর্শনীর ন্যায় স্থায়ী বাজার প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অসংখ্য দর্শক এবং ক্রেতাদের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।

প্রাচীনকাল হইতেই জাপানীরা সামরিক জাতি। আর পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি উহাদের অসাধারণ উচ্চবিশ্বাস এবং অচলা ভক্তি। তাই যাদুঘরের দুই তিনটা ঘর কেবল প্রাচীন তরবারিতেই পূর্ণ। প্রাচীন ধনুর্ব্বাণ প্রাচীন পোষাক, প্রাচীন দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতিতে যাদুঘর সজ্জিত। আধুনিক কলা ও শিল্পবিদ্যা সম্ভূত জিনিসপত্র তথায় অতি অল্প। সে সমস্ত রাস্তাঘাটে ও হাটে-বাজারে সর্ব্বত্রই দ্রষ্টব্য। একস্থলে দুই ব্যক্তির জীর্ণ বস্ত্র এবং টুপি আর তাঁহাদের তৈল চিত্র অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। উঁহারা উভয়ে ইউরোপে গিয়া সর্ব্বপ্রথম খনিজবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং খনিতে কায করিতে করিতে পাথরের চাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাই জাতীয় সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঁহাদের স্মৃতি সাধারণের সমক্ষে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের কোন ভারতীর বন্ধু বলিয়াছেন, ভারতের তুলনায় জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ অথচ পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যাহা জাপানে নাই! তাই সমগ্র জাপান দেশকে একটী বড় আকারের যাদুঘর মনে করিলেও চলে। সহর কিম্বা গ্রামে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প; নাই বলিলেও চলে। কোন কোন বন্ধু বলেন একে ক্ষুদ্র দেশের ৮৪ ভাগ পাহাড়ে আবৃত তাহার উপর যদি পুকুর খনন করা যায় তবে কৃষি করিবে কোথায়!

মিউজিয়মের অনতিদূরে পার্কের ভিতরই চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু অধিকাংশই বিদেশ হইতে আনীত—যেহেতু জাপানে জীবজন্তুর বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা অতি অল্প। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হইতেই আমদানী করা হয়। শকট পরিচালন এবং কৃষি-

কার্য্যের জন্য গরু এবং ঘোড়া ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনীত হইয়া থাকে। সমগ্র জাপানে তিনটী বই হাতী নাই। আমাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিলে আর জাপানের চিড়িয়াখানায় দেখিবার উপযোগী কিছুই থাকে না। সময় সময় দুই একটী বিশেষ শ্রেণীর জাপানী মোরগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের পুচ্ছ ১২।১৪ হাত লম্বা। ঐরূপ এক একটী মোরগের দাম নাকি চারি পাঁচ শত টাকা।

তোকিও সহরে বৌদ্ধ ও শিস্তো মন্দিরেব সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। সাধারণ পার্কে, রাস্তার ধারে নদীর ঘাটে, পাহাড়ের উপর কত যে মন্দির তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজপুতানায় বিকানীর রাজ্যে যেখানে সেখানে মন্দির; কিন্তু জাপানে মন্দিরের সংখ্যা তার চেয়েও ঢের বেশী। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের বাড়ীতে অনেকের ঘরের মধ্যেও অতি ক্ষুদ্র আয়তনের একটী করিয়া মন্দির আছে। উহা কাষ্ঠে নির্ম্মিত, অনেকটা আমাদের পাখীর খাঁচা বা পিঁজরার মত। প্রতিদিন তথায় ভাতের ভোগ দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় মোমের বাতি জ্বালান হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ সরকার।

চয়ন।

যবদ্বীপে।

বুধবার—১২ ডিসেম্বর

আজ প্রাতে, ছয় ঘটিকার সময়, হোটেলেব সম্মুখস্থ উদ্যান হইতে একটি চমৎকার দৃশ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল; সম্মুখের সমভূমি হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্ফীতোদর পাহাড় উঠিয়াছে, উহাব উপর তেঙ্গেরেসের কতকগুলি গ্রাম; তাহার পশ্চাতে জলপ্লাবিত ধানের ক্ষেত ঝিকৃমিক্ করিতেছে; দক্ষিণে নীল সমুদ্র—পাতলা কুয়াসায় আচ্ছন্ন; বামে, ঈষৎ-ধূসরবর্ণের কুজ্ঝটিকা-জাল প্রসারিত; তাহার পশ্চাতে, বিরাট-দর্শন কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলা আগ্নেয়গিরি। বর্ষাকালে, প্রভাতেই ক্বচিৎ-কখন এইরূপ প্রসারিত ভূখণ্ডের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হোটেলের ঘোড়াগুলা সবই ভাড়া হইয়া গিয়াছে; তাই আজ ব্রোমায় যাওয়া হইল না; কাল যাইব। আজিকার একটা দিন হাতে পাইয়াছি। এই অবসরে তোসারীর আশপাশগুলা পদব্রজে ভ্রমণ করিব। Ngadivono নামক একটি গ্রাম দেখিবার জন্য একজন পাণ্ডা সঙ্গে লইলাম; কিন্তু এই পাণ্ডার পথ দেখাইবার ধরণটা অতি অদ্ভুত; রাস্তাব প্রত্যেক চৌমাথায় থামিয়া আমাকে একটা পথ নির্ব্বাচণ করিতে বলে এবং মালাই ভাষায় একটা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়ে···হোটেলে ফিরিয়া গিয়া, তাহাকে সেইখানে ছাড়িয়া দিলাম; আমি একলাই হাঁটিয়া চলিলাম।

পর্ব্বতের সুঁড়ি পথগুলি ধরিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভাল লাগে। এই সকল গ্রাম ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তাহার

চারিদিকে বেড়ার ঘের; কোন কোন গৃহে যেরূপ এক একটা তোরণ আছে, এই ঘেরের মধ্যেও সেইরূপ একটা তোরণ আছে; এই তোরণদ্বার আড়াআড়ি বাঁশ দিয়া নির্ম্মিত। এখানকার লোকেরা সমভূমির লোক হইতে খুবই তফাৎ; ইহারা রূঢ় প্রকৃতি বলিষ্ঠ পর্ব্বতবাসী; উহাদের চালচলনে বেশ একটা তেজ ও বীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়। ইহারা এই গ্রামের চত্বরে ক্রীড়ামোদ করে। আমি একজন অপূর্ব্ব-ধরণের য়ুরোপীয়, পাণ্ডা না লইয়া যেখানে-সেখানে ইচ্ছামত বেড়াইতেছি —আমাকে দেখিয়া উহারা কিছুমাত্র ভয় করিতেছে না। পাহাড়ের ধার দিয়া ছোট ছোট রাস্তা গিয়াছে—সেই সব রাস্তা ধরিয়া আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেছি। ক্ষেতে য়ুরোপ-সুলভ শাকসব্জি জন্মিয়াছে; তাহার পর, কতকগুলা ভেরাণ্ডা, কতকগুলা পর্ণতুরু, কতকগুলা কলা-গাছ। আমাকে দেখিয়া ভয়ে গণ্ডা-পাঁচ কেনারী-পাখী তাহাদের ক্ষুদ্র পীত পক্ষ বিস্তার করিয়া ঝাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। একটা শুঁড়ি পথের বাঁকে আসিয়া, একটী স্রোতোস্বিনী পাইলাম। একটি দেশীয় তরুণী তাহার জলে স্নান করিতেছে; আমাকে দেখিয়া একটা চীৎকার শব্দ করিয়া, তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া, ছুটিয়া পলাইল; আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি তোসারীতে ফিরিয়া আসিলাম। শাকসব্জি বহন করিয়া দুইজন কৃষক-রমণীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা প্রকাণ্ড কালো প্রজাপতি উড়িতেছিল,— উহারা আমাকে দেখাইল এবং মালাই ভাষায় কি বলিতে লাগিল—আমি ফরাসী ভাষায় বলিলাম এইরূপ পরস্পরের সহিত দুই চারিটা কথার বিনিময় হইল, কিন্তু আমরা কেহই কাহার কথা বুঝিলাম না। পরে, হঠাৎ এই হাস্যজনক অবস্থাটা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আমাদের ভারী মজা লাগিল,— আমরা সকলেই এক সঙ্গে হাসিতে লাগিলাম।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

২৪

বেলা দশটা বাজিয়াছে!

আমার মেরির কথা মনে পড়িতেছিল! হা হতভাগিনী কন্যা আমার, আর ছয় ঘণ্টা পরে কোথায় এ পৃথিবী, কোথায় আমি! হাঁসপাতালের টেবিলে একটা কদর্য্য মাংসপিণ্ডের মত আমি পড়িয়া রহিব। দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তবে তাহারা আমাকে মুক্তি দিবে! তারপর সেই টুকরা-টুকরা মাংস ও অস্থিগুলা ধরণীর কোলে বিছাইয়া দিবে—তবে আমার ছুটি মিলিবে! হায় মেরি, তোমার পিতার জীবনের এ কি পরিণাম!

অথচ এখানে কেহ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না! করুণায় সকলের প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে! যত্ন বা সেবার এতটুকু

ত্রুটি নাই! তবু আমাকে বাঁচিতে দিবে না! করুণা—কিন্তু এ কি নির্ম্মম তার বিধি! আমাকে হত্যা করিবে—কিছুতে ছাড়িবে না!

বেচারী মেরি আমার! পিতার সে কি ভালবাসা তোমাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছিল, তার সে কি মধুর চুম্বনে তুমি তৃপ্তি পাইতে, তোমার ঐ কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছে মৃদু দোল দিয়া পিতা সে কি আদর করিত—ফুলের মত তোমার কচি নরম মুখখানি হাসিতে নিত্য ভরিয়া রহিত—আনন্দের কলহাস্যে সারা গৃহে সে কি বিচিত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিত, তার পর নিদ্রার পূর্ব্বে ছোট হাতদুটিতে মুঠি ভরিয়া পিতার সহিত বিধাতার বন্দনা-গীতে যোগ দিয়া দিনের সকল শ্রান্তি, সকল তাপ ঘুচাইয়া দিতে—কি সে আবেগপূর্ণ আন্তরিক আরাধনা! এমন সুখের স্বাদ আর কে পাইয়াছে—কিন্তু হায়,আজ সে সব যেন স্বপ্ন! হায় বালিকা, তেমন করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া কে আর অজস্র চুমায় তোমার ছোট মুখখানি ভরাইয়া দিবে—তেমন ভাল আর কে বাসিবে! সবার গৃহে ছোট ছেলে-মেয়েগুলি যখন সুখে-দুঃখে উৎসবে-আনন্দে পিতার আদরে-নাচিয়া মাতিয়া উঠিবে, তখন তোমরা আঁখির কোণ শুধু জলে ভরিয়া উঠিবে—গভীর বেদনার তাপে তোমার ঢলঢল মুখখানি শুখাইয়া যাইবে ম্লান নেত্রে সবার পানে চাহিয়াই তোমার দিন কাটিবে! বৎসরের প্রথম দিনে না আছে কোন উপহার, না আছে পিতার আদর! নাই, কিছু নাই, হা রে অভাগিনী, স্নেহকাঙ্গালিনী, তোর হৃদয় স্নেহের তৃষায় আকুল তৃষিত হইয়া উঠিবে—কিন্তু তার পরিতৃপ্তির কোন আশা থাকিবে না! পিতৃহারা অনাথিনী মেরি!

জুরির দল একবার যদি আমার মেরিকে দেখিত, তাহা হইলে এ মৃত্যুদণ্ড দিবার পূর্ব্বে আমার কথাটা একটুও বুঝি তারা বিবেচনা করিত! তিন বৎসরের অবোধ সে বালিকা! তবু তার সাশ্রু নেত্র দেখিয়া তাদের কঠোর চিত্ত নিশ্চয় চঞ্চল হইত! সন্দেহ নাই, কোন সন্দেহ নাই! আমার মেরি,—তার দুঃখ দেখিলে কার না প্রাণ ফাটিয়া যায়!

মেরি! যখন তার বয়স বাড়িবে, জ্ঞান হইবে, সকল কথা বুঝিবার তার শক্তি হইবে, তখন কোথায় আমি! সারা প্যারির একটা কলঙ্কিত স্মৃতি মাত্র! আমার নামে তার প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না! আমার নামে জীবনের যত দুর্দ্দৈব, যত লজ্জা, নিমেষে তার অন্তরে কি জাগিয়া উঠিবে না! লোকের ঘৃণায় তার সমস্ত জীবন কি এক অসহ্য জ্বালায় ভরিয়া যাইবে! মেরি, আদরিণী মেরি আমার—পিতার নামে একবিন্দু অশ্রুর পরিবর্ত্তে কি তোমার চক্ষু বীভৎস ঘৃণার দাহ বর্ষণ করিবে! না, মেরি, না, একবিন্দু অশ্রু দিও! শুধু একবিন্দু মাত্র! হা ভগবান, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, পাপ করিয়াছি যে, সমাজ আজ এমন একটা গুরুতর অপরাধ ও পাপে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছে!

আজিকার সূর্য্য যখন অস্ত যাইবে—তখন কোথায় আমি! এ পৃথিবীতে সকল অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি! আজ আমার জীবনের শেষ দিন! ইহা কি সত্য? স্বপ্ন নয়?

বাহিরে অস্পষ্ট একটা কি কোলাহল! আমারি মৃত্যু দেখিবার জন্ম সকলে বুঝি ছুটিয়া চলিয়াছে! কৌতূহলী দর্শক, স্পর্দ্ধিত প্রহরী, সজ্জিত আচার্য্য—আমাকে দেখিবার জন্যই সকলের এত আগ্রহ! মৃত্যু তবে সত্যই আজ আমাকে গ্রহণ করিবে! আমাকে—? যে আমি বসিয়া রহিয়াছি, নিশ্বাস ফেলিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বায়ু-স্পর্শ অনুভব করিতেছি—সেই আমি এখনই মরিব!

২৫

এ ব্যাপারখানা আমারো কিছু জানা আছে! প্লে দি গ্রীভের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম—সে আজ বহুদিনের কথা! বেলা তখন এগারোটা বাজিয়াছিল! সহসা আমার গাড়ী থামিয়া পড়িল।

পথে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। গাড়ীর মধ্য হইতে আমি মাথা বাহির করিয়া দেখি, আবালবৃদ্ধবনিতায় সারা পথ ভরিয়া গিয়াছে! নরশিরের সংখ্যা ছিল না! গৃহের প্রাচীর, বৃক্ষচূড়া কোন স্থান বাদ যায় নাই! এবং অদূরে উর্দ্ধে স্থাপিত—ফাঁসিকাঠও দেখা যাইতেছিল! ফাঁসির সকল সরঞ্জামই প্রস্তুত ছিল!

আজও সেইদিন! কিন্তু আজ আমি দর্শক নই, আজ আমাকে দেখিবার জন্যই সেখানে তেমনি লোক জমিয়াছে!

একটী রজ্জুকে অবলম্বন করিব—নিমেষে অমনি কি বিরাট অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া পড়িব! জমাট অন্ধকার! তারপর—

আঃ, একখণ্ড প্রস্তর যদি কুড়াইয়া পাই, ত তারি আঘাতে এখনি মস্তকটা চূর্ণ করিয়া ফেলি!

২৬

মার্জ্জনা! ওগো, মার্জ্জনা! আমায় মার্জ্জনা কর! হয়ত আমি মুক্তি পাইব! রাজার প্রাণ করুণায় গলিবে—মার্জ্জনার আজ্ঞা বহিয়া এখনি দূত ছুটিয়া আসিবে! শীঘ্র—শীঘ্র এসো! তখন এই সমস্ত অন্ধকার চকিতে মুছিয়া যাইবে—এবং কি সে তীব্র দীপ্ত মুক্ত আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিব! জয়ের সে কি বিকট উল্লাসে সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিবে!

আমায় প্রাণ ভিক্ষা দাও! ওগো, স্নেহমায়াভরা এমন সুন্দর পৃথিবী,—প্রাণ যে ছাড়িতে চাহে না! আমায় রক্ষা কর! ওগো, তপ্ত লৌহশলাকায় সর্ব্বদেহ আমার বিঁধিয়া দাও—লোকালয়ে প্রবেশ করিতে দিও না—বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর জেলে রাখিয়া দাও, শুধু এই সূর্য্যের আলো আকাশ বাতাস হইতে বঞ্চিত করিও না—বন্দী যে,সে-ও চলে, দেখে, ভাবে, কথা কয়, সে-ও সুখী! শুধু এই প্রাণটা ভিক্ষা দাও,—আর আমার কোন প্রার্থনা নাই!

২৭

আচার্য্য ফিরিয়া আসিল। তাঁর পলিত কেশ, শান্ত কথাবার্ত্তা, নম্র প্রকৃতি। শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্র বটে।

আজই সকালে আপনার সমস্ত জ্ঞান বন্দীর দলে তাঁহাকে বিতরণ করিতে দেখিয়াছি! কিন্তু আমার তাহাতে কি লাভ! তাঁর কথার দিকে আমার মনই ছিল না! বৃষ্টির জল সার্শির গায় লাগিয়া যেমন ঝরিয়া পিছলাইয়া

যায়, আমার মনে লাগিয়া তাঁহার অমূল্য-বাণীও তেমন পিছলাইয়া যাইতেছিল!

তবু তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণটা যেন জুড়াইল! চারিধারে এই পরুষ রুক্ষতার মধ্যে তিনি যেন কি এক আনন্দশ্রী বিকশিত করিয়া দিলেন!

আমরা বসিলাম—তিনি চেয়ারে এবং আমি আমার সেই জীর্ণ শয্যার উপর।

"ভাই!" তিনি কহিলেন—কথাটা আমার হৃদয়ে বিঁধিল! তিনি কহিলেন, "ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আছে কি?"

আমি কহিলাম, "আছে।"

"এই যে উদার ক্যাথলিক ধর্ম্ম—ইহার প্রতি তোমার ভক্তি আছে?"

আমি কহিলাম, "নিশ্চয় আছে।"

"তবে শোন।" আচার্য্য বলিতে লাগিলেন! কি বলিতেছিলেন তাহা আমার মনে নাই, কতক্ষণ বলিতেছিলেন তাহাও জানি না! আমি অন্যদিকে চাহিয়াছিলাম—সহসা তিনি কহিলেন, "কি?" আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম। কহিলাম, "অনুগ্রহ করে আমাকে একলা থাকতে দিন। আমার কিছু ভাল লাগছেনা।"

"কখন আসব আমি, বল।"

"খবর দেব'খন।"

তিনি উঠিলেন, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "নাস্তিক।"

নাস্তিক! না—যতই কেন হীন হই না আমি, তবু নাস্তিক নই! ভগবান জানেন তাঁর প্রতি কি গভীর আমার বিশ্বাস! কিন্তু এ আচার্য্য আর নূতন এমন কি কথা বলিবে! আমার সংক্ষুব্ধ আত্মা যাহা পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইবে, তাহা দিতে ইহার সামর্থ্যই বা কোথা? কতকগুলা বাঁধা গৎ বকিয়া শুধু অস্থির করিবে মাত্র!

খুনী ও ডাকাতের সম্মুখে মুখস্থ বিদ্যা জাহির করা যাহার পেশা, ক্ষুব্ধ আত্মাকে শান্তি দিবার চেষ্টা করা, তার পক্ষে ধৃষ্টতা! ভগবানের নাম লইয়া কি এ শ্ব-বৃত্তি? বিধাতার নামে এমন পরিহাস! অথচ ইহাই রাজধর্ম্মে অনুমোদিত হইয়া কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য্য!

কিন্তু এই বৃদ্ধ আচার্য্য! ইহারই বা দোষ কি? কি তার শিক্ষা, কি তার জ্ঞান? তুচ্ছ কয়টা মুদ্রার জন্য সে এই কাজ করিতেছে! ইহাই তার জীবিকার অবলম্বন,—নহিলে উদরপূর্ত্তি হয় না যে! এমন অশ্রদ্ধা দেখানোটা আমার পক্ষে উচিত হয় নাই! কিন্তু উপায় নাই! আমার নিশ্বাস-বায়ুস্পর্শে চারিধার জ্বলিয়া যাইতেছে, মুখের কথায় বিষ বাহির হইতেছে, আমি ত উপলক্ষ্যমাত্র, ভবিতব্য কঠিন!

প্রহরী আমার জন্য নানাবিধ আহার লইয়া আসিয়াছে! ইহজীবনের মত একবার বাসনা মিটাইয়া খাইয়া লইতে হইবে। যথেষ্ট হইয়াছে! এমন কদর্য্য ঘৃণা, এমন হীনতা আর গলাধঃকরণ করা যায় না!

২৮

একটা লোক,—মাথায় টুপি—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত! ব্যস্ত ভাব, কোনদিকে তার লক্ষ্য নাই! হাতে গজের ফিতা ও কাগজপত্রের বাণ্ডিল! আসিয়াই সে দেয়াল মাপিতে লাগিল! 'আচ্ছা'—'পাঁচফুট' এখানটা বদলানো

দরকার' প্রভৃতি নানা কথা আপনার মনেই সে বকিয়া যাইতে লাগিল।

প্রহরীর মুখে শুনিলাম, সে একজন কণ্ট্রাক্টর! কারাগৃহের সংস্কার হইবে, তাই সে মাপ করিতে আসিয়াছে!

কাজ শেষ হইলে সে আমাকে কহিল, "আপনার বুঝি আজ ফাঁসি হবে—আহা!"

আমি উত্তর দিলাম না। সে আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

সে কহিল, "ছ'মাস পরে এ জেল আর চেনা যাবে না, এর আগাগোড়া বদল হয়ে যাবে, আর কি জমকালো রকমই না সে দেখতে হবে।"

অর্থাৎ তার কথার মর্ম্ম,—আমি নিতান্তই বেচারা, এমন কাণ্ড দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না—।

তার মুখে কাষ্ঠ হাসি দেখা দিল। প্রহরী তাহাকে কহিল, "এখানে দাঁড়াবার হুকুম নাই! আপনার কাজ হয়ে থাকে যদি ত, বাহিরে গেলে ভালো হয়!"

সে চলিয়া গেল। আর আমি—যে পাষাণ-দেয়াল সে ফিতা লইয়া মাপিতেছিল—সেই পাষাণ দেয়ালেরই মত নিশ্চল মূক হইয়া বসিয়া রহিলাম।

২৯

এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটিল। প্রহরী বদল হইল। নূতন প্রহরীর অসভ্য-ভাব-ভঙ্গী, বিশ্রী চেহারা, কর্কশ স্বর! যেন যমদূত!

প্রহরী কহিল, "ওহে, তোমার মনে দয়া-মায়া কিছু আছে কি, ভাই?" আমি কহিলাম, "না!"

আমার স্বরে একটা তীক্ষ্ণতা ছিল—কিন্তু সে হটিবার পাত্র নহে। সে কহিল, "বলি, একটা কথা, শোনই না!"

আমি কহিলাম, "অত রসিকতা আমার সহ্য হবে না।"

সে কহিল, "আমি বড় দুঃখী, ভাই, নেহাৎ হতভাগা। তুমি একটু দয়া করলে যদি ভালো হয় ত, কর না! চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ থাকব!"

চিরদিন! আমার সে 'চির' ত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ফুরাইয়া যাইবে! আমি কহিলাম, "তুমি কি পাগল? তোমার সুখদুঃখের খোঁজ নিয়ে আমি মিছে মাথা ঘামাই কেন?"

তবু সে ছাড়িবে না—কহিল, "বলি শোনইনা কথাটা!" তার পর চারিধারে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে কহিতে লাগিল, "দেখ দাদা, আমার যা কিছু সুখ, যা কিছু ভালো, তা তোমারি হাতে নির্ভর কচ্ছে! নেহাৎ গরীব আমি—এ কাজে কি পরিশ্রম, আর মাহিনাটা কি কম! এর উপর আবার নিজের খরচে একটা ঘোড়া রাখতে হয়! চাকরির সুখ কত! তাই বুঝেই, ভাই, লটারির টিকিটটা আসটা মাঝে-মাঝে আমি কিনি! জীবনে একটা কিছু করা চাই ত! কিন্তু এই যে আজ সাত-আট বৎসর লটারিতে এত টাকা দিচ্ছি, তা এ ত লটারিতে নয়, সব জলে দিচ্ছি! আমার নম্বর যদি হয়, ৭৬, ত ঠিক ৭৭ নম্বরের টিকিট টাকা পেয়ে বসে আছে। আবার যদি দেখে-শুনে ৭৭ নম্বরের টিকিট কিনি ত, হয় ৭৬ নম্বর, নয় ৭৮ নম্বর টাকা পায়! বরাত দেখ না! তাই মনে করেছি কি জানো?" কথাটা বলিয়া সে আমার দিকে চাহিল। আমি কহিলাম, "কি মনে করেছ?"

সে কহিল,—"তাই মনে করছি একটা সুবিধা হতে পারে তোমা হতে।"

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, "আমা হতে সুবিধা ?"

সে কহিল, "হাঁ, দাদা সে তোমারি হাত। দেখ,মানুষ মরে গেলে ভুতভবিষ্যত সব দেখতে পায়, তা তুমি ত এই ক'ঘণ্টা পরেই মরচ, তাই বলছি কি, জানো, আমাকে যদি ঐ ঠিক নম্বরটি বলে দাও ত আমি সেই নম্বরের টিকিট-খানি কিনি! বেশ দু পয়সা তা হলে হাতেও আসে! রাতারাতি বড়মানুষ হয়ে পড়ি,আর এই লক্ষ্মীছাড়া চাকরি ছেড়ে বাঁচি—ভুতকে আমি ভয় করি না, বুঝলে কি না—কোন বাধা নাই! আমার নাম কার্সে পাঁপিকুর! বি নম্বর ঘর, ২৬ নম্বর বিছানা—মনে থাকবে ত? আজই সন্ধ্যার পর তা হলে বলে দিও, দাদা। দোহাই তোমার।"

এ কথার আমি উত্তর দিতাম না—প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু একটা উন্মদ আশা আমার মনে জাগিয়া উঠিল—একবার শেষ চেষ্টা! আমি কহিলাম, "দেখ, তুমি টাকা চাও ?"

"হাঁ, দাদা! আর পয়সার দুঃখ ভোগ করতে পারিনে!"

আমি কহিলাম, "বেশ—আমি তোমাকে রাজার ঐশ্বর্য্য দেব, অগাধ টাকা যদি এক কাজ করতে পার!"

তার চোখ যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল, "বল, আমি এখনি করব—যত বড় শক্ত সে কাজ হোক, তবু পেছুবো না।"

আমি কহিলাম, "শুধু আমাদের পোষাক বদল করতে হবে, ব্যস—আর কিছু নয়!"

"এই কাজ! ওঃ, এখনি রাজী আছি।" বলিয়াই সে জামার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ক্ষিপ্র গতিতে আমি উঠিলাম। বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনি সব পণ্ড হইবে! আঃ, ভগবান, ধন্য তুমি! নিমেষে আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে আগাগোড়া সমস্ত দ্বার মুক্ত—কোথাও বাধা নাই, বন্ধ নাই—মুক্ত আকাশতলে আবার আমি দাঁড়াইয়াছি—মাথার উপর পাখীর দল উড়িয়া চলিয়াছে, স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর স্পর্শ অবধি যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম,—সে এক সম্পূর্ণ নুতন জীবন!

সহসা প্রহরীটা থমকিয়া গেল—কহিল, "ওহো! বুঝেছি তোমার মতলবখানা—তুমি পালিয়ে যেতে চাও?"

একটা ঢোক গিলিয়া আমি কহিলাম, "তাইত চাই, নইলে তোমাকে টাকা দেব কি করে?"

প্রহরী জামার বোতাম আঁটিতে লাগিল। আমার অন্তরের মধ্য দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎ শিখা বহিয়া গেল—মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

সে কহিল, "না—তা কি হয়? ও সব হাঙ্গামায় আমি নাই—মরে তুমি টাকার কিনারা করো ভাই, যেমন বললুম—এ রকম পালিয়ে—আরে না—না।"

আমি বসিয়া পড়িলাম—আমার পা টলিতেছিল! আশা নাই—কোন আশা নাই! নিরাশার সুগভীর বেদনায় আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

দ্বিতীয় ভাগ।

ভারতবর্ষের অনেকগুলি নাম আছে। পূর্ব্বে ইহাকে সিন্টু নামে অভিহিত করা হইত। কেহ কেহ ইহাকে হিয়েনটোও বলিত। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম হইতেছে ইণ্টু। নিজ নিজ জিলা অনুযায়ী ইণ্টু দেশীয় লোকেরা ইহার নামকরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের আচার ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের। চীন ভাষায় ইণ্টু অর্থে চন্দ্র।

ভারতবর্ষের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কৌলীন্য ও চরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি ব্রাহ্মণদের কাহিনী পবিত্রতাপূর্ণ করিয়াছে। জনসাধারণে ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণদের দেশ এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরিমাণ, জলবায়ু প্রভৃতি।

ভারতবর্ষ নামক পরিচিত দেশগুলি পঞ্চসিন্ধু নামে কথিত হইয়া থাকে। এই দেশের পরিধি ৯০,০০০ লি; ইহার তিন দিকেই সুবিশাল সাগর এবং ইহার উত্তরে তুষার পর্ব্বত। ইহার উত্তরাংশ প্রশস্ত; দক্ষিণাংশ সঙ্কীর্ণ। দেখিতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। সমগ্র দেশটী ৭০ কি ততোধিক প্রদেশ বিভক্ত। ঋতুগুলি অত্যন্ত উষ্ণ; ভারতভূমি সুজলা এবং আর্দ্র। উত্তরাংশ উপত্যকাপূর্ণ ও সমতল। এই সকল উপত্যকা ও সমতল ক্ষেত্রগুলি সুজলা ও কর্ষিত বলিয়া উর্ব্বর ও ফলোৎপাদক। দক্ষিণাংশ বনরাজি ও শাক পরিপূর্ণ। পশ্চিমাংশ কঙ্করময় এবং অনুর্ব্বর

ভারতবর্ষের পরিমাপ লইতে হইলে প্রথমে যোজন গণনা করা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সৈন্যদের একদিনের কুচকে যোজন বলে। পুরাতন পুস্তকাদিতে ৪০ লিতে এক যোজন এইরূপ দেখা যায়। সাধারণতঃ ৩০লিতে এক যোজন পরিগণিত করা হয়—কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকে দেখা যায় যে ১৬ লিতে এক যোজন হয়। আট ক্রোশে এক যোজন। গরুর ডাক যতদূর হইতে কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে সেই দূরত্বকে ক্রোশ বলে। এক ক্রোশে ৫০০ শত ধনু। চার হাতে এক ধনু এবং ২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত হয়। ৭ যবে এক অঙ্গুলি এবং এই প্রকারে আরও নানাপ্রকার পরিমাপের প্রণালী আছে। ইহার পরে আবার অণু ও পরমাণু আছে।

জ্যোতিষ, পঞ্জিকা ইত্যাদি।

সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সময়কে ক্ষণ বলে। একশত বিশ ক্ষণে তক্ষণ; ৬০ তক্ষণে এক পল, ৩০ পলে এক মুহূর্ত্ত এবং ৫ মুহূর্ত্তে কাল এবং ৬ কালে এক অহোরাত্র হয়। সাধারণতঃ দিবারাত্রি আট-কালে বিভক্ত করা হয়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যাকে কৃষ্ণপক্ষ বলা হয়। চৌদ্দ কি পনের দিনে কৃষ্ণপক্ষ হয়—কেননা মাস কখন দীর্ঘ কখন ছোট হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী শুক্লপক্ষ লইয়া একমাস। ছয় মাসে দুই অয়ন। সূর্য্য যখন বিষবরেখার মধ্যবর্ত্তী থাকে তখন ইহাকে উত্তরায়ন ও বহির্ভাগে থাকিলে দক্ষিণায়ন বলে এই দুই অয়ন লইয়া এক বৎসর পরিগণিত হয়।

বৎসর ছয় ঋতুতে বিভক্ত। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে তৃতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল; তৃতীয় মাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পূর্ণ গ্রীষ্মকাল; পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শস্যবৃদ্ধিকাল। নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে একাদশ মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত শীত ঋতুর প্রারম্ভকাল ও একাদশ মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পূর্ণ শীতকাল।

তথাগতের শাস্ত্রানুযায়ী বৎসরে মাত্র ৩টী ঋতু। প্রথমমাসের ষোড়শ দিবস হইতে পঞ্চম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত গ্রীষ্মঋতু। পঞ্চম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে নবম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত বর্ষাঋতু ও নবম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ

দিবস পর্য্যন্ত· শীত ঋতু। আবার চারিঋতুও কথিত হইয়া থাকে—বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত। বসন্তের মাস হইতেছে চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। প্রথম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে চতুর্থ মাসের পঞ্চদশ দিবসের সহিত এই মাসত্রয়ের ঐক্য দেখা যায়। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রপদ মাস লইয়া গ্রীষ্মকাল। চতুর্থ মাসের ষোড়শ দিবস হইতে সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই গ্রীষ্মকালের ঐক্য দেখা যায়। আশ্বিন কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ এই তিনমাস লইয়া হেমন্ত। সপ্তম মাসের ষোড়শ দিবস হইতে দশম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত সময়ের ঐক্য আছে। পৌষ, মাঘ, এবং ফাল্গুন —এই কয়মাস শীতকাল। দশম মাসের ষোড়শ দিন হইতে প্রথম মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই কাল। পুরাকালে পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া বর্ষাকালে দুইবার বিশ্রাম করিতেন *— প্রথম তিনমাস অথবা শেষ তিন মাস। সূত্র ও বিনয় অনুবাদকারীগণ—এই বিষয় শুদ্ধরূপে অনুধাবন করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই যে সীমান্ত প্রদেশের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মধ্যপ্রদেশের ভাষা বোধগম্য করিতে পারিত না। এবং এই কারণেই তথাগতের জন্ম, গৃহত্যাগ, নির্ব্বাণ প্রভৃতির সঠিক সময় নির্দ্ধারিত হইয়া উঠে নাই।

নগর ইত্যাদি।

নগর ও গ্রামের মধ্যে দরজা আছে। প্রাচীর উচ্চ ও প্রশস্ত। পথ ও উপপথ সকল পাকানো এবং রাজ-পথগুলি ঘোরানো। পথগুলি অপরিষ্কার এবং ইহাদের পার্শ্বে সুসজ্জিত বিপণিগুলি যথাযোগ্য চিহ্নে শোভিত। কসাই, মৎস্যজীবি, নর্ত্তক নর্ত্তকী, জল্লাদ ও সম্মার্জ্জক প্রভৃতির বাস নগরের বহির্ভাগে। ইহাদিগকে রাজপথের বামপার্শ্ব দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। ইহাদের গৃহাদি অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এবং উপনগর বলিয়া খ্যাত। মৃত্তিকা নরম ও কর্দ্দমময় বলিয়া নগরের প্রাচীরগুলি ইষ্টক বা টালী দ্বারা প্রস্তুত। প্রাচীরের উপরিস্থ প্রাসাদগুলি কাষ্ঠ বা বংশনির্ম্মিত গৃহাদিতে বারান্দা ও আমোদগৃহ আছে। এইগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত। তবে ইহাদের বহির্দ্দেশে চুণ বা সুরকীর আস্তরণ থাকে এবং ছাদ ইষ্টকের। চীনের ন্যায় তৃণ, শুষ্ক শাখা, টালি বা কাষ্ঠ ছাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। দেওয়ালগুলি চুণ ও কর্দ্দমলিপ্ত এবং পবিত্রতার জন্য গোময়ও মিশ্রিত হইয়া থাকে।

সঙ্ঘারামগুলির নির্ম্মাণ কৌশল অত্যন্ত অসাধারণ। চতুষ্কোণের চতুর্দ্দিকেই এক একটা ত্রিতল মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কড়িকাষ্ঠ ও কার্ণিস নানা-প্রকারে খোদিত হইয়া থাকে। দরজা জানালা এবং অনুচ্চ প্রাচীরগুলি মুক্তহস্তে চিত্রিত। সন্ন্যাসীগণের কক্ষের অভ্যন্তর কারুকার্য্যখচিত কিন্তু বহির্দ্দেশ অনলঙ্কৃত। মধ্যস্থলে উচ্চ ও বিস্তৃত ঘর। দরজাগুলি পূর্ব্বমুখ; রাজসিংহাসনও পূর্ব্বমুখে স্থাপিত।

আসন, বসন ইত্যাদি।

ভারতবাসীরা উপবেশন বা বিশ্রামের কালে মাদুর ব্যবহার করে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও সহকারী কর্ম্মচারীগণ কারুকার্য্য শোভিত মাদুর ব্যবহার করে কিন্তু আকারে সকল মাদুরই এক প্রকার। রাজার সিংহাসন বৃহৎ উচ্চ এবং মূল্যবান মণিমুক্তাসজ্জিত; ইহাকে সিংহাসন বলে। সিংহাসন অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত; পাদদানটী পর্য্যন্ত মণিমুক্তাখচিত। সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সুচিত্রিত ও মূল্যবান আসন ব্যবহার করেন।

পোষাক পরিচ্ছদের কোন রূপ "ছাট কাট" নাই। শুভ্র পোষাকই তাহারা পছন্দ করে; বহুবর্ণ বা সুশোভিত পরিচ্ছদ তাহাদের মনঃপুত হয় না। পুরুষেরা মধ্যদেশে তাহাদের পরিচ্ছদ জড়াইয়া, কুক্ষিতলে ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ঝুলাইয়া দেয়। স্ত্রীলোকের পোষাক মৃত্তিকা স্পর্শ করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহাদের স্কন্ধ আবৃত করে। তাহারা মস্তকোপরি কেশের কিয়দংশ দ্বারা কবরী বন্ধন করে

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইৎসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এবং অন্য চুলগুলি আলগা করিয়া রাখে। কেহ কেহ গোঁফ ছেদন করে *। মস্তকোপরি তাহারা মুকুট ও মণিময় মাল্য ব্যবহার করে। তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় * ও কার্পাস নির্ম্মিত। ক্ষৌম বস্ত্রের পরিচ্ছদও দেখা যায়। উৎকৃষ্ট ছাগলোম দ্বারা কম্বল প্রস্তুত হয়। করাল (বন্য পশুর সুচিক্কণ-লোম) দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয়। ইহা বয়ন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেই জন্য ইহার পরিচ্ছদ মূল্যবান এবং ইহা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদরূপে গণিত হয়।

উত্তর ভারতে বায়ু শীতল এবং সেই জন্য তথায় তাহারা ছোট এবং আঁটা পোষাক ব্যবহার করে। অবিশ্বাসীদিগের পরিচ্ছদ ও গহনা বহুবিধ ও মিশ্রিত। কেহ ময়ূরপুচ্ছ, কেহ নরকঙ্কাল ব্যবহার করে। কেহ বা উলঙ্গ থাকে, আবার কেহ পত্র বা বল্কল পরিধান করে। কেহ কেশ কর্ত্তন করে, কেহ বা গোঁফ মুণ্ডন করে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ গোঁফ এবং মাথার উপর চুলের কবরী ও দেখা যায়। ইহাদের পরিচ্ছদ একরূপ নহে এবং এক এক সময় এক এক প্রকার রংয়ের পোষাক ব্যবহার করে।

শ্রমণগণের তিন প্রকার পরিচ্ছদ *। এই তিন প্রকার পরিচ্ছদের "ছাঁট" এক প্রকার নহে—ইহা সম্প্রদায় বিশেষের উপর নির্ভর করে। কাহারও কাহারও ক্ষুদ্রপাড় কাহার আবার চওড়া। কোন কোন পোষাক আবার কমবেশী ঝুলিয়া পড়ে। এক প্রকার পোষাক কেবল বাম স্কন্ধ ও উভয় কুক্ষিতল আবৃত রাখে। ইহা বামদিকে অনাবৃত রাখিয়া দক্ষিণদিক আবৃত করিয়া রাখে। কোমরের নীচে ইহা ঝুলিয়া পড়ে। অন্য প্রকার পোষাকের কটিবন্ধ বা থোবা নাই। পরিধানকালীন ইহার নিম্নাংশ ভাঁজ করিয়া পরিতে হয় ও কটিদেশে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিতে হয়। সম্প্রদায় সকলের পরিচ্ছদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু—পীত ও লোহিত উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন এবং সাদাসিধা ভাবে ও মিতব্যয়িতার সহিত জীবন ধারণ করেন। রাজা এবং মন্ত্রীগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ব্যবহার করেন। রত্নখচিত উষ্ণীষ এবং পুষ্প কেশে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলয় ও মাল্য দ্বারা নিজেদের ভূষিত করেন।

অনেক ধনবান বণিক স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহারা নগ্নপদে যাতায়াত করেন—কদাচিৎ কেহ উপানৎ ব্যবহার করে। ইহারা দন্ত লোহিত কিম্বা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত এবং কর্ণ বিদ্ধ করে। ইহাদের নাসিকা চিত্রিত এবং চক্ষুগুলি আয়ত।

পরিচ্ছন্নতা।

ইহারা শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী এবং এই বিষয়ে কোনরূপেই শৈথিল্য প্রকাশ করে না। আহারের পূর্ব্বে সকলেই স্নান করিয়া থাকে; কখনও উচ্ছিষ্ট ভোজন করে না এবং একের ভোজনপাত্র অপরে ব্যবহার করে না। কাষ্ঠ বা প্রস্তর পাত্র ব্যবহৃত হইলেই নষ্ট করিয়া ফেলে। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা লৌহ পাত্র প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর ধৌত ও মার্জ্জিত করে। আহারাদির পরে তাহারা দন্তকাষ্ঠ + ব্যবহার করে এবং মুখ ও হস্ত প্রক্ষালন করে *। স্নানের পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। । শৌচান্তে প্রত্যেকবার তাহারা গাত্র ধৌত করে এবং চন্দন ও হরিদ্রার সুগন্ধি ব্যবহার করে। রাজার স্নানকালে ঢক্কা নাদ হয় ও বাদ্যযন্ত্র যোগে সঙ্গীত হয়। পূজা বা প্রার্থনার পূর্ব্বে ইহারা অবগাহন করে।

লিখন, বর্ণমালা, ভাষা পুস্তক প্রভৃতি।

ভারতবর্ষীয়দের বর্ণমালা ব্রহ্মদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা ৪৭ এবং দেশ কালপাত্র অনুযায়ী

* এই সকল আচার ব্যবহারগুলি ইৎসিংও উল্লেখ করিয়া গিয়াছে।

\+ দন্তকাষ্ঠের ব্যবহার ইৎসিংয়ের গ্রন্থে এবং আরও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। "বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা" প্রবন্ধে (ভারতী ১৩১৬ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

শব্দ রচনার উপযোগী ভাবে সংযুক্ত। এই বর্ণমালা নানা দেশের নানা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই জন্যই দেশভেদে উচ্চারণে ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। মধ্য ভারতে ইহা আদিকাল হইতে এক ভাবেই আছে। এই স্থানের উচ্চারণ শুনিতে মধুর এবং দেবতাদিগের ভাষার ন্যায়। সীমান্ত প্রদেশবাসীদের উচ্চারণে ভ্রম দেখা যায় কেন না চরিত্রগত দোষের জন্য তাহাদের ভাষাও দূষিত হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক প্রদেশে সাময়িক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। এই সকল বিবরণকে নীলপিত বলে। শুভাশুভ সর্ব্ববিধ ঘটনাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হয়।

বালকদিগের শিক্ষা ও উৎসাহের জন্য তাহাদিগকে প্রথমতঃ দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট সিদ্ধবস্তু নামক পুস্তক অধ্যয়ন করান হয়। সপ্তম বর্ষে উপনীত হইলে তাহারা পঞ্চবিদ্যা নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। প্রথমেই তাহারা শব্দবিদ্যা অধ্যয়ন করে। এই পুস্তক শব্দের অন্বয় এবং পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্ব শিক্ষা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা শিল্পস্থান বিদ্যা অর্থাৎ শিল্পশক্তি নির্ণয়কবিদ্যা এবং জ্যোতিষ অধ্যয়ন করে। পরে চিকিৎসাবিদ্যা অর্থাৎ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও গুপ্তমন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেয় তাহাই অধ্যয়ন করে। পরে হেতুবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্তটিতে পঞ্চ বৌদ্ধ শাস্ত্রের * সকল তত্ত্ব নিদ্ধারিত আছে।

ব্রাহ্মণে চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। প্রথম বেদকে আয়ুর্ব্বেদ বলে কেন না ইহা জীবনরক্ষণ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করে। দ্বিতীয় যজুর্ব্বেদ, তৃতীয় সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ।

এই সকল বেদে যে সকল গূঢ় ও গুপ্ততত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে তাহা এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণ যে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা প্রথমতঃ উহাদের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়া পরে ছাত্রদিগকে দুরূহ শব্দ সমূহের অর্থ বোধগম্য করাইয়া দেন। তাঁহারা শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করেন এবং সুকৌশলে তাহাদের পরিচালিত করেন। যদি তাঁহারা দেখেন যে তাঁহাদের শিষ্যগণ অধীত বিদ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছুক তাহা হইলে তাঁহারা উহাদের স্বকীয় বশে রাখেন। তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এবং ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে তাহাদের চরিত্র গঠিত এবং জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যখন তাহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় তখন প্রথমে তাহারা গুরুদেবের যত্নের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয়। পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ অনেকে বিদ্যা-চর্চ্চাতেই জীবনাতিপাত করেন এবং এবং সংসার হইতে দূরে বাস করিয়া নিজেদের স্বভাব অক্ষুণ্ন রাখেন। পার্থিব বিষয়ের ইহারা কিছুই ধার ধারেন না; নিন্দা বা প্রশংসায় ইঁহাদের কিছুই যায় আসে না। তাঁহাদের সুযশ দিগদিগন্তে বিস্তৃত হওয়ায়, রাজন্যবর্গ তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন কিন্তু তাঁহারা কদাপিও রাজসভায় উপস্থিত হন না। গুণের জন্য নরপতি তাঁহাদের সম্মান করেন এবং প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের যশোরাশির প্রশংসা করে এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের ভক্তি করে। এই কারণেই তাঁহারা দৃঢ়তা ও উৎসাহ সহকারে অক্লান্ত ভাবে বিদ্যাচর্চ্চায় সময়াতিপাত করিতে পারেন। তাঁহারা আত্মবলে নির্ভর করিয়া জ্ঞানান্বেষণ করেন। যদিও তাঁহারা বিপুল ধনের অধিকারী তথাপি তাঁহারা সামান্য জীবিকার জন্য নানাস্থান ভ্রমণ করেন। পক্ষান্তরে, এরূপ লোকও দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াও নির্লজ্জভাবে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইয়া কেবল মাত্র সুখলালসায় অর্থরাশির অপচয় করে। ইহারা বহুমূল্য আহারাদি ও বস্ত্র নিজ সম্পত্তি বিনষ্ট করে। নিজেদের নৈতিক বল এবং অধ্যয়নস্পৃহা না থাকাতে ইহারা অপমানিত হয় এবং ইহাদের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

নিজ নিজ শ্রেণী অনুযায়ী, সকলেই তথাগতের

* পঞ্চযান—(১) বুদ্ধ (২) বোধিসত্ত্ব (৩) প্রত্যেক বুদ্ধ (৪) যতি (৫) অন্যান্য শিষ্য।

ধর্ম্মমত জ্ঞাত আছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পরে বহুকাল গত হওয়াতে, তাঁহার মতের রূপান্তর হইয়াছে এবং কেবলমাত্র তত্ত্বান্বেষিগণের অনুসন্ধানের উপরই এইক্ষণ এই জ্ঞান নির্ভর করে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পুস্তক, বিচার, বিনয় প্রভৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালার স্থায় তাঁহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক উত্থিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য আছেন এবং যদিও তাঁহাদের মতামত বিভিন্নমুখী, তথাপি তাঁহাদের লক্ষ্য এক।

অষ্টাদশটী সম্প্রদায় আছে এবং প্রত্যেকই অপরের উপর প্রাধান্য প্রকাশ করিতে অভিলাষী। মহাযান এবং হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ পৃথক পৃথক বাস করিতেই ইচ্ছুক। অনেকে নীরব ধ্যানেই আসক্ত এবং ভ্রমণে, উপবেশনে, দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল সময়েই জ্ঞানার্জ্জন ও সূক্ষ্ম দর্শনের জন্য নিমগ্ন থাকেন। কেহ কেহ স্ব স্ব মতের পোষকার্থে চীৎকার করিয়া তর্ক বিতর্ক করেন। নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক নিয়ম অনুসারে বৌদ্ধগণ চালিত হন।

বিনয়, বিচার, এবং সূত্রপিটক—সকলই বৌদ্ধ-পুস্তক। যিনি এই সকল গ্রন্থের এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে কর্ম্মদানের শাসন হইতে মুক্ত দেওয়া হয়। যদি তিনি দুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিতে পারেন তবে তাঁহাকে দ্বিতীয় তলে বাসের জন্য আসবাব দেওয়া হয়। যিনি তিন অংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য কয়েকটী ভৃত্য দেওয়া হয়। যিনি চারি অংশের ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে উপাসক নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যিনি পঞ্চাংশ ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে হস্তিযান দেওয়া হয়। যিনি ছয় অংশেরই ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাঁহাকে শরীররক্ষী প্রদত্ত হয়। যখন কাহারও সুযশ উচ্চ সীমায় উপনীত হয়, তখন বিচারের জন্য তিনি সভা আহ্বান করেন। যাঁহারা সভায় উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের গুণের বিচার করেন; তিনি বুদ্ধিমানদিগকে প্রশংসা করেন এবং ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন। সভায় যদি কেহ মার্জ্জিত ভাষা, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন তাহা হইলে তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এবং বহুসংখ্যক সহচর সঙ্গে দিয়া মঠের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আনয়ন করা হয়। পক্ষান্তরে, যদি কেহ বিচারকালীন অসাধু ভাষা প্রয়োগ করেন, অথবা কুতর্ক অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলে তাহার মুখ লাল ও সাদা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দেয়, তাহার সর্ব্বাবয়বে ধূলি ও কর্দ্দম মাখাইয়া দেয় এবং পরে কোন নির্জ্জন স্থানে বা পয়ঃপ্রণালীতে রাখিয়া আইসে। এই প্রকারে তাহারা গুণী ব্যক্তিকে সম্মান এবং গুণহীনকে অপদস্থ করে।

ভোগবিলাস সাংসারিক জীবনেই শোভা পায় এবং জ্ঞানার্জ্জনই ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ। শেষোক্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক ভোগবিলাসে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত গর্হিত। যদি কেহ বিনয়ের নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তাহাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়। সামান্য দোষে, তিরস্কার বা কয়েকদিবসের জন্য নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। অপরাধ গুরুতর হইলে চিরদিনের জন্য মঠ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা এইরূপে বহিষ্কৃত হয় তাহারা অন্যত্র আবাস অন্বেষণ করে এবং যদি তাহাতে অসমর্থ হয় তবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও তাহারা পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে।

বর্ণবিভাগ ও বিবাহ।

ইহারা চারিবর্ণে বিভক্ত। প্রথম ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সদাচারী। ইহারাই ধর্ম্মপরায়ণ এবং নিয়মাবলী পালনে বিশেষ তৎপর। দ্বিতীয় শ্রেণীকে ক্ষত্রিয় বলে, ইহারা রাজজাতীয়। বহু দিন হইতে ইঁহারা দেশ শাসন করিতেছেন। ইঁহারাও ধার্ম্মিক ও দয়াশীল। তৃতীয় বৈশ্য—ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

ইহারা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে ও দেশ বিদেশে ধনার্জ্জন করে। চতুর্থ শ্রেণীকে শূদ্র বলে—ইহারা কৃষিজীবি। ইহারা হলচালন ও কর্ষণ করে। এই চতুর্ব্বর্ণে জাতীয় বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা অনুসারেই পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয়। যখন ইহারা বিবাহ করে, তখন নূতন কুটুম্বিতা অনুসারে ইহাদের পদমর্য্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। একবার স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে আর বিবাহ হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু জাতি আছে যাহারা নিজ নিজ ব্যবসানুযায়ী বিবাহ করে।

ক্রমশঃ

ছবি।

(ইংরাজী হইতে)

শরতের স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ চিত্রকর সেমুর সস্ত্রীক নদীতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। অস্তগামী সূর্য্যকিরণে তখন নদীর জল লাল হইয়া গিয়াছিল।

অদূরে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া এক বালক কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ছুরিকার সাহায্যে ছোট নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। বালকের বেশ ছিন্ন ও মলিন। আপনার কাযে সে এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে. পথের দিকে তার কোন লক্ষ্যই ছিল না।

সেমুর ভাবিল, বাঃ—চিত্রের যোগ্য বটে! স্ত্রী কিটিকে কহিল, "আঁকবার মত নয় কি?"

কিটি কহিল, "নিশ্চয়, সুন্দর হবে।"

অগ্রসর হইয়া বালকটির কাঁধে হাত দিয়া সেমুর কহিল, "তোমার নাম কি?"

বালক চমকাইয়া সেমুরের মুখের দিকে চাহিল, কহিল,"আমি জিম"। বলিয়া সে আবার আপনার কাযে মন দিল।

কিটির নিকট আসিয়া সেমুর কহিল, "আমি এখনি সব জিনিষপত্র আন্‌ছি—তুমি একে কিছুতে উঠ্‌তে দিও না, কোন রকমে ভুলিয়ে রেখো।"

সেমুর যখন ফিরিয়া আসিল, বালকটি তখনো তেমনিভাবে নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। সেমুর পট লইয়া বসিয়া গেল।

তখন চারিধারে আঁধার নামিতেছিল! জিম্ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া ছোট নৌকাটী বুকে লইয়া উঠিয়া পড়িল।

সেমুর কহিল, "আর একটু,—জিম, আর একটু বস।" পরে পকেট হইতে একটী রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া কহিল,"আর একটু বসলে দেব?"

জিম্ অবাক হইয়া গেল। কহিল, "আমাকে দেবেন?"

"হাঁ, তুমি আর একটু ঐখানে বস, তা হলে দেব। কিন্তু কাল আবার আসা চাই, আবার দেব। কেমন আসবে ত, জিম?"

জিম্ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

সে রাত্রে সেমুর বাড়ীওয়ালীকে জিমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "ওঃ, নিশ্চয় তবে সে জিম মেরিডিথ। আহা

বেচারা জিম্! তাদের দুঃখের কথা আর বলব কি, সে আজ প্রায় দু বৎসরের কথা। হাঁ, ঠিক দু বৎসর। জিমের বাপ ওয়েনের সঙ্গে তার বন্ধু রিজের কি বচসা হয়, ওয়েন রিজকে একটা ধাক্কা দেয়। ওয়েনের ধাক্কায় রিজ কেমন বে-কায়দায় পড়ে অজ্ঞান হয়। রিজ বুঝি মারা গেল ভেবে ভয়ে দুঃখে ওয়েনও কোথা চলে গেল। তার পর, তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।"

কিটি কহিল, "রিজ কি সত্যই মারা গেছে?"

"নাঃ, মরবে কেন? জোয়ান মানুষ, একটা ধাক্কায় কি মরে কখনো? প্রায় হপ্তা দুই পরে সে বেশ সেরে উঠল! ওয়েনের জন্য কতদিন সে কেঁদেছে, তার কত খোঁজও করেছে—আহা, বড় ভাব ছিল দুজনে. তার উপর রিজেরই নাকি দোষ ছিল—তা কোথায় ওয়েন—তার কোন সন্ধানই নেই!" কথাটা বলিয়া বাড়াওয়ালী ছোটখাট একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

২

পরদিন সেমুর নদীতীরে আসিয়া দেখে জিম্ তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কিন্তু আজ আর সে জিম নয়—আজিকার জিম দিব্য পরিচ্ছন্ন! বেশ ধোপদস্ত পোষাক পরিয়া সে আসিয়াছে। মুখের কালি সাবানে ধুইয়া ফেলিয়াছে, উস্ক-খুস্ক চুলগুলা তৈল-চিক্কণ, ব্রসের সাহায্যে তার পারিপাট্যই বা কি!

সেমুর কহিল, "এ কি করেছ জিম্—তুমি আর সে জিম নও যে—এঃ, এমন সেজে আসতে কে বলেছিল?"

বালকের মুখ শুখাইয়া গেল। সে বলিল, "মা সাজিয়ে দিয়েছে, ছবি তোমার কথা বল্‌তে, মা—"

"না, না শীঘ্র যাও, কাল যেমন ছিলে, তেমনটী হয়ে এস—কিছু মনে করোনা জিম্, এই দেখ তোমার চুলে এমন তেল মেখেছ—এ সব ঠিক করে এস, যাও, না হলে ছবি ভাল হবে না ত। ঠিক কালকের মত পোষাকে এস।"

এমন ভদ্রোচিত বেশ সেমুরের কেন যে মনঃপূত হইল না,—জিম তাহার মর্ম্মই মোটে গ্রহণ করিতে পারিল না।

* * * *

ছবিখানি সম্পূর্ণ হইল। সেমুরের নিপুণ তুলিকাপাতে সুন্দর ফুটিল! চিত্রশিল্পে তার দক্ষতাও ছিল অসামান্য!

কিটি ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সোৎসাহে স্বামীকে কহিল, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে।"

"তোমার ভাল লেগেছে ত কিটি, তাহলেই আমি সুখী। জিম তুমিও একবার এসে তোমার ছবি দেখ।"

জিম গৃহমধ্যে যাইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবির পানে চাহিয়া রহিল! এই কি সে! দেখিল, একেবারে ঠিক—ক্রমে আপনার বেশের প্রতি তার নজর পড়িল—লজ্জায় সে আপন বেশের ছিন্ন স্থান গুলা হাত দিয়া ঢাকিতেছিল। তার কেমন একটা সঙ্কোচ হইতেছিল—'তাইত ছবিতে এগুলাও আঁকা হইয়া গিয়াছে!'

জিমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেমুর হাসিয়া

কহিল, "জিম্ ঐ গুলার জন্যই ত ছবি খানির দাম! বুঝলে?"

পরে কহিল, "আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আমরা চলে যাচ্ছি!"

বালক কাতর দৃষ্টিতে সেমুরের প্রতি চাহিল, কহিল, "চলে যাবেন? কোথায়?"

"লণ্ডনে যাব, বুঝলে, জিম্, তুমি যাবে?" বালক বলিয়া উঠিল, "মা বলছিল সেখানে আমার বাবা আছেন", পরে সে আবার কহিল, "সেখানে আপনারা আমার বাবাকে নিশ্চয় দেখবেন, দেখা হলে আমার আর মার কথা যদি বলেন—" বলিতে বলিতে বালকের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

সেমুর ও কিটির অন্তর দুঃখে ভরিয়া গেল! জিমকে বুকে টানিয়া কিটি কহিল, "কেঁদোনা জিম। চুপ কর।" সেমুর কহিল, "জিম তোমার বাবাকে নিশ্চয় আমি এখানে পাঠিয়ে দেব, তোমার মাকে বলো।"

* * * *

৩

স্তব্ধ রাত্রি। লণ্ডনের এক গৃহমধ্যে নিম্নকণ্ঠে কে কহিল "হা ভগবান!" লোকটীর মুখ শুষ্ক বিবর্ণ! সে চোর, চুরি করিতে আসিয়াছিল।

রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গৃহের মেঝেতে চোরের পরিশ্রমলব্ধ জিনিষপত্র সংগৃহীত—সকলগুলিই রৌপ্য-নির্ম্মিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে! নিকটে একটী থলিও পড়িয়াছিল।

চোর সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাহারো কোনো সাড়াশব্দ নাই—চারিধার নিস্তব্ধ!

বাহিরে কেবল খড়খড়ির গায় বৃষ্টির ফোঁটার পট-পট শব্দ আর রাস্তায় ক্বচিৎ গৃহমুখী গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। চারিধারে বিরাট নিস্তব্ধতা! চোরের মুখ পাংশুবর্ণ, তার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ।

সম্মুখে গৃহকোণে একটী চিত্রের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মত সে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তার পর ধীরে ধীরে দেয়াল হইতে ছবিখানি সে নামাইয়া লইল।

দ্বার খোলার শব্দ হইল—সে শুনিতে পাইল না, তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছিল।

একখানি চেয়ারে সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। পশ্চাতে তখনো প্রবেশদ্বার অৰ্দ্ধমুক্ত রহিয়া গেল। হাঁটুর উপর ছবিখানি রাখিয়া একমনে সে তাহাই দেখিতেছিল।

নদীতীরে শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট এক বালকের প্রতিমূর্ত্তি—বালকের বেশ ছিন্ন মলিন! মুখে কেমন করুণ ভাব! সুন্দর!

দেখিতে দেখিতে একটা অব্যক্ত বেদনায় তার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল—অলক্ষিতে তার চক্ষু হইতে বড় একফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া চিত্রের উপর পড়িল। ক্রমে দুইটী—তিনটী। আপনাকে সে আর কোনমতে সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমন ভাবেই খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তখনও সে ছবি দেখিতেছিল। চোখের জলে ছবি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল! এতক্ষণ কখন সে চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ তার একি মোহ!

তখন উষার প্রথম আলোকচ্ছটা ধরণীতে ব্যাপ্ত হইতেছিল। তাহারই একটী অস্পষ্ট

কণা খড়খড়ির ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে কক্ষমধ্যে বাতির আলোও ম্লান হইয়া আসিল।

রাস্তায় ময়লা গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে থলি ও মেঝেতে স্তূপীকৃত দ্রব্যাদির প্রতি চাহিতেই সব কথা তার মনে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে ছবিখানি দেয়ালে টাঙ্গাইয়া সে ভাবিল, "হা, ভগবান! ধন্য তুমি,—আজ রাত্রে এ কি নূতন পথ দেখালে! আজ হতে আমি নূতন মানুষ! আর আমার কোন লোভ নাই—অভাব নাই, আজ হতে আমি চুরি ছাড়লাম।" ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে সে অগ্রসর হইল। কে যেন তার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিল! দ্বারের নিকট আসিয়া সে দেখে, বাহির হইতে তাহা রুদ্ধ। আর সম্মুখে রিভলভার হস্তে দাঁড়াইয়া স্বয়ং গৃহস্বামী তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে!

গৃহস্বামী কহিল, "দাড়াও!" তার স্বর বজ্রগম্ভীর!

চোর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। চোরের দিকে রিভলভার তুলিয়া গৃহস্বামী হাঁকিল, "চুরি—চুরি করতে এসেছে, যাও যেমন বসেছিলে তেমন ভাবে বস, নইলে এখনি মাথা উড়িয়ে দেব!"

চোর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন, আমি সত্য কথা বলব—ঐ ছবি! এখানা চোখে না পড়লে কোন্ মুহূর্ত্তে আমি এ সব জিনিষ নিয়ে সরে পড়তাম! শুধু ঐ ছবি। ঐ ছবি খানিই আজ চোরের হাত হতে আপনার জিনিষপত্র রক্ষা করেছে!"

চোরের কথা শুনিয়া গৃহস্বামী রিভলভার নামাইয়া একপদ অগ্রসর হইল, বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ছবি,—কোন্ ছবি?"

চোর কহিল, "ঐ যে একটি ছেলে নদীর ধারে পাথরের উপর বসে, উস্ক-খুস্ক চুল —ছেঁড়া পোষাক—"

গৃহস্বামী কহিল, "ওগো! বুঝেছি সেই ছবি—ভালো, তোমার নাম? তুমি—" "ওয়েন মেরিডিথ—ঐ ছেলেটির মত আমারো একটি ছেলে–"

গৃহস্বামী অধীরভাবে কহিল, "তার নাম?"

চোর কহিল, "জিম্।"

গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইলেন। চোরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "ওয়েন মেরিডিথ্ তোমাকে এমন চোরের বেশে দেখব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি!"

শিশুর ন্যায় ওয়েন কাঁদিয়া উঠিল। পরে রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমার জিমের ছবি কেমন করে পেলেন?"

সুগভীর বেদনায় গৃহস্বামীর অন্তর আকুল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সে আজ চার বৎসর, ঠিক চার বৎসরের কথা—যখন আমি ঐ ছবি আঁকি। ঐ ছবিই আমার উন্নতির প্রথম সোপান—সে এক শুভ মুহূর্ত্তের কি উজ্জ্বল স্মৃতি! আমার স্ত্রী কিটি ও আমি বেড়াতে গেছলাম—দুজনে জিমকে দেখি,—আমি এই ছবি আঁকি— তারপর আমার জীবনের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেল—আজ কোথায় কিটি—এ ছবি আমাদের সেই মহা সুখের স্মৃতি—তাই

আবার আমি কিনে রেখেছি, ওয়েন আজ তোমাকে পেয়ে আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে! তোমার জন্য বাড়ীতে তোমার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু সকলে অধীর, তোমারই সন্ধান করছে। তোমার বন্ধু—"

ওয়েনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কহিল—"জানেন ত—খুনের দায়ে আমি,—"

"ওহো, সে তোমার ভুল, ওয়েন, রিজ মরেনি—বেঁচে আছে! তোমার দুঃখিনী স্ত্রী, আদরের জিম্, প্রাণের বন্ধু রিজ সকলে তোমারই জন্য আজ অধীর।"

ওয়েনের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, এ কি স্বপ্ন! উন্মাদের মত সে জড়িতস্বরে কহিল "রিজ, —রিজ বেঁচে আছে!—কি আশ্চর্য্য, আর আমি—"

সেমুর কহিল "তুমি চারটি খেয়ে নিয়ে আজই বাড়ী যাও—আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।"

শ্রীনরেন্দ্রমোহন চৌধুরী।

বিজ্ঞানের নূতন বাণী।

এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এই পার্থক্যটাই লক্ষ্য করিয়াছে যে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির দুয়ার পর্য্যন্ত মাত্র অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত হন, কিন্তু কবি সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে ধরা দেন না; তিনি প্রকৃতির গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রকৃতি অহরহ যে পাদপদ্মের দিকে তাহার অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রেরণ করিতেছেন তাহারই সন্ধান গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিক নাকি কবির এই কাজটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দেন—অন্ততঃ অনেকেই তাহা মনে করে। এই জন্যই কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের বিরোধ অনেকটা প্রবাদে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সেদিন আর থাকিবার নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানের কেবল কাঠামোটুকু লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা সেই পুরাতনটা লইয়াই আছেন। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা এই দলের। কিন্তু আজকাল যাঁহারা বিজ্ঞানের অন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা বিজ্ঞানের ভিতর হইতেই একটা বড় কথার সন্ধান পাইয়াছেন। তাহাতে কবির সহিত বৈজ্ঞানিকের সমস্ত বিরোধ দূর হইয়াছে, এবং দুইদিক হইতে দুইজনের লক্ষ্য যে একই দিকে ফিরিয়া আছে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখিবার সাধক। তিনি নানা প্রাকৃতিক ঘটনা লইয়া আলোচনা করিয়া তাহাদের সকলগুলির ভিতরে সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে যে সত্যটি কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া থাকেন। এই গুলিই তাঁহার বিজ্ঞান-সৌধ নির্ম্মাণের ইষ্টক। বৈচিত্র্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গরমিল দেখিয়া তিনি নিরাশ হন না, বরঞ্চ সেই গরমিলের মধ্যে মিল খুঁজিবার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম জাগ্রত হইয়া উঠে। লোকে

যেখানে কোনো মিল দেখে না বৈজ্ঞানিককে সেই স্থানেই মিল আবিষ্কার করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক যে নিয়মের সূত্রে নানা প্রাকৃতিক ঘটনাকে একত্র বাঁধেন সেগুলি এই ঐক্যের অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ। এই নিয়মগুলিই একটা ঘটনার সহিত আর একটা ঘটনাকে এবং অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যৎকে বন্ধন করিয়া ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বাঁধে। যে কারণে একবার যাহা ঘটিয়াছে, এখনো সে কারণে তাহাই ঘটে, ভবিষ্যতেও ঘটিবে। দশটি ঘটনা যে সুদৃঢ় নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘটে সেই নিয়মগুলিই বিজ্ঞানের প্রাণ।

এক সময় ছিল যখন লোকে বৃক্ষ হইতে ফলের পতনের কারণ এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি অব্যাহত থাকার কারণ যে একই তাহা কল্পনাই করিতে পারিত না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই দুই ঘটনার মধ্যেও ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে যে সৌর জগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের গতি যে ক্ষতিরহিত হইয়া অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে মহাকর্ষণই তাহার কারণ। সমগ্র সৌর জগৎটি যে সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি হইয়া আছে তাহা মহাকর্ষণ। পৃথিবীর অতি প্রচণ্ড বেগ সত্ত্বেও যে কারণে ভূপৃষ্ঠস্থ কোনো পদার্থই পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে না তাহাও মহাকর্ষণ। যে শক্তিতে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়া রহিয়াছে তাহাও আকর্ষণ। অত্যতি সূক্ষ্ম হইতে অত্যতি বৃহৎ ক্ষেত্রেও সেই এক মহাকর্ষণ শক্তি যে কাজ করিতেছে তাহাই আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান কি কম ঐক্যের সাধনার পরিচয় দিয়াছে?

জ্যোতিষীরা বলেন, আমরা আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি সূর্য্য। তাহাদের এক একটির চারিদিকে তাহাদের আপন আপন গ্রহগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ কথাও অসম্ভব নহে। এমন কথাও বলা হয় যে গ্রহ উপগ্রহ সহ আমাদের এই সৌর জগৎটি এমনিতর আরো কত কত জগতের সহিত কোনো এক অজ্ঞাত বৃহত্তর সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। নক্ষত্রগুলি আমাদের নিকট হইতে এত দূরে যে সে গুলির কোনোটিরই সহিত সৌর জগতের কোনো সম্পর্ক আজো স্থাপিত হইতে পারে নাই। এইটা হইলে বিশ্বাকাশকে একই সূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাইতাম। একদিন ছিল যখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে একটি মাত্র কারণে সৌর জগৎ এক হইয়া আছে এবং তাহার প্রতি অংশেরই গতি এরূপ নিয়মবদ্ধ; কিন্তু আজ সেটাও যে সত্য তাহাতে আমাদের কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইবার আর অবকাশ মাত্র নাই। একদিন হয়তো জানা যাইবে যে মহাকর্ষণই একমাত্র শক্তি যাহাতে কেবল সৌর জগৎ নহে, সমগ্র বিশ্বযন্ত্র সুনিয়মে চলিতেছে। তখন সৌরজগৎকে বিশ্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তখন দশ বিশটা পদার্থের মধ্যে যে ঐক্য দেখিয়া আমরা এত আনন্দ লাভ করিতেছি তাহাই আরো প্রসারতা লাভ করিয়া একটা মহা ঐক্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে।

জীব জগতেও এমনিতর একটা সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু এখনো কোনো কথা জোরের সহিত বলিবার সামর্থ জন্মে নাই। দারউইন্ বানরত্বকে মানুষের পূর্ব্বাবস্থারূপে নির্দ্দেশ করিয়া এই দুইটি জীবের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

দারউইনের পথে আজো কোনো মহা-ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারা যায় নাই সত্য এবং মহাকর্ষণের ভিতর দিয়াও আমরা কোনো পরম ঐক্যকে দেখি নাই সত্য কিন্তু আর এক স্থানে বৈজ্ঞানিক ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎকে তিনি এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন।

এতদিন এইটুকু মাত্র জানিতাম যে পরমাণুর সম্পাতে অণু এবং অণুর সম্পাতে পদার্থ গঠিত হইয়াছে। এক সময় ছিল যখন অণুতেই আমাদের গতিবিধি শেষ হইত, আরো সূক্ষ্মতায় যাওয়া কাহারো সাধ্য ছিল না। এ গণ্ডী এখন উত্তীর্ণ হওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান এই এক সত্য প্রচার করিয়াছে যে, ভৌতিক পদার্থের অণুগুলি অভৌতিক পদার্থের সম্পাতে গঠিত। সাধারণত যে যে গুণ থাকিলে আমরা কোনো কিছুকে পদার্থ বলি এই অভৌতিক পদার্থ গুলিতে সেগুলির কোনোটিই নাই। এ গুলি শক্তিকণা। সকল বস্তুরই অণু এই শক্তিকণার সম্পাতে গঠিত। এই সম্পাতের বিশেষত্ব অনুসারে পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব জন্মে। স্বর্ণ যাহা, রৌপ্যও তাহাই, আবার সামান্য অঙ্গার খণ্ডের উপাদান ও সেই একই শক্তি। একই এই জগতের উপাদন। ভূলোক, ভুবলোক এবং অন্তরীক্ষ একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

বিজ্ঞান এই এক শক্তিকে জগতের উপাদানরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিয়া ঐক্যের সাধনায় সিদ্ধির সংবাদ দিয়াছে। বিপুলভাবে এককে উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক কবির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব মিটাইয়া ফেলিয়াছে এবং উভয়েই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মূল এক।

বর্ত্তমান যুগ আমাদিগকে একটি একটি করিয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর উপলব্ধির মধ্যে লইয়া যাইতেছে। যে বিজ্ঞানকে এতদিন আধ্যাত্মিকতার শত্রু বলিয়া লোকে মনে করিত সেই আজ এমন এক নূতন বাণী প্রচারিত করিয়াছে যে তাহাতে ভগবদ্ভক্তের ঈশ্বরোপলব্ধি স্বতই সায় পাইতেছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সীতারাম।

সীতারামের ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রতাপাদিত্যের লীলাস্থল, সেই সোণার যশোহর আজ আর নাই। যে যশোহর একদিন সহস্র সহস্র যোদ্ধার হুঙ্কারে নিত্য মুখরিত হইত, অসি যষ্টি ও বন্দুক ক্রীড়ায়, মগ, ফিরিঙ্গি, পাঠান ও মোগলের ভীতি সঞ্চারিত করিত, সুপ্রসিদ্ধ গৌড় নগরীর যশহর—করিয়াছিল বলিয়া যাহা যশোহর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, যথাকার প্রতি পল্লী—প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম নির্ম্মিত, গোবিন্দদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ ও

কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উচ্চ শীর্ষ মন্দিরাবলীতে সুশোভিত ছিল, যেখানকার পল্লী, ছত্র, দেবমন্দির সমূহ একদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও অতিথিকে চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় আহারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিত, প্রতাপ এবং সীতারামের সুবিখ্যাত সেই রাজধানী আজ আর নাই। এখন তাহার কতক অংশ সমুদ্র গর্ভে নিহিত, কতক অংশ বা গভীর অরণ্যে পরিণত; অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাহা ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আজ সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই—আছে কেবল তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু।—সেই স্মৃতিটুকু লইয়াই আমরা ধন্য। ইতিহাসের উজ্জ্বল অক্ষরে সেই ক্ষীণ আলোকটুকুও যদি স্থায়ী করিতে পারি তবেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হইবে।

দুঃখের বিষয় অতীত ইতিহাস এ সব কথা বড় বলে না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এ সকল বীরের কথা ফুৎকারে নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সীতারামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ আমরা যশোহরবাসী জানি না। কেহ কেহ বলেন যে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "যশোহরের বিবরণী"তে তাহাই লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত পক্ষীয় ব্যক্তিগণ Long's Selections from the records of Government নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ঐ কথা বলেন।

"যে পত্রে আপনি রোজ সাহেব নামক ইংরাজ সওদাগরের নৌকা লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন সে পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। বাথরগঞ্জের নিকট যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে এবং ডাকাইতগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহাও আপনার পত্রে অবগত হইয়াছি। আপনার অনুরোধানুযায়ী যাহাতে উক্ত জমিদার ঐ লুণ্ঠিত সম্পত্তি ফেরত দেন ও ঐ অঞ্চলে যাহাতে আর দস্যুভয় না থাকে তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিতে সৈয়দ রেজা খাঁকে অন্য পত্র দিয়াছি।" (কলিকাতার শাসনকর্ত্তার নামে নবাবের পত্র) [প্রথম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা]। ঐ খণ্ডের ৩৮৭, ৩৮৮ এবং ৩৮৯ পৃষ্ঠায় পুনরায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে গবর্ণর মহাশয় নবাবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও মর্ম্ম এইরূপ—"পূর্ব্বেই আপনাকে রোজ সাহেবের নৌকা-লুট ও তাঁহার মৃত্যুর কথা এবং দস্যুগণ যে সীতারামের জমিদারীতে আশ্রয় লইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। আমি একজন ইংরাজকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে সীতারামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম কিন্তু উক্ত জমিদার এই দূতকে গ্রাহ্যই করেন নাই!" এইত গেল এক কথা।

দ্বিতীয়তঃ, ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় একটী প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয় তাহার সহিত দয়ারাম প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং সীতারামের পরাজয়ের পর দয়ারাম নবাব কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া-

ছিলেন। (কলিকাতা রিভিউ ১৭৮৩ সনের জানুয়ারী)। লং সাহেবের পুস্তকে উপরোক্ত রোজ সাহেবের মৃত্যু-ঘটনা বিবৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দয়ারাম সংক্রান্ত একটী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে গবর্ণর কর্তৃক লিখিত পত্রে জানা যায় যে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ উইলিয়ামসন্ গবর্ণরকে অবগত করিয়াছিলেন যে, রামপুর বোয়ালিয়া হইতে নৌকাযোগে কোম্পানির ১০০ শত মণ রেশম আসিতেছিল কিন্তু দয়ারাম ঐ রেশম আটক করেন। এই সকল ঘটনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে সীতারাম এই সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ, উপর্য্যুক্ত সীতারাম যদি আমাদেরই সীতারাম হন, তবে বলিতে হইবে যে কোম্পানির দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্তির ২।১ বৎসর পূর্ব্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে তাহা সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ সীতারাম মুর্শীদকুলীখাঁর আমলেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর্শীদকুলিখাঁ ১৭০৪ হইতে ১৭২৫ পর্য্যন্ত বাংলার গদী উপভোগ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সীতারাম তাঁহার দেওয়ান যদু মজুমদারকে যে সনন্দ প্রদান করেন তাহাতে ১১১৪ সনের ২৫ বৈশাখ তারিখ আছে। এই বাংলা তারিখ ইংরাজী ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয়তঃ, সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত দশভূজা মন্দিরে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ছিল—

"মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ং
অকারি শ্রীমতাসীতারামরায়েণ মন্দিরং।"

অর্থঃ—মহী এই স্থলে '১'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহী বা পৃথিবী মাত্র একটী—সেইজন্য মহী=১

ভুজ—এই স্থলে '২'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভুজ বলিতে দুই বা দুই বুঝায় সেইজন্য ভুজ=২

রস—এই স্থলে '৬'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। রস ছয়টী। সেইজন্য রস=৬

ক্ষৌণী—এই স্থলে (১)র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষৌণী বা পৃথিবী মাত্র একটী—সেইজন্য ক্ষৌণী=১।

ইহা হইতে আমরা ১,২,৬,১, এই অঙ্ক চারিটী সজ্জিত করিয়া ১২৬১ শকে যে এই মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি। ১২৬১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে নিম্নলিখিত শিলালিপি ছিল।

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূমিতে
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে সীতারামেণ মন্দিরং।"

অর্থাৎ তর্ক (ন্যায় (৬)), অক্ষি (২,), রস (৬), ভূমি (১) হইতে আমরা ১৬২৬ শকের নিদর্শন পাই। এই শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারামকে টানাটানি করিতে চান, তাঁহাদের যুক্তি ভ্রমসঙ্কুল।

ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার "বাংলার ইতিহাসে" সীতারামের নিম্নলিখিত কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ষ্টুয়ার্টের বর্ণিত কাহিনীর স্থূলবৃত্তান্ত পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম।

"আবু তোরাব নামক একজন সদ্বংশজাত ওমরাহ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়, ভূষণার নিকট সীতারাম নামক একজন অবাধ্য জমিদারের অধীনে অনেকগুলি দস্যু থাকিত। সীতারাম ইচ্ছানুযায়ী নিজ লোকজন সহায়তায় ডাকাতী করিতেন। আবুতোরাব এই দুর্দ্দান্ত দস্যু দমন মানসে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করা
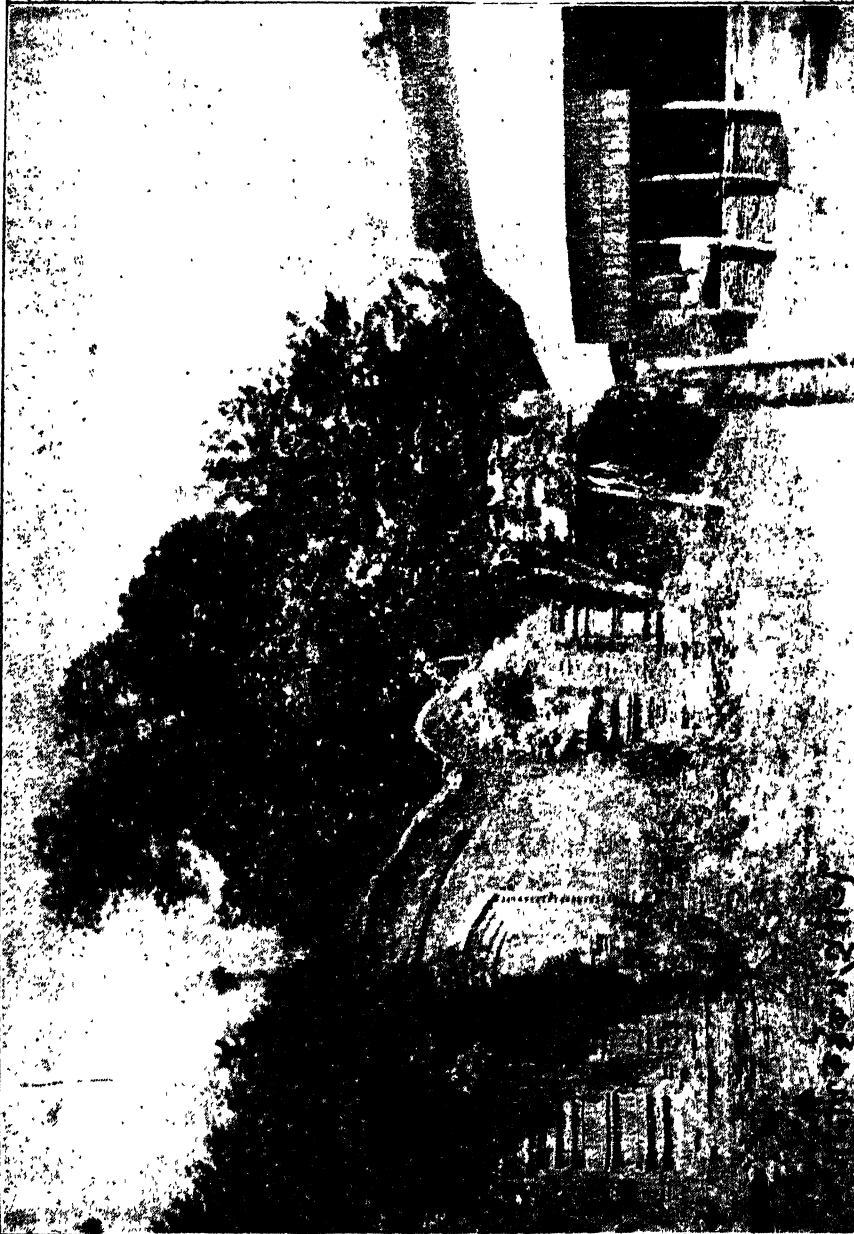
দশভুজা মন্দির।

সত্ত্বেও নবাব তাঁহাকে কোন সাহায্য প্রদান করেন নাই। অবশেষে, এই দস্যুকে ধৃত করিবার জন্য ফৌজদার পিরখাঁ নামক তাঁহার একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সীতারাম এই সংবাদ পাইয়া নিজ আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন

লক্ষ্মীনারায়ণ

ঘটনাচক্রে ফৌজদার আবু তোরাব এই স্থলেই মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন এবং সীতারাম পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার অধীনস্থ দস্যুগণ আবু তোরাবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করে। সীতারাম এই ঘটনায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন এবং আবুতোরাবের মৃতদেহ তাঁহার অনুচরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করেন। আবুতোরাবের অনুচরগণ মৃতদেহ ভূষণার নিকটেই কবর দেয়।

নবাব, আবুতোরাবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বক্স ইলাহি খাঁ নামক সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ইলাহি খাঁকে সাহায্য করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী জমিদারদিগকে পরোয়াণা প্রেরণ করেন। সীতারাম সপরিবারে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। সেইস্থানে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার পরিবারবর্গকে বিক্রয় করা এবং সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়।"

ষ্টুয়ার্ট সাহেব যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা উপন্যাস হইতে পারে কিন্তু আমরা ইহাকে ইতিহাসে পরিগণিত করিতে পারি না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন যে "The tanks and temples and ruins at Muhammadpur consi-t far better with the local legend than with the Muhammadpur account." অর্থাৎ সীতারামকৃত দীর্ঘিকা, মন্দির এবং মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সীতারাম সম্বন্ধীয় প্রবাদই সত্য।

ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব * যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমরা সেই বৃত্তান্তকেই মোটের উপর সত্য বলিয়া গণ্য করি এবং তাহাই আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গদেশে এই সময় দ্বাদশটী ভূঁইয়া ছিলেন। এই ভূঁইয়াগণ এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং বাদসাহ বা তাহার প্রতিনিধি নবাবকে বিশেষ গণ্যমান্যও করিতেন না বা নিরূপিত রূপে রাজস্বও প্রেরণ করিতেন না। সম্ভবতঃ কোন এক ভূঁইয়াকে শাসন করিবার জন্যই হোক বা ফতেয়াবাদ স্থিত কোন পাঠান ওমরাহকে দমন করিবার জন্যই হোক নবাব সায়েস্তাখাঁ কর্ত্তৃক সীতারাম বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া ছিলেন। তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়াতেই পুরস্কার স্বরূপ নলদী পরগণা লাভ করেন। এবং সম্রাট আউরংজীব তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করিয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সম্রাট প্রদত্ত ফার্ম্মাণসহ সীতারাম মুরশীদকুলি খাঁর নিকট পৌঁছিয়া রীতিমত নজর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে নবাব তাঁহাকে কয়েক বৎসরের জন্য ঐ সকল ভূমি নিষ্কর দখল করিতে অনুমতি প্রদান করেন। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদপুর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। কি কারণে হিন্দু-কুলতিলক সীতারাম তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করেন তাহা সঠিক

* Mr. Blochman supposes him to be one of the descendants of successors of the equally notorious Mokund, who possessed the Sirkar of Fathabad and Pergunna of Bhoosna..—Ibid.

রামসাগর

জানা যায় না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে সীতারাম যেস্থানে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মাণে মনস্থ করেন,সেই স্থানে এক ফকীর বাস করিতেন। সীতারাম ফকীরকে ঐ স্থান পরিত্যাগে অনুরোধ করিলে ফকীর অস্বীকার করেন। পরে, অনেক অনুরোধ উপরোধে স্থান পরিত্যাগে স্বীকৃত হন কিন্তু সীতারাম ফকীরের নামানুযায়ী ঐ স্থান মহম্মদপুর নামে আখ্যাত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। জনশ্রুতি এইরূপও শোনা যায় যে, মহম্মদ আলি নামক এক ফকীর সীতারামকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ও আবশ্যক মত উপদেশাদি প্রদান করিতেন। নব-রাজ্য সংস্থাপনোন্মত সীতারামকে তিনি উপদেশ দিলেন যে সীতারাম হিন্দু হইয়া যদি মুসলমান-পয়গম্বরের নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলে মুসলমান প্রজাও সন্তুষ্ট হইবে। এই নূতন রাজা যে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই অপত্যনির্ব্বিশেষে ও নিরপেক্ষভাবে দেখিবেন, ইহা তাহারা বুঝিবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস সীতারামে এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন।*

প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ একদিন অশ্বারোহণে এই স্থান দিয়া যাইবার সময় তাঁহার অশ্বক্ষুর কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যায়। বহুকষ্টে অশ্বপদ কর্দ্দম হইতে উঠান হইলে দেখা গেল যে অশ্বক্ষুর ত্রিশূলে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অনুসন্ধানে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাও এইস্থানে পাওয়া গেল। অন্য একটী প্রবাদ এইরূপ যে সীতারামের অশ্বই এই ত্রিশূলে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং সেইজন্য সীতারাম এই স্থলেই রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন।

সীতারাম রাজা হইয়া অন্যান্য ভূঁইয়াদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। মেনাহাতী, বক্তার, ফকীর মাছকাটা, রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি সৈনিকদিগের তত্ত্বাবধানে তাঁহার বহু সৈন্যদল সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহ হইতেই এই সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল। সীতারামের সৈন্যদলমধ্যে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ২।১টী স্থলে এখনও ক্ষত্রিয়-বাস আছে।

এই অঞ্চলে তখন আবুতোরাব নামক এক ব্যক্তি নবাবের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সীতারাম রায়ের উন্নতি সহ্য করিতে পারিলেন না। গৃহশত্রু সীতারামের উকীলও গোপনে আবুতোরাবকে সকল অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। ফলে,

* "The ruins at Mohamadpur called after Mahmud Shah, the twelfth king of Bengal wrongly designated by Mr. Westland Muhammadpur. They all belong to the period of Sitaram Rai, the notorious Zeminder of Bhoosnah, styled by the writer of the Report Raja"...Calcutta Review CXXV. রেণী সাহেবের এ ব্যঙ্গোক্তিতে ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন ইহা সকলেই অবগত আছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সীতারাম নামে এক নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে "সন্তোষ রঙ্গমঞ্চে" ইহার অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাটকখানি প্রকাশিত হইলে সীতারাম সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারিব।

আবুতোরাব দলবলসহ সীতারামকে আক্রমণ করিলেন। সীতারাম প্রস্তুত ছিলেন। এ যুদ্ধে বাঙ্গালীর নিকট আবুতোরাব পরাস্ত হইলেন। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ মেনাহাতী তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সীতারামকে উপহার প্রদান করিলেন। বক্স ইলাহিখাঁর অধীনে আবার সৈন্য প্রেরিত হইল। সীতারাম এই যুদ্ধে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ

সীতারামের দুর্গাবশেষ।

কালা খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক ২টী কামান দ্বারা মুসলমানবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। জয়শ্রী সীতারামকে জয়মাল্য দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলেন না।

এই দুই যুদ্ধের ফলে সীতারাম বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার "মস্তকের জন্য" পুরস্কার ঘোষিত হইল এবং সীতারামকে সমূলে দলন করিবার জন্য সিংহরাম নামক এক প্রথিতনামা সেনানী প্রেরিত হইলেন। গুপ্তচরে সিংহরামকে সংবাদ দিল যে মেনাহাতী যতদিন জীবিত আছেন ততদিন সীতারাম অপরাজেয়। তাই মেনাহাতী একদিন যখন দোলমঞ্চ সমীপে সন্ধ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে সিংহরাম সমীপে আনয়ন করা হইল। নিরস্ত্র বীর আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলেন না। প্রবাদ এই, মেনাহাতী নিজ শরীরে গুপ্তভাবে একপ্রকার ঔষধ ধারণ করিতেন। সেই ঔষধপ্রভাবে কোনপ্রকার অস্ত্রই তাঁহার শরীরে ক্ষত করিতে পারিত না। কিন্তু বেদনা নিবারণের কোন উপায় তিনি জানিতেন না। তাই যখন শত্রুপক্ষীয় সৈনিকগণ তাঁহাকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, তখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি ঔষধের কথা ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ছিন্নশির নবাব সমীপে প্রেরিত হইলে নবাব এরূপ বীরের এই শোচনীয় মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে ইহাঁকে জীবন্ত ধৃত করিয়া আনাই সমীচীন ছিল।

মেনাহাতীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সীতারাম মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তত্রাপি তিনি সিংহরামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সিংহরামকে পরাস্ত করিলেও তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সিংহরাম তাঁহার দুর্গাধিকার করিলেন।

সীতারামের মৃত্যু কাহিনীর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন যে দুর্গ আক্রমণ কালে সীতারাম বীরের ন্যায় মুসলমান বাহিনীর গতিরোধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অন্য প্রবাদ,—ফকীর মহম্মদ আলি তাঁহার এক শিষ্যকে সীতারামের রাজপোষাকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মুসলমানসৈন্যগণ সীতারাম হত হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া পড়িলে ফকীর সীতারামকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে লইয়া শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে জীবন দান করেন।

আমরা সংক্ষেপে সীতারাম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু মহাপুরুষের কাহিনী সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় বিবৃত করা সম্ভবপর নহে। বারান্তরে এই বীরের কাহিনী আরও পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। অন্য কেহ সীতারাম ও যশোহরের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধারে আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরা কৃতার্থ বিবেচনা করিব।*

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

* বহু দিন পূর্ব্বে যশোহরের ইতিহাসের জন্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলাম। গৃহদাহে সবই ভস্মীভূত হইয়াছে। আবার এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা জাগিয়াছে। কিন্তু সমগ্র যশোহরবাসীর আন্তরিক ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত এ কার্য্য অসম্ভব—তাই সকলের নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

তরু দত্ত।

"Full many a flower is born to
blush unseen,
And waste its sweetness on the
desert air." Gray.

কবি তরু দত্তের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার কবিতার সহিত আমরা বঙ্গীয় পাঠকের পরিচয় সাধন করিব মাত্র।

তরুবালা ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় রামবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। অব্জ, অরু এবং তরু তিন ভগ্নী, তন্মধ্যে তরু সর্ব্ব-

কনিষ্ঠা। তের বৎসর বয়সে তরু পিতার সহিত য়ুরোপ ভ্রমণে গমন করেন এবং ফ্রান্স ও কেম্ব্রিজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঁচ বৎসর য়ুরোপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিদেশ ভ্রমণের এরূপ সুযোগ কুমারী তরুর ন্যায় অপর কোন ভারত রমণীর ভাগ্যে সচরাচর ঘটে না। য়ুরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দৈনিক লিপিতে লিপিবদ্ধ রাখিতেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাইতে ও গান করিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সেক্সপিয়র, মিল্টন, গেটে, ভিক্টর হিউগো, ব্রাউনিং প্রভৃতির কাব্য পাঠ করিতেন। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় লিখিত বহু কবিতা ও গল্প তিনি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। বিদেশীয় ভাষা সুন্দররূপে আয়ত্ত করা ও সেই ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। মিল্টন ইতালীয় ভাষায় এবং সুইনবর্ণ ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরদেশীয় ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করার দৃষ্টান্ত সাহিত্য জগতে অপর এই দুইটী ভিন্ন আর বড়-একটা দেখা যায় না। তরুবালা ইংরাজী ভাষায় বহু কবিতা লিখিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিকদিন এ সংসারে রাখিলেন না। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, ২১ বৎসর মাত্র বয়সে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে অমর কবি Keats এর কথা মনে পড়ে। তরুর নিজের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"A creature of the starry skies,
Too lovely for the earth to keep."

তরুদত্তের বাল্যরচিত কবিতার কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্যও নহে। কতকগুলি নিতান্ত অপরিপক্ব, গাম্ভীর্য্য-বিহীন, এবং দোষ বহুল। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবের কিরূপ বিকাশ হয় তাঁহার কবিতা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষভাগে লিখিত কবিতাবলী হইতে যথার্থ কবিত্বরসের আস্বাদ যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকেরাও জানেন সেক্সপিয়রের 'Midsummer Night's Dream' এবং 'Hamlet' এ রচনার কিরূপ প্রভেদ। সকল কবির সম্বন্ধে এই একই কথা খাটে।

তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার রচনায় কবিত্বের একটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তাঁহার রচনা স্বতঃই সরল, অনাড়ম্বর এবং কবিতার ছন্দ মধুর ও সাবলীল।

'Ancient Ballads and Legends of Hindustan' নামক গ্রন্থটীতে হিন্দুদিগের কতকগুলি পুরাতন গল্প মধুর ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ হিন্দু রমণী না সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হন? তরু দত্ত এইরূপ বহু প্রচলিত ভারতীয় গল্প তাঁহার সুললিত ভাষায় নূতনতর করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

'Royal Ascetic and the Hind' কবিতায় নির্জ্জন কাননে কিরূপে একজন বানপ্রস্থাবলম্বী সম্রাটের মন একটী মৃগশাবকের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিয়া কবি মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতার একটী হৃদয়গ্রাহী চিত্র প্রদান করিয়াছেন। সম্রাটের মৃত্যুকালে মৃগশিশুটী সজলনয়নে, পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মলিনমুখ শিশুরই ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে! কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী বর্ণনা! কবির প্রতিপাদ্য, কেবল কঠোর শারীর নির্য্যাতন দ্বারা দয়ার আধার ঈশ্বরকে পাইবার চেষ্টা করা ভুল। গল্পের এই মর্ম্মার্থটুকু শেষে সুন্দর-রূপে কয় ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"Not in seclusion, not apart from all,
Not in a place elected for its peace,
But in the heat and bustle of the world,
'Mid sorrow, sickness, suffering, and sin,
Must he still labour with a loving soul
Who strives to enter through the narrow gate."

তাঁহাকে পাইতে হইলে সংসারের দুঃখ, দৈন্য, বেদনা সমস্তই বরণ করিতে হইবে। তিনিই সমস্ত, কাজেই সমস্তকে স্বীকার না করিলে তাঁহাকে স্বীকার করা হয় না, তাঁহাকে পাওয়াও যায় না।

ধ্রুবোপাখ্যানটী এই মণিকাঞ্চনময় কাব্য-কুসুম মালার একটী উজ্জ্বল রত্ন। বালক ধ্রুব তাহার পিতার ক্রোড়ে উঠিবার আশায় পিতার নিকট গিয়া রাজার প্রিয়া ভার্য্যা মুখরা সুরুচির তাড়নায় ক্ষুব্ধ হইয়া মাতার নিকট ক্রন্দন করিতেছে। সুনীতি তাহাকে বুঝাইলেন—

"The sins of previous lives must bear their fruit."

কিন্তু কর্ম্মফলে মানুষ কষ্ট পায়, ধ্রুবের মন এ কথায় ভুলিল না, তাহার উত্তর কি বীরত্ব-পূর্ণ!

"There is a crown above my father's crown,
I shall obtain it, and at any cost
Of toil, or penance, or unceasing prayer."

কঠোর অধ্যবসায়, কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত এবং অবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা দ্বারা—কিম্বা যেমন করিয়াই হউক সে পিতার মুকুট লাভ করিবেই।

"Well kept the boy his promise made that day!
By prayer and penance Dhruba gained at last
The highest heavens, and there he shines a star!
Nightly men see him in the firmament,"

ধ্রুব আপনার কথা রাখিয়াছিল। স্বর্গলোকের শীর্ষদেশে আজো সে অপূর্ব্ব আলোকে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিতেছে।

সিন্ধু, বটু, প্রহ্লাদ, সীতা প্রভৃতি কবিতা-গুলির ছন্দ যেমন মধুর ভাবও তেমনি সুগম্ভীর! প্রবন্ধবিস্তারের আশঙ্কায় এগুলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা দমন করিতে হইল।

'Our Casurina Tree' কবিতাটি অতি সুন্দর! কবি বলিতেছেন,

"Dear is the Casurina to my soul :
Beneath it we have played ;
though year may roll,
O sweet companions, loved
with love intense,
For your sakes shall the tree
be ever dear !
Blent with your images,
it shall arise
In Memory, till the hot tears
blind mine eyes !"

কবি অতীত স্মৃতিতে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্টবন্ধনে আবদ্ধ! গাছটির ছায়ায় কেমন করিয়া একদিন সঙ্গীদের সহিত আনন্দে কাল কাটাইয়াছেন সেই শৈশবের স্বর্গসুখের দিন স্মরণ হওয়ায় গাছটি কবির নিকট কি এক অভিনবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে!

তরু দত্তের প্রকৃতি-বর্ণনা বড়ই সুন্দর। 'Ancient Ballads'এর কবিতাবলী পারিজাতকুসুমমাল্যের ন্যায় সদাই নূতন। যত পাঠ করা যায় প্রতিবারই নব নব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

'A sheaf gleaned in French fields' নামক গ্রন্থ chateaubriand, Heine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Dupont, Gramont প্রভৃতি নানা বিখ্যাত (অধিকাংশ ফরাসী) কবির অনুবাদ সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে মূলের ভাব ও সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া কবি নিজের কবিত্বেরও প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন।

'The young Captive' (Andre Chenierএর অনুবাদ) কবিতার নায়িকার চক্ষে মানবজীবনই সৃষ্টিকর্ত্তার শ্রেষ্ঠ দান। তাহার উক্তি কি কারুণ্যে পূর্ণ—

"At the banquet of life
I have barely sat down,
My lips have but pressed
the bright foaming Crown
Of the wine in my cup
bubbling high.
* * *
O Death, thou canst wait ;
leave, leave me to dream ;
* * *
The world has delights,
the Muses have songs,
I wish not to perish too soon"

সে আজো জগৎপিতার শ্রেষ্ঠ দানটির সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে নাই, এখনো যে সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই! কবির নিজের জীবনদীপটি এমনি অকালে নিভিয়া গিয়াছিল!

ভিক্টর হিউগোর 'Universal Republic' কবিতা বেশ সুচারুরূপে অনূদিত হইয়াছে। ইহাতে টেনিসনের "Parliament of man, the Federation of the world"এর মত মানবের ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃভাবের কথা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

"Rancour and hatred are effaced
One picture in all hearts is traced,
One purpose animates all minds ;
Equality—no king, no chief."

পাঠ করিলে Shelleyর ছত্রগুলি মনে পড়ে—

"The loathsome mask has fallen,
the man remains—
Sceptreles, free, uncircumscribed,
but man :
Equal, unclassed, tribeless,
and nationless."

সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের ভাব চলিয়া গিয়াছে। কোথাও আর বাধা নাই ; শাসকের দণ্ড কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে ! বিশ্বে আর শ্রেণী নাই, জাতি নাই—সকলেই সমান !

'To a bereaved mother' (Jean Reboul এর অনুবাদ) কবিতায় শোকাকুলা মাতাকে পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ পাওয়া যায় না—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" প্রভৃতি কথায় দেবদূত শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—

"Here never is an unmixed joy,
Distinct from suffering and from pain,
Nothing, alas, without alloy ;
No smile but has its sigh again.

বাল্যকালাবধি তরুবালার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিবেন এবং চিত্রবিদ্যাকুশলা ভগ্নী অরুবালা তাহার চিত্র অঙ্কন করিবেন। এই উপন্যাসখানি ফরাসীভাষায় এবং দৈনিকলিপির আকারে লিখিত হইয়াছে। ইহা ফরাসীদেশের একটি চিত্র, এবং নায়কনায়িকাগণও সেই দেশীয়। এখানি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

ইংরাজদিগের মধ্যে Elizabeth Barrett Browning প্রভৃতি অনেক মহিলা স্বীয় ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া যশোলাভ করিয়াছেন। একজন বঙ্গ-মহিলা যে ইংরাজী ও ফরাসীভাষায় এরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Edmund Gosse তরুবালার 'Ancient Ballads' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে বিদেশীয় সাহিত্যে তরুবালার স্থান কত উচ্চে।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

ভারতীয় চিত্রের আদর্শ আমরা পাই, প্রথমত বৌদ্ধ গুহা থেকে, দ্বিতীয়ত—মোগল রাজাদের প্রাসাদ এবং পুস্তকে অঙ্কিত চিত্রাদি থেকে।

আমরা এখন দেখাতে চাই, এই বৌদ্ধ-যুগের আর মুসলমান যুগের ছবির মধ্যে কি কি বিষয়েই বা পার্থক্য এবং কি কি বিষয়েই বা ঐক্য আছে। মূলে দেখ্‌তে গেলে আমরা দেখি, উভয় শিল্প প্রায় একই নিয়মে রচিত। পাশ্চাত্য শিল্পের মত ওগুলি শুধু আলো ও ছায়ার খেলা দেখিয়ে পালাতে চায় না ; ওরা ভাব ফুটিয়ে তোলবারই কেবল চেষ্টা করে। যাঁদের ধারণা, স্বভাবের হুবহু নকল করার নাম,

অথবা কাগজে থিয়েটার দেখানরই নামই চিত্র-শিল্প, তাঁরা যদি অজন্তা গুহায় পদার্পণ করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁদের সে ভুল বিশ্বাস দূর হবে! একদিকে তাঁরা সুবৃহৎ চিত্র-ভাণ্ডার গুলির অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন, অন্যদিকে আমাদের দেশে শত-সহস্র বৎসর আগে এইরকম সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছিল বলে—আত্মগৌরবে অভিভূত হয়ে পড়বেন।

অজন্তার শিল্পীরা যে সমস্ত পরিকল্পিত চিত্রে গিরি-গুহা পরিশোভিত করে রেখে গেছেন সে সমস্তগুলির শুধু নকল করতে পারাও বিশেষ ক্ষমতার কায। এমন কি আমরা শুনেছি বিলাতের বড় বড় শিল্পিরাও সুন্দররূপে তার দুএকটা ছবিরও সামান্য প্রতিলিপি করে উঠ্‌তে পারেননি। বিশেষত ছবির যেখানে প্রাণ, অর্থাৎ ছবির আসল ভাবটা একেবারেই বজায় রাখ্‌তে পারেননি। মোগলশিল্পও ইংরাজ চিত্রকরগণের কাছে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! একটা নখের মত স্থানের মধ্যে সংখ্যাতীত কারু শিল্প যে কি করে দেখান যায়, তা' তাঁরা বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। সূক্ষ্ম কারু-শিল্প বিষয়ে মোগল শিল্প শ্রেষ্ঠ; আর বৌদ্ধ শিল্প ভাব পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রধান।

আমরা যখন গিরি-গুহায় প্রবেশ ক'রে সর্ব্বপ্রথম সেই অনন্ত অসংখ্য কারু-শিল্প দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল, এই সকল কাজ না জানি কত যুগ ধরে কতশত শিল্পী মিলে এঁকেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যতই সেগুলি দেখ্‌তে লাগলুম ততই আমাদের মনে হ'তে লাগ্‌ল, যেন অবলীলাক্রমে নির্ঝরের মত এই সকল বিচিত্র কারুশিল্পসমূহ শিল্পিগণের অন্তর হতে প্রবাহিত। সেগুলো তখন দেখ্‌লে আর মনেই হত না যে,সে সব অনেক মাথা ঘামিয়ে বা বহু পরিশ্রমে আঁকা! যেন আলাদিনের প্রদীপের গল্পের মত সে এক বিচিত্র ব্যাপার! এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন সূর্য্যালোক গুহাগুলো আলোকিত করত; তখন, গুহার দেয়ালের ছবিগুলি আলোতে যেন প্রাণ পেয়ে সজীব হ'য়ে উঠে আমাদের চোখে সে যে কি বিস্ময়ময় সৌন্দর্য্যের অবতারণা কর্‌তো তা বলা অসম্ভব! সে ব্যাপার যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনিই কেবল বুঝতে পারেন। দেয়ালের কোথাও রাজারাণী পারিষদবর্গে বেষ্টিত হ'য়ে সিংহাসনে ব'সে, কোথাও রাজ্যাভিষেক,—বাইরে ভিখারী বিদায় হ'চ্চে, কোথাও গান-বাজনা,—বেণু-বীণা বাজিয়ে নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা আসর জমিয়ে তুলেচে; কোথাও বা রাস্তায় রাস্তায় ঢোল মৃদঙ্গ নিয়ে সংকীর্ত্তন বেরিয়েছে, এই রকম আরও শত শত চিত্র এক সঙ্গে চোখের উপর ফুটে উঠে আমাদের যেন কোন্ এক নূতন অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যেত। প্রথম প্রথম আমরা কোন্‌টা ছেড়ে যে কোন্‌টা দেখ্‌বো ভেবে ঠিক্ কর্‌তেই পার্‌তুম না! মনে হত যেন কি এক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মধ্যে পড়ে আত্মহারা হয়ে পড়্‌চি! মোগল চিত্র দেখে এরকম ভাব আমাদের কখনও হয়নি। মোগল চিত্র চোখের সামনে ধরে তার মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার করে তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মোগলচিত্রে আমরা প্রধানত বিলাস ও

ক্রীড়ার ভাবই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত! এমন কি যুদ্ধ বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে। তা'হলে বুঝতে হবে মোগলশিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধ শিল্প শান্তিময়। মোগলদের
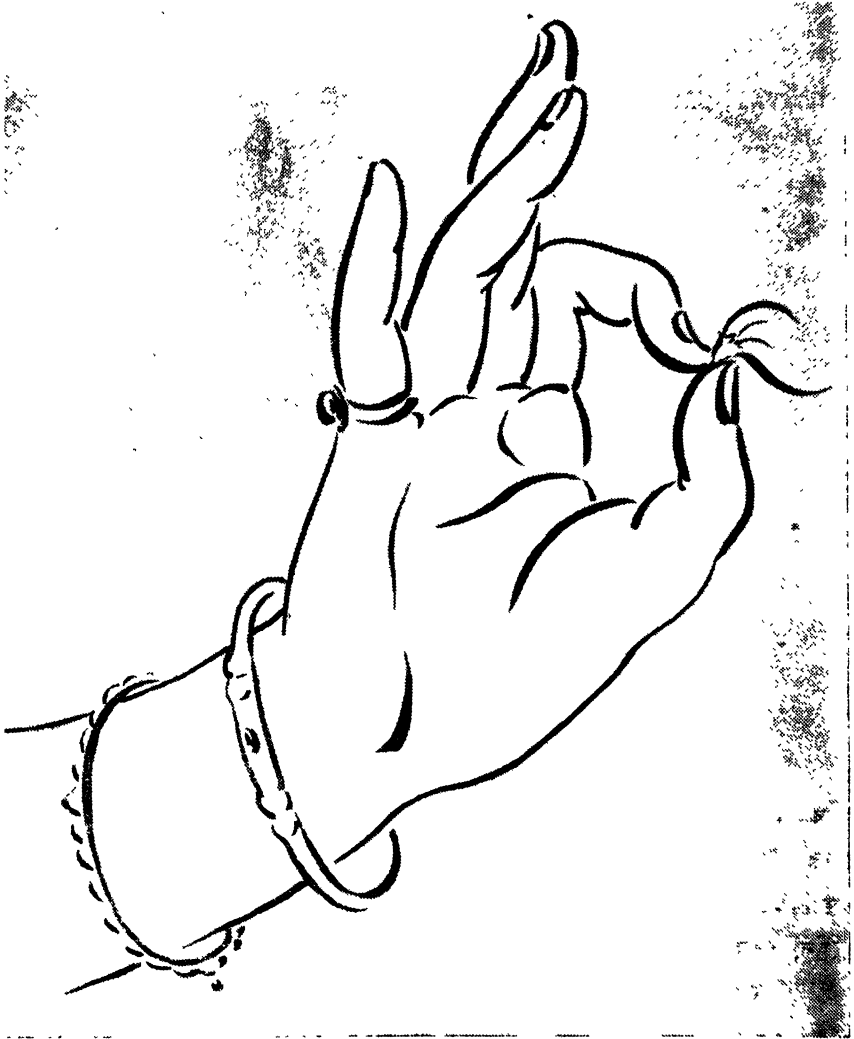
চিত্ররচনা প্রণালী ও বৌদ্ধ শিল্পিদের চিত্র-রচনা প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মোগল শিল্পিরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্ন নিয়ে ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন বৌদ্ধশিল্পীরা সেটা দুই চারটা সরু-মোটা রেখার টানে দেখিয়ে দেন। বৌদ্ধশিল্পী অঙ্কিত উপরের ছবিখানি দেখলে সেটা বোঝা যাবে। অজন্তাচিত্র

বর্ণসমাবেশেও অতি মনোরম!* তার প্রতিবর্ণ যেন চোখে স্নিগ্ধ শীতল ভাব আনে। মোগল কিম্বা অন্য কোন শিল্পে সে রকমটা প্রায় দেখা যায় না! বৌদ্ধ আর মোগলচিত্র উভয়েরই রঙের একটা প্রধান গুণ, শত শত বৎসরের পুরাতন মোগল ছবি এবং সহস্র বৎসরের জীর্ণ বৌদ্ধ ছবিগুলির কোনোটারই বর্ণের অদ্যাপি কোন রকম পরিবর্ত্তন ঘটেনি। সেগুলি যেন চিরনবীন! দেখলে হঠাৎ মনে হয়, এইমাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল! স্বভাবত পরিবর্ত্তনশীল রঙের মধ্যে সাদা আর নীল রংগুলি অজন্তার ছবিতে এখনও এত পরিষ্কার-রূপে বর্ত্তমান যে, ইংরাজ দর্শকেরা সে যে সহস্র বৎসরের পুরাতন রং, একথা মোটেই স্বীকার করতে চান না! তাঁরা বলেন, পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা সংস্কারের সময় ওগুলিতে নূতন করে রঙ দিয়েছিলেন। যাই হক্, ভারতীয় চিত্রের রঙ যে ইউরোপীয় তৈলচিত্রের চেয়ে স্থায়িত্বে শ্রেষ্ঠ সেকথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বৌদ্ধ শিল্পিদের অসীম ধৈর্য্য দেখলেও স্তম্ভিত হতে হয়! সেই অবরুদ্ধ অন্ধকার গুহার ভিতর নানান অসুবিধার মধ্যে বিশেষত ছাদের নীচে (ceiling) যে কি করে ঐ সমস্ত বিস্ময়কর ও নয়নানন্দ কারুকার্য্য করে গেছেন, এখন তা বোঝাই অসাধ্য। এ বিষয়ে মোগল চিত্রকর অথবা অন্য কোন দেশের চিত্রকরকেই এতটা কষ্ট স্বীকার করতে দেখা যায় না। আলঙ্কারিকশিল্প(decorative art) সম্বন্ধে বৌদ্ধশিল্পী এবং মোগল শিল্পিগণ প্রায় সমকক্ষ। অজন্তা গুহার শীর্ষদেশ সজ্জা (ceiling decoration) এক বিচিত্রকাণ্ড! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন মাথার উপর একখানি বহুমূল্য শালের চাঁদোয়া টাঙান রয়েছে! প্রত্যেক চাঁদোয়ার মধ্যে একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেত পদ্ম বিকশিত; আর চারিধারে গোলভাবে সজ্জিত সারি সারি হাঁস, কিম্বা ময়ূর, অথবা মৃণাল দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল; এবং চার কোণে নানারকম লতা-পাতার কাজ। সেগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ অর্থ আছে তা দেখলেই বোধ হয়। মোগল decorative চিত্র সূক্ষ্মতা হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত অর্থ পূর্ণ বলে মনে হয় না। অজন্তাগুহায় গাছ-পালার চিত্রগুলিও প্রায় নিখুঁত। মোগল চিত্রেও বৃক্ষাদির ছবি অতি সুন্দর! পাশ্চাত্য শিল্পিদের মত ওরা শুধু তুলির স্পর্শে একটা গাছের ভাঙ্গ খাড়া করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন না; তাঁরা যতদূর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুঁড়ির আকারের তারতম্য ঠিকভাবে এঁকে গাছের পরিচয় দিয়ে দেন; অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চিত্রের গাছপালা দেখলে জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, 'এটা কী গাছ?' Perspective সম্বন্ধে অজন্তার ছবিতে প্রায় কোন ভুল দেখলুম না। মোগল শিল্পিরা বোধ হয় ও বিষয়ে ততটা লক্ষ্য রাখতেন না। আমরা এক নম্বর গুহার দেয়ালের এক জায়গায় একটা ছবির নকল নেবার সময় হঠাৎ পিছন ফিরতেই দেখলুম গুহার চারি-দিকের বারান্দা দেওয়া প্রকাণ্ড হল ঘরটা

* এ সংখ্যা 'ভারতী'তে মুখপত্রের ছবি দ্রষ্টব্য।

যেমন, চিত্রকরেরা যেন ঠিক সেইটে ছবি এঁকেছেন। এতে বোধ হয় যে, দেখেই ছবিতে একটা বাবাণ্ডা দেওয়া হলের তখন Perspective বলে একটা কিছু কথা
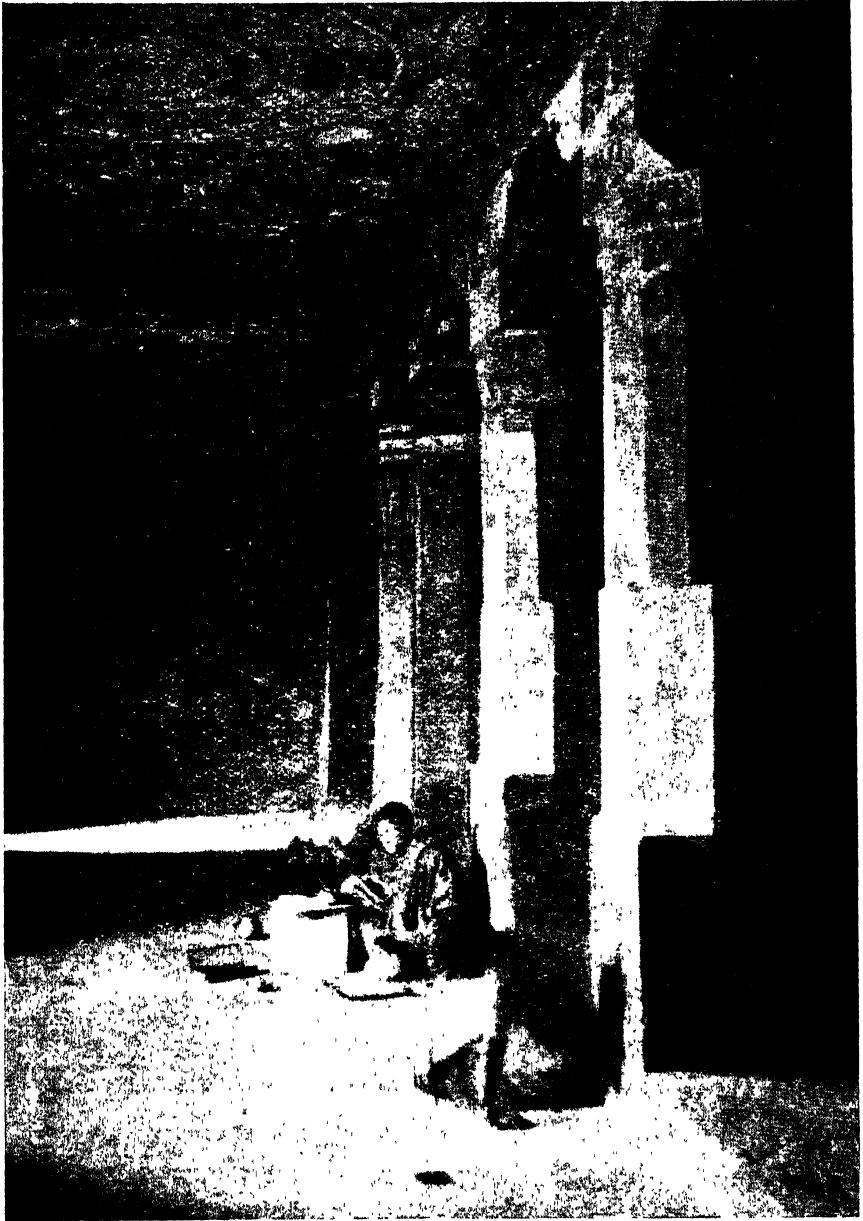
ছাদের নীচের কারুকার্য্য
(অজন্তার সপ্তদশ গুহার চিত্র হইতে)

না থাকলেও তাঁরা ও বিষয় নেহাৎ অজ্ঞ ছিলেন না। তবে, তাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পিদের মত ওটাকেই ছবির সার বা চূড়ান্ত জিনিস বলে মানতেন না। অজন্তা ছবি ছায়া-আলোক সমাবেশেও (shade and light) নয়ন-তৃপ্তিকর! বিলাতী ছবিতে যেমন ছবির একদিকে খুব আলো আর অপর দিকে আঁধার ঘনিয়ে দিয়ে ছবির কোমলত্ব ঘুচিয়ে দেয়, এ তা নয়। অজন্তার ছবিতে গঠন দেখাবার জন্যে কোন কোন জায়গায় সামান্য, কোন কোন জায়গায় প্রচুর shade দেওয়া আছে।—তাতে ছবিতে ভারি চমৎকার এক স্নিগ্ধ ও স্বাভাবিক ভাব এনে ফেলেচে! মোগল ছবিতে কৃচিৎ shade দেওয়া দেখতে পাই। ইহার প্রধান কারণ,—তাঁরা সাধারণতঃ ছোট ছোট ছবি আঁক্তেন বলে তাঁদের ছবিতে যেটুকু shade দিতেন তা চোখে প্রায় দেখা যায় না।

অজন্তার চিত্রে আমরা অ্যানাটমির ভুল কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমাদের সঙ্গে যে একজন ইংরাজ মহিলা শিল্পী (Mrs. Herringham) ছিলেন, তিনি বল্তেন, "এত প্রাচীন কালে আঁকা তোমাদের দেশে এরকম নিখুঁত ছবি দেখলে সত্য সত্যই আনন্দ হয়। আমাদের দেশে এ রকম ছবি থাক্‌লে আমরা তাদের নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশী যত্ন করতুম! বড় দুঃখের বিষয় যে তোমরা এমন অমূল্য বস্তুর আদর জান না।" মোগল চিত্রকরগণ স্থানে স্থানে anatomy এবং proportion সম্বন্ধে বিশেষ অন্যথা করেচেন বটে, কিন্তু তাতে যে তাঁদের ছবির ছবিত্ব লোপ পেয়েছে তা নয়, বরং সেই জন্যেই তাঁদের অনেক ছবিতে স্নিগ্ধ শান্ত ভাব এসেছে।

অজন্তার ছবিতে আমরা যে সমস্ত নানা রকমের নিখুঁত ভাবে আঁকা জীবজন্তু, পশু, পক্ষী, গাছ-পালা, প্রাসাদ, দোকান, প্রাচীর, কুটীর প্রভৃতির চিত্র দেখ্‌তে পাই, সে সমস্ত কোনো আদর্শের অনুকরণ না করে কেবল কল্পনার দ্বারা যে কি রূপে তাঁদের মাথায় এসেছিল তা আমাদের জ্ঞানাতীত! তাঁরা তাঁদের চিত্রের দু এক জায়গায় যে সমস্ত সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করেছেন, সে গুলির স্থানে স্থানে রং উঠে যাওয়ায়, তাহা অল্প অল্প প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেগুলি দেখে, বেশ স্পষ্ট বোধ হ'ল যে, তাঁদের যা-কিছু যখন মাথায় আস্‌ত, অম্‌নি গোবরমাটী-লেপা দেয়ালে সাদা রঙের একটা জমি করে এক এক তুলির টানে তা এঁকে যেতেন। তার পরে, তাদের ইচ্ছামত তার উপর রং দিয়ে ঢেকে সংশোধন কিম্বা পরিবর্ত্তন করতেন। আজকালকার মত পেন্সিলের দাগ বারবার রবারে ঘসে ঘসে ইচ্ছামত বদল কিম্বা শোধ্‌রাতে পার্‌তেন না। এ বিষয়ে তৈল-চিত্রে অনেক সুবিধা; কেন না, নরম মাটীতে পুতুল গড়ার মত একটা ছবির উপর অবলীলাক্রমে যেমন ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করা চলে। অজন্তার শিল্পিরা ছবিতে সংশোধন করা একপ্রকার অসম্ভব জেনে, যে বিষয়টা আঁকতেন যথাসম্ভব তার রূপ ধ্যান করতে করতে যখন মানসচক্ষে দেখতেন সাদা দেয়ালের উপর ছবিটা ফুটে উঠেছে তখন তুলিতে হাত দিতেন! মোগল চিত্র-করগণ কিম্বা অন্য দেশের খুব অল্প শিল্পী

মহাত্মারাই ওরকম পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে জান্‌তেন।

অজন্তা গুহার এক এক দেয়ালে এক এক ধরণের (style) ছবি। তা'তে বেশ বোঝা যায় যে গুহাগুলি একটা বিরাট শিল্প-বিদ্যালয় বা আশ্রম ছিল; এবং গুরু শিষ্যেরা মিলে এক একটা দেয়ালে ছবি আঁকতেন। আমরা অজন্তার দেয়ালে অসম্পূর্ণ ছবিও অনেক দেখেছি; কিন্তু, সে গুলির মধ্যে কতকগুলি অসম্পূর্ণ হ'লেও দেখে মনে হ'ল যেন কোন ওস্তাদেরই হাতের কাজ। দু নম্বর গুহায় এ অসম্পূর্ণ কাজের সংখ্যা অধিক। অল্পবয়স্ক বালকের হাতের কাজও কোন কোন দেয়ালে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

গুহার ক্ষোদিত শিল্পেও চিত্রশিল্পীগণ রং দিতে ছাড়েন নি; দুয়ের নম্বর গুহার বারাণ্ডায় দেখ্‌লুম থামের উপর এবং থামের ধারে ধারে সাদা high light দিয়ে থামের গঠন ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই নির্জ্জন ইন্দ্র-পুরী তুল্য গিরিগুহায় নির্ঝরণীর পাশে, স্তব্ধ স্নিগ্ধ ভাবে বিভোর হ'য়ে পুণ্যাত্মা শিল্পিরা বাঁদর পেঁচা যা কিছু এঁকে গেছেন তারই ভিতর থেকে যেন আমরা এক অমৃতময় শান্তি ও আনন্দের বিকাশ দেখ্‌তে পাই! অজন্তার ছবির আর একটি বিশেষ বাহাদুরী এই যে, কোন ছবি কোনটার নকলে আঁকা হয় নি। প্রত্যেকটার ভাব ও ব্যাপার ভিন্ন। কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিরা বর্ণনায় যে সে ভাব ব্যক্ত করে গেছেন, অজন্তার ছবিতে সেই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। কালিদাস যেমন বিবাহের বরযাত্রী দেখ্‌বার জন্যে উৎসুক মহিলাদের কাউকে লাজ-বর্ষণ-তৎপরা, কাউকে চুল বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে,—কাউকে বা আল্‌তা পায়ে দিতে দিতে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জানালার কাছে উঠে আস্‌তে দেখিয়েছেন;—অজন্তাতেও ঠিক্ সেই সমস্ত ভাবের ছবি অঙ্কিত আছে। পদ্মবনে হাতী, হংস-মিথুন, চকা-চকি, মৃগ-মৃগী প্রভৃতি পূর্ব্ব কবিদের বর্ণিত বিষয় অজন্তার ছবিতে দেখতে পাই। পূর্ব্ব কবিরা যেমন সুন্দরী ললনার উপমায় কৃশাঙ্গী, পীণপয়োধরা প্রভৃতির দ্বারা আকৃতি-বর্ণনা কর্‌তেন, আমরা অজন্তাতে ঠিক্ সেই বর্ণনার অনুরূপ চিত্র দেখ্‌তে পাই। কালিদাসের রঘুবংশে আছে, বন পথ দিয়ে যখন মহারাজ দিলীপ আর রাণী সুদক্ষিণা পুত্রকামনায় বিমানে চড়ে বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে যাচ্চেন, তখন তাঁদের রথের শব্দে হরিণ-হরিণীগণ কিছু মাত্রও ভীত ত্রস্ত না হ'য়ে বরং যেন রাজা রাণীকে দেখ্‌বার জন্যেই পথ ছেড়ে রথবর্ত্মের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। অজন্তা চিত্রের মধ্যেও একটা ঠিক্ এই ভাবেরই ছবি আছে।

আমরা ছবিতে এমন-সব অনেক জিনিষ আঁকা দেখ্‌তে পাই, যে গুলো আমরা আমাদের ভারতের জিনিষ ব'লে মোটেই জানি না।—আমাদের বোধ হয় কারো ধারণাই নেই যে, বগলস'টা আমাদের দেশে অনেকদিন থেকে চলে আস্‌চে! একটা ঘরে, কল্‌কাতার ঠিক্ কুক কম্পানির ঘোড়ার আড়গড়ার মত অনেকগুলি ঘোড়া রাখা আর হুকের উপর সাজসরঞ্জাম টাঙান। দেখ্‌লে সত্যি সত্যি অবাক্ হয়ে যেতে হয়!

অজন্তার ছবি দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদব কায়দায় যেমন কোট বা কুর্ত্তা-না পর্‌লে সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হওয়া যায় না, এবং অধিক গহনা পরাটা যেমন ভয়ানক বর্ব্বরতা, অজন্তার ছবিতে দেখি, ঠিক্ তার বিপরীত। যত নর্ত্তক-নর্ত্তকী আর সাধারণ লোকদের গায় কোর্ত্তা আঁটা, গয়না নেই বল্লেও হয়। আর যত বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকের অঙ্গেই অলঙ্কারের পরিমাণ বেশী। বড় লোকদের গায় কখনও কখনও কোমরে একটা নাম মাত্র সূক্ষ্ম উত্তরীয় ফিতের মত ক'রে বাঁধা। আর ভৃত্যগণ তাঁদের পার্শ্বে পান-পাত্র কিম্বা আর কিছু নিয়ে একান্ত অনুগত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব সেই সমস্ত দাসেরা বিদেশীয়। যাঁর যত পদমর্য্যাদা ও সম্মান বেশী তাঁর গায়ের গহনার মূল্যও তত অধিক।

অজন্তায় যে কেবল বড় বড় ছবিই আছে তা' নয়। ১৭নং গুহার সাম্‌নের বারান্দার এক পাশে দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড রথের চাকার ভিতর টুক্‌রো টুক্‌রো ছোট ছোট অনেক ছবি সুন্দর ভাবে আঁকা আছে। অজন্তায় যেমন মানুষের চেয়ে বড় ছবি দেখা যায়, তেম্‌নি চার পাঁচ ইঞ্চি ছবিও বিরল নয়। মোগল ছবি সাধারণত ছোটই বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়; সূক্ষ্মত্ব হিসাবে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের চিত্র ওর কাছে ঘেঁস্‌তে পারেনি, কিন্তু অজন্তার মত প্রশান্ত ভাবপূর্ণ এবং বড় চিত্রও বোধ হয় আর কোথাও নেই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

অঙ্কমালার উৎপত্তি

পাটীগণিত বাঙলার নিজস্ব বলিলেও চলে; কারণ শুভঙ্কর বাঙালী ছিলেন এবং তাঁহার আর্য্যা, দেহের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের ন্যায় প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক পরিপোষক! মানসাঙ্ক এই পাটীগণিতেরই অঙ্গ মাত্র, এবং বাঙালী যে এককালে বর্ত্তমান মাড়ওয়ারীগণের ন্যায় অতীব চতুর ও কর্ম্মঠ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার অদ্ভুত ক্ষিপ্রগণনাকৌশলই তাহার প্রমাণ। বিবিধ প্রকার Table বা Ready Reckoner সাহায্যে, উচ্চ-বেতন-ভোগী বর্ত্তমান হিসাব-নবীশ যাহা কষিতে গিয়া ডেসিমেলের সাহায্যে (দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহা আবার মধ্যে মধ্যে Recurringএ পরিণত হয়) কোনরূপ একটা মোটামুটী সমাধা বাহির করেন, অনধিক-পঞ্চদশমুদ্রা-বেতন সে কালের পাঠশালে পড়া সরকার বা মুহুরী, কড়াক্রান্তি মিলাইয়া তাহার সিকি সময়ে সেই সমাধাটি মুখে মুখে বলিয়া দেন। দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়া আজি কালিকার শিক্ষাভিমানী কয়জন, দাম ঠিক হইল কিনা বুঝিয়া লইয়া মূল্য দিয়া থাকেন? বিশেষতঃ ইংরাজের দোকানে

হইলে বিনা বাক্যব্যয়ে বিক্রেতানির্দ্ধারিত মূল্য দিয়া আসিয়া, পরে বাটীতে কাগজ কলমের সাহায্যে হিসাব করিয়া দেখিতে হয়।

শুভঙ্করের মানসাঙ্কের শিক্ষা থাকিলে আর এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙালী যে পাটীগণিত বা তদঙ্গীভূত মানসাঙ্কে নির্ব্বিবাদে পৃথিবীর অপরজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কারণ ইহা বলা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশ হইতেই অঙ্কমালার (Numerals) সৃষ্টি। যে জাতি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর সেই জাতির মধ্যেই তাহার উদ্ভব বা প্রথমাবিষ্কার ঘটাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানপটু ইয়োরোপীয় জাতির মধ্যেই বাষ্পীয়যান ও বিদ্যুৎযান প্রভৃতি যন্ত্রের প্রথমাবিষ্কার; অধুনা কৃত্রিম শিল্প-বিদ্যাবলে সস্তার প্রলোভন দেখাইয়া জর্ম্মণি, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যেও নিজ বাণিজ্য বিস্তারে প্রয়াসী, সেই জন্য কৃত্রিম প্রণয়ণ বিদ্যা এক্ষণে জর্ম্মণিরই একরূপ একচেটিয়া বলিলেই হয়। বাণিজ্যকুশল বাঙালী, সেই জন্যই বহুপূর্ব্বে, অঙ্কমালার উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

উক্ত কথার সমর্থনোপযোগী প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে এইটুকু বলিয়া রাখি যে ইয়োরোপীয়গণ এক্ষণে স্বীকার করেন যে ভারতেই পাটীগণিতের প্রথম আবির্ভাব। ছোট বড় সকল ঐতিহাসিকই বলেন পাটীগণিত ভারতভূমি হইতে প্রাচীন আরব-গণ কর্ত্তৃক মিশ্রদেশ পথে ইয়ারোপে আনীত হয়—সুতরাং উহার পুনঃ সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ বা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি। আমি নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা এইটুকু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে আমাদের 'সোনার বাঙলা'ই অঙ্কমালার উৎপত্তি স্থান।

প্রমাণ।

১। এক, দুই, তিন, চারি, প্রভৃতি শব্দের মাত্রা বর্জ্জিত প্রথম বা প্রধান অক্ষর ও অঙ্কমালার অঙ্কগুলি পরস্পর পার্শ্বে রাখিয়া উহাদের আকার সাদৃশ্য অবলোকন করুন। যথা:—

১	এ	এক
২	দ	দুই
৩	ত	তিন
৪	চ	চারি
৫	প	পাঁচ
৬	ছ	ছয়
৭	স	সাত
৮	ট	আট
৯	৯	নয়
১০	শ	দশ

বলা বাহুল্য, ট-ই আট শব্দের প্রধান অক্ষর ও শ-ই দশ শব্দের প্রধান অক্ষর! প ও ছ অক্ষর দুইটীর সামান্য পরিবর্ত্তনেই অর্থাৎ একের দাঁড়ি ও অপরের পুচ্ছ বাদ দিলেই ৫ ও ৬ হয়। "যোড়া পুটুলী শ লেখো!" কে জানিত এই যোড়া পুটুলী শ-ই অঙ্ক মালার 'জান' "০" অঙ্কের উদ্ভাবক? শ এর দাঁড়ি বাদ দিলেই ১০ অঙ্কটী পাওয়া লায় এবং শ এর দ্বিতীয় পুটুলীই শূন্য "০" অঙ্কের মূল।

দৈব সাহায্যই অনেক আবিষ্কারের মূল! মৃত ভেক-দেহের সহসা স্পন্দনই বিদ্যুৎ শক্তির উদ্ভাবক। দ্বিবিধ ধাতু ও তাহাদের সংযোগ সঙ্কেতের নির্দ্দেশক। দশ শব্দের শ অক্ষরটির এই বিচিত্র পুটুলী বহুল আকৃতি না থাকিলে

'শূন্য' প্রাণ অঙ্ক মালার সৃষ্টি আদৌ হইত কি না, কে বলিতে পারে?

২। এগারো, বারো, তেরো, প্রভৃতি শব্দের ও তাহার অর্থ ও অঙ্ক লিখন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেও বুঝা যায় দশ অঙ্ক দুই অঙ্ক বিশিষ্ট (১ ও ০) হইবার পর, এগারো অর্থাৎ এক আর ও, বারো অর্থাৎ দুই আরও, তেরো অর্থাৎ তিন আরও এই রূপ ভাবে পর পর অঙ্কগুলি এক অঙ্কের পাশে যোজনা করিয়া অপর অঙ্কগুলি লেখা হয়।

৩। শ হইতেই যে শূন্য (০) অঙ্কের সৃষ্টি, তাহা বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ প্রভৃতির অঙ্কপাত প্রণালী দ্বারা সমর্থিত হয়।

৪। শূন্যের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা উপলব্ধি হইবার পর, অপর শূন্য প্রয়োগে ১০০, ১০০০, প্রভৃতি অঙ্কের সৃষ্টি হইয়া পাটীগণিত সম্পূর্ণ হইয়াছে—বলা বাহুল্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

ঝুমঝুমি। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউশ হইতে প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি। গল্পগুলি জাপানীগল্পের ভাব লইয়া রচিত। লিপিচাতুর্য্যে মৌলিক গল্পেরই মত সুন্দর ফুটিয়াছে। গল্পগুলি সহজ সরল ভাষায় উপভোগ্য, কৌতুক ও আনন্দ-রসের ধারায় সুস্নিগ্ধ। পাঠ করিলে দুরন্ত শিশুও বশ মানিবে। শিশুসাহিত্য-রচনায় মণিলাল বাবুর দক্ষতা অসাধারণ। "ইঁদুরের মোকর্দ্দমা" কবিতাটি সুন্দর, বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব ও মনোরম। গ্রন্থে এগার খানি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মলাটের উপর ফার্শী ছাদে গ্রন্থের নাম ও ঝুমঝুমির চিত্রখানি চমৎকার হইয়াছে। ছাপা কাগজও উৎকৃষ্ট।

হৃদয় ও মনের ভাষা। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। 'আগে ভাব খোঁজ, ভাষার অভাব থাকিবে না,' 'যে মানুষ ও যে জাতি যেমন, তাহার চিন্তা ও ভাবও তেমন—তাহার ভাষাও তেমন। ইংরাজী ও পার্শী শক্তির ভাষা—বলের ভাষা। সংস্কৃত ও গ্রীক, সত্য ও সুন্দরের ভাষা। লাটিন জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা। ইটালিয়ান, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা স্নেহের কোমলতার ভাষা,' 'ভাষার মধ্যে মানবের চিন্তা ভাব ও জীবনের অস্থি, কঙ্কাল সমাধিস্থ' প্রভৃতি কয়েকটি সুগভীর সত্য লেখকের যুক্তিতর্কে বেশ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে লেখকের সহিত আমাদিগের মতের মিল হয় নাই, তথাপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা লেখকের সুগভীর চিন্তাশীলতা, ও কাব্যরসগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থখানিতে একটিও বাজে কথা নাই, এইটুকুই ইহার মনোরম বিশেষত্ব।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৭। বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে এইখানিই প্রথম গ্রন্থ। ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন, "বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের আলোচনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। সাহিত্য পথের পরবর্ত্তী পথিকেরা * কেহই নূতন মার্গে বিচরণ করিতে পারেন নাই। * * ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন,

পরবর্ত্তীগ্ণ পতিরা সেই অট্টালিকার চুণ-বালি ধরাইয়া রঙ ফলাইয়া শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র, নক্সা বদলাইতে পারেন নাই।" গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্ত্তনের কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা। অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবকাল অবধি বাল্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এই কালের লেখক। পরে ভারতচন্দ্রের সময় অবধি যৌবন, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি এই কালের লেখক এবং তাহার পর ইদানীন্তন অথবা বাঙ্গালা ভাষার প্রৌঢ়কাল। গ্রন্থখানির উপাদেয়তা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা বেশ সহজভাবে আগাগোড়া পাঠ করিতে পারিবেন। গবেষণার অত্যধিক ভারে বক্তব্য কোথাও চাপা পড়ে নাই—গ্রন্থের ধারাবাহিকতাটুকু গ্রন্থকারের লিপিকুশলতায় কোনখানে প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যের কাল-নিরূপণাদি সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্পাদক মহাশয় ফুটনোটে সে সমস্তই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন মতও বাদ দেওয়া হয় নাই! গ্রন্থকার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিবর মাইকেল সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত অনেকেরই সহানুভূতি হইবে না। গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সমগ্র সাময়িক পত্রাদির সতারিখ এবং কতিপয় নবীন গ্রন্থকারের বর্ণানুক্রমিক তালিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের তালিকায় সম্পাদক মহাশয় 'বাহুল্যভয়ে' বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারেন নাই; উক্ত তালিকায় অপ্রথিত বা অজ্ঞাত নামা প্রায় সাত আট জন লেখকের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অথচ সুকবি ৺রজনীকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও নবীন আরো দুই চারি জন প্রতিভাশালী লেখক এবং কবি প্রিয়ম্বদা দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতির নামোল্লেখ দেখিলাম না। সম্পাদক মহাশয়ের এ কর্ত্তব্য-শৈথিল্য উপেক্ষণীয় নহে। আশা করি ভবিষ্যতে এ ত্রুটি স্খলিত হইবে।

কবীর। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বোলপুর। মূল্য ছয় আনা। সাধু কবীর রচিত প্রায় শতাধিক দোঁহাবলী অনুবাদসহ সংগৃহীত হইয়াছে। কবীরের দোঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। ক্ষিতিবাবু বিস্তর পরিশ্রম করিয়া বহু নূতন দোঁহা সংগ্রহ করিয়াছেন,—অনুবাদ গুলির ভাষা বেশ সরল ও প্রাঞ্জল—মূলের ভাব কোথাও নষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার সম্পদ যে সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থের ভূমিকায় কবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনী-পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের উদ্যম জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সাবিত্রী। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণে আমরা বই খানির যে প্রশংসা করিয়াছিলাম তাহার অতিরিক্ত বলিবার কিছু নাই।

রেখা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। মূল্য বারো আনা। এখানি কবিতার বই। যতীন্দ্রবাবু কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার রচনায় কবিত্ব আছে, ভাবে মৌলিকতা, ভাষায় সরলতা, শব্দচিত্রে নিপুণতা ও ছন্দে একটা লীলা আছে। তাঁহার বর্ণনাগুলি ছবির মত ফুটিয়া উঠে। তাঁহার কোনো কোনো কবিতা রবিবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও সেগুলি উপভোগ্য। *

টুনটুনির বই। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি শিশুপাঠ্য গল্পের বহি। 'টুনটুনি পাখী,' 'দুষ্টু বিড়াল,' 'নরহরি দাস,' 'বুদ্ধুর বাপ,' 'পান্তবুড়ী' প্রভৃতি চিরপরিচিত গল্পগুলি গ্রন্থকারের সহজ সরল রূপকথার ভাষায় চমৎকার ফুটিয়াছে। বহিখানির জন্য শিশুরাজ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। গল্পগুলি আগাগোড়া হৃদয়-গ্রাহী এবং সেগুলির মধ্যে বেশ একটি মনোরম বৈচিত্র্য আছে। বহিখানির পাতায় পাতায় ছবি—আকারে ছোট হইলেও সংখ্যায় অনেক। কভার

কাগজ পরিপাটি, এবং ছাপা, কান্তিক প্রেসের স্বাভাবিক মুদ্রণ-নৈপুণ্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

আর্য্য-বিধবা। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও বগুড়া হইতে প্রকাশিত। রায়প্রেসে মুদ্রিত। ১২৯৯ সাল। মূল্য তিন আনা। ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে বিধবার কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সুখপ্রিয়া নিরাশ্রয়া বা সংযম-অক্ষমা নারীর পক্ষে বিবাহ দোষের নহে, কর্ত্তব্য; তবে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ-গৌরব চিরদিনই অক্ষুণ্ন থাকিবে, ইহাই এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানির প্রতিপাদ্য। লেখকের যুক্তিগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত; গ্রন্থে কোথাও গোঁড়ামি নাই—সকলদিকই লেখক সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

গার্গী। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা! গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন—তাঁহার বিরাট ভাষা-গহন ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। রচনা যেমন নীরস, তেমনি দুর্ব্বোধ্য জটিল, গ্রন্থে ভাষার দোষ ও দৈন্যের দৃষ্টান্তও প্রচুর।

বঙ্গের রত্নমালা। বা বঙ্গীয় সমাজের কতিপয় নীতিগর্ভ ঘটনা ও চরিত্র। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। বাঁধাই মূল্য দশ আনা। বালকবালিকাগণের নীতিশিক্ষা প্রদানোদ্দেশ্যে সাধারণ ও অসাধারণ বাঙ্গালী-জীবনের ছোট বড় ঘটনা হইতে সৌভ্রাত্র, পরদুঃখানুভব, আহারে সংযম, চরিত্রে বল, কর্ত্তব্য-পালন, প্রভুপরায়ণতা প্রভৃতি শিক্ষণীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার একটা উপভোগের দিক আছে। দেবচরিত্র বা বিদেশীয় মহৎচরিত্র অনেকস্থলে হৃদয়ে ঠিক ততখানি দাগ টানিতে পারে না, যতখানি আমাদিগেরই মত 'সাদাসিধা' বাঙ্গালী চরিত্রের দ্বারা সম্ভব হয়! গ্রন্থকার কলেজের অধ্যাপক হইলেও তাঁহার ভাষা বজ্র-নির্ঘোষের মত কর্ণপটহের পীড়াদায়িকা নহে, তাহা বেশ সরল ও সতেজ! সহৃদয়তার গুণে গল্পগুলি বেশ ফুটিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ভাবভঙ্গির অভিব্যক্তিতে অযথা বাড়াবাড়ি আছে। যথা, "জননী এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।" 'চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির' প্রভৃতি রচনারীতি নিতান্তই অসহ্য ঠেকে! বালক বালিকাগণের নীতিশিক্ষার উপযোগী ত গ্রন্থখানি বটেই, উপরন্তু অভিভাবকগণও ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

খোকার বই। দ্বিতীয় ভাগ. শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু প্রণীত। বারদী ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। এখানি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থের ভাষা কটমট, নীরস এবং দুরূহ। "হরিভক্ত প্রহ্লাদ", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতির ভাষা নিতান্তই অসহ্য! কবিতাগুলিতে না আছে ভাব বা ভাষা, না আছে কোমল লালিত্য। কোন আখ্যানই ভালো করিয়া ফুটে নাই! শিশুদিগের পক্ষে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বিষযে আমাদিগের ঘোরতর সন্দেহ আছে! পাঠে অনুরাগের পরিবর্ত্তে শিশুহৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার হইবে।

মেহেরনেগার-কাব্য। শ্রীযুক্ত আব্বাছ-আলী প্রণীত। মৈমনসিং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। গ্রন্থখানি কাব্য কি হেঁয়ালি ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কবিত্বেরও একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইল। নমুনা স্বরূপ দুই ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"* * বলি, এক কৌটা বিষপূর্ণ,
স্বকরে গলায় ঢালি পড়িলা ভূতলে।"

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক। প্রকৃত ঘটনামূলক উপন্যাস। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর "শরৎ পুস্তকালয়" হইতে প্রকাশিত। চট্টগ্রাম সনাতন যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এমন বীভৎস ও সৃষ্টিছাড়া কল্পনা কচিৎ দেখা যায়। পনের বৎসরের বালক ও বারো বৎসরের বালিকা সকলেই গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করেন এবং প্রেমে পড়েন। গ্রন্থের নায়ক স্কুল পরিদর্শনে গিয়া একটা বার বৎসরের বালিকার হাত ধরিয়া 'বেণী বড় দুরন্ত বালক' পড়াইতেছিলেন, সহসা তাঁহার "শরীর শিহরিয়া উঠিল। হৃদয়ে তাড়িৎ-

বৎ কি প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে পাইলেন; পুনঃ পুনঃ বালিকার মুখ দেখিবার ইচ্ছা জন্মিল।' আবার টিপ্পনী আছে,—"ঈশ্বরের সব ইচ্ছা" আমরা বলি, প্রভু ঔপন্যাসিক, আপনারই সব ইচ্ছা! এমন হীন প্রকৃতির যুবককে বালিকাবিদ্যালয়ের সীমানায় প্রবেশ করিতে দিতে নাই,—প্রেমে পড়িবার জন্য ইহারা যেন সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। এমন কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত লেখককেও উপন্যাস লিখিতে হইবে। হায় বঙ্গসাহিত্য!

কায়স্থ দর্পণ। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধনপুর কায়স্থ সভা হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার বিধেয় এবং উপনয়নের প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখক বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কায়স্থগণের আচার ব্যবহার ও প্রধান প্রধান বংশের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি নানা তথ্যে পূর্ণ, কৌতূহলোদ্দীপক। কায়স্থগণের নিকট সমাদর লাভের যোগ্য।

শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত। "তিনি শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক বিপুল গ্রন্থের আয়োজন করিয়াছেন, এই পুস্তিকা তাহার ভূমিকা।" প্রথম ভাগে "শিক্ষাতত্ত্ব" ও দ্বিতীয় ভাগে "শিক্ষার প্রণালী" সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "গ্রন্থকারের যোগ্যতা অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া" এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত। আমরাও তদ্রূপ আশান্বিত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা' পাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্ব্যবহার আজিকালিকার এ স্বার্থের যুগে দুর্ল্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক। শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শে বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্র নাই। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

ধ্রুব। শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। নব্যভারত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক আধুনিক নভেলের ছাঁচে ধ্রুবোপাখ্যান লিখিয়াছেন। রচনাটি ব্যর্থ হইয়াছে। যাত্রার ধরণের উচ্ছ্বাস ও হীন নাটকের রুচির পরিচয়ই সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সুরুচি-চরিত্রে রুচির মর্য্যাদায় লগুড়াঘাত করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। সরকার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। লোকনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের সংক্ষেপ-সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতা বেশ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অংশগুলি কোথাও বাদ পড়ে নাই। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। তবে ফুটনোটের টীকাগুলি সর্ব্বত্র সহজ হয় নাই। 'স্বয়ম্বরা'র ব্যাখ্যা 'নিজেই স্বামী বাছিয়া নিতে ইচ্ছিতা' তেমন সহজ বলিয়া মনে হইল না। গ্রন্থে দুইখানি হাফটোন চিত্র আছে—ছাপা ভাল, তবে পরিকল্পনা সুখ্যাতির যোগ্য নহে। গ্রন্থের মূল্য সুলভ।

অভিনয়-প্রণালী ও অথার। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী দত্ত প্রণীত। শ্রীঅমূল্যচরণ নাগচৌধুরী (নাট্যভূষণ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রেট ইডিন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনামাত্র। 'অভিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব হেতু এবং অধুনা অভিনয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া' গ্রন্থকার লেখনী ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার 'অভিনয় প্রথারূপ পথের আবর্জ্জনা' দূর করিতে গিয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া প্রহসনকারের গীতের ছত্র মনে পড়ে, 'আপনি অন্ধ দৃষ্টি বন্ধ, পরকে দেখায় পথ।' 'অথার' ক্ষুদ্র রঙ্গপ্রহসন, 'অথার' নামধারী অক্ষম লেখককে ব্যঙ্গ করাই 'অথারের'

উদ্দেশ্য। পাঠ করিয়া 'ছুঁচ' ও 'চালুনীর' প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ-কথা, মনে পড়ে।

সংসারী। (হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা পুস্তক) ডাক্তার এন, সি, ব্যানার্জ্জী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পশুপতি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। গ্রন্থখানিতে হোমিওপ্যাথি মতে রোগ নির্দ্দেশ ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা বেশ সহজ ভাষায় সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। জ্বর, ওলাউঠা, ও জটিল স্ত্রী-ব্যাধি হইতে ক্রিমি, চুলকণা অবধি রোগের ঔষধ নির্দ্দেশে গ্রন্থখানি সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী হইয়াছে। অথচ গ্রন্থের কলেবর হিসাবে মূল্যও সুলভ। ডাক্তার মহাশয়ের ইংরাজী ধরণে নামকরণের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। এ ব্যাধি তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিল কেন, ইহার প্রতিকার সাধনে ডাক্তার মহাশয়ের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। এ নাম-বিভ্রাট আর কেন?

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

খাদ্য। শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু প্রণীত। মূল্য এক টাকা। আমরা চুনীলাল বাবুর খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তকখানি অতি যত্নের সহিত পড়িয়াছি। পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ ও নানা বিষয়ের অনুশীলনে বড়ই শিক্ষাপ্রদ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য শারীর বিজ্ঞানের পরিপাক প্রণালীর ও ছবির সহিত সরল বিবৃতি আছে। তা ছাড়া আরও অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের গুণ।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ। নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

রন্ধন। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন। খাদ্যে ভেজাল ও তন্নিরূপণের উপায়। ইত্যাদি।

আমাদের দেশের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে; কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল। ডাক্তারবাবুর এই ছোট পুস্তকখানিতে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সঙ্গত অনেক কথা বিবৃত আছে। তাহাতে পুস্তকখানি দেশের লোকের খাদ্য সম্বন্ধে পড়িবার ও শিখিবার বড়ই উপযোগী হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল ও বলিবার প্রথা অতি প্রাঞ্জল হওয়াতে সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়।

আমাদের দেশে বিশেষ কলিকাতায় প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই অল্প বিস্তর ভেজাল দেওয়া। আইন করিবার সময় এমন একটু শিথিলতা ছিল যে লোকে ভেজাল জিনিষ বেচিলেও যদি

"ভেজাল দেওয়া" "মিশ্র দুধ" "মিশ্র ঘী"

বলিয়া বেচে, তবু তার আইনমত দোষ হয় না। চুনীবাবু এসকল নিবারণ করিবার অনেকগুলি উপায় দেখাইয়াছেন। তিনি সাধারণ লোকদেরও সাবধান হইতে বলেন ও কোম্পানী বাহাদুরকে আইন সংস্কার করিতে বলেন।

চুনীবাবুর এই মত অনুসরণ করিয়া যদি ভেজাল দেওয়া খাদ্যের প্রচলন বন্ধ হয় ত দেশের কত উপকার হইবে। কলিকাতায় খাদ্যের দোষে কত লোক মন্দাগ্নি অম্ল প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছে। ও কলেরা টাইফইড যক্ষ্মাকাশ ইত্যাদি রোগও দুষ্ট খাদ্য হইতে উৎপন্ন। দুধ ঘী প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের অনেক জিনিষই ভেজাল দেওয়া। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে তাহা কত হানিকর। দুধের অভাবে ও দুধের দোষে আমাদের দেশে হাজার করা তিন শত তেত্রিশটি শিশু মারা যায়। এ সকলের প্রতিকার স্বরূপ তিনি যে কয়টি উপায় করিতে বলিয়াছেন তা মোটামুটি এই

১ লোক শিক্ষা। ২ আইন সংস্কার। ৩ আব-শ্যকীয় ব্যবসায় যৌথ কারবার রূপে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—মনোযোগ ও চেষ্টা।

এই সদুপদেশপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত পুস্তকখানি আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় অশেষ সুফল দিবে। এ পুস্তকখানি ঘরে ঘরে রাখা উচিত। শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চ স্বরেতে,
হিষ্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে।
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরোসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
দাদা এম এ, আমি বি এ।

রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীযুক্ত সতীশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা হইতে।

ইউ, রায় কর্তৃক ব্লক] [কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত
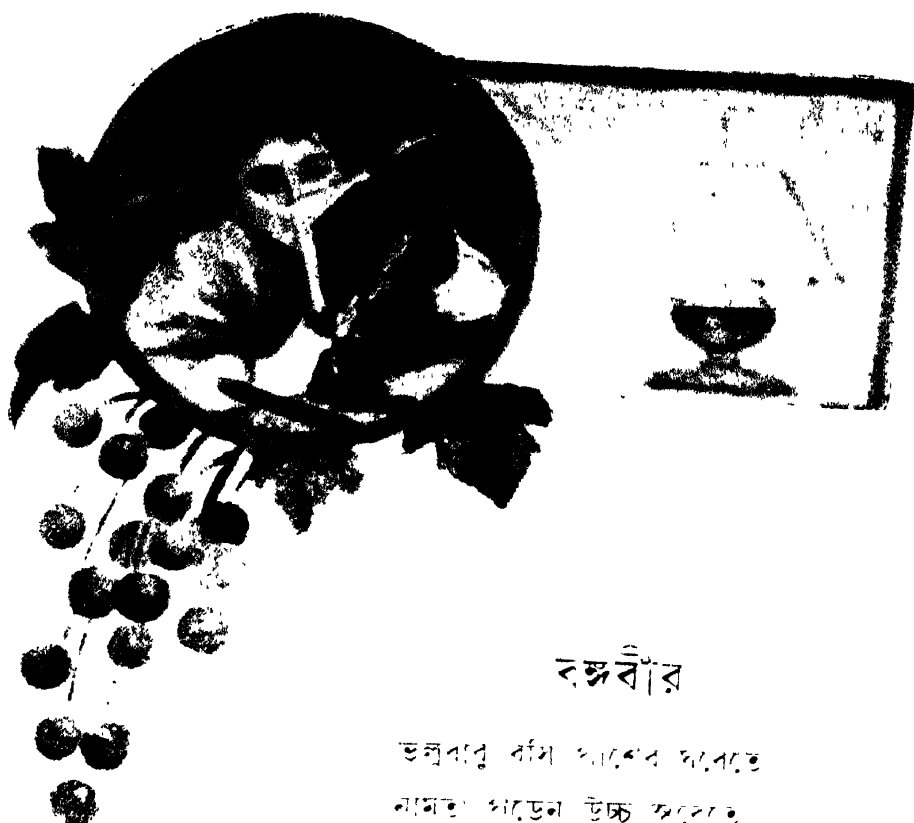
ভারতী

৩৪শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ [৮ম সংখ্যা

ভাবসাধন।

চিরকাল যাহার সঙ্গে আড়ি করিয়া বসিয়া আছি, আজ হঠাৎ 'এস' বলিয়া তাহার দিকে কর প্রসারণ করিলেই যে সে আমাদের হইয়া যাইবে এমন কথা কে বলিল? ঘরের শিল্প, তাহার সঙ্গে ভাব রাখিবার কোন পন্থা, কোন ইচ্ছা আমরা এতকাল রাখি নাই, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই নিজস্ব শিল্পের সঙ্গে ভাবের অভাব ঘটাইবার জন্যই এতদিন প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলাম, আজ সখ হইয়াছে ভাব করিব কিন্তু তাহা হয় কই? এখন সাধিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভাব করা ছাড়া তো উপায় নাই।

শিল্প তো সখের খেলনা নহে, সাধনার বস্তু। রত্নহার নির্জীব পদার্থ, তাহাকে যখন ইচ্ছা টানিয়া ফেল, যখন ইচ্ছা কণ্ঠে ধর। কিন্তু বন্ধুর বাহুপাশের মত পূর্ব্বপুরুষগণের ভাব সঞ্জীবিত যে শিল্প তাহাকে আজ টানিয়া ফেলিলে কাল চাহিবামাত্র ফিরিয়া পাওয়া দুষ্কর।

ভা ও ব সহজ দুইটা অক্ষর যে টান্‌কে বুঝায় মনে সেটার অভাব থাকিতে প্রাচীন ভারতশিল্পটা যে আমাদের যত্নের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী এটা আমরা কিছুতেই বোধ করিতে পারিব না, সুতরাং এ অবস্থায় তাহাকে বুঝিতে অথবা বুঝাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। ঠিক কোন্ ভাবে ভারতশিল্পটা গ্রহণ করিব তাহা বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে পাশ্চাত্য শিল্পটা যেমন অবাধে আমাদের কাছে ধরা দিতেছে মনে হইতেছে, ভারতশিল্পটা সেরূপ করিতেছে না। শিল্পের যে একটা গুণ সহজে সাধারণের বোধগম্য ও মনোরঞ্জক হওয়া যেন সেই গুণের অভাব ভারতশিল্পে লক্ষ্য করিয়া আমরা ভারতশিল্পকে নানা দোষদুষ্ট অপরিণত এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের নিকট কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই যে সকল সময়ে ভারতশিল্পটারই দোষ একথা বলিতে পারি না, এ বিষয়ে আমাদের নিজের দিকেও যে ভারতশিল্পকে বুঝিবার একটা প্রকাণ্ড অক্ষমতা জন্মিয়াছে সেটা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

অল্পকালই হইল আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়াছি এবং এই অল্প কালের মধ্যেই প্রাচীন ভারতবাসীর ভাব গতিকের সহিত আমাদের ভাবগতিকের একটা প্রচণ্ড বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন করিয়া যে কাজটি করিতেন, যে সকল বিষয় লইয়া

যে ভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা আজ্‌কাল ঠিক সেরূপটা করিনা। উন্নতির পথেই বল বা অবনতির দিকেই বল অগ্রসর হইতে হইতে আমরা প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার সহিত যোগাযোগের পথ প্রায় রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছি সুতরাং এ অবস্থায় ভারতশিল্পের নিগূঢ় সৌন্দর্য্য বুঝিবার অবসর আমাদের কোথায়? অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রাচীন ভাব-নদীর সহিত বিচ্ছিন্ন রহিয়া পিপাসা তো আমাদের কোন দিন মিটিবে না উপরন্তু নদীর নাম ধরিয়া চিৎকার করিলে স্বরভঙ্গ হইয়া মরিবারই সম্ভাবনা। এ অবস্থায় তপস্যা করিয়া নদীর স্রোত নিজের দিকে আনা, নিজেকে প্রাণপণে নদীর দিকেই অগ্রসর করা অথবা ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া স্থির থাকা ছাড়া উপায় কি! নীরস আধুনিক ও বিজ্ঞান যুগের মরু প্রান্তরে আমরা প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি, জীবনে ভাবের প্রভাব সৌন্দর্য্যের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া কোন নরকের দিকে যে আমরা অগ্রসর হইতেছি তাহা বুঝিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত আমাদের লোপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানের চোখে শিল্পটাকে দেখা চলেনা, ভাবের চক্ষে ধরা যায়। বিজ্ঞানের চক্ষে শিল্পে এটার অভাব ওটার অভাব, আর ভাবের চক্ষে সকল অভাব পূর্ণ হইয়া শিল্পের স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। কি ভারত কি ইউরোপীয় সকল শিল্পকেই বুঝিবার এই একমাত্র অমোঘ উপায়।

প্রাচীন ভারতশিল্প যেটা প্রাচীন ভারত-বাসীর ভাবের বিকাশ সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহি কিন্তু হৃদয়টাকে বিপরীত ভাবের বর্ম্মাচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া। এ অবস্থায় ভারতশিল্প যে কোনদিন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে এ আশা দুরাশা।

এই নবযুগের সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অণুবীক্ষণ সাহায্যে লুপ্ত অক্ষর উদ্ধার করিয়া প্রত্নতত্ত্ব প্রকাশ করা চলে কিন্তু তাহাতে পুরাতন পুঁথির ভাব ও রস গ্রহণে কোন সহায়তা করে না। শিল্পেও তেমনি ভাবের চশমা না লাগাইলে আমাদের কোন লাভেরই আশা নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যতার ও ভাবের সহিত যদি আধুনিক আমরা বিচ্ছিন্নই হইলাম তবে প্রাচীন শিল্পটাকেই বা ধরিয়া থাকিব কেন? আমরা একটা নূতন অবস্থার উপযোগী নব শিল্পের অবতারণা কেন না করি? অবশ্য এ কথা গ্রাহ্য হইবে সেইদিন যেদিন আমরা নবভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইব যে ভারতবাসী বলিয়া আমরা নিজেকে স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারিব না, যে দিন আমাদের কাব্য সঙ্গীত আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম আমাদের নিকটে অসভ্যের খেয়াল কৌতুকের সামগ্রী মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

নব নব জ্ঞানের রেলগাড়িতে চলিয়া যে দ্রুত গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি— তাহাতে সেদিনের আর বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু আশার বিষয় এই যে ভারতের কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জীবই এই মহাযাত্রায় টিকিট কিনিয়াছি।

দেশের কুলকামিনীগণের হস্ত হইতে সেই সত্যযুগের শঙ্খ আভরণ এখনও স্খলিত হয় নাই। বেদ ধ্বনিতে ব্রাহ্মণেরা এখনও আকাশ

ধ্বনিত করিয়া থাকেন, দেশের সাড়ে পনরো আনা শিল্পির নির্ভর এখনও সেই প্রাচীন শিল্পেরই উপর, দীন দরিদ্র ধনী গৃহস্থ যতি সন্ন্যাসী এখনও অন্তরে অন্তরে সেই আর্য্য সভ্যতার অম্লান তিলকাঙ্ক বহন করিতেছে, আর ভগবান এই ভারতের ষড়ঋতুর সৌন্দর্য্যবিকাশে চিরন্তন প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দিতেছেন না। কালিদাস যে বর্ষার গান শরতের শোভা বসন্তের মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সেই গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুগণ ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া আজও আসিতেছে যাইতেছে তবে কেমন করিয়া বলি নূতন শিল্প আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে !

এই কলিকাতা সহরে এখনও এমন লোকও আমি দেখিয়াছি যিনি ক্রোরপতি হইয়াও নিজের Portrait অঙ্কিত করাইবার সময় নিজেকে মহামূল্য সিংহাসনে না বসাইয়া গুরুদেবের ছত্রধারিরূপে অঙ্কিত করাইয়াছেন। আর্য্য সভ্যতা যখন এখনও ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে তখন অতি শিক্ষিত আমাদের মত দুই দশজন বাঙালীর কথায় আর্য্যশিল্পকে দেশ হইতে নির্ব্বাসন দিতে যাওয়া মূর্খতাব কার্য্য।

যতদিন না এই ভারতখণ্ড তাহার তেত্রিশকোটী নরনারী তাহার এই শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি লইয়া সমুদ্রের অতল গর্ভে প্রবেশ করে ততদিন জগতের লোক আমাদের প্রাচ্যজাতি বলিয়াই জানিবে এবং আমাদের নিকট হইতে প্রাচ্য শিল্পই প্রত্যাশা করিবে, ইতালীয় শিল্পও নয় ফ্রেঞ্চ শিল্পও নয় অথবা প্রাচ্য ইতালীয় এবং ফ্রেঞ্চ শিল্পের খিচুড়িও নয়। এ অবস্থায় ইউরোপের সহিত Loan খুলিবার যে বিশেষ আবশ্যক আছে এমন বোধ করি না।

আমরা নিজের ভাণ্ডার হইতে সল্প হইলেও যেটুকু দান করিব জগৎবাসীর নিকটে তাহারই মূল্য আছে, আর ধার করিয়া যেটা বিতরণ করিয়া যাইব তাহা চিরদিন চোরাই মালের সামিল হইয়া থাকিবে।

সমস্ত মানবজাতির মধ্যেই ভাবের আদানপ্রদান যখন চলিতেছে তখন শিল্পেও আদানপ্রদান চলিতে থাকিবে, সেটাকে ঠেকাইবার সাধ্য কাহারও নাই এবং সেরূপ আদানপ্রদানে দোষও দেখি না ; কিন্তু দানই গ্রহণ করিতেছি দান করিতে অপারক এরূপটা হইলে আজ না হউক দশদিন পরেও অর্দ্ধচন্দ্র আমাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত।

Science of Perspective ইত্যাদি তুচ্ছ সামগ্রীর লোভে পুরুষ-পরম্পরালব্ধ যে আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলটা হারাইতে বসিয়াছি সেটা জগতের আর কোন শিল্পই আমাদের দিতে পারিবে না। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া perspective, anatomy আরও কত কি আমরা দখল করিয়াছি কিন্তু প্রাচীন ভারতের একটা মন্দির চূড়া অথবা একটি চিত্রের এক রেখা এক বর্ণও পুনঃসংস্কার করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছি বলিয়া তো বোধ হয় না ! তবে বৃথা পরিশ্রমে কোন্ লাভ ? নূতন artএর সৃষ্টি করিতেছি এমন অহঙ্কারও আমরা রাখিতে পারি না, কেননা এই পঞ্চাশ বৎসরে ইউরোপীয়

একেবারে নিঃসংশয় হইতে হইবে, তর্ক ও আলোচনা কোন দিন আমাদের নিঃসংশয় করিয়া দিতে পারিবে না।

হৃদয় রতন যাচিয়া মেলে, অযাচিত ও পাওয়া যায় কিন্তু যে যাচাইয়া গ্রহণ করিতে চাহে তাহাকে ঠেকিতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শিল্পটাকে আমরা তামাকু ধরাইবার টিকাটার মত যৎসামান্য করিয়া দেখি সুতরাং তাহার যেখানে সেখানে আগুন ধরাইয়া সেটাকে ছাই ভস্ম করিয়া দিতে আমাদের কোন ভাবনা উপস্থিত হয় না। আমরা কথায় কথায় বলিয়া ফেলি, ভারত শিল্পের আকৃতি প্রকৃতিটা ইউরোপীয় দস্তর দিয়া একটু আধটু সোজা করিয়া দিলে ক্ষতিটা কি? এস তাহার বেমানান্ হাত পায়ের স্থানে গ্রীকমূর্ত্তির হাত পা কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া যাউক, তাহার চম্পক অঙ্গুলির পরিমাণ উখা ঘসিয়া খাটো করিয়া ফেলি; তাহার গালের একদিক সাদা একদিক কালো করিয়া তাহার সুচেহারাটা ফুটাইয়া তুলি, তাহার তপস্যায় শীর্ণ দেহটাকে গোস্ত খাওয়াইয়া তাজা করিয়া তোলা যাক—ঠিক গ্রীসিয় কুস্তিগিরের মত!

শিল্প যে ছেলাখেলা নয় আমাদের জীবনের উপরে তাহার একটা প্রভাব আছে এটা যদি আমাদের জ্ঞান থাকিত তবে এত সহজে আমরা ভারত শিল্পের উপরে ছুরি চালানো ব্যাপারে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতাম না!

যাঁহারা হাতে কলমে শিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে কোন চিত্রের বা কোন মূর্ত্তির রেখাপাত বা বর্ণ সন্নিবেশ প্রথায় সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটাইলে চিত্রটার বা মূর্ত্তিটার ভাবে ও অর্থের কতই না বদল হইয়া পড়ে। চিত্রণের মুখে গঠনের বেলায় যেটা বাহির হয় তাহার উপরে হাত চালাইতে যিনি শিল্পি তিনিই সাহস করেন না আর আমরা অতি সহজে বলিয়া ফেলি কেন এরূপ পরিবর্ত্তনে দোষ কি? দোষ যে কি তাহা প্রস্তাবকারীর চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু যাহাদের প্রাণ আছে প্রাণ থাকিতে তাহারা আনাড়ির হাতে ভারত শিল্পের চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে কই!

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারত শিল্পের ভিত্তিতলে কত না শিল্পের কত তরঙ্গ আসিয়া বারম্বার আঘাত করিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই কিন্তু এই যে তাহার আশ্রয়-ভূমি আমাদের মন তাহার ভিতর হইতে যে একটা জিঘাংসা প্রবল ভূমিকম্পের মত সজোরে তাহাকে নাড়া দিতেছে তাহাতে ভারত শিল্পের পতন অবশ্যম্ভাবী। ভারত শিল্পের মন্দির চূড়া পাকা মসলায় গাঁথা দুই চারিটা ভূমিকম্প সে সহিবে কিন্তু তাহার অধিক নয়। সেই প্রলয়ের দিনে যে ভূমি তাহাকে নাড়া দিতেছে সেই ভূখণ্ডের সহিত কোন অতলে সে প্রবেশ করিবে তাহাই ভাবিয়া দেখ।

চ বর্গের উষ্ট্রবক্ষ ঞ'র মত ভারত শিল্পটা যদি বা আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকে তথাপি ঞকে N করিয়া যেমন আমাদের কোন লাভ নাই তেমনি ভারত শিল্পকে পাশ্চাত্য শিল্পের ভারবাহী গর্দ্দভ করিয়াও আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের সহর।

(২)

জাপানের দৃশ্য অতি মনোরম। সমগ্র জাপানই যেন শিলং, দার্জ্জিলিং, শিমলা, মুসুরী, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণ। জাপানের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ পাহাড়ে আবৃত। শত শত ঝরণা, প্রস্রবণ প্রভৃতির ঝরঝর শব্দ বড়ই আনন্দদায়ক। আবার কোন কোন জায়গার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড waterfallগুলি ভীতিসঞ্চার করিয়া থাকে। আর সে শীতপ্রধান দেশে বরফের কোন নূতনত্ব নাই। পার্ব্বত্য জাপান ছোট বড় ৬০০ দ্বীপ সমষ্টি। ছোট ছোট নদীর সংখ্যা অল্প নয়। পর্ব্বতের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দেশের নানাস্থানের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমুদ্র এবং পর্ব্বতের সম্মিলনেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চূড়ান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

গতমাসে তোকিও সহরের ভিন্ন ভিন্ন পার্কের বিবরণ ভারতীর পাঠকবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছি। অদ্য সহরের অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে জাপান সম্রাট মিকাদোর প্রাসাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। ১৮৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত সোগুণ উপাধিধারী সম্রাটের প্রধান সেনাপতি তোকিও সহরে বাস করিতেন। সে সময়ে তোকিও ইয়েদো নামে অভিহিত হইত। নামে সেনাপতি হইলেও সোগুণের প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে কার্য্যতঃ তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; সম্রাট মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় সহর হইতেই তিন শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী কিওতো রাজধানীতে অবস্থান করিতেছিলেন। যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের মধ্যযুগের অবসান হইয়া বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন হয় সেই রাষ্ট্রবিপ্লবই প্রকৃত প্রস্তাবে তোকিও সহরকে রাজধানী পদে উন্নীত করে। তোকিও তখন অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল। সেনাপতি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে আপন বাসভবন সম্রাটকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন। সে আজ প্রায় ৩৩ বৎসরের কথা। তদবধি তোকিও জাপানের রাজধানী। তখন জাপানে রেল ছিল না। সম্রাট শিবিকারোহণে দূরবর্ত্তী কিওতো হইতে নূতন রাজধানী তোকিও সহরে আগমন করেন। পাঠক মনে করিবেন না যে সেনাপতির বাড়ী বলিয়া সম্রাটের বর্ত্তমান প্রাসাদ ছোট বা সামান্য ধরণের। উহা বিশাল এবং বিস্তৃত। আমার যে সকল বন্ধু ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য দেখিয়া জাপানে আসিয়াছেন সকলেই মিকাদোর বাড়ীকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। কোন কোন সম্রাট কিম্বা প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও মোটের উপর জাপান রাজভবন অনেক বিষয়ে অধিকতর সুন্দর। বাড়ী খানা একটা দুর্গের মত; তোকিও সহরের মধ্যস্থলে দীর্ঘে প্রস্থে আনুমানিক এক মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত

এবং পরিখায় বেষ্টিত। পরিখাগর্ভ হইতে উত্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হার্কিউলিয়ান পাথরে প্রথিত অত্যুচ্চ দিব্য দেওয়ালের উপর সবুজ দুর্ব্বাচ্ছদিত বেষ্টন এবং তাহার উপর সারি সারি কামান। পরিখার উপরিস্থিত ভিন্ন ভিন্ন দ্বারদেশের প্রশস্ত প্রস্তর সেতু সহরের
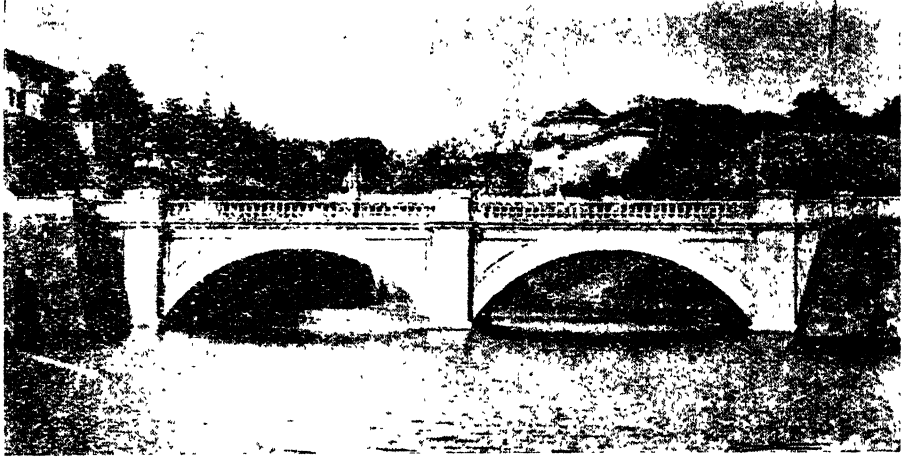
সম্রাটের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা, তদুপরিস্থ সেতু, হার্কিউলিনস্ পাথরের দেয়াল এবং প্রহরীদের বিশ্রামাগার।

বিস্তৃত রাস্তার সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। বহির্দ্দেশের তৃণাবৃত বিস্তৃত আঙ্গিণাগুলি এতই পরিষ্কার যে বহুমূল্য মকমল এবং কার্পেটাবৃত প্রাঙ্গণও তাহার নিকট লজ্জা পায়। সাধারণ লোক বহির্দ্দেশের কয়েকটী প্রাঙ্গণ পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে পারে। রাজভবনের দুই ধারে দুইটী পাব্লিক পার্ক। রাজবাড়ীর চারি ধারেই বৈদ্যুতিক ট্রামের রাস্তা।

রাজবাটীর প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে এক বিস্তৃত জায়গায় রাজপুত্রের (ক্রাউন প্রিন্সের) বাড়ী। এ বাড়ীর আয়তনও স্বয়ং সম্রাটের বাড়ীর অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে, ইহারও কয়েক ধারে বিস্তৃত রাস্তা। তিন ধার দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম এবং অপর ধারের তলদেশ দিয়া সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী ও বৈদ্যুতিক ট্রাম উভয়ই চলিতেছে। সম্প্রতি শ্বেত প্রাসাদ নামে নামক রাজপুত্রের জন্য যে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা দেখিবার জিনিস। রাজপুত্র তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিসহ এই বাড়ীতে অবস্থান করেন। এই বাড়ীর এক পার্শ্বে সৈন্যদের কাওয়াজ খেলিবার বিস্তৃত মাঠ; ব্যারাক, এবং মিলিটারী কলেজ। রাজপুত্রের প্রাসাদ আওইয়ামা প্যালেস্ নামে পরিচিত। সহরের ঐ অঞ্চলের নাম আওই-য়ামা। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের তোকিওস্থ ইণ্ডিয়ান হাউস্ রাজপুত্রের বাড়ীর এক পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই বৈদেশিক নৃপতি মণ্ডলীর প্রতিনিধি বর্গের আবাসস্থল। রাজবাড়ীর নিকটেই শাসন, শিক্ষা, যুদ্ধ, এবং অন্যান্য বিভাগীয় বড় বড় আফিষ এবং পার্লিয়ামেণ্ট হাউসদ্বয়,

পার্লিয়ামেণ্ট এবং বড় বড় আফিষের অধিকাংশ বাড়ীই কাষ্ঠ নির্ম্মিত। জাপানীরা বাহ্যিক আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয়ে প্রচুর অর্থ আটক রাখিতে এবং তন্নিবন্ধন দেশের কারবারের প্রতিবন্ধক জন্মাইতে প্রস্তুত নহে। খর্ব্বাকৃতি, ক্ষুদ্র দেহধারী জাপানী সাধারণ ভাবে থাকিয়া বড় বড় কায করিতেই অভ্যস্ত।

শ্বেত প্রাসাদ

প্রাচীন রাজধানী কিওতোর প্রাসাদ আজও পর্য্যন্ত অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির পরিচয় পত্র লইয়া উক্ত প্রাসাদ দেখিয়া আসিয়াছি। অন্দর এবং বাহির্বাটী সমস্তই প্রাচীন ধরণের, অনেকটা হিন্দুস্থানী ধরণের। টেবিল চেয়ারের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই তাতামি অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর মাদুরে আচ্ছাদিত মেজে বা ভূমিতল। নানারূপ চিত্রিত পটে দেওয়াল সুসজ্জিত। প্রাচীনকালের চিত্রিত পট বলিতেই বুঝিতে হইবে যে সামুরাই জাতির যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র। যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র ছাড়া কোন কোন স্থানে জীবজন্তুর এবং গাছপালার চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দেখিলে বেশ প্রতীতি জন্মে যে প্রাচ্যের সভ্যতা জাপানে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই বিস্তারিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ছুমিদা নদীর দুই ধারে তোকিও সহর অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে যতকিছু উল্লেখ করিয়াছি সমস্তই ছুমিদা নদীর পশ্চিম তীরে। অপর তীরে রাশি রাশি কল কারখানা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নাই। মারিন স্কুল, কিশারি স্কুল প্রভৃতি কয়েকটী নূতন ধরণের ইন্‌ষ্টিটিউশন সহরের এই অঞ্চলেই। এ অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়ীতেই ছোট খাট কোন না কোন কারখানা আছেই। আমাদের ভারতীয় ছাত্রদের

যাহারা কারখানায় কাজ শিখিতে যায় তাহাদের অধিকাংশকেই ছুমিদা নদীর এই পারে কায শিখিতে আসিতে হয়।

ছুমিদা নদী ক্ষুদ্র হইলেও বাণিজ্য-বহুল; ছোট ছোট ষ্টীমার এবং নৌকায় পূর্ণ; প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর ছোট ছোট ফেরি ষ্টীমার সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আরোহী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অর্দ্ধ কিম্বা এক মাইল অন্তর অন্তরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এই নদীর উপর রিওগোকু জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতু। ইহার উপর বৎসরে জুলাই মাসে একদিন "হানাবি" অর্থাৎ আতসবাজির মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকসমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী রাত্রিকালে তাড়িতালোক এবং আতসবাজির সাহায্যে স্ব স্ব ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকে। সহস্র সহস্র নৌকা সমাগমে সেদিন জলে ও স্থলে যেন কোন ভেদ থাকে না।

নদীর ধারে বসন্তকালে মুকোজিমা নামক স্থানের চেরি প্রস্ফুটিত হইবার সময় প্রায় একমাস কাল সংসার-চিন্তা ভুলিয়া সহস্র সহস্র লোক অপার আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। তখন তথায় রোজই যেন চূড়ামণি যোগ লাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

জাপানের বড় সহরের সহিত ছোট সহরের পার্থক্য কেবল আয়তনে এবং লোকসংখ্যায়। চাল চলন সর্ব্বত্রই এক। রাস্তা ঘাট, ঘর, দুয়ার অধিকাংশ সহরেই এক রকম। উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ শীতপ্রধান প্রদেশস্থ সহরগুলির এবং তোকিও, ওসাকা, কোবে এবং ইয়োকোহামা প্রভৃতি কারবারী সহরের লোকগুলি সুচতুর এবং কর্ম্মঠ।

মার্কিন জাতির ন্যায় জাপানীরা আজকাল সহর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; দেশের গণ্য মান্য এবং নব্য ভদ্রলোকগণ রাজধানী অথবা অন্য কোন বড় সহরে বাড়ী করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সমুদ্রতীরে, হ্রদ অথবা বিখ্যাত জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থানে গ্রীষ্মাবাস দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের মিউনিসিপালিটী আমাদের মিউনিসিপালিটীর ন্যায় নহে। সহরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও নর্দ্দামাগুলি খোলা; ঢাকা সহরের নর্দ্দামার মত। নূতন রাস্তা ঘাট প্রস্তুত কিম্বা পুরাতনের মেরামত ভার মিউনিসিপালিটীর হস্তে। মিউনিসিপালিটীর পার্ক প্রভৃতিতে মিউনিসিপালিটী হইতেই আলো দেওয়া হয়। তাছাড়া দোকানদারগণ এবং সহরের অধিবাসিগণ নিজ নিজ ব্যয়ে স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখে আলো দিয়া থাকে। অবস্থানুযায়ী কেহ তাড়িতালোক, কেহ বা গ্যাসের, আবার কেহ বা কেরোশিনের আলো বাড়ীর সম্মুখদেশে ব্যবহার করিয়া থাকে। আর বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তাতেও গৃহস্বামীই পরিষ্কার রাখিয়া জল সিঞ্চন করিয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীর আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করিবার জন্য বাড়ীর এক পাশে একটি কাঠের বাক্স রাখিয়া দেওয়া হয়। দুই একদিন পর পর উহা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি লোক নিয়োজিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অতি সামান্যই দিতে হয়; যেহেতু আবর্জ্জনা জমির পক্ষে মূল্যবান। উহারা

উহা মফস্বলে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সহরে আলো দেওয়ার জন্য অনেক প্রাইভেট কোম্পানী রহিয়াছে, মাসের শেষে বিল করিয়া আলোর খরচ লইয়া থাকে। বড় বড় সহরে জলের কল আছে। সহরতলি এবং ক্ষুদ্র সহরে কূপের জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাপানীরা অদ্ভুত জীব। হোক্কাইদো দ্বীপে একটি ক্ষুদ্র সহরের লোক সংখ্যা বিশ হাজার। লৌহ এবং কয়লার আকর থাকায় ইহা একটি বাণিজ্যস্থান। কিন্তু এখানে জলের বড়ই অভাব। ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী ছাপ্পোরের সহর হইতে রোজ রেলে তথায় জল নীত হইতেছে।

তোকিওর ন্যায় বড় সহরের রাস্তাতেও জল সিঞ্চনের বেশ বন্দোবস্ত নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দোকানদার এবং সাধারণ বাসিন্দাগণ নিজেদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা সিক্ত করিয়া থাকে। উহারা খোলা নর্দ্দামার কিম্বা নিকটবর্ত্তী খালের জল অথবা নিজ বাড়ীর কূপ অথবা কলের জলই রাস্তায় ছিটায়। আর পাবলিক রাস্তা এবং পার্ক প্রভৃতির জন্য স্থানে স্থানে রাস্তার ধারে কূপ আছে। ভিস্তি একরূপ কাঠের গাড়ীতে জল লইয়া রাস্তায় দেয়।

পায়খানার বিবরণ ভারতবাসীর নিকট একটু অভিনব। সহরে এবং গ্রামে সর্ব্বত্রই পায়খানার প্রচলন, মিউনিসিপালিটীর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই; উহা গৃহস্বামীরই তত্ত্বাবধান। সহরে কতকগুলি কোম্পানী আছে, ময়লা সংগ্রহ করাই তাহাদের ব্যবসা। কোম্পানীনিয়োজিত লোক কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে ময়লা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এক একজন ঐরূপ ৮।১০টী পাত্র একখানা গাড়ীর উপর সাজাইয়া মফস্বলে টানিয়া লইয়া যায়। যে সময়েই তোকিওর পথে বাহির হও না কেন দেখিবে সারি সারি ময়লা গাড়ীর যেন শেষ নাই। জাপানীরা উহার গন্ধে অভ্যস্ত; আমরা কিন্তু নাকে রুমাল না দিয়া চলিতে পারিতাম না। জাপানীদের উহাতে একটু ঘৃণার ভাবও পরিলক্ষিত হয় না। এমন কি সহরের অনেক কেন্দ্রস্থলে ঐ সকল গাড়ীর আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়। জলপথেও বহু দূরবর্ত্তী গ্রামে ঐ সকল গাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। তোকিও সহরে জলপথে নৌকাযোগে উহা রপ্তানী হইবার উল্লেখযোগ্য প্রধান ষ্টেশন আছাকুশার বিখ্যাত হায়াব পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউশানের দ্বারদেশের সম্মুখভাগ। আমাদের দেশে—সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখেও এরূপ ষ্টেশন থাকিতে পারে না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সে বিষয়ে আদৌ আকৃষ্ট হয় না; যেহেতু উহা অনেকটা ধানের বস্তা, তুলার বস্তা, পাটের বস্তা প্রভৃতির ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই ইহাদ্বারা সহজে ব্যারামের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। কোম্পানীর লোকগণ মফস্বলের কৃষকদের নিকট উহা বিক্রয় করিয়া থাকে। গৃহস্বামীকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য মেথরকে কিছুই দিতে হয় না বরং ইচ্ছা করিলে গৃহস্বামী মেথরের নিকট হইতে ময়লার মূল্যস্বরূপ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারে। সাধারণতঃ অনেকেই নগদ মূল্য গ্রহণ করে না। ময়লার পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে শাক শব্জীর ভেট লইয়া থাকে। জাপানে মেথরশ্রেণী বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট

শ্রেণী নাই। যে কেহ পায়খানা পরিষ্কার করিতে পারে, তাহাতে জাতিভ্রষ্ট কিম্বা সমাজচ্যুত হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই।

অনেকেই জানেন যে গরুর বিষ্ঠা জমির পক্ষে মূল্যবান সার। মনুষ্যের বিষ্ঠা উহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান, যেহেতু মনুষ্য গরুর চেয়ে পুষ্টিকর এবং মূল্যবান পদার্থ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের ভুক্ত পদার্থের কিয়দংশ অস্থি, মাংস ও রক্তে পরিণত হইয়া দেহ পুষ্ট করে এবং বাকী অধিকাংশই রূপান্তরিত হইয়া বিষ্ঠারূপে বহির্গত হয়। উহা উদ্ভিজ্জের পরিপোষণে বিস্তর সহায়তা করে। মনুষ্য খাদ্যের সহিত উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকে। অতি অল্প খরচে এই মূল্যবান সার সকলেই লইতে পারে। জাপানে ছোট বড় ধনী দরিদ্র কেহই এ সার জমিতে প্রয়োগ করিতে ঘৃণা বোধ করে না।

মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্সের দায়ে গরীব সহরবাসীকে ঝালাপালা হইতে হয় না। যে যেরূপ চালচলনে চলিতে চায় তেমনি পারে। গরীব ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বাড়ীর সম্মুখে আলো নাও জ্বালাইতে পারে। আর পাড়াপ্রতিবেশীর কলের জলেই তাহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

সহরে এবং বড় বড় গ্রামে গতায়াতের সুবিধার জন্য ট্রাম এবং রিকশার বন্দোবস্ত আছে। তোকিও সহর কলিকাতার চেয়ে অনেক বড় হইলেও সেখানে গাড়ী ঘোড়া এবং মোটরকারের ধূম কলিকাতা হইতে অনেক কম। তোকিও সহর বৈদ্যুতিক ট্রামে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তথায় চারি বৎসর অবস্থান কালে সংবাদপত্র স্তম্ভে একদিনের জন্যেও মোটর গাড়ী কিম্বা বৈদ্যুতিক ট্রামের চাপায় একটী ব্যক্তিরও অপমৃত্যুর সংবাদ অবগত হই নাই। তোকিওর ন্যায় ভারী সহরে ১৫।২০ খানার বেশী মোটর গাড়ীও নাই। ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও প্রায় তদ্রূপই। বাইসিকেল আজকাল ভদ্রলোকে কমই ব্যবহার করিয়া থাকে। ফেরিওয়ালা এবং সংবাদবাহকগণের ভিতরই উহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজের ছেলেরাও ব্যবহার করিয়া থাকে।

গাড়ী ঘোড়ার আড়ম্বর নাই বলিয়াই যে জাপানীরা আমাদের চেয়ে গরীব তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহারা এরূপ ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করে। একবার হায়দরাবাদের নিজামের ভাগিনেয় এক নবাব তোকিও সহরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী এবং সৈন্যবিভাগীয় কাপ্তেনের সহিত তাঁহাদের আগমনের দ্বিতীয় দিবস সহর ভ্রমণে বাহির হই। তাঁহারা কয়েক মিনিটের অভিজ্ঞতাতেই গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতির আড়ম্বর না দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন "আরে ভিকারী সম্রাট রে! আরে ভিকারী মিউনিসিপালিটী রে। আরে ভিকারী জাপান রে।" বলাবাহুল্য মাসাধিক কাল অবস্থানের পর তাঁহাদের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারা তখন দরিদ্র জাপানীদের ভিতরও ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাপক কিছু না কিছু দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিক দরিদ্র চাকরাণীগুলির রাশি রাশি যেরূপ মূল্যবান রেশমী বস্ত্র দেখিতাম আমাদের দেশের বিশিষ্ট অবস্থাপন্না ভদ্র

মহিলারও তেমন আছে কিনা বলিতে পারি না। জাপানের দরিদ্র কৃষকও তিন বার পরিতোষ সহকারে উদর পূর্ত্তি আর রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। তেমন স্বচ্ছল অবস্থা আমরা কি কখন হিন্দুস্থানে আশা করিতে পারি।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

বহ্বারম্ভ।

(১)

নীহারিকা একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আমি যদি এখন মরি, তুমি কি কর?"

সুকুমার গভীর ব্যথার ব্যঙ্গভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "ওঃ। তা হলে?—একটা মস্ত কবিতা লিখে ফেলি!"

নীহারিকা কহিল, "না—ঠাট্টা নয়! সত্যি বল—তুমি ফের বে কর?"

"তুমি আমায় এত অধম ভাব?"

নীহারিকা হাসিয়া বলিল, "দেখা যাবে!"

"কি দেখবে?"

"এই, ফের বে কর কিনা।"

সুকুমার একটু বিরক্ত ব্যথিত হইয়া বলিল—"যদি বে-ই করি তুমি আর দেখবে কোথেকে?"

নীহারিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"সে তখন বুঝবে!"

ইহার কিছু দিন পরে নীহারিকা তার পিতার কর্ম্মস্থল—হাজারিবাগে গেল। তার বড় বোন প্রভাতকুমারীও স্বামীর সহিত তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। অরুণ বাবুর শরীর খারাপ। ছুটি লইয়াছেন—এখন হাজারিবাগেই থাকিবেন। লোকনাথ বাবু, জামাতাকে পৃথক বাটী ভাড়া করিতে দেন নাই।

(২)

এপ্রিল মাসের আর বেশী দেরী নাই। প্রভাত বলিল, "নীহার, আয় সুকুমার বাবুকে 'এপ্রিল্ ফুল্' করি।"

নীহারিকা সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল—"বেশ! আমার একটা প্ল্যানও তৈরি আছে।"

"সত্যি নাকি? কি, বল্ দেখি! যাতে ঠকে, এমন করতে হবে!"

"নিশ্চয়ই ঠক্‌বেন, তা ছাড়া সেই সঙ্গে বেশ একটা রীতিমত একজামিনও করা হবে!"

"তা হলেত খুব মজা!—কি প্ল্যান করেচিস্?"

নীহারিকা বলিতে লাগিল, "একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস্ কল্লুম—'আমি যদি মরে যাই তুমি কি কর'—?"

প্রভাত খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ও হরি! সকলেরি দেখচি এক রোগ!"

নীহারিকা বলিল, "ওমা! তুমিও বুঝি ঐ কথা জিজ্ঞেস্ করো?—তা, কি উত্তর পাও?"

তিনি অম্‌নি চোখদুটো কপালে তুলে

বলেন, "তা হলে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাবো আর কবিতা লিখিব!"

নীহারিকা গালে হাত দিয়া বলিল—"সকলেরি দেখ্‌চি এক প্রেস্কৃপশান!"

"তা যাক এখন তোর প্ল্যানটা কি শুনি।"

"অরুণ বাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি তাঁকে লেখান যাক যে, হঠাৎ হার্টফেল হয়ে আমি মারা গেছি! দেখি কি করেন।"

প্রভাতের মনে প্ল্যানটা তত সুবিধার বলিয়া মনে হইল না; নীহারিকার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "দূর! সেকি ভাল?—"

নীহার বলিল, "তোমার ভয় নেই দিদি, আমি মরবো না!"

"দূর, তা কেন?"

"তবে কি?"

"যদি আবার বে করে বসে!"

নীহারিকার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—সে বলিল, "না, সেটুকু বিশ্বাস আছে।"

প্রভাত কহিল—"তবে আবার একজামিন কেন?"

"ভাল ছাত্রকেও তো একজামিন দিতে হয়!"

প্রভাত কৃত্রিম দুঃখে বলিল—"আহা, বেচারা সেই বেলা থেকে একজামিন দিতে দিতে জ্বালাতন হয়ে গেচে—আবার তোর কাছে একজামিন!'

নীহারিকা হাসিয়া বলিল—"পুরুষের সারাজীবনই ত একজামিন।"

এমন সময়ে অরুণচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন—"আর মশায়রা বুঝি বসে বসে প্রাইজ দিবেন!" অরুণবাবুর দিকে না চাহিয়াই নীহার হাসিয়া বলিল—"সেই রকম ত মনে হয়!"

(৩)

'এপ্রিল ফুলের' প্ল্যান শুনিয়া অরুণচন্দ্র প্রথমটা রাজি হইলেন না কিন্তু হঠাৎ আর একটা মতলব তাঁর মাথায় আসিল—তিনি বলিলেন, "বেশ, আমিও রাজী!"

নীহারিকা ও প্রভাত সকৌতুক ব্যগ্রতার সহিত সুকুমারের পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচ দিনের দিন সুকুমারের নিকট হইতে পত্র আসিল। অরুণ বলিলেন, "নীহার, দেখো, সুকুমার 'মাই ডিয়ার অরুণবাবু'—লিখেই তোমার শোকে চোখের জলে ভেসে গেছে—এই দেখো কাগজ চুপসে গেছে!"

স্বামীর সুগভীর স্নেহ স্মরণ করিয়া নীহারিকার ডাগর চক্ষু দুটী অশ্রুসজল হইয়া উঠিল!

কিছু দিন পরে প্রভাতের নিকট সুকুমারের সম্পাদিত 'মলয়া'র চৈত্র সংখ্যা আসিল। নীহারিকা দেখিল, কাগজের প্রথমেই আর একখানি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র সৃষ্টি হইয়াছে! প্রবন্ধের নীচে লেখা—"অভাগা"।

দুই ভগিনীতে খুব খানিকটা হাসিলেও প্রিয়জনকে কৌতুকের খাতিরে বেদনা দেওয়ায় নীহারিকা অন্তরে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। নীহারিকা বলিল, "না ভাই! আর বেচারাকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, এবার বহরমপুর যাওয়া যাক্!"

প্রভাত রাজী হইল না—বলিল, "আচ্ছা, আর একটু দেরী করনা, বেদনা ও বিরহ আর একটু পেকে আসুক।"

বৈশাখের "মলয়ায়" নীহারিকা দেখিল—

তার ছবি বাহির হইয়াছে—চারি ধারে মোটা কালো 'বর্ডার' মধ্যে একটী করুণ মর্ম্মস্পর্শী সনেট! নীহারের ব্যথিত প্রাণ বহরমপুর যাইবার জন্ত আবার অস্থির হইয়া উঠিল! প্রভাত বাধা দিল। আরো চারি মাস কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে "মলয়াতে" নীহারিকার শোকে অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে! সেই সঙ্গে সম্পাদকের ব্যঙ্গরসাত্মক কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্পও আছে।

নীহার একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রভাতকে একদিন বলিল—"আচ্ছা! তাঁর যদি মন খারাপ তা হলে এমন হাসির লেখা বেরুচ্চে কেমন করে?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল—"ঐটি পুরুষদের বিশেষ তো লেখক জাতের বাহাদুরী!—আরো এরকম কাণ্ড আমি দেখেছি!"

নীহারিকা বলিল, "তবে কি পুরুষের হাসাও মিছে কাঁদাও মিছে?—"

"ভাদ্রের রোদবিষ্টি কি মিছে?"

"মিছে নয় বটে কিন্তু কোন কাজেরও নয়—সে জলে মাটিও তেমন ভেজেনা, সে রোদে কাপড়ও শুখোয় না!

(৪)

আশ্বিন মাস। ছুটির আগেই 'মলয়া' বাহির হইবার কথা। নীহারিকা ভাবিতেছিল, এবার পূজার সংখ্যার ছদ্মাবরণে প্রিয়তমের ব্যথিত প্রাণের আর একটু ভাবতরঙ্গ পাইব—না জানি পূজার 'মলয়া'র ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে তাঁর কত ব্যথা কত মর্ম্মপীড়া কত অশ্রুসিক্ত ভালবাসা নিহিত আছে!—সত্যই আমি নিষ্ঠুর!—বড় নিষ্ঠুর—একজনের প্রাণের ব্যথা নিয়ে আমোদ কৌতুক!

এমন সময় প্রভাত পিছন হইতে বলিল—"নীহার! নাঃ! সুকুমারটা শেষে ফেল্-ই হ'ল।" কথাটা বলিয়া আশ্বিনের 'মলয়া'খানা তার সম্মুখে ফেলিয়া সে চলিয়া গেল!

"সুকুমার ফেল্!"—নীহারিকার মুখের রংটা পাঁশের মত হইয়া গেল। সে কম্পিত হৃদয়ে, 'মলয়ার' পাতা খুলিয়া দেখিল সুকুমারের নব-পরিণীতা স্ত্রীর ছবি—এমন সুন্দর অথচ এমন কুৎসিত বুঝি নীহারিকা জীবনে কিছু দেখে নাই! আবার ছবির তলে চারি লাইন কবিতা—

"ক্ষমা কর তুমি দেবী!—অতীত প্রতিমা!
তুমিই এসেছ ফিরে নব প্রতিমায়
ধুইয়া স্বর্গদানীরে মৃত্যুর কালিমা,
এই জ্ঞানে স্থাপিয়াছি এ চারুবালায়!"

নীহারিকার চক্ষু ফাটিয়া যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল! নীহারিকার মৃত্যুসংবাদ তার স্বামীকে ব্যথা দেয় নাই—কবিতার উপাদান যোগাইয়াছে মাত্র!—যে নারী স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে আমরণ জাগাইয়া রাখে, সেই স্বামী স্ত্রীর চিতার আগুন না জুড়াইতেই আবার ঘটকের দ্বারস্থ হয়!—নীহারিকা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই যেন তার বুকটা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল!

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল—"এ কি! নীহার তুমি বেঁচে!"

নীহার চমকাইয়া উঠিল—দেখিল,—তার স্বামী!

সুকুমার হাসিয়া বলিল "সতীনের হাতে স্বামীটিকে দিয়ে বুঝি স্বর্গে মন্ টিঁকল না? এখন সতীনটিকে আদর করে ডেকে আনো! গাড়ীতে বসে আছে।"

নীহার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"বেশত! চল না!"

সুকুমার বলিল—"ইস্—থাক্ না!—এখনি আবার স্মেলিং সল্টের দরকার হবে!"

নীহারিকা বলিল—"তুমি ত আচ্ছা লোক! কাগজে ছাপালে কেমন করে?"

এমন সময় প্রভাত ও অরুণচন্দ্র সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীহার তাঁর দিকে ফিরিয়া বলিল—"অরুণবাবু, শেষে আপনার এই বিশ্বাসঘাতকতা!"

অরুণবাবু সহাস্যে বলিলেন "কি করি বল! পাখোয়াজের দুদিকেই ঘা দিতে হয়, নহিলে যে বেসুরো বাজবে! তোমরা দুই বোনে এককাট্টা হয়ে বেচারাকে জব্দ করতে গিছলে, আমি একটু তাঁর পক্ষ নিয়েছিলুম—আবার কোন্ দিন আমায়ও তো অমনি করতে পারো! তখন কে সহায় হবে, বল!"

নীহারিকা বলিল—"নাঃ, আপনার জন্যই আমাদের এই হারটা হল!"

প্রভাত বলিল—"আচ্ছা, সে যেন হোল—কিন্তু সেই সঙ্গে 'মলয়া'র এতগুলি নিরীহ পাঠক কি অপরাধ করেছিল যে তারাও ঠক্‌ল!"

সুকুমার হাসিয়া বলিল—"ওহো ও কথানা আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল্ কাপ!"

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

বৌদ্ধ ও প্রাচীন মোগল চিত্রশিল্প।

আশ্চর্য্যের বিষয় অজন্তার ছবির মধ্যে আমরা বাঙ্গলাদেশের দৃশ্যের আভাষ পাই। প্রথমত আমরা গুহার নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে গিয়ে যত কুটীর দেখেছি, সব-গুলিরই মাটীর ছাদ; কিন্তু, অজন্তার ছবিতে অবিকল বাঙ্গলার মত আটচালা! ও দেশের লোক নারকল গাছ চোখে দেখেনি; কিন্তু ছবিতে নারকল গাছ যথেষ্ট! বঙ্গদেশে যেমন উঁচু বৃষস্কন্ধ দেখা যায়, অন্য কোন দেশের ষাঁড়ের বোধ হয় তত উঁচু কাঁধ নয়; অজন্তার ১ নং গুহায় ষাঁড়ের লড়াইয়ের ছবিতে ঠিক আমাদের দেশের ষাঁড়ই অঙ্কিত। এই সমস্ত দেখে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশ থেকে কোন ছাত্র অজন্তার শিল্পাশ্রমে চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে গিয়েছিলেন। কিছুই বিচিত্র নয়! আবার নয় নম্বর গুহায় থামের গায়ে আঁকা যে কয়েকটি বুদ্ধদেবের ছবি আছে—সেগুলি অবিকল চীন ছবির অনুরূপ! তা দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, চীন কারি-কর এদেশে এসে আমাদের চিত্রশিল্প শিখে গিয়েছিলেন। আমি এখানে অনেক জায়গায় রোমশিল্পের আভাসও দেখেছি। গ্রীক প্রভৃতি বিদেশীয়গণও যে এ দেশে শিল্পশিক্ষার অভিপ্রায়ে এসেছিলেন—এ থেকে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়। যাঁরাই এসেছেন তাঁরাই এখানে নিজের দেশের শিল্পের কিছু কিছু রেখে গেছেন। চীন ও জাপান-বাসীরা ত স্বীকারই করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

দেশের শিল্প-বিদ্যাও তাঁদের দেশে এবং অন্যান্য সকল দেশে গেছে।

অনেকে মনে করেন পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রের আদর্শ জাপান চিত্র হইতে গৃহীত—অজন্তার ছবি দেখলে কিন্তু এ ভ্রম একেবারেই দূর হয়ে যায়। তাঁর চিত্র—এমন কি সেই চিত্রের প্রাণ পর্য্যন্ত যে ভারতবর্ষীয় তাহা অজন্তার চিত্র দেখলে আর সন্দেহ থাকে না।

ইংরাজেরা নয় নম্বর গুহাকেই অন্যান্য সকল গুহার চেয়ে বেশী প্রাচীন বলেন,—কেন জানি না। তাঁরা বোধ হয়, গুহার অনেকগুলি ছবিতে অপকৃষ্ট অসভ্যের আকৃতি দেখ্‌তে পান বলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন! কিন্তু, সেই গুহাটাতেই আবার আমরা 'বুদ্ধদেবের প্রচার' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছবিও দেখেছি। তবে, থামের গায়ে খোদা যে একটা লেখা আছে সেইটে ধরে' যদি—তাঁরা কিছু আবিষ্কার করে থাকেন ত' সে কথা স্বতন্ত্র!

আমরা অজন্তার ছবিগুলিতে মাত্র দু-এক যায়গায় পালি অক্ষরেরর মত লেখা দেখেছিলুম। আর পাথরের দেওয়ালের উপর খোদা লেখাও দু একটা গুহাতে পেয়েছি। সেগুলিতে ঐতিহাসিকদের জান্‌বার বিষয় অনেক থাকৃতে পারে। আমরা এক, নম্বর, দুই, নয়, দশ, ষোল, সতের, ঊনিশ প্রভৃতি নম্বরের কতকগুলি গুহা ভিন্ন, আটাশটা গুহার মধ্যে অন্য কোনটাতে বড় একটা ছবি দেখ্‌তে পাইনি। পথ না থাকায় একটা গুহাতে তো একেবারে যাওয়াই গেল না। অল্পসংখ্যক কতকগুলি গুহা অসম্পূর্ণ ভাবে পড়ে আছে। কোনটার কেবল বারান্দাটুকু খোদা মাত্র হয়েছে, কোনটা কেবলমাত্র খুদ্‌তে আরম্ভ করেছিল; পাহাড়ের গায়ে বাটালীর দাগ এখনও বেশ পরিষ্কার ফুটে আছে! দেখ্‌লে মনে হয় যেন এইমাত্র শিল্পীরা বসে বসে কাট্‌ছিল, পরিশ্রান্ত হয়ে যে যার বাড়ী গেছে। কতকগুলিতে পূর্ব্বে ছবি ছিল,—কিম্বা আঁকা হচ্ছিল—কালে মাটী চাপা পড়ে সেগুলি একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! অজন্তার বেশীর ভাগ ছবি একেবারে লুপ্ত ও নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও তাকে অক্ষয় ভাণ্ডার বলা চলে। যে সব ছবি এখনও বর্ত্তমান আছে সে গুলির আমরা কেউ যদি আজীবন ধবে প্রতিলিপি (copy) করি, তবে, এ জীবনে সেগুলি শেষ করে উঠতে পারি কিনা সন্দেহ!

আমি এইবার অজন্তার বিশেষ বিশেষ কয়েকটা ছবির বিষয় কিছু বো'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'র্‌ব। প্রথম নম্বর গুহায় আমরা একটা বিশাল, সৌম্য, ও সুন্দর কান্তি বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের ছবি গুহাটীকে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে দেখ্‌তে পাই। সেখানি বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের চিত্র ব'লে মনে হয়। সেই ছবি খানিতে চিত্র-শিল্পিরা বাস্তবিকই তাঁদের মহৎ ও উদার অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়ে গেছেন; কেন না, তাঁদের মন সেরূপ উচ্চ না হ'লে ছবিতে তেমন বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা ভাব কখনই দেখাতে পার্‌তেন না। সাধারণতঃ কবিদের লেখায়, আর চিত্রকরের চিত্রে তাঁদের চিত্তের ভাব প্রতিফলিত হ'তে দেখা

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ।

(অজন্তার প্রথম গুহার চিত্র হইতে)

যায়। এক নম্বর গুহার মধ্যে "বুদ্ধদেবের প্রলোভন" ছবি খানিও সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জক চিত্র। সে ছবি খানিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও পরিবেষ্টিত হ'য়ে ভগবান বুদ্ধদেব অটল-গম্ভীর ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন! তিনি শত-সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থেকেও মনে মনে তাদের চেয়ে ঢের তফাতে যেন কোন শান্তির আলোকময় রাজ্যে ভাসচেন! আর তাঁর জড়-তনু খানি সেখানে প্রাণশূন্য হ'য়ে পুতুলের মত বসে আছে। এদিকে আশে-পাশে চারিদিকে ছদ্মবেশী শত্রুরা তাঁকে প্রলোভিত করবার জন্য যার-যতদূর সাধ্য চেষ্টা করচে। কাম সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি ধরে, লোভ চাকরবেশে, মোহ দানব সেজে, মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতিরা আরও রকম রকম মূর্ত্তি ধরে তাঁকে প্রলোভিত করবার নানা রকম কৌশল করচে। রাজসভায় দুজন পণ্ডিতের তর্ক বিতর্কের ছবিখানি অত্যন্ত কৌতুকজনক! এক নম্বর গুহায় যে একটা প্রকাণ্ড ভীষণ দর্শন সাপের ছবি আছে, সেটা এত স্বাভাবিক যে, হঠাৎ দেখ্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তে হয়!

সতের নম্বর গুহায় উৎকৃষ্ট ছবির সংখ্যা কিছু বেশী। অন্যান্য ভাল ভাল ছবির মধ্যে ভিখারী বেশী বুদ্ধদেবের সাম্‌নে মাতৃমূর্ত্তির ছবি খানিতেই গিরিগুহাটী অলঙ্কৃত করে তুলেছে। মা ছেলের হাত ধরে তাকে দিয়ে বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে গেছেন, অবশেষে মহাত্মা বুদ্ধদেবের সৌম্যোজ্জ্বল কান্তি দেখে, ভক্তি-প্রেম-বিহ্বল হ'য়ে তাঁর চরণ-প্রান্তে পুত্র সমেত নিজেকে নিবেদন করতে যাচ্ছেন! অন্তর্য্যামী বুদ্ধদেবও যেন তার মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পেরে নত হয়ে তাদের দেওয়া ভিক্ষা সাদরে গ্রহণ কর্‌ছেন! ভিক্ষাপাত্রধারী বালকটীর মুখে সরল-নির্ভীক-হৃদয়ের মাতৃ-ভক্তি ও আনুগত্যের ভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে! বুদ্ধদেবকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন তাঁর অন্তর-নিভৃতে কি এক কোমল করুণ সুর বাজচে, যেন তাই তিনি অপরের বেদনায় ব্যথিত, দুঃখে দুঃখিত, এবং ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল!—এক কথায়—ছবি খানিতে জননীর স্নেহ, ভক্তের প্রেম, বুদ্ধদেবের করুণা এবং পুত্রের আনুগত্যের ভাব সুন্দর ফুটেছে! বুদ্ধের ছবি খানি মাতৃমূর্ত্তির দ্বিগুণ বা ততোধিক বড়। তা'তে বোধ হয় যে, মাতৃমূর্ত্তির হৃদয় পটে মহাতাপস বুদ্ধদেবের যে বিশাল ও উদার ছবি খানি প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই ভাবটা দেখাবার জন্যেই শিল্পী বুদ্ধ মূর্ত্তীকে ও রকম অস্বাভাবিক বড় করে এঁকেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছবির এখন শুধু বুকটুকুই বর্ত্তমান! কিন্তু তাতেও তার সৌন্দর্য্য লোপ পায়নি।

সতের নম্বর গুহায় সিংহল বিজয়ের চিত্র-গুলিতে আমরা ধর্ম্ম যুদ্ধের আদর্শ দেখ্‌তে পাই। যাঁরা কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পুরাকালের যুদ্ধ-প্রণালী আর নারাচ, বজ্র, শেল, শূল আদি নানারকম অস্ত্র ও অস্ত্রের চালনা কিরূপ ছিল জানতে চান, তাঁরা সিংহল বিজয়ের ছবি গুলিতে তা' দেখ্‌তে পাবেন। কোন কোন যায়গায় (সম্ভবতঃ সিংহলের) দুর্গদ্বারে বিপক্ষের অশ্বারোহী আর পদাতিক যোদ্ধার দল বীর-দর্পে ও মহোল্লাসে যেন মেদিনী কাঁপিয়ে প্রবেশ কর্‌ছে।

পরাজিতেরা এখনও সম্মুখ সমরে তৎপর। এই যুদ্ধ ব্যাপারের ছবিগুলি দেখলে মনে বাস্তবিক আলো আঁধারের মত আনন্দ ও আতঙ্কের উদ্রেক হয়! সিংহল বিজয়ের ছবিগুলিতে আমরা প্রাচীন অর্ণবপোতের ছবি দেখতে পাই। এক যায়গায় একটা মিছিলের চিত্রে কতকগুলি লোক আনন্দে চীৎকার করচে, কতকগুলি লোক হাতীর পিঠ থেকে ভেঁপু বাজাচ্চে। তাদের ভাব-ভঙ্গি একমনে কিছুক্ষণ দেখলে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের কিম্বা কল্‌কাতার বড়লোকের বিবাহের সমারোহের বাদ্যকোলাহলময় শব্দ, কানে যেন খুব স্পষ্ট ভাবে এসে লাগে। ছবিতে এরকম ভাব দেখান কম ক্ষমতার কাজ নয়। মৃগয়ার ছবিগুলিও বেশ চিত্তরঞ্জক! সেগুলি আজ কালকার মত 'ফাঁসকল' পেতে শীকার করার ছবি নয়। তাতে অনেক বিষয় বোঝবার ও দেখবার আছে। হরিণদের স্বাভাবিক ভয়বিহ্বল চপলভাব আর শিকারীদের মৃগয়াকৌশল তাতে সুস্পষ্ট। নর-নারীর বিলাসচিত্র ও দাম্পত্য প্রেমের ছবিও যথেষ্ট পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৭ নং গুহায়, প্রবেশ দ্বারের উপর কতকগুলি দম্পতির ছবি উল্লেখযোগ্য। আর এক জায়গায় কোন কামিনী বসন্ত আগমনে হৃষ্টচিত্তে বাসন্তি রঙের কাপড় প'রে দোলনায় দুলছে; তার আননে ও গঠনে যৌবনের ধীর ও প্রফুল্ল ভাব সুন্দর ফুটেছে! ৯ নম্বর গুহায় একস্থানে দুয়ারের দুধারে দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একতলার সমান বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে; সে দুটীর মধ্যে একটি এখন অস্পষ্ট ছায়াকার হয়ে পড়েছে আর একটীর কেবল শ্বেত শতদলের উপর চরণ কমল দুটী অবশিষ্ট! চরণ দুটী এত সুন্দর ও ভাবপূর্ণ যে, তার তলায় পড়ে থাকৃতে ইচ্ছে হয়! আবার ঐ গুহাতেই গগনচারিণী দেবকন্যাদের কতকগুলি পা দেখেছি অতি আশ্চর্য্য ভাবে আঁকা! সেগুলো দেখ্‌লেই তারা যে শূন্যে মেঘের কোলে ভাস্‌চে সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকে না! ১৯ নম্বর গুহার এক জায়গায় একটা পুষ্পিত পলাশ গাছের গুঁড়ির উপর সারবন্দী পিঁপড়ের দল উঠছে। শিল্পীরা একটা সামান্য পিঁপড়ে থেকে হাতী ঘোড়া লোক লস্কর প্রাসাদ প্রাচীর—দুনিয়ার কিছুই যেন বাদ দেন নি।

খানিকক্ষণ ধরে ছবি দেখতে দেখতে আমরা এমন তন্ময় হয়ে পড়তুম যে বাইরের সমস্ত বিষয়, এমন কি নিজের বিষয়ও যেন ভুলে যেতুম! আমাদের মনে কেবল সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কাল জেগে উঠত। আমরা যখন যে ছবিটার কাছে দাঁড়াতুম, তখন, এজগতের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে তাতেই ডুবে যেতুম! হয়ত, আমি কোন একটা মিছিলের ছবি দেখচি, দেখতে দেখতে মনে হ'ত আমিও বুঝি সেই মিছিলের মধ্যের একটা লোক! কোলাহল দেখতে দেখতে কোলাহলে যোগ দিতে ইচ্ছা হ'ত। কখন হয় ত, কোন পারিষদ্‌বর্গ বেষ্টিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজার দরবারের ছবি দেখে মনে হত, যেন, ত্রেতাযুগে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে কোন বিষয়ের প্রার্থী হয়ে এসেছি। কোথাও যদি গান বাজনা হচ্চে এরকম ছবি দেখতুম, তো

সেখানে শ্রোতা হয়ে যেতুম! চির-মৌন ছবি-তেও যেন রাগ-রাগিণী বেজে উঠ্‌তো! চিত্রে এরকম আশ্চর্য্য ভাব খুব কমই দেখা যায়। ছবিগুলি দেখে ঠিক্ যে ভাব মনে উদয় হতো তা' ভাষায় জানান আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব! আমি এ জীবনে সেই সব ভাব কখনও ভুল্‌তে পারব না। অজন্তার প্রথম নম্বর গুহা থেকে বুদ্ধদেবের জীবনের বাল্যের ঘটনা আরম্ভ করে, ২৬নং গুহায় তাঁর চির নির্ব্বাণের চিত্র দেওয়া আছে। এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অনেক স্থানে তখনকার প্রচলিত উপকথা ও জাতকাদি গল্পের ছবি আছে।

অনেকে অজন্তার ছবিকে নগ্ন বলে উপহাস করে থাকেন; কিন্তু, এর নগ্নভাব আর বিলাতি নগ্নভাবের মধ্যে অনেক প্রভেদ! ইউরোপীয় ছবিতে নগ্নতা বিশেষ করে নগ্নতার ভাবই মনে করিয়ে দেয়, আর অজন্তার ছবিতে নগ্নতা কেবলমাত্র গঠনের সৌন্দর্য্য দেখায়! এ সম্বন্ধে মোগল ছবি অজন্তাচিত্রেরই অনুরূপ।

হেমেন্দ্র রায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে অজন্তা গুহাগুলির অবস্থা ও বিবরণ সুন্দর ভাবে লিখেছেন। তাই বাহুল্যভয়ে আর সে সব কথা এ প্রবন্ধে লিখতে চাইনা। মোট কথা,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হিসাবে মোগল চিত্র শ্রেষ্ঠ হলেও চিত্র হিসাবে অজন্তার ছবি ঢের মূল্যবান।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

নর্ত্তকী।

(কুশীলব)

বীরসিংহ···রাজ-সেনাপতি।

রাধাবাই···নর্ত্তকী।

হেমরাজ···অজ্ঞাতপরিচয় যুবক।

তরুণসিংহ...বীরসিংহের সহকারী।

দৃশ্য—সজ্জিত প্রমোদ-কক্ষ। মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়া অদূরস্থ নদী দেখা যাইতেছিল। কাল, জ্যোৎস্না-রাত্রি।

রাধা বাতায়ন পার্শ্বে মখমল-আস্তীর্ণ উচ্চাসনে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছিল।

রাধা—(গীত)

ক্যায়সে মুসে রহেনা যায় সামেলিয়াসে
প্রীতিকর পাছে তানি,
ক্যায়সে করু ক্যায়সে করু মেরি সজনি—
পিয়ারে সুরত সামেলিয়া—

বীরসিংহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বীরসিংহ—চারিধার নিস্তব্ধ হয়েছে, রাধা!

রাধা—এখনো তার দেখা নেই।

বীরসিংহ—বেচারা জানেনা সে কি ফাঁদে পা দিয়েছে—আজ সে বন্দী হবে! আমি আড়ালে সরে যাই! কিন্তু এখনো সে দেরী করছে কেন? সে কি কোন সন্দেহ করেছে?

রাধা—আসবে কি না, তাই বা কে জানে?

বীরসিংহ—তাহলে তোমায় ধিক! এমন

রূপের আগুন জেলে রেখেছে'—তুচ্ছ এ পতঙ্গটা কি ঝাঁপ দেবে না' ? রাধা—

রাধা—চুপ! কি সুন্দর রাত্রি! চাঁদের আলোয় চারিধার ছেয়ে গেছে—যেন আগাগোড়া স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে!

বীরসিংহ—থাক্—আমি তা দেখতে চাইনে! এমন চাঁদের আলো, এমন তুমি, তা হলে সব কাজ মাটি হয়ে যাবে! কি সুন্দর তোমাকে আজ দেখাচ্ছে, রাধা!

রাধা—একটা কঠোর দস্যুর প্রাণ টলাবার জন্য এত আয়োজন—

বীরসিংহ—সব কি পণ্ড হবে?

রাধা—না—কুহকিনীর কুহকের শক্তি অসাধারণ—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সেনাপতি, যদি সে আসে ত আজ রাত্রে বন্দী করে তাকে তোমার হাতে দেব, নিশ্চয়—

বীরসিংহ—আঃ কি সে সম্মান, কি সে গৌরব, তার পর, রাধা, তুচ্ছ সংসার, তুচ্ছ কর্ত্তব্য সব থেকে অবসর নিয়ে তোমারি প্রেমে ডুবে থাকব! সে কি সুখ, কি আরাম—

রাধা—সে কথার সময় আছে, সেনাপতি! এখন মোহের ফাঁদে ধরা পড়ো না—

বীরসিংহ—রাধা—রাধা—তুমি আমায় কি করেছ—জানোনা তুমি!—নারীকে কখনো আমি জানবার অবসর পাইনি! মানুষ মারার নানা কৌশলের মধ্যেই এতদিন মগ্ন ছিলাম। তার পর এই দুর্বৃত্ত দস্যু চাঁদরায়কে ধরবার নানা চেষ্টা বিফল হল, শেষে তাকে ধরবার জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ করলাম—তুমি যখন একলা বসে নিজের মনে গান গাও, আমার প্রাণের মধ্যে কি যেন একটা অভাব হাহাকার করে ওঠে! তোমার পাশে বসে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকতে শুধু সাধ যায়! আমাকে কি এক নেশায় তুমি মাতিয়ে তুলেছ—এমন বেণী দুলিয়ে রঙীন কাপড় পরে গোলাপী ওড়না উড়িয়ে যখন তুমি বসে থাকো, তখন আমার কি সাধ যায়—জানো—

রাধা—চাঁদরায় জানলার ধারে আমাকে প্রথম দেখে—চোরের মত সে এসেছিল! আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে ভেবে সে তা লুণ্ঠন করতে এসেছিল—জানেনা যে আমি ব্যাধের মত বসে আছি! আমি তখন গান গাচ্ছিলাম—তন্ময় হয়ে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল—তার পর পাগলের মত এসে কি সব বললে—আমার মনে যে কি আহ্লাদ হল—পাখী ধরবার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল—পাখী এসে আপনা-হতে সে ফাঁদে পা দিয়েছে—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আর কোন আশঙ্কা রইল না—যে কাজের জন্য সেনাপতির নিমক খেয়েছি—সে নিমকের মর্য্যাদা থাকবে—

বীরসিংহ—আর সেই সঙ্গে সেনাপতিকে এমন ভাবে জয় করে বসেছ যে সে চিরজন্ম তোমারি কাছে বন্দী থাকবে! এমন পরাজয় হয়েছে আজ তার!

রাধা—প্রেমের কথা তুলো না—সেনাপতি! আমি হীন নর্ত্তকী—রূপ ব্যবসায়িনী আমি, আর তুমি সম্ভ্রান্ত রাজপুত সেনাপতি—এ সাম্রাজ্যের ভিত্তি তুমি!

বীরসিংহ—যাক সে ভিত্তি রসাতলে!

রাধা—চাঁদরায়ই যে হেমরাজ কেমন

করে জানলে, তুমি? সে জানে, আমি কোন সর্দ্দার-কন্যা! আমার প্রেমে বিভোর হয়ে পড়েছে সে।

বীরসিংহ—এটা তার সুবুদ্ধিরই পরিচয়!

রাধা—সে জানেনা, সন্দেহ করবারো সে কোন অবকাশ পায় নি যে, আমি একজন সামান্যা নর্ত্তকী মাত্র—তাকে ধরবার জন্য বিরাট আয়োজন করে বসে আছি! সে এমন বশ মেনেছে যে আমার কথায় স্বচ্ছন্দে সহরে যেতে এখন সে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করবে না!

বীরসিংহ—রাধা, আমাকে ত আশ্বাসের কথা কিছু বললে না, তুমি!

রাধা—সে কথার এখনো ত সময় যায়নি, সেনাপতি!

বীরসিংহ—এমন সুন্দর তুমি, হায় নারী, আবার এমনি নির্ম্মম! পাষাণের প্রতিমা!

রাধা—সেনাপতি বীরসিংহ, প্রেমোচ্ছ্বাসের সময় এ নয়!

বীরসিংহ—সময় নয়, কি বল, রাধা? এমন জ্যোৎস্না রাত্রি, এমন নিস্তব্ধ দিক, এমন শান্ত সুন্দর তুমি, এমন নির্জ্জন—

রাধা—চুপ! দূরে ঐ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ! তুমি আড়ালে যাও -

বীরসিংহ—রাধা, ধিক এ কর্ত্তব্যে!

প্রস্থান।

রাধা—(আপনার মনে গান ধরিল।)

দেখে বিনু কল নাহি পরত চায়ন মোহে
ছিপি রহে বনোয়ারী মোরি সজনি,
কোই দেউনা বাতাওয়ে—

হেমরাজের প্রবেশ।

হেমরাজ—রাধা!

রাধা—হেম!

হেমরাজ—এত রাত্রে এখনো তুমি একলাটি বসে আছ!

রাধা—(হেমরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।)

হেমরাজ—এখনো তুমি জেগে আছ, রাধা?

রাধা—হুঁ! কিন্তু তোমার এত দেরী হল কেন, হেম! এত রাত্রে কি এমন তোমার কাজ ছিল!

হেমরাজ—সে কথা জিজ্ঞাসা করোনা, আমাকে! (রাধার হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল) আমারি জন্য তুমি বসে আছ, রাধা?

রাধা—(হেমরাজের মুখের পানেই সে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর দিল না।)

হেমরাজ—(রাধার হাত ছাড়িয়া) তুমি জানোনা—আজ সারাক্ষণ কি যন্ত্রণা আমি ভোগ কচ্ছি!

রাধা—বল, আমাকে! (হেমরাজের হাত ধরিল) বলবে না?

হেমরাজ—আমাকে স্পর্শ করোনা, তুমি! তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও আমার নেই! আমি আজ বিদায় নিতে এসেছি।

রাধা—বিদায়? কোথা যাবে, তুমি?

হেমরাজ—জানি না। তবে তোমার সামনে আর আসবো না, কখনো!

রাধা—আমাকে তুমি গ্রহণ করবে, বলেছ ত!

হেমরাজ—তা হয় না, রাধা!

রাধা—কেন? কি দোষ করেছি আমি?

হেমরাজ—দোষ তোমার নয়, রাধা, দোষ আমার!

রাধা—তোমার? কি, সে? এত ভালবাসা—

হেমরাজ—সেই ভালবাসার জন্য আমি দূরে যেতে চাই! রাধা, সূর্য্য তুমি, আমি পথের মলিন ধূলিমাত্র! তোমার দীপ্ত আলোর সামনে আমার মলিনতা আরো ব্যক্ত হয়ে ওঠে। তুমি আলো, আমি অন্ধকার!

রাধা—এ তুমি কি বলছো, আজ?

হেমরাজ—বুঝতে পারছ না? তবে শোন বলি—

রাধা—(বসিল) বল!

হেমরাজ—(চকিতভাবে) ও কিসের শব্দ?

রাধা—কিছু না!

হেমরাজ—আমার মনের তা হলে! রাধা যা বলব তা শুনলে এখনি সমস্ত আলো নিভে যাবে—বাতাস স্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশ কেঁপে উঠবে, তুমিও স্তম্ভিত হবে—তবু শোন···রাধা আমাকে চেননা তুমি, আমি সর্দ্দার নই, ওমরাহ নই, আমি ঘৃণিত দস্যু! রাজদণ্ডে দণ্ডিত!

রাধা হেম——

হেমরাজ—আমি সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু চাঁদ রায়—তোমাকে যা বলেছি, মিথ্যা! সব মিথ্যা! তাই আজ তোমার পথ থেকে সরে যেতে চাই! এ মণি রাজার মুকুট-শোভার জন্য, হীন দস্যুর বুকের জন্য নয়, রাধা!

রাধা—আমি তোমায় ভালবাসি, হেম!

হেমরাজ—ভুলে যাও, রাধা, দুঃস্বপ্নের মত আমার কথা ভুলে যাও, তুমি! আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম—অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল! কিন্তু তোমার নির্ম্মল প্রেমের যোগ্য নই, আমি!

রাধা—তবু আমি ভালবাসি, হেম! তুমি দস্যু হও, যে হও, তবু তুমি আমার সর্ব্বস্ব!

হেমরাজ - না! তুমি ভালবাস সর্দ্দার হেমরাজকে, দস্যু চাঁদরায় তোমার ভালবাসার যোগ্য পাত্র নয়, রাধা!

রাধা—হেম!

হেমরাজ—কি?

রাধা—তবে আমারো কিছু বলবার আছে। শোন—আমিও মিথ্যা বলেছি—আমি সর্দ্দারকন্যা নই, হীন নর্ত্তকী, আমার নাম লছমি! তোমাকে ধরবার জন্য শুধু ফাঁদ পেতেছিলাম রাজার আদেশে,—কিন্তু কি ফাঁদে ধরা পড়েছি, তা তুমিই জানো!

হেমরাজ—নর্ত্তকী লছমী! রূপব্যবসায়িনী লছমী—

রাধা হাঁ, হীন, অতি হীন নর্ত্তকীর প্রাণ তোমারই প্রেমে সে আজ নূতন রূপে ভরে উঠেছে! জীবনে এই প্রথম সে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে! তা থেকে বঞ্চিত করোনা তাকে!

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, লছমী নয়, লছমী মরেছে, আমি রাধা!

হেমরাজ—রাধা, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল, তুমি?

রাধা—কি কথা?

হেমরাজ—যে আমাকে তুমি ভালবাস, যে আমি তোমার সর্ব্বস্ব!

রাধা—বিশ্বাস কর, হেম, সত্য বলছি, এ

কথা বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে এমন সত্য আর কিছু নেই!

হেমরাজ—আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে তুমি, অথচ...

রাধা—অথচ নিজেই আমি কি এক নূতন ফাঁদে ধরা পড়েছি!

হেমরাজ—এ কথা সত্য?

রাধা—সত্য, তোমার পদ স্পর্শ করে বলছি, এ কথা সত্য! আজ যখন তোমারি প্রতীক্ষায় এখানে এসে বসলাম তখন চারিধার জ্যোৎস্নায় ভবে গেছে—কি সে সৌন্দর্য্য, কি সে শোভা—মনে তৃপ্তি ছিল না। তোমার জন্য প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল—কি অধীর তীব্র সে ব্যাকুলতা! সেই সময় প্রথম জানলাম এ খেলা নয়, প্রেমেরি জটিল বন্ধন! সে বন্ধন ছেদন করবার শক্তি আমার নেই! সে এমনি দৃঢ়!

হেমরাজ—রাধা, তুমি জানোনা, কাল যদি ঘুণাক্ষরে এ কথা সন্দেহও করতাম আমি, তাহলে তোমার ঐ কোমল বুকে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করতাম না! (বক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিল) এই দেখো!

রাধা—তাই করো—তোমার উপেক্ষার চেয়ে শাণিত ছুরিই আমার আদরের, গৌরবের, লাভের!

হেমরাজ—না—দূর হোক, এ ছুরি—(ছুরিকা বাহিরে ফেলিয়া দিল)—রাধা—

রাধা—কি?

হেমরাজ—জীবনে আমার আর কোন স্পৃহা নেই! সেনাপতিকে ডাক—প্রহরীদের ডাক--আমায় তারা বন্ধন করুক!

রাধা—না!

হেমরাজ—তবে আমি আত্মসমর্পণ করিগে, চাঁদরায়ের অস্তিত্ব এ পৃথিবী থেকে মুছে যাক!

রাধা—না, না!

হেমরাজ—তবে কি চাও, তুমি?

রাধা—চল হেম, লোকালয় ছেড়ে বনে যাই! দুজনে থাকব...দুজনে শুধু—তুমি প্রভু, আমি দাসী! বনের মাঝে হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, কোন কোলাহল নেই!

হেমরাজ—লছমী—

রাধা—না, রাধা আমি! আমার সমস্ত অতীত কলঙ্ক মুছে পায়ে যদি না স্থান দাও আমাকে, তবে হত্যা কর, এখনি হত্যা কর (হেমরাজের পদতলে লুণ্ঠিতা হইল।)

হেমরাজ—(নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া) রাধা, ওঠ—(রাধা দাঁড়াইল।) এ প্রেম কতদিনের জন্য! এমন মিথ্যা হতে সন্দেহ হতে, প্রবঞ্চনা হতে যে প্রেমের সৃষ্টি. য প্রেম সত্যের উপর, মর্য্যাদার উপর, ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে প্রেম কত দিন!

রাধা—তবু সে প্রেম!

হেমরাজ—কে জানে এ-ও ক্ষণিকের খেলা নয়? খেলায় আমার সাধ নেই! রুচিও নেই!

রাধা—উপরে ঐ অনন্ত আকাশ তার শপথ, এ প্রেম চিরদিনের—মেঘশূন্য ঐ আকাশেরই মত সুন্দর, উদার, নির্ম্মল এ প্রেম!

বীরসিংহ আসিয়া অন্তরালে দাঁড়াইল।

হেমরাজ—এ প্রেমে কোন পাপের স্পর্শ নেই?

রাধা—অনুতাপের অশ্রুতেও কি তা মুছে যাবে না?

হেমরাজ—কিন্তু স্মৃতি! সে যে বৃশ্চিকের মত মাঝে মাঝে দংশন করে উঠবে—তখন? না রাধা, আমি ধরা দিই—সকল খেলার অন্ত হোক!

রাধা—না, চলো হেম, এই রাত্রের নীরবতার মধ্য দিয়ে আমরা চলে যাই! সমস্ত অতীত, সমস্ত পাপ, রাত্রির মত পোহাবে—তারপর দিনের আলোয় নূতন প্রেমোজ্জ্বল জীবনে নবজাগরণ! আনন্দ ও পুণ্যের সে স্নিগ্ধ জ্যোতি!

হেমরাজ—কিন্তু লছমী—

রাধা—বুঝেছি, কোথায় তোমার বাধছে,—বেশ, নর্ত্তকী বলে ভুলতে না পাবো যদি ত, দাসী বলে—

হেমরাজ—(সহসা রাধাকে বক্ষে ধরিল।) রাধা—

রাধা—হেম!

হেমরাজ—তাই হবে, সমস্ত অতীত ভুলবো—আমি চাঁদরায় নই, হেমরাজ! আর তুমি রাধা, আমার স্ত্রী! (চুম্বন করিল।)

রাধা—আঃ, কি সুখ!

হেমরাজ—যাক্, সমস্ত অতীত মুছে যাক্। আজ আমাদের পুনর্জ্জন্ম! প্রেমের মোহন স্পর্শে সমস্ত মলিনতা ঘুচে যাক—নূতন আলো, নূতন পৃথিবী, নূতন জীবন!

রাধা—প্রভু, স্বামী—

হেমরাজ—এসো, রাধা,—

উভয়ে বাতায়ন-পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল!

বীরসিংহ আসিয়া নির্ব্বাকভাবে বাতায়নের ধারে দাঁড়াইল।

বীরসিংহ—দুর্ভাগা বীরসিংহ! যাও, প্রেমের বর্ম্মে আচ্ছাদিত হয়ে দুজনে চলে যাও! তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করবারও কারো সাধ্য হবে না!

তরুণের প্রবেশ।

তরুণ—কৈ, কোথা সে দস্যু, চাঁদরায়? সেনাপতি—

বীরসিংহ—(ফিরিয়া) তরুণ—

তরুণ—কি, পালিয়েছে? (শশব্যস্তে বাতায়নের ধারে আসিল।)

বীরসিংম—না—আমারি ভুল হয়েছিল!

তরুণ—ভুল?

বীরসিংহ—হাঁ! দস্যু চাঁদরায় ও স্বাধীন সর্দ্দার হেমরাজ, দুজনে এক লোক নয়!

তরুণ সিংহ স্তম্ভিতভাবে বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যবনিকা।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বিবাহ-পদ্ধতি।

আজকাল ভারতের নরনারী আধুনিক বিবাহ-রীতিতে সন্তুষ্ট নহেন। পুরাকালে যে সকল রীতি আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা বহুকাল হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকালকার রীতিগুলি সেই সকল প্রাচীন রীতির অপভ্রংশ মাত্র। সুতরাং আজকাল ব্যক্তিগত ও মতগত স্বাধীনতা লাভ করিয়া অনেকে সমাজকেও

মধ্যযুগের অন্যায় ও অযৌক্তিক বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে আমাদের দেশেও বিবাহের পূর্ব্বে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে ভাবী পতিপত্নীর আলাপ ও পরিচয়ের অবসর থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে যে যাহাকে বিবাহ করিবে তাহাকে তাহার আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া ও বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এরূপ করিতে হইলে বর্ত্তমান বিবাহপদ্ধতির সমূল উচ্ছেদ করিয়া বালকবালিকার স্থলে যুবকযুবতীর পরিণয়রীতি প্রচলিত করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রাচীন ভারতে যে এরূপ যুবকযুবতীর স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাহার ফলে যে সমাজের মঙ্গলই হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং হিন্দু মাত্রেই এই সকল কাহিনী শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পবিত্র জ্ঞানে পাঠ করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষেই যদি যুবকযুবতীর স্বয়ম্বরে ও বিবাহপূর্ব্বে আলাপ-পরিচয়ে কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে তাহার সমস্ত না হইলেও কতকাংশ বর্ত্তমান সমাজ মধ্যে প্রচলিত করিলে আমাদেরও বিশেষ ক্ষতি না হইয়া বরং অনেক ইষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের পুরাতন বিবাহপদ্ধতিতে আমরা পাশ্চাত্যজগতের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিকাশই দেখিতে পাই,—কেবল ইহার মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের যথেচ্ছ ব্যবহার ও শৈথিল্যটুকু নাই। তাহার কারণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মর্ম্মটুকু প্রতীচ্য সভ্যতার ন্যায় জড়বাদিত্বের পঙ্কে পূর্ণ ছিল না। ভারতের সনাতন ধর্ম্ম বা চরিত্রনীতি আপামর সকলকেই এরূপ শিক্ষা দান করিয়াছিল, যদ্দ্বারা তাহারা কেহই পার্থিব বস্তুকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে শিখে নাই, সকলেই জগদাতীত এক বৃহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্যের অনুসন্ধানে ছুটিত। ভারতবাসী পৃথিবীকে কর্ম্মভূমির চক্ষেই দেখিত—ইহাকেই সে কোনদিন চরম লক্ষ্য-ভূমি বলিয়া জ্ঞান করে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, আনন্দ, সুখ বা সম্ভোগ্য বস্তু, সে সকলকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান না করিয়া, এ সকলকে সে কেবল শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য লাভের উপায়স্বরূপ বলিয়া মর্ম্মমধ্যে বিশ্বাস করিত। এই বিশ্বনীতিটুকু উচ্চ নীচ সকলেই আপন আপন জীবনে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। যে মহাপাপী ও অত্যাচারী সেও আপনাকে মানব চরিত্রের এই নীতিটুকুর অধীন বলিয়া জানিত। লঙ্কেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল সত্য, সীতার শুভাশুভ তাহার নিমেষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছিল সত্য, কিন্তু তথাপি রাক্ষসরাজ এই দীর্ঘকালের মধ্যেও সীতার অনিচ্ছায় তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করে নাই। সেকালের নীতিই ছিল যে তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোনও রমণীকে কেহ স্পর্শ করিবে না। সেকালের আপামর সকলেই কিরূপ ধর্ম্মানুরক্ত ছিল তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অমর অক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন এরূপ ছিলেন, তখন আমরা যে এক্ষণে কতকাংশেও তাঁহাদিগের ন্যায় হইতে পারি না, ইহার কারণ কি ?

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের চিরপ্রচলিত সংস্কার অনুসারে বলিয়া থাকেন যে আধুনিক হিন্দু জীবনের বাহ্যিক অবস্থাগুলা প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং এই সকল বাহ্যিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইলে আমাদের পুনরায় ভারতের প্রাচীন আদর্শ অনুসারে জীবনগঠন করা সম্ভব। কিন্তু এ স্থলে বিবেচ্য এই যে সেই সকল বাহ্যিক অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করায় আমাদের যথার্থ বাধা কোথায়! আমাদিগের আপন অজ্ঞতা বা দুর্ব্বলতা ভিন্ন অপর কোন শক্তিই আমাদিগকে বিদেশী আদর্শের অর্থাৎ তাহার বিকৃত অনুকৃতির আদর করিতে, অথবা আপনার শ্রেষ্ঠ ধনকে উপেক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে সেকালে নারী ও পুরুষের মধ্যে চরম স্বাধীনতা ছিল এবং পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতরমণীর আত্মরক্ষা করিবার পক্ষেও যথেষ্ট বল ও শক্তি ছিল। আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে সেকালে ভারতের নরনারীর মধ্যে পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রচলিত ছিল না, অন্ততঃ সেরূপ প্রবল ও সাধারণ ভাবে নহে সেটা নিশ্চয়। সেকালে পতিপত্নী যথেচ্ছাচারকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে শ্রেষ্ঠ সন্তানোৎপাদনের জন্যই চেষ্টা করিতেন। বিবাহ ব্যাপারটা কেবল একটা লৌকিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। যুবক যুবতী প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিত যে তাহাদের উভয়ের মিলন তাহাদের নিজেদের বা সন্তানের পক্ষে আবশ্যক কি না। তাহারা এরূপ আবশ্যকতা বোধ করিলে তবে সমাজ ও ধর্ম্ম তাহাদিগের মিলনকে স্বীকার করিত। আজকাল এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সমাজের মতে বিবাহ কর্ম্মটা প্রথম হয়, তাহার পর উভয়ের মিলন-ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। সে কালের কাহিনী হইতে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে তখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার রীতিটা অল্পাধিক প্রচলিত ছিল। অনেক ঋষি লোক-সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বা পবিত্র নদীতীরে বাস করিয়াও সময়ে সময়ে আপনার বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য কোনও নারীর সহিত মিলিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইবার পর আর কেহ কাহারও বিষয় চিন্তাই করিতেন না। স্বার্থ বা অপবিত্র মোহই অধিকাংশ সময়ে তাঁহাদের এ অস্থায়ী মিলনের যথার্থ কারণ। অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপাদনের জন্যও নরনারী এরূপ ভাবে মিলিত হইতেন।

বিশ্ববসু ও মেনকার মিলনে একটি কন্যার জন্ম হয়। তাহারা উভয়েই গন্ধর্ব্ব। বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ নহে বলিয়া তাহারা তাহাদের শিশু কন্যাটিকে স্থূলকেশী নামে এক ঋষির আশ্রমে ফেলিয়া যায়। শিশুর রূপে মুগ্ধ হইয়া মুনিবর তাহাকে ভূমি হইতে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাইলেন ও তাহাকে আপন পোষ্য-কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। দিনে দিনে শিশুটির বয়সের সহিত রূপগুণ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং সকলেই তাহাকে ঋষিকন্যা বলিয়াই জানিল।

এদিকে প্রসিদ্ধ ভৃগুমুনির পুত্র রুরু স্থূলকেশীর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন

এবং সেই অসামান্যা সুন্দরী ঋষিকন্যাকে দর্শন করিতেন। রুরু সেই সুন্দরীর রূপে এতই মুগ্ধ হইলেন যে তাহাকে না পাইয়া জীবন-ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি তাহার নিকট আপনার অন্তরের গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করিয়া জানিলেন যে কিশোরীও তাঁহার প্রেমে আত্মহারা। তখন তিনি তাহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবার জন্য আপন পিতা ভৃগুকে স্থূলকেশী মুনির নিকটে প্রেরণ করিলেন। স্থূলকেশী যুবক-যুবতীর মনোভাব পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এক্ষণে ভৃগুমুণির মুখে এই প্রস্তাব শুনিবা মাত্র সানন্দচিত্তে সম্মতি দান করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের বিবাহ স্থির হইবার পরেই একদিন সেই ঋষিকন্যা অন্যান্য আশ্রম-বালাদিগের সহিত উদ্যানে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে সহসা অজ্ঞাতে এক সর্পকে পদাঘাত করেন। সর্পটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিল এবং অনতিবিলম্বেই ঋষিকন্যার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই শোকসংবাদ অল্পকাল মধ্যেই তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলে তাহার সেই অচেতন দেহের পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন সে মূর্ত্তিতে মৃত্যু-কালিমা কিছুই নাই,—নিদ্রাগতা স্বর্ণলতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছে! চতুর্দ্দিকের যত মুনিঋষি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিলোকখ্যাত ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনিও তথায় উপস্থিত হইলেন। শোকবিহ্বল রুরুও তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু ভূতলে তাঁহার প্রাণপ্রিয়ার মৃত দেহ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এতই কাতর হইল যে তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে যাইয়া অবিশ্রাম অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাতরহৃদয়ে দেবতার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন, কারণ তাহাকে হারাইয়া তাঁহার প্রাণধারণ করা অসম্ভব! তিনি নিজে একজন দেবতা-বিদিত তপস্বী, সুতরাং ইন্দ্রদেব তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া শোকার্ত্ত রুরুর নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন।

দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ঋষিপুত্র, তোমার এ শোকের কারণ কি? ইন্দ্রদেব তোমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন। মানুষ একবার মরিলে কি আবার বাঁচে? তোমার এ শোক নিতান্তই বৃথা!"

ঋষিপুত্র বলিলেন—"কিন্তু আমি এমন কোন কুকর্ম্মই করি নাই, যাহার জন্য আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর শাস্তি-বিধান হইতে পারে। শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি কোন অন্যায় কর্ম্মই করি নাই এবং কোন দিন মনুষ্য বা দেবতার প্রতি কর্ত্তব্যেও পরাঙ্মুখ হই নাই। ইন্দ্রদেব ইচ্ছা করিলে কি আমার প্রাণপ্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে পারেন না?"

দেবদূত—"তোমার প্রাণপ্রিয়া একজন সামান্যা মানবী ছিল না; গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার ঔরসে তাহার জন্ম। এরূপ জীবের পৃথিবীতে কতকাল থাকা সম্ভব? সেই জন্য দেখ, তাহার এই অকালমৃত্যু হইয়াছে,—এ মৃত্যু বিধাতার বিধান অনুসারেই হইয়াছে।"

রুরু—"কিন্তু আমি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া পাইতে চাই, তাহার কি কোন উপায়ই নাই?"

দেব—"হাঁ আছে। ইন্দ্রদেব আমাকে

বলিয়াছেন যে যদি তুমি তোমার অর্দ্ধেক পরমায়ু ত্যাগ করিতে সম্মত থাক, তাহা হইলে সেই কাল পর্য্যন্ত এই রমণীকে জীবিত রাখা যাইতে পারে।”

রুরু—“আমি আমার নিজের অর্দ্ধেক জীবন ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম।”

এই কথা শুনিবামাত্র দেবদূত যমরাজের নিকট যাইয়া ঋষি-কন্যাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আদেশ লইয়া আসিলেন। দেবদূত ফিরিবামাত্র ঋষিকন্যা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় ভূমি হইতে উত্থিতা হইলেন,—সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরে উভয়ে বিবাহিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এই আখ্যানের মধ্যে আমরা বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর প্রেমের প্রাচীন আদর্শটিকে পরিস্ফুট দেখিতে পাই, এবং অসাধারণ অবস্থার মধ্যে ব্রাহ্মণযুবার আন্তরিক প্রেমের কঠোর পরীক্ষা দেখিতে পাই।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মনুষ্য-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি এরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও বিবাহ ব্যাপারের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এখনকার ন্যায় মহাভারতের কালেও সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে বংশরক্ষার জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের যন্ত্রণার সীমা থাকে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অগ্নিতেজা তপস্বী জরৎকারুকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে দেখিতে পাই।

জরৎকারু কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার দ্বারা দেবপিতা ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরণ কুমার থাকিবেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু তাঁহার আর ছয়টি ভ্রাতাও কুমার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করাতে পিতৃদেবগণ বংশলোপ হইবার ভয়ে দারুণ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরৎ এক অতল কূপের মধ্য হইতে তাঁহাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাঁহাদের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পিতৃদেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া উত্তর করিলেন “হে অপরিচিত, আমাদের ইচ্ছা তুমি জরৎকারু নামক চিরকুমার-ব্রতী অভাগাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বল যে আমাদিগের উদ্ধারের জন্য তাহার বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করা আবশ্যক।”

জরৎ বলিলেন—“আমিই সেই অভাগা। আপনাদের যাহা কিছু বক্তব্য, আমাকে বলিতে পারেন।”

“আমরা জানি যে তুমি কঠোর তপস্যার দ্বারা সাধনমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছ, কিন্তু তুমি অপুত্রক বলিয়া আমাদিগের উদ্ধারের আর আশা নাই। সুতরাং তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।”

“আমি আজ পর্য্যন্ত বিবাহে মনোযোগী হই নাই। কিন্তু যখন আপনারা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন তখন আমি বিবাহ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে!”

“কি সর্ত্ত?”

“আমি সাধারণভাবে বিবাহ করিতে পারিব না ইহা স্থির, সে আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যাহাকে লেশমাত্রও ভালবাসি না, তাহার সহিত প্রেমের ছলনা করিতে পারিব না। তবে ভিক্ষা করিতে

করিতে আমি একটি পত্নী ভিক্ষা চাহিব। যদি কেহ আমারই ন্যায় নামবিশিষ্টা কোন কন্যাকে ভিক্ষাদান করে, তাহা হইলে আমার একটি সন্তান হওয়া পর্য্যন্ত সে আমার পত্নী থাকিবে।"

এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে এই ব্রহ্মচারী পত্নী অন্বেষণে বাহির হইলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র বলিয়া এবং অন্নভিক্ষার সহিত পত্নীভিক্ষা করিতেছেন দেখিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাদান করিতে অগ্রসর হইল না। তিনি পত্নীলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিরত হইবার বাসনা করিতেছিলেন এরূপ সময়ে নাগরাজ বাসুকী তাঁহার ভগ্নীর জন্য এইরূপ একটি পাত্রের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই অসাধারণ ঘটনাটি দেবগণের ব্যবস্থানুসারে হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে লিখিত আছে। রাজা পরীক্ষিতের পুত্র সর্পযজ্ঞ করিতেছেন দেখিয়া নাগগণ সবংশে ধ্বংশ হইবার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা করিল যে তাহাদের কতকগুলিকে ধ্বংশ করিয়া অবশিষ্টকে রক্ষা করা হউক। তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণের জন্য দেবগণ বলিলেন যে যদি তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে কোন পত্নীভিক্ষুকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করে তাহা হইলে সেই কন্যার গর্ভজাত সন্তান তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

সেইজন্য রাজা বাসুকী পুরবাসীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাসাদে কোন পত্নীভিক্ষু উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যেন অবিলম্বে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভগ্নীকে ইতিপূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি ভিক্ষুকের পত্নী হইয়া তাঁহার স্বজাতিকে উদ্ধার করিতে সম্মত কি না, তাহাতে তিনি আপন আত্মোৎসর্গের অভিলাষ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—"রমণী বিবাহ করে, হয় প্রেমের জন্য না হয় কর্ত্তব্যের জন্য। প্রেমের জন্য বিবাহ করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে আমি কর্ত্তব্যের জন্য বিবাহ করিয়া স্বজাতিকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।"

সুতরাং জরৎকারু যখন নাগরাজ্যে অন্ন ভিক্ষা করিতে যাইয়া প্রতি দ্বারে তিনবার করিয়া পত্নী ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, তখন এ সংবাদ অবিলম্বে যাইয়া রাজা বাসুকির নিকট উপস্থিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভগ্নী বহুমূল্য বস্ত্রশোভিতা হইয়া সলজ্জ পাদক্ষেপে সেই ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইয়া সানন্দ চিত্তে আপনাকে ভিক্ষা স্বরূপ দান করিলেন।

নাগকন্যার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া জরৎকারু বিস্মিত হইলেন। রমণীর নাম তাঁহার অনুরূপ কিনা এই সন্দেহে তিনি সেই মনমোহিনী সুন্দরীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি, সুন্দরী?"

নাগকন্যা ভাবী পতির এই প্রথম সাদর সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন—"আমার নাম জরৎকারু, আমি রাজা বাসুকীর ভগ্নী।"

এমন সময়ে স্বয়ং রাজা বাসুকী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মুনিবর, এই কুমারী আমার সহোদরা। সে আপনারই জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিল, এক্ষণে আপনি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ইহাই প্রার্থনা।"

ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন—"তুমি রাজগৃহে

জন্মগ্রহণ করিয়াছ আর আমি কঠোর তপস্বী। তোমাকে যে আমি ভরণপোষণ করিতে পারিব না তাহা জানিয়াও তুমি আমার পত্নী হইতে চাহিতেছ?"

বাসুকি উত্তর করিলেন—"আমি তাহা বেশ জানি। আপনার যতদিন ইচ্ছা আমি আপনাকে ও আমার ভগ্নীকে রক্ষা করিব। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের জন্যই আমি এত দিন আমার সহোদরাকে কুমারী রাখিয়া-ছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া জরৎকারু কঠোর স্বরে বলিলেন—"তবে বাসুকীরাজ শ্রবণ করুন। আমি রাজকুমারীকে পত্নীস্বরূপ রাখিবার জন্য আমার দারিদ্র্য বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে চাহি না। অধিকন্তু আপনার সহোদরা লেশমাত্র অবাধ্য হইলে আমি তাহা সহ্য করিব না। যে মুহূর্ত্তে সে আমার অমনোমত কোন কথা বলিবে বা কর্ম্ম করিবে সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।"

বাসুকি লেশমাত্রও চিন্তা না করিয়া কহিলেন—"তথাস্তু।"

এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবে নাগ-রাজ্যে সুন্দরী রাজকুমারীর সহিত এক কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ কুমারের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ দিবসে রাজপ্রাসাদের আনন্দ—কোলাহলের মধ্যে রাজকুমারী বেশ প্রফুল্ল ও সুখী। ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু তাপসোচিতভাবে রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। বিবাহ সময়ে অভদ্র ব্রাহ্মণ যথাসম্ভব মধুরভাষী হইবার চেষ্টা করিয়া পত্নীকে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন—"ভদ্রে, তুমি কদাচ আমার বিরক্তিকর কোন কর্ম্ম করিও না বা অপ্রীতি-কর কোন কথা উচ্চারণ করিও না। যে দিন এইরূপ করিবে সেই দিনই আমি তোমাকে ত্যাগ করিব, তুমি আর আমার পত্নী থাকিবে না।"

মনুষ্যপ্রকৃতি তখনও আমাদের মতই ছিল। বিবাহের দিনে স্বামীর নিকট এরূপ সুমিষ্ট কথা শুনিবার জন্য কেহই প্রস্তুত থাকে না। সুতরাং মুনিবরের বাক্য শ্রবণমাত্র রাজকুমারী কম্পিত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ঋষিবর, আমি জীবনে একদিনের জন্যও আপনার অবাধ্য বা অপ্রীতিকর হইব না প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

বিবাহের পর ঋষিপত্নী প্রাণপণে স্বামী-সেবা ও তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই ভয় পাছে তাঁহার কোন অজ্ঞাত ত্রুটির জন্য চিরপরিত্যক্তা হইয়া জীবনপাত করিতে হয়।

কিন্তু সে দুর্ঘটনা ঘটিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিন চারিমাস পরেই একদিন এক অভাবনীয় ব্যাপারে উভয়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিল।

একদিন বৈকালে এই কঠোর ব্রাহ্মণ পত্নীর অঙ্কোপরে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে-ছিলেন। সূর্য্য অস্ত গেল তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী মহা সমস্যায় পড়িলেন। সান্ধ্য আহ্নিকের সময় উপস্থিত, এ সময়ে স্বামীকে নিদ্রোত্থিত না করিলে তিনি কুপিত হইবেন, আবার তাঁহার অনিচ্ছায় নিদ্রাভঙ্গ করিলেও তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া স্বামীগতপ্রাণা ঋষিকন্যার মুখমণ্ডল স্বেদসিক্ত

হইয়া উঠিল, বাত্যান্দোলিত বল্লরীবৎ সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল যে সান্ধ্য-আহ্নিক না করিলে তাঁহার প্রাণেশ্বরের অমঙ্গল হইবে। আর তাঁহার দ্বিধা রহিল না। স্বামীর অমঙ্গলের অপেক্ষা আপনার অমঙ্গলকেই শ্রেয় মনে করিয়া তিনি পতির নিদ্রাভঙ্গের জন্য বলিলেন—"হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, জাগ্রত হও। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সূর্য্য অস্তাচলগামী হইয়াছে। তোমার সূর্য্যোপাসনার সময় হয় নাই কি? দেবপূজার সময় উপস্থিত, সুতরাং অধীনার অপরাধ ক্ষমা করিও।"

জরৎকারু ধীরে পত্নীর অঙ্ক ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নয়ন মুছিয়া দেখিলেন তাঁহার নিকটে কে উপস্থিত রহিয়াছে। পার্শ্বে অবনতচিত্তা পত্নীকে দেখিয়া বুঝিলেন তিনিই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। বিচ্ছেদভয়বিধুরা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নাগরাজ দুহিতা, তুমি কোন্ সাহসে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে এবং আমি আমার আপন ধর্ম্মসাধনে অমনোযোগী বলিয়া আমাকে এইরূপে অপমানিত করিতে সাহসী হইলে? তুমি আমাদের উভয়ের সর্ত্তভঙ্গ করিলে বলিয়া আমি দুঃখিত, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।"

ভীতিবিহ্বলা রাজকুমারী কাতরে বলিয়া উঠিলেন—"হায় তাপসবর, আমি তোমাকে অপমানিত করিবার জন্য নিদ্রাভঙ্গ করি নাই, তোমার অমঙ্গলের আশঙ্কাতেই করিয়াছিলাম।"

পাষাণহৃদয় ঋষি উত্তর করিলেন—"আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। এতদিন তোমাদের নিকটে বিবাহিত জীবনের সুখসম্ভোগ করিতেছিলাম। আজ বিদায়! তোমার ভ্রাতা বাসুকিরাজকে সংবাদ দিও! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিও না।"

ঋষিকন্যার সকল আশা দূর হইল। বেদনায় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্বদেহ কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ নয়ন দুইটি অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং লজ্জাবতী লতার ন্যায় এই নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে মর্ম্মমধ্যে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলেন। পরে চিরবিদায়ের পূর্ব্বে নৈরাশ্যের সাহসে ভর করিয়া কাতরে করযোড়ে কহিলেন—"স্বামী, প্রভু, আমি অনুক্ষণ তোমার সেবা ও পূজা করিয়াছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন অন্যায় কর্ম্ম করি নাই, তবে বিনা অপরাধে আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে কেন প্রভু? রাজা বাসুকি তোমার ঔরসে সন্তান জন্মিয়া নাগজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমাকে এ ভাবে ত্যাগ করিয়া যাইলে তিনিও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন।"

জরৎকারু বলিলেন—"ভদ্রে, তুমি যাহা বলিতেছ সত্য, কিন্তু তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছি বলিয়া তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবার বাসনা আমার নাই। দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর কয়েকমাস পরে তোমার যে পুত্র হইবে

তাহার দ্বারা আমার পিতৃপুরুষগণ এবং নাগজাতি উদ্ধার পাইবে। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতেছ তোমার শোকের কোন কারণ নাই ?”

এইভাবে ব্রহ্মচারীর অনিচ্ছাকৃত বিবাহের উপসংহার হইল। পতি পত্নীর মধ্যে ব্যবহার-বিধি সম্পর্ক বিবিধ ন্যায় কঠোর ও প্রাণহীন! আজকালের গুরুজন-আদিষ্ট বিবাহের মধ্যে এইরূপ দাম্পত্য-সুখহীন সম্বন্ধ কত সুলভ তাহা পাঠক স্থির করিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মেয়ে-যজ্ঞি।

(১৩১৬ পৌষের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধ লেখা বড় দায়। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে আমার শত্রু নয় আত্মীয়কুটুম্ব সকলেই নানা দিক হতে নানা প্রকারে আমাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি যে সকল পত্র পাইয়াছি তাহার মধ্যে ২৪ খানি ভারতীর পাঠকপাঠিকার গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি।

পত্র নং ১

ভাই দিদি—

আমরা গরীব বলে যে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই তা মনে কোরো না। তুমি লিখেছ “সুশিক্ষিতা-মহিলা-যজ্ঞিতে বিশৃঙ্খলা ঘটে না” কিন্তু ভাই বিবেচনা করে দেখ, তাঁরা সুশিক্ষিতা বলেই বিশৃঙ্খলা ঘটে না অথবা ধনী বলে ঘটে না। তাঁদের প্রচুর দাসদাসী আছে, আয়া আছে গবর্ণেস্ আছে,—মাষ্টার পণ্ডিত আছে। তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে কি পরে বিকেলের আহারাদির হুকুম দিলেন বা ভাঁড়ার দিলেন। একটু বিশ্রামের পর ইচ্ছামত নিজের গাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্থানে গিয়ে মিলিত হলেন। তার পর আমাদের,—তা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মনে কর [illegible] একটি অসুস্থ— [illegible] —তা মিথ্যা [illegible] করে তিনি চলে গেলেন। আমাদের ঘরে ভাই ওরকম সুবিধে হবার আশা করতে পারব না।

ধরো ত আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ বুড়ো মানুষ—সংসারের কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না। আমার ৬টী সন্তান—বড়টী এগার বৎসরের; একটি মাত্র ঝি অবলম্বন [illegible] নিমন্ত্রণ [illegible] পাবে? [illegible] ছুটী নিয়ে তবে ত পাড়ার বাহির হতে পারবো। তাদের জন্য বেঁধে বেড়ে রেখে যেতে হলে আর যাওয়া হয় না। তা ভাই লোকলৌকতা ত রক্ষা করতে হবে! ছেলেদের কষ্ট হবে বলে কি আত্মকুটুম্ব সব ত্যাগ করবো? আজ তবে আসি।

তোমার ছোট বোন্।

পত্র নং ২

শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তুমি যে দেখছি "সমাজ-সংস্কারক" হয়ে উঠ্‌লে। আর যা কর না কর মেয়ে-যজ্ঞির সময়টা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ো না। ভেবে দেখ তোমার এ সেবক যে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে তোমাদের শ্রীচরণ দর্শন পায় তার কত না অন্তরায় ঘটবে। আমার এই কুড়ে ঘর— দিদিমার দল কি পরিমাণ জানইত। মনে পড়ে কি ঠাকুর মা বলে ছিলেন "বাপরে যেদিকে চেয়ে দেখি, দেখি বড় বৌএর বাপের বাড়ীর কুটুম!" তা তোমাদের তো কোন কায কর্ম্মে বাদ দিতে পারি না না ডাকলেও তো তোমরা ছাড় না। তার পর এ দাসের বিবাহ দিয়াছ; তা গৃহিণীর পিত্রালয়টী কিছু বাদ দেওয়া চলে না। বাকী রইলেন খুড়া জ্যেঠাই মাসী পিসি ভগিনী পাড়া প্রতিবাসী প্রভৃতি। এঁদেরও অনেককে না ডাক্‌লে হয় না। এঁরা না হলে কাজ কর্ম্ম করেই বা কে? তা আমার নিবেদনটা এই যে অনির্দ্দিষ্ট সময়েরও একটা সুবিধে আছে। কতক আসছেন, খাওয়া দাওয়া সেরে যাচ্ছেন— আবার কতক আসছেন,—এমনি করে মধ্যাহ্ন ভোজন থেকে আরম্ভ করে সায়াহ্ন ভোজন পর্য্যন্ত খাওয়া দাওয়া লেগে থাকে। তাই বলি আর যা কর সময়টা নির্দ্দিষ্ট করে কাজ নেই। আমার মত কুড়ে ঘরে অনেকেরই বাস। শুধু একেলা কি আমি?

ইতি সেবক রাজু।

পত্র নং ৩

শ্রীচরণ কমলেষু,

মাসিমা আমার প্রণাম জানিবেন। ভারতীতে আপনার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা আমরা পড়িয়াছি।

এ কি মাসিমা আমাদের উপর আবার আক্রমণ কেন? আপনার মা, মাসিমারা আমাদের যেমন শিখাইয়াছেন তেমনি শিখিয়াছি।

আপনাদের এমনি শিক্ষা দেবার ঝোঁক, যে কবে যে আমাদের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল তা ত মনেই পড়ে না। পাঁচ বছর বয়সে যখন আমরা ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি হলুম তখন বাড়িতে মাষ্টার মশায় রাজর্ষি আর সেকেণ্ড বুক পড়াতেন। এ ত গল্প কথা নয় মাসিমা এ সত্যিকার ঘরের কথা। ভোরে সেই বিছানা থেকে উঠেই স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হত। ঘড়ির কাঁটায় ৮॥০ টা বাজলে আমরা গাড়ীতে উঠে স্কুল চলে যেতুম —আর সেই সন্ধ্যা ৫।৫॥০ টায় বাড়ীতে ফিরে আসতুম। রান্না বান্না ঘরের কায শেখবার অবসর পাওয়া দূরে থাক্ খেলা করতে অবসর পেতাম না। আবার সন্ধ্যাজ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই মাষ্টার মশায় এসে হাজির হতেন। এমনি করে খেলার সুখের মুহূর্ত্ত টুকুও আমরা ভোগ করতে পাই নাই বল্লে হয়।

যাহোক তার পর বিবাহ। বিবাহের পর পরের ঘরে পরের হাতে পড়েছি। তাঁরা যেমন তেমন করে হয়েছে। রান্না বান্নার কায ঘাড়ে পড়ে নাই—কাযেই তেমন পটু নাহি যে তা স্বীকার করিতেছি।

আগুণতাতে গেলেই মাথা ধরে তাত সত্য। রান্নার কায তেমন অনায়াসে করতে পারি না বটে কিন্তু তা ছাড়া যে সব কায আমাদের

করতে হয় তার পক্ষে কি রান্নার কায করাটা এমনই শক্ত? অনভ্যাস বশতঃ শারীরিক ক্লেশ হয় কিন্তু কাযটা কঠিন নয়। তার চেয়ে সংসারের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য প্রতি খুটি-নাটির দিকে দৃষ্টি রাখা সুকঠিন নয় কি? সন্তানদের দেখা শোনা, দাস দাসীদের পরিচালান করা, ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখা, আর যাঁহার হাতে আমাকে সমর্পণ করেছেন তাঁর সর্ব্ব কার্য্যে সহায়তা করা ও তাঁর সুখস্বচ্ছন্দের দিকে সর্ব্বপ্রকারে দৃষ্টি রাখতে আমাদের যত হয় এমনটি পল্লী মহিলাদের কিন্তু হয় না। আমি অনেক পল্লীগ্রামে গিয়েছি তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তাঁতে এইটুকু বুঝেছি যে আমাদের ঘরকন্নার দায়ীত্ব তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়েছে। আজ তবে আসি।

আপনার স্নেহের রেণু

পত্র নং ৪

ভাই ঠাকুরঝি —

আর বোল' না জ্বলে মলুম। পুরুষদেয় চক্ষু যে ভগবান কেন দিয়েছেন বলতে পারি না। একটু কি পসন্দ নেই। মেজবৌমাকে চড়ুকের তত্ত্ব কোরবো বলে দুটো জ্যাকেট কিনে আনতে বলেছিলুম বোলবো কি ভাই তোমার দাদা মোটা মোটা দুটো সাটিনের জামা এনে হাজির। তাতে বিশ্বের জরী ফিতে লেস দেওয়া আছে। সে দুটো জ্যাকেট কি বালিসের খোল তার ঠিক নেই! দেখে ত অবাক। তোমাদের শিল্পবিদ্যালয় কেমন চল্‌ছে? রথের তত্ত্বর জন্য কয়েকটী জ্যাকেট আমাকে তৈরি করাইয়া দিতে পারকি? দেখো যেন ভাল রকম হয়। ছিঃ ছিঃ পুরুষ মানুষের কি কিছু পসন্দ নাই। এদিকে ত ভাল কাপড়খানি পরলে হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

তোমার বৌদিদি

পত্র নং ৫

প্রিয় ভগিনি—

ভারতীতে আপনার মেয়ে যজ্ঞির বিশৃঙ্খলা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মহিলাবর্গের দোষগুণ, অভাব, অভিযোগ মহিলাদেরই করা উচিত। আপনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ভাল করিয়াছেন। এক্ষণে মহিলাগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন প্রত্যেকে গৃহস্থালী বিদ্যাশিক্ষা শিশু পালন প্রভৃতির উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং এই সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পত্রিকা প্রভৃতিতে আন্দোলন করেন। কেহ কোন বিষয়ের ত্রুটী দেখাইলে ক্ষুণ্ণ না হইয়া যেন ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন। নমস্কার।

আপনার শ্রীমতী দয়াবতী দেবী

এক্ষণে ভারতীর পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা নিবারণের উপায় যাঁহার যাহা মনে হয় যেন ভারতীতে প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করেন

শ্রীশরৎকুমারী চৌধুরাণী।

পোষ্যপুত্র।

গড়ের মাঠের নির্জ্জন রাস্তা ছাড়াইয়া একখানা গাড়ি আফিস কোয়ার্টারের জনহীন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িগুলাকে অতিক্রম করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই লোক চলাচল পূর্ণ আলোকিত হাওড়ার পুলের নিকট আসিয়া পড়িল, হঠাৎ সেই সময়ে স্তব্ধ শান্তি বিস্মিতনেত্রে বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত পথটা দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, কেহ কাহারও সহিত একটি কথা পর্য্যন্ত কহে নাই, আসিবার সময়েও এই প্রকারে আসিয়াছে কিন্তু সেবারে শান্তি সমস্ত পথটাই কাঁদিয়াছিল, এবারে সে কাঁদিতে পারে নাই।

হেমেন্দ্রও একবার চাহিয়া দেখিল, রাস্তার ধারে আলোকাধার হইতে অত্যুজ্জ্বল, তীব্র একটা আলোকের ছটা গাড়ির ভিতরকার অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাদের মুখে পড়িল; হেমেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। শান্তি সন্দিগ্ধনেত্রে সেই অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মুখের ভাব দেখিতে চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "হাবড়া ষ্টেশনে নিয়ে এলো যে?"

হেমেন্দ্র উত্তর দিল না, যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি করিয়া বসিয়া রহিল। শান্তির বুকটা এবার একটা কি যেন নূতন আশঙ্কার আভাষে হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া উঠিল, চঞ্চল ভাবে সে পিছনদিকের একটা খড়খড়ি টানিয়া আবার উৎকণ্ঠিতনেত্রে বাহিরের দিকে চাহিল। গঙ্গার জলে সহস্র বিদ্যুতালোক জ্বলিতেছে, অগণ্য নক্ষত্র এখানে প্রভাহীন, সাদা ও লাল ফুলে গাঁথা মালার মতন পশ্চাতে আলোকের শ্রেণী পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল "গাড়োয়ানটা ভুল করেচে, আমাদের সেয়ালদায় না নিয়ে গিয়ে হাবড়ায় নিয়ে এলো"—হেমেন্দ্র এবারেও কোন উত্তর করিল না।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিলে দরজা খুলিয়া হেমেন্দ্র গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। শান্তিকে নামিবার চেষ্টা বিরহিত দেখিয়া বলিল "নেবে এসো একখানা গাড়ি বোধ হচ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

শান্তি নামিল না বরং গদির উপর একটু শক্ত হইয়া বসিল। হেমেন্দ্রের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াই ছিল, শান্তির অবাধ্যতায় গভীর বিরক্তিতে তাহা আরো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তথাপি সংযতভাবে শান্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিল "শান্তি শুন্‌চো নেবে এসো"। শান্তি এবার দ্রুতকণ্ঠে বলিল "কোথায় আমায় নিয়ে যাচ্চ তা না বল্লে আমি নাববো না।"

শান্তির স্বরের দৃঢ়তায় ও কথার ধরণে হেমেন্দ্র প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে এমন জোরের সহিত প্রতিবাদ করা যে কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ শান্তির মুখে এমন উদ্ধত স্বর সে একদিনমাত্র শুনিয়াছিল বটে কিন্তু সেদিনকার সে ভর্ৎসনা নারী হৃদয়ের উদ্যত অভিমানাশ্রুরাশির মতনই প্রেমপূর্ণ, কিন্তু আজ তাহার মধ্যে একি কঠোরতা একি বিচারকের অলঙ্ঘ্য আদেশের কঠিন

সুর! হেমেন্দ্র ঘোর বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহকে সামান্য কীটপতঙ্গগুলাও এখন হইতে অপমান করিতে পারিলে ছাড়িবে না বোধহয়! অদূরে গাড়ি ছাড়িবার বাঁশি বাজিয়া উঠিল। স্বল্পসংখ্যক লোক কেহ মাথায় মোট কেহ ব্যাগ হাতে ছাতা বগলে প্লাটফরমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। হেমেন্দ্র উদ্যত বোধাগ্নি হৃদয়ে চাপিয়া ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল; "শিগ্গির এসো এখনও যদি গাড়িটা না পাই তা হলে হয়ত সকাল অবধি বসে থাকতে হবে।"

শান্তি নামিয়া আসিল, কিন্তু সে হেমেন্দ্রের অনুসরণ করিল না; প্রাচীরের গায় পিঠ রাখিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। গাড়িভাড়া চুকাইয়া দিয়া হেমেন্দ্র দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল; মনে করিয়াছিল শান্তিও তাহার পশ্চাতে আসিতেছে, কিন্তু টিকিট কিনিতে গিয়া একটু ভাবিবার জন্য দাড়াইল, তারপর হঠাৎ পিছনে চাহিয়া দেখিল শান্তি তাহার সঙ্গে আসে নাই, দারুণ বিরক্তি ও অপমানে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া টিকিট না কিনিয়াই ফিরিয়া আসিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ভোর হইয়া আসিতেছিল, দূরে আলোকের মালা ঈষৎ ম্লানপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকজনও খুব বেশী চলিতেছে না। ষ্টেশনের প্রবেশ পথের সম্মুখে কতকগুলি থার্ড ক্লাশের যাত্রী গাড়ির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ছোট বড় বোঁচকা পাশে রাখিয়া ঘুমে ঢুলিতেছে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল "এ কি রকম ব্যবহার তোমার শান্তি! সুধুসুধু ট্রেণটা ফেল করালে!"

শান্তি ক্ষিপ্রহস্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "বলেছতো আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চো না বল্লে আমি যাবো না, কোথা যাচ্চো?"

হেমেন্দ্র এবারও বিস্ময় বোধ করিল, কিন্তু নিজেকে পুনঃ পুনঃ অপমানিত করিতে দিতে আর সে সাহস করিল না। দিনের আলোয় কোন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের চোখে এই অবস্থায় যদি পড়িয়া যায় তাহার চেয়ে অপমানের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই স্বরটা একটু কোমল করিয়া বলিল "কোথা যাচ্চি তা কেমন করে বল্‌বো বলো, আমাদের স্থান কোথা? যেখানে হয় কোথাও চলে যাই এসো।" শান্তি রুদ্ধস্বরে বলিল—

"না আমরা লক্ষ্মীপুরেই যাবো, কেন তুমি এখানে নিয়ে এলে? চলো ফিরে যাই। সেখানে না গিয়ে কোথায় যেতে চাইছো?"

এবার আবার শান্তির চোখে জল ভরিয়া আসিয়া পতনোন্মুখ হইল। তাহার স্বর কাঁপিতেছিল। হেমেন্দ্র পরুষ শ্লেষের সহিত সক্রোধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"এ জন্মে আর নয়, জাহান্নমে যাব সেও ভাল তবু সেখানে নয়, তোমার খুসি হয় তুমি যাও।"—চারিদিকের আলোক মালা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়া উষার অম্লোজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রকাশ পাইল। আকাশে মেঘ ছিল না কিন্তু গত দিবসের বৃষ্টিচিহ্ন রাজপথকে পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছিল, লোকের ভিড় ও গাড়ীর শব্দে ষ্টেসন ভরিয়া উঠিল। শান্তির ঠোঁট কাঁপিতেছিল প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্থির

স্বরে কহিল, বেশ তাই তবে হোক, "আমি জ্যেঠামশায়ের কাছেই যাবো।" রোষে ক্ষোভে গুমরিয়া হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। এ সংসারে তাহার কোন দাবীই নাই! যে স্ত্রী ভিন্ন তাহার যথার্থ আপনার বলিতে গেলে কেহই বিদ্যমান নাই সেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চায়। সে কি এমনি অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল! কিন্তু না হেমেন্দ্র তাহাকে কিছুতেই এখন হাতছাড়া করিতে পারে না। সেই এখন তাহার অভিষ্ট সিদ্ধির একমাত্র অস্ত্র।

হেমেন্দ্র বড় বিপদেই পড়িল, শান্তি ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে! এখন তাহাকে বুঝাইয়া ভুলাইয়া নিজের মতে লইয়া আসা সম্ভবই নয়। এদিকে আর কতক্ষণই বা এমন করিয়া সাধারণের কৌতুহল দৃষ্টির দৃশ্যরূপে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকা যায়! কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে একটু বেড়াইয়া আসিয়া আবার একটু কোমলভাবে কহিল—"দিন-কতক না পশ্চিমে বেড়িয়ে আসি চলো।" কথাটা অসঙ্গতভাবে নিজের যেন সঙ্কোচে জড়াইয়া আসিল; শান্তির মুখেও একটা অবিশ্বাসের বিষণ্ণ হাসির ছায়া যেন সহসাই ফুটিয়া উঠিতেছিল,—সেটুকু হেমেন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নাই, অপ্রতিভ হইয়া সে ঘামিয়া গেল। তার পর আবার বলিল "যাবে না?"

শান্তি কথা কহিল না—শুধু তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাথা নাড়িল 'না'।

ক্রোধে অপমানে হেমেন্দ্রের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। কিন্তু সে কেমন করিয়া এই শান্ত শিষ্ট লজ্জানম্র শান্তিকে যে তাহার একটা মিষ্ট কথার জন্য লালায়িত, তাহার কৃপাদৃষ্টির উপর মাত্র যাহার সমস্ত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর—কেমন করিয়া তাহাকে আজ নিজের মতে লইয়া আসে ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। এত লোকের মাঝখানে তো আর তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না।

চারিদিকের লোক হাঁ করিয়া তাহারদিকেই চাহিয়া আছে, হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া পড়িল। এই সময় একখানা মেল আসিয়া প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল; কোলাহলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া আরোহীরা ক্রমে বাহির হইয়া যাইতেছিল;—হঠাৎ তাহার মধ্য হইতে যোগেশ আসিয়া হেমেনের হাত ধরিল "আরে ছোট বাবু যে, কোথায়?" বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া শান্তির পানে চাহিল "বৌ দিদিও সঙ্গে যে! ব্যাপারখানা কি বলো তো? যাওয়া হচ্চে কোথায়?"

শান্তি যোগেশকে দেখিয়াই মুখে ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। হেমেন্দ্র যেন সেদিকের ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল! যোগেশকে পাইয়া সে এই সঙ্কটের মধ্যে যেন একটা কূল পাইল। কিন্তু নিজের স্বভাবসিদ্ধ আত্মাভিমান ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, —ঈষৎ গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল "পশ্চিম" "পশ্চিম!" বলিয়া যোগেশ একবার চারিদিকে চাহিয়া লোক জন বা লগেজ পত্রের অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ হইল।

কই কাউকে তো দেখ্‌চিনা? আর এমন সময় পশ্চিমের গাড়ি কোথা? যোগেশ কৌতুহলে হেমেন্দ্রের পানে চাহিল। হেমেন্দ্র বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল একটু খানি মাথা চুলকাইয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল,

তা বটে এখনতো কোন ট্রেণ নেই ; তাহলে যোগেশ কি করা যায় বলো দেখি ?"

যোগেশ অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিল, চট করিয়া তাহার মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল, হেমেন্দ্রকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপারটা কি বলো দেখি ? শ্বশুরবাড়ি গেলেনা কেন ?"

হেমেন্দ্রের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সব কথা খুলিয়া না বলিয়া কেবল মাত্র উত্তর করিল "না।" "বাড়িতে আর বনবেনা তা আমি আগেই জানতুম। তা কোন জায়গাটায় যাওয়া ঠিক হয়েছে ?" হেমেন্দ্র মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে উত্তর করিল "এখনও কিছুই ঠিক করিনি।" "ঠিক না করেই টিকিট কিনবে নাকি ? সঙ্গে কে আছে ? জিনিষ পত্র কই ?"

একি পরিহাস! হেমেন্দ্রের লোকজন জিনিষ পত্র! তার কি আছে ? কে আছে ? মৃদুহাসিয়া বলিল "সঙ্গে কে থাকবে ? যোগেশ যখন বাড়ি থেকে এসেছিলুম সঙ্গে কে এসেছিল ? আর কিছুই তো আনিনি, যেমন এসেছিলুম তেমনিই যাব। শুধু যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন সেইটেই বইতে হবে।"

"এর নাম পশ্চিম যাওয়া! পশ্চিমে গিয়ে কি করবে ? চলবে কেমন করে ?"

হেমেন্দ্রের আরক্তমুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল, সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী সংসার সমুদ্র, সে গলায় কলসী বাঁধিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে আসিয়াছে, সাঁতারও জানেনা, তথাপি গর্ব্বের সহিত কহিল "কোথাও একটা চাকরী বাকরী চেষ্টা করব, ভিক্ষের ভাত আর খাবো না। যোগেশ আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে।"—

যোগেশ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল! বলিল "ভিক্ষে, সবিতো তোমার। খুড়র ভীমরথি হয়েচে বলে দেশের আইন আদালত সুদ্ধ কি উঠে গেল ? মাগী আদালতে প্রমাণ করুকনা কেমন সে বিনোদের স্ত্রী।"

হেমেন্দ্রের চোখের সম্মুখ হইতে যেন একখানা কাল পর্দ্দা কে সরাইয়া দিল। সত্যিতো মূর্খ বিনোদ কুমারের মতন সেও অভিমানে দেশ ছাড়া হইবে নাকি ? তাহাতে ক্ষতিই বা কাহার ? সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "কিন্তু শ্বশুর তো আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য কর্ব্বেনা আমার তো কিছুই নেই—"

যোগেশ বন্ধুর পিট চাপড়াইয়া তাহাকে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিল "কিছু ভেবনা সব আমি ঠিক করে ফেলব। এখন তবে কোথায় থাকবে! ফরেস ডাঙ্গায় আমার এক শালীর বাড়ি আছে চলো বলত তোমাদের বরঞ্চ সেইখানেই নিয়ে যাই। তারা গেছে কাশীবাস করতে,—বাড়িখানা ভাড়াও হয়নি খালি পড়ে রয়েচে।"

একটু পরেই একখানা প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছাড়িবে—যোগেশ গিয়া শান্তিকে বলিল, "বৌদি এখানে দাঁড়িয়ে কেন গাড়িতে এসে বসুন, চারিদিকে ভদ্র লোকের ভিড়।—" শান্তি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া যোগেশের সহিত আসিল! হেমেন্দ্র দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভাবিল যোগেশ নাজানি কিউপায়েই তাহার মন ফিরাইয়াছে!

ট্রেন ছাড়িয়া দিলে একে একে জনকোলাহলময়ী নগরীর দৃশ্য চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে পর শান্তি যখন মুখ ফিরাইল, হেমেন্দ্র দেখিল একরাত্রির ভিতরে

তাহার যেরকম পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে সেরূপ অনেক বৎসরেও হয় না। সে ভিতরে ভিতরে একটু শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে করিল, কাজ নাই শান্তিকে লক্ষ্মীপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাই—" কিন্তু দারুণ আত্মাভিমান পরমুহূর্ত্তেই তিরস্কার করিয়া উঠিল,—ভীরু! স্ত্রীর জন্যে নিজেকে লোকের কাছে নীচু করবে! হেমেন্দ্র জোর করিয়া মনের কোমলতাটুকুকে পদদলিত কীটের মত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যোগেশের কাছে সরিয়া বসিল।

যোগেশ বন্ধুকে মৃদুস্বরে অনেক রকম পরামর্শ দিতে দিতে মধ্যে মধ্যে শান্তির ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। হেমেন্দ্র না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল শান্তি বাহিরের লোকের সম্মুখে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে আসিল।

তাহার মুখের আশাহীন বেদনার নিদারুণ আঘাতচিহ্ন কশাঘাত চিহ্নের মতনই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সকরুণ-নেত্রে যোগেশ তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিল "তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে; তুমি যার হাতে পড়েছ সে তোমায় চিনবে না সে তোমার আদর বুঝবে না। তবে আমি যেটুকু পারি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করবো।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কন্‌ফারেন্স।

সমস্ত ইউরোপে এই ব্যবস্থা যে শীতকালে তাঁহারা বাড়ীতে বা দেশে থাকিয়া কাজ করেন, আর গ্রীষ্মকাল পড়িলেই স্বাস্থ্যলাভ-উদ্দেশ্যে আনন্দে নানা দেশ বিদেশে বেড়াইয়া—সঙ্গে সঙ্গে নূতন জ্ঞান অর্জ্জনও করেন। Winter session বা শীতকালের কাজ তাহাদের দেশে ছয় মাস চলে, কিন্তু summer session গ্রীষ্মকালের কাজ তিনমাস মাত্র চলে। বাকী তিনমাস ছুটী ও বেড়াইবার বা বিশ্রাম করিবার সময়। তাই এই অবসর সময়েই যত সভা, সমিতি, ও সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

বিলাতে সব ডাক্তারদের একত্রে মিলিবার একটি সমিতি আছে তাকেই British Medical Association "চিকিৎসকসভা" বলে। পৃথিবী জুড়িয়া সকল পাস করা ডাক্তারই তাহার সভ্য হইতে পারেন। বৎসরে তজ্জন্য প্রায় বিশ টাকা দিতে হয়। বিভিন্ন দেশ হইতেও সেই বিলাতি সভার সভ্য হওয়া চলে। দূরে থাকিয়া কাগজ-পত্র পাঠাইয়া ও জ্ঞানের আদানপ্রদান করিয়া নিকটে থাকার মতই একত্রে কার্য্য করা যায়। আসল সভাটি বিলাতে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে শাখা সমিতি আছে। আমাদের ভারতেও তার একটি খণ্ড সমিতি আছে। এইরূপে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রোগ পরীক্ষা ও রোগ চর্চ্চার ফল পরে একত্র হইয়া সেই পীঠস্থান বিলাতের প্রধান সমিতিতে যাইয়া মিলে। জ্ঞানোপার্জ্জনের সে দেশে এমনই পৃথিবী জুড়িয়া সুব্যবস্থা।

আমি যে সময়ে বিলাতে ছিলাম, সেই সময়েও গ্রীষ্মকালে সেই মহাসভায় পৃথিবীর সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রতিবৎসর এক স্থানে ইহার অধিবেশন হয় না। কখনও বা বর্মিংহ্যামে, কখনও বা লণ্ডনে, কখনও বা এডিনবরায় এই মহাসভা আহূত হইয়া থাকে। সে বৎসর ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ডিভনসায়ারের "একসেটর" নামক একটি পুরাতন স্থানে এই অধিবেশন হইয়াছিল।

আমি এত নিকটে থাকিয়াও এই বাৎসরিক অধিবেশনের কথা কিছুই জানিতাম না। অধিবেশনের সবেমাত্র দুই দিন পূর্ব্বে আমার এক পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু একজন পার্শী ভদ্রলোক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহার আর একজন বন্ধু সেই সভার সভ্য হইয়া যাইতেছিলেন। শুনিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম। সে সব দেশে যাত্রার উদ্যোগ করিতে বেশী সময় লাগে না। মংলবেরও সহজে ঠিক হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করাও সহজ সাধ্য এবং যাতায়াতেরও অশেষ সুবিধা। সুতরাং একঘণ্টার মধ্যেই একটি হাতব্যাগ, ওভারকোট ও দুইটি সার্ট ও চারখানি রুমাল লইয়া গাড়ি ধরিতে চলিলাম। ১৭ শিলিং মাত্র দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। গাড়িগুলি যদিও খুব দ্রুত চলে—তবুও লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় সে স্থানে পৌঁছিলাম। যাইবার পথে কতই নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে অঞ্চলগুলি সবই পাড়াগাঁয়ের মত। শস্যক্ষেত্র, গোচারণ মাঠ, বাগান ও দরিদ্র-লোকের ছোট ছোট বসত বাড়ী। চারিদিকে গরু, বাছুর, ভেড়া, ঘোড়া চরিতেছে। সুস্থশরীর ও কর্ম্মপটু কৃষকেরা ও কৃষকবধূরা শস্যক্ষেত্রে হাতের আস্তেন গুটাইয়া পাশাপাশি নিজের হাতে কাজ করিতেছে।

আমাদের দেশে যেমন রেল দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে কত পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী ও গ্রাম দেখা যায়, ও দেশে সেরূপ মোটেই দেখিলাম না। অভাব, অযত্ন দুঃসময়, বা মৃত্যুর চিহ্ন যেন কোথাও নাই। চারিদিকেই সমৃদ্ধির লক্ষণ; পুরাতনের উপরও পরিপূর্ণ নূতন সংস্কার। যাইবার পথে "বাথ" প্রভৃতি কতগুলি নূতন সহরও দেখা যায়; সেগুলি সব লণ্ডনের ভাব ও নূতন সমৃদ্ধি লইয়া গঠিত। যাইবার কালে পথে কতগুলি সমুদ্রধারের স্বাস্থ্যনিবাসও দেখা গেল। সে গুলির বর্ণনা ব্রাইটন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পূর্ব্বেই করিয়াছি। আনন্দমাখা মুখ ও হাবভাব লইয়া সব ছেলে মেয়েগুলি খালি পা করিয়া হাঁটু জলে ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতেছে ও ছিপ ও কুড়াজালি করিয়া মাছ ধরিতেছে। অনেক স্থলে অবগাহন স্নান করিবার জন্য ছোট ছোট ঢাকা গাড়ি। কোথাও বা প্রণয়ীদের নির্জ্জন গাছের তলায় গুপ্ত সম্মিলন স্থান। সেস্থানে অনেকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিত্য সময় কাটান।

সন্ধ্যা ছয়টায় গাড়িখানি একসেটরের ষ্টেসনে পৌঁছিল। সেটি একটি পুরাতন সহর। ষ্টেসনটিও তত বড় নয়। একাই সাহস করিয়া গিয়াছি কিন্তু নাবিয়া যে কোথায় যাইতে হইবে ও কোথায় থাকিব,

তার কিছুই জানিনা। কিন্তু ষ্টেশনে নাবিয়াই দেখিলাম সভ্যদের জন্য আহ্বান-সমিতির লোক সেই খানেই উপস্থিত আছেন।

এত দেশ বিদেশের লোক সেস্থানে তখন সমাবেশ হইয়াছিল যে আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাওয়াই দুরূহ। সবাই আগে হইতে চিঠি লিখিয়া আপনার আপনার স্থান ঠিক রাখিয়াছে। আমার জন্য কোনই ভাল স্থান নাই। আহ্বান-সমিতির লোকেরা নিকটস্থ একটি বড় হোটেলে লইয়া গিয়া আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেখানে একদিন মাত্র মাথা গুঁজিয়া ছিলাম তাহাতেই অনেক শিক্ষা হইয়াছে। যত বড় লোকের সেই হোটেলে আড্ডা। সুধু আহার করিবার জন্য ১২ শিলিং লাগে—সমবেত সভ্যেরা আহারের সময় যে সকল মদ্য পান করিলেন,—তার রং যেমন সুন্দর গন্ধ তেমনি মধুর। ফেণাগুলি দানা দানা হইয়া গেলাসের ধারে বৈদ্যুতিক আলোকে মুক্তার শোভায় শোভা পাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল আজ ইহারা যেরূপ দামী মদ পান করিতেছেন অন্য দিন এমন করেন না।

দুইটি যুবতী রমণী হোটেল তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা ছিলেন। তাঁহারা সকলকেই এমনি মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতেছিলেন যে লোভ হইতে লাগিল, বেশী পয়সা খরচ হইলেও সেস্থানে কিছু দিন থাকি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যাঁহার স্থান দখল করিয়াছিলাম, পরদিন তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন! সুতরাং আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারাই আমার জন্য অন্য স্থান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু সে স্থানটি বড়ই অপছন্দসই। কি করি বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। হোটেলটির নামও বড় ভাল নয়—"প্যাক্ হস হোটেল।" সেখানেও দৈনিক এক পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকিতে হইল।

শীতের দেশে বড় একটা ক্লান্তি আসে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরও খানিক ক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিলেই শ্রান্তি দূর হয়। গাড়ি হইতে নামিয়া প্রথমেই এসোসিয়সেনের আপিশে যাই। সেখানে সব সই করিয়া তবে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। একার্য্যে সনাক্ত করিবার দুইজন লোক চাই। আমাকে জানে না বলিয়া প্রথমে কেহই সনাক্ত করিতে চায় না। পরে একজন অবসর প্রাপ্ত I. M. S. কর্ম্মচারী আমাকে নিজে না জানিয়াও সই করিলেন, ও অন্য একজনকেও সই করিতে অনুরোধ করিলেন! এই সদাশয় পুরুষের নাম ডাক্তার "জইণাস্"। ইনি এখন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া "প্লাইমাউথে" ডাক্তারী করেন। ইনি Tropical Journal-এর একজন সম্পাদক ও ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের উপর ইঁহার বড়ই দয়া। আমাকে দেখিবামাত্রই জানাশুনা না থাকিলেও ইনি নিজে আমার স্বাক্ষর নিম্নে সই করিলেন ও অপর একজন ডাক্তারকে দিয়াও সই করাইয়া দিলেন। ইনিই (St. Mary) "সেণ্টমেরী" হাঁসপাতালে ডাক্তার রাইটের (Sir Amruth Wright) কাছে আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া চিঠি দেন। সেই চিঠি লইয়াই আমি সে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হই। সে চিঠির একস্থানে এই কথা লিখিত ছিল Dr. Mallick hails from India—and is our fellow-subject. He like all Indian, is very

shy, and hence the necessity of this introduction. অর্থাৎ—"আমরাও যেমন ব্রীটিশ প্রজা ডাক্তার মল্লিকও সেইরূপ। আর সকল ভারতবাসীই যেমন সকল বিষয়ে লাজুক ইনিও সেই প্রকৃতির। তাই ইঁহার হাতে আমি এই চিঠিখানি দিলাম।"

এই কথা কয়টির ভিতর কেমন একটু আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা মাখান আছে। ভারতবর্ষে উপস্থিতিকালে তিনি কত তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবাসীর চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা এই চিঠিখানি হইতে বুঝা গেল।

অত বড় একটি বৃহৎ সমিতির স্থান হইবার মত একটি বড় বাড়ী সহজে পাওয়া যায় না। তাই সমিতির বিভিন্নশাখার অধিবেশন বিভিন্ন স্থানে হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এলবার্ট হল নামক বাটীতে গ্রীষ্মদেশের রোগ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। Albert Hallটী অতি সুন্দর স্থান। সেইটিই ষ্টেশনের নিকট ও সহরেরও প্রায় মধ্যস্থলে। সকল দিক হইতে যাতায়াতের সুবিধা আছে। বাড়ীটিও বেশ বড়, সেখানে অনেক বিষয়ের মিউজিয়ম আছে। সবগুলিই অতি সুনিয়মে সাজান। একটি ঘরে চাষবাসের যত কল কারখানা সব একত্র পাশাপাশি সাজান ও তাহার কলকৌশলও বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। একটিতে খনিজ পদার্থের প্রদর্শনী। আর একটিতে জীবজন্তু ও মনুষ্য কঙ্কাল সাজান। সকলগুলিই শিক্ষার উপযোগী। এই স্থানেই Polytechnic নামক শিক্ষা স্থান। এইখানে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় বক্তৃতা হয়। লোকেরা দিবসের কাজকর্ম্ম শেষে অবসর সময়ে এখানে আসিয়া তাহা শুনে। একটি স্থানে কতকগুলি সুন্দর ছবি ছিল। তার এক শ্রেণীর ছবিগুলি সবই দরিদ্র ঘরের ঘটনার চিত্র। সে চিত্রকর দরিদ্র লোকের বিভিন্ন অবস্থারই চিত্র লিখিয়া গিয়াছেন। একখানিতে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামান্য সমিতি। ঘরে ছেলেরা সব আগুন পোহাইবার জন্য আগুনের ধারে ধারে বসিয়া আছে। একটি অনাথ বালকও আসিয়া তাদের দ্বারে আশ্রয় পাইয়াছে। দরিদ্রই দারিদ্র্যের ব্যথা জানে। একান্ত সহানুভূতির ভাব সে চিত্রে সুন্দর চিত্রিত।

সেখানে নানা রকমের বিভিন্ন সমিতি থাকিলেও আমি দুটি সমিতিতে মাত্র মিশিয়াছিলাম। "গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগের সমিতি" ও "জীবাণু বিস্তার সমিতি"। সে সকল স্থানে বক্তৃতার প্রথা এই যে, একজন কেহ একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া সেই সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলেন, তারই উপর তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে। তাতে বিভিন্ন লোকের মুখ হইতে অল্পসময়ে কত কথাই শেখা যায়। প্রথমেই গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের মেলেরিয়া প্রভৃতি জ্বরের প্রাদুর্ভাবের কথা উঠিল। এ দেশে যত লোক মরে তার অর্দ্ধেক সংখ্যা জ্বরের তালিকাভুক্ত। এমন কি যাহারা মরে না তারাও জ্বরে ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই এত জাতীয় দুর্ব্বলতা আসিয়াছে। মেলেরিয়া বিষ মশক দংশনে ঘটে। তাই মশা মারিয়া অনেক দেশে ফল পাওয়া গিয়াছে। মেলেরিয়া প্রকোপেই গ্রীসের পতন হয়। ইহাতেই দেশ

জুড়িয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা আসে ও সঙ্গে সঙ্গে পতনও ঘটে। গ্রীসে ম্যালেরিয়া আসিবার প্রথম কারণ মেলেরিয়ার দেশ হইতে তথায় ক্রীতদাস ধরিয়া আনা হয়। আমি নিজে বহুমূত্র রোগের বিষয় কিছু বলিলাম। এই সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে ভারতবর্ষেই কেন এ রোগ এত অধিক হয়। তার উত্তর অনেক আছে—যথা আমাদের অসার আহার, বাল্যবিবাহ, ও মস্তিষ্কের বেশী চালনা। সমিতিতে সকলেরই বলিবার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহই তার বেশী সময় লইতে পারেন না। সবই অতি সুব্যবস্থায় চালিত— কোনও গোলমাল নাই। আমাদের এদেশের সমিতিতে কত অব্যবস্থা ও গোলমাল উঠে। এইরূপ,—অস্ত্রচিকিৎসা, চক্ষুর চিকিৎসা, ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের শাখা ছিল। অন্যান্য স্থানে নানা বিষয়ের জিনিষপত্র দেখাইবার নানারূপ প্রদর্শিনীও চলিতেছিল। তার মধ্যে একটি কেবলই অনুবীক্ষণের ব্যাপার। রোগ নিরূপণে ও রোগ চিকিৎসায় সে যন্ত্রের আজকাল বড়ই আদর। সেখানে সকল রকম ডাক্তারী নূতন ঔষধ ও নূতন যন্ত্র ইত্যাদিরও প্রদর্শনী আছে। অনেক প্রকার (X ray) যন্ত্র দেখিলাম। যন্ত্র-ব্যবসাদারেরা নানা দেশ হইতে আপনাদের জিনিষ দেখাইতে ও বেচিতে লইয়া আসিয়াছে। সকল জিনিষেরই গায়ে দাম লেখা। বড় একটা দরদস্তুর করিতে হয় না। তার মধ্যে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান লইয়াছে। Cancer বা কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্য কত না বৈদ্যুতিক ও রেডিয়ম যন্ত্র দেখিলাম। তা ছাড়া নানারূপ নূতন ঔষধ ও খাদ্যসামগ্রীও ছিল। সবগুলিই লোক চক্ষু আকর্ষণ করিবার জন্য বিপুল আড়ম্বরে সজ্জিত। সকল গুলিই বুঝাইয়া দিবার জন্য ছাপা কাগজ আছে, ও দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবারও লোক আছে। তুমি কেনো বা নাই কেনো তাতে ক্ষতি নাই,আপাততঃ যন্ত্রগুলিতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই হইল। আর তখনই তোমার নাম ধাম খাতায় টোকা হইয়া গেল। পরে তার সুফল ফলিবে—এই আশায় চিরদিন তোমাকে তাদের জিনিষের বিজ্ঞাপন ছাপা কাগজ পাঠাইবে। আমি এখনও এখানে ওরূপ কাগজ কত পাই। বিলাতী ব্যবসায়ের এই দস্তুর।

অধিবেশন শেষ হইলেই কত স্থান দেখিবার ও নিমন্ত্রণ খাইবার আহ্বান আসিল। সে দেশের মিউনিসিপালিটি ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বড় লোকেরাই অতিথিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিভিন্ন স্থান দেখাইতেন ও নানারূপে আপ্যায়িত করিতেন। খরচ তাঁদেরই সব; তবে কে যাইবে কে না যাইবে তাহা আগে হইতে ঠিক করিয়া বলা চাই। ওরূপ নিয়মবদ্ধ ঠিকঠাকের দেশে একবার যাইব বলিয়া শেষে 'না' বলা চলে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডেভনসায়ারে এমন বেশী কিছু দেখিবার নাই। বিখ্যাত রাসায়নিক "ডেভী"র এইস্থানে জন্ম হইয়াছিল। তাছাড়া একটি বহু পুরাতন ও বড় গির্জ্জা আছে।

স্থানটি আয়তনে খুবই ছোট—তবুও রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি চলে। আর পূর্ব্বে মালপত্র যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি খাল কাটা হইয়া-

ছিল,—এখন তাহার তত দরকার না থাকিলেও সেগুলি যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশে কত থাল এখন অযত্নে নষ্ট হইয়া গেছে। আর একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলাম—যুবতী বালিকাদের সুবেশ পরিয়া হাবভাব দেখাইয়া পথে বেড়ান। যেস্থানে জনতা হয় সেই স্থানেই তাঁহাদের গতি।

অতিথি বলিয়া সমিতির অভিভাবকগণ আমাদের কত কি দ্রব্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপহার দিলেন। তার ভিতর একখানি সাদা কাফ্ লেদারে বাঁধান সুন্দর সোনার জল দিয়ে লেখা, বহু ছবিবিশিষ্ট "Exeter" নামক সেই স্থানটিরই ইতিহাস। সে বইখানি আমার কাছে এখনও আছে। দেখিলেই সেই দিনের কথা মনে হয়।

সমিতি শেষ হইবার পরদিনই প্রাতে এই সব কাগজ ও খাতাপত্র সযত্নে থলির মধ্যে পুরিয়া ও হাতব্যাগ হাতে লইয়া সমুদ্র ধারের স্বাস্থ্যনিবাস "তর্কী" নামক স্থানে যাইবার জন্য গাড়ি ধরিতে ছুটিলাম। তাহাতে কোন ক্লান্তিই বোধ করি নাই। ঠাণ্ডা দেশে ও উদ্যমশীল বীরজাতির সংসর্গে মনে তখন কত উৎসাহ দেহে তখন কত বল! আজ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কিছুই নাই! সকলই আবহাওয়ার গুণ!

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

রসেটা প্রস্তর।

হার্মিস্ ত্রিস্ মেজিষ্টাস্ নামক মিশরীয় দার্শনিক স্বদেশকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,"হা মিশর, তোমার ধর্ম্মের অনিশ্চিত কিংবদন্তী মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ভবিষ্যবংশীয়গণ তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী মাত্র তোমার ধর্ম্মজীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সিথীয় অথবা ভারতীয়গণ, অথবা অন্যতর বর্ব্বর প্রতিবেশী আসিয়া মিশরে বাস করিবে। দেবতাগণ স্বর্গে প্রতিগমন করিবেন। মানব ও দেবতাবর্জ্জিত মিশর মরুভূমিতে পরিণত হইবে।"

স্বদেশপ্রেমিক দার্শনিকের সেই করুণ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। পারসীক গ্রীক ও রোমকগণ একে একে মিশর জয় করিয়া তথায় স্ব স্ব বিজয় পতাকা উড়াইয়াছে। অবশেষে মুসলমানগণ প্রাচীন সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন মিশরীয় সাম্রাজ্য শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিশরীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের কাহিনী বহুদিন যাবৎ শুধু কিংবদন্তীতেই নিবদ্ধ ছিল। সে কিম্বদন্তীও মিশর ত্যাগ করিয়া গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। মিশরে ছিল শুধু প্রস্তরোৎকীর্ণ শব্দাবলী। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহাদের মধ্যে মিশরীয় রহস্য লুক্কায়িত ছিল। দুই সহস্র বৎসর যাবৎ তাহারা মানবের অনুসন্ধিৎসা ব্যর্থ করিয়াছিল। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অতর্কিতভাবে সেই রহস্য

কুহেলিকা পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে এবং মিশরীয় সাহিত্য সুধীগণের কৌতূহল তৃপ্তি করিতে সক্ষম হয়।

গ্রীকগণ যখন মিশর জয় করিয়াছিল তখনও প্রাচীন ভাষাভিজ্ঞ লোকের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষা করিতে গ্রীকগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দুই একজন চেষ্টা করিয়া থাকিলেও তাহার শিক্ষা বিবরণ পাওয়া যায় নাই। অন্ততঃ কোন গ্রীক পণ্ডিতই মিশরীয় ভাষা শিক্ষা ও পড়িবার উপায় সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। মিশরীয় লিপিকে গ্রীকগণ যে নামে অভিহিত করিত—তাহা হইতে বোধ হয় গ্রীকগণ উক্ত লিপিকে ধর্ম্মের গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন বলিয়া মনে করিত। (Hieroglyphics—hieros sacred, glyphein—to carve) কিন্তু মিশ,-রীয়গণের দৈনিক ব্যাপারেও যে ঐ একই লিপি ব্যবহৃত হইত তাহা পরে জানা গিয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন মিশরীয় ভাষা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। মিশরের পূর্ণ অভ্যুদয়ের সময়ও কতিপয় সুধীগণ ভিন্ন অন্য কেহই প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় কথা বলিতে বা লিখিতে পারিত না। প্রাচীন ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক স্বতন্ত্রভাষায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। মিশর রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইবার পরে প্রাচীন ভাষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রাচীন ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া পড়ে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মিশরাভিযানের সহিত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিশরে গিয়াছিলেন। মিশরে উপনীত হইয়াই তাঁহারা মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হন, এবং মিশরের পুরাবস্তু সমূহ ফ্রান্সে অন্তরিত করিতে প্রয়াসী হন। ইংরেজের প্রতিবন্ধকতায় ইহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরেজগণ অনেক পুরাবস্তু স্বদেশে লইয়া যান। রসেটা প্রস্তর তাহাদিগের অন্যতম। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে নীলনদের মোহানায় রসেটা নগরের সান্নিধ্যে সেণ্ট জুলিয়ান দুর্গের ভগ্নাবশেষের মধ্যে ফরাসীগণ রসেটা প্রস্তরখানা প্রাপ্ত হন। আলেকজান্দ্রিয়ায় সন্ধির পরে প্রস্তরখানি ইংরেজদিগকে অর্পিত হয়। ইংরেজগণ বৃটিশ মিউজিয়মে ইহাকে রক্ষা করেন।

রসেটা প্রস্তরের উপর ত্রিবিধ লিপি খোদিত আছে। প্রথমে মিশরীয় চিত্র লিপি, তৎপরে রেখা, কোণ ও চিত্রার্দ্ধসম্বলিত এক প্রকার লিপি। ইহা দেখিয়া একরূপ সংক্ষিপ্ত লিপি বলিয়াই ধারণা হয়! ইহাকে প্রাকৃত লিপি (Enchorial or demolic) বলে। সর্ব্ব নিম্নে গ্রীক লিপি। একত্র সমাবেশিত ত্রিবিধ লিপি দেখিয়া প্রথমেই মনে হয় একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকও পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, একই কথা তিন লিপিতে খোদিত আছে! ১৯৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেম্‌ফিস্ নগরের যাজকগণ মিশরের গ্রীক রাজা পঞ্চম টলেমি, এপিফেনস্‌কে দেব-সম্মান প্রদান করেন,—প্রস্তর লিপি তাহারই নিদর্শন।

বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষগণ রসেটা

প্রস্তর দেখিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, এবং সমগ্র প্রস্তরীয় লিথোগ্রাফ চিত্র প্রকাশিত করেন। ইউরোপের যাবতীয় দেশের পণ্ডিতগণ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও প্রস্তর খোদিত মিশরীয় লিপিদ্বয় পড়িতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে ইংরেজ টমাস্ ইয়ং ও ফরাসী চ্যাম্পোলিন কর্ত্তৃক এই সমস্যার সমাধান হয়।

রসেটা প্রস্তরের পাঠোদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া ইয়ং বর্ত্তমান মিশরীয় ভাষা কপ্ত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে এক বৎসরের মধ্যে তিনি কপ্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন, এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয়—প্রাচীন মিশরীয় ভাষার সহিত কপ্ত ভাষার সাদৃশ্য আছে। প্রস্তরে খোদিত লিপি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ গ্রীক ভাষায় খোদিত বাক্যাবলীর অর্থ তিনি উপরিস্থ লিপিদ্বয় হইতে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে নিম্নলিখিত বিষয় আবিষ্কার করেন।

(১) চিত্রলিপির অনেক চিত্রদ্বারা চিত্রসূচিত পদার্থ সূচিত হইয়াছে। মানুষের চিত্রদ্বারা মানুষ, সিংহের চিত্রদ্বারা সিংহ ('শব্দ' নহে শব্দসূচিত পদার্থ) সূচিত হইয়াছে।

(২) অনেক চিত্রদ্বারা তৎসূচিত পদার্থ সূচিত না হইয়া পদার্থান্তর সূচিত হইয়াছে। শব্দসূচিত পদার্থের সহিত পদার্থান্তরের সম্বন্ধই এই ব্যাখ্যার কারণ।

(৩) পুনরুক্তিদ্বারা বহুবচন সূচিত হইয়াছে।

(৪) রেখাদ্বারা সংখ্যা সূচিত হইয়াছে।

(৫) দক্ষিণ অথবা বাম উভয় দিক হইতেই চিত্রলিপি পড়া যায়। কিন্তু যেদিকে জন্তুগুলির মুখ থাকে—সেই দিক হইতে পড়িতে হয়।

(৬) লোক অথবা পদার্থটি (proper nouns) শেষের নামসূচক চিত্রগুলি একপ্রকার ডিম্বাকার রেখাদ্বারা বেষ্টিত থাকে। ইয়ং এই ডিম্বাকার রেখাকে কার্ত্তুস্ (coitoushe) আখ্যা দিয়াছেন।

(৭) রসেটাপ্রস্তরস্থ কার্ত্তুস্‌গুলির মধ্যে "টলেমির" নাম লিখিত আছে।

(৮) কার্ত্তুসের পরে কোনও স্ত্রীলোকের চিত্র থাকলে তদ্দারা কার্ত্তুস্‌মধ্যস্থ নামের স্ত্রীত্ব সূচিত হয়।

(৯) কার্ত্তুস্‌মধ্যস্থ চিত্রগুলি শাব্দিক চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে (phonetic symbol)। কোথাও তাহারা মৌলিক ধ্বনির চিহ্নস্বরূপ (alphabetical), কোথাও কতিপয় সমবায়ে গঠিত শব্দাংশের চিহ্নস্বরূপে syllebic রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১০) একাধিক চিত্রদ্বারা একই ধ্বনি সূচিত হইতে পারে।

চতুর্দ্দশটী ধ্বনিসূচক চিত্রের নির্দ্দেশ ইয়ং করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছয়টী মাত্র পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। ইয়ং শুধু কার্ত্তুসের মধ্যেই বর্ণমালার ব্যবহার স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তু অথবা ব্যক্তি বিশেষের নাম ভিন্ন অন্যত্রও যে মিশরীয় ভাষায় বর্ণমালার ব্যবহার হইত—ইয়ং তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ফরাসী চ্যাম্পোলিন এই তথ্য অবাধে স্বীকার করেন।

রসেটাপ্রস্তর ও অন্যান্য অনেক মিশরীয়

লিখন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চ্যাম্পোলিন বুঝিতে পারেন মিশরীয়গণ একপ্রকার বর্ণমালা ব্যবহার করিত। তিনি মিশরীয় ভাষায় সম্পূর্ণ বর্ণমালার আবিষ্কার করেন। তন্মধ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যা অতি কম।

কিন্তু চ্যাম্পোলিনের মতও সুধীগণ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। মিশরীয় ভাষার চিত্র দ্বারা শুধু বর্ণই যে সূচিত হইত তাহা নহে। অনেক চিত্র দ্বারা পূর্ণ শব্দ ও অনেকগুলি দ্বারা শব্দাংশও সূচিত হইত। আবার অনেক চিত্র দ্বারা শব্দ সূচিত না হইয়া শব্দ নির্দ্দিষ্ট পদার্থই সূচিত হইত।

চ্যাম্পোলিনের পরে তৎশিষ্য রসেলিনি ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বিস্তর মিশরীয় পুরাবস্তু আবিষ্কার করতঃ মিশরের ইতিহাস গঠন করিয়াছেন। এই সমস্ত পণ্ডিতের গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে—মিশরীয়গণের মধ্যে প্রথমে চিত্রলিপিই প্রচলিত ছিল বর্ণমালার ব্যবহার প্রথমে হয় নাই। এবং বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরেও চিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয় নাই। বর্ণমালার অলঙ্কারের পূর্ব্বে প্রথমে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত হইত। প্রতি পদার্থ বুঝাইতে এক একটি চিত্র ব্যবহৃত হইত। তৎপরে চিত্র দ্বারা পদার্থ সূচিত না হইয়া তৎকালে শব্দ সূচিত হইত। একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও একই চিত্র দ্বারা শব্দ বিশেষ সূচিত হইত। একাধিক শব্দাংশের (Syllable) সমবায়ে শব্দ ও একাধিক মৌলিক ধ্বনির সমবায়ে শব্দাংশ গঠিত। প্রথমতঃ শব্দাংশের জন্য চিত্র ব্যবহার করিয়া অবশেষে মৌলিক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র চিত্রের ব্যবহার পর্য্যন্ত মিশরীয়গণ শিখিয়াছিল। প্রতি মৌলিক ধ্বনির জন্য স্বতন্ত্র চিত্র ব্যবহার করা ও বর্ণমালার ব্যবহার একই কথা। প্রথমে যে চিত্রগুলি মৌলিক ধ্বনি প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত—কালে সরলীকৃত হইয়া তাহারাই অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এই অক্ষরমালার ব্যবহার শিখিয়াও মিশরীয়গণ চিত্র ব্যবহার ত্যাগ করে নাই। কোনও শব্দ বর্ণ সাহায্যে বানান করিয়া তৎপরে তৎসূচক চিত্রও তাহারা ব্যবহার করিত। ফিনিসীয়গণ মিশরীয়গণের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অবলম্বিত লিপিপ্রণালী অবলম্বন করে। কিন্তু তাহারা মিশরীয় লিপির অনাবশ্যক চিত্রগুলি ত্যাগ করিয়া শুধু অক্ষরগুলি গ্রহণ করতঃ লিপিবিদ্যাকে অনেক সরল করিয়া দেয়। ফিনিসীয়গণের নিকট হইতেই যাবতীয় ইয়োরোপীয়গণ আপনাদের অক্ষরমালা প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

জোনাকি ও আঁধার।

জোনাকি কহিল হাসি—শোন গো আঁধার,
আমার প্রকাশে বাড়ে সৌন্দর্য্য তোমার!
আঁধার কহিল—নাহি কর অহঙ্কার,
তোমার প্রকাশ হয় উদয়ে আমার!

দীপ ও রজনী।

দীপ কহে—হে রজনী আলোকে আমার,
ধরা মাঝে হয় সদা প্রকাশ তোমার!
রজনী কহিল হাসি—মোর অবসানে,
হে দীপ, তোমার কথা কেহ নাহি জানে!

শ্রী প্রফুল্লশঙ্কর গুহ।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

রাজ-পরিবার, সৈন্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র।

ক্ষত্রিয়গণই রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহারা সময় সময় বলপ্রয়োগে ও রক্তপাতে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। ইঁহাদিগকেও বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়।

জনমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী তাহাদিগকেই বিশিষ্ট সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যেহেতু পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করে, সেই জন্য ইহারা শীঘ্রই যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শী হয়। শান্তির সময় ইহারা রাজ-প্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ শিবিরে বাস করে কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন ইহারা সকলের অগ্রবর্ত্তী হয়। সৈন্যগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম, পদাতিক, দ্বিতীয় অশ্বারোহী, তৃতীয়, রথী এবং চতুর্থ গজারোহী। হস্তীগণকে সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত করা হয় এবং তাহাদের দন্তেও তীক্ষ্ণ কণ্টক থাকে। সেনাপতি রথে উপবিষ্ট থাকিয়া আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দুই জন করিয়া চালক রথ চালনা করে। এই সকল রথ চতুরশ্বযোজিত। সৈন্যাধ্যক্ষ রথেই থাকেন; এবং চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ তাঁহার রথচক্রের নিকটে থাকে।

অশ্বারোহী সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য সর্ব্বাগ্রে থাকে এবং পরাজয় হইলে সংবাদ বহনের জন্য ইতস্ততঃ গমন করে। পদাতিকগণ ক্ষিপ্রকারিতার জন্য প্রতিরোধে নিযুক্ত থাকে। সাহস ও শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের নির্ব্বাচন হয়। ইহারা দীর্ঘ বর্শা ও প্রশস্ত ঢাল বহন করে। কখন কখন ইহারা তরবারীও ব্যবহার করে এবং প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়। ইহাদের যুদ্ধোপযোগী সকল অস্ত্রই তীক্ষ্ণধার ও সূক্ষ্মাগ্র। বর্শা, ঢাল, তীর, ধনুক, তরবারী, কুঠার, টাঙ্গী, এবং নানা প্রকার ফিঙ্গা যন্ত্র ইহারা ব্যবহার করে। এই সকল অস্ত্রাদি ইহারা বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

রীতিনীতি, বিচার, পরীক্ষা প্রভৃতি।

সাধারণ ভারতবাসীগণ যদিও লঘুচিত্ত, তত্রাপি তাহারা সৎ ও অপকার্য্যবিমুখ। অর্থাদি বিষয়ে তঞ্চকতা জানেনা এবং বিচার কার্য্যে ইহারা সতর্ক। পরকালের শাস্তির জন্য ইহারা বিশেষ ভীত কিন্তু বর্ত্তমানের বিষয় ইহারা বিশেষ চিন্তা করে না। ব্যবহারে ইহারা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয় না এবং প্রতিজ্ঞাপালনে বিশেষ তৎপর। রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সাধুতাপরিপূর্ণ এবং ইহাদের ব্যবহার অত্যন্ত সরল ও মধুর। দেশে অপরাধীর সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং অতি অল্প সময়ই ইহারা উপদ্রব করে। যখন কেহ আইন-বিরুদ্ধ আচরণ করে, তখন সেই বিষয় সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা হয়। শারীরিক কোন প্রকার শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না। শীলতা অথবা ন্যায়ের বিধিলঙ্ঘন, দাম্পত্য-সম্বন্ধ ভঙ্গ, বা পিতৃমাতৃভক্তিতে ঔদাসীন্য দেখিলে সেই ব্যক্তির নাসাকর্ণ ছেদন অথবা হস্তপদাদি কর্ত্তন করিয়া অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত বা মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া শাস্তি দেওয়া হয়। অন্যান্য দোষে, সামান্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপরাধী ব্যক্তির দোষানুসন্ধানের জন্য কোনরূপ বেত্র বা দণ্ড ব্যবহৃত হয় না। অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যদি নিজ দোষ স্বীকার করে তবে তাহাকে লঘুশাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যদি অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার না করে অথবা অপরাধ করিয়া থাকিলেও দোষক্ষালনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়া নিম্ন লিখিত কোন প্রকারে শাস্তি প্রয়োগ করা—যথা (১) জল, (২) অগ্নি (৩) পরিমাণ প্রয়োগ অথবা (৪) বিষ।

প্রথমোক্ত বিধিতে অপরাধীকে থলিয়ায় করিয়া প্রস্তর পাত্রসহ গভীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি জলমগ্ন হয় ও প্রস্তর পাত্র

ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যদি প্রস্তর জলমগ্ন হয় ও ঐ ব্যক্তি ভাসিয়া ওঠে তাহা হইলে সে নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয়ত :—ভারতবাসীরা লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর উপবেশন করায়। এবং ঐ উষ্ণ লৌহপাত্র অপরাধীকে ক্রমান্বয়ে হস্ত, পদ ও জিহ্ব'দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যদি ইহাতে কোন ক্ষত না হয় তবে সে নির্দ্দোষ এবং ক্ষত হইলে দোষী বলিয়া গণ্য হয়। কোন দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি এইরূপ পরীক্ষায় অসম্মত হইলে, তাহাকে একটি ফুলের কলিকা অগ্নির দিকে নিক্ষেপ করিতে হয়। যদি কলিকাটি প্রস্ফুটিত হয় তবে সে ব্যক্তি নির্দ্দোষ এবং পুষ্পটী দগ্ধ হইলে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়।

তৃতীয় দণ্ডের নিয়ম, অপরাধীর সমপরিমাণ প্রস্তর একত্র তৌল করা হয়। যদি তৌলকালীন অপরাধীর ওজন প্রস্তরাপেক্ষা কম হয় তবে তাহাকে নির্দ্দোষ বলা হয়। আর যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয় তবে, প্রস্তরের ভারই বেশী হয়।

চতুর্থ দণ্ডের নিয়ম ; একটী মেষের দক্ষিণ উরুতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সকল প্রকার বিষ ও অপরাধীর আহার্য্যের কিয়দংশ দেওয়া হয়। যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হয় তবে মেষটী মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং নিরপরাধ হইলে বিষে কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

উপরোক্ত চারিটী উপায়েই দুষ্কার্য্যের পথ রোধ করা হইয়া থাকে।

সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম।

নিম্ন লিখিত নয় প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।—(১) অনুরোধ কালীন মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া (২) সম্মান প্রদর্শনের জন্য মস্তক অবনত করিয়া (৩) হস্তোত্তোলন করিয়া এবং নত হইয়া (৪) হাত জোড় করিয়া এবং নত হইয়া (৫) জানু নীচু করিয়া (৬) সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া—(৭) জানু ও হস্তের উপর ভর দিয়া (৮) পঞ্চচক্রে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া এবং (৯) পঞ্চাঙ্গে প্রণত হইয়া এবং মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া।

এই কয় প্রকারের মধ্যে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত এবং পরে জানু পাতিয়া সম্বোধিত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তনই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাননীয় ব্যক্তি দূরে থাকিলে অবনত হইয়া প্রণাম করাই বিধেয়। নিকটে থাকিলে পদ চুম্বন এবং সম্বোধিত ব্যক্তির গুল্‌ফ স্পর্শ করাই উচিত।

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির আদেশ গ্রহণের সময়, পরিধেয় প্রান্ত ভাগ উত্তোলন করিয়া ভূমিতে প্রণত হইতে হয়। উচ্চ পদস্থ বা সম্মানীয় ব্যক্তি—যাঁহাকে উপরোক্ত রূপে সম্মান প্রদর্শন করা হয়—তিনি মস্তক স্পর্শন বা পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া মিষ্ট বাক্যে উপদেশ দান অথবা স্নেহ প্রদর্শন করেন।

যখন কোন শ্রমণকে—যিনি ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—এইরূপ অভিবাদন করা হয়, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে শুভ কামনা করেন।

ভারতবর্ষে প্রণামই একমাত্র সম্মান উপায় নহে। তাহারা নানা প্রকারে প্রদক্ষিণ করিয়াও সম্মান প্রদর্শন করে।

ঔষধ, সৎকার প্রভৃতি।

কাহারও কোন রূপ ব্যাধি হইলে তিনি সাত দিবস উপবাসী থাকেন। অনেকে এই উপবাসকালীনই আরোগ্য লাভ করেন কিন্তু ইহাতে আরোগ্যলাভ না করিলে তখন ঔষধ সেবন করেন। এই সকল ঔষধের ফল ও নাম বিভিন্ন। চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী।

যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, যাহারা সৎকার করে, তাহারা বিশেষরূপে শোক প্রকাশ করে এবং সকলে একত্র হইয়া ক্রন্দন করে। তাহারা তাহাদের বস্ত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন, এবং কেশবন্ধন উন্মুক্ত করিয়া মস্তকে ও বক্ষে আঘাত করিতে থাকে। অশৌচকালীন কিরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে এবং কতদিন অশৌচ পালন করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

মৃতদেহ সৎকার করিবার তিনটী প্রণালী আছে। প্রথম দাহ, চিতা সজ্জিত করিয়া কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করা হয়। দ্বিতীয়, গভীর জলে মৃতদেহ নিক্ষেপ; এবং তৃতীয় পশুপক্ষীর আহারের জন্য মৃতদেহ নির্জ্জন স্থানে বিসর্জ্জন।

রাজার মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। কেননা উত্তরাধিকারীকেই রাজার সৎকার কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং প্রজাগণকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। রাজার গুণানুসারে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে উপাধি ভূষিত করা হয়। মৃত্যুর পরে আর কোন প্রকার উপাধি দেওয়ার রীতি নাই।

যে বাড়ীতে মৃত্যু হয়, তথায় যতক্ষণ মৃতের সৎকার না হয় ততক্ষণ আহারাদি স্থগিত থাকে। সৎকারের পর পূর্ব্ববৎ আহারাদি ও ক্রিয়া কলাপ হয়। মৃতের জন্য কোন প্রকার বাৎসরিক অনুষ্ঠানের রীতি নাই। যাহারা সৎকারে ব্যাপৃত থাকে তাহারা নিজেদের অপবিত্র বিবেচনা করে। তাহারা নগরের বহির্ভাগে স্নান করিয়া পরে গৃহ প্রবেশ করে।

বৃদ্ধ ও স্থবির অথবা যাহারা গুরুতর ব্যাধি গ্রস্ত তাহারা যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাসনা করে, অথবা যদি কেহ সংসারের ভোগাদি হইতে মুক্তির বাসনা করে, তবে তাহাদের আত্মীয় ও বন্ধুগণ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া বাদ্যসহকারে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া নৌকা গঙ্গার মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে, এই সকল ব্যক্তি গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হয়। এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে উহারা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিবে—এইরূপ ইহাদের বিশ্বাস।

পুরোহিতগণ মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ বা ক্রন্দন করিতে পারে না। যখন কোন পুরোহিতের মাতার বা পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহারা মন্ত্র পাঠ করে এবং অতীতের বিষয় স্মরণ করিয়া সৎকারে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের বিশ্বাস যে এইরূপ করিলে ইহাদের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায়।

রাজনীতি, রাজকর প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের রাজনীতি মঙ্গলজনক বিধির সহিত জড়িত বলিয়া, শাসনকার্য্য অত্যন্ত সহজ। অধিবাসীদিগের নামধাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা নাই এবং তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিবারও নিয়ম নাই। রাজাদিগের নিজ ভূম্যধিকার আয় প্রধানত চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ রাজকীয় কার্য্য এবং পূজা হোমাদিতে,—দ্বিতীয়াংশ মন্ত্রী ও রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীবর্গের বেতনাদিতে,—তৃতীয়াংশ রাজ্যের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পুরস্কারার্থে, এবং চতুর্থাংশ ধর্ম্মসভা প্রভৃতিতে ব্যয় হইয়া সুবৃত্তি সকলের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রজার রাজকরের পরিমাণ অল্প এবং তাহাদের ব্যক্তিগত যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহাও পরিমিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দ্রব্যাদি শান্তিতে রক্ষা করিতে পারে এবং জীবিকার জন্য স্ব স্ব ভূমি কর্ষণ করে। যাহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করে, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকর রূপে দিতে হয়। বণিকগণ ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারেন। সামান্য কর প্রদত্ত হইলেই জলপথ ও স্থলপথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রজাদের কাজ করিতে হয় বটে কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বেতন পায়। কার্য্যের অনুপাতানুযায়ী বেতন দেওয়া হয়।

সৈনিকগণ সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করে অথবা অবাধ্যদিগকে শাস্তি দিতে বহির্গত হয়। সৈন্যগণ, শাসনকর্ত্তাগণ, মন্ত্রীগণ, নগরপাল এবং কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত ভূমি লাভ করেন।

তরুলতা, কৃষি, আহার্য্য, পানীয় এবং পাক ক্রিয়া।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলবায়ু বলিয়া, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। পুষ্প, লতা, ফল, বৃক্ষ নানা প্রকারের এবং তাহাদের নামও বিভিন্ন। আমলা, সাধুক, আম্র, কপিথ, তিন্দুক, মোচা, নারিকেল, এবং পানস ফল প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এদেশের সকল প্রকার ফলের নামকরণ

অসম্ভব। খর্জ্জুর, বাদাম, এদেশে পাওয়া যায় না। আঙ্গুর, পীচ প্রভৃতি ফল কাশ্মীর হইতে আনীত। দাড়িম্ব ও মিষ্ট কমলা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

উপযুক্ত সময়ে কর্ষণ, বপন, কর্ত্তন হয়। কার্য্য শেষে কৃষকেরা কিছুকাল বিশ্রাম করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান। আদা, শরিশা, তরমুজ, লাউ, কদু, যথেষ্ট পাওয়া যায়। পেঁয়াজ ও রসুন বেশী পাওয়া যায় না। যদি কেহ পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহাকে নগরের বহির্ভাগে নির্ব্বাসন করা হয়। দুগ্ধ, মাখন, সর, চিনি, গুড়, শর্ষপতৈল, এবং পিষ্টকই সর্ব্বজন খাদ্য। মৎস্য ও মেষ মাংসও সচরাচরই লোকে খায়। কখন কখন নোনা মৎস্যমাংসও ব্যবহৃত হয়। গো, গর্দ্দভ, হস্তী, অশ্ব, শূকর, কুক্কুর, শৃগাল, নেকড়ে সিংহ, বানর এবং লোমশ পশুর মাংস নিষিদ্ধ। যাহারা এই সকল পশুমাংস ভক্ষণ করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখা হয় এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করে। ইহারা নগরের বহির্ভাগে বাস করে এবং কদাচিৎ ভদ্র মনুষ্যের সহিত মিলিত হয়।

নানা প্রকার মদ্য আছে। ক্ষত্রিয়গণ আঙ্গুর ও ইক্ষু নির্ম্মিত সুরা পান করে। বৈশ্যগণ তেজস্কর মদ্য পান করে। শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ আঙ্গুর অথবা ইক্ষু সরবৎ পান করে। এই সরবৎ তীক্ষ্ণতেজ নহে। বর্ণসঙ্কর ও নীচ জাতিগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে বিভিন্ন নহে। কেবলমাত্র ইহারা যে পাত্র ব্যবহার করে তাহা অন্যরূপ। ইহাদের গৃহকার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদির অভাব নাই। যদিও ইহাদের কড়াই ও হাঁড়ী আছে কিন্তু তত্রাপি ইহারা অন্নপাকের জন্য ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার জানে না। নানা প্রকার মৃন্ময় পাত্রাদি ইহারা ব্যবহার করে। সকল প্রকার দ্রব্য একটী পাত্রে একত্র করিয়া অঙ্গুলি সংযোগে মাখিয়া আহার করে। ইহারা চামচ বা পেয়ালা ব্যবহার করে না। পীড়িত হইলে ইহারা তাম্রপাত্র ব্যবহার করে।

বাণিজ্যাদি—

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শ্বেত অশ্ব এবং মুক্তাই এই দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এতদ্ব্যতীত নানারূপ মূল্যবান রত্ন এবং নানা প্রকার প্রস্তরাদি এদেশে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত এই গুলি বিনিময় করে। ইহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা নাই।

ভারতবর্ষ এবং নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সীমা উপরে বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হইল। জলবায়ু ও ভূমির বিষয়ও বর্ণনা করা হইয়াছে। এইক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিবরণ প্রদত্ত হইবে। (ক্রমশঃ)

তৈমুর লঙ্গ।

প্রথম সম্রাট। (মাসুশি হইতে)

যে বীরপুরুষ তাতার দেশের এক সামান্য গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ শক্তি ও প্রতিভার বলে ভারত হইতে পশ্চিমে ম্যাসিডোনিয়া পর্য্যন্ত আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৈমুর লেন বা তৈমুর লঙ্গ দুইটি তাতার কথার সংযোগে রচিত হইয়াছে। তৈমুর অর্থে লৌহ। চিরদিন লৌহ অস্ত্রে পরিবেষ্টিত ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে তৈমুর বলা হইত। লঙ্গ অর্থে খঞ্জ। তৈমুরের জন্মাবধি একটি পা খোঁড়া ছিল। তাতার দেশের কাশ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। মুসলমানদিগের ইতিহাসে এই সম্রাটের জন্ম সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালীর জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কোন গল্প রচনা করা প্রাচ্যজাতির অভ্যাস।

শুনা যায় তৈমুরের মাতার নাকি বিবাহের পূর্ব্বেই সহসা পুত্রবতীর লক্ষণ প্রকাশ পায়। কুমারীর পিতা নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িলেন; কন্যাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া দুষ্টা কন্যাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া স্বীয় অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। এরূপ সময়ে যুবতী পিতার পদতলে পড়িয়া তাহার অবস্থার আশ্চর্য্য কাহিনী প্রকাশ করিল। সে বলিল "তাহার গৃহের জানালায় একটি সামান্য ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া তাহাকে এরূপ ভাবে বেষ্টিত করিয়া ধরিল, যে মনে হইল যেন সে উজ্জ্বল আলোক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছে। পরে সেই রশ্মি তাহাকে আদর করিতে লাগিল। পরে কুমারী কাতরে কহিল, পিতা, আপনার আমার প্রতি ক্রোধ সঙ্গত সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার এ অবস্থার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" পিতা সন্ধান লইয়া জানিলেন কন্যার কথাই সত্য। অবশেষে তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সকল তেজের আকর সূর্য্যের অনুগ্রহে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার গৌরব-কীর্ত্তিতে তাঁহার বংশের নাম অমর হইবে।

এই গল্পটি নিতান্ত গল্প হইলেও তৈমুরের পিতার নাম হইতেই এই গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নাম ছিল টার্গে অর্থাৎ "আলোকের উৎপত্তি-স্থল।" হুসেন নামে এক নৃপতি সে সময়ে তুর্কিস্থান ও তাতারের একছত্র অধিপতি ছিলেন। এই হুসেনের রাজসভার মধ্যে টার্গে একজন অতি বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত সভাসদ ছিলেন। "মোগল" এই কথাটার আদি অর্থে কোন দেশবিশেষকে বা সাম্রাজ্য বিশেষকে বুঝায় না। "মোগল" একটা পরিবার বিশেষের নাম মাত্র। এই পরিবার বহুদিন হইতে তাতার প্রদেশের দক্ষিণভাগে রাজত্ব করিত। এই পরিবার হইতেই তৈমুরের উৎপত্তি। ইঁহারই পূর্ব্ব-পুরুষ চেঙ্গিস খাঁ আসিয়ার প্রধানতম রণবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ মোগল বর্ত্তমান উভয় তাতার প্রদেশকেই শাসন করিতেন। নিজ ভুজবলে তিনি চীনদেশ পর্য্যন্ত পদানত করিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণ চীনে সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিজরা ৭৩৬ অব্দে অর্থাৎ ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের জন্ম হয়। এই সময়ে হুসেন নামে চেঙ্গিসের এক বংশধর দক্ষিণ তাতারে রাজত্ব করিতেন। মোগলদিগের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, তৈমুর রাজসভা ও রাজধানী হইতে দূরেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তিনি বাল্যকালে তাঁহার পিতার মেষ পালন করিয়া বেড়াইতেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার বাক্যে ব্যবহারে একটা অদম্য তেজের ভাব প্রকাশ পাইত। তাহা ছাড়া সেই অল্প বয়সেই তিনি চতুর্দ্দিকস্থ মেষপালক বালকগণের উপর যেরূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে তিনি যে প্রভুত্ব করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইত। পল্লীর বালকগণ সকলেই তাঁহাকে দলপতির ন্যায় সম্মান করিত এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইলে তাঁহাকেই বিচারক বলিয়া মনোনীত করিত। মেষ চারণের স্থান লইয়া যখন বিবাদ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, তাহারা বালক তৈমুরের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিত এবং তিনি যাহা বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন তাহার বিরুদ্ধে আর কোন আপিল করা তাহারা আবশ্যক মনে করিত না। একবার এক উষ্ট্র দলভ্রষ্ট হইয়া বালকদের মেষ-চারণের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বালকেরা তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কি ছাড়িয়া দিবে স্থির করিতে না পারিয়া, তাহাদের অভ্রান্ত বিচারক তৈমুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুর বিচার করিয়া বলিলেন—"এই উষ্ট্র যদি নিম্নভূমি হইতে তোমাদের নিকটে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বদলে যুক্ত হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, আর যদি সে পার্ব্বত্য ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় স্বদলে মিলিত হওয়া সম্ভব নয় বরং বন্যজন্তুর দ্বারা হত হওয়াই সম্ভব, সুতরাং সেরূপ স্থলে উহাকে রাখিয়া দেওয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য।" বালকগণ তাহাই

করিল, উষ্ট্রটিকে নিজেদের নিকটেই রাখিয়া দিল। এইরূপে বালকদের ক্রীড়ার মধ্যেই পৃথিবীর অভূত-পূর্ব্ব বিরাট সাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই মেষপালক বালকগণ বড় হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তৈমুরেরও তাহাদের উপর প্রভুত্ব ও প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই প্রভুত্বের অধিকার-বলে তিনি অনুচরদিগকে যেরূপ কঠোরভাবে শাসিত করিতেন, তাহাতে ক্রমে তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, তাঁহার প্রতিবাদ করিতে আর কেহই সাহসী হইত না। একদিন তৈমুর শুনিলেন এক নেকড়ে বাঘ একটি মেষকে লইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মেষপালককে তাহার অসাবধানতার জন্য সমুচিত দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার এক প্রজা একটি গরু চুরি করিতে যাইয়া ধরা পড়ে। নবীন নৃপতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে শূলদণ্ডে বধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এই বিচারের ফলে মেষপালকের অধিনায়ক তাঁহার শক্তির বল বুঝিলেন এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্খায় প্রণোদিত হইলেন। মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা মনে করিলেন মেষপালকগণ বালক তৈমুরের হস্তে যে ক্ষমতা দান করিয়াছে তৈমুর এক্ষেত্রে তাহার অপব্যবহার করিয়াছে। এই বিশ্বাসে তাহারা বিচারক ও তাঁহার নৃশংস শাসনের পরামর্শদাতাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। শাস্তিটা যে অসঙ্গত হইয়াছিল তাহা তাহারা মনে করে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্তি দান করিয়াছিল তাহাকে শাসনকর্ত্তারূপে স্বীকার করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। সেই জন্য এই অন্যায় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দুই গ্রামের অধিবাসীরা অর্থাৎ দুই পরিবারের পরিজনবর্গ নিকটবর্ত্তী মেষচারণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তৈমুর তাঁহার অল্প বয়স্ক বীরগণকে লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং এই দুই পরিবারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুচর-বর্গ প্রথম জয়গৌরব লাভ করিল। তৈমুরের সাহস ও দক্ষতার বিবরণ শুনিয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সাহসী যুবকগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। ইহারা সকলেই তাঁহার প্রজা হইবার জন্য উৎসুক, এবং যথার্থ রাজার ন্যায় তৈমুরের আজ্ঞাপালন করিয়া ইহারা এক প্রকার গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

তৈমুরের যে সকল মেষপাল ছিল তাহাদের চারণোপযোগী যথেষ্ট ভূমি লাভ করিবার জন্য এবং এতগুলি অনুচর মেষপালকের অধিকার বৃদ্ধির জন্য, তাঁহার নূতন ভূমি জয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সুলতান্ মামুদই তাঁহাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন। তাহারা তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করা সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল, এবং তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে রাজধানী অধিকার করিবার পরামর্শ করিল। এই রাজধানীতে সেই প্রদেশের যত অল্পবয়স্ক মেষপালকগণ যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত।

যুদ্ধ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এই অল্পবয়স্ক মেষ-পালক-গণ তাহাদেরই ন্যায় অল্পবুদ্ধি ও অল্পবয়স্ক এক নায়কের নেতৃত্বে চালিত হইয়া রাজধানীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তৈমুরের সৈন্যগণ যে কোথায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। অবশেষে তৈমুর অনুচর-বিহীন ভাবে একাকী পদব্রজে ভিক্ষা করিতে করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন। একদিন এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে চিনিত। সে তাঁহাকে তাহার আপন কুটীরে লইয়া গেল এবং রাখালরাজকে এক সঙ্কীর্ণ রেকাবে করিয়া দুটি গরম ভাত দিল। ক্ষুধায় কাতর হইয়া তৈমুর রেকাবের মধ্যস্থল হইতে ভাত লইয়া তাড়াতাড়ি যেমন খাইতে গেলেন, অমনি তাঁহার মুখ পুড়িয়া গেল। বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল, "প্রভু, এই ঘটনা হইতে শিক্ষা করুন যে ভবিষ্যতে আর কখনও মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিবেন না, প্রান্তভাগ হইতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমে সীমান্ত দেশ জয় না করিয়া ব্যস্ততা সহকারে দেশের মধ্যস্থলে

যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে বিপদ ও ব্যর্থতা অনিবার্য্য।"

এই উপদেশ তৈমুর কখনও বিস্মৃত হন নাই। ভবিষ্যতে যাবতীয় যুদ্ধে তিনি সর্ব্বদাই এই নীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহার যাত্রার ব্যাঘাত করিতে পারে বা পলায়নে বাধা প্রদান করিতে বা জয়লাভকে ব্যর্থ করিতে পারে, এরূপ কারণ তিনি সেই অবধি কখনও পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতেন না। যাহা হউক তাঁহার জীবনের এই প্রথম বাধায় তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। তাঁহার বিচ্ছিন্ন অনুচরবর্গ বিভিন্ন পথ দিয়া পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট যাইয়া সমবেত হইল। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায়ই তাঁহার অনুগত রহিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর হইতেই তৈমুর যেন কিছু অত্যধিক উদ্ধত ও কঠোর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি নিকটবর্ত্তী ভূমিসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। প্রতি স্থলেই জয় লাভ করিয়া রাখালরাজ তাঁহার পূর্ব্ব পরাজয়ের স্থানটির এত নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন যে তিনি সেই নগরটিকে পুনরায় অধিকার করিতে চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নগর অধিকৃত হইল এবং এই সংবাদে বহুদূর পর্য্যন্ত সকলে ভীত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাখাল ও তাহাদের অধিনায়কের অসমসাহস দেখিয়া হুসেন ও তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাতার প্রদেশে তাঁহার রাজ্যমধ্যে তৈমুর একপ্রকার রাজশক্তি অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন। হুসেন এই নবীন বিজেতার অগ্রসরের পথ বলপূর্ব্বক রোধ করা আবশ্যক স্থির করিলেন। মামুদের পরাজয়ে তৈমুরের শক্তি দেখিয়া বস্তুতঃ অনেকেই ঈর্ষা বোধ করিত। অমাত্যবর্গ হুসেনকে পরামর্শ দিল যে এরূপ যুদ্ধকর্ম্মে অনভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় অর্ব্বাচীন ও অল্পবয়স্ক মেষ-পালককে পরাজিত করার জন্য অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ সৈন্যই যথেষ্ট। অস্ত্রের প্রভেদ হিসাবে এরূপ অসমান যুদ্ধ কখনও হইয়াছে কি না জানি না। রাজসৈনিকেরা উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি লইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাতার দেশীয়গণ এ সময়ে বন্দুকের ব্যবহার জানিলেও তাহা যুদ্ধে ব্যবহার করা তখনও প্রচলিত হয় নাই। তৈমুরের লোকেরা কেবল শড়কি ও বর্ষা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তৈমুরের লোকেরা সকলেই যৌবনের অদম্য তেজে উদ্দীপ্ত,—তাহাদের দেহ ক্লান্তি জানে না, মন সঙ্কোচ জানে না। তাহা ছাড়া তাহাদের মনোনীত নায়কের আদর্শে ও জয়োল্লাসে তাহারা সকলেই উৎফুল্ল; যুদ্ধ ব্যাপারে তৈমুরের একপ্রকার ঐশী শক্তি ছিল। অনভিজ্ঞ হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে তিনি সুদক্ষ বীরের ন্যায় সৈন্যচালনা করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল; মেষপালকগণের প্রবল ব্যূহ হুসেন কোনমতেই ভেদ করিতে পারিলেন না। তৈমুর স্বয়ং ব্যূহমুখে উপস্থিত থাকিয়া অসমসাহসে শত্রুসংহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৈমুরই জয়ী হইলেন, হুসেন জীবন ও রাজমুকুট দুইই হারাইলেন।

(ক্রমশঃ)

যবদ্বীপে।

বৃহস্পতিবার।

একটি উৎকৃষ্ট টাটুঘোড়ার উপর চড়িয়া, প্রাতঃকাল পাঁচটার সময় ব্রমোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার পথপ্রদর্শক—একটি যাবা-দেশীয় যুবক—মুখে একটি বেশ মধুর সরল ভাব। গায়ে একটা সাদা ছোটো জামা, এবং আ-জানু-লম্বিত একটা খাটো স্কচ্‌-কোর্ত্তা। জঙ্ঘা ও পদদ্বয় নগ্ন।

দুই ঘণ্টা ধরিয়া, শাক্‌সবজির ক্ষেতের উপর দিয়া, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিলাম।

পরে, হঠাৎ একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়া হইতে, একটা বিরাট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। বালু-সমুদ্র। এই ধূসর বালু-সমুদ্র, একটা বিশাল পরিসর ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার চারিদিকে, আগ্নেয় গিরির প্রাচীর। বোধ হয় ইহা আগ্নেয় গিরির একটা পুরাতন অগ্নি-গহ্বর। এই বিরাট গহ্বর হইতে ৪।৫টা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরি সমুত্থিত হইয়াছে :—বাটক্,—উদ্ভিজ্জে সমাচ্ছন্ন; তাহার পশ্চাতে ব্রমো; আরও দূরে, আর কতকগুলা আগ্নেয় গিরি; দক্ষিণে, Smeroe গিরি; তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; দেখিলে মনে হয় যেন টুপির মাথায় পালোকের থোপ্না উঠিয়াছে...এই অনন্য-সাধারণ বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য অনেকক্ষণ দেখিয়াও ক্লান্তি বোধ হয় না। আর-কি নিস্তব্ধতা! বাতাসের শব্দমাত্র নাই—একটি পাখীর ডানার শব্দও নাই: এই বিরাট-গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া মনোমধ্যে যে এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য-রস অনুভূত হয়, তাহা আর কিছুতেই বিক্ষিপ্ত হইবার নহে।...

পাহাড়ের পাদদেশে নামিয়া বালু-সমুদ্রে পৌঁছিলাম। নীচে হইতে দৃশ্যটা আর এক হিসারে আরও জম্‌কালো। নীচে হইতে আগ্নেয় গিরিগুলার প্রশস্ততা আরও বেশী উপলব্ধি করা যায়। উপর হইতে শুধু কল্পনা করা যায় মাত্র। আবার ঘোড়ায় চড়িয়া, বাটকের মধ্য দিয়া,—বায়ু সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে, স্ফীতকায় উদ্ভিজ্জ-শ্যামল যে গিরি-প্রাচীর আছে—তাহার প্রায় চূড়াদেশে আরোহণ করিলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে এরূপ উন্মত্ত হইলাম যে সেই বালু-সমুদ্রের উপর দিয়া আমার টাটুকে খুব ছুটাইয়া ব্রমোর পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। ব্রমোর পশ্চাতে, আগ্নেয় পদার্থসমূহের সূক্ষ্ম রেণুরাশি জলদ-জালের ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক এত পিছনে পড়িয়া গিয়াছে যে, সে একটি বিন্দুর ন্যায় অদৃশ্যপ্রায়। তাহার এই ক্ষুদ্রতা হইতে, চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থসমূহের বিশালতা আরও যেন বেশী উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আমি ব্রমোর দুরারোহ ঢালুর উপর পদব্রজে উঠিলাম। একটা বন্ধুর সুঁড়ি-পথ, তার পর একপ্রকারের সোপান ধাপ—এই পথ ও ধাপের উপর দিয়া একেবারে চূড়ায় উঠিলাম।

এই শৈল-প্রাচীরের চূড়া হইতে, পাদদেশের গহ্বর দেখা যায়—এই আগ্নেয় গহ্বরটা অতীব বিশাল। শৈল-গাত্রে দ্রব-ধাতু গড়াইয়া পড়িতেছে; ফিকা হলদে কিংবা ঘোর-সবুজ রঙ্গের গন্ধকের বড়-বড় পত্তর। অসংখ্য রন্ধ্রপথ দিয়া ধূমের ফোয়ারা নিঃসৃত হইয়া খুব উচ্চে উঠিয়াছে। একেবারে তলদেশে, জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে; ঐ ফুটন্ত জল পর্য্যায়ক্রমে ধূসর, সাদা, কালো, সবুজ—এইরূপ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিতেছে। একটা বাষ্প উঠিতেছে—এই বাষ্প কখন কুয়াসার মত পাতলা কখন মেঘের মত ঘন... সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় একটা গভীর শব্দ ক্রমাগত শুনা যাইতেছে—যেন সৈকত বেলার উপর তরঙ্গাঘাত হইতেছে। সময়ে-সময়ে এই মূল-ধ্বনির সহিত, সোঁ-সোঁ শব্দ, ঘোর গর্জ্জন, ও বজ্রনিনাদ মিশ্রিত হইতেছে...

এই নৈসর্গিক নাট্য, নাট্য-সঙ্গীত, নাট্য-

সজ্জা সমস্তই অতীব অদ্ভুত। আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমার অন্তরাত্মা যদি ধর্ম্মপ্রবণ ও উপধর্ম্মভীরু হইত এবং মধ্যযুগের যোগীদিগের ন্যায় আমার প্রবল কল্পনা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এই আগ্নেয়গহ্বর দেখিয়া নিশ্চয়ই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত: আমার মনে হইত, আমার পাদদেশে একটা নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—যে নরকে,—প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছায়, অসংখ্য পাপী অনন্তকাল ধরিয়া দগ্ধ হইতেছে!

কিন্তু আমি ঊনবিংশতি শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞান, আমার অন্তরে শান্তিতর ভাবের অঙ্কুর, উচ্চতর চিন্তার অঙ্কুর স্থাপন করিয়াছে। বিজ্ঞান নিরাকুলভাবে এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীর গর্ভকেন্দ্রে একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে।—বিজ্ঞানের এই আভাস ইঙ্গিতে, মানুষের কল্পনা ছুটিয়া চলিয়াছে। না জানি এই পৃথিবীর গর্ভস্থ উত্তাপ কতদূর হইতে আসিয়া, আমার নিকটবর্ত্তী এই জলরাশিকে ফুটাইয়া তুলিতেছে! কি প্রকাণ্ড আমাদের পৃথিবী! কি প্রকাণ্ড আমাদের সৌরজগৎ—যাহার নিকট আমাদের এই পৃথিবীও একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র! আর এই সমস্ত অসংখ্য তারা, এই সমস্ত গ্রহ, এই সমস্ত সূর্য্য লইয়া যে ব্রহ্মাণ্ড—এই ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড, কি অমেয়, কি অসীম!...এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি আমার মনে অনন্তের ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে—তারা-সঙ্কুল নির্মেঘ আকাশ দর্শনে যেরূপ অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ।

আমার এইরূপ মনোভাবের হেতু নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে করিতে, ব্রমোর শিখরে উঠিয়া, বিরাট্-রস (sublime) সম্বন্ধে ক্যাণ্টের (kant) সিদ্ধান্ত আমার মনে পড়িয়া গেল। ক্যাণ্টের মতে,—মানুষ যখন যুগপৎ আপনাকে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব ও জ্ঞান-নীতি সম্পন্ন উন্নত জীব বলিয়া মনে করে, তখনই মানুষের মনে বিরাট্-রসের আবির্ভাব হয়। ক্যাণ্ট যেভাবে বিরাটের অর্থ করেন, সেই অর্থে এই যবদ্বীপের আগ্নেয়-গিরি, বিরাট ভাবোদ্দীপক। এই সকল আগ্নেয় গিরি আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে; পক্ষান্তরে ইহাও মনে করাইয়া দেয়, প্রকৃতি যতই বৃহৎ হোক্ না কেন, মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, প্রকৃতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান, প্রকৃতি অপেক্ষা প্রীতিভাজন। বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ যখন বাস্তবকে বুঝিতে পারে, মানুষ যখন বিশ্ব-বাসী কতকগুলি জীবের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, তখনই মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী।

৩০

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আমি বসিয়াছিলাম—অতীতের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল—স্বপ্নের মত বিচিত্রমধুর কৈশোরের কথাগুলি! দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার এই ভীষণ কণ্টক, সে কথাগুলি তাহারি পার্শ্বে যেন সুন্দর, শুভ্র কুসুমের রাশি!

প্রফুল্ল মুখ, নিশ্চিন্ত হৃদয়, উল্লসিত প্রাণ—কি সে মধুর দিন! উদ্যানের মাঝে ছুটাছুটি খেলা, সঙ্গীদের প্রাণভরা ভালবাসা, সে কি সুখ! তার পর কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে নূতন আলোকের উন্মেষ! নিরালা কাননে পার্শ্বে ছিল তরুণী সঙ্গিনী!

সুদীর্ঘ টানা চক্ষু, কেশের রাশি, গৌর তনু, রক্তাভ অধর—অপূর্ব্বরূপিণী চতুর্দ্দশী পেপা! বাগানে আমরা একত্রে কত খেলা করিয়াছি! কত হাসি, কত গল্প!

কলহেরো অন্ত ছিল না! তার প্রকৃতিটি ছিল শান্ত মধুর! পাখীর বাসা চুরি করিয়া হৃষ্টমনে ধীরে ধীরে যখন আমি গাছ হইতে নামিতাম তার ম্লান চোখ দেখিয়া আমি জ্বলিয়া যাইতাম। সে দিন সে মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, "কেন তুমি বাসা চুরি কর—আহা, ছোট ছানাগুলি—বড় নিষ্ঠুর তুমি!" এত বড় একটা বীরত্বের কাজ সারিয়া আসিতেছি কোথায় সে উৎসাহ দিবে, না, তিরস্কার! পাখীর বাসা ছুড়িয়া তাহাকে আঘাত করিলাম! গৃহে ফিরিলে যখন তার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এখানে কি কি হয়েছে রে?" সে অমনি অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, "পড়ে গেছলুম, মা!"

তার পর কতদিন আমার স্কন্ধে ভর দিয়া নদী তীরে সে বেড়াইয়াছে! কখনো ধীর, কখনো-বা দ্রুত গতি! তীরে দাঁড়াইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম—সন্ধ্যা নামিয়া আসিত—চারিদিক ধীরে ধীরে আঁধারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত—মৃদু সঙ্গীতের মত নদীর জল তটের কূলে আছাড়িয়া পড়িত—আমাদের কণ্ঠস্বরও মৃদু হইত! কত গল্প করিতাম—কত রাজকন্যার কথা, ব্যর্থ প্রণয়ের কত করুণ কাহিনী! মাঝে মাঝে কেমন সঙ্কোচে-সরমে সে মুখ নত করিত!

পেপার হাতের রুমাল পড়িয়া গেল—আমি তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া তাহার হাতে দিলাম—স্পর্শে হাত কাঁপিয়া উঠিল!

সে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা! বাগানের কোণে বাদাম গাছের তলায় আমরা বসিয়াছিলাম।

সহসা পেপা কহিল, "এস খানিক ছুটি!" সূক্ষ্ম তনুটি লইয়া সে ছুটিয়া চলিল—বোল্‌তার মত লঘু তার সে গতিটুকু! কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে গলার সুন্দর রঙ ফুটিয়া উঠিতেছিল—যেন তামাটে মেঘে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছিল!

একটা কূপের পার্শ্বে সে বসিয়া পড়িল—ললাটে স্বেদের বিন্দু মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম—সে হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া

যাইতেছিল—কৃষ্ণ পক্ষ্মের তলে চক্ষু দুটি যেন শ্বেতপদ্মের মত! আমি তাহারি প্রতি চাহিয়াছিলাম।

পেপা বলিল, "একটু পড়ি এস! এখনো ত আলো রয়েছে; বই নেই তোমার কাছে?"

পকেটে একখানি ভ্রমণকাহিনী ছিল—তাহার পৃষ্ঠা খুলিলাম। আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল—আমার পূর্ব্বেই তার পাঠ শেষ হইতেছিল—তার বুদ্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ!

পাঠ শেষ করিয়া আমার পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পড়া হয়েছে?" আমি তখন সবেমাত্র পড়া সুরু করিয়াছি!

আমাদের উভয়ের কেশাগ্র পরস্পর স্পর্শ করিল, তার নিশ্বাস বায়ু আমার গালে লাগিল, তার পর উভয়ের ওষ্ঠও মিলিল! আবার যখন বই খুলিলাম, তখন মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গৃহে ফিরিয়া সে ডাকিল, "মা, মা, আজ আমরা খুব ছুটেছি!" আমার মুখে কথা বাধিয়া গেল!

তিনি বলিলেন, "তুই যে কিছু বলছিস না রে? তোর মুখ যে শুখিয়ে গেছে—মনে দুঃখ হয়েছে নাকি কিছু?"

দুঃখ! আনন্দে আমার হৃদয়ের দুই কূল যে ছাপিয়া গিয়াছে! সেই স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যার কথা, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি ভুলিতে পারিব না যে!

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত—? হায়, তার আর বিলম্বই বা কি?

৩১

কয়টা বাজিয়াছে জানি না! কিসের একটা মিশ্র শব্দ ভ্রমর-গুঞ্জরের মত কাণে আসিতেছে! বুঝি আমারি শেষ চিন্তাগুলা মাথার মধ্যে এক বিরাট কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে!

আমার অপরাধের কথা ভাবিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এ অনুতাপ আর কতটুকু সময়ের জন্যই বা!

দণ্ডের পূর্ব্বে অনুতাপের বোঝা যে বুকে চাপিয়াছিল, এখন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কিছুর জন্য ত আমার হৃদয়ে স্থান নাই! অতীতের কথা ভাবিতে গেলেও—ফাঁসির রজ্জুর কথাটা যে ভুলিতে পারি না! মধুর শৈশব, গৌরবোজ্জ্বল কৈশোর, আজ এমনি রক্ত মাখিয়া সে অবসিত হইবে! অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে একটা রক্ত-নদীর ব্যবধান! যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার এ জীবনের কাহিনী পাঠ করেন ত ঘৃণায় বিভীষিকায় কতখানি তিনি শিহরিয়া উঠিবেন! এ কি বিশ্বাসের যোগ্য কথা! কি রক্তপিপাসী আইন! হা নিষ্ঠুর মানুষ—আমি কি এমনি মন্দ? না, কখনো না!

আর কয় ঘণ্টা পরেই সকল চিন্তা সকল ভাবনার সুগভীর সমাপ্তি! অথচ সে আজ কত দিনই বা, যখন শুদ্ধ স্বাধীন চিত্তে নদীর তীরে, বৃক্ষের তলে, পত্র-মর্ম্মর পথে স্বচ্ছন্দ গতিতে বেড়াইয়া আমার দিন কাটিত!

৩২

আমার এ রুদ্ধ ঘরেরই অনতিদূরে সুখের গৃহগুলি তরুণতরুণীর সুখগুঞ্জন, ও শিশুর কলোচ্ছ্বাসের বিহ্বল রাগিণীর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ—আশা-নিরাশার ও সুখ-দুঃখের ভার লইয়া অসংখ্য নরনারী পথে চলিয়াছে!

বালকের দল হাঁকিয়া সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে! জীবনের কি বিরাট স্ফূর্ত্তি চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে, আর আমি?—কিন্তু আর কেন সে চিন্তা!

পুরানো এক দিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমি বালকমাত্র! নোতরদমের ঘণ্টা দেখিতে আসিয়াছিলাম। অন্ধকারে আঁকা-বাঁকা বিস্তর সোপান অতিক্রম করিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল—উপরে উঠিয়া দেখি সারা পারি সহর যেন আমার চরণতলে বিচিত্র গালিচার মত বিছানো রহিয়াছে!

তারপর ঘণ্টা দেখিলাম! কি সে প্রকাণ্ড ঘণ্টা! কিন্তু আমি পারি সহর দেখিতেছিলাম—নোতরদমের গগনস্পর্শী ভবনশির হইতে নিম্নে পথের লোকগুলাকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল! এমন সময় সহসা আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া ভীমরোলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—বজ্রের মত ভীষণ সে নিনাদ! চূড়া কাঁপিয়া উঠিল! আমার পা কাঁপিয়া গেল আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম—স্তব্ধ নির্ব্বাক পাষাণের মত আমি বসিয়াছিলাম! ঘণ্টাধ্বনি থামিয়া গেলেও তার প্রতিধ্বনি অসংখ্য ভ্রমণগুঞ্জণের মত কাণে আসিয়া লাগিতেছিল!

আজো আমার তেমনই মনে হইতেছে! ঘণ্টাধ্বনি নাই, তবু যেন চারিধারের কোলাহল একটা অস্পষ্ট শব্দের ঝঙ্কারে শ্রুতিটাকে ভরাইয়া তুলিয়াছে—আমার ললাটের শিরগুলাও দপ দপ করিতেছে! ছায়ার মত অস্পষ্ট যেন আমি দেখিতেছি—আমারি চারিদিকে অসংখ্য নরনারী হর্ষকোলাহলে মাতিয়া চলাফেরা করিতেছে, তাদের উল্লাসের চীৎকার না ঐ শুনা যায়! আর আমি নিস্পন্দ জড়ের মত বসিয়া রহিয়াছি—কোথায় শান্তি—কোথায় আরাম!

৩৪

ভিলা হোটেলের সূক্ষ্ম চূড়ার গায়ে স্থাপিত বিচিত্র ঘড়িটা যে ঐ দেখা যায়! প্লে দী গ্রীভের পরুষ কঠিন প্রাচীরের দিকেই ঘড়িটা যেন চাহিয়া রহিয়াছে! কতকালের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীর—রং কালো, এমন কালো যে দীপ্ত সূর্য্য কিরণেও তার সে কৃষ্ণাভা দূর হয় না!

যেদিন কাহারো জীবন ফাঁসির রজ্জু ধরিয়া অজানা লোকের ভীমান্ধকারে ঝুলিয়া পড়ে সেদিন প্লে দী গ্রীভের সকল দ্বারগুলার সম্মুখে অসংখ্য প্রহরীর চক্ষু যেন কি এক কৌতূহলের দৃষ্টি লইয়া জাগিয়া উঠে; হতভাগ্য মরণপথের যাত্রী সে ব্যগ্র দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য! লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে আপনার জীবনের সকল কাহিনী শেষ করিয়া দেয়, আর সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে দীপ্ত চন্দ্রের মত হোটেলের ঐ জ্বলন্ত ঘড়ি ফুটিয়া উঠে!

৩৫

একটা বাজিয়া পনেরো মিনিট হইয়াছে!

আমার এখন অবস্থাটা! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা! যেন কে মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে! যখনি বসি, কিম্বা উঠিয়া দাঁড়াই, মনে হয় মাথার মধ্যে কিসের একটা রুদ্ধ স্রোত যেন আমার মাথার খুলি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

কেমন একটা আতঙ্কে সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। অঙ্গুলি হইতে লেখনী খসিয়া

পড়িতেছে—হাতে যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লাগিয়াছে!

দুই চোখের কোণ জলে ভরিয়া গিয়াছে, যেন আমি ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি! বাহুমূলে কি একটা বেদনা! কিন্তু আর পৌনে তিন ঘণ্টা মাত্র! তাহার পর আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে—আঃ, চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিব! সে কি তীব্র অসহ্য সুখ!

৩৬

কেহ বলেন, যন্ত্রণা—সে-ত কিছুই নহে—বিজ্ঞানের এমনি অপূর্ব্ব কৌশল যে মৃত্যুর পথে যন্ত্রণা আমার মোটেই হইবে না! যন্ত্রণা কিছু নয়?

এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া আমি যে বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছি—ইহাপেক্ষা মৃত্যুযন্ত্রণা কি এমনি ভীষণ? এই যে প্রতিমুহূর্ত্তটি এমন ধীরগতিতে চলিয়াছে—আমার মনে হইতেছে সে কি দ্রুত! বেদনার অসংখ্য সোপান বহিয়া মৃত্যুলোকে চলিয়াছি! কি অসহ্য এ যন্ত্রণা!

তবু, ইহা কিছুই নয়?

প্রতি শিরা হইতে যেন রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে! বুকের উপর কে যেন পাষাণ ভার চাপিয়া ধরিয়াছে—শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে!

কি এ যন্ত্রণা! বুঝিবে কে, বুঝাইবে বা কে? ফাঁসির পরমুহূর্ত্তে, দ্বিখণ্ডিত নরশির যদি একবার আসিয়া এ বেদনাটা বুঝাইতে পারিত তবে আর যাহাই বলুক বিজ্ঞানের কৌশলের তারিফ্ সে নিশ্চয়ই দিত না—কখনো না!

চক্ষের পলক পড়িবারো অবকাশ মিলিবে না। এখনি সব সমাধা হইবে! এই যে অসংখ্য কৌতূহলী দর্শক, এই যে অগণ্য রাজপুরুষের দল,—ইঁহারা এ যন্ত্রণার মাত্রা কি বুঝিবেন! ভীষণ রজ্জু এখনি একটি নিমেষে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে—সমস্ত শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে দেহের রক্ত স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া যাইবে! সমুদ্রের গতি রুদ্ধ হইলে রোষে সে যেমন ফুলিয়া উঠে,—তেমনি বাধা পাইয়া সমস্ত ভিতরটা ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য যে বিরাট দ্বন্দ্ব বাধাইবে, হা রে হতভাগ্য, তাহারি নিষ্ঠুর ভীষণ চাপে সব শেষ! ভিতরে বাহিরে প্রবল সংঘর্ষ—সে কি ভয়ঙ্কর! ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সূর্য্য ও সৌরজগত।

সূর্য্যদেবকে আমাদের আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে এ পৃথিবীতে কিরূপ অভিনব ঘটনা সম্ভব, এই বিষয় লইয়া বিলাতের টাইমস্ (Times) পত্রিকায় একটি মনোহর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—

"একবার এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে তাঁহার মতে গত শতাব্দীর কোন্ আবিষ্ক্রিয়াটিকে মানব-সমাজের পক্ষে যুগান্তরকারী বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি উত্তর করিলেন, "সাধারণ দোকানে যে একপ্রকার খেলেনা বিক্রয় হয়, যাহার মধ্যে দুইটি ছোট ছোট চাকা সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে আপনি ঘুরিতে থাকে, সেইটিই তাঁহার মতে অতীত যুগের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্ক্রিয়া।"

বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক নফেনেড়ে

(Fessenden) বায়ুর বেগ ও সূর্য্যতাপের শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিও যে আমরা ইহাদিগকে লইয়া খেলা করা ভিন্ন অন্য কিছু আবশ্যকীয় ব্যবহারে ইহাদিগকে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি এরূপ কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে নিতান্তই কল্পনা মাত্র তাহাও নহে।

যদি কোনদিন আমরা সূর্য্যতাপের শক্তিকে আমাদের নিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অবস্থারও যে বিশেষ উন্নতি ঘটিবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ একটু বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছিলেন যে সূর্য্যতাপ প্রয়োগ করিবার পক্ষে ইংলণ্ড বেশ উপযুক্ত স্থান নহে। তবে সেই সঙ্গে সান্ত্বনা স্বরূপ ইহাও বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের বায়ুর বেগ সাধারণত বেশ প্রবল। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাত্রেই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম। উত্তরের এই তুষারাচ্ছন্ন দেশে সূর্য্যরশ্মি যেরূপ চঞ্চল অস্থায়ী, তাহাতে এদেশে সূর্য্য শক্তির অধিক ব্যবহার সম্ভব নহে সত্য।

এ বিষয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বড়ই সুবিধা। এ সকল দেশে সূর্য্য হইতে উদ্ভূত শক্তিকে সঞ্চিত ও নিযুক্ত করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা। প্রথমে হয় ত মনে হইবে এরূপ আবিষ্ক্রিয়া যদি কোনও দিন সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে পরিণামে সভ্য জগতের সমস্ত প্রাধান্যই নষ্ট হইবে! যে সকল দেশে স্বাভাবিক সম্পদ অধিক, স্বাভাবিক উর্ব্বরতা অসাধারণ, পরিশ্রম করিবার জন্য অগণ্য লোক অল্পমূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে শক্তিলাভ করা যায়, সে সকল দেশের নিকট কালে উত্তরের সভ্য জাতিদিগের পরাজয় অনিবার্য্য। কিন্তু অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেনের স্বপ্ন সত্য হইলেও পৃথিবীর রাজনৈতিক ও আর্থিক কেন্দ্রস্থল কি কোন কালেও উষ্ণ কটিমণ্ডলে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব?

আমাদের ত তাহা মনে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রাধান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা কোনও দিনই নির্দ্দিষ্ট হইবার নহে, মানবসমাজের চরিত্র ও গুণই উচ্চ নীচ স্থান স্থির করিবে। সূর্য্যশক্তি ব্যবহারের অপেক্ষা মানব শক্তি ও উৎসাহের সাধনাই ভবিষ্যতে পার্থিক উন্নতির প্রধান নিয়ন্তা হইবে।

দেশের জলবায়ুই মানবের গতিশক্তির প্রধান নিরূপক। আমরা চিরদিনই দেখিতেছি যে শীতপ্রধান দেশের জলবায়ুর সহিত যাহাদিগকে অবিরাম সংগ্রাম করিতে হয়, তাহারা স্বভাবতঃ এরূপ সবল, সতেজ ও কঠিন হয় যে মানবের ইতিহাসে তাহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্র জলবায়ুর প্রবলতর ও সজীবতর শক্তিকে পরিবর্ত্তিত করিতে কোনদিনই পারে নাই। হিমপ্রধান দেশের দুর্জ্জয় প্রকৃতির সহিত যাহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, কোন নূতন আবিষ্ক্রিয়াই তাহাদের অন্তর্জাত শক্তিকে নষ্ট করা সম্ভব নহে। কঠোর প্রকৃতির মধ্যে লালিত হইলে যে শ্রেষ্ঠ অন্তর্শক্তি জাগিয়া উঠে, নগরের বিলাসবহুল জীবন তাহা আজিও নষ্ট করিতে পারে নাই এবং আরও দুই চারিশত বৎসরেও যে পারিবে এরূপ মনে হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে সভ্যতার অভিব্যক্তি গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল। এ কথাটা সম্ভবতঃ সত্য, কিন্তু সভ্যতার আদি জন্মভূমি যে ঠিক কোথায় তাহা আজিও স্থির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া অনেক প্রোথিত নগর আবিষ্কার করিতেছেন সত্য, কিন্তু সভ্যতার প্রথম প্রভাত যে কোন্ দেশবিশেষে হইয়াছিল, আজিও তাঁহারা তাহা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা আমাদিগকে প্রাচীন নানা জাতির কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আজও সেই সকল জাতির উৎপত্তির এমন কোনও যুক্তি-সঙ্গত নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই যাহা দ্বারা আমরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের আভাষ পাইতে পারি। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীনতম সভ্যজাতিরা পার্শ্ববর্ত্তী বা উত্তর দিকেই অগ্রসর হইয়াছিলেন, দক্ষিণে অগ্রসর হইতে বড় একটা দেখা যায়

না। ভারতবাসীর ন্যায় যাঁহারা দক্ষিণে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলবায়ুর প্রভাবে অবিলম্বেই কোমল প্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ সভ্যতার দৃষ্টান্ত দেখা যায় তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই জন্ম হইতেই একটা আশু ও অকাল অধঃপতনের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতেরাই কেবল প্রবল শৌর্য্য বীর্য্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কারণ বালুময় মরুর মধ্যে জীবনধারণ করিতে তাহাদের যে নিত্য সংগ্রামের আবশ্যক হইত, তাহা অনেকটা উত্তর দেশের কঠোর অবস্থার অনুরূপ। এই কারণেই আরবগণ প্রবলতেজে চতুর্দ্দিক মথিত করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের উত্থানের অব্যবহিত পরেই উত্তর দেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। যে সকল বিজয়ী জাতির কীর্ত্তিকলাপ পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া আছে, তাহাদের অধিকাংশই জনহীন শস্যহীন কঠোর পার্ব্বত্য ভূমি হইতে উত্থিত, প্রকৃতির ভীষণ লীলার মধ্যেই তাহাদের চরিত্র গঠিত ও পুষ্ট; যে সকল অবস্থার মধ্যে মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, কর্ম্মক্ষম হয় ও শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, ঠিক সেই সকল অবস্থার মধ্যেই তাহারা পালিত। আর অন্তহীন সূর্য্যকিরণ মনুষ্যকে অধঃপতনের পথেই অগ্রসর করিয়াছে। মানব সমাজ চিরদিন এই একই নিয়মে চলিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেনের শৌর শক্তিভাণ্ডার একটা সম্ভব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইয়ুরোপবাসীর ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।

এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে শীতপ্রধান দেশের জাতিগণ হইতে অসংখ্য ব্যক্তি নূতন জলবায়ুর দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু আজিও তাহাদের যথার্থ কোনও অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে ইয়ুরোপ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক নূতন নূতন মহাদেশে যাইয়া বাস করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী প্রায় সকলেই প্রাচীন পৃথিবীর উত্তর দেশ সমূহ হইতে আগত। আমরা এখানে থাকিয়া অনেকেই মনে করি যে যাহারা সমুদ্রপারে দেশান্তরে গিয়াছে তাহাদের চরিত্রে আর কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। অনেক সময়ে আমাদের মনে হয় যেন তাহাদের চরিত্রে আমরা নূতন গুণের পরিচয় পাই, কিন্তু অন্তরে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে, চরিত্রগত তাহারা আমাদের অনুরূপই আছে। মোটের উপর এ কথা আজিও সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরদিন এরূপ থাকিবে না বলিয়াই বোধ হয়। মানবসমাজের অভিব্যক্তির পক্ষে তিনশত বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও হইতে পারে। আমাদের এ অভিব্যক্তি যে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। পৃথিবীর আদিকালের মানুষের ভঙ্গুর অস্থি এতদিনে লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু পর্ব্বত পাষাণে এখনও তাহাদের অস্তিত্বের ক্ষীণ স্মৃতি জাগিয়া আছে।

যে সকল জাতি আজ নব নব দেশে যাইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের বাহ্যিক জাতিগত গর্ব্ব, স্বদেশপ্রেম বা রাজনৈতিক ভাবের অন্তরালে যে যথার্থ জাতীয় চরিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিরদিন একই ভাবে থাকিবে কি না, তাহা আজ বলিতে যাওয়া দূরদৃষ্টির প্রতি কিছু অযথা অত্যাচার করা হইয়া পড়ে। এক থাকিবে বলিয়া ত মনে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া এখন হইতে ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের ভয় দেখাইলে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। এই যেমন অষ্ট্রেলিয়ায় যাইয়া যে ইংরাজ জাতির চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে এখন এ কথা বলাটা আমরা নিতান্ত অন্যায় বলিয়াই মনে করি। পাঁচশত বৎসর পরে অবশ্য সে কথার আলোচনা করা সঙ্গত হইবে। আসল কথা এই যে প্রেম দয়া আশা সাহস ইত্যাদি আমাদের যে প্রকৃতিগত প্রধান গুণ আছে তাহা কোন দেশে বা কোন কালেই নষ্ট হইবার নহে।"

অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেনের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রবন্ধকার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপকের প্রস্তাবটা যে কি তাহা এখনও ভাল করিয়া বলা হয় নাই। বায়ু ও সূর্য্য হইতে শক্তি গ্রহণ

করিয়া তাহাকে আমাদের কর্ম্মে নিযুক্ত করাই যে অধ্যাপকের আলোচ্য বিষয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সম্বন্ধে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞান সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা হইতে মনে হয় যে এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া আমরা তাহা বাণিজ্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারি। তবে প্রথমেই একটা মহা বাধা এই যে সূর্য্যতাপের পরিমাণ সকল স্থানে সমান নয়। অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলেন যে ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বর্গ ফুটের উপর প্রায় ১৫০ পাউণ্ড ভারের তুল্য, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার এ হিসাব বোধহয় আসলের অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত হইবে। অপর কোনও অধ্যাপকের মতে ইহা ৬৩-৪২ পাউণ্ড, আবার অপর একজনের মতে ইহা ৯১-৩৫।

অধ্যাপক ভেরি (Very) যে হিসাব করিয়াছেন তাহা হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে সংগ্রহযোগ্য সূর্য্যশক্তি দেশকাল ও অবস্থা ভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এরূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে যে ব্যয় হইবে বলিয়া অধ্যাপক ফেসেন্‌ডেন্ বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এখন কোনও মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব, কারণ আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির বিষয় তিনি এখনও সাধারণের নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

এই সকল শক্তিভাণ্ডারে সুবিধামত বায়ু চালিত কল থাকিবে, তাহার শক্তিও ইহার সহিত যুক্ত হইবে। অধ্যাপক বলেন, যে সকল স্থানে জলের শক্তি সংগ্রহ করিবার সুবিধা নাই, সেই সকল স্থানে সূর্য্য বা বায়ুর শক্তি অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। দিন দিন খণিজ পদার্থের যত অভাব ঘটিবে, তাহার পূরণার্থে এইরূপ কোনও একটা উপায় অবলম্বন করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই। সূর্য্য ও বায়ু এতদিন আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা রাবণের যেরূপ আজ্ঞাপালন করিয়া চলিত একদিন যে আমাদেরও সেইরূপ আজ্ঞাবাহী হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

বিবিধ।

পৃথিবীর বয়স।

বহুকাল হইতেই দুই বৈজ্ঞানিক দলের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন পৃথিবীর জন্ম ৩০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানবিদগণের মতে ২ বা ৩ কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রথম জন্ম হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক ক্লার্ক ও বেকার সাহেব সম্প্রতি গণনা করিয়া বলিয়াছেন,—বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়স ৭ কোটি বৎসরের অধিক নহে এবং ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসরের কম নহে। আধুনিক কালের যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা নূতন বয়স স্থির করিয়াছেন; কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। লর্ড কেলভিন (Lord kelvin) ১৮৬২ সালে গণনা করিয়া বলেন ২ কোটি হইতে ৪০ কোটির মধ্যে, সম্ভবতঃ ৯ কোটি ৮০ লক্ষ বৎসর। ১৮০৩ সালে কিং ও বেরাস (Clarence King and Carl Baras) বলেন ২ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। ১৮৯৭ সালে পুনরায় গণনা করিয়া লর্ড কেলভিন বলেন ২ কোটি হইতে ৪ কোটির মধ্যে। ১৮৯০ সালে লাপেরাণ্ট (De Lapperant) বলেন ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে ৯ কোটির মধ্যে। ১৮৯৩ সালে ওয়ালকট (Charles D. Walcott) বলেন ৭ কোটির অধিক হইবে না। ১৮৯৯ সালে জোলি (J. Joly) বলেন পৃথিবীর

করিয়াছিল ইহারা তাহাদেরই কতকগুলির বংশধর। ইহাদের বাসস্থানের দূরত্ব এবং আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব হইতেই তীরবর্ত্তী স্থানের হাটে বাজারে নানারূপ অতি রঞ্জিত কাহিনীর প্রচার হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।

এখনকার পৃথিবী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিতে হইবে। প্যারাগুয়ে হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত দেশ আবিষ্কারকের কর্ম্মও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিষিদ্ধ নগরের মধ্যে কতলোক প্রবেশ করিয়াছে! গুপ্ত নগর এখন কেবল উপন্যাস লেখকের কল্পনা রাজ্যেই অধিষ্ঠান করিতেছে। এ কালে আর প্রচ্ছন্ন শ্বেতকায় জাতির অজ্ঞাতবাসের স্থান নাই।

আফ্রিকার মধ্যস্থল দিয়া এখন রেলের এঞ্জিন ছুটিতেছে। আফ্রিকার মধ্যস্থলে এক অভিনব গৌরজাতি বাস করে বলিলে এখন আর কেহ সহজে বিশ্বাস করিবে না। হ্যাগার্ড সাহেব তাঁহার উপন্যাসে যে জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা সম্ভবতঃ বাহিমা জাতি। অনেকে বলেন যে এই জাতি দেখিয়াই আফ্রিকাতে শ্বেতকায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি উঠিয়াছে। তাহাদের বর্ণ বেশ গৌর এবং তাহারা দেশের সাধারণ লোকের সহিত মেশে না। সত্যের সম্মুখে কল্পনা নিতান্তই সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

রেডিয়াম রহস্য।

রেডিয়াম এতদিনে ধাতুর আকারে পরিণত হইল। বর্ত্তমান যুগে যতগুলি অভিনব আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ম্যাডাম কুরিই যে সর্ব্ব প্রথমে এই নূতন ধাতু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা আরও আনন্দের বিষয়। তিনি ও তাঁহার স্বর্গগত স্বামী উভয়েই এই ধাতুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহুদিন হইতে অনুমান করিতেছিলেন, এবং এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধাতু আবিষ্কার করিবার জন্য নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে তাঁহারা উভয়েই পিচব্লেণ্ড (Pitchblend) নামে পদার্থের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই পদার্থ লক্ষ লক্ষ মণ প্রস্তরের মধ্যে বালুকণার ন্যায় সামান্য অংশে পাওয়া যায় মাত্র। অসাধারণ অধ্যবসায় ও কৌশলের ফলে ইঁহারা বহুবৎসরের সাধনায় সামান্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এতদিনে সেই সাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইল। কিন্তু পতিহীনা ম্যাডাম কুরি এখন একাকিনীই উভয়ের চেষ্টার সার্থকতায় আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন।

বহুকালের বিপরীত ধারণা সত্ত্বেও বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এমন সকল সত্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তাহা দ্বারা অনেকেরই মনে ক্রমে একটা বিশ্বাস জন্মিতেছিল যে, বায়ুর অপেক্ষা লঘু ও জটিল কোন অমিশ্র পদার্থ থাকা সম্ভব এবং হয়ত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ হইতে বায়ুস্থিত অম্লজান পর্য্যন্ত সেই একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন। এক ধাতু হইতে যে অপর এক ধাতু উৎপন্ন করা সম্ভব তাহা রসায়ন নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া এতদিন বিজ্ঞানবিদেরা হাসিয়া উড়াইতেন, কিন্তু এখন আবার তাহা সম্ভব বলিয়া অনেকের মনে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ হইল। প্রথমে যখন আবিষ্কৃত হইল যে কয়েকটি ধাতু এমন রশ্মি বিকীর্ণ করে যে তাহারা সাধারণ একটি শুষ্ক ফটোগ্রাফের প্লেটে নিজেদের চিহ্ন রাখিয়া দেয়, তখন হইতেই এ বিশ্বাসের উৎপত্তি। যে কেহ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। একখানি শুষ্ক প্লেটের উপর অনেক ভাঁজ কাগজ জড়াইয়া তাহার উপরে একখণ্ড সাধারণ দস্তা রাখিয়া দিন। দুই এক মাসের মধ্যেই প্লেটের উপরে সেই দস্তা খণ্ডের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া সম্ভব; সকল ক্ষেত্রেই যে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা নহে। দস্তাটি যদি প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় হয়, তাহা হইলে প্লেটে

আর কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। ইয়ুরেনিয়াম (uranium) যে শুষ্ক প্লেটকে নষ্ট করে এ অপবাদ তাহার বহুকাল হইতেই ছিল। ইয়ুরেনিয়াম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার ধাতুগুলির মধ্যে একটি।

ম্যাডাম কুরির এই যুগান্তরকারী আবিষ্ক্রিয়ার পর ইহা বলা সহজ যে সেই গুরুভার ধাতু ইয়ুরেনিয়াম নিশ্চয়ই নিজেকে কোন সরলতর পদার্থে চূর্ণ করিয়া, তাহার লঘু অণুগুলিকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলে, এবং এই উপায়ে যাহাতে পেষিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান ঘনত্বে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ পরিত্যাগ করে। কিন্তু রাসায়নিক তুলাদণ্ডে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহ তে মনে হয় যে এই ভাবে নিজেকে চূর্ণ করিয়া কাগজ ভেদ করিয়া ইয়ুরেনিয়াম যে ফটোগ্রাফের প্লেটকে নষ্ট করে, তাহাতে ইহার ভার বা শক্তি কিছুই কমে না। সুতরাং খনিজ ধাতুর মধ্যে যে এমন কোন বৈজ্ঞানিক জগতের বস্তু বা ধাতু লুক্কায়িত ছিল যাহা বহুদিনের যত্নশ্রমে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না ইহাও দেখা গিয়াছিল যে ইয়ুরেনিয়াম মিশ্রিত পদার্থই সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। সেই জন্যই যে খনিজ পদার্থ হইতে ইয়ুরেনিয়ম প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যেই কুরী দম্পতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সেই খনিজ পদার্থ পিচব্লেণ্ড।

প্লেটের উপরে কালিমা চিহ্ন পড়া ভিন্ন অন্য কারণেও পিচব্লেণ্ডের উপরই ইঁহাদের প্রথম দৃষ্টি পড়ে। তাড়িৎ পূর্ণ একটি তাড়িৎ পরিচালক দণ্ড এই খনিজ পদার্থের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারে তাড়িৎ শূন্য হইয়া যায়। ইহার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে এতৎ সংঘর্ষে তাড়িৎ পরিচালক দণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু কোন না কোন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া নিজের স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব ত্যাগ বলিয়া পরিচালকত্ব লাভ করে। এই দুই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কুরি দম্পতি তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। রেডিয়ামের অন্বেষণ যে সময়ে আরম্ভ হয় ঠিক সেই সময়েই ক্যাথোড্ (cathode) তাড়িৎরশ্মি, এক্স তাড়িৎরশ্মি (Xrays) এবং অন্যান্য বহু প্রকারের অদৃশ অংশুবিকিরণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃই বিজ্ঞানবিদগণের মনে হইল যে সেই অজ্ঞাত ধাতুর অন্তর্নিহিত পদার্থ হইতেই এক্স তাড়িৎরশ্মি বিকীর্ণ হয়।

কুরি দম্পতি তাঁহাদের পরীক্ষার প্রথমেই দেখিলেন যে কারখানার যে সকল অব্যবহার্য্য বস্তু ফেলিয়া দেওয়া হয় সেগুলি তাঁহারা যে ইয়ুরেনিয়াম প্রস্তুত করিতেছিলেন তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও অংশুবিকিরণকারী (radio active)। সুতরাং ম্যাডাম কুরি সেই সকল অব্যবহার্য্য বস্তু লইয়াই তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

এস্থলে একটা কথা বলিবার বিষয়। আজও পর্য্যন্ত যত রেডিয়াম প্রসবকারী পিচব্লেণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অষ্ট্রিয়া দেশে পাওয়া গিয়াছে। ইয়ুরেনিয়ামের চতুর্দ্দিকে যে আবর্জ্জনাস্তূপ পড়িয়া আছে, তাহাই এ পৃথিবীর রেডিয়াম উৎপাদনের প্রধান উপাদান। অষ্ট্রিয়ার গবর্মেণ্ট এ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। ম্যাডামকুরির রেডিয়াম আবিষ্ক্রিয়ার কথা যেমন প্রচারিত হইল অমনি অষ্ট্রিয়া হইতে পিচব্লেণ্ড বা ইয়ুরেনিয়াম কারখানার আবর্জ্জনার রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইল। কাজেই রেডিয়ামের উৎপাদন শক্তি অষ্ট্রিয়া একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন বলিলেও হয়। তাহার পরে রেডিয়ামের উপযুক্ত খনিজ পদার্থ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এবং ইংলণ্ডের তিন চারিটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আজিও অষ্ট্রিয়াই এ বিষয়ে অগ্রগণ্য।

এই রেডিয়ামের অনুসন্ধান করিতে ম্যাডাম কুরির যে কিরূপ একান্ত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা পাঠককে বুঝান অসম্ভব। সহস্র সহস্র মণ প্রস্তরখণ্ড হইতে এক এক চামচ পরিমাণ প্রস্তর লইয়া, ধীরে ধীরে সেগুলিকে তাহাদের অন্তর্নিহিত উপাদানে বিশ্লেষিত করিতে হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে যেগুলির অংশুবিকিরণ শক্তি দেখা গিয়াছে সেগুলিকে একত্রিত করিতে হইয়াছে। প্রথমে যখন এই অসামান্য নারী প্রায় দুই শত মণ প্রস্তর হইতে এমন কয়েক বিন্দু নূতন পদার্থ বাহির করেন যাহা অন্ধকার

খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তখনই ইঁহার কঠোর সাধনার প্রথম পুরস্কার লাভ হয়। এই বিন্দুগুলি অশুদ্ধ রেডিয়াম ব্রোমাইড্। সত্যই যে রেডিয়াম বিন্দুগুলি জ্বলিতেছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের বিকীর্ণ আলোক রশ্মিতে ব্রোরামের (brorum) অংশগুলিকে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। এই রেডিয়াম ব্রোমাইড অধ্যাপক কুরি লণ্ডন নগরের রয়েল ইনষ্টিটিউটে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদগণকে দেখাইবার জন্য আনিয়াছিলেন। এই বহুমূল্য দ্রব্যের মোড়কটি তিনি তাঁহার ওয়েষ্ট কোটের পকেটে করিয়া ইংলণ্ডে আনেন এবং সেই ভাবেই পুনরায় প্যারিস নগরে লইয়া যান। কয়েক দিন পরে তিনি ঠিক সেই পকেটের নীচে গায়ে একটি দাগ দেখিতে পাইলেন। এই দাগটি ক্রমে সাংঘাতিক ঘায়ে দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতেই পৃথিবী জানিল যে রেডিয়াম অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকিলে এমন তেজ বিকীর্ণ করে যে অসাবধান হইলে তাহা আমাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিতে পারে।

এই নূতন সরল পদার্থ রেডিয়ামের ব্যবহারের কথা অনেকে অনেক রকম বলিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃই তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করে। ধীরে ধীরে ইহা যখন অন্য কোন পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা প্রভূত পরিমাণে শক্তি ত্যাগ করিতে থাকে। সেই জন্য অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে ইহা আমাদের এঞ্জিন চালাইবে ও অন্যান্য নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য করিবে। পরে যখন অধিক পরিমাণে রেডিয়াম প্রস্তুত হইতে লাগিল তখন চিকিৎসকেরা এই পদার্থের সাহায্যে নানা প্রকার দুরারোগ্য চর্ম্মরোগের চিকিৎসা করিলেন এবং ক্যান্সার রোগীর যন্ত্রণা উপশমের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ম্যাডাম কুরি ইহাকে ধাতুতে পরিণত করিয়া রেডিয়াম সম্বন্ধে চরম সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাড়িতের সাহায্যে তিনি ব্রোমাইডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক প্রকার উজ্জ্বল ধাতু বাহির করিয়াছেন। প্রকৃতির রহস্যময় বিধানে ইহা প্রবল বেগে একত্রিত এবং ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া সরলতর পদার্থে পরিণত হইতেছে এবং বাহিরের বায়ু সংস্পর্শে আসিয়া ধীরে ধীরে অবিরামগতিতে এরূপ উত্তাপ বিকিরণ করিতেছে, যে ইহার সংস্পর্শে এক টুকরা কাগজ আনিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে

সৃষ্টির কোন্ আদি অবস্থায় প্রকৃতির প্রবল শক্তির পেষণে এই রেডিয়াম প্রস্তুত হইয়াছিল, আর আজ আমরা এতদিন পরে তাহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় জানিতে পাইলাম। প্রকৃতির রহস্য যেমন নিগূঢ়, মনুষ্য বুদ্ধির চেষ্টাও তেমনি অজেয়!

শ্রীভঃ

পর্ত্তুগালে সাধারণ তন্ত্র।

পর্ত্তুগালের রাজনৈতিক আকাশে অনেকদিন হইতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। শাসন বিশৃঙ্খলায়, পুরোহিত ও ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারে পর্ত্তুগালবাসী অনেকদিন হইতেই পীড়িত হইতেছিল। বর্ত্তমান রাজার পিতাকে কয়েকজন উন্মত্ত প্রজা :পথের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে বোমা মারিয়া হত্যা করে—তাহা আমরা আজিও ভুলি নাই। রাজা মানুয়েল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি প্রজারঞ্জনে প্রতিশ্রুত হইয়া অনেককে আশ্বাস দান করেন। কিন্তু শেষে যখন প্রজারা দেখিল দেশের অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং,' তখন সেনাবিভাগের ও নৌ-বিভাগের কতিপয় অধিনায়ক মিলিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন

এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা লাভের চেষ্টা তাহা নহে। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি করাই

রাজা ম্যানুয়েল ও রাজমাতার ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিবার পরে গৃহীত ফটোগ্রাফ।

বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্য। যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয় আডমিরেল রীস (Reis) সাহেবই এই বিদ্রোহের প্রধান সহায় ও অধিনায়ক। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রাজপক্ষের সহিত সংগ্রামের সমস্ত হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনিই বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মসম্মান বোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে ভ্রান্ত

অভিমানে এরূপ অসঙ্গত কর্ম্ম করিয়া বসিতেন যে অপরের পক্ষে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। রীস সাহেব স্থির করিয়াছিলেন যে অক্টোবরের প্রথম মঙ্গলবারের রাত্রি ১টার সময়ে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবে। স্থির ছিল যে

অ্যাডমিরেল রিস্।

তিনি ১টার কিছু পূর্ব্বে এক নৌকায় করিয়া কতিপয় সহচর সঙ্গে লইয়া বন্দরের 'সান্ রাফেল' নামে রণতরির উপর যাইবেন। পরে তথা হইতে এক দল বিদ্রোহী সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিবেন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের ব্যর্থ করিবার নানাবিধ আয়োজন করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদি কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া অঙ্কুরেই ইহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের এত শীঘ্র এরূপ শোচনীয় পরাজয় হইত না। যাহা হউক বিদ্রোহের নির্দ্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে নৌ-সচিব রণতরি-সমূহে টেলিগ্রাফ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে আক্রমণকারী শত্রুকে পরাজিত করিতে তাঁহারা প্রস্তুত কি না। এই অনুসন্ধান দেখিবামাত্র ষড়যন্ত্রীরা ভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের ভয় হইল, বোধ হয় সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হইয়াছে। আডমিরেল রীস কিন্তু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। বার বার তিনি তাঁহার সহচরদিগকে নৌকাযোগে রণতরীতে যাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতে গবর্মেণ্ট সাবধান হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তখন তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহার সহচরেরা দেখিলেন যে এরূপ স্থলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার ত সম্ভাবনা নাইই, বিপদের সম্ভাবনা ও আশঙ্কাই প্রবল। এই ভাবিয়া শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহারা তাঁহাদের এই কঠোর ব্রতসাধনে পশ্চাৎপদ হইলেন। আর বিলম্ব নাই! নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত! নৌকা অপেক্ষা করিতেছে, রণতরিতে দলবল আত্মদানের জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! এমন সময়ে রাজধানী লিসবনের ষড়যন্ত্রীরা তাহাদের অধিনায়ককে উপেক্ষা করিল, ত্যাগ করিল! এই প্রকারে বিদ্রোহের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এ অবস্থায় পরিণামে ব্যর্থতাই অবশ্যম্ভাবী! আডমিরেল রীস্ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার আত্মসম্মানবোধ অতি প্রবল ছিল। তাঁহার মনে

ধারণা হইল যে তিনিই তাঁহার স্বদেশকে ও বন্ধুবর্গকে বিপদসাগরে ডুবাইলেন, সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত করিলেন। এই সকল অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি উন্মাদের ন্যায় হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কে যে কি করিবে তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না, অনেকেই মনে করিল বিদ্রোহের সকল আশা ব্যর্থ হইল!

কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে অন্যান্য অধিনায়ক আসিয়া উপস্থিত হইল। মেকাডো সাণ্টেস (Machado Santcs) নামে এক নৌ-কর্ম্মচারী এই সময়ে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আডমিরেল রীসের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রবেগে তিনি সৈনিকগণকে, সাধারণ প্রজা ও ছাত্রবৃন্দকে একত্রিত করিয়া বিদ্রোহীদলের সৈন্যরচনা করিলেন। রাজধানীর পথে পথে আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর গঠিত করিলেন। এই প্রতিভাবান পুরুষের প্রবল চেষ্টায় রীসের মৃত্যুর প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বিদ্রোহীর কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সংগ্রামসচিব তখন কোমল শয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছেন। প্রধানসচিব তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে বসিয়া আছেন। রাজধানীর পথে পথে বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিল। রাজপক্ষীয়েরাও সশস্ত্রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। বিদ্রোহীদের অসম সাহস ও আত্মোৎসর্গের সম্মুখে তাঁহারা পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিলেন। রাজা মানুয়েল সেই রাত্রেই রাজপরিবার লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া জিব্রালটারে পলাইলেন। দুই দিনের মধ্যেই একপ্রকার বিনা রক্তপাতে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

যুদ্ধের পরে সাধারণ-তন্ত্রীরা রাজপক্ষীয় সেনাপতি কন্‌সিরোকে (conciro) ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন রাজা যখন সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন তখন তাঁহার রাজপক্ষ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তিনি ঘৃণাভরে তাহাদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। রাজা যে সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এ কথা তাঁহার কোনমতেই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি যে বিদ্রোহদমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন এই কথা স্বয়ং রাজাকে জানাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গেলেন। কিন্তু রাজা কোথায়! ক্ষোভে অন্ধ হইয়া বিদ্রোহীদের নেতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন—"এখন আমি তোমাদের শাসন স্বীকার করিলাম এবং তোমাদের প্রজা হইতে প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু আমি তোমাদের পক্ষ লইয়া অস্ত্রধারণ করিতে অক্ষম। আমি আমার সেনাপতিত্ব আজ হইতে ত্যাগ করিলাম।" এই সেনাপতির অস্ত্রত্যাগেই বিদ্রোহীদল পরিণামে জয়ী হইল।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে অল্পবয়স্ক রাজা মানুয়েল যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহা হইতেও অধিক অকস্মাৎভাবে রাজ্যচ্যুত, সিংহাসনচ্যুত হইলেন। কালের খেলা এমনি দুর্ব্বোধ্য! এক রাত্রির মধ্যে রাজা ভিখারী!

এই প্রসঙ্গে ভারতের সহিত পর্ত্তুগালের সম্বন্ধ বিবরণ কিছু বলিলে বোধ হয় পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

আজ পর্ত্তুগাল ইয়ুরোপে এক প্রকার নগণ্য বলিলেও হয়। কিন্তু একদিন এই পর্ত্তুগালই বাণিজ্যব্যাপারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইয়ুরোপের অগ্রগণ্য ছিল। পর্ত্তুগাল নাবিকগণ প্রাচ্য জগতের যে কত দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ সর্ব্ব প্রথম পর্ত্তুগালই বাহির করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডি গামা যেদিন আফ্রিকার গুডহোপ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কালিকাটে (calicut) পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তরের সূচনা হইল। তাহার পূর্ব্বে ভারত ও প্রাচ্য দেশের সহিত সমুদয় বাণিজ্যই আরবদিগের হস্তগত ছিল। এই বহুমূল্য বাণিজ্য হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকাও সভ্যজগতের সহিত সংযুক্ত হয়। সে সময়ে পর্ত্তুগালের রাজার নাম ছিল এমানুয়েল (Emmanuel)। তাঁহাকে সকলেই সৌভাগ্যবান বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাঁহার প্রজাগণের এই সকল আবিষ্ক্রিয়ার সফলতা যে রাজসাহায্যে বা উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের জলপথ আবিষ্কার করিবার পর ভাস্কো ডি গামা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে পুনরায়—ভারতে আগমন করিয়া তিনি মালাবার তীরে একছত্র বাণিজ্যসত্ব লাভ করেন। ফ্রান্সিস্ (Francis at Almedia) ভারতে প্রথম পর্ত্তুগীজ রাজপ্রতিনিধি। ফ্রান্সিস ভাস্কোর বিজিত রাজ্যে অনেকগুলি কারখানা স্থাপিত করেন এবং সিংহল ও মালডিভ্ দ্বীপপুঞ্জ পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ভারতে পর্ত্তুগীজ শাসন কর্ত্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ ছিলেন আবুকার্ক (Albuquerqu) ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়া নগর অধিকারই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁহার এই যুদ্ধজয়ের ফলে পর্ত্তুগালই পারস্য উপকূল হইতে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাচ্য জগতের বাণিজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা রহিল, এবং প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া পর্ত্তুগালের রাজাই আসিয়ার দক্ষিণ ভাগের সর্ব্বময় অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আবুকার্কই সর্ব্বপ্রথম সুয়েজ পর্য্যন্ত রণপোত লইয়া অগ্রসর হন। এই বাণিজ্য পথটি তাঁহাদের জাতীয় সম্পত্তি করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সেকালে পারস্য উপসাগরে আর্ম্মাজ নগর একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। আবু অনেক কষ্টে তাহা অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি ও শক্তি দেখিয়া রাজদরবারে তাঁহার অনেকগুলি শত্রু জুটিয়াছিল। অরমাজ অধিকার করিয়া ফিরিতেছেন, এরূপ সময়ে গোয়া বন্দরের মুখে একখানি জাহাজ তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির আদেশপত্র দান করিল। তিনি দেখিলেন তাঁহার একজন চিরশত্রু তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না, তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল না, পথেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার রাজাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার

শত্রুদিগের রটনা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিয়া যান এবং তাঁহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য পুরস্কারাদি তাঁহার পুত্রকে দিতে অনুরোধ করেন। পত্র পাইয়া রাজার জ্ঞান হইল, কিন্তু তখন আর আবুকে ফিরিয়া পাইবার কোনও উপায় নাই। অগত্যা তাঁহার পুত্রকেই তিনি সম্মান ও সম্পদে ভূষিত করিলেন। আবুব প্রকৃতি উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারী ছিল সত্য, কিন্তু তিনি এরূপ বীর এবং সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরে, হিন্দু মুসলমান তাঁহার সমাধি স্তম্ভের নিকটে গিয়া পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিত।

যেদিন হইতে পর্ত্তুগাল স্পেন রাজ্যের অধীন হইল এবং স্পেনের সহিত অন্যান্য ইয়ুরোপীয়গণ যোগদান করিল সেই দিন হইতেই ভারতে তাহার শক্তির অধঃপতন আরম্ভ হইল। পর্ত্তুগালের শক্তি হ্রাসের আরম্ভেই ডাচেরা প্রাচ্যদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য একটি কোম্পানি গঠিত করিল। ১৬০২ হইতে ১৬১০ সালের মধ্যে তাহারা পর্ত্তুগালের প্রাচ্য রাজ্যসমূহ প্রায় সবই অধিকার করিয়া লইল। ভারতে দুই চারটি ক্ষুদ্র স্থান ভিন্ন পর্ত্তুগালের আর কিছুই রহিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল ও যবদ্বীপ সমস্তই ডাচেরা অধিকার করিল। পর্ত্তুগাল প্রথমে পথ দেখাইল বটে, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য জাতিরা আসিয়া একে একে ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। ১৬০০ সালে ইংরাজ, ১৬০৪ সালে ফরাসী ও ১৬১২ সালে দীনেমারেরা আসিল। আজিও গোয়া ও যে দু' চারিটি ক্ষুদ্র স্থানে পর্ত্তুগাল উপনিবেশ আছে সে সকল স্থানেও সাধারণ তন্ত্রের অধীনে এখন স্বায়ত্ত শাসন স্থাপিত হইতে চলিল।

পৃথিবীর ইতিহাস

বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় "পৃথিবীর ইতিহাস" সঙ্কলনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা এগ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিলাম। এক্ষণে "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড-ভারতবর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষ আখ্যায়, বেদ চতুষ্টয়, ষড়বেদাঙ্গ, ষড়দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, প্রভৃতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ প্রভৃতি দিব্য পরিপাটি। গ্রন্থকার সূচনায় বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীর ইতিহাস এক বিরাট কল্পনা। অন্যূন ত্রিংশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। * * পৃথিবীর সকলদেশের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় এই পৃথিবীর ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট করিব।" বর্ত্তমান খণ্ড এই সুবিরাট গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র।

একের চেষ্টায় এ ব্রত-উদযাপন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। বিষয়টি যেমন গুরুতর এবং বিশাল, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত চেষ্টা এতৎপ্রতি প্রযুক্ত হইলে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যে

"পৃথিবীর ইতিহাস" এক অভিনব সম্পদ স্বরূপ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। সম্ভবতঃ, দুর্গাদাস বাবু এরূপ আয়োজনে ত্রুটি করেন নাই।

আলোচ্য খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা, পাঠানুরাগ, ও সুগভীর জ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাইয়াছি। অদ্ভুত তাঁহার তত্ত্বসংগ্রহশক্তি, অপূর্ব্ব তাঁহার সরল বিবৃতিভঙ্গী! এক-একটি বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা করিয়া তবে অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এইগ্রন্থ পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণকে নূতন পথ দেখাইবে, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। বিষয়ের প্রভূত্ব ও অসীমতার কথা

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভাবিয়া দেখিলে, গ্রন্থকারের সহিত স্থানে স্থানে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে, বরং তাহা একান্ত স্বাভাবিক! তবে গ্রন্থকারের যুক্তি পরম্পরাও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নহে! এই টুকুই ইহার বিশেষত্ব! গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আরো মুগ্ধ হইয়াছি আমরা গ্রন্থকারের বিনয় সন্দর্শনে! গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যদি কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হই, পাঠকমাত্রকেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, সেরূপ স্পর্দ্ধা সেরূপ উদ্দেশ্য আমার

আদৌ নাই।" তিনি শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত পরম্পরার পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ কোন্ বিষয় কিভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহারি আভাষমাত্র দিয়াছেন; প্রাচীন বিষয়ের আলোচনায় প্রধানতঃ শাস্ত্র মতেরই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।

আরো দুই চারি খণ্ড না দেখিলে গ্রন্থের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট কিছু ধারণা করিতে পারিতেছি না, তথাপি এইটুকু বলিতে পারি "পৃথিবীর ইতিহাস" বাঙ্গালা লাইব্রেরীটিকে অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত করিবে! যে বয়সে সকলে বিশ্রামের জন্য লালায়িত হয়েন, দুর্গাদাস বাবু সেই বয়সে এই মহাব্রত সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহার এ অধ্যবসায় ও জ্ঞানচর্চ্চা সকলের পক্ষে অনুকরণীয়! তাঁহার সাধু সঙ্কল্প সফল হউক, বঙ্গভাষা ধন্য হইবে! গ্রন্থের দুই একটি ছোটখাট ত্রুটি আমাদিগের চোখে পড়িয়াছে তৎপ্রতি গ্রন্থকারের মনোযোগ আমরা সবিনয়ে আকর্ষণ করিতেছি। মাঝে মাঝে একদেশদর্শিতা এবং ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিককে রীতিমত উদার ও সমদর্শী হইতে হইবে, ব্যক্তি বা জাতিধর্ম্মগত পক্ষপাতিত্বে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় একথা প্রবীণ গ্রন্থকার মহাশয়কে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। তবে স্বজাতি বা স্বদেশের গৌরব স্মরণে ভাবের রশ্মি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। তাই বিশেষ করিয়াই কথাটির উল্লেখ করিলাম। পরিশেষে সাহিত্যানুরাগী, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীগণের আদর্শস্থানীয় দানশীল, মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় এই খণ্ডের ব্যয়ভার সম্পূর্ণতঃ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য সাধারণের তরফ হইতে তাঁহাকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অনারেবল মিষ্টার সায়েদ আলি ইমাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভারতের ব্যবস্থাসচিবের পদ ত্যাগ করায় লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লি মাননীয় আলি ইমামকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার এই নিয়োগে আমরা আন্তরিক সুখী হইয়াছি। মুসলমান সমাজ ভারতে হিন্দু সমাজের পরেই, সুতরাং এবার মুসলমান সমাজ হইতে এই পদের জন্য লোক নির্ব্বাচিত হওয়াতে মুসলমানদের স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করাই হইয়াছে। তা ছাড়া মিষ্টার আলি ইমাম মুসলমান সমাজের মধ্যে একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঁহার পরিবারের সকলেই বংশানুক্রমে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও পদে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার ভ্রাতা আমাদের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান সভ্য ও সহায়। তাঁহার শিক্ষা ও উদারতার বিষয় আমরা সকলেই

জানি। মিষ্টার আলি ইমামের প্রতিভায় তিনি যে এই কঠিন কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ বা শাসন-শক্তির কোন বিশেষ পরিচয় করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসালাভে আমরা এখনও পাই নাই সত্য, কিন্তু সমর্থ হইবেন এরূপ আশা করা যাইতে

অনারেবল মিষ্টার স্যায়েদ আলি ইমাম।

পারে। ইনি পূর্ব্বে বাঁকিপুরে ব্যারিষ্টারি করিতেন। তখন ইঁহার পরিচয় আমরা বড় একটা জানিতাম না। পরে 'মোসলেম-লিগ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই আমাদের তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় হয়। এখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল পদে অধিষ্ঠিত।

এরূপ পদ হইতে কাউন্সিলের মেম্বর পদ প্রাপ্ত এদেশে নিতান্ত বিরল। কিন্তু ইহা আমাদের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। কেননা এখানে গুণেরই আদর প্রকাশ পাইতেছে। সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে গুণের সমাদরই যথার্থ পক্ষে দেশের পক্ষে প্রল্যাণপ্রদ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা কর্ত্তৃপক্ষকে বলা আমরা সঙ্গত বিবেচনা করি। বিলাত হইতে যখন বিলাতী সচিব নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল তখন তাঁহার ব্যারিষ্টার হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ভারত হইতে ভারতবাসী যখন এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তখন—কি ব্যারিষ্টার কি প্লিডার যোগ্যতানুসারে আইন ব্যবসায়ী মাত্রেরই এ পদ লাভে অধিকার থাকা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, মাননীয় শামসুল হুদা ইত্যাদি প্রতিভাবান লোকেরা যে আইন বিষয়ে ব্যারিষ্টার অপেক্ষা অজ্ঞ বা ব্যবস্থাসচিবের কর্ম্মের পক্ষে অনুপযুক্ত এ কথা কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। গুণের যথার্থ আদর করিতে হইলে কোন গণ্ডী বিশেষের মধ্যে অন্বেষণ করা ঠিক সঙ্গত নহে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বেড়া যাহাতে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

কবি রজনীকান্ত সেন।

পাবনা সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

রজনীকান্তের ক্ষুদ্র জীবন কেবলমাত্র ৪৪ বৎসরের সমষ্টিমাত্র। এই অনতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহার বিচ্ছেদ আমাদের সাহিত্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষোভের বিষয়।

১২৭২ সালের ১৭ই শ্রাবণ সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে রজনীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার সস্নেহপালনে তাঁহার কিশোর জীবন বিকশিত হইয়া উঠে। পুত্রের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে এই পিতার অনলস সতর্ক দৃষ্টি দেবতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদের ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। বালক রজনীকান্ত অটুট স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ব্যায়ামের প্রদর্শনীতে প্রতিবারই তিনি প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন। পুরস্কারও কোনবার ফাঁক যায় নাই। আর তাঁহার মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আমাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে হইবে

না,—তাঁহার বাণী, কল্যাণী এবং অন্যান্য কবিতাই সে বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ দুর্লভ কবিত্ব সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার "পদচিন্তা মণিমালা" একখানি সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ। ভাবে এবং ভাষায়, সরস করিত্বে এবং ভক্তি-প্রগাঢ়তায় তাহা বৈষ্ণব কবি-দিগের অতুলনীয় গানগুলির মতই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। রজনীকান্তের এই অমর কবিত্ব—স্নেহাতুর জনকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান।

কান্ত কবির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ,ভক্ত এবং রসিক সকলেরই সমান উপভোগ্য—সকলেরই সমান আদরের বস্তু। একদিকে যেমন তাঁহার "তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা" প্রভৃতি গান উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তথ্যের অবতারণা করিয়া শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে অন্য দিকে আবার তেমনি "এস এস কাছে, দূরে কি গো সাজে" প্রভৃতি গান সাধারণের ভিতর কোমল স্পর্শে আনন্দের শতদল পদ্মকে বিকশিত করিয়া তোলে। একদিকে যেমন "আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ" ভক্তের চক্ষু হইতে বিহ্বল আবেশের ধারা-প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দেয়, অন্যদিকে আবার তেমনি "যদি কুমড়োর মত হতো পাশিতোয়া" মূর্ত্তিমান রহস্যের হাস্যরসপ্রিয় শ্রোতার মুখের উপর অট্টহাস্যের তরঙ্গ রেখা পরিস্ফুট করিয়া তোলে। শতদীপপুলকিত প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গীতসমূহ যেমন দেয়ালে বাধিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিয়া আসে তেমনি আবার রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তরে, "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে" তাঁহারই গীতাবলী গগন পবন পূর্ণ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

চরিত্রের দিক দিয়াও তাঁহাকে দেখিতে গেলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধহাস্যে এবং মধুর বাক্যে পরিতুষ্ট রাখিতেন। তাঁহার গান ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধের অপেক্ষা রাখিত না। যে কেহ ধরিলেই কল্লোলময়ী নির্ঝরিণীর মত তাহা নামিয়া আসিত।—নিদাঘের ধারাপাতের ন্যায় হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ধৌত করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিত। সঙ্গীতে তাহার ক্ষমতাও এমন অদ্ভুত ছিল যে তিন, চারি ঘণ্টা অবিশ্রান্ত কণ্ঠ পরি-চালনার পরও কেহ তাঁহাকে ক্লান্তির নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখে নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ ছিল তাঁহার বাক্ পটুতা এবং পরিহাস করিবার ক্ষমতা। তাঁহার উপহাসের ভিতরেও এমন একটা ঋজুতা এবং স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা ছিল যাহা কোনো মানুষকেই আঘাত করিতে জানিত না—অথচ সরল সুন্দর হাস্যে সকলকেই উৎফুল্ল করিয়া তুলিত।

হিন্দু বলিলে যাহা বুঝায় রজনীকান্ত তাহাই ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দেন নাই। বরং সমাজকে এজন্য তীব্রকণ্ঠে শাসন করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠানুভব করেন নাই। সমাজ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির আলোচনা করিলে—

আমাদের এই অধঃপতিত সমাজের জন্য তাঁহার চক্ষুতে যে অশ্রুর অভাব ছিল না তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কবিতা হিসাবে সেগুলির স্থান খুব উচ্চে না হইতে পারে—ভাবের নূতনত্বে, চিন্তার বিশালতায় তাহা পরিণত মস্তিষ্কের উপযুক্ত না-ও হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্য এগুলিকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবে না।

নবযুগের পুণ্য মন্ত্রে নির্জ্জীব বাঙ্গালা যে দিন সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল সেদিনও তাহাতে রজনীকান্তের কৃতিত্ব বা প্রভাব কম ছিল না। নিত্য নূতন সঙ্গীতে তিনি মাতৃপূজার অর্ঘ্য রচনা করিয়া দিতেন আর সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সেই তীব্রতাহীন খাঁটি স্বদেশী উপহারে মাতৃচরণ অর্চ্চনা কবিত। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও কবি তাঁহার দেশ মাতাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। একনিষ্ঠ পূজক যেমন মৃত্যু কালে তাহার পাথরের ঠাকুরকে বিশ্বস্ত হস্তে সঁপিয়া যায় রজনীকান্তও তেমনি কারয়া মৃত্যুব পূর্ব্বে যথার্থ—উপযুক্ত সন্তানের হাতে তাঁহার দেশমাতাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুবিবর্ণ কবির "কুমার, করুণা-নিধে, দেখো র'ল দেশ"—এ প্রার্থনা ভক্তের প্রার্থনা—সাধকের প্রার্থনা—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

দীর্ঘদিন হইতে কান্ত কবি ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছিলেন। এই রোগই তাঁহাকে আমাদের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিয়াছে। প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার নাক দিয়া নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা রুদ্ধ হইয়া যায়। গলায় অস্ত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাঁহাকে এতদিন জীবিত রাখা হইয়াছিল। তাঁহার চিরমুখর কণ্ঠ সেই দিন হইতেই চিরনির্ব্বাক। আর গত ২৮শে ভাদ্র রাত্রি ৮—৩০ মিনিটের সময় তাঁহার বুকের স্পন্দনও চিরদিনের জন্য থামিয়া গিয়াছে। অনাহারই কান্ত কবির জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের যবনিকা এত সত্বর টানিয়া দিয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কে, অমৃত আনন্দময়ী, অভয়া এবং বিশ্রাম এই পুষ্প চতুষ্টয়ে তাহার চিরারাধ্যা বীণাপাণির পূজার শেষ অর্ঘ্যরচনা করিয়া গিয়াছেন।—যে মায়ের সাধনায় তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছে সেই মায়ের পূজা করিতে করিতেই তিনি মায়ের কোলে মিশিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর গীতি কবিতায় রজনীকান্তের স্থান কোথায় তাহা নির্দ্দেশের সময় এখনও আসে নাই। কবে আসিবে আমরা তাহাও বলিতে পারি না! আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয় কেবল এই মাত্র বলিতে পারে যে, তিনি আমাদের কবি—সমাজেব কবি—বাঙ্গলার কবি ছিলেন—তিনি যেখানেই থাকুন সেখান হইতেই আমাদের ভক্তি প্রীতি ভালবাসাব অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন।

"Thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on."

তুমিও যবে মরিবে তবে আমাদের এবুকে
চিরাভিনব স্মৃতিটি তব ঘুমায়ে রবে সুখে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সমালোচনা।

পারস্য উপন্যাস। (গার্হস্থ্য সংস্করণ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। বটতলার দুর্দ্দশাপন্ন জঘন্য পারস্য উপন্যাস ভদ্র সমাজের অযোগ্য ছিল সে অভাব দূর করিবার জন্য এই নির্দ্দোষ সর্ব্বজনপাঠ্য ও সুমুদ্রিত গার্হস্থ্য সংস্করণের আবির্ভাব। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে কবিত্ব রস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই—সুরুচিও সর্ব্বত্র সুরক্ষিত হইয়াছে। বালকবালিকাগণের হস্তে অসঙ্কোচে উপহার দেওয়া যায়। গ্রন্থখানিকে সর্ব্বতোভাবে রমণীয় করিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে অতিশয় সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি তিনবর্ণে মুদ্রিত। চিত্রের পরিকল্পনা রমণীয়। গ্রন্থের সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাগজ। সে হিসাবে মূল্য বেশ সুলভই হইয়াছে।

রবিন্সন ক্রুশো। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ কর্ত্তৃক অনূদিত। এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান প্রেস ও কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। ডিফো রচিত রবিন্সন ক্রুশো ইংরাজ বালকবালিকার নিকট বিশেষ আদরের সামগ্রী। এমন কৌতূহলপূর্ণ শিশুপাঠ্যগ্রন্থ জগতের সাহিত্যে অল্পই আছে। চারুবাবু সেই গ্রন্থের এমন সুন্দর সমগ্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ সবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অনুবাদে কোন অংশ বাদ পড়ে নাই। ভাষা দিব্য লঘু ও সরল, কোথাও এতটুকু বাধাবদ্ধ নাই। মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। বহিখানি আবালবৃদ্ধবনিতার পক্ষে যে উপাদেয় হইয়াছে তাহার একটি প্রমাণ, সমালোচ্য গ্রন্থখানি বহুদিন বহুপাঠকপাঠিকার হাতে ফিরিয়া তবে সমালোচকের হাতে পড়িয়াছে গ্রন্থে অনেক-

…সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুরস্কারযোগ্য ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ তালিকায় রবিন্সন ক্রুশো উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

জোলেখা। শ্রীআবদুল লতিফ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। "বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলী," ও কোরাণ শরিফের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত ধর্ম্মাত্মা ইউসফের জীবন কাহিনী অবলম্বনে কবি জামি কাব্য রচনা করেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। উপাখ্যানে শিক্ষার সহিত রোমান্সের সুন্দর সমন্বয় আছে। তবে অনুবাদকের রচনায় রোমান্সের রসটুকু ভালো ফুটে নাই। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল কিন্তু উচ্ছ্বাসের ঘটা কিছু অতিরিক্ত, তজ্জন্য স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

শিশির। শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত। চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীগৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। তেমন বিশেষত্ব কিছুই নাই।

জাপান। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ২০৩,৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকামাত্র। গ্রন্থকার সার্দ্ধ চারিবৎসরকাল জাপানে শিক্ষাসৌকর্য্যার্থ বাস করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক ভদ্র পরিবারের সহিত মিশিবার পক্ষে তাঁহার সুযোগ ঘটিয়াছিল—সেইহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন রীতিনীতি জাপানী সমাজ প্রভৃতি রীতিমত দেখিবারও অবসর মিলিয়াছিল। গ্রন্থখানিতে জাপানের রাজধানী, সমাজ, শিক্ষা, জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে লেখক বেশ হৃদয় দিয়া আগাগোড়া বর্ণনা করিয়াছেন দেখিবার শক্তিও তাঁহার সাধারণের মত নহে

উপন্যাসের মত গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য। গ্রন্থের ছাপা কাগজ মলাট প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট। সর্ব্বসমেত ৪৩ খানি চিত্রে পরিশোভিত। চিত্রগুলিরও বিশেষ মূল্য আছে। কারণ তাহা হইতে লেখকের বক্তব্য প্রস্ফুটতর হইয়াছে। ভাষাটুকু সরল, কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্রণে সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

আদর্শ রমণী। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। ঢাকা আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত মূল্য চারি আনা মাত্র। সখিনাখাতুন, জোবায়দা খাতুন, দেবী রাবিয়া সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল প্রভৃতি কয়েকটি আদর্শ রমণীর কাহিনী লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত। লেখকের ভাষাটুকু সরল ও মিষ্ট; রচনায় বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। মুসলমান লেখকের এমন রচনাকুশলতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি হিন্দু মুসলমান সকলের নিকটই আদর পাইবার যোগ্য। মুসলমান মহিলাগণের ত অবশ্য পাঠ্য।

মদিনা-শরীফের ইতিহাস। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য এক টাকামাত্র। গ্রন্থের ভাষা সরল প্রাঞ্জল। ইসলাম জগতের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থকার মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

শুক্লা। শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায় বি, এ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা। এখানি কাব্যগ্রন্থ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। উপাখ্যানে কোন বিশেষত্ব নাই। খণ্ডকাব্য রচনায় লেখকের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। ভাব ও ছন্দ অত্যন্ত জটিল; ভাবও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

পুণ্যের জয়। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা পূজার সময় সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট শিল্পসমিতির বিধবাশ্রমের সাহায্যে ভিক্ষা প্রার্থনা করি। মহিলাগণ অনেকেই যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ ভাবে এই আবেদন রক্ষা করিয়াছেন—তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ আমাদের দুই একটি মহিলার কাজ নহে, ইহা সমগ্র বঙ্গরমণীরই কাজ। তাই এই আহ্বানে, তাঁহাদিগকে সাড়া দিতে দেখিয়া আমাদের হৃদয় এত আনন্দগর্ব্বে স্ফীত। আমরা বুঝিতেছি আমাদের ব্রত নিষ্ফল হইবে না,—বঙ্গের অভাগিনী ভগিনীদিগের দুঃখাশ্রু মুছাইতে সমগ্র ভাগ্যশীলা রমণী সস্নেহে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইবেন। এ আশা যে দুরাশা নহে তাহা শ্রীমতী জ্ঞানদাবালার নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে সকলে বুঝিবেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিহিত প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং

আপনি যে মহদুদ্দেশ্যে আপনার আশ্বিনের ভারতীতে ৺ পূজার ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন কয়েকটী কারণে ঐ সদুদ্দেশ্য আমার সংসারমগ্ন চিত্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করিয়াছিল। তাই আপনার বৃহৎ ভিক্ষাঝুলির আদর্শে নিজে একটী সামান্য রকম ভিক্ষাঝুলি লইয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি। এই সংগ্রহ কার্য্যে এখানকার যে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নাম এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আনন্দের বিষয় এই যে, ইঁহাদের সকলেই আপনাদের সমিতির বিষয় শুনিয়া আন্তরিক আগ্রহে ও অসঙ্কোচে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বেশ মনে হয়

যে আমার অপেক্ষা বেশী সামর্থ্য, বিদ্যাবত্তা ও অবসর যাঁহার আছে তিনি এই সংগ্রহ কার্য্যে নিয়োজিত হইলে সিমলা পাহাড়ের বাঙ্গালী মহিলাদের নিকট আরও বেশী চাঁদা উঠিত। * * *

যে কয়েকটী কারণে আপনার ভিক্ষা প্রার্থনা আমাকে বিচলিত করিয়াছে তাহার একটি এখানে ব্যক্ত করা আবশ্যক মনে করি। হিন্দু বিধবার সাংসারিক দুর্দ্দশা দেখিয়া আজকাল অনেক সুশিক্ষিত লোক সমাজের উচ্চস্তরে পর্য্যন্ত বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন; ইঁহারা বোধহয় অনুভব করেন নাই অবিকৃতস্বভাব হিন্দু-মহিলার নিকট বিধবার ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রাচীন সুমহান্ আদর্শ কতদূর সম্মান ও আদরের বস্তু। * * এই সঙ্কট সময়ে আপনার হিন্দু-বিধবাশ্রম বিধবার আর্থিক অসহায়তা দূর করিবার প্রয়াসী হইয়া সমস্ত হিন্দুনারী সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছে। * * *

ইতি কার্ত্তিক সন ১৩১৭ সাল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিনী—মিত্রজায়া জ্ঞানদাবালা।

শ্রীমতী উষা দেবী,	সিমলাপাহাড়	১০৲
" সরলা দেবী বি, এ,	ঐ	৫৲
" শরৎসুন্দরী মিত্র,	ঐ	৫৲
" জ্ঞানদাবালা মিত্র,	ঐ	৫৲
" নীরদবালা দেবী,	ঐ	৪৲
" সরযূবালা দাসী,	ঐ	৪৲
" গোপাঙ্গনা দাসী,	ঐ	২৲
" গোলাপসুন্দরী সিংহ,	ঐ	২৲
" কুমুদিনী দেবী,	ঐ	২৲
" গঙ্গা দেবী,	ঐ	২৲
" প্রেমবালা মজুমদার,	ঐ	২৲
" লতিকা ঘোষ,	ঐ	২৲
" বিষ্ণুপ্রিয়া বসু,	ঐ	১৲
" নগেন্দ্রবালা দেবী,	ঐ	১৲
" প্রকাশনলিনী মিত্র,	ঐ	১৲
" হেমলতা রায়,	ঐ	১৲
" নিত্যকুমারী দেবী,	ঐ	১৲
" মাধুরীবালা দত্ত,	ঐ	১৲
" হরকুমারী দেবী,	ঐ	১৲
" মৃণালিনী ঘোষ,	ঐ	১৲
" ভবানী সুন্দরী দেবী,	ঐ	১৲
" প্রীতিময়ী ঘোষ,	ঐ	১৲
" মণিবালা দে,	ঐ	১৲
" মৃণালিনী বসু,	ঐ	১৲
" তুষারবালা সরকার,	ঐ	১৲
" নবনলিনী সরকার,	ঐ	১৲
" নলিনীবালা দেবী,	ঐ	১৲
" নির্ম্মলাবালা দেবী,	ঐ	১৲
" নীহারিকা দেবী,	ঐ	১৲
" চারুবালা ঘোষ,	ঐ	১৲
" অমূল্যসুন্দরী দত্ত,	ঐ	১৲
মিসেস্ কে, পি, দে,	ঐ	১৲
শ্রীমতী মোহিনী বালা গাঙ্গুলী,	ঐ	৷৷০
" নবকুমারী দেবী,	ঐ	৷৷০
" সরযূবালা দেবী,	ঐ	৷৷০
" সুশীলাবালা ঘোষ,	ঐ	৷৷০
" দুর্গা দেবী,	ঐ	৷৷০
" নীলনলিনী দেবী,	ঐ	৷৷০
" গোপেশ্বরী ঘোষ,		৷৷০
মিসেস্ বিনোদদাস,	সিলেট	১৲
শ্রীমতী হেমনলিনী সেন,	পাটনা	১৲
মিসেস্ গিরীন্দ্রনাথ সেন,	কলিকাতা	২৲
মিসেস্ ওদেদার,	লক্ষ্ণৌ	১০৲
শ্রীমতী কনকলতা রায়,	ঐ	৫৲
" কমলা গুহ ওদেদার,	ঐ	৩৲
কুমারী অমিয়লতা গুহ ওদেদার,	ঐ	২৲
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,	সিলং	১৲
মিসেস্ শরৎচন্দ্র বাগচী,	কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী,	কাশীধাম	১৲
শ্রীশৈলজানাথ চক্রবর্ত্তী	আশুগঞ্জ, ত্রিপুরা	২৲
বাবু যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	দেবগ্রাম	১৲
		৯৯৷৷০
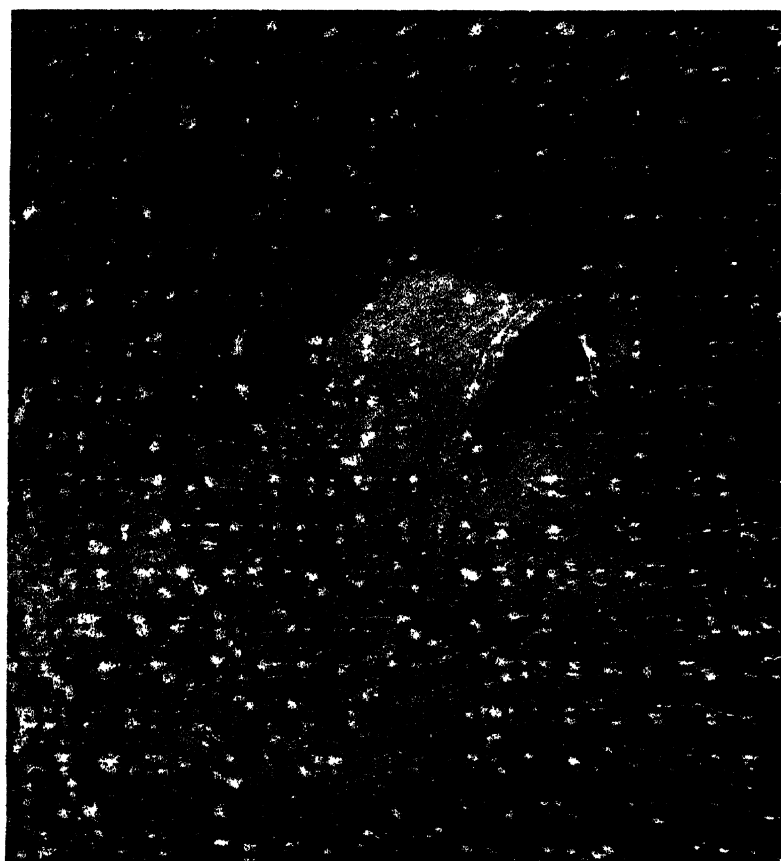
কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] পৌষ, ১৩১৭ [৯ম সংখ্যা

নীলগিরির টোডা জাতি।

বহুদিন পূর্ব্বে ভারতীতে নীলগিরি সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম! কিন্তু সে সঙ্গে তখন চিত্র ছিল না। টোডাদিগের ছবি দেখাইবার জন্যই প্রধানতঃ পুনরায় সংক্ষিপ্তাকারে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল। ভা সঃ।

আমরা যখন উৎকামন্দে ছিলাম তখন বর্ষাকাল। কিন্তু বর্ষাকালে সেখানে সারাদিন ধরিয়া টিপটিপ বা ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে না। যখন বৃষ্টি হয় মুষলধারে খানিকক্ষণ বেশ জোরে বৃষ্টি হইয়া যায়; তাহার পর আবার নির্ম্মল আকাশতলে পরিষ্কার রৌদ্র ফুটিয়া উঠে। দার্জিলিঙ্গে বর্ষার দিনে অনবরত বৃষ্টিবর্ষণশীল মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতিতে একটা বিরক্তির ভাব আছে, শীতে ক্লান্তি আছে, সেখানকার রৌদ্রস্ফুট তুষার দৃশ্যও অতি মহান, অতি গম্ভীর, অতি বিস্ময়কর, তাহা কেবল দূর হইতে দর্শনের, স্পর্শনের নহে, তাই তাহার মধ্যে তৃপ্তির পূর্ণ সুখ নাই। নীলগিরির জলবায়ু হইতে দৃশ্য সৌন্দর্য্য সমস্তই নিরতিশয় তৃপ্তিজনক।

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের গিরিবিহার এই উৎকামন্দ নীলগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত। উচ্চতায় ইহা প্রায় ৭০০০ ফুট. দার্জিলিঙ্গেরই প্রায় সমান। কিন্তু ইহার শৈত্য দারজিলিং নৈনিতাল প্রভৃতি গিরি নিবাসের তুলনায় মৃদুমন্দ—এবং দৃশ্যও কোমল-মধুর। উৎকামন্দে হিমালয়ের সেই রজতশুভ্র তুষারসজ্জিত শৈলশৃঙ্গশ্রেণীর সুমহান সৌন্দর্য্য নাই, দিনে নিশীথে ঝিল্লি ধ্বনি মুখরিত নিবিড় গম্ভীর অরণ্যানীর রুদ্রশোভা, অথবা পথপার্শ্বে কোথাও বা লতাশৈবাল জড়িত মহাবৃক্ষনিবিড়তা, কোথাও বা অতুঙ্গ মসৃণ পর্ব্বত প্রাচীর, কোথাও বা গভীর খদের ভয়ঙ্কর ভাব নাই। যত্র তত্র বিবিধবর্ণ বনফুল ও বিচিত্র লতাগুল্মের বিচিত্র সমাবেশ, নির্ঝর প্রপাতের ফেণময় উচ্ছসিত কল্লোল এবং মেঘ রৌদ্রের মুহুর্মুহু লীলাখেলাও নাই। পাহাড়গাত্র যে সকল সুন্দর সুদৃশ্য তরুরাজি সমাচ্ছন্ন—তাহাও রুদ্রভাববিরহিত কানন শোভাসঙ্কুল, ভ্রমণেও পার্ব্বত্য শ্রমক্লান্তি নাই—পথ দুরারোহ উচ্চ নীচ নহে, ঘূর্ণমান সমতল চড়াই পথে—নিম্নভূমির মত গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে! সহরের যত ঊর্দ্ধেই উঠিতে চাও ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে পার —বাতাসও মলয়ানিলের ন্যায় উপভোগ্য।

ইহার দিগন্তবেষ্টিত মেঘহীন স্বচ্ছশুভ্র আকাশের কোলে স্তরে স্তরে নীলিমায় তরঙ্গায়িত অতি নীল,—নীলাকাশ হইতেও ঘননীল—স্বনামে সার্থক অনতি উচ্চ শৈলাবলী অতি সুদৃশ্য। এত নবঘন নীল মাধুরী অন্য কোন পাহাড়ে দেখা যায় না। ইহার বক্ষস্থিত

সর্পাকৃতি পথ, সুবিশাল হ্রদ গুচ্ছ, সুদূর বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্র, সরল সুদীর্ঘ পত্র মুকুট শোভিত, সুরূপ সুন্দর নীল নির্যাস তরুসমাচ্ছন্ন স্তর বিন্যস্ত পাহাড়পুঞ্জ, তৎগাত্রস্থিত রক্তবর্ণ খোলার ছাদবিশিষ্ট কুটীরাবলী ও অট্টালিকা-সমূহ সকলই মনোহর। অধিকতর মনোহারী কেননা মেঘহীন শুভ্র সুনির্ম্মল দিন, রৌদ্রদ্রব সুখকর শীত, বসন্তমধুর সুশীতল সমীরণ এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ অনায়াস ভ্রমণ এই দৃশ্য সৌন্দর্য্যকে আমাদের প্রকৃত উপভোগের মধ্যে আনিয়া দেয়। হিমালয় দেবালয়, তাহার দুর্ভেদ্য দুর্গম্য গূঢ় গম্ভীর রহস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আপনার করিতে পারে না,—নীলগিরি মর্ত্ত্যে যেন মানব উপভোগ্য নন্দনকানন। অন্তত দারজিলিং হইতে দূরে—বহুদূরে তাহার সৌন্দর্য্য যখন মানসনেত্রে অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট, কাল্পনিক সামগ্রী, তখন নীলগিরির প্রত্যক্ষ, সুদৃশ্য, সুগন্ধ, সুবসন্ত উপভোগ করিতে করিতে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল।

ইংরাজিতে যাহাকে ব্লুগম বলে আমি তাহাকেই নীলনির্যাস বলিয়াছি। ইহা তালগাছের ন্যায় সরল সুদীর্ঘ কিন্তু ইহার গাত্রস্থিত সুদীর্ঘ সরু সরু বিরল শাখায় তেজপত্রের ন্যায় সুদীর্ঘ পত্রাবলী আলম্বিত। শিরোভাগ পত্র ঘন, পত্রগুচ্ছ মুকুটের মত শোভাময়। এই বৃক্ষরাশি শৈশবে ও যৌবনে ভিন্নরূপ। শৈশবাবস্থায় ইহার পাতা লেবু পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা এবং আকাশের মত সুনীল আর বড় গাছে ইহা শ্যামকান্তিময়। তরুণ ও বয়স্ক বৃক্ষকে একত্র পাশাপাশি দেখিলে বিশ্বাসই হয় না যে ইহারা একই জাতি। এই শিশু, কিশোর ও বয়স্ক তরুর সমাবেশে, শ্যাম ও নীলকান্তির অপরূপ সম্মিলনে উৎকামন্দের বনস্থলী একদিকে বিচিত্র শোভাপন্ন অন্যদিকে সুগন্ধে আমোদিত। এই সুগন্ধপত্রবিশিষ্ট নীলনির্যাস তরু স্বাস্থ্যকারিতায় এবং জলশোষণ গুণে নীলগিরির প্রধান ভূষণস্বরূপ। শুনা যায় উৎকামন্দের মাটীতে জলীয়তা পূর্ব্বে এত অধিক মাত্রায় ছিল যে রাস্তার যেখানে সেখানে খুঁড়িলেই চোরানদীর মত জল পাওয়া যাইত। পাহাড়ে যেখানে সেখানে নির্ঝর বহিত। রাস্তাঘাট গাড়ী ঘোড়ার ঘর্ষণ অধিকদিন সহ্য করিতে পারিত না—শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খারাপ হইয়া যাইত। কিন্তু বহুপরিমাণে নীলনির্যাসতরু রোপিত হওয়াও এই পাহাড়ের মাটী এত কঠিন ও নির্জ্জল হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন এখানে একরূপ জলাভাব বলিলেই হয়। মাটী খুঁড়লে ত আর জল ওঠেই না, সহরের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সরোবর হইতে কলে জল আসে। নীল নির্যাস তরু সজিনা গাছের ন্যায় অমর, মুড়াইয়া কাটিয়া ফেল, আবার মূল হইতে শাখা উঠিবে। ইহার শিকড়ে জল শোষণ করে পত্রে তারপিন তেল হয়। এ দেশে লোকেরা সর্দ্দি হইলে ইহার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করে।

সহরের আশে পাশে যে সকল প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি রক্ষিত সেখানে নীল নির্যাসের গাছ অপেক্ষাকৃত বিরল, অন্যান্য নানাজাতীয় বন্যগাছেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। এই সকল অরণ্যকে এখানে সোলা বলে। সোলায় অনেক পরিমাণে হিমালয়ের প্রকৃতি বিরাজিত।

অরণ্যের মধ্য দিয়া বেশ প্রশাস্ত গাড়ীর পথ, পথের স্থানে স্থানে তরুশাখা দুইদিক হইতে খিলানের মত মিলিত হইয়া পথ ছায়াচ্ছন্ন নিকুঞ্জের মত করিয়াছে। স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্য লতাজড়িত মহীরুহে, ফলবৃক্ষে, ফার্ণে, বনফুলে ফুলন্ত ফলন্ত শোভা সমাকুল। সহরের ফুলের অভাব এখানে এইরূপেই বিদূরিত হইয়াছে। নইনিতালের ন্যায় বন্য সেঁউতি যূথিতে বনভূমি স্থলে স্থলে আলোকিতা অন্যান্য বনফুলও নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অর্কিড বা শৈবাল লতা নিতান্ত বিরল, ফার্ণও তত প্রচুর বা নানাজাতীয় নহে। এখানকার অমরপুষ্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রা বর্ণের চন্দ্রমল্লিকার ন্যায় দেখিতে এবং চিরসৌন্দর্য্য বতী। শুকাইয়া গেলেও এমন সুন্দর দেখিতে থাকে যে সোলার নির্ম্মিত ফুল বলিয়া ভ্রম হয়। কোন কোন বনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুইনিনের চাষ দেখিলাম। বন্যফলের গাছ সমস্ত সোলাতেই প্রচুর। চেরি নানারকম! ষ্ট্রবেরির ক্ষুদ্র লতান ডাঁটার আগায় আমরুল শাকের পাতার মত দুএকটি গোল গোল পাতা আর সমস্ত ডাঁটা ফলে ফলে ভরা। দেখিলে আমাদের দেশের বালিকা মাতাদিগকে মনে পড়ে। আপেল নাসপাতি প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগানও এখানে অনেক।

টিপু সুলতান এখানে আসিয়া যে উচ্চ পাহাড় শিখরে কেল্লা নির্ম্মাণ করেন তাহার নাম সুলতান শিখর। সেই নাম হইতে আমি এই শিখর সংলগ্ন অরণ্যাবলীর নাম দিয়াছিলাম সুলতান সোলা। কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া বেশী দিন টিপুর এখানে বাস করিতে হয় নাই। শীতক্লান্ত হইয়া শীঘ্রই তিনি এ বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এখনো অরণ্যে পরিণত পাহাড় চূড়ায় গড়ের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। একটি ক্ষুদ্র নদী সুলতান সোলার পদপ্রান্তে প্রবাহিত।

আমাদের যে মান্দ্রাজি ভৃত্যটি ছিল সে প্রায়ই উৎকামন্দের একটি বিস্ময়জনক প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ করিত। বলিত—

"এখানে গরমের দিনে তুষার পড়ে।"

"সে গরমের সময়টা কখন? কি মাস?"

এ প্রশ্নের উত্তরে সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিত—"ডিসেম্বর জানুয়ারি।"

"সে সময়ে গরম?"

"অত্যন্ত। সূর্য্য তখন সমস্তক্ষণ আকাশে থাকে—বৎসরের সমস্ত সময় অপেক্ষা সে সময় প্রচণ্ড রৌদ্র—অথচ সন্ধ্যায় বরফ পড়ে, শীত ভীষণ।"

আরও একটি বিষয়ে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিতাম। ইংরাজ যত জংলি গাছ মস্ত লম্বা চওড়া নামে অভিহিত করিয়া বটানিকাল গার্ডেনে লাগায়—আর বেশী বেশী দরে বিক্রয় করে। ইহা তাহার নিতান্তই হীন ছলনা মনে হইত। তাহার ভাষায়—"Madam they bring them all from Jungle and only give a name and sale.

মান্দ্রাজী ভৃত্যেরা প্রায় সকলেই ইংরাজি জানে। কিন্তু এ ভাষা ইহাদেরই অদ্ভুত সৃষ্টি। কোন ইংরাজ নিজের ভাষা বলিয়া ইহা গ্রহণ করিবেন না। ইহাদের ইংরাজির একটি বিশেষত্ব—সমস্ত অতীত ক্রিয়ার পূর্ব্বে তাহারা একটা done বসাইয়া দেয় যেমন done eat

খাইয়াছে বা খাইয়াছি Done put রাখিয়াছে রাখিয়াছি, ইত্যাদি।

উৎকামন্দের হ্রদ অতি সুন্দর। ইহা সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত এবং ইহার জলরাশি স্থানে স্থানে প্রণালীর আকারে সঙ্কীর্ণ হইয়া আবার বিশালতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য ইহা গুচ্ছাকার। প্রতি সকালে বিকালে ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ হ্রদ প্রদক্ষিণ করিয়া বায়ু সেবন করেন। যেমন পদ্মের শোভা জলে জলের শোভা পদ্মে;—সেইরূপ গিরি ও ইংরাজ ললনা উভয়ের রূপে উভয়ে শোভা বর্দ্ধন করেন।

উৎকামন্দের চারিদিকেই এইরূপ সোলা অর্থাৎ অরণ্য আছে।—আমরা কেবল ফার্ণহিল ও সুলতান সোলায় গিয়াছিলাম। দুই অরণ্যেই টোডার বাস দেখিলাম। ইহারা নীলগিরির আদিম অসভ্য জাতি।—নিভৃত অরণ্যপ্রান্তের মুক্ত বিজন স্থলে কাছাকাছি তিনচারিখানি কুটীর, ইহাই এক এক অরণ্যের টোডাপাড়া। এমন এক একটি পাড়ায় স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে মিলিয়া ২০।২৫ জন টোডার বাস, আর সেই অতি ক্ষুদ্র তিন চারি খানি কুটীরই সমগ্র ২০।২৫ জনের রাত্রিকালের আশ্রয় স্থল। কুটীরের আকার ধনুকাকৃতি তিনদিক বন্ধ একদিক খোলা, একেবারে গুড়ি গুঁড়ি না দিয়া সেই অতি নিম্ন দ্বারপথে গৃহপ্রবেশ করা যায় না। দ্বারের কাছে বসিয়াও মাথা নীচু করিয়া উঁকি মারিয়া তবে গৃহমধ্য নজরে পড়ে। কুটীর মধ্যে একদিকে একটু রোয়াক তাহাই শয়ন স্থল, অন্যদিকে উনুনের কাছে বাসন প্রভৃতি সাজান। তিন চারি দল বিবাহিত অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একত্র মিলিয়া এক সঙ্গে সেই রোয়াকে শয়ন করে।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় যখন বস্ত্রবয়ন কৌশল অনাবিষ্কৃত ছিল, যখন কুটীর নির্ম্মাণ সহজ ছিল না তখনকার কালে শীত নিবারণের জন্য এরূপ একত্র শয়ন আবশ্যক হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই; কিন্তু সভ্যতার সুবিধার এত সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা সেই হীন আদিম প্রথা এখনো রক্ষা করিতেছে দেখিলে অঙ্গে কেমন কাঁটা দিয়া উঠে। শুনিলাম আগে ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, সমস্ত ভ্রাতা একজন রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিত। কিন্তু সে নিয়ম এখন আর নাই। এখন প্রত্যেক পুরুষেরই ভিন্ন ভিন্ন পত্নী।—

আদিম অসভ্যজাতি শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন ইহারা কাফ্রিজাতির মত ভীষণ মূর্ত্তি বা ভুটিয়াদিগের মত খর্ব্বনাশা ও বিশাল মাংসপেশী তাহা হইলে ভুল করিবেন। ইহাদের চেহারায় অসভ্যত্ব বা অনার্য্যত্ব কিছুই নাই। আর্য্যগণ সন্তুষ্ট হইবেন কিনা জানি না—ইহাদের আকৃতি আর্য্যদিগের ন্যায়ই সুশ্রী সুগঠন। তাহা দেখিয়া ইংরাজ বংশতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদের অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ইতালীয় হইতে, কেহ বা ইহুদিজাতি হইতে, কেহ কেহ বা আরবজাতি হইতে ইহাদের মূল টানিতে চেষ্টা করেন। এক একজন টোডাকে দেখিলাম—একেবারে গ্রীক্ প্রস্তর ছবির মত সৌম্য সুন্দর। বর্ণ কাহারও কাল নহে—বেশীর ভাগ শ্যাম; কেহ

কেহ সামান্য গৌরবর্ণ। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ভিতরে ঘাগরার ন্যায় কটিবন্ধ বস্ত্র—জড়ান; আর একখানা লম্বাচাদর গলা হইতে পা পর্য্যন্ত ঝোলান। ইহাদের সকলেরি কেশ প্রায় কুঞ্চিত এবং আস্কন্ধ লম্বমান। এইরূপ বেশ বলিয়া যাহারা সুশ্রী দেখিতে তাহাদিগকে যেন ছবির মত দেখায়। দুঃখের বিষয় আমরা যেরূপ সুশ্রী টোটা দেখিয়াছি এস্থলে সেরূপ কোন চিত্র দিতে পারিলাম না।

টোডা খুকী।

আগে নাকি ইহারা একরূপ নগ্ন থাকিত, গভর্ণমেণ্টের আদেশে কাপড় পরিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা দূর অরণ্যে থাকে তাহাদেরও শুনিলাম এখন এই রকম বেশ। টোডা যুবতীগণ সাধারণতঃ বেশ ফিটফাট, সাজসজ্জার দিকে বিশেষ একটু মনোযোগী। সকলেরই সম্মুখের চুল বেশ একটু পরিপাটি করিয়া আঁচড়ান—মুখ মার্জ্জিত পরিষ্কার, কেহ কেহ কেশগুচ্ছ-কুঞ্চিত করিয়া মাথার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিয়াছে, উপযুক্ত সময় ঝুলাইয়া দিবে। কাহারো অলক গুচ্ছ দ্বিধাযুদ্ধ-সীমন্তের পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে আলম্বিত, কাহারো গাত্রে অল্পস্বল্প রৌপ্যাভরণ, —উল্কাভূষাও ইহাদের দেখিলাম; কিন্তু অধিক নহে। বস্তুতঃ চেহারায় নহে, বাসস্থলে এবং আচার ব্যবহারেই ইহাদের অনার্য্যত্ব অসভ্যত্ব প্রত্যক্ষ। তাহা কুটীর চিত্রে পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক টোডাপাড়ার বাস কুটীর কয়খানি হইতে দূরে একখানি করিয়া শূন্য কুটীর থাকে। ইহা টোডাদিগের দেবস্থান। এখানে কোন প্রকার মূর্ত্তি নাই। ইহারা মহিষ দুগ্ধ আনিয়াএখানে মাখন ঘৃতাদি প্রস্তুত করে। ইহাই টোডাদের পূজা। স্ত্রীলোক এ গৃহে প্রবেশ করে না; দধিমন্থন পুরুষেরই কার্য্য। দেবস্থানের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম—"যেখানে হারিস ডারিস্—অর্থাৎ ঈশ্বর থাকেন"।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঈশ্বর কে?"

'যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন।'

"তিনি কি ঐ স্থানে থাকেন?"

"আমাদের পূজা লইতে তিনি ঐখানে আসেন। দুধ ঘিতে তিনি সন্তুষ্ট।"

অবশ্য আমাদের ভৃত্য ইন্‌টারপ্রেটারের কাজ করিয়া আমাদের এইরূপ বুঝাইয়া দিল। টোডাদিগের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, কেহ দরিদ্র নহে। ২৫।৩০।৪০।৫০ করিয়া এক এক

পরিবারের মহিষ আছে। তাহা হইতে ইহারা প্রচুর ঘৃত মাখনাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। যদি কোন টোডার মহিষ মরিয়া যায় তবে অন্য টোডারা নিজেদের মধ্য হইতে দুই একটি দান করিয়া তাহার মহিষ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহিষ রাখিতেও ইহাদের কোন খরচ নাই। তাহারা সমস্ত দিন পাহাড়ে চরিয়া খায়, আর বিকালে টোডা রমণীর ডাকে কুটীর সন্নিধানে আসিয়া দুগ্ধদোহন করিতে দেয়—তারপর রাত্রে কুটীরের কাছাকাছি যেখানে সেখানে শুইয়া থাকে। মহিষগণ ক্ষুদ্র টোডা বালকের হস্তেও পরিচালিত হইয়া থাকে কিন্তু সহরের লোকের পক্ষে ইহারা ভয়ানক। যে পাহাড়ে মহিষ চরে সেখানে কেহ আসিতে পারে না। বিশেষতঃ ইংরাজ ঘোড়সওয়ার দেখিলে ইহারা মহা ক্ষেপিয়া ওঠে।

মহিষ ঘৃত দুগ্ধাদি বা বাসস্থানের জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে ইহাদের কর দিতে হয় না। ইংরাজ নীলগিরি লইবার আগে যেসকল অরণ্যভূমি টোডাদের ভোগদখলে ছিল গভর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থান ইহাদিগকে নিষ্কর দান করিয়াছেন; তবে ইহাতে তাহাদের বিক্রয়াধিকার নাই।

টোডাদের অবস্থা এত স্বচ্ছল, গভর্ণমেণ্টের ইহাদের প্রতি এত অনুগ্রহ—আবশ্যকের অধিক ইহাদের উপার্জ্জন—তথাপি ইহাদের সন্তানাদি নিতান্ত অল্প। যোগ্যজাতিই যে টেঁকসই (Survival of the fittest) এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। প্রতি অরণ্যে ২০।২৫ জনের বেশী টোডা নাই। দূর অরণ্যেও শুনিলাম টোডার সংখ্যা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। টোডারা অত্যন্ত অলস। স্ত্রীলোকের গৃহকার্য্য, এবং পুরুষের ঘৃতাদি প্রস্তুত ও বাজারে ক্রয়বিক্রয় কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কাজ নাই। ইহারা কৃষিকার্য্য সহজেই করিতে পারে কিন্তু করে না। চাকরী কথা ত নিতান্ত অপমানজনক জ্ঞান করে। আসল কথা ইহাদের অন্য কোন কাজের আবশ্যক নাই। ঘৃত বিক্রয়ে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহাতে বেশ বাবুগিরি করিয়া থাকিতে পারে। দুঃখের বিষয়—অর্থের প্রকৃত ব্যবহার ইহারা জানে না। অন্য কোন সভ্যতর জাতি ইহাদের মত স্বচ্ছল অবস্থায় যেরূপ আয়েস আরাম সুবিধা কিনিতে পারিত—ইহারা উপায় সত্ত্বেও তাহা করে না। বন্য ফলমূল, ও দুধই ইহাদের প্রধান আহার। গোধূম চাল ও আলু আজকাল ইহারা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে; মাছ মাংস ইহারা খায় না। অন্যান্য তরী তরকারী মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি সহর হইতে যাহা সহজেই পাইতে পারে তাহাও তাহারা দৈবাৎ কেনে। নূতন গ্রহণের মধ্যে তামাক ও নস্যের আয়েস তাহারা বুঝিয়াছে—আর বুঝিয়াছে ভিক্ষায় আয়েস। দাস্যবৃত্তি তাহারা অপমানজনক জ্ঞান করে কিন্তু ভিক্ষায় অপমান নাই। মেম সাহেবেরা তাহাদের দেখিতে গেলেই তাহারা বক্সিশস্বরূপ কর চাহে,—আমরাও অবশ্য এ দাবী পূরণে বাধ্য হইয়াছিলাম।

টোডার নাচ বড় অদ্ভুত। স্ত্রীলোকে নাচে যোগ দেয় না। ৭।৮ জন পুরুষে মিলিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়ায়,—দাঁড়াইয়া ও হাউ ও হাউ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তালে তালে এক সঙ্গে পা

ফেলিয়া ঘুরিতে থাকে। আসল কথা ইহা আনন্দ নৃত্য নহে। কেহ মরিলে মৃত ব্যক্তিকে লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন কালে, প্রতি গ্রামে সকলে মিলিয়া উক্তরূপে শব বেষ্টন করিয়া ঈশ্বর স্তব করে। গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তখন মৃত দেহ পুনরায় স্বগ্রামে নীত হইয়া তাহার স্বকুটীরে সমস্ত তৈজস অলঙ্কার দ্রব্যাদির

সহিত দগ্ধীকৃত হয়। অধুনা এ প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেহ মরিলে তাহার কুটীর ও দ্রব্যাদি তাহার সহিত ভস্মীভূত না করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কুটীর মধ্যে শবদাহ করা হয় এবং টোডাগণ সকলে মিলিয়া দুই একখানি করিয়া তৈজস পত্রাদি যাহা দান করে তাহাই মৃতব্যক্তির সহিত পোড়ান হয়। শবদাহ হইয়া গেলে পুরুষেরা শড়কি দিয়া ৮।১০ টা মহিষ নিহত করে এবং টোডা নারীগণ সুর করিয়া কাঁদিতে থাকে। ইহারা মাছ মাংস খায় না সুতরাং মহিষ বধ মৃত্যু ভোজের জন্য নহে। মৃত ব্যক্তি লোকান্তরে তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবে ইহাই তৈজসাদি দাহন এবং মহিষ বধের অভিপ্রায়। সুখের বিষয় এইখানেই তাহাদের ইতি পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পত্নীদাহের প্রথা নাই। আমাদের সুসভ্য ভারতবর্ষ এলোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয়, আধ্যাত্মিক ভাবের দোহাই দিয়া সতীদাহেরও প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছিলেন!

আমরা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম—"মরিলে কি হয়?"

"ওস্কনার—অর্থাৎ মহালে কে যায়?"

"ভূতে বিশ্বাস কর?"

"না আমরা জঙ্গলে থাকি—কখনো ভূত দেখি নাই—ভূত বিশ্বাস করি না।"

"মৃত আত্মাকে পূজা কর?"

"না একবার মরিয়া গেলে তাহার কথা আর আমরা ভাবি না।"

এই মৃত্যুৎসব ছাড়া ইহাদের অন্য কোনরূপ উৎসব নাই। এমন কি বিবাহও ইহাদের পর্ব্বদিন নহে। বিবাহে কোন আমোদ প্রমোদ হয় না। বাপ মায়ের কথায় বিবাহ ঠিক হইয়া যায়। এই সম্বন্ধকেই তাহারা বিবাহ বলে। তাহার পর কোন সময় কন্যা স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে।

নীলগিরিতে কোটা, কুড়ুম্বা, ইরুলা প্রভৃতি নামে আরো কয়েক জাতি পাহাড়ি আছে। ইহাদেরমধ্যে কুড়ুম্বারা যাদুকর বলিয়া খ্যাত। ইহারা আরো সুদূর অরণ্যে বাস করে। এদেশের অশিক্ষিত লোকমাত্রেই প্রায় কুড়ুম্বাকে ভয় করে—কেবল টোডারা ভয় করে না। আমাদের ভৃত্য কহিল—"কুড়ুম্বা জাতির পশু বানাইবার ক্ষমতা আছে—ভিক্ষা চাহিলে কেহ যদি না ভিক্ষা দেয় ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে পশু বানাইয়া ফেলে। নিজেরাও বাঘ প্রভৃতির বেশ ধরিয়া লোককে ভয় দেখায়। এইরূপ মানুষ পশুর কেবল লেজ থাকে না, ইহাতেই বুঝা যায় যে সে যাদুপ্রাপ্ত।" নীলগিরির অনেকস্থলে পুরাতন সমাধি দেখা যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্গণ ইহার কোনটাই প্রায় খুঁড়িতে বাকী রাখেন নাই। খুঁড়িয়া ইহার মধ্যে যে সকল দগ্ধ পিত্তল পাত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও মনুষ্যের মৃন্ময়মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে—সকলই তাঁহারা লুট করিয়াছেন। এমন কি অঙ্গার পর্য্যন্ত বাকী রাখেন নাই। সমাধিউদ্ধৃত অনেক মৃন্মূর্ত্তি তাতার উষ্ণীষধারী। কোন কোন মতে এই সকল সমাধি টোডাদিগের সাইথীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের। কিন্তু অবোধ টোডাগণ আপনাদিগের এই উৎপত্তি সম্ভ্রম স্বীকারে অনিচ্ছুক। তাহারা এই সমাধি তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের বলিয়া জানেও না, মানেও না।—তাই অবাধে ইহা খনন ও

লুণ্ঠন করিতে দেয়। টোডাদিগের এবং অনেক স্থানীয় লোকের মতে পাণ্ডিয়া বংশ বহুপূর্ব্বে নীলগিরিতে রাজ্য করিতেন—এ সকল সমাধি তাঁহাদিগেরই। নীলগিরির পুরাতন গভীর জঙ্গলের স্থানে স্থানে যেরূপ ভগ্নাবশেষ দুর্গ চিহ্ন এবং দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়, এবং তৎসংলগ্ন দেব ঋষি ও রাক্ষসের গল্প শুনা যায় তাহাতে ইহা যে বহু পূর্ব্বে আর্য্য নিবাস ছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সম্ভবতঃ পাণ্ডু বংশীয়েরাই এখনি রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহারাই পাণ্ডিয়া নামে খ্যাত। কিন্তু টোডাগণ যদি সেই পাণ্ডিয়াগণেরই বংশধর হয় তবে, ইহাদিগের কি দারুণ পতন? তাহা হইলে উন্নতিও যে কতদূর অবনতিতে পৌঁছিতে পারে ইহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ! কে জানে আমাদেরও একদিন এইরূপ অবস্থা হইবে কি না!

খুনে।

সহরের বাহিরে জেলখানার হাতায় জেল-দারোগার বাসার খিড়কির বাগানে একলাটি খেলা করিতেছিল জেল-দারোগার সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে মিনু। একটা গোল পাথর পায়ের ঠেলায় ফুটবলের মতন বাগানময় গড়াইয়া লইয়া বেড়ানোই তার খেলা।

জেলখানার মতো খিড়কির বাগানও উঁচু দেয়ালে ঘেরা। কিন্তু এক দেয়ালে আটক আছে কত লোকের স্বাধীনতা, কত লোকের নিরানন্দ পাপের বোঝা; আর এ দেয়ালের অন্তরালে আছে শুধু ফুলের হাসি, সবুজ রঙের চোখজুড়ানো বাহার, প্রজাপতির স্বাধীন নাচ, আর মিনুর সরল পবিত্র আনন্দ।

মিনু খেলা করিতে করিতে শুনিল হঠাৎ কিসের শব্দ। চাহিয়া দেখিল একটা লোক খাটো জাঙিয়া, ঢিলা কুর্ত্তি পরা, গলায় পদক আঁটা, শিকারী বেরালের মতো কুঁজো হইয়া বাগানের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

সে লোকটা এদিক ওদিক চাহিয়া যখন দেখিল সেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই, তখন সে ফস্ করিয়া বাগানে ঢুকিয়া পড়িল, আর ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরদিকের খিল লাগাইয়া দিল।

তখন সে সোজা সটান হইয়া দাঁড়াইয়া হাঁপ ছাড়িল—সে নিশ্বাস আরামের, সে নিশ্বাস মুক্তির।

মিনু আজন্ম কয়েদির সঙ্গে পরিচিত, তার একটুও ভয় হইল না। অনেকের সঙ্গে তো তার খুব ভাব ভালোবাসা। এ লোকটাকে সে কিন্তু কখনো দেখে নাই, কাজেই এর সঙ্গে আলাপও ছিল না। সে লোকটার দিকে চাহিয়া দেখিল—লোকটা বেয়াড়া লম্বা চৌড়া প্রকাণ্ড। হাতের থাবা-গুলো গুলতোলা লোহার হাতলের মতো, মুখখানা চৌকো কঠিন অস্থিময়, চোখ দুটো ছোট ছোট, বেরালের মতো ভীষণ আর ধূর্ত্ত। তাহাকে দেখিয়া মিনুর তত ভালো লাগিল না।

লোকটা পিঁজরাভাঙা হিংস্র পশুর মতো

একবার খুব আড়ামোড়া ভাঙিল; একবার মুক্তির সম্ভাবনায় দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, তারপর মিনুর দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

মিনুর আর তাহার দিকে নজর ছিল না। সে একবার তাহাকে দেখিয়া লইয়া আপনার খেলা সুরু করিয়াছিল। সে পাথর ঠেলিতে ঠেলিতে, টলমল করিয়া হেলিতে দুলিতে আসিতেছিল—সে দেখে নাই যে লোকটা তাহার কাছে আসিয়াছে। সে পাথরে ধাক্কা দিতে গিয়া টলিয়া পড়িতেছিল—কিছু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দেখিল সেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে, সে তখন অসঙ্কোচে তাহার কুর্ত্তা ধরিয়া পতন সামলাইয়া লইল।

লোকটা অমনি প্রকাণ্ড জাঁতিকলের মতন হাত দুখানা মিনুর গলার দিকে বাড়াইয়া দিল। মিনু তার সরল চোখদুটি তাহার মুখের দিকে তুলিয়া আদরের স্বরে বলিল—তুমি সরে যাও! আমার পাথর ছিটকে যদি তোমায় লাগে!

সরল বালিকার সোহাগবাণী তাহাকে যেন বাধা দিল। লোকটা হাত গুটাইয়া মিনুর নিকট হইতে সরিয়া গেল।

মিনু লোকটার দিকে ফিরিয়া বলিল—ওগো এস না, আমরা দুজনে খেলি। তুমি হও ভাই মালি, আমি বাবু।

এই বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া একখান কোদাল আনিয়া লোকটার কাছে বাড়াইয়া ধরিল। লোকটা কোদাল লইতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া মিনু বলিল—নেও, তুমি কোদাল নেও—এস আমরা খেলি।

কোদালের চকচকে ধার দেখিয়া লোকটার গোল চোখ দুটো জলিয়া উঠিল, চোখের পাতা মিটমিট করিল। সে আবার তখনি কেমন সঙ্কুচিত হইয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিল—না না, আমার ও চাইনে! আমায় ও দিসনে!

মিনু কোদাল ফেলিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—না, তুমি বড় দুষ্টু! ঘিষ্টু, নানকুয়া ওরা বেশ! আমার সঙ্গে খেলা করে, বাবার কাজ করে। তুমিও এস, খেলবে এস। তুমি মাটি খুঁড়বে না? তবে জল তোল, ডোলের জল নালায় ঢেলে দেও, আমি তাতে নৌকো ভাসাব। এস———।

মিনু তাহার কুর্ত্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে কুপের ধারে লইয়া গেল। সেও যেন কোন প্রবল টানে অসহায়ের মতো একটি বালিকার আকর্ষণ মানিয়া চলিল।

মিনু কুপের পাড়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—দেখ দেখ, জলে আমার ছায়া পড়েছে। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ? ও! তোমার চোখ দুটো অমন কটমটে কেন? না, তুমি অমন করে চেয়ো না, আমার ভয় করে।

এই কাতর কথাগুলি লোকটার কঠিন হৃদয়ে যেন ঘা দিল। সে প্রসারিত হাত দুখানা বুকের উপর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া প্রাণপণ বলে চোখ বুজিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—ওরে অবোধ, তুই ঝুঁকিসনে, কুয়োর কাছে আমায় ডাকিসনে। ওসব দেখলে আমার গায়ে মরণের জর আসে।

মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অতবড় লোকটার ভয়কাতর ভাবভঙ্গি দেখিয়া

খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—দুর বোকা, তোমার ভয় কি, তুমি থাকতে আমি পড়ব কেন ?

সে লোকটা যেই দেখিল মিনু সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাহাকে এক ধাক্কায় কূপের ধার হইতে সে সরাইয়া দিল। তাহার রূঢ় ধাক্কায় মিনুর ভৎসনাভরা দৃষ্টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মিনু ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বলিল—যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! তুমি আমায় মারলে ?

লোকটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার অভিমানের কান্না দেখিল। তাহার সকল কঠোরতা যেন গলিয়া গলিয়া বালিকার অশ্রুরূপে তাহার প্রাণকে ধৌত নির্ম্মল করিয়া দিতেছে। তাহার কণ্ঠ এবার কোমল হইয়া পড়িল, সে বলিল—নে নে, আর কাঁদিসনে! তুই আমায় অমন করে কোদাল দেখিয়ে, কূপ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে, আমি কিছু বলব না। চুপ কর, চুপ কর!

এই সান্ত্বনায় প্রীত হইয়া মিনু অশ্রুজলের ভিতর দিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—তবে আমায় একটা গোলাপ তুলে দেও।

ছোট ছোট ঝোপ গাছে টকটকে লাল গোলাপ ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছিল। লোকটি বাধ্য শিশুর মতো এক থোলো কুঁড়ি ও ফুটন্ত গোলাপ তুলিয়া মিনুর হাতে দিল। মিনু সেই ফুলের তোড়াটি বুকের উপর জামার গায়ে গুঁজিয়া দিল। মিনু হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিল—দেখ দেখ কেমন সুন্দর!

লোকটির মুখ পাণ্ডাশ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ডোঙার মতো বড় দুখানা হাতে তার প্রকাণ্ড মুখ ঢাকিয়া আহত পশুর মতো কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—ওরে ওরে তোর বুকের ওপর ওযে রক্তের মতো লাল—ফ্যাল, ফ্যাল, টেনে ফ্যাল, আমায় আর লোভ দেখিয়ে ক্ষেপাসনে।

মিনু ভয় পাইয়া ফুলগুলি খুলিয়া ফেলিল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

লোকটি চোখ খুলিয়া বলিল—ছি! তুই আবার কাঁদচিস। চুপ কর চুপ কর। আমায় তুই ক্ষেপাসনে, আমিও তোকে কাঁদাব না।

সে তার হাতুড়ির মতন হাতখানা দিয়া মিনুর অশ্রু মুছাইয়া তাহার গালে আদর করিল। সে নত হইয়া মিনুকে চুমু খাইতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে অনেক লোকের ব্যস্ত কোলাহল, দৌড়াদৌড়ি শুনা গেল।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন লোকটা তড়াক করিয়া সোজা হইয়া উঠিল। তারপর এক-লাফে বাগানের এক কোণে গিয়া লুক্কায়িত হইল।

বাহির হইতে কে কপাটে ঘা দিয়া ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—মিনু, তুই কোথায় ?

"বাবা, আমি এখানে।"

"খোল্ খোল্, দরজা খোল।"

"দরজায় যে খিল দেওয়া।"

"আরে খিলই খোল না।"

"খিল যে উঁচুতে,আমি নাগাল পাই না।"

"তবে দিলি কেমন করে ?"

"আমি দিয়েছি বুঝি—খিল তো ও দিলে।"

বাহির হইতে ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ও কে রে ?

মিনু বলিল—ও একজন কয়েদি, আমি ওর নাম জানিনে।

বাগানের কোণ হইতে একটা দুঃখ-বিরক্তি-মিশ্রিত হতাশার শব্দ মিনুর কানে গেল। ফিরিয়া দেখিল কয়েদি সামনের দিকে হেলিয়া গুঁতাইতে উদ্যত গোক্ষুর ভঙ্গিতে কোদাল উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিনু তাহার সেই ভাব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, তুমি অমন করে থেকো না—ওগো তুমি আবার ক্ষেপে উঠলে কেন?

এতক্ষণে বাহির হইতে দরজা ভাঙিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছিল। মিনু ছুটিয়া কয়েদির কাছে গিয়া তাহার কোর্ত্তা ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—এস লক্ষ্মীটি, দরজা খুলে দেও - ওরা যে দরজা ভেঙে ফেললে! তুমি কোদাল ফেলে দেও, নইলে আমি আবার কাঁদব!

কয়েদি মিনুর মিনতিভরা চোকের দিকে চাহিয়া দেখিল—ছুটি বিন্দু অশ্রু তরল মুক্তার মতন টলটল করিতেছে। কয়েদি সটান হইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুনিশ্চিত পশুর মতো কাতর শব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া কোদাল ফেলিয়া দিল। তাহার সেই চৌড়া বুকখানার মধ্যে যে বিষম তোলপাড় হইতেছিল তাহাতে যেন তাহার বুকখানা এখনি ফাটিয়া যাইবে। মিনু কিন্তু তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো টানিয়া দরজার কাছে আনিয়া বলিল—দরজাটা খুলে দাও।

কয়েদি একবার খিলের দিকে চাহিল, একবার মিনুর মিনতিভরা চোখের দিকে চাহিল, একমুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্তত করিল, তারপর সে দরজার খিল খসাইয়া দিয়া স্তব্ধ-ভাবে মিনুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দরজা খোলা পাইয়া তিনজন পাহারাওলা বাঁধভাঙা জলের মতো ছুটিয়া বাগানে ঢুকিয়া কয়েদিকে ধরিল। সে বন্দী বাঘের মতো আপনার বলের গর্ব্বে দৃপ্তভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো বাধাই দিল না।

জেল-দারোগা তাড়াতাড়ি আসিয়া কন্যাকে বুকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিল, যেন সে হারানো রত্ন ফিরিয়া পাইল।

পাহারাওলারা কয়েদিকে লাথি কিল চড় ধাক্কা গুঁতো মারিতে মারিতে জেলখানায় লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মিনুর কোমল প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা, ওকে মারতে বারণ কর।

জেল-দারোগা কন্যাকে বুকে চাপিয়া বলিল—ওর জন্যে কাঁদিসনে, ও খুনে ডাকাত!

এ কথাতে মিনু কিন্তু কোনো সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইল না।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্য্যকরী শিক্ষা।

জীবনের কর্ত্তব্যকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম্মের উপযোগী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। স্কুল শিক্ষা ও জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মোপযোগী শিক্ষার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা কর্ত্তব্য ইহা বহুদিবস হইতে ইয়োরপের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ পরিস্ফুরণ, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষসাধন, স্মৃতিবৃদ্ধি এবং যুক্তি শক্তির উন্নতি বিধানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবনের বাস্তব কার্য্যের সহিত স্কুল শিক্ষার কোনরূপ সম্বন্ধস্থাপন তাঁহারা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

কিন্তু এই দ্বিবিধ শিক্ষার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন আধুনিক পণ্ডিত সাধারণের অভিমত। সেই নিমিত্ত ইদানীং পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই মনোবৃত্তি প্রস্ফুরণকারী শিক্ষার সহিত কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে অর্পিত সময়ের কিয়দংশ লাঘব করিয়া তাহা আধুনিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে; জ্যামিতি অধ্যয়নের সঙ্গে জ্যামিতি বিষয়ক অঙ্কন এবং ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্রের শিক্ষার সহিত ধনবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির খর্ব্বসাধন না করিয়া হয় নাই। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের চিন্তা রাশির সমন্বয় করিয়াই আজকালিকার বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালেও ইয়োরপে প্রাচীন সাহিত্য কেবলমাত্র মানসিক উন্নতির জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত না; যাঁহারা গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেন, এবং যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি পৃথিবীর সকল স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বাক্যের আদান প্রদান করিতেন, কার্য্যোপযোগী বলিয়াই তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন—মনোবৃত্তির উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।

প্রাচীনকালে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিবিধান জাতীয় গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত না। য়িহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্য জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। গ্রীক ও রোমানগণ দক্ষনাগরিক ও রাজনৈতিক সৃষ্টি করাই গৌরবকর বিবেচনা করিতেন। মধ্যযুগে শিক্ষিত সম্প্রদায় গির্জ্জা ও দৈহিক সামর্থ্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। কাজেই পুরাকালে প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত ছিল। অশিক্ষিত ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন শিল্পচর্চ্চা আবদ্ধ ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য চলিত তখন দ্রব্য বিনিময়ে। শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্য হেয়জ্ঞান করিতেন। গ্রীস এবং রোমে কার্য্যকরী ব্যবসা আদৌ আদৃত হইত না, সুতরাং সাধারণ শিক্ষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি পেন (Mr. Payne) বলিয়াছেন যে, মনুষ্যকে শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ক কার্য্যের উপযোগী করাই সমুদায়

ঐতিহাসিক যুগের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতই শিক্ষা-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিক্ষা এবং মানজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের মধ্যে বরাবরই সম্বন্ধ স্থাপিত; দেশকাল ভেদে শিক্ষা স্বতন্ত্র হইলেও ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সমাজের উপযোগী ছিল।

প্লেটো তাঁহার "রিপাব্লিক গ্রন্থে" অতীব অবাস্তব শিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ বিষয় কর্ম্মে সহায়তা প্রদান জন্য নহে। গণিত ও জ্যামিতি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বিধান। অথচ সেই "রিপাব্লিক" গ্রন্থেরই প্রধান উদ্দেশ্য নাগরিকগণকে রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা। এই অর্থে প্লেটোর শিক্ষা ব্যবসায়মূলক এবং জীবনের দৈনন্দিক কর্ম্ম পরম্পরার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। অতএব দেখা যাইতেছে যে প্লেটোর শিক্ষারও মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনোবৃত্তি নিচয়ের উৎকর্ষ বিধান নহে; পরন্তু মনুষ্যকে রাজ্যের উচ্চকার্য্য সমূহ সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা।

প্রাচীন রোমে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্লেটোর "রিপাব্লিকে" সূচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র। বাগ্মিতা অভ্যাস করিবার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন রোমে সাধারণতঃ তদনুযায়ী শিক্ষাই প্রদত্ত হইত! খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রোমে কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা আমরা কুইনটিলিয়ানের (Quintilian A. D. 35-95) প্রসিদ্ধ শিক্ষা বিজ্ঞান হইতে জানিতে পাই। সুবক্তা হইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তিনি তাঁহার পুস্তকে কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

মধ্যযুগে সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায় 'চার্চ্চের' সভ্য ছিলেন এবং যাঁহারা 'ষ্টেটের' কর্ম্ম পছন্দ করিতেন তাঁহাদিগকেও চার্চ্চের সভ্য-মণ্ডলীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। সে কালে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল—সমুদয় শিক্ষারই বাইবেলের সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের মধ্যে যথেষ্ট লাটিন এবং সামান্য গ্রীক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আস্‌-চামের (Ascham) সুপরিচিত গ্রন্থে মধ্য-যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে। অস্কার ব্রাউনিং (Mr Oscar browning)। বলেন যে, প্রাচীন সাহিত্য তখন বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জনের জন্য পাঠ্য ছিল না,—সৌখিন কলাবিদ্যা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্ব্বকালে শিক্ষা ও বাস্তব কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন। আইন, ঔষধ, এবং ঈশ্বরতত্ত্ব তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রফেসার লরি (Lauric) তাঁহার "বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে আলো-চনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেলার্ণো (Salrno) বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ ঔষধ শিক্ষাগার এবং বলোগনা (Bologna) বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন শিক্ষাগার ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শিশু বিদ্যালয় সমূহ যে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রালোচনার

আলয় ছিল তাহা নহে; অধিকন্তু ব্যবসায় ও সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে লাটিন ভাষা প্রাচীনকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস্তব কর্ম্মের উপযোগী ছিল এবং তজ্জন্যই শিক্ষা-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণ লাটিন শিক্ষার এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক লেখক বলিয়াছেন "আমরা লাটিনের দাস। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে হইলে গ্রীক ও মুসলমানগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলির জন্য—কখন ঈদৃশ সম্পদ্ রাখিয়া যাইতে পারিতন না"। লক সাহেব (Locke) বলেন যে সন্তানকে ব্যবসায়ের উপযোগী করিতে হইলে তাহাকে লাটিন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া বৃথা অর্থব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক বিষয় কিছুই হইতে পারে না; কারণ ব্যবসায়ের জন্য লাটিন শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই।

সেকালে ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও আইন অধ্যয়ন আদরণীয় ছিল, এবং শিক্ষাবিভাগের উপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধিক আধিপত্য ছিল বলিয়া স্কুলে প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে দু'চার জন সংস্কারকের চেষ্টা কিছুই করিতে পারে নাই। শব্দশিক্ষা অপেক্ষা বস্তু শিক্ষার উপকারিতা বহুপূর্ব্বে উপলব্ধি করিলেও সে সময়ে সেরূপ শিক্ষার উপযোগী কোন নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সেই শৈশবাবস্থায়—ইহা বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের শিক্ষোপযোগী হইবে—এ আশা কেহই করিতে পারেন নাই।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে লক বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির কার্য্য এরূপ সূক্ষ্ম ও বোধ শক্তির অগম্য যে ইহাকে কখনও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিজ্ঞানে পরিণত করা যাইবে না। এমন কি রুসো—যিনি তাঁহার এমিলেতে (Emile) শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন এবং মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সহিত তুলনায় পুঁথিগত বিদ্যার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন—তিনিও প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির তখন কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারেন নাই। রুসো যে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা সে সময়ের উপযোগী ছিলনা। কারণ সেকালে কার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহা খাটাইবার উপায় ছিল না; অধিকন্তু পুঁথিগত বিদ্যাই মান সম্ভ্রম প্রদান করিত। কাজেই বস্তুগত শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ সাধারণের নিকট আদরণীয় হয় নাই। কিন্তু রুসো ঠিকই বুঝিয়াছিলেন; এক্ষণে সকলে তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতেছেন এবং বলিতেছেন, যে, বাহ্য জগতের সহিত মনোবৃত্তিনিচয়ের সুস্পষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনেই বৃত্তিসমূহের প্রকৃত উন্নতি। হারবার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন যে মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; —এবং ইহা করিতে হইলে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় কর্ম্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ থাকা একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষা-ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের

প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী ও তাহার উদ্দেশ্য, এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণের অভিমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, আবহমানকাল হইতে বাস্তব কর্ম্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য বহুবিধ চেষ্টাও হইয়াছে। শিক্ষা দেশ কাল ভেদে বরাবরই সমাজের উপযোগী ছিল। কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন শিক্ষা প্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বের সমাজ ও আধুনিক সমাজ এক নহে, ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন আর দ্রব্য বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় চলে না; শিল্প ও বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বহুবিধ শিল্পব্যবসায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। নানারূপ কলকারখানার সৃষ্টি হওয়ায় আজকাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে—এক্ষণে এক মাসের পথ এক দিবসেই যাওয়া যায়, স্থানের দূরত্ব আর পূর্ব্বের ন্যায় সময়াপহারক নহে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে; আজকাল একস্থানে বসিয়া নিমেষমধ্যে সমস্ত পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও টেলিগ্রাফ স্থান ও সময়ের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তননিবন্ধন এক্ষণে শিল্প ও বাণিজ্য স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালিত হইতেছে। ইদানীং এমন অনেক নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে পরিচালিত করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসাবাণিজ্য করিতে হইলে আজকাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন।

অতএব আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কার্য্যের উপযোগী করিতে হইলে এখন আর অতীতকালের শিক্ষা প্রণালী বজায় রাখিলে চলিবে না; সমাজের নূতন নূতন আবশ্যকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা-প্রণালীরও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সুখের বিষয় দেশের লোকে অল্পবিস্তর পরিমাণে ইহা বুঝিয়াছেন। শিল্পশিক্ষা ব্যতিরেকে এক্ষণে আর ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে, ইহা দেখিয়া অনেকেই শিল্পশিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া বালক বালিকাদিগকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সাধারণের দিন দিন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে; ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্যোগ এবং শিল্পবিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠার-দিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে। তথাপি এখনও আমাদের অভাব বিস্তর। কর্ম্মক্ষেত্রের সকলরূপ বিভাগে প্রবেশ পথ যতদিন না উন্মুক্ত হয় ততদিন এই আগ্রহের অনুরূপ ফললাভে আমরা বঞ্চিত। এপক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায় শিক্ষকের অভাব। জ্ঞান প্রচারের দিকে আমাদের যেমন লক্ষ্য পড়িয়াছে সেই সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষার সকল বিভাগেই শিক্ষক প্রস্তুতের চেষ্টারও আবশ্যক।

যোগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি হইতে এতদুদ্দেশ্যে ইয়োরোপ জাপানে মধ্যে মধ্যে ছাত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, সম্প্রতি বেঙ্গল শিল্পবিদ্যালয় হইতেও সাতজন যুবক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা পাইবার জন্য আমেরিকায় গিয়াছেন; ইহা অতিশয় সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের পক্ষে এই আয়োজন একদিকে সামান্য —অন্যদিকে আবার যাঁহাবা বিদেশ হইতে শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন তাঁহারাও সকলে দেশসেবাই ব্রতরূপে গ্রহণ করিতেছেন না! বস্তুতঃ যেদিন আমরা দেখিব বঙ্গের ফার্গুসন কলেজের ব্রতধারী শিক্ষকগণের ন্যায় বঙ্গদেশেও বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষকগণ অনন্য চিন্তাহীনভাবে শিক্ষাদানে নিযুক্ত সেইদিন বুঝিব আমাদের ন্যাসানেল কলেজ বা শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সার্থক।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ইংরাজের স্বদেশ-প্রেম।

মোগল পাতসাহদিগের রাজত্বের অবসানকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট তখন নামে সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইতেন। তাঁহার হস্ত হইতে শাসন-বল্গা বিচ্যুত হইয়াছিল। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতে অথবা কার্য্যকুশলতার অভাবে গৃহের সর্ব্বত্রই যেরূপ বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়, মোগল পাতসাহদিগের অকর্ম্মণ্যতায়, দৌর্ব্বল্যে ভারতবর্ষের রাজ্যনিচয়ের তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। তখন সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কাজেই গৃহ-বিবাদাগ্নি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশ ইংরাজবণিকদলের ক্রমেই করতলগত হইতেছিল। তথায় ইংরাজের প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ করিবার আর কেহই ছিল না। উত্তর-পশ্চিমের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ হইয়াছিল। দিল্লির সম্রাট কখন মুসলমান রাজদ্রোহীর, কখন মহারাষ্ট্রীয় নরপতির হস্তে ক্রীড়ণকস্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার মানসে কেবল যে ইংরাজ ও ফরাসী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা নহে; দেশীয় রাজন্যবর্গও স্বাধীনভাবে দাক্ষিণাত্য গ্রাসের চেষ্টা করিতে বিরত হন নাই। পঞ্জাবে শিখের বল প্রবল থাকিলেও অরাজকতার অভাব ছিল না।

ভারতবর্ষের এবংবিধ অবস্থায় য়ুরোপ হইতে দলে দলে শ্বেতাঙ্গ আগমন করিতেন। ভারত রত্নপ্রসূ বলিয়া চিরকাল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে রত্নাহরণ করা সুবিধাজনক, ইহা অনেকেই অনুমান করিয়া—স্বদেশে উপেক্ষিত অবস্থায়, দৈন্যদশায়, অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষে ভাগ্য পরীক্ষার্থ আগমন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ ভাবিয়া—কোনরূপে ভারতে পদার্পণ করিতে প্রয়াসী হইতেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদিগের অধিকাংশেরই আশা পূর্ণ হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা যে সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি, ভারতবর্ষে তদ্রূপ দুঃসময় পূর্ব্বে কখন উপস্থিত হয় নাই। স্বল্পবুদ্ধি নৃপতিরা সে সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীর বল অনুভব করিতে পারিয়াও, আগন্তুক "ভবঘুরে" শ্বেতাঙ্গদিগের কল-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা সৈনিক-বিভাগ অলঙ্কৃত করিতে বিরত হন নাই। তাঁহারা এই শ্রেণীর শ্বেতচর্ম্মীর সাহায্যে পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদে মত্ত হইতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এই অন্তর্ভেদে তাঁহাদিগের রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষা কখনই ফলবতী হইবে না। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য, বলদৃপ্ততা তখন কাহারও অগোচর ছিল না। সেই সর্ব্বগ্রাসিনী ক্ষমতা প্রতিহত করণ মানসে দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সমবেত না হইয়া আত্মকলহে মত্ত হইলেন, পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন।

দেশীয় নরপতিদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি সিন্ধিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হোলকার প্রবল প্রতিপক্ষ সিন্ধিয়াকে দমন করিবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকিতেন। সিন্ধিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রধান কারণ, তাঁহাদের অধীনে যেরূপ শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি পরিচালিত সুশিক্ষিত সৈন্যদল ছিল, হোলকারের তাহা ছিল না। তখন পূর্ব্বোক্ত "ভবঘুরে" শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবর্ষে আসিয়াই দেশীয় নৃমণিদিগের অধীনে সৈন্যবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। দেশীয় রাজাদিগেরও বিশ্বাস ছিল, সেনাদলের সুশিক্ষায়, শৃঙ্খলা স্থাপনে শ্বেতাঙ্গদিগের ন্যায় দেশীয় সেনা-নায়কেরা নিপুণ নহেন। এরূপ ধারণা যে ভিত্তিহীন ছিল, তাহা নহে। বস্তুতঃ সে সময়ে যে রাজার অধীনে যত শ্বেতচর্ম্মী সেনানায়ক থাকিতেন, এবং তাঁহাদিগের পরিচালিত সৈন্যবল যত অধিক থাকিত, সেই রাজারই বল সেই পরিমাণে অধিক হইত। হোলকারের উপর সিন্ধিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব এই নিমিত্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই ত গেল আভিজাত্যবর্গের কথা। তাহার পর ভারতবাসী যোদ্ধৃগণের কথা। ইহাদিগের স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রীতি আদৌ ছিল না। যেখানে অর্থাগমের অধিকতর সুবিধা হইত, সেইখানেই ইহারা গমন করিয়া সৈন্যদল পুষ্ট করিত। ভারতবাসী কৃতঘ্ন নহে বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই সময়ে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। "নিমকহারামী" তখন দোষের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। ইহারা আজ যাঁহার "নিমক" খাইত, কল্য আবার তাঁহারই বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইত না। সে সময়ে পিতা পুত্রে, সহোদরে সহোদরে, জ্ঞাতি কুটুম্বে ভিন্ন ভিন্ন দলের পক্ষভুক্ত হইয়া রণাঙ্গনে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনায় ক্ষান্ত হইত না। এতদপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

যশবন্ত রাও সে সময়ে হোলকারের রাজ-সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনানায়ক মেজর আর এল এমব্রোস বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরদিগের চেয়ারম্যানকে এই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থার সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহার অংশবিশেষের অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইংরাজি পত্রের মর্ম্মানুবাদ।*

যখনই সিভ্যালিয়ার ডুডারনেগ এবং মসিঁয়ো প্লুমের কথা হোলকারের মনোমধ্যে উদিত হইত, তখনই তিনি ফরাসীদের নামে ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারা যায় না। কারণ উক্ত সৈনিকপুরুষদ্বয়কে তিনি সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অথচ উহারা সিন্ধিয়া-সেনার আগমনের পূর্ব্বেই, উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী এবং পদাতিক সেনাসহ, রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতেই সিন্ধিয়ার নিকট হোলকারকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। হোলকার উক্ত ফরাসীদ্বয়ের ব্যবহারে এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, ফরাসী দেশেরও নামোচ্চারণকালে তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। তদনন্তর তাঁহার অধীনে যে সকল (Brigades) গঠিত হইয়াছিল, সেই সকল সেনাদলের সেনাপতিগণকে তিনি বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন উক্ত "দাগাবাজ" (বিশ্বাসঘাতক) জাতির কোন লোককে আর সৈন্যপদে বরণ করা না হয়।

"যাহারা প্রাচ্য দেশের (ভারতের) অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে, সে দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, সুবিধা পাইলেই, এক রাজার অধীনে

" Holkar detested—justly detested—the name of a Frenchman, when he reflected that by the Chevalier Dudernaigue and Morsieur Plumet, to whom in the first instance he was deserted on the near approach of Scindia's army and left with his infantry, deprived of officers, to the defeat which he experienced at Indore. So highly irritated was he, that he never mentioned the country without signs of abhorence, and it was his express order to the commanders of brigades subsequently appointed, that on no account whatever should they afford employment to individuals of a nation by him entitled the *Duggerbaz*, or Faithless.

It is well known, to those conversant with the affairs of the East, that there are in that country many hundreds of thousands, soldiers by profession, who wander continually from service to service, from prince to prince, as the pressure of the moment requires there assistance and promises them employment. Gain is their God, and it is perfectly immaterial to them to whom they serve, while they are paid, and the *minutiæ* of their caste attended to. That an ulter stranger, with effecient funds, might at any times raise an army in Hindustan, who would follow him and fight his battles as long as his resources were sufficient for the current expenses of the day. Born soldiers, without any other profession than that of arms, these men eagerly flock to the standard of any adventurer, however desperate his prospects, if he only possesses then *summum bonum* of their happiness. In the minds of these people no such sentiment as *amor patriæ* is to be founded, above affection for a few clods of earth or stumps of trees, merely from their having been imprinted on their recollection from the sportive period of infancy. The Indian is, in this point, a citizen of the world. It not unfrequently happens that fathers, sons, and brothers embrance different service, and meet in battle array on the ensanguined plain aganst each. other, perhaps unwitting by to fall by each other hands".

চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রাজার অধীনে চাকুরী পাইবার জন্য, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। অর্থই তাহাদিগের উপাস্য দেবতা। তাহারা কাহার অধীনে কি কার্য্য করিতেছে, তাহা আদৌ ভাবে না, জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অর্থলাভ করিতে পারিলেই তাহার কৃতার্থ হইত। এমন কি, যদি কোন ভিন্নদেশীয় লোকও (অর্থাৎ ভারতবাসী নহেন) সৈন্যদিগের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহকরণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও সৈন্যবল গঠন কোনরূপে দুষ্কর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই সকল সৈন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ইহারা জন্মাবধিই যোদ্ধৃপুরুষ, অস্ত্রচালনা ব্যতীত অন্য ব্যবসায় জানে না। অসাধ্য সাধনার্থও যদি কেহ ইহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করান্, অর্থ পাইলে, ইহারা তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহাদিগের "স্বদেশ প্রেম" বলিয়া কোন বৃত্তি নাই, কেবল বাল্যের ক্রীড়াভূমি পাদপশ্রেণী-পরিশোভিত কয়েকটা মৃত্তিকাখণ্ড ইহাদিগের হৃদয়ে সময়ে সময়ে প্রীতিপূর্ণ স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। এই বিষয়ে ভারতবাসীকে জগদ্বাসী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখ স্বজননিচয় ভিন্ন ভিন্ন লোকের অধীনে পদগ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না; এমন কি, একের হস্তে অন্যের নিধনপ্রাপ্তিও যে বিরল ঘটনা এমনও নহে।"

ভারতের এবংবিধ অবস্থার সময়, আর্মষ্ট্রং নামক জনৈক ইংরাজ সৈনিকপুরুষ হোলকারের সেনাবিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। আর্মষ্ট্রং মেজরের পদে উন্নীত হন। ডুডারনেগ এবং প্লুমে নামক হোলকারের ফরাসীসেনাপতিদ্বয় যখন সিন্ধিয়ার সেনাগমন দেখিয়া ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় স্বদলে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল—অন্নদাতা প্রভু হোলকারের সর্ব্বনাশ সাধনে ইতস্ততঃ করিল না—তখন হোলকার গত্যন্তর না দেখিয়া আমষ্ট্রংকে মেজর প্লুমের পদে নিযুক্ত করেন। পাঠক! উপরি-উদ্ধৃত পত্রের অনুবাদ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ডুডারনেগ ও প্লুমের বিশ্বাসঘাতকতায় হোলকার সমগ্র ফরাসী-জাতির উপর কিরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন; এমন কি; উহাদিগকে "দাগাবাজ" বলিয়া অভিহিত করিতেও বিরত হন নাই।

যাহা হউক, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোলকারের অনুকম্পায় তদীয় দ্বিতীয় সৈন্যদলের অধিনায়কের পদে মেজর আর্মষ্ট্রং বরিত হইয়া সেই বৎসরেই পুণার যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মেজর আর্মষ্ট্রংএর কার্য্যকাল দীর্ঘ হয় নাই। কারণ পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮০৩ সালে ইংরাজ-কোম্পানীর সহিত হোলকারের যুদ্ধ বাধে। হোলকারের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার অর্থে পুষ্ট ইংরাজ সেনানীবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, "নিমকহারামী" করিবে না। কিন্তু তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রমপূর্ণ, কার্য্যকালে তিনি তাহার প্রমাণ পাইলেন। হোলকার স্বয়ং ভারতবাসী। সুতরাং তদানীন্তনকালের ভারতবাসীর ন্যায় তাঁহারও স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির মর্ম্মাবগত

হইবার শক্তি ছিল না। যাহার বলে ইংরাজ জাতি আজি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেমিকতা আবহমান-কাল ইংরাজের অস্থিমজ্জায় সংবদ্ধ হইয়া আছে। কাজেই ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যখনই হোলকারের বিবাদ বাধিল, তখনই হোলকারের ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীরা পদ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইংরাজ চরিত্রের এই মহত্ত্ব হোলকার বুঝিতে পারিলেন না, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ভাইকার্স, ডড এবং রায়েল নামক ইংরাজসৈনিক কর্ম্মচারীদিগের প্রাণসংহারে আদেশ দিলেন। মেজর আর্মষ্ট্রং ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বদেশের পতাকার বিরুদ্ধে কখনই অস্ত্রধারণ করিবেন না স্থির করিলেন। বহুকষ্টে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি হোলকাব রাজ্য হইতে অবশেষে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহত্ত্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত মাসিক বারশত টাকা পেন্সন ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় ইংরাজ ও ভারতবাসীর চরিত্রের পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মেজর আর্মষ্ট্রং প্রভৃতির ন্যায় ভবঘুরে ইংরাজ স্বদেশে উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া, উদরপূর্ত্তির দায়ে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হয়। অথচ তাঁহারা স্বপ্নেও স্বদেশদ্রোহিতা করিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই, প্রাণপাত করিয়া স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন। আর ভারত-বাসী—স্বদেশে থাকিয়া, স্বজাতির অন্নে পুষ্ট হইয়া, স্বদেশদ্রোহী হইয়া, আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রভৃতির কণ্ঠচ্ছেদে পশ্চাৎপদ হয় নাই। তুলনায় আলোচনা করিলে বলিতে হয়, একটি স্বর্গের দৃশ্য, অপরটী রৌরবের জঘন্য নিকৃষ্ট চিত্র। যাঁহার চক্ষু আছে, যাঁহার হৃদয় আছে, তিনিই ইংরাজের এই গুণ দেখিতে পান, ইংরাজের এই চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সুশ্রুত।

কি ঐহিক বিষয়, কি আধ্যাত্মিক বিষয়, কি বিজ্ঞান, কি জ্যোতিষ, যেদিকে দৃষ্টিপাত করি হিন্দুজাতির অপার ভূয়োদর্শন ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হই; অপিচ আমিও যে এই জাতি সমুদ্রের একটী কণামাত্র ইহা মনে করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করি। সুশ্রুত কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরির জনৈক শিষ্য। গুরুপ্রোক্ত শল্যতন্ত্র বা ক্ষারদাহন ও অস্ত্রনিষ্পন্ন চিকিৎসাশাস্ত্র ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহাই কালক্রমে সুশ্রুত নাম ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম হইতে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব-

বেদের উপাঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই আয়ুর্ব্বেদ স্বয়ম্ভু এক লক্ষ শ্লোকে ও সহস্র অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন। ইহাতে অষ্ট বিষয়ের উল্লেখ আছে; ইহাই চিকিৎসা শাস্ত্রের অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে—যথা শল্য, শাল্যাক, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজিকরণতন্ত্র।

যে সুশ্রুত সংহিতা আমরা দেখিতে পাই ইহা ভগবান সুশ্রুতের রচিত নহে। ইহা নাগার্জ্জুন নামক জনৈক নৃপতি দ্বারা প্রতিসংস্কৃত সুতবাং সুশ্রুতের ছায়ামাত্র। সুশ্রুত সংহিতার টীকাকার ডল্বন ইহা লিখিয়াছেন। প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন এবং বাগ্‌ভট ও আভাষে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন যথা:—

ঋষিপ্রণীতে ভক্তিশ্চেন্মুক্ত্বা চরক সুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাকিংন পঠ্যন্তে তস্মাদ্‌গ্রাহ্যং সুভাষিতং।
(অষ্টাঙ্গ হৃদয়)

অর্থাৎ যদি ঋষি প্রণীত গ্রন্থে ভক্তি থাকে তাহা হইলে চরক সুশ্রুত পরিত্যাগ করিয়া ভেল লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত সুতরাং যাহা সুভাষিত তাহাই সুধিগণের গ্রহণীয় হইয়া থাকে।

অপিচ চরক সুশ্রুতের টীকায় টীকাকারগণ বৃদ্ধসুশ্রুত হইতে প্রমাণস্বরূপ বচন উদ্ধার করায় বুঝা যাইতেছে সুশ্রুত ঋষির গ্রন্থ তাঁহাদের সময়ে সংসারে বিরাজিত ছিল—তখনও তাহার লোপাপত্তি ঘটে নাই।

বিজয় রক্ষিত মাধবনিদানের জ্বরটীকায় লিখিয়াছেন—"পুষ্পেভ্যোগন্ধরজসী,—জস্যেভ্যো যথানিলঃ ইত্যাদিনা বৃদ্ধসুশ্রুতেন পঠিতং—তৃণপুষ্পাখ্যং জ্বর মত্রৈবান্তর্ভাবয়তি।" অর্থাৎ পুষ্প হইতে গন্ধ ও পরাগ এবং অগ্নি হইতে যেমন বায়ু বৃদ্ধ সুশ্রুতের এই বচন দ্বারা সেইরূপ তৃণপুষ্পাখ্য জ্বরের বিষয় প্রকাশ পাইতেছে।

সুশ্রুত যে hay ও malaria fever জানিতেন ইহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ইহা সুশ্রুত সংহিতাতে নাই।

চক্রদত্তের বাতব্যাধিপ্রোক্ত শাল্বন স্বেদের টীকায় শিবদাস লিখিয়াছেন—

বৃদ্ধ সুশ্রুতে তু কাকোল্যাদি যথা—
কাকোল্যৌ মধুকামোদে জব কর্ষভকৌ সহে।
ঋদ্ধির্বৃদ্ধিস্তু শাক্ষীরী পুণ্ডরীকাং সপদ্মকং।
জীবন্তী সামৃতাশৃঙ্গী মৃদ্বীকাচেতি কুত্র'চৎ।
কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ॥

সুশ্রুতসংহিতা সূত্রস্থান ৩৯ অধ্যায়ে ইহা গদ্যে আছে।

বৃন্দের সিদ্ধযোগ অর্শাধিকারে পিপ্পল্যাদি তৈল টীকায় শ্রীকণ্ঠ বলেন—"বৃদ্ধ সুশ্রুতেতু তৈলেঽস্মিংশ্চতুগুণং তোয়ং দর্শিতং"।

অতএব দেখা যাইতেছে নাগার্জ্জুন প্রতিসংস্কার করিতে গিয়া বৃদ্ধ সুশ্রুতকে নূতন করিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মনোহর পদ্যগুলি ভাঙ্গিয়া গদ্যাকার প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুর দৃষ্টিতে ইহা ভাল হয় নাই।

বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতা ছয় ভাগে বিভক্ত যথা—সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান, ও উত্তরতন্ত্র। সূত্র ও শারীর স্থানের অধিকাংশ গদ্যে লিখিত মধ্যে মধ্যে 'ভবতি ভবতঃ ভবন্তি চাত্র' বলিয়া এক দুই বা অধিক ছত্র পদ্যের উদ্ধার আছে। বোধ করি ইহাই বৃদ্ধ সুশ্রুতের প্রতি সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ। নিদান ও চিকিৎসা স্থানের

অধিকাংশ পদ্য, অল্প গদ্য। আমার মতে এই পদ্যের অল্প বিস্তর বৃদ্ধ সুশ্রুতের বচন হইতে পারে। কল্প ও উত্তর তন্ত্র সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত। ইহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক রচিত। ভাষা মার্জ্জিত প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট, বিষয় মনোহারী;—পাঠে পুরাকালের অনেকানেক তত্ত্বের অবগতি হয়। যাঁহারা ইহা একবার পড়িয়াছেন তাঁহারা ভগবান ধন্বন্তরির অসীম জ্ঞানরাশির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। আর যে ধৃষ্টবুদ্ধিগণ আধুনিক ইউরোপায় চিকিৎসার বহুমান করিয়া নিজের বস্তুকে অকিঞ্চিৎকর মনে করেন তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পাঠ করিলে নিজের দুর্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়া লজ্জিত হইবেন!

আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশ স্বীয় নামে যে তন্ত্র প্রণয়ন করেন তাহা পরবর্ত্তী কালে চরক ঋষি কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরক নাম ধারণ করিয়াছে। এই চরকে যে অভাব ছিল তাহা পঞ্চনদবাসী বিদ্বান দৃঢ়বল পূরণ করেন এবং কল্প ও সিদ্ধিস্থান গুলিও সংযোজিত করিয়া দেন—যথা

অস্মিন্ সপ্তদশাধ্যায়াঃ কল্প সিদ্ধয়ঃ এব চ।
নাস্বাদ্যন্তেঽগ্নিবেশস্য তন্ত্রে চরক সংস্কৃতে॥
অখণ্ডার্থঃ দৃঢ়বলোজাতঃ পঞ্চনদেপুরে।
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যো বিশেষাচ্ছবলোচ্চয়ং।
সপ্তদশৌষধাধ্যায়ান্ সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ।

চরক চিকিৎসাস্থান ৩০ অধ্যায়!

অর্থাৎ—চরক সংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রে ১৭ অধ্যায়ে পূর্ব্বকল্প ও সিদ্ধি সন্নিবিষ্ট ছিল না তাহা পঞ্চনদবাসী দৃঢ়বল চরক সম্পূর্ণ করিবার জন্য যোজনা করিয়াছেন।

ইনি নিজের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, নাগার্জ্জুন তাহা করেন নাই; কেন ইহা জিজ্ঞাসিত হইতে পারে?

নাগার্জ্জুন জনৈক বৌদ্ধনৃপতি ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীমতে ইনি কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর রাজ্যকালে প্রাদুর্ভূত হন এবং সেই সময় বৌদ্ধগণ প্রবল হওয়ায় কাশ্মীরও শাসন করিয়াছিলেন যথা,—

আবিভুবাভিমন্যুঃ শতমন্যুরিবাপরঃ।
তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধাঃ দেশে প্রবলতাংযযুঃ।
নাগার্জ্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্ত্বেন পালিতা।

এই বিদ্বান নাগার্জ্জুন মহাযান নামক বৌদ্ধধর্ম্ম পদ্ধতি নিয়ামকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং ইঁহার প্রতিসংস্কারের অধীনে পড়িয়া বৃদ্ধ সুশ্রুত মাংসবর্জ্জিত কঙ্কালে পরিণত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে হিন্দুর নিকট বৌদ্ধগ্রন্থের যে বিষম পরিণামের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, বৌদ্ধপ্রভাবকালে হিন্দুগ্রন্থের প্রতি সেপ্রকার কিছু হইয়াছিল কিনা তাহা শ্রুত হওয়া যায় না। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র মানব ও জীবজন্তুর প্রতি হিতকরী বলিয়া এই শাস্ত্রে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অন্য সাধারণ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় নাই বলিয়া স্বয়ং বিক্রমশালী রাজা তাহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়া ঋষির পদ্যগ্রথিত অংশের বিলোপ সাধন করিয়া তাহার ভাবার্থমাত্র গদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। টীকাকারগণের উদ্ধারদ্বারা বোধ হয় ইনি বৃদ্ধসুশ্রুতের অনেক অংশ বাহুল্য বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির রচনার অভাব স্বভাবতঃ আমাদের মনকে বিকল করিতেছে।

নাগার্জ্জুন কতকগুলি বিসদৃশ কথাও লিখিয়াছেন। সকলেই জানেন বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণ,—শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শাস্ত্র সম্মত এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ছয় ঋতুকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুতসংহিতায় প্রচলিত পর্য্যায় পার্শ্বে বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত গ্রীষ্ম প্রাবৃট এইরূপ ক্রম-উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তরতন্ত্রের উপসংহারেও এই শেষোক্ত ঋতুপর্য্যায়ই দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা দুইটি বিষয় অবগত হওয়া যায়—১ম—সুশ্রুতের বহুকাল পরে প্রতিসংস্কারক প্রাদুর্ভূত হন। ২য়—তিনি কোন বর্ষা বহুল দেশের অধিবাসী ছিলেন। হুষ্কজুষ্ককনিষ্ক আদি তুরস্কবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের মথুরার নিকটবর্ত্তী উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বারা জানা যায় যে তাঁহারাও ঋতুপর্য্যায়ে প্রাবৃট-কালেরই প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আশ্চর্য্য নাই যে ঋতুর এই শেষোক্ত ক্রমই বৌদ্ধগণেরই অনুমোদিত হইবে। শুনিলাম পারসীকগণও বর্ষাকে আদি স্বীকার করিয়া ঋতু গণনা করেন। হিন্দুগণ প্রাবিট্‌কে বর্ষা পর্য্যায়েই ধরিয়াছেন—যথা শরৎকালং প্রতীক্ষস্বপ্রাবৃট্-কালোঽয়মাগতঃ। রামায়ণ কিষ্কি ২৭অ ৩৯। আবার ২৬ সর্গে বর্ষার ও শরতের চারি মাসকে বার্ষিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যথা—

পূর্ব্বোঽয়ংবার্ষিকোমাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারঃমাসাবার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণ বধে যতঃ। ১৭

রামায়ণের এই লেখাদ্বারা বেশ বোধ হইতেছে প্রাবিট্ বর্ষা হইতে ভিন্ন ঋতু নহে। আমার বোধ হয় এই বার্ষিক সংজ্ঞাই পরবর্ত্তীকালে বর্ষা প্রাবৃটের বিভিন্ন ঋতুকল্পনার মূল।

সংস্কর্ত্তা চরকের ন্যায় সুশ্রুতের স্থলে নাগার্জ্জুন যদি স্বীয় নাম দিতেন তাহা হইলে তাহা জনসমাজে গৃহীত হইত কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ তিনি ঋষি ছিলেন না সুতরাং তাঁহার রচনাও প্রমাদহীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। এই নিমিত্তই নাগার্জ্জুন সুশ্রুত নামের লোপসাধন যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই। প্রত্যুত স্থানে স্থানে ঋষিগণের প্রতি সম্মানের সহিত উল্লেখ আছে, এবং কোনস্থলেই গ্রন্থ বা শাস্ত্রের নিন্দাবাদ নাই।

এক্ষণে সুশ্রুতসংহিতা হইতে কতকগুলি বিষয় উদ্ধার করিয়া ঋষির পাণ্ডিত্য ও প্রমাদ বিহীনতা প্রদর্শন করিয়া সময় নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইব। ইউরোপীয়গণ এত বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়াও অদ্যাপি স্থির নিশ্চয় করিতে পারে নাই যে শরীরাভ্যন্তরে প্লীহা যন্ত্রটী কি কার্য্য করে। এপ্রকার শ্রুত হওয়া যায় যে একজন অহম্মন্ত ডাক্তার এই যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অদূরদর্শিতার আরোপ করিয়া নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অপিচ স্বয়ং একটী কুকুরের উপর আসুরিক পরীক্ষাও দ্বারা প্লীহাটী কর্ত্তিত করিয়া দেখিয়াছিলেন; কুকুরটী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া দিন কতক জীবিত ছিল। সুতরাং ডাক্তারের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অপনীত হইল না। যাহা হউক এই তামসিক জ্ঞানের সহিত সুশ্রুতোক্ত ধীর শান্ত মতের তুলনা করুন, দেখিবেন উহাতে কি সাত্বিক জ্ঞান রাশি নিহিত রহিয়াছে। সুশ্রুত সূত্র. স্থান ১৪ অধ্যায়ে যাহা লিখিত আছে তাহার অনুবাদ এই;—

"পাঞ্চভৌতিক ষড়রসময় চর্ব্যচোষ্যলেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ যে আহার আছে ইহার সম্যক্ পরিণতির যে তেজোভূত পরমসূক্ষ্ম সার তাহাকে রস বলে। ইহার স্থান হৃদয়। তাহাই হৃদয় হইতে দশ উর্দ্ধে নিম্নে দশ ও তির্য্যগ্ ভাবে চার এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া কৃৎস্নশরীরকে বেষ্টনপূর্ব্বক অদৃষ্টকর্ম্মবলে তৃপ্তি প্রদান, বর্দ্ধন, ধারণ, নিঃসারণ ও জীবনী শক্তি প্রদান করিতেছে। অতএব ক্ষয়বৃদ্ধিবিকার দ্বারা শারীরিক রসের গতি অনুমান করিবে।"

এখন এই সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত রস সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে—ইহা জলীয় না আগ্নেয়? স্নিগ্ধতা, সজীবতা, তৃপ্তিসাধন, ধারণাদি দ্রবণীয় পদার্থের গুণ থাকায় ইহা সৌম্য বলিয়াই বোধ হয়। সেই জলীয় রস যকৃৎ প্লীহায় উপস্থিত হইয়া রক্তবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ঋষি তাহাই অন্য যে দুই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা এই; "এই যকৃৎ প্লীহান্তর্গত রস শরীরস্থ অগ্নিদ্বারা রঞ্জিত হইয়া প্রসন্নতা (নির্ম্মলতা ক্লেদহীনতা) প্রযুক্ত রক্ত নামে অভিহিত হয়। জলীয় বলিয়াই স্ত্রীলোকের রক্তকে রজ বলে তাহা দ্বাদশবর্ষে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।"

অতএব দেখা গেল যকৃৎ প্লীহাই রক্ত প্রস্তুত করিবার যন্ত্র। এই মত পাশ্চাত্য কি পুরাতন বা আধুনিক কোন গ্রন্থে নাই সুতরাং ইহা যে ভারতীয় ঋষিগণের মৌলিক মত তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যগণ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুগণ চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন। উপরিউক্ত ঋষিবচন দ্বারা এই প্রলাপও নিরস্ত হইল।

"শরীরে ৩৬০ খানি অস্থি আছে ইহা বেদবাদী-গণের উক্তি কিন্তু শল্যতন্ত্রদ্বারা ৩০০ খানি অস্থিরই অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে শাখা অর্থাৎ হস্তপদ বাহু জানু জঙ্ঘা আদি স্থানে ১২০ খানি; নিতম্ব পঞ্জর পৃষ্ঠ উদর ও বক্ষে ১১৭ খানি গ্রীবা ও তাহার ঊর্দ্ধ মস্তকে ৬৩ খানি,—সকলের সমষ্টি ৩০০ খানি।" শারীরস্থান ৫ম অধ্যায়।

এস্থলে বেদের সহিত উক্তি বিভিন্ন হওয়ায় ঋষি ভীত হয়েন নাই; তাঁহার ভয়ের কোন কারণও ছিল না। কেন না তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথার্থ মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এ ত আর বাইবেল শাসিত দেশ নহে যে তাহার একটী ভ্রান্ত বচন খণ্ডিত হইলে খণ্ডনকারী শূলোপরি দণ্ডভোগ বা যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করিবে। ইহা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এস্থানে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ম্মলীকৃত জ্ঞানলাভ করাই ঋষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কপিলদেব যজ্ঞের দোষ উল্লেখ করিয়া মোক্ষের অনুপযুক্ত বলিয়াছেন তথাপি তিনি বেদে সম্মানর্হ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি রামায়ণে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। মহাভারতে তাঁহার বহু প্রশংসা পাওয়া যায় এবং ভগবদ্গীতায় তাঁহার সাংখ্যযোগ জ্ঞান যোগের নামান্তর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালেও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ যুবা আর্য্যভট্ট প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তন ও শূন্যে সূর্য্য প্রদক্ষিণরূপ স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া জ্যোতিষীগণের

তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ দণ্ড ভোগ করেন নাই।

"গর্ভে ভ্রূণের প্রথম মস্তক উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা শৌনক বলিয়াছেন কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের মূল। কৃতবীর্য্যের মতে হৃদয়, কারণ তাহাই বুদ্ধি ও মনের স্থান। পারাশর্য্য বা পরাশর মতে নাভি, যে হেতু নাভি অবলম্বন করিয়া দেহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মার্কণ্ডের মতে হস্তপদ, কারণ গর্ভ তাহাই অবলম্বন করিয়া স্পন্দিত হয়। গৌতম সুভূতির মতে মধ্যশরীর, যেহেতু সকল শরীর তাহাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার কোনটাই যথার্থ নহে যেহেতু ধন্বন্তরি বলেন শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে; গর্ভের সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। উদাহরণস্বরূপ বংশাঙ্কুর ও আম্রফল। আম্র পরিপক্ক হইলে কালপ্রভাবে কেশর (আঁশ) মাংস (শাঁস) অস্থি (আঁটি) মজ্জা (কশি) গুলি যেমন পৃথক পৃথক প্রকাশিত হয় তরুণ অবস্থায় সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সেইগুলি দৃষ্ট হয় না। কালই তাহার কেশরাদি প্রব্যক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে বংশাঙ্কুরও ব্যাখ্যাত হইতে পারে সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে গর্ভের তরুণাবস্থায় সর্ব্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলেও সূক্ষ্মতানিবন্ধন ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। তাহাই পরবর্ত্তীকালে প্রব্যক্ত হইয়া ওঠে।" শারীরস্থান তৃতীয় অধ্যায়।

এই বচনে পাঠকবর্গ দেখিবেন ধন্বন্তরির যুক্তি ও সিদ্ধান্তে কত সারবত্তা রহিয়াছে। তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয় ও সিদ্ধান্ত দোষশূন্য। এস্থানে অনেকগুলি ঋষির মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইঁহারা সকলে যে ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বোধ হয় না। সুভূতি গৌতম ত বুদ্ধদেবের জনৈক আত্মীয় ও শিষ্য এবং কৌমারভৃত্য নামক বালচিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতা। পারাশর্য্য অর্থে পরাশর পুত্র অর্থাৎ ব্যাসদেব। তিনি কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রণেতা কিনা তাহা শ্রুত হওয়া যায় নাই। তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা ও যোগাভ্যাসেই রত থাকিতেন। তবে আত্রেয় পুনর্বসুর ছয় শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম পরাশর ছিল এবং জ্যোতির্বেত্তা পরাশরেরও নাম শ্রুত হওয়া যায়। ধর্ম্মসংহিতাপ্রবক্তা পরাশর মুনির বিষয়ও শোনা যায়। ইঁহারা সকলেই এক বা বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে নাগার্জ্জুন যে চিকিৎসাশাস্ত্রপ্রণেতা পরাশরকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুমান মাত্র।

চরক ও সুশ্রুত উভয় গ্রন্থেই গোমাংসের গুণ ও ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে (চরকবিমান স্থান ৮ম অধ্যায়)। আবার পরক্ষণেই তাহা উষ্ণ অসাত্ম্য—অর্থাৎ যাহা হৃদয় গ্রহণ করিতে চায় না—যাহা আত্মার ভাললাগে না;—ও অপ্রশস্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। (চরক চিকিৎসাস্থান ১৫ম অধ্যায়)। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, এ দেশের পক্ষে ইহা অস্বাস্থ্যকর ও অখাদ্য।

চরকে ধান্বন্তরীয় চিকিৎসকদের বিষয় এবং ধন্বন্তরিকে প্রণাম আদি লিখিত থাকায় আত্রেয় পুনর্বসু ও ধন্বন্তরির সমসাময়িকতা প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারা ঋষিসংঘে সম্মিলিত হইয়া মানব-হিতকল্পে আয়ুর্ব্বেদের একএকটী অঙ্গের উপদেশ দিতে প্রতিশ্রুত হন। শিষ্যগণ

তাহাই লিপিবদ্ধ করেন। সেই সেই গ্রন্থ শিষ্য নামে সংসারে প্রচারিত হয়। অধুনা চরক ও সুশ্রুতই কালের স্রোত অতিক্রম করিয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। নাগার্জ্জুনের সময় জনক রাজার শালাক্যশাস্ত্র, কৌমারভৃত্য শাস্ত্র এবং অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর হারীত ও ক্ষারপাণি আত্রেয়ের এই ষট্‌শিষ্য-রচিত তন্ত্র বা চিকিৎসাশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল। উত্তর তন্ত্রে ইনি তত্তৎ শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

ইংরাজী সাহিত্যে সেক্ষপীয়র সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার নাটকাবলী মানবচরিত্রের দৃশ্যপট স্বরূপ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জগতের এই সাহিত্য সম্রাটের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা নাই।

নিকোলাস রো সর্ব্বপ্রথমে সেক্ষপীয়রের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছিলেন। তৎপরে ম্যালোন্ বহু অনুসন্ধান ও অধ্যবসায় দ্বারা সেক্ষপায়র সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

কবির পিতাব নাম ছিল জন্ সেক্ষপীয়র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির পিতা নিজের নামটী পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না! কবির মাতা মেরী আর্ডেন্ ওয়ারউইক সায়াবের প্রাচীন আর্ডেন বংশ-সম্ভূতা। ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে কবিব জন্ম।

১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে এপ্রিল উইলিয়ম সেক্ষপীয়রকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। তদানীন্তন রীতি অনুসারে তিন দিবসের নবজাত শিশুকে দীক্ষিত করা হইত। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে ২৩শে এপ্রিলই সেক্ষপীয়রের জন্মদিন। ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দেই ষ্ট্রাটফোর্ড নগরে প্লেগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে গড়পরতায় ১৪০০ লোকের মধ্যে প্রায় ২৪০ জনের মৃত্যু হয়। ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধনের জন্যই বোধ হয় বিধাতা এই শিশুটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন!

সেক্ষপীয়রের চরিত্রে যে নারীসুলভ কোমলতা এবং সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইত সে সমস্ত তাঁহাব জননীর আদর্শ এবং শিক্ষা হইতে অর্জ্জিত। স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ গুণরাশি তাঁহার জননীর চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল, এবং তাঁহাব চবিত্র হইতেই তিনি নারীচরিত্র সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

টমাস্ জলিফ্ প্রতিষ্ঠিত (Thomas Jolyffe) ষ্ট্রাটফোর্ডের একটি অবৈতনিক স্কুলে সেক্ষপীয়র শৈশবে অধ্যয়ন করেন, এবং একটুখানি লাটিন ও তদপেক্ষাও অল্প গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ পরে তিনি কিছুকাল এই স্কুলে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

অনেকে তাঁহার লেখা হইতে এইরূপ অনুমান করেন, যে তিনি কিছুকাল আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিম্বা তাঁহার আত্মীয় ষ্ট্রাটফোর্ডের এটর্ণি টমাস্ গ্রীনের নিকট হইতে তিনি এবিষয়ে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও হইতে পারে।

১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে সেক্ষপীয়র সন্নিকটস্থ শটারি (Shottery) গ্রামের কুমারী অ্যান্ হ্যাথ্ওয়েকে বিবাহ করেন। অ্যান্ সেক্ষপীয়র অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। আধুনিক কয়েকজন সমালোচকের মতে সেক্ষপীয়র এই বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা তৎপ্রণীত দ্বাদশ রাত্রি 'Twelfth Night' নাটকের নিম্নলিখিত কয় পংক্তি উদ্ধৃত করেন—

"Let the woman take
An elder than herself ;
So wears she to him,
So sways she level in her
husband's heart.

* * * *

Then let thy love be younger
than thyself,
Or thy affection cannot hold
the bent."
(II. 4.)

ইহাতে সম্রাট্ পুরুষবেশী ভায়োলাকে বয়ঃকনিষ্ঠা কোনো রমণীকে বিবাহ করিতে উপদেশ দিতেছেন। সমালোচকেরা বলেন যে সেক্ষপীয়র স্বয়ং বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে বিবাহ করিয়া পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, এবং ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়না একথা বলা বাহুল্য। ইহা কেবলমাত্র সমালোচকদিগের একটি অনুমান। সমালোচক হাড্সন্ ইহার বেশ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কাহারো হৃদয়ে কোনো গুপ্ত বেদনা থাকিলে পরের হৃদয়ের সে বেদনার কথা সে কিছুতেই বলিবে না"।

সমালোচক গ্রাণ্ট হোয়াইট্ বলেন যে অ্যান্ অতি নীচ প্রকৃতি এবং পরুষ স্বভাবা ছিলেন। সুতরাং বিবাহের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেক্ষপীয়র তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার ঘৃণিত সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে লণ্ডন নগরে প্রস্থান করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই সেক্ষপীয়র ষ্ট্রাটফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া জীবনের শেষ অংশটুকু স্ত্রীপুত্রের সহিত একত্রে আনন্দে অতিবাহিত করিবেন।

এই বিবাহে যে সেক্ষপীয়র সুখী হন নাই সমালোচকেরা তাহার আর একটী প্রমাণ দিয়া থাকেন। কবির উইল পত্রে আছে,

"I give unto my wife the second best bed, with the furniture." অর্থাৎ, আমি আমার স্ত্রীকে ভাল পালঙ্গগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টী এবং আসবাব পত্র দিলাম।

তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীর প্রতি যে তিনি বীতরাগ ছিলেন ইহাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ। নাইট্ সাহেব কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত উইলটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন সেক্ষপীয়রের সমস্ত সম্পত্তিতে ইংরাজী আইনানুসারে তাঁহার স্ত্রীর জীবনস্বত্ব ছিল। আর এই যে শয্যাটী, ইহা সাধ্বী

পতিব্রতা স্ত্রীর নিকট পার্থিব সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে ইহা জানিয়াই সেক্ষপীয়র এইরূপ উইল করিয়া গিয়াছিলেন।

রো সাহেব বলেন যে বাল্যকালে সেক্ষপীয়র অন্যান্য বালকের সংসর্গে সার টমাস্ লুসির শিকারোদ্যানে মৃগশাবক চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। এই ঘটনায় তিনি সার টমাসকে ব্যঙ্গ করিয়া এক কবিতা রচনা করেন। ইহাতে সারটমাস্ সেক্ষপীয়রের প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে ষ্ট্রাটফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিতে বাধ্য হইতে হয়।

ঘটনাটি সত্য হইলেও হইতে পারে। বিশেষতঃ হরিণ চুরি তখন বড় অন্যায় কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত না। ইহা যুবকগণের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। এবং সেক্ষপীয়রেরও বাল্যজীবন যে একেবারে নিষ্কলঙ্ক ছিল না তাহা তিনি নিজেই একটী চতুর্দ্দশপদী কবিতায় বলিয়াছেন—"Most true it is that I have look'd on truth Askance and strangely."

তিনি সত্যের প্রতি যে সহজ সরল দৃষ্টিতে তাকান নাই একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন।

সেক্ষপীয়রের রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়ার তিনটী কারণ সমালোচকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, এই হরিণ চুরির ঘটনা, দ্বিতীয়তঃ নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আসক্তি, এবং তৃতীয়তঃ আর্থিক দুরবস্থা।

সে সময়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই নাটকের মহা সমাদর। সেক্ষপীয়রও অভিনয়ে সুনিপুণ ছিলেন। অচিরেই তিনি স্বীয় অসামান্য মেধাবলে নাট্য জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন। এই সময়ে ডিউক সাদাম্‌টন্ তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য দেন, এবং কবি ভিনাস্ ও এডোনিস্ এবং লুক্রেশ্ কবিতাদ্বয় তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। রাজ্ঞী এলিজাবেথও তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

১৬১৩ খৃঃ অব্দের ২৯শে জুন গ্লোব থিয়েটার পুড়িয়া যায়। বোধ হয় তাহার সঙ্গে সেক্ষপীয়রের অনেক লেখা নষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহা সত্বেও তাঁহার রচিত ৩৮টী নাটক এখন পাওয়া যায়।

শুনা যায় যে রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ চতুর্থ হেনরি নামক নাটকের সার জন্ ফলষ্টাফের চরিত্রে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি আর একটী নাটকে ফলষ্টাফের প্রেমের কাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই অনুরোধেই সেক্ষপীয়র পরে Merry Wives of Windsor নামক নাটক প্রণয়ন করেন।

"সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল ডাক্তার হাড্‌সনের কথাগুলি হইতে তাহার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।—তিনি বলিতেছেন,—

"সেক্ষপীয়রের পূর্ব্বে ইংরাজী নাটকগুলি নীচ আদর্শে রচিত হইত, এবং চরিত্রহীন লোকেরাই নাটক লইয়া থাকিত। সেই হীন দশা হইতে উদ্ধার করিয়া শক্তি, সৌন্দর্য্য এবং সুরস সঞ্চারে ইংরাজী নাটককে সেক্ষপীয়র সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিয়া তোলেন। নাট্য

বিষয়ক যাহা কিছু সমস্তেরই জন্য ইংলণ্ড সেক্ষপীয়রের নিকট যে কত ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

১৬০৪ খৃঃ অব্দে সেক্ষপীয়র নাট্যশালার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, শেষ জীবনটুকু নির্জ্জনে ষ্ট্রাটফোর্ডে কাটান। থিয়েটারে অভিনয় করা তিনি মনে মনে ঘৃণা করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Alas, 'tis truc I have gone
here and there
And made myself a motley
to the view."

শেষ দুই তিন বৎসর তিনি কোনো কবিতা লেখেন নাই। ১৬১৬ খৃঃ অব্দের ২৩শে এপ্রিল, তাঁহার জন্ম তারিখেই, তাঁহার মৃত্যু হয়। ৭ বৎসর পরে তাঁহার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করিলে স্বামীর সমাধির পার্শ্বেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী।

প্রয়াণ।

(প্রাতঃস্মরণীয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের স্বর্গগমনোপলক্ষে)

নিবিড় নদীর-কোলে অপরূপ ইন্দ্রধনুসম
মলিন এ মহীমাঝে অভিরাম চির-অনুপম,
তুমি ফুটেছিলে দেবি,—আপনার স্বর্গীয় প্রভায়
শুচি-স্নাত করি' এহি পাপে পূর্ণ, পঙ্কিল ধরায়।
হিংসা-দ্বেষ-নির্য্যাতনে নিত্য বিশ্ব কাঁদে হাহাকারে,
স্বজন শোনিত পান করে সুখে স্বার্থের আঁধারে;—
এ শ্মশানে শুধু তুমি মৌন প্রেমে, শান্ত গরিমায়
ধ্যান-মগ্ন ছিলে বসি' মরতের মঙ্গল-চিন্তায়!
জগত-জননীসম আর্ত্ত-দুঃখে আত্ম-বিস্মরিয়া
অসহায় আতুরের সর্ব্ব জ্বালা দিলে জুড়াইয়া!
করে তব শান্তি-সুধা- মুখে তব সান্ত্বনা সরস,
মুমূর্ষু মেলিত আঁখি লভি তব সস্নেহ পরশ;
আজি ওগো জ্যোতির্ম্ময়ি, কোথা চলি' গেলে নাহি জানি।
আঁধারে ছাইছে বিশ্ব তোমা' বিনা হে দেবি কল্যাণি!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

কুমারী নাইটিংগেল।

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিংগেল নবতি বর্ষ বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতরা এবং শুশ্রূষাপরায়ণা রমণী দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার দয়া এবং পরোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার নবতিবর্ষের জন্মদিনে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থান হইতেই তাঁহাকে উপহার প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারি যত্নে এবং চেষ্টায় চিকিৎসালয়ে পীড়িতের এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইয়াছে। বাল্যাবধি কুমারী ফ্লরেন্স বড়ই কোমলহৃদয়া ছিলেন। প্রকৃতির তরুলতা পশুপক্ষীর সৌন্দর্য্য যেমন তাঁহার হৃদয় আকর্ষণ করিত তেমনি তাহাদের অসহায় অবস্থাও তাঁহার করুণার উদ্রেক করিত। বনের পাখী, কাঠবিড়ালী তাঁহার পোষা হইয়া যাইত। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের নিজের হাতে আহার দিতেন। তাঁহার মাতার টাট্টু ঘোড়াটি পোষা কুকুরের মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। বাল্য-কালে গ্রামের ধর্ম্মযাজকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—এই ধর্ম্মযাজকটি প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যখনি গ্রামে কোনও পীড়া কিম্বা আকস্মিক বিঘ্ন বিপদ হইত তখনি তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সেবা যত্ন করিতেন। কুমারী ফ্লরেন্সও সেই সকল সময়ে তাঁহার সঙ্গী হইতেন। এই সময় একটি কুকুর সাংঘাতিকরূপে আহত হয়—কুকুরটি একজন বৃদ্ধ কৃষকের; সে তাহাকে বড় যত্ন করিত। কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন দুষ্ট বালক প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে তাহার পিছনের পা ভাঙিয়া দেয়। তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া কৃষক তাহাকে গুলি করিয়া মারিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করে। কিন্তু কুমারী ফ্লরেন্সের যত্নে সে পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠে। এই সময় হইতেই আর্ত্ত এবং পীড়িতের শুশ্রূষা কার্য্য রীতিমত শিখিবার জন্য তাঁহার মন উৎসুক হয়। ইহার কিছুকাল পরে তিনি একবার সৈনিক দিগের হাঁসপাতাল দেখিতে নেটলিতে যান। সেইখানকার দৃশ্য এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া শুশ্রূষা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইয়া ইহাই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Kaisn Worth নামক একটি ক্ষুদ্র জর্ম্মাণ নগরে তিনি একদল প্রটেষ্টাণ্ট শুশ্রূষাকারিণী রমণীদগের সহিত সেবা কার্য্যে যোগদান করেন। পর বৎসর লণ্ডন হার্লি ষ্ট্রীটে পীড়িত শিক্ষয়িত্রীদিগের সেবাভার গ্রহণ করেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণপণ চেষ্টা, যত্ন এবং পরিশ্রমে হাঁসপাতালের সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। এই সময় তিনি লণ্ডন, এডিনবরা, ডবলিন প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের চিকিৎসালয়ে বিশেষ যত্নসহকারে শুশ্রূষা কার্য্য শিক্ষা করেন। তাহাতে সেই সকল

চিকিৎসালয়ের বিশেষ উপকার এবং উন্নতি হয়। এইরূপ দারুণ পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কিছুকালের জন্য তাঁহাকে বিশ্রামে বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু অধিককাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা নিতান্তই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই বৎসর দুই পরে ক্রিমিয়া যুদ্ধের আরম্ভে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আজ কালকার মত তখন আহতদিগের সেবায়
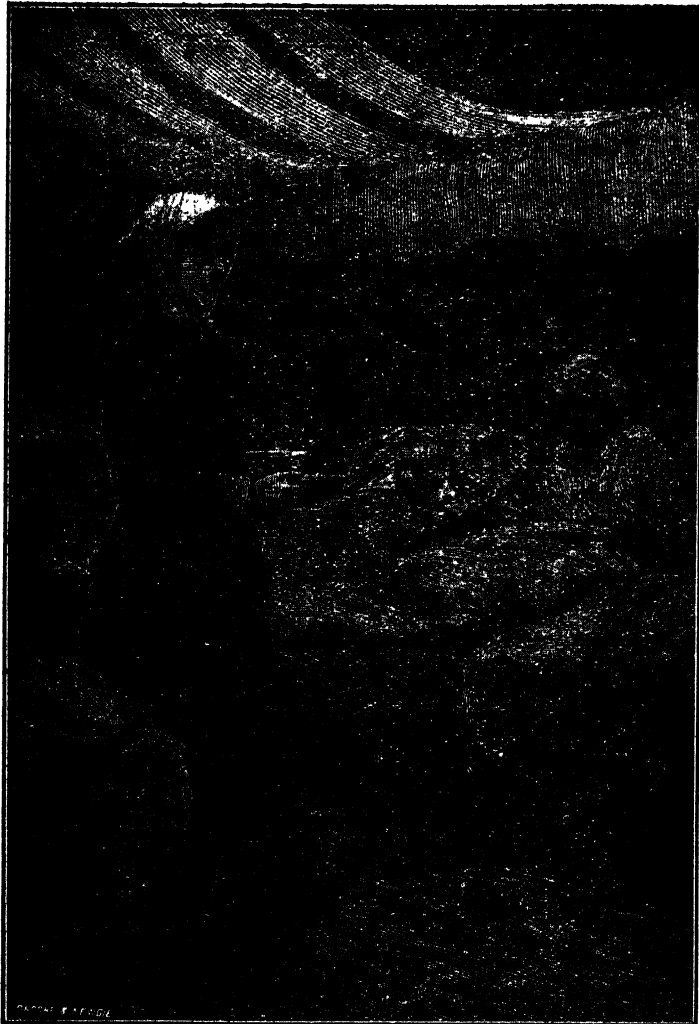
সেবারত কুমারী নাইটিংগেল

কোনরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। তাই আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি এই তন্বী সুকুমারী রমণী যখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মঙ্গল হস্তে, নিঃস্বার্থভাবে নীরবে করুণাপূর্ণ হৃদয়ে পীড়িত সৈনিকদিগের মুখে ঔষধ পথ্য তুলিয়া দিতেন, তাহাদের যন্ত্রণা দূর করিবার

জন্য কোমল হস্তে তাহাদিগকে সেবা করিতেন, তখন যে তাহারা তাঁহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করিত তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সেই ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্রে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, মৃত এবং আহতদিগের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁহার দিন কাটিত। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাঁহার সুকুমার দেহযষ্টি কেমন করিয়া অবিশ্রান্ত দিনরাত্রি সেই দারুণ ক্লেশ, অভাব ও পরিশ্রম সহ্য করিত। সৈনিকেরা তাঁহাকে এতই ভালবাসিত যে তিনি যখন পাশ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন তখন তাহারা নুইয়া পড়িয়া তাঁহার ছায়াকে চুম্বন করিত। এই অমানুষিক পরিশ্রম এবং দেবদুর্লভ করুণায় তাঁহার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িল এবং ইংলণ্ডবাসী সকলেই ১৮৫৬ সালে তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন সময়ে বিপুল সমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কুমারী ফ্লরেন্স বাল্যাবধি বাহ্যাড়ম্বরশূন্য এবং মানুষের নিকট যশোমানলাভে অনিচ্ছুক ছিলেন তাই কাহাকেও তাঁহার আগমনবার্ত্তা না জানাইয়া গোপনে আপন দেশে ফিরিয়া আসিলেন! দারুণ পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরকালের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, জীবিতকালে আর তিনি নিজ হস্তে শুশ্রূষা করিবার সুখ লাভ করেন নাই। ইংলণ্ডবাসীরা যখন তাঁহার নিমিত্ত কোনরূপ সমারোহ করিতে পারিলেন না তখন তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য সার্দ্ধ সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু মহৎহৃদয়া কুমারী ফ্লরেন্স সে অর্থও গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন সেই অর্থ দিয়া কৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁহার নামে একটি সেবাগৃহ নির্ম্মিত হইল।

জীবনে কুমারী ফ্লরেন্স যে মহৎ সেবাব্রত প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার স্থান অতি উচ্চে। কি রাজা কি প্রজা কি স্বদেশী কি বিদেশী—আত্মপর উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার স্বার্থত্যাগ তাঁহার নিরতিশয় পরদুঃখকাতরতা প্রশংসাপূর্ণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন স্মরণ করিবে। ক্রিমিয়া যুদ্ধে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি যে অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাহা চিরদিন মানব হৃদয়কে উৎসাহিত এবং মহত্ত্বে প্রণোদিত করিবে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পলিত পত্র।

"একে একে সব সাথী করেছে প্রয়াণ,
　　শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায়।
আর কেন? ওহে পর্ণ পাণ্ডু ম্রিয়মান,
　　এখনও তরুর গায়ে আছো কি আশায়?"

"গেছে সব! তাহে কিবা?—শীতের সমীর
　　পলে পলে মৃত্যু আনে কাঁপাইয়া কায়া,
ভাবিয়াছি, শেষবিন্দু বুকের রুধির—
　　শুকাইয়া কিসলয়ে দিব তবু ছায়া।"

শ্রীকালিদাস রায়।

হেঁয়ালি নাট্য

ভণ্ড সন্ন্যাসীর বটবৃক্ষতলে বসিয়া গাঁজা সেবন। ডাকাতীতে অভিযুক্ত রসিকচন্দ্রের প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। ব্যোম্ ব্যোম্—(গাঁজা সেবন)

রসিক। (চমকিয়া) কে আবার! কোথাও দেখছি নিস্তার নাই!—সর্ব্বস্থানেই যমদূত!

স। শিব—শিব—হর—হর—বোম্।

র। তবু ভাল—গোয়েন্দা নয়,—একজন সন্ন্যাসী। বোধ হয় আমারই দলের হবে। (নিকটে গিয়া) সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম হই।

স। বোম্—বোম্। এই ঠো, তোমারা পাস্ রাখ্ দেও। (কিঞ্চিৎ ভস্ম প্রদান)

র। কেন বাবা! নাস নিতে হবে!

স। নাস না আছে লেকন এ নাশ হ্যায়; সব পাপ এসিমে নাশ হো যাতা।

র। আপনার মত অমায়িক প্রকৃতির লোক আমি আর কোথাও দেখি নাই।

স। হাম্‌কো মাফিক সাধুকা সাৎ কৈ কো বাৎ হোতা নেই। লেকন্ এ খবর কোই কো মৎ বলো,—সব আদমি আনে সে হামকো নাশ কর ডালেগা।

র। না ঠাকুর, আমি এ খবর কাকেও বল্‌ব না (স্বগতঃ) একবার একটা ভৌতিক বিদ্যে শিখে নিতে পারি তাহলে সকলকে মজা দেখাই।

স। (গাজা সেবন) বোম্—বোম্।

র। আচ্ছা, বোম্ বোম্ করেন কেন?

স। এ সব, তোম সম্‌জেগা নেই।

র। তা একটু বলুন না কেন?—বলতে কি দোষ আছে?

স। এ সব ধরম্ কা বাৎ,—তোম্ সমজেগা নেই।

র। অ্যাঁ! কি বল্লেন ধর্ম্ম?

স। হাঁ, ধার্ম্মিক আদ্‌মি এই বাৎ লেতা হ্যায়।

র। সর্ব্বনাশ! আপনি তাহলে ধার্ম্মিক!

স। হাঁ হাম্ ধার্ম্মিক হ্যায়।

র। সর্ব্বনাশ! আপনি ধার্ম্মিক?

স। হাঁ ধার্ম্মিক।

র। Virtuous men are always ready to die—তা হলে আপনি মরতে প্রস্তুত?

স। কা, বোল্‌তা?

র। বাবা, বোল্‌তাও না ভীমরুলও না।

স। হাম কুছ্ সমজ্‌তা নেহি—আচ্ছা কর্‌কে বাতাও।

র। তা, মর্‌বার সময় কেউ কিছু বুঝতে পারে না, তোমাকে আচ্ছা করে বাতিয়ে কি আর লাভ হবে?

স। হাম্ মরেগা কাহে?

র। আঃ—আপনি যে ধার্ম্মিক বল্লেন।

স। ধার্ম্মিক আদ্‌মি তো মর্‌তা নেহি।

র। না বাবা—এখন কলিযুগ—ধার্ম্মিক হলেই মরতে হয়।

স। তোমারা ও বাৎ ঝুঠা হ্যায়।

র। না কখনই না। ধার্ম্মিক হলেই আপনাকে মরতে হবে। তা যদি না হয় ত বুঝব আপনি ঝুটা, আপনার এই ভস্ম ঝুটা, তামাম্ সব্ ঝুটা।

স। আমি সে ধার্ম্মিক আছি না।

র। এখন মরবার ভয়ে আছি না বল্লে কি আর চলে? তুমি এখন মর, আর আমি আমার পথ দেখি।

[সদল বলে পুলিস ইন্স্পেক্টারের প্রবেশ,—রসিকচন্দ্রের বেগে প্রস্থান ও দূরে বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান]

১। (সন্ন্যাসীর প্রতি) এই যে, এই সেই বেটা।

২। হাঁ হাঁ সেই বেটাই বটে। যত দেখবে সাধু সন্ন্যাসী সব বেটা—স্বদেশী,—সিডিসনিষ্ট, বোমাপন্থী, বিদ্রোহী। বাঁধ বেটাকে বাঁধ। (সকলে মিলিয়া সন্ন্যাসীকে বাঁধন)।

স। এ ক্যা কর্‌তা হ্যায়—

১। আবার হিন্দুস্থানী বুলি যেন বাঙ্গ্‌লা জানেন না!

২। কি আর করব! এই সকলে মিলে তোমা হেন ধার্ম্মিক সাধু পুরুষকে ভগবদ্গীতা-উক্ত যোগাসনে বসিয়ে দিচ্ছি। বুঝেছ ত?

স। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) বাবা আমি ধার্ম্মিক না আছে—ঠিক বোলতা হ্যায়—হাম ধার্ম্মিক নেহি হ্যায়।

৩। বেটা ওঠ্‌ এখন; বাঁধন চোটে—সত্যি কথা বেরিয়ে গেছে—ভণ্ড তপস্বী চল এখন।

[সন্ন্যাসীকে ধরিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান]।

রসিক। আঃ কি মজা! সন্ন্যাসী ঠাকুর এখন ফাঁসিতে ঝুলুক আমি ঘরে যাই। কি বুদ্ধিটাই জুগিয়েছিল—একেই বলে, কারো পৌষ মাস কারো সর্ব্বনাশ!

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সাউ।

প্রাচীন বিবাহ প্রথা।

(খৃষ্টীয় চতুর্থপূর্ব্ব শতাব্দী)

অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'প্রাচীন ভারতে বিবাহ পদ্ধতি শীর্ষকে এক সুলিখিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যায় চাণক্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' নামক পুস্তক হইতে খৃষ্টজন্মের চতুর্থ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিবাহাদি বিষয়ে কিরূপ আদেশ বিধি বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিব।

বিবাহ সকল প্রকার আচারের অগ্রবর্ত্তী। ব্রহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ—এই কয় প্রকার বিবাহ প্রচলিত। এই কয় প্রকার বিবাহ মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকারের বিবাহ প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে এবং কন্যার পিতা সম্মত হইলেই এই সকল বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য প্রকারের বিবাহে পিতামাতা উভয়েরই অনুমোদন আবশ্যক। কেননা জামাতা তাহাদের কন্যাকে যে শুল্ক প্রদান করে তাহা তাহারাই গ্রহণ করে। পিতা কিংবা মাতার অনুপস্থিতে কিংবা একের মৃত্যু হইলে অন্য জনে এই শুল্ক গ্রহণ করিবে। যদি পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে তবে কন্যা নিজেই এই শুল্ক গ্রহণ করিবে।

যাহারা বিবাহে সংশ্লিষ্ট তাহারা সন্তুষ্ট হইলে সকল প্রকার বিবাহই সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

পুরুষের দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ।

যদি কোন স্ত্রীলোক জীবিত সন্তান প্রসব না করে, অথবা পুত্র উৎপাদনে অক্ষমা হয়, অথবা বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে তাহার স্বামীর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহণের পূর্ব্বে অষ্টম বর্ষ অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি পত্নী কেবল কন্যা প্রসব করে, তবে স্বামীকে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। তৎপর, যদি তিনি পুত্র কামনা করেন, তবে বিবাহ করিতে পারেন। যদি স্বামী এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তবে পত্নীকে শুল্ক, স্ত্রীধন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান ব্যতীত, রাজাকেও তাঁহার চব্বিশ পণ প্রদান করিতে হইবে। যে সকল স্ত্রী বিবাহের শুল্ক বা স্ত্রীধন পায় নাই তাহাদেরও শুল্ক ও স্ত্রীধন দিয়া এবং স্ত্রীদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বৃত্তিদান করিয়া পরে স্বামী ইচ্ছানুসারে যতগুলি ইচ্ছা স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারেন, কেননা পুত্রার্থেই স্ত্রীর প্রয়োজন। যদি স্বামীর অনেক গুলি পত্নী বা সকল পত্নীই এক সময়ে সন্তানধর্ম্মা হইয়া থাকেন, তবে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে বিবাহ করা হইয়াছে অথবা যে স্ত্রী পুত্রবতী তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি স্বামী যথাসময়ে * * স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করেন, তবে তাহাকে ৯৬ পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। পুত্রবতী, ধার্ম্মিকা, বন্ধ্যা, মৃতবৎস্যা, এবং যাহারা সন্তানবতী হইবার বয়স অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের অনভিমতে সহবাস নিষিদ্ধ। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তা বা উন্মত্তা স্ত্রীর সহিত স্বামীর একত্র বাস করা না ইচ্ছানুসারে নির্ভর করে। পুত্রার্থে স্ত্রী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বা উন্মত্ত স্বামীর সহবাস করিতে পারেন।

যদি স্বামী কুচরিত্র, বিদেশবাসী, রাজদ্রোহী, অথবা স্ত্রীর প্রাণহানি করিতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা থাকে, অথবা জাতিচ্যুত, বা ক্লীব হয় তবে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ।

শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ জাতিভুক্তা যে সকল স্ত্রী সন্তান প্রসব করে নাই, তাহারা প্রবাসী স্বামীর জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু যাহারা সন্তানবতী তাহারা এক বৎসরের অধিককাল স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে তাহারা দ্বিগুণকাল অপেক্ষা করিবে। যদি সেরূপ ব্যবস্থা না থাকে তবে তাহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গ তাহাদিগকে চার কি আট বৎসরের জন্য প্রতিপালন করিবে। তৎপর বিবাহের সময় যাহা দান করা হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিয়া, জ্ঞাতিগণ তাহাদের বিবাহে অনুমতি দিবে। যদি ব্রাহ্মণ স্বামী বিদ্যার্থী হইয়া বিদেশে বাস করেন, তবে অপুত্রবতী স্ত্রী দশ বৎসর অপেক্ষা করিবে; এক্ষেত্রে স্ত্রী পুত্রবতী হইলে দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে। যদি স্বামী ক্ষত্রিয় হন, তবে স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। কিন্তু বংশনাশ ভয়ে স্ত্রী, সবর্ণে বিবাহ করিয়া পুত্রবতী হইলে, সে ঘৃণাস্পদ হইবে না। যদি প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীর ভরণপোষণের অভাব হয় এবং ধনী

জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করে তবে স্ত্রী তাহার ইচ্ছানুসারে পুনর্ব্বার যে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারে এরূপ লোককে বিবাহ করিতে পারে।

প্রথমোক্ত চার প্রকারে বিবাহিতা "কুমারী" যাহার স্বামী বিদেশে বাস করিতেছেন এবং যাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ স্ত্রী যদি স্বামীর নাম সাধারণে প্রকাশ না করিয়া থাকে তবে সাতমাস অপেক্ষা করিবে। যদি নাম প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে এক বৎসর অপেক্ষা করিবে। প্রবাসী স্বামীর সংবাদ যদি অবগত না হওয়া যায় তবে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি স্বামী প্রবাসী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়া গিয়া থাকে এবং স্ত্রী যদি শুল্কের অংশবিশেষ মাত্র পাইয়া থাকেন, তবে স্ত্রী তিন মাস মাত্র অপেক্ষা করিবেন কিন্তু স্বামীব সংবাদ পাইয়া থাকিলে সাত মাস অপেক্ষা করিতে হইবে। সম্পূর্ণ শুল্ক যে স্ত্রী পাইয়াছেন, স্বামীর সংবাদ না পাইলে তিনি পাঁচমাস অপেক্ষা করিবেন কিন্তু সংবাদ পাইলে দশ মাস অপেক্ষা করিবেন। পরে, বিচারকগণের (ধম্ম স্থৌ বিসৃষ্টা) অনুমতি লইয়া ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে পারেন; কেননা * * স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষা না করিলে কোটিল্য বলেন, 'ধর্ম্ম বধ' হয়।

যে সকল স্বামী অনেক দিন প্রবাসী, বা যাহারা মৃত তাঁহাদের অপুত্রবতী স্ত্রীগণ এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীগণ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারেন। যদি মৃত স্বামীর অনেকগুলি ভ্রাতা থাকে, তবে স্ত্রী মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর অথবা যে ভ্রাতা ধার্ম্মিক ও তাহাকে প্রতিপালনে সক্ষম হইবেন অথবা যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও অবিবাহিত তাহাকে বিবাহ করিবেন। যদি মৃত স্বামীর ভ্রাতা না থাকে তাহা হইলে স্বামীর আত্মীয়গণের সগোত্রে বিবাহ করিবেন। কিন্তু যদি উপযুক্ত অনেকগুলি ব্যক্তি থাকেন, তবে মৃত স্বামীর নিকট-আত্মীয়কে বিবাহ করিবেন।

যদি কোন স্ত্রীলোক উপরি উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী এবং যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, যাহারা কন্যাকে দান করিয়াছে এবং যাহারা ইহাতে সম্মতি দান করিয়াছে তাহারা সকলেই দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

লানপো (লম্ঘন) (১)

লানপো রাজ্য পরিধিতে প্রায় সহস্র লি। ইহার উত্তরে তুষার পর্ব্বত শ্রেণী; অন্য তিনদিকে কৃষ্ণ পর্ব্বত শ্রেণী। প্রায় দশ লি স্থান বেষ্টন করিয়া রাজধানী অবস্থিত। কয়েক শতাব্দী হইতে রাজবংশ লুপ্ত হওয়ায়, প্রধান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালনের

(১) এই প্রদেশ কাবুল নদীর উত্তর ধারে অবস্থিত। Ancient Geography of India পুস্তকে কনিংহাম সাহেব ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার পশ্চিমে ও পূর্ব্বে আলিঙ্গর ও কুনার নদী।

জন্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিয়া আসিতেছেন; কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করেন না। সম্প্রতি ইহা কপিশার অধীনস্থ হইয়াছে। এদেশ ধান্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং যথেষ্ট ইক্ষু দণ্ড এখানে পাওয়া যায়। দেশে ফলের বৃক্ষ প্রচুর আছে কিন্তু খুব কম ফলই পরিপক্ক হয়। জলবায়ু সুবিধাজনক নয়; ঘন নীহার যথেষ্ট কিন্তু বরফ বেশী নাই। যথেষ্ট শস্য জন্মে। অধিবাসীরা সঙ্গীত বিদ্যায় অনুরক্ত। স্বভাবতই ইহারা অবিশ্বাসী এবং চৌর্য্যবৃত্তি পরায়ণ; কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহে না। ইহারা খর্ব্বাকৃতি কিন্তু কর্ম্মঠ এবং বলবান। সাধারণতঃ ইহাদের পরিচ্ছদ শুভ্র এবং সাজসজ্জা সুন্দর। প্রায় দশটি সংঘরাম আছে কিন্তু তাহাতে যতির সংখ্যা অত্যল্প। অধিকাংশই মহাযান মতাবলম্বী। দেব-মন্দিরও বেশ আছে। অবিশ্বাসীর সংখ্যা কম। এই প্রদেশ হইতে ১০০ লি দক্ষিণে যাইয়া আমরা বৃহৎ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া ও নদীপার হইয়া নাকিলোহো অর্থাৎ উত্তর ভারতের সীমান্ত পৌঁছি।

নাকিলোহো (নগরহরা)। (২)

নাকিলোহো পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬০০০ শত লি এবং উত্তর দক্ষিণে ২৫০ কি ২৬০ লি বিস্তৃত। ইহার চতুর্দ্দিকেই লম্ববান গিরিশৃঙ্গ। রাজধানী পরিধিতে প্রায় ২০ লি। ইহার কোন প্রধান শাসন-কর্ত্তা নাই। সেনাপতি এবং তাঁহার সহকারীগণ কপিশা হইতে প্রেরিত হইয়া থাকেন। দেশে শাকসবজী, পুষ্প ও ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। অধিবাসীরা সরল, সাধু এবং প্রকৃতিতে ইহারা উৎসাহী এবং সাহসী। ইহারা আর্থিক বিষয়ে উদাসীন এবং বিদ্যানুরাগী। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং অত্যল্প সংখ্যক লোকই অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করে। সঙ্ঘরাম যথেষ্ট আছে কিন্তু যতি সংখ্যায় অল্প। স্তূপগুলি জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট আছে। দেবতাদের পাঁচটী মন্দির আছে ও একশত ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

নগরের তিন লি পূর্ব্বে তিন শত ফুট উচ্চ রাজা অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ আছে। ইহা কারুকার্য্য শোভিত এবং খোদিত প্রস্তর নির্ম্মিত। বোধিসত্বাবস্থায় শাক্য এই স্থানেই দীপাঙ্কর বৌদ্ধের দর্শন পান এবং অজিন বিস্তার করিয়া, কেশরাজি উন্মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কর্দ্দমাক্ত রাজপথ আবৃত করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি ভবিষ্যতে যে সফলকাম হইবেন এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যদিও গত কল্পে পৃথিবী ধ্বংস হইয়াছিল তত্রাপি, এই ঘটনার চিহ্ন বিনষ্ট হয় নাই। উপবাসের দিবস আকাশ হইতে নানাপ্রকার পুষ্প পতন হয়। তদ্দৃষ্টে জনপদ বাসীগণও নানাপ্রকারে পূজা করে।

এই স্থানের পশ্চিমে একটী সঙ্ঘরামে কয়েকজন যতি বাস করেন। দক্ষিণে ক্ষুদ্র একটী স্তূপ আছে। এই স্থানেই বোধিসত্ব স্বকীয় চুল দ্বারা কর্দ্দমাক্ত পথ আবৃত করিয়াছিলেন। রাজা অশোক এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরাভ্যন্তরে বৃহৎ স্তূপের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এই স্থানে বুদ্ধদেবের উজ্জ্বল ও বৃহৎ একটী দন্ত ছিল। বর্ত্তমানে সে দন্ত নাই—কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহারই পার্শ্বে ত্রিশ ফুট উচ্চ অন্য একটী স্তূপ আছে। কি প্রকারে এ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা জানা যায় না; তবে লোক পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে ইহা স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃই ইহা মনুষ্য সৃষ্ট নহে, অদ্ভুত ব্যাপার।

নগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অন্য একটি স্তূপ আছে। পৃথিবীতে যখন তথাগত বাস করিতেন তখন মনুষ্যকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি শূন্য হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্তিপ্লুত হইয়া

(২) সিম্পসন সাহেব নগর হরার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিহার জেলায়, মেজর কিটো ভগ্নপ্রায় সুদ্রদুর্গে সংস্কৃত খোদিত লিপিতে নগরহরার উল্লেখ পাইয়াছেন।

জনসাধারণে এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এইক্ষণে, স্তূপ জনশূন্য, ইহাতে কোন যতি বাস করেন না। নগরাভ্যন্তরে রাজা অশোক নির্ম্মিত দুইশত ফুট কি ততোধিক উচ্চ স্তূপ আছে। এই সঙ্ঘরামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ পর্ব্বত গাত্র হইতে প্রবল স্রোত নির্গত হইয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে। পর্ব্বত গাত্রগুলি প্রাচীরের ন্যায়; পূর্ব্বদিকে গভীরগুহাভ্যন্তরে নাগ গোপাল বাস করে। গহ্বরের প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং ইহা অন্ধকারময়। প্রাচীনকালে গুহাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের স্বভাব পরিচায়ক এবং উজ্জ্বল ছায়া দৃষ্ট হইত। পরে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। কেবল মাত্র সামান্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু যিনি ভক্তি-ভরে প্রার্থনা করেন, তিনি ক্ষণকালের জন্য দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া পরিষ্কার ভাবেই ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পান।

যখন তথাগত পৃথিবীতে বাস করিতেন তখন এই দৈত্য গোপালক ছিল এবং রাজাকে দুগ্ধ ও ক্ষীর সরবরাহ করিত। কোন সময়ে কার্য্যে শৈথিল্যতার জন্য তিরস্কৃত হওয়াতে গোপালক ক্রোধান্ধ হইয়া স্তূপে যাইয়া পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রার্থনা করে যে সে যেন ধ্বংশকারী দৈত্যে পরিণত হইয়া দেশের ও রাজার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। পরে পর্ব্বতারোহণ করিয়া গোপালক লম্ফ প্রদান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবং তৎক্ষণাৎ সে দৈত্যরূপে পরিণত হইয়া এই গুহা অধিকার করিয়া দেশ ও রাজাকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তথাগত এই উদ্দেশ্য অবগত হইয়া করুণাপরবশ হইয়া মধ্য ভারত হইতে এই স্থানে আগমন করেন। দৈত্য তথাগতের আগমনে অহিংসা পরমধর্ম্ম এই সার সত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। যাহাতে বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ সদাসর্ব্বদা এই গুহায় তাঁহাকে পূজা করিতে পারে, সেইজন্য গুহায় বাস করিবার জন্য দৈত্য বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করে। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন যে,"এই স্থানে আমি আমার ছায়া রাখিয়া যাইব এবং তোমার নিকট হইতে অনবরত পূজা গ্রহণের জন্য পাঁচজন অর্হৎ প্রেরণ করিব। সত্যধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও তোমার দত্ত পূজা গৃহীত হইবে। যদি তোমার অন্তঃকরণে কোন মন্দাভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে তুমি আমার ছায়ার দিকে চাহিলে তোমার সে অভিলাষ দূরীভূত হইবে। ভদ্রকল্পে (৩) যে সকল বুদ্ধের আবির্ভাব হইবে তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় ছায়া তোমাকে দান করিবেন।" গুহার বহির্দ্দেশে দুইখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর আছে। একখানির উপর তথাগতের পদ চিহ্ন আছে। মধ্যে মধ্যে ইহা উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। গুহার উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষে তথাগতের শিষ্যগণ উপাসনা করিতেন।

গুহার উত্তর পশ্চিম কোণে একটী স্তূপ আছে এই স্থানে বুদ্ধদেব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্য একটী স্তূপে তথাগতের চুল ও নখাবশিষ্ট আছে। নিকটেই অন্য স্তূপে তথাগত তাঁহার ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া স্কন্ধ ধাতু আয়তন সম্বন্ধে নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন। গুহার পশ্চিমে বৃহৎ পর্ব্বতে তথাগত নিজ কশায় বস্ত্র ধৌত করিয়া প্রসারিত করিয়া-ছিলেন। সূত্রের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নগরহরার ৩০ লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে হিলোনগর। ইহা উচ্চে অবস্থিত। নগরে যথেষ্ট পুষ্প পাওয়া যায় এবং হ্রদের জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। অধিবাসীরা সরল, সাধু এবং সৎ। এখানে দোতলা একটী প্রাসাদ আছে; উহার কড়িগুলি চিত্রিত এবং স্তম্ভগুলি লোহিতবর্ণে রঞ্জিত। দ্বিতলে সপ্তপ্রকার মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত একটি স্তূপ আছে; তথায় তথাগতের করোটীর অস্থি রক্ষিত। করোটীর পরিধি ১ ফুট দুই ইঞ্চি। চুলের ছিদ্রগুলি এখনও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎ শুভ্র ও পীত। যাহারা শুভাশুভ লক্ষণ জানিতে চায় তাহারা সুগন্ধি মৃত্তিকা করোটীর উপর স্থাপন করিলে পুণ্যানুসারে মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া শুভাশুভ সূচনা করে। অন্য আর একটী ক্ষুদ্র স্তূপেও তথাগতের করোটীর অস্থি রক্ষিত

(৩) যে কল্পে আমরা বাস করিতেছি এই কল্পে সহস্র বুদ্ধ আবির্ভাব হইবেন।

আছে। ইহা দেখিতে পদ্ম পত্রের ন্যায় এবং ইহার বর্ণ অপর করোটীর ন্যায়। ইহা মূল্যবান আধারে সংরক্ষিত।

অন্য স্তূপে তথাগতের চক্ষুর তারা আছে। চক্ষুর তারাটী আমড়া ফলের ন্যায় বৃহৎ এবং ইহা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ; ইহাও একটী মূল্যবান আধারে সুরক্ষিত। উত্তম কার্পাস নির্ম্মিত পীত লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট তথাগতের সঙ্ঘরাম বস্ত্রও মূল্যবান আধারে রহিয়াছে। যেহেতু অনেক মাস ও বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে সেই জন্য ইহার সামান্য অনিষ্ট হইয়াছে। তথাগতের লৌহ-মণ্ডলবিশিষ্ট যষ্টি এবং চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত যষ্টিও মূল্যবান দ্রব্যনির্ম্মিত আধারে রক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি, জনৈক রাজা এই দ্রব্যগুলি তথাগতের নিজস্ব বলিয়া বলপূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া নিজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে যাইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে দ্রব্যগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে সেগুলি তাহাদের পূর্ব্বতন স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছে। এই পাঁচটি পবিত্র দ্রব্য অনেক সময় অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করে।

এইসকল পবিত্র দ্রব্যকে অনবরত পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য উপহার দিবার জন্য কপিশারাজ পাঁচজন সদ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনবরত জন সাধারণ এই দ্রব্য গুলিকে পূজা করিবার জন্য সমবেত হওয়ায় এবং নির্জ্জনে তপস্যার জন্য, ব্রাহ্মণগণ শান্তিরক্ষণার্থ পূজার জন্য নির্দ্ধারিত শুল্ক স্থির করিয়াছেন। যাহারা তথাগতের করোটী দেখিতে অভিলাষী হয় তাহাদের এক সুবর্ণ মুদ্রা দান করিতে হয়; যাহারা উহার প্রতিকৃতি গ্রহণেচ্ছুক তাহাদের পঞ্চসুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে হয়। অন্যান্যগুলিতেও নির্দ্ধারিত শুল্ক আছে। যদিচ এই শুল্ক অত্যন্ত উচ্চ, তত্রাপি অনেক লোক পূজার্থ একত্রিত হয়।

দ্বিতীয় প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে নাতিবৃহৎ স্তূপ আছে। স্পর্শমাত্রেই ইহা কাঁপিতে থাকে এবং ইহার ঘণ্টা ও ঝুনঝুনিগুলি শব্দ করিতে থাকে। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পাঁচ শত লি গমন করিয়া আমরা কিয়েনটোলো (গান্ধার) রাজ্যে পৌঁছি।

কিয়েনটোলো (গান্ধার)

গান্ধার রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে ১০০০ লি এবং উত্তর দক্ষিণে ৮০০ লি বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বসীমায় সিন (সিন্ধু) নদী। রাজধানী পোলুসাপুলো (পুষ্পপুর) নামে কথিত হইয়া থাকে। রাজধানীর পরিধি প্রায় ৪০ লি। রাজবংশ নির্ব্বংশ এবং কপিশা হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণ রাজ্যশাসন করেন। নগর ও গ্রাম জনশূন্য। রাজকীয় আবাসের সন্নিকটে সহস্র ঘর লোক বাস করে। দেশে শাক, পুষ্প ও ফল যথেষ্ট পাওয়া যায়, ইক্ষুদণ্ডও প্রচুর আছে; এই ইক্ষুদণ্ডের রস হইতে অধিবাসীরা চিনি প্রস্তুত করে। জলবায়ু আর্দ্র এবং উষ্ণ এবং সাধারণতঃ বরফ দেখা যায় না। অধিবাসীরা ভীরু এবং নম্রপ্রকৃতির। ইহারা সাহিত্যানুরাগী। অধিকাংশই ধর্ম্মে অবিশ্বাসী এবং অত্যল্পসংখ্যাই সত্যধর্ম্ম বিশ্বাস করে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে অনেক শাস্ত্রকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যথা নারায়ণ দেব, অসংখ্য বোধিসত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ব, ধর্ম্মত্রাতা, পার্শ্ব প্রভৃতি। প্রায় সহস্র সঙ্ঘরাম আছে কিন্তু সকলগুলিই জনশূন্য ও ধ্বংশাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট। সেগুলি জঙ্গলাকীর্ণ এবং নির্জ্জন। স্তূপগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। অবিশ্বাসীদিগের শতাধিক মন্দিরে অধিবাসীগণ বাস করে।

রাজধানীর অভ্যন্তরে উত্তর পূর্ব্ব দিকে এক প্রসাদের ভগ্নাবশেষ ভিত্তিমূল দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থানে বুদ্ধদেবের পাত্র মূল্যবান প্রাসাদে রক্ষিত হইত। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর, তাঁহার পাত্র এই প্রদেশে অনেক শতাব্দী ধরিয়া পূজিত হইয়াছিল। এইক্ষণে পাত্রটী পারস্যদেশে আছে।

নগর-বহির্ভাগে ৮।৯ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রকাণ্ডকায় একটি বৃক্ষ আছে। ইহার শাখাগুলি বৃহৎ এবং ইহারই নিম্নে চারিজন বুদ্ধ বসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানেও এই স্থানে চারিটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্রকল্পে আরও ৯৯৬টী বুদ্ধ এই স্থানে উপবেশন করিবেন। শাক্যতথাগত এই বৃক্ষমূলে দক্ষিণামুখে

উপবিষ্ট হইয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন "আমার নির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে, কনিষ্ক নামে এক নরপতি এই দেশে রাজত্ব করিবেন। এই স্থানের সন্নিকটে তিনি এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন; তথায় আমার অনেক অস্থি ও চর্ম্ম রক্ষিত হইবে।"

পিপুল বৃক্ষের দক্ষিণে কনিষ্কনির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে কনিষ্ক জম্বুদ্বীপ শাসন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তিনি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না। এক দিবস তিনি জলাভূমি অতিক্রমকালে একটী শ্বেত খরগোস দর্শনে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন। খরগোস এই স্থানে আসিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। সেই সময় তিনি দেখিতে পান যে এক বালক নিকটবর্ত্তী বনে তিনফুট উচ্চ এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছে। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, তুমি কি করিতেছ।" বালক উত্তর করিলেন "পূরাকালে শাক্যবুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধিবলে নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন "এই দেশে একজন বিজয়ী রাজা এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আমার স্মরণচিহ্ন রক্ষা করিবেন।" বর্ত্তমানই সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবারই প্রশস্ত সময় এবং সেই জন্য আমি তোমাকে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আদেশ করিতেছি।" এই কথা বলিয়াই বালক অন্তর্ধান করিলেন।

রাজা এই আদেশে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। বুদ্ধদেব যে ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছিলেন এই সংবাদে তিনি নিজেকে সম্মানিত বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বালকের প্রস্তুত স্তূপ বেষ্টন করিয়া তিনি প্রস্তরের বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। স্তূপ যতই নির্ম্মিত হইতে লাগিল বালকের ক্ষুদ্র স্তূপও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রকারের ৪০০ ফুট উচ্চ এবং সার্দ্ধ শত লি ভিত্তি লইয়া স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্তূপ নির্ম্মাণ শেষ হইলেই রাজা দেখিতে পাইলেন যে সহসা ক্ষুদ্র স্তূপটী বৃহৎ ভিত্তিমূলে দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে স্থাপিত হইয়া কনিষ্ক নির্ম্মিত স্তূপ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে।

রাজা এই ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া তাঁহার স্তূপ ধ্বংসের আদেশ প্রদান করিলেন। দ্বিতীয়তল পর্য্যন্ত ভাঙ্গা হইলে ক্ষুদ্র স্তূপটী পুনরায় স্বস্থানে আসীন হইল। কিন্তু উচ্চতায় অন্যটী অপেক্ষা বেশী থাকিল। রাজা নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা অসম্ভব। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। এই দুইটী স্তূপ বর্ত্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায়। কষ্টসাধ্য ব্যাধি হইলে আরোগ্য লাভের আশায় লোক এই স্থানে গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পোপহার প্রদান করে এবং ভক্তিপূর্ণচিত্তে প্রার্থনা করে। অনেক স্থলেই পীড়িত আরোগ্যলাভ করে।

ক্রমশঃ।

ওলন্দাজি উপনিবেশ সম্বন্ধে কতিপয় মন্তব্য।

(ফেলিসিয়াঁ-শ্যালের ফরাসী হইতে)

বাতাবিয়া—শুক্রবার, ১৯ ডিসেম্বর।

যবদ্বীপে দ্রুত পরিভ্রমণ করিয়া, লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, ওলন্দাজের উপনিবেশপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে, যবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে তাহা লিপিবদ্ধ করিব মনে করিতেছি।

আমার বিশ্বাস, এই উপনিবেশ স্থাপনের

বিষয়টি নিঃস্বার্থভাবে অনুশীলন করা আমার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। এই উপনিবেশ-রাজ্যগুলি যুদ্ধের দ্বারা বিজিত হইয়াছে বাহুবলে বশীভূত হইয়াছে—এই ছুতা করিয়া অনেকে—যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহের স্থানে শান্তিকে ও বাহুবলের স্থানে ন্যায়ধর্ম্মকে স্থাপন করিতে চাহেন—উপনিবেশ-সমস্যার সম্বন্ধে বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। উপনিবেশ স্থাপনের কাজটাই অন্যায় ও দুর্নীতিমূলক—এই বলিয়া এককথায় তাঁহারা বিচার নিষ্পত্তি করিয়া বসেন। তাঁহারা ইহা বোঝেন না,—এসম্বন্ধে কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে বাস্তবিক অবস্থাটা জানা আবশ্যক। একথা স্বীকার করিতে হইবে, উপনিবেশ-তন্ত্রটা একটা বাস্তব তথ্য; ভৌগোলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশকালে জাতিবিশেষের আপেক্ষিক অবস্থা—এই সকল কারণে উপনিবেশস্থাপন অনিবার্য্য। যে জাতি য়ুরোপীয় নহে, এবং যুদ্ধকার্য্যে ও আর্থিক হিসাবে যে জাতি দুর্ব্বল, সে জাতিকে কোন য়ুরোপীয় জাতির অধীনে আসিতেই হইবে—যে য়ুরোপীয় জাতি যুদ্ধে ও অর্থে সমধিক প্রবল বলবান্। উপনিবেশপত্তনের কাজ আপাতত অনিবার্য্য—একথা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ন্যায়ানুসারে দেশীয় লোকদিগকে মুক্তিদান করিবার চেষ্টায় উপস্থিতমত বিশেষ-বিশেষ সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সুদূরবর্ত্তী রাষ্ট্রবিপ্লবের শুধু একটা অস্পষ্ট আশা হৃদয়ে পোষণ করিলে কোন কাজ হইবে না। সুতরাং উপনিবেশ সমস্যার সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি, সমস্ত মতবাদগুলি, সমস্ত তথ্যগুলি ভাল করিয়া অনুশীলন করা আবশ্যক। বর্ত্তমান অবস্থাটা জানিতে পারিলে, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হইবে।

যবদ্বীপে ওলন্দাজেরা কি করিতে চাহিয়াছিল?—তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?—আর কিছুই নহে,—উপনিবেশ-রাজ্যের যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্বল, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তাহা হইতে ধন উৎপাদন করিয়া ওলন্দাজ-দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা, স্বদেশকে লাভবান্ করা,—ইহাই উদ্দেশ্য।

ইহা সেই কার্য্যপ্রণালী, যাহা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে General Vanden Basch কল্পনা করিয়াছিলেন। উপনিবেশ সম্বন্ধীয় মতবাদের ইতিহাসে, এই প্রণালীটি Basch এর প্রণালী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। প্রণালীটি এইঃ—য়ুরোপীয় রাজসরকার,—য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনীয় বিদেশী গাছ রোপন ও চাষ করিবার জন্য দেশীয় লোকদিগকে বাধ্য করেন; দেশীয় লোকেরা তাহাদের কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য, একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সরকারের গুদামে দাখিল করিতে বাধ্য। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্য য়ুরোপে চালান করিলে খুব লাভ হয়। কেননা, খুব কম মূল্যে খরিদ করিয়া খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় করা হয়।—প্রথমে চিনি, তামাক, চা, নীল প্রভৃতি সকলপ্রকার চাষের সম্বন্ধেই Basch এর প্রণালী অনুসৃত হইত, পরে ক্রমশঃ শুধু কাফির চাষেই এই প্রণালী প্রযুক্ত হইল। এই অনন্যসাধারণ অর্থ-নৈতিক বন্দোবস্তটি—যুগপৎ সরকারের অনুকূল ও প্রজার প্রতিকূল; সরকারের

অনুকূল এইজন্য যে, একটা সমস্ত বাণিজ্য সরকারের একচেটিয়া; প্রজার প্রতিকূল এইজন্য যে, খুব অল্প মজুরীতে চাষীদিগকে চাষ করিতে বাধ্য করা হয়। এই প্রণালীটি প্রজাপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এই প্রণালী অনুসারে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হওয়া দূরে থাক্, বরং তাহারা প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠে; সামাজিক শ্রমের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত হইতে এইরূপই আর্থিক লভ্য হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিটি যেরূপ সরকারের অনুকূল সেইরূপ যদি প্রজারও অনুকূল হইত, যে প্রভূত অর্থ ওলন্দাজেরা আত্মসাৎ করে, তাহা যদি দেশীয় চাষাদিগের ভোগে আসিত, তাহা হইলে অচিরাৎ যবদ্বীপবাসীদিগের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

যবদ্বীপের ভূমি কর্ষণ করিয়া ধনোৎপাদন ও ধনোপার্জ্জনই ওলন্দাজদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায়, এই উদ্দেশ্যের সহিত মিল করিয়া তাহারা রাজ্যশাসনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি নিপুণভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছে। এইরূপ হীন উদ্দেশ্য হইলেও, অনেক বিষয়ে তাহাদের রাষ্ট্রনীতিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাহারা দেশীয় লোকের রীতিনীতি আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া দেশ শাসন করিতেছে। রাজপুরুষেরা যাহাতে দেশের রীতিনীতি সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারে এইজন্য তাহাদিগকে দেশীয় ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়। দেশের প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতিও তাহারা সম্মান প্রদর্শন করে। ইহাদের মতো পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদাসীনতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহারা দেশীয় গ্রাম্যমণ্ডলীদিগকে বহুপরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছে। ইহারা চীনের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় লোকদিগকে এবং লুব্ধ য়ুরোপীয় উপনিবেশিকদিগের হস্ত হইতে দেশীয় লোকের অধিকৃত কৃষিভূমিকে রক্ষা করিয়াছে। যবদ্বীপের কৃষিভূমি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা একটু নূতন ধরণের। দেশের অধিকাংশ বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর সরকারের স্বত্বাধিকার। প্রজাদের প্রায়ই অস্থায়ী স্বত্ব—কয়েক বৎসরের জন্য তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হয় মাত্র; কোন কোন জমি ৭৫ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়া থাকে। সরকারই সাধারণের স্বত্বাধিকারের—দেশীয় লোকের স্বত্বাধিকারের রক্ষক; সুতরাং অন্যায় অত্যাচার হইলে সরকারকে সময়ে সময়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। একদিকে সরকারের এই হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার, এবং অপরদিকে য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীন উদ্যম—এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাজ করা হয় তাহা অতীব প্রশংসনীয়। আমাদের দেশেও কুলপরম্পরাগত চিরস্থায়ী স্বত্বাধিকারের বদলে ক্রমশঃ এইরূপ সীমাবদ্ধ অস্থায়ী স্বত্বাধিকার প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে ভাল হয়।

রাজ্যশাসনের দিক দিয়া দেখিলেও, ওলন্দাজদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অব্যবহিত রাজ্যশাসনের লোভ সম্বরণ করিয়া তাহারা শুধু উপরিতন কর্ত্তৃত্বের (protectorate) ভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর পাশাপাশি সমপদস্থ এক একজন দেশীয় কর্ম্মচারীও অবশ্য আছে। আসল

ক্ষমতাটা য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরই হাতে; তবে যে, একজন সমপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীকে তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার অর্থ আর কিছুই নহে—দেশীয় লোকের দ্বারাই দেশ শাসিত হইতেছে এইরূপ একটা ভান করা মাত্র। এইরূপ মধ্যবর্ত্তী দেশীয় কর্ম্মচারীকর্ত্তৃক যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা প্রজারা ভাল বুঝিতে পারে ও তাহা সহজে সম্পাদিত হয়। দেশীয় বিচারকদিগের দ্বারাই বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তবে প্রধান বিচারপতি একজন য়ুরোপীয়; তিনি দেশীয় ভাষা ও দেশীয় রীতি নীতি সমস্তই জানেন। ওলন্দাজেরা দেশীয়দিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উদ্ধত কর্ত্তৃভাব প্রদর্শন করিলেও, নিজের প্রকৃত স্বার্থের উদ্দেশে, যেরূপ শাসন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা দেশীয়দিগের স্বার্থেরও অনুকূল। এইরূপ উপনিবেশ-শাসন-পদ্ধতি অন্য সকল জাতিরই অনুকরণীয়। যবদ্বীপে ওলন্দাজদিগের, ভারতে ইংরাজ-দিগের, ও কোচিন-চীন ও টিউনিসে ফরাসী-দিগের যেরূপ পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা, তাহাতে জটিল, স্বেচ্ছাচারী, বহুব্যয়সাপেক্ষ অব্যবহিত শাসন অপেক্ষা এইরূপ মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা শাসন করিবার সাদাসিধা পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

মানুষের সম্বন্ধে যেরূপ,—জিনিসের সম্বন্ধেও সেইরূপ ওলন্দাজদিগের 'কেজো' বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমি হইতে ধনোৎপাদন করিবার জন্য তাহারা সুপ্রণালী-ক্রমে যেরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা অসংখ্য খাল কাটিয়াছে। তাহারা কৃষির উন্নতিসাধন করিয়াছে, নূতন-নূতন চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক বৃক্ষাদির অনুশীলন করিয়াছে। কিসে বৃক্ষাদির পরিপুষ্টি হয়, কোন্ ভূমির কিরূপ শক্তি, কোন্ সার কোন ভূমির উপযোগী, কোন্ ভূমির কিরূপ রোগ ও কিরূপ প্রতিকার—সমস্তই তাহারা সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়াছে। এই কার্য্যে সরকারের সহিত ব্যক্তিবিশেষেরও সহযোগিতা আছে। Burtenzorg-উদ্যানে যে ব্যয় হয় তাহার একতৃতীয়াংশ প্ল্যাণ্টারেরা দিয়া থাকে; সরকার প্ল্যাণ্টারদিগকে বীজ, গাছের কলম, এমন কি, মূলধনের অগ্রিম টাকা পর্য্যন্ত যোগাইয়া থাকেন।

এইরূপ সুনিপুণ ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতির দ্বারা ওলন্দাজেরা যবদ্বীপকে বেশ ফলোৎপাদক করিয়া তুলিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যবদ্বীপের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এখন যে ততটা নাই—সে তাহাদের দোষ নহে। কোন কোন প্রদেশে কাফি-গাছ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে; সেই সব স্থানে কাফির চাষ রহিত করিতে হইয়াছে। অন্যান্য ফলোৎ-পাদক দেশের প্রতিযোগিতায়—বিশেষত ব্রেজিলের প্রতিযোগিতায়—চিনি ও কাফির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, ওলন্দাজ-দিগের কখন কখন এইরূপ ভয় হয়, পাছে কোন প্রবল রাজশক্তি এই সুন্দর উপ-নিবেশকে আক্রমণ করে। তাই তাহারা অন্য কোন রাজশক্তির সংস্রবে বড়-একটা আসিতে চাহে না। যবদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, বৈদেশিককে এইজন্য ছাড়পত্র দেখাইতে হয়, কেন ভ্রমণ করিতে আসিয়াছে তাহার

কৈফিয়ৎ দিতে হয়। বৈদেশিকদের নিকট ওলন্দাজ-কর্ম্মচারীগণ সাবধানে কথাবার্ত্তা কহে, দেশ সম্বন্ধে বড়-একটা খোঁজখবর দিতে চাহে না। এই বিষয়ে ইংরাজদের সহিত তাহাদের বিলক্ষণ প্রভেদ; ইংরাজেরা আপনাদের সম্বন্ধে নির্ভয় ও গর্ব্বিত।—ক্ষুদ্র হলণ্ড, বৃহৎ রাজশক্তিদিগকে অত্যন্ত ভয় করে। জাপানও হলণ্ডের মনে ভয় সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; আমি যখন যবদ্বীপে ছিলাম, চীনদিগের প্রতিকূলে বিধিবদ্ধ বিশেষ-আইনগুলাকে এড়াইবার জন্য, তত্রস্থ আড়াই কোটি চীন অধিবাসীর মধ্যে ৬০,০০০ চীন, জাপানী জাতিভুক্ত হইতে চাহিয়াছিল; কেননা, নবসংস্থাপিত সন্ধির বলে, জাপানীরা য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই কতকগুলি ওলন্দাজ এইরূপ মনে করে,—কে জানে যদি জাপানিরা এই চীনদের প্রার্থনা কোন দিন গ্রাহ্য করে, এবং অভিনব জাতিদিগকে রক্ষা করিবার ব্যপদেশে স্বীয় উৎকৃষ্ট নৌ-বহরের সাহায্যে, এই অরক্ষিত দ্বীপটিকে দখল করিয়া বসে?···এইরূপে পূর্ব্বতন উপনিবেশটি ক্রমশই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে; বিশেষত সম্প্রতি কোন কোন ভূখণ্ডে যে সকল রাজনৈতিক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে যেরূপ অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর ওলন্দাজদিগের কোন হাত নাই। যাই হোক, তাহাদের উপনিবেশ-পদ্ধতির কোন দোষ নাই। তাহাদের পদ্ধতিকে প্রশংসা করিতেই হয়,—উদারতার জন্য নহে, পরন্তু তাহাদের 'কেজো' বুদ্ধির জন্য।

অবশেষে বক্তব্য,—সমস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় নিয়ম স্থাপন করা যাইতে পারে। যদি উপনিবেশ-রাজ্য স্থাপন করা অপরিহার্য্যই হয়, তাহা হইলে শান্তি ও ন্যায়ের মিত্রগণ অন্তত এইটুকু দাবী করিতে পারেন যে, বিদেশী রাজা ও স্বদেশী প্রজা—এই উভয়ের স্বার্থের প্রতি যেন সমান দৃষ্টি রাখা হয়। উপনিবেশরাজ্য স্থাপনের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে কতকগুলা দাস-নিয়োগকারী ব্যক্তি কিংবা অ্যাব্স্যাঁথ (absinth) মদ্যের কতকগুলি বণিক ধনশালী হইয়া উঠে। রাজ্যকর্ত্তা কোন য়ুরোপীয় জাতি ও প্রজাস্থানীয় দেশীয় লোক—এই উভয়ের মধ্যে সম্মিলন হইয়া যাহাতে উভয়ই লাভবান হয়, ইহাই উপনিবেশ রাজ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই সম্মিলনের ফলে, অর্থনৈতিক হিসাবে বিদেশী রাজসরকারের বিশেষ লাভ হইয়া থাকে; তাঁহাদের অধীনস্থ উপনিবেশ-রাজ্য,—"সুবিধা জনক ক্রয় বিক্রয়ের একটা বৃহৎ বিপণি"; অন্যত্র অপেক্ষা তাঁহারা সহজে স্বকীয় শিল্প সামগ্রী দেশীয় লোকদিগকে বিক্রয় করিতে পারেন এবং সেখান হইতে শিল্প সামগ্রীর যাহা মূল-উপাদান, সেই সকল নিতান্ত আবশ্যকীয় কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারেন। যতই তাঁহারা দেশীয়দের নিকট হইতে কাঁচা মাল ক্রয় করিবেন এবং দেশীয়দিগকে তাহাদের শিল্প সামগ্রী বিক্রয় করিবেন, দেশীয়দিগের আর্থিক অবস্থারও ততই উন্নতি হইবে। উপনিবেশের উন্নতির পক্ষে দেশীয় লোকেরা একটা প্রধান উপাদান। আবার, তাঁহাদের এই দূরস্থ উপনিবেশ রাজ্যটি, তাঁহাদের পররাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্বন্ধে, তাঁহাদের যুদ্ধকার্য্য

সম্বন্ধে, একটা বিশেষ আশ্রয়স্থল ও সহায় হইতে পারে। পক্ষান্তরে, য়ুরোপীয় শাসনাধীনে, যদি দেশীয় লোকদিগের কোন লাভ না হয়, তাহা হইলে সে শাসন নিতান্ত অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে আসিয়া, দেশীয় লোকেরা বেশী স্বাধীনতা লাভ করিবে, বেশী ন্যায়বিচার পাইবে, বেশী সুখশান্তি সম্ভোগ করিবে, তবেই উপনিবেশ রাজ্যের সার্থকতা। যদি উপনিবেশ রাজ্যের দেশীয় অধিবাসীরা বিদেশীয় শাসনে উপকৃত হয় তবেই নৈতিক হিসাবে উপনিবেশ রাজ্যাধিকারকে সমর্থন করা যাইতে পারে।

যাহারা অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকূল, যাহারা দেশীয় লোকদিগের ন্যায্য অধিকারের পক্ষপাতী, তাহারা অবশ্য ওলন্দাজি শাসনপদ্ধতির মুল-ভাবটিকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। তথাপি দেখা যায়, ভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করিয়াও ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে কতকগুলি সংস্কারকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। যাবায় যেরূপ দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় সেইরূপ সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই হওয়া উচিত; যাবার ন্যায় সকল উপনিবেশ-রাজ্যেই—কি ব্যক্তিগত, কি সমবেত—সর্ব্বপ্রকার স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত হওয়া উচিত। যাবার ন্যায় সকল উপনিবেশ রাজ্যেই শাসনকার্য্য স্বদেশীয় লোকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত; কেবল পরিচালনের কর্ত্তৃত্ব এমন য়ুরোপীদিগের হস্তে থাকা আবশ্যক যাহারা দেশীয় ভাষা, দেশীয় রীতি নীতি সমস্তই অবগত আছে। যাবার ন্যায় সকল উপনিবেশ রাজ্যেই অন্ততঃ প্রাথমিক আদালতের বিচারকার্য্য দেশীয় বিচারপতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। অনেকগুলি য়ুরোপীয় উপনিবেশ-রাজ্যে দেশীয়েরা যেরূপ কষ্ট পায়, এই সামান্য নিয়মগুলি প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ সেই সব কষ্টের লাঘব হইতে পারে।

আর দুই এক শতাব্দীর মধ্যে আরও বড় বড় সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে। পৃথিবীতে যে পরিমাণে সুনীতি ও সদনুষ্ঠানের উন্নতি হইবে, সেই অনুসারে, শান্তি ও ন্যায়-ধর্ম্মের ভাব সর্ব্বত্র প্রসারিত হইবে, উপনিবেশ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসকল য়ুরোপীয়েরা উত্তরোত্তর আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। তখন তাহারা বুঝিতে পারিবে, উপনিবেশগুলি নিত্যকাল পরাধীন থাকিবে—বিধাতার এরূপ অভিপ্রায় নহে। তখন তাহারা দেশীয় লোকের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে; এবং দেশীয়েরা অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিলেও সেই প্রেমের বন্ধন বরাবর থাকিয়া যাইবে। তাহারা অধীন জাতিদিগকে এতটা সমৃদ্ধ এতটা শিক্ষিত এতটা বলবান্ করিয়া তুলিবে যে একদিন সেই সকল জাতির অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিবে; মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, এই উপনিবেশ-রাজ্য-পদ্ধতি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইবে; এবং সেই শুভদিন অগ্রসর করিয়া দিবে যখন সমস্ত জাতি—সকলেই সমান-স্বাধীন—ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া মানব সমাজে শান্তির রাজ্য বিস্তার করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রলোক।

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেবের প্রভাব অপরিসীম! বর্ণনায়, উপমায়, বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, অনুপ্রাসে,—সুধাকর, হিমাংশু, শশাঙ্ক, কলঙ্ক, প্রভৃতি নহিলে কিছুতেই চলে না। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এইরূপে কেবল সাহিত্য কুঞ্জে লীলাখেলা করিয়া, চন্দ্রের নিস্তার নাই। বিজ্ঞান দৈত্য সে পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে।

যখন অভিমন্যু শোকে, ভদ্রার্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন সমুদ্রে এই সুবর্ণের দীপ দেখি, তখন মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে কেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগলগ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে—উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশিগুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক, যে সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এবং এজন্যই চন্দ্র পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন, যে চন্দ্র একটী ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক বিংশতি সহস্র ক্রোশ—ত্রিশ সহস্র যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরত্ব অতি সামান্য—এ পাড়া ও পাড়া মাত্র। ত্রিশটী পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে, দিন রাত্রি চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যাইত।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে চন্দ্রাদিকে চক্ষু দ্বারা আমরা যত বড় দেখি সেই দূরবীণে তাহার অপেক্ষা ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে, যে চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশমাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাই। চন্দ্র যদি মেমারি ষ্টেশনে আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে কলিকাতাবাসীরা তাঁহাকে যেমন স্পষ্ট দেখিতেন, ত্রিংশৎ সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী চন্দ্রকে জ্যোতির্ব্বিদেরা এক্ষণে তেমনি দেখিতেছেন।

এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে, চন্দ্র পাষাণময়, আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ, একটি সুবৃহৎ জড়পিণ্ড। তাহার কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতাবলী—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। আমরা পৃথিবীতে দেখি যে যাহা রৌদ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্র প্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল। এবং যে স্থানে রৌদ্র লাগে না সে স্থান উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় না। চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রের যে স্থান উন্নত সেই স্থানেই প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র লাগে বলিয়া—আমরা তাহা অত্যুজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থান গুলিই "কলঙ্ক"—অথবা "মৃগ"—প্রাচীনদিগের মতে সেই গুলিই "কদম্ব-তলায় বুড়ী, চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগের এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে তাহার ফলে এখন চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত। তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশ সকল সেই মান-চিত্রে বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত এবং তাহার পর্ব্বত-

মালায় উচ্চতাও পরিমিত। জ্যোতির্ব্বিদগণ অন্যূন ১০৯১টী চান্দ্র পর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে "নিউটন" নামপ্রাপ্ত পর্ব্বত ২২, ৮২৩ ফুট উচ্চ। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বত শিখর, পৃথিবীতে আন্দস্ ও হিমালয়ে ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ এবং গুরুত্বে একাশি ভাগের একভাগ মাত্র; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চন্দ্রের পর্ব্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ।

চান্দ্রপর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে; চন্দ্রলোকে অগ্নিহীন আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত নির্ব্বাপিত আগ্নেয় পর্ব্বত শ্রেণী ভূতপূর্ব্ব অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্র সকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া এককালে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবর বিশিষ্ট,—বিদীর্ণ, ভগ্ন ছিন্ন ভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়। এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরী-দিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এখানে জীবের বসতি আছে কি? যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ণ-পরীক্ষক যন্ত্রের (Spectroscope) বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই বায়ুও নাই। যদি জলবায়ু না থাকে তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব যে তথায় নাই ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। আমরা যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ শীতকালে দিন ছোট, গ্রীষ্মকালের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড়। যদি দিন তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড় হইলেই, এত তাপাধিক্য হয়, তবে পাক্ষিক চন্দ্রদিবসে না জানি চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তাহাতে আবার পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্রে জল বায়ু মেঘ কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক সূর্য্যালোকে কিরূপ তপ্ত হইয়া উঠে তাহা আমাদের কল্পনাতীত। লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়া বলিয়াছেন, যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ যে তাহার তুলনায় পৃথিবীর ফুটন্ত উত্তপ্ত জলও অতিশয় শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্তের জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না।

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকার, তাহা এক্ষণে আমরা এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন, ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ পাষাণময়। জলশূন্য,—জনহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন, উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ড তুল্য! এই চন্দ্রলোক! ইহাই আমাদের হিমকর, সুধাংশু!

যদি কেহ বলেন, যে চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকের শৈত্য স্পর্শের দ্বারা প্রত্যক্ষ জানিয়া থাকি। বাস্তবিক একথা সত্য নহে—আমরা স্পর্শ দ্বারা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভব করি না। অন্ধকার রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনের বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকের যে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে তাহা পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে। তবে সেটুকু এত অল্প যে তাহা আমাদিগের স্পর্শের অননুভবনীয়।

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি।

প্রতিহিংসা।

(গল্প)

আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য! সারাদিন ধরিয়া সেই বিপুল জনতা কঠোর উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের দীর্ঘ কাহিনীর প্রত্যেক কথাটিকে যেন সাগ্রহে গ্রাস করিতেছিল। এতক্ষণে জুরি তাঁহাদের বিচার নিষ্পত্তির জন্য বিচার গৃহ ত্যাগ করিয়া নেপথ্যে গমন করিলেন দেখিয়া, সমাগত জনমণ্ডলী একটু বিশ্রামের অবসর লাভ করিল।

এতগুলি উদ্বিগ্ন মুখের মধ্যে কেবল একখানি মুখ নিতান্তই নিরুদ্বিগ্ন স্থির। সে মুখ সেই কাঠগড়ার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিযুক্ত অপরাধীর! একটা শ্রান্তি ও সন্দেহের কালিমা চিহ্ন সেখানে এখনও স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে সত্য, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সেখানে নৈরাশ্যের যে একটা নিবিড় ছায়া দেখা গিয়াছিল এখন তাহা অপসৃত হইয়াছে,—এখন তাহাকে দেখিলেই মনে হয় সে অদৃষ্ট স্রোতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, যেন এতক্ষণে বুঝিয়াছে যে আজ ভাগ্যদেবীর সকল শক্তিই তাহার বিপক্ষ,—এই বিষম সংগ্রামে তাহার পরাজয় অনিবার্য্য।

এতক্ষণ সে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছে; তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করিয়া সে বার বার বলিয়াছে যে সে তাহার প্রভুর অর্থ কখনই অপহরণ করে নাই,—নিশ্চয়ই কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিয়া থাকিবে।

এই স্থলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। এই ব্যক্তি ন্যাথাল কারষ্টিন্ নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম করিত। ন্যাথানের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া ব্যবসা ছিল। কিন্তু অল্পদিন পূর্ব্বে কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কিছু টাকা ঋণ লইয়া যায়। কিছুদিনের মধ্যেই সেই অলঙ্কারগুলি চুরি যায় এবং পরে অন্বেষণে সেগুলি তাঁহার সেক্রেটারির পোর্টমাণ্টো হইতে বাহির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে যখন লুকাইয়া পলায়ন চেষ্টা করিতেছিল তখন অলঙ্কার সমেত ধরা পড়িয়াছে। এবং অলঙ্কারগুলি যে কি প্রকারে তাহার দ্রব্যের মধ্যে আসিল উইল ভেয়ার তাহার কোনই সদুত্তর দিতে পারে নাই।

জুরি বিচাব গৃহ ত্যাগ করিবার পরেই বিচারক তাঁহার আপন প্রকোষ্ঠে প্রস্থান করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিচারক থর্ণ চেয়ারে হেলিয়া বসিয়া পড়িলেন, আজ কেমন একটা অভিনব ক্লান্তি আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে! একটা যেন কি অজ্ঞাত বেদনা আজ তাঁহার অন্তরের সুপ্ত তন্ত্রীকে আঘাত করিয়া বহুদিনের অতীত স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে! আঘাতটা কিসের তাহা তিনিই নিজেই স্থির করিতে অক্ষম!

সে দিন বিচারালয়ে সারাদিন ধরিয়া একটা যেন ছায়াময়ী মূর্ত্তি অতীত প্রেমের প্রেতাত্মার

ন্যায় তাঁহাকে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,—যেন মৃত্যুর কঠোর নিষ্পেষণে নিস্তব্ধ একটি কণ্ঠের ক্ষীণস্বর সারাদিন তাঁহার শ্রবণ মূলে মৃদুগুঞ্জনে কি বলিতেছিল—তাহার অর্থ তাঁহার নিকট অবোধ্য।

আজ এতদিন পরে সহসা বিচারগৃহের পাষাণ দেয়াল বিদীর্ণ করিয়া আইনের নীরস তর্কজাল ভেদ করিয়া তাঁহার স্নিগ্ধযৌবনা পরলোকগতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতিটি যে কি কারণে তাঁহার মানসপটে উদিত হইল এবং তাহার আকুলস্পর্শে মর্ম্মমধ্যে বহুদিনের বিস্মৃত বেদনাটিকে জাগাইয়া তুলিল তাহা তিনি কোনমতেই স্থির করিতে পারিলেন না।

পত্নীর প্রেম ও সন্তানের স্নেহে একদিন তাঁহার হৃদয়টি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় ছিল,—তেমনই স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি সুগন্ধময়! কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা। যেদিন ভীষণ ভূমিকম্পে দক্ষিণ আমেরিকার সমৃদ্ধ নগরী ধূলিসাৎ হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণপ্রিয় পুত্র চিরদিনের মত বিদায় লইল, সেইদিন হইতে তিনি আর সে মানুষ নাই! এক্ষণে তিনি কঠোর, কর্কশ, নির্ম্মম,—তাই আজ এই করুণ স্মৃতির আঘাতে তিনি আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

সহসা কে দ্বারে আসিয়া আকুল আঘাত করিতে লাগিল, যেন প্রাণপণে সাক্ষাৎ ভিক্ষা করিতেছে! থর্ণ চকিতনেত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন সম্মুখে এক আলুলায়িতকুন্তলা, উৎকণ্ঠিত নয়না, যুবতী। রমণী বিনা আহ্বানে গৃহে প্রবেশ করিয়া ত্বরিত করে দ্বার বন্ধ করিল—এবং দ্বারদেশে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া স্ফীত বক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। "এথেল!" সহসা এই নামটি উচ্চারণ করিবা থর্ণ বিস্মিত নেত্রে নবাগতার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে তাঁহার মুখের ভাব কঠোর হইয়া আসিল! তিনি বার বার বলিয়া থাকেন যে বিচারালয়ের মধ্যে তিনি কেবলমাত্র আইনের দাস, তথায় বাহিরের কোনও ব্যক্তিরই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা জানিয়াও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর পক্ষে এরূপ সময়ে এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা কোনমতেই সঙ্গত হয় নাই!

এই যুবতীটি তাঁহার পোষ্য কন্যা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা কন্যাটিকে লইয়া তিনি পালন করেন। দক্ষিণ আমেরিকার সেই বিয়োগান্ত অভিনয়ের পরে তাঁহার অন্তর মধ্যে যেটুকু কোমল স্নেহ অবশিষ্ট ছিল, তাহার সবটুকুই তিনি এই কন্যাটির উপর সমর্পণ করিয়াছিলেন।

যে তিরস্কারের উচ্ছাস তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল, তাহা যুবতীর কাতর দৃষ্টি ও কম্পিত অধর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কণ্ঠ মধ্যেই মিলাইয়া গেল।

"খুল্লতাত! আপনার তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে—রক্ষা করিতেই হইবে!" কথা কয়টি রুদ্ধ কণ্ঠের ক্ষীণ গুঞ্জনের ন্যায় কষ্টে বাহির হইল।

"এথেল, আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি অসুস্থ বলিয়া গৃহে আছ। কিন্তু তুমি এ ভাবে এখানে উপস্থিত কেন, আর তোমার কথারই বা অর্থ কি? কাহাকে রক্ষা করিব!"

যুবতীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সে বলিয়া উঠিল—"যে ব্যক্তি এক্ষণে আপনার নিকট বিচারাধীন আছে তাহাকে। উইল ভেয়ারকেই আমি গোপনে ভাল বাসিয়াছি, এই ব্যক্তিকেই আমি স্বামীরূপে বরণ কবিয়াছিলাম! হায়, আপনি যদি লেশমাত্রও দয়াস্নেহ দেখাইতেন, তাহা হইলে আপনার সহানুভূতি লাভের আশায় আশ্বস্ত হইয়া আমি কতই আনন্দের সহিত আপনাকে আমার অন্তরের সকল কথা বলিতাম,—আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা, দিনে দিনে প্রণয় পরিণতির কথা! কিন্তু,—কিন্তু আমার কেমন একটা ভয় হইত; আজ কেবল আমার সে ভয় আর নাই; আজ তাহাব অপেক্ষা অধিক ভয়ে, আমার প্রিয়তমের জন্য ভয়ে, সে ভয় পলাইয়াছে!"—বিচারক বজ্রনিনাদে বলিয়া উঠিলেন—চুপ! এই ব্যক্তিই যদি তোমার প্রেমপাত্র হয় তাহা হইলে লজ্জায় তোমার নীরব থাকাই কর্ত্তব্য।"

যুবতী উন্মাদিনীর ন্যায় অধীর হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—"আপনি কি মনে করেন এই ব্যক্তির প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে আমার কোন প্রকার লজ্জ বোধ হয়? সে নির্দ্দোষ, আমি বলিতেছি আপনাকে, সে আপনার আমার মতই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

"তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বিদেশে পলায়নের কল্পনা—তাহার আচরণ ও আয়োজন হইতেই বুঝা যায় যে সে পূর্ব্ব হইতেই অপহরণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। তুমি এ সকলের কোন কৈফিয়ৎ দিতে পার?"

"অবশ্যই পারি। আমারই জন্য সে এই সকল ব্যবস্থা করিতেছিল। সে তাহার বর্ত্তমান ঘৃণ্য জীবন ও জীবিকা ত্যাগ করিবার জন্যই সে পলায়নে উদ্যত হইয়াছিল, আমি সহধর্ম্মিণীরূপে তাহার অনুসরণ করিব স্থির করিয়াছিলাম। সে আমার কাছে তাহার জীবনের কোন কথাই লুকায় নাই। আমি জানিতাম সে এক সময়ে নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার পার্শ্বে থাকিলে যে দেব চরিত্র হইত।"

বিচারক থর্ণের পক্ষে আর ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

"তাহার মধ্যে যদি এতই মহত্ত্ব ছিল, তাহা হইলে সে যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েক বৎসর এরূপ জঘন্য সংস্রবে নষ্ট করিবে কেন? বাঃ, সে তোমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে দেখছি!"

"তাহার পালকই চিরদিন শনির মত তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় লিপ্ত, সেই তাহাকে বাল্যকালে এই সকল জঘন্য সঙ্গীগণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এই ব্যক্তিই তাহাকে রক্ষা না করিয়া তাহার দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায় নিয়তই ধ্বংসের পথে প্ররোচিত করিত!"

বিচারকের মুখে ঘৃণার হাসির একটা ক্ষীণ রেখা আসিয়া দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তোমার উন্মত্ত অনুরাগ তোমাকে অন্ধ করিয়াছে। লোকটা অতি পাষণ্ড, তাহার প্রভুর দ্রব্য অপহরণ করিয়া সে যৎ-পরোনাস্তি অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। এখেল, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আর কোন কথা যেন তোমার কাছে কখনও না শুনি।"

"খুল্লতাত!" যুবতীর কম্পিত অধর হইতে কাতরে এই সম্বোধনটি বাহির হইল, বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি দিয়া বক্ষের বেদনা গলিয়া ঝরিতে লাগিল। "খুল্লতাত, আপনি —আপনি অতি নির্দ্দয়। অনাথিনীর কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব উইল ভেয়ারের সহিত গ্রথিত এবং সেই উইল-ভেয়ারকে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার হস্তে!"

"কি ছেলে মানুষের মত বকিতেছ! তাহার অদৃষ্ট যে জুরির হস্তে নির্ভর করিতেছে তা কি তুমি জান না?"

"কিন্তু তাহার শাস্তি বিধানের শক্তি আপনার হস্তে। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে সামান্য শাস্তি দান করিতে সহজেই সক্ষম। এইটি আপনাকে করিতেই হইবে।

"চুপ!" দ্বারে দুইবার আঘাত হইল, —বিচারক তাহার অর্থ বুঝিলেন,—জুরি তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

থর্ণ এথেলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার রক্তহীন মূর্চ্ছিত প্রায় দেহলতা কপাটের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে—বাত্যাবিচ্ছিন্ন শতদলের ন্যায় তাহার মুখখানি মলিন ও শুষ্ক! আজ কয় সপ্তাহ অসুস্থতা বশতঃ সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই,—আজ তাহার প্রিয়তমের বিপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া তাহার দেহের সকল দুর্ব্বলতা দূর হইয়া গিয়াছে, এবং এই শেষ সময়ে সে বিচারালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

বিচারক বিচারগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি মনে মনে কর্ত্তব্যস্থির করিয়াছেন।

আজ তিনি এথেলের প্রতি নির্দ্দয় ভাবে দয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকালের জন্য এই নির্ব্বোধ প্রেম-পীড়িতা বালিকা ও তাহার অপদার্থ প্রেমাস্পদের মধ্যে অন্তরায় স্বরূপ কারাপ্রাচীর উত্তোলিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি সময়ের শক্তির পরিচয় জানিতেন এবং এথেল চিরদিনই নম্র ও বাধ্য স্বভাব!

আজ যে ব্যক্তিকে তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধ কারাদণ্ডিত করিতেছেন একদিন এথেল তাহাকে বিস্মৃত হইবে। এই সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একদিন এথেলই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান করিবে! ইহাই সংসারের চিরদিনের যুক্তি!

জুরির অগ্রগণ্যকে যখন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল তখন বিচার গৃহের চতুর্দ্দিকে সকলেই 'নির্বাত নিষ্কম্প' প্রদীপের ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে নিশ্চল নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল! উত্তর হইল—"অপরাধী!" বিচারক তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন।

তখন বিচারক থর্ণ অপরাধীকে সম্বোধন করিয়া গভীর গম্ভীর স্বরে তাহার অপরাধের বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—

"সাত বৎসর কঠোর কারাবাস।"

শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করিবামাত্র বিচারক ও অপরাধীর চারি চক্ষু মিলিত হইল—অপরাধীর দৃষ্টি বৈরাগ্যবেদনায় কাতর, বিচারকের দৃষ্টি একটা আকস্মিক দ্বিধার আবেগে প্রশ্নময়—আর সে কঠোর তীব্রতা নাই!

সেই ছায়া মূর্ত্তির, সেই অদৃশ্য আত্মার উপস্থিতির অনুভূতি আসিয়া আবার তাঁহাকে

আকুল করিয়া তুলিল ;—বহুদিনের পরিচিত একটা কণ্ঠস্বরের রুদ্ধ কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে থাকিয়া থাকিয়া বাজিতে লাগিল! ব্যাপারটা একটা মানসিক ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে—মুহূর্ত্ত মধ্যে মিলাইয়া গেল! পর মুহূর্ত্তেই উইলভেয়ারের বিচার ও শাস্তির গুরু অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল!

(২)

কয়েক ঘণ্টা পরে বিচারক থর্ণ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া আছেন,—গভীর চিন্তামগ্ন। সেদিন যে লোকটাকে শাস্তিদান করিয়াছেন সে যেন আজ তাঁহার বুকের ভিতর কি একটা দুরপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে,—যেন কিসের একটা অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া আজ তাঁহার মর্ম্ম দ্বারে অবিরামই আঘাত করিতেছে!

সহসা তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন,—প্রাণটা যেন শিহরিয়া উঠিল,—বাহিরে যেন একটা পদশব্দ শুনা গেল! বাটীর সকলেই নিদ্রিত—এত গভীর রাত্রে ওরূপে নড়িয়া বেড়ায় কে?

নীরব প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে দ্বারটি উন্মুক্ত হইল এবং সম্মুখে এক দীর্ঘকায় ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার কুটিল মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই থর্ণ তাহাকে চিনিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ একটা বিস্ময়ের রুদ্ধ ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল!

থর্ণ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন,—তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ! মুহূর্ত্তকাল উভয়ে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আমি ভাবিয়া ছিলাম প্রচলিত প্রথায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আপনি হয়ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, সেই জন্য সন্ধ্যার সময়ে যখন দ্বার খোলা ছিল, সেই অবসরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলাম।" আগন্তুকের কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ ও মৃদু, অথচ ঈষৎ জয়দর্প মিশ্রিত।

বিচারক ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—"এত বক্রপথ অবলম্বন করিবার কোনও আবশ্যক ছিল না। আমি সাক্ষাৎ করিতাম। অস্বীকার করিব কেন?

আগন্তুক একটা কর্কশ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

"আমি সেই অতীতে প্রতিহিংসা গ্রহণের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা হয় ত' তোমার আজিও স্মরণ আছে এবং হয়ত তুমি সেই জন্য ভীত–আমি ইহাই মনে করিয়াছিলাম।"

বিচারক মস্তক উত্তোলিত করিলেন। এই ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতিতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর সে ভাব নাই,—মুখে সেই স্বাভাবিক কাঠিন্য ও দৃঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

"আমি কাপুরুষ নহি।" বিচারকের স্বর অতি শান্ত।

"না, তুমি কাপুরুষ নও, তুমি কেবল আমার জীবনের সর্ব্বস্ব অপহারক তস্করমাত্র! আমি যে নারীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতাম,—যে ভালবাসা জগতের পক্ষে দুর্লভ, যে ভালবাসার ধারণা স্বপ্নেও তোমার পক্ষে অসম্ভব,—তুমি সেই নারীকে অপহরণ করিয়াছিলে। সে আমার আরাধ্যা দেবী ছিল; সে আমার এই তমসাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভবসমুদ্রের মধ্যে

ধ্রুবতারকা ছিল; যদি সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিত, যদি সে আমার পত্নী হইত, আজ সে আমার জীবনকে পাপমুক্ত পবিত্র করিতে পারিত।" আগন্তুক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল,—প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযত হইয়া বলিল—"তুমি তাহাকে অপহরণ করিয়া আমার অন্তরাত্মাকে দলিত করিয়াছ,—আজ আমাকে আমার এই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করিয়াছ,—আমাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছ,—প্রতিহিংসা ভিন্ন আজ এ অন্তরের সকল বৃত্তিরই বিনাশ করিয়াছ!"

বিচারক মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—"এতকাল পরে আর প্রতিহিংসার কথা উত্থাপিত করা বৃথা।" লোকটিকে দেখিয়া বিচারকের পক্ষে অবিচলিত থাকা অসম্ভব, কারণ এককালে তাঁহারা উভয়ে বাল্যবন্ধু ছিলেন।

তিনি সত্যই তাহার অন্তরে একদিন ব্যথা দিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে আজ তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

"সে সকল অতীত কথা আর স্মরণ কর কেন? এতকাল পরে আমাদের উভয়েরই কি তাহা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে? দেখ যে নারীকে আমরা উভয়েই ভালবাসিতাম সে আজ সমাধিশয্যায় শায়িতা, চিরনিদ্রায় অভিভূতা। দুদিনের জন্য যে সুখভোগ করিয়াছিলাম, তাহার জন্য তোমার এক্ষণে হিংসা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

"তাহার সহিত কি তোমার পুত্রও শায়িত?"

বিচারক গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"হাঁ, মৃত্যু আসিয়া পুষ্প ও কোরক উভয়কেই ছিন্ন করিয়া লইয়াছে।"

আগন্তুক একটা কর্কশ বিদ্রূপের হাসি হাসিল, বিচারক বিস্মিত হইলেন।

"শুন।" লোকটা একটা কম্পিত হস্ত তুলিল,—তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর স্থির ও দৃঢ়। "শুন, হিসাব নিকাশের,—তোমার আমার মধ্যে হিসাব নিকাশের দিন এতদিনে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মনে করিয়াছিলে ভূমিকম্পে তাহার জননীর সহিত তোমার পুত্রও পরলোক গমন করিয়াছে? তোমার সে ধারণা ভ্রান্ত। আমি তখন সেই নগরে উপস্থিত ছিলাম। আমি নিজে রক্ষা পাইয়াছিলাম এবং তোমার অসহায় পুত্রকে—রক্ষা করিয়াছিলাম। সে মরে নাই, আজও জীবিত।"

বিচারক চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন তাঁহার দৃষ্টি স্থির, শূন্য ও বিস্ময় পূর্ণ।

"আমার পুত্র—আমার সেই পুত্র!" রুদ্ধকণ্ঠে এই কথা কয়টি উচ্চারিত হইল। তখন তাঁহার মুখে এক নবালোক আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা অভূতপূর্ব্ব ভাবের স্রোত আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইয়া দিল। অতীত সমস্ত ঘটনাগুলি যেন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে রক্ত কুহেলিকার মধ্যে ভাসিতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি হইতে লাগিল যেন তিনি তাঁহার অতীত বন্ধুকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সবলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—"আজ বিশ বৎসর তুমি আমাকে আমার পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছ। কোথায় সে, আমার পুত্র কোথায়?" কথা কয়টি দন্তের মধ্য দিয়া কষ্টে

বাহির হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ চৈতন্য হইল এবং পরক্ষণেই রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় বিচারক ভূমিতলে পড়িলেন।

অপর ব্যক্তি উল্লাসমিশ্রিত বিদ্রূপের তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—

"এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করানই আমার উদ্দেশ্য। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়াই আজও এ সত্য বুঝিতে পার নাই। যে বালককে আজ কারাগারে প্রেরণ করিয়াছ, সেই উইল ভেয়ারই তোমার পুত্র। আজ সে সমাজে লাঞ্ছিত ঘৃণ্য তস্কর মাত্র,—যে দিন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি সেই দিন হইতেই আমি তাহাকে এইরূপ শিক্ষাই দিয়াছিলাম। তুমি কি মনে কর আমি দয়া বা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম? না, তাহা নহে। প্রকৃতির চতুর্দ্দিকের প্রলয় নৃত্যের মধ্যে আমার অন্তরে প্রতিহিংসা বহ্নি জ্বলিতেছিল। সুবিচারক ন্যায়পরায়ণ পিতা তাহার নিজের পুত্রকে আজ কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে!"

"যথেষ্ট হইয়াছে!" বিচারক ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—তাঁহার মুখ মৃতের ন্যায় রক্তহীন, নিশ্চল। "তোমার এ কথা মিথ্যা!"

আগন্তুক হাসিল। "তাহার মুখে কি সেই সাদৃশ্য দেখিতে পাও নাই? সেই চক্ষু সেই দৃষ্টি, সেই কণ্ঠস্বর!

"যাও!" বিচারক দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। "হাঁ, আমি এখনই যাইতেছি। আর আমার অপেক্ষা করিবার কোনও কারণ নাই। আমার আগমনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে,—আজ আমার প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ।"

লোকটা যখন চলিয়া গেল বিচারক প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় অবিচলিত দৃষ্টিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দ্বার পুনরায় বদ্ধ হইবামাত্র বালুকা প্রতিমার ন্যায় শতধা হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

তাঁহার সেই পত্নীর সন্তান,—তাঁহার পুত্র—আজ তস্কর, কারাদণ্ডিত!

ক্ষোভে, অনুতাপে, ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় শতধা হইতে লাগিল—দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যে মধ্যে অস্ফুটস্বরে জগৎপতির নিকট দয়া ভিক্ষা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে কালরাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাতের অরুণ রশ্মি আসিয়া পাঠাগারে দ্বারদেশে আঘাত করিল। বিচারক সেই গৃহমধ্যেই বদ্ধ রহিলেন।

সুপ্তোত্থিত পৃথিবী পুনরায় কলগানে ভরিয়া উঠিল। সহসা দ্বারদেশে একজন আসিয়া বলিয়া উঠিল—"বিশেষ সুসংবাদ আছে, দ্বার খুলুন।"

কণ্ঠস্বর এথেলের।

তিনি দ্বার খুলিবামাত্র এথেল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। খুল্লতাতের শুষ্ক, শীর্ণ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

"খুল্লতাত,সেদিন আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা আজ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমার প্রিয়তমের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে; এখনই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। হ্যাথেলের এক পুরাতন ভৃত্য

স্বীকার করিয়াছে যে সেই অলঙ্কারগুলি তাহার প্রভুর নিকট হইতে অপহরণ করিয়া উইল-ভেয়ারের পোর্টমাণ্টোর মধ্যে রাখিয়াছিল।”

বিচারক হতবুদ্ধির ন্যায় এথেলের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বন্দী।

৩৭

রাজার কথাটাই এখন কেবল আমার মনে পড়িতেছে! আশ্চর্য্য! এ চিন্তা মন হইতে যতই দূর করিবার চেষ্টা করি সকলই বৃথা হয়! দুই কাণের পাশে যেন কে বলিতেছে, “রাজা! এমন সময় এই সহরের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটি কক্ষে তিনি বসিয়া আছেন! আমারই মত অসংখ্য প্রহরী তাঁর দ্বারে দাঁড়াইয়া!” তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে আর আমি কত নিম্নে—এই প্রভেদ! তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে—কি মহিমা, কি গরিমা, কি যশ, কি উল্লাস! চারি দিকে প্রেম ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্ঝর ঝরিতেছে! তাঁর সম্মুখে তীব্রস্বর মৃদু, গর্ব্বিত শির নত হয়! তাঁর চক্ষের সমক্ষে স্বর্ণরৌপ্য ঝলসিতেছে! সভাসদ বেষ্টিত রাজাসনে বসিয়া তিনি আদেশ দিতেছেন; সসম্ভ্রমে সকলে সে আদেশ পালন করিতেছে! কখনো মৃগয়া-বসন—কখনো নৃত্য-গীত—মুখের কথাটি বাহির হইলে হয়, অমনি অসংখ্য লোক বিলাসপ্রমোদের আয়োজনে শশব্যস্ত হইয়া উঠিবে।

রাজা! আমারি মত রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষ, এই রাজা! তাঁর লেখনীর একটি ইঙ্গিতে আমার ফাঁসিকাঠ সরিয়া যাইতে পারে! জীবন, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য গৃহ—সকল সুখ নিমেষে আমার করায়ত্ত হইতে পারে! আরো শুনিয়াছি, তাঁহার চিত্ত করুণায় ভরা! তবু আমার প্রাণটা কেহ বাঁচাইবে না? একটা মানুষের প্রাণ!

৩৮

তবে এস সাহস! মৃত্যুর বিভীষিকা দূর করিয়া দাও! কিসের আতঙ্ক, কিসের ভয়? এস মৃত্যু—আমি তোমাকে হাস্যমুখে আলিঙ্গন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি! এস তুমি, মিত্র হও, শত্রু হও, এস তুমি!

চক্ষু মুদিয়া দেখিব—উজ্জ্বল আলোকে চারিধারে ভরিয়া গিয়াছে—আমার আত্মা সে কি আলোকের হ্রদে স্নান করিতে চলিয়াছে। মাথার উপর অনন্ত আকাশ আলোকোজ্জ্বল, আর নক্ষত্রগুলা সেই শুভ্র আলোকের গায় যেন কতকগুলা কৃষ্ণচিহ্নমাত্র! কালো মখমলের মত আকাশে এখন যেমন হীরার টুকরার মত সেগুলা ঝিক ঝিক করিতেছে—তখন আর সেগুলা এমনটি থাকিবে না।

কিম্বা হয়ত, হতভাগ্য আমি দেখিব কোথায় আলো, কোথায়ই বা বায়ু! বায়ুও

আলোকহীন একটা গহ্বরের মধ্যে যেন নামিয়া পড়িয়াছি, আমার চারিধারে অসংখ্য দানব বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে!

হয়ত বা দেখিব সেই অস্ফুট অন্ধকারে আমার শিরোহীন দেহটা পড়িয়া আছে—আর কবন্ধের চারিধারে ভূত প্রেতের উপদ্রব বাধিয়া গিয়াছে! যেন এক বিপুল ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর এক কোণের পর্দ্দা সরিয়া গিয়াছে, আর অসংখ্য দানবের দল পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে! চারিধারে নর-কঙ্কালের পর্ব্বত, তাহারি নিম্নে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছে! মাথার উপর আকাশে আলো নাই—নক্ষত্রগুলা শুধু অগ্নিময় পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতেছে!

আমার পূর্ব্বে ফাঁসিকাঠে যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহারা আমার জন্য দল বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—তাদের মূর্ত্তিগুলা যেন আমি চোখে দেখিতে পাইতেছি—সব রক্তহীন শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, শুষ্কমুখ, কি ভীষণ! অস্পষ্ট আলো-আঁধারে দাঁড়াইয়া অতিমৃদুকণ্ঠে তাহারা কথা কহিতেছে—মুখে কাহারো এতটুকু হাসির রেখা নাই—কি এক আতঙ্ক—কি সে উদ্বেগ—তাদের অন্তরে বাহিরে একটা বিরাট দাগ পড়িয়া গিয়াছে। কোনদিকে আর কিছু দেখা যায় না—শুধু ভিলা হোটেলের ঐ নির্ম্মম ঘড়িটা—ফাঁসি-কাঠে চড়িবার সময় সে তার রুক্ষ মূর্ত্তি রক্ত চক্ষু লইয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে বিদায় দিয়াছিল! জগতে কোথাও কিছু নাই—এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু করুণা—কিছু না!

এমন নানা কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে! এক দণ্ড নিষ্কৃতি নাই!

হায়—কি এ মৃত্যু? কে সে? আত্মাটার সহিত তার এত বিরোধ কেন? এক আঘাতে সে যখন দেহটাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, তখন মনের এই অনুভূতি, এই প্রেম স্নেহ, দয়া মায়া এমন সর্ব্বব্যাপী যে চিত্ত—এসব সে কোথায় উড়াইয়া দেয়? পৃথিবী—কঠিন পৃথিবীর কি এতটুকু মায়া—এমন শক্তি নাই যে এই মৃত্যুটাকেও জয় করিয়া স্বহস্তে সে তার গঠিত জীবনটাকে রক্ষা করে? ভগবান, এ কি বিচিত্র তোমার সৃষ্টিলীলা! কি নিষ্ঠুর এ রহস্য! নির্ম্মম কৌতুক!

৩৯

একটু নিদ্রার জন্য কাতর হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

মাথার মধ্যে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। জীবনে ইহাই আমার শেষ নিদ্রা! স্বপ্ন দেখিলাম!

যেন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি! আমার পাঠাগারে দুইটি বন্ধুর সহিত বসিয়াছিলাম। পার্শ্বের কক্ষে স্ত্রী নিদ্রিতা—কন্যা মেরি তাহারই বুকের কাছে!

আমরা মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলাম—কেহ যেন না ভয় পায়! সহসা একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম! তখনি সন্ধানের জন্য চলিলাম! নিশ্চয় চোর আসিয়াছে!

চারিধারে সন্ধান করিলাম! কেহ কোথা নাই—জনপ্রাণীর চিহ্নও না!

চিমনির পাশে কি ও? কে? দেখি, এক নারী—কেশগুচ্ছ রুক্ষ, মুক্ত, মুখের চারিধারে উড়িয়া পড়িয়াছে—মুখে একটা পরুষভাব! সে চক্ষু মুদিয়াছিল! আমি কহিলাম, "কে তুই?"

সে সাড়া দিল না। আমরা কহিলাম, "কে তুই, বল্ শীঘ্র!" তবু সে কথা কহিল না, বা চোখ খুলিল না!

এক বন্ধু কহিল, "মুখের কাছে আলোটা ধর—এখনি টিট্ হবে!"

তার মুখের কাছে আমি বাতি ধরিলাম! তবু তার মুখে কথা নাই! আমি কহিলাম, "কথা বল্ না মাগী!" তবু সে অচঞ্চল রহিল! আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম! এ কি আপদ আসিয়া জুটিল!

বন্ধু কহিল, "ধর আলো—মুখে!"

আমি তার চিবুকের নিচে বাতি ধরিলাম। সে চোখ খুলিয়া চাহিল! কি ভীষণ তার সে দৃষ্টি! আমি চক্ষু মুদিলাম। সহসা হাতে একটা দংশনজ্বালা বোধ করিলাম! উঃ! চোখ খুলিয়া দেখি, আমার শয্যার সম্মুখে আচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন!

আমি কহিলাম, "আমি কি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম?"

তিনি কহিলেন, "হাঁ! এক ঘণ্টা ঘুমাচ্ছ! তোমার কন্যাকে এনেছি, মেরি—দেখিবে না? তোমাকে জাগাতে না পেরে আমাকে ডেকেছে—তোমার কন্যা মেরি—"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "মেরি! আমার কন্যা মেরি—কই সে? কোথা বলুন! আনুন—আমার বুকে তুলে দিন তাকে!" (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

তৈমুর লঙ্গ

হুসেনের এই পরাজয় হইতেই তৈমুর বুঝিলেন যে, তিনি যে অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সাহায্যে সমগ্র আসিয়া মহাদেশ তিনি পদানত করিতে সমর্থ। তাঁহার প্রজা মেষপালকেরা তাহাদের অশ্বশালা হইতে শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলিকে লইয়া রণবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছে এবং শিশুকাল হইতেই তাহাদিগকে সৈন্যদলের সহিত চালিত হইতে অভ্যস্ত করিয়াছে। এই সকল মেষপালকের অশ্বারোহণ নিপুণতা এবং অশ্বচিকিৎসাব্যুৎপত্তি পরে তাঁহার দেশজয় ব্যাপারে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল।

হুসেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তৈমুর অবাধে সমরখন্দে প্রবেশ করিলেন। এই নগরই হুসেনের বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। নগরপ্রান্তে তৈমুর উপস্থিত হইবা মাত্র বিনা আপত্তিতে তাহার তোরণ দ্বার মুক্ত হইল এবং প্রজাবৃন্দ অক্ষুব্ধচিত্তে মোগল রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। ইতিপূর্ব্বে তৈমুরের পিতৃপুরুষগণই এই সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। এই নগরকেই তৈমুর তাঁহার বিজিত বিপুল সাম্রাজ্যের রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তির বলে সমরখন্দ সমগ্র আসিয়ার ধনসম্পদের ভাণ্ডারভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুস্থান পারস্য, সিরিয়া এবং মিশর দেশ জয় লুণ্ঠন করিয়া তিনি যে বিপুল মণিকাঞ্চন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সমরখন্দেই তাহা সঞ্চিত হইয়াছিল।

সমরখন্দের অধিকার হইতেই তৈমুরের রাজত্ব আরম্ভ হইল বলিতে পারা যায়। মুসলমান ইতিহাস অনুসারে হিজরা ৭৭১ সালে বা ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর এই নগর অধিকার করেন। তৈমুরের বয়স তখন ৩৫ বৎসর। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দারের জীবনের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে বয়সে তাঁহার বিচিত্র জীবনের যবনিকা পতন হইয়াছিল, তৈমুর সেই বয়সে তাঁহার জীবন আরম্ভ করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু এরূপ ভাবে এই উভয় বীরের তুলনা করা সঙ্গত নহে। আলেকজান্দার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৈমুরকে নিজের অতুল চেষ্টায় সিংহাসন গড়িয়া লইতে হইয়াছিল। একজন সুশিক্ষিত অগণ্য সৈন্য বিনাচেষ্টায় লাভ করিয়াছিলেন, অপর জন অশিক্ষিত মেষপালকদের লইয়া এক দুর্জ্জয় সৈন্য গঠিত করিয়াছিলেন। আলেকজান্দারের ন্যায় তৈমুরের আরিষ্টটলের (Aristotle) মত গুরু ছিল না সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও চরিত্রগুণে তিনি আলেকজান্দারের তুল্যই ছিলেন। উপরন্তু তাঁহার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তৈমুর মিতাচারী, পবিত্র চরিত্র, সংযমী এবং স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে নৃশংসতার অপরাধে অপরাধী করে সত্য, কিন্তু বিদেশবিজয়ী বীরের পক্ষে তাঁহার চরিত্র যে বিশেষভাবে নৃশংস ছিল এমন কথা কোনমতেই বলা যায় না।

নূতন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তৈমুর সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সংকল্প করিয়া সমরখন্দের চতুর্দ্দিকস্থ অধিবাসীদিগকে বশীভূত করিতে অগ্রসর হইলেন। আসিয়ার উত্তর দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে যে সকল বীরের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই অনুচর বর্গ লইয়া তুষারমণ্ডিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ খণ্ডের ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশে বসতি করিয়াছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের দিকেই সর্ব্বপ্রথমে এই পাশ্চাত্য-জাতির স্রোত প্রবল বন্যার ন্যায় আসিয়া পড়িল। সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া তৈমুর দেখিলেন যে সে প্রদেশের অধিবাসিদের ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাদিগের হইতে বিভিন্ন। সে সময়ে তাতারগণ সাধারণতঃ সকলেই মুসলমান ছিল। তিনি নিজে তাঁহাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে চেঙ্গিস্ খাঁর ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেন। এই ধর্ম্ম অর্থে এক অনাদি অনন্ত, সর্ব্ব শক্তিমান অদৃশ্য বিধাতায় বিশ্বাস,—তিনিই সর্ব্বময়, সর্ব্বস্ব, অভেদ অখণ্ড। তৈমুর এই অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া কোরাণের বচনকে ঘৃণা করিতেন এবং পৌত্তলিক ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি বিদ্বেষী ছিলেন। শুনা যায় যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা ছিল না। তাঁহার পত্নী নাকি খ্রীষ্ট অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সন্তানদিগকে এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহা হউক সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও পৌত্তলিকতাকে উচ্ছিন্ন করিবার প্রবল আগ্রহে প্রণোদিত হইয়া তৈমুর ভারতের হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন কাবুলই ভারতের উত্তরসীমান্তে প্রধান নগর ছিল। এই নগরের নাম হইতেই সন্নিকটস্থ প্রদেশের নাম কাবুলস্থান হইয়াছিল। তৈমুরের বিজয়ী সেনার সহিত প্রথম যুদ্ধের যে ভীষণ সংঘর্ষ তাহা এই প্রদেশের রাজাকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল। তৈমুরই জয়ী হইলেন এবং সমগ্র কাবুলস্থান লুণ্ঠিত, পীড়িত হইয়া তাতারের বশ্যতা স্বীকার করিল। এ যাত্রায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশ রক্ষা পাইল। সহসা এই জয়োন্মত্ত সৈন্যের বন্যা যাইয়া পারস্যের উপরে পড়িল। তৈমুরের এ গতি পরিবর্ত্তনের কারণ কি তাহা কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তিনি যে সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ না হইয়াই পশ্চিমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তাঁহার পারস্য ও সিরিয়া জয়ের কাহিনী অনেক লেখক লিখিয়াছেন। হিরাট (Herat) জয় ও ধ্বংস করিয়া তিনি খোরাসানের অধিপতি হন। নিকাবোর দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পরে জার্জ্জিয়া রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। কিন্তু পারস্য দেশ জয় করিতে তৈমুরকে অধিক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। সমগ্র পারস্য দেশ জয় করিতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। অবশেষে শিরাজদুর্গে তৈমুরের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল দেখিয়া পারস্যবাসীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, তখন ভুজবলে ও সদাশয় নীতির ফলে তৈমুর সমগ্র দেশ করায়ত্ত করিলেন। পারস্য হইতে তৈমুর দুর্জ্জয় বাহিনী লইয়া আসিয়ার উত্তরতম প্রদেশ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। সে প্রদেশে এক মাস দশ দিন ধরিয়া অস্তহীন সূর্য্য অংশুবিকিরণ করে। সুতরাং সৈন্যের সহযাত্রী ইমানেরা অর্থাৎ ধর্ম্মোপদেষ্টারা সৈনিকগণকে সান্ধ্য উপাসনা হইতে অব্যাহতি দিলেন।

এই বিজয় যাত্রায় তৈমুর উভয় তাতার প্রদেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু পারস্যে সৈন্যের মধ্যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি অবিলম্বে তথায় ফিরিয়া আসিলেন। বাগদাদ রাজ্য তখনও প্রাচীন ব্যাবিলনের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ছিল। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর এক মোগল, সুল্‌তান বেন্‌ এভিস্‌ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তৈমুর এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া সুলতানকে বাগদাদ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। বেন্‌ এভিস্‌ প্রাণ লইয়া মিশরের সুলতানের আশ্রয় লইলেন।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ তাহার বিশৃঙ্খল সীমান্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়া দুর্দ্দান্ত দস্যুর ভাবী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতেছিল। কাবুল রাজ্যে দাসত্ব বন্ধন দেখিয়া সিন্ধুনদের পরপারবর্ত্তী রাজারা সকলেই আত্মরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই সকল রাজারা বিজয়ী তৈমুরের গতিরোধের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের এ ভয় যে ভিত্তিহীন নহে এবং আয়োজন যে নিষ্ফল হয় নাই, তাহা অবিলম্বেই প্রকাশ পাইল। কাবুলে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সিরিয়া হইতে তাতার সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কাবুল বশীভূত করিয়াই তৈমুর এবারে সদলবলে হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতজয়ের এ দ্বিতীয় সুযোগ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল।

মুসলমান কাহিনীর মতে হিজরা ৮০০ সালে বা ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর দ্বিতীয় বার ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তাঁহার ৬৪ বৎসর বয়স। এই সময়েই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য-স্থাপনের যথার্থ সূচনা হয়।

কাবুল ধ্বংস করিয়া তৈমুর নিশ্চিন্ত চিত্তে হিন্দুস্থানের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেন। সিন্ধুনদ ও গঙ্গাতীরের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশই তৈমুরের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু এই ভুবনবিজয়ী বীর ভারতে আসিয়া যে বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় দেখিয়াছিলেন, আসিয়ার অন্য কোনও দেশেই এরূপ দেখেন নাই। আলেকজান্দারের বিজয়গতি রুদ্ধ করিয়া পুরুবিক্রম যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে আসিয়াবিজয়ী মোগল বীরের গতিরোধ করিয়া এক নূতন পুরুবিক্রম দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ে যে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল, তাহা রাজপুতের ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য না হইলেও আসিয়ার ইতিহাসে বিরল বলিলেও চলে। ভারতের বীরবৃন্দের শিরোরত্ন চিতোরের রাণা তৈমুরের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তৈমুর লঙ্গ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া রূঢ় বাক্যে এক পত্র লিখিলেন। এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি পূর্ব্বে অনেক দুর্গ ও প্রদেশ বিনা রক্তপাতে অধিকার করিয়াছেন। তিনি রাণাকে লিখিলেন যে তিনি অবিলম্বে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে তিনি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন। যৌবনতেজে উদ্‌ভ্রান্ত রাণা তৈমুরের পত্র পাইয়া অবজ্ঞাভরে উত্তর না দিয়া, প্রবল বাহিনী লইয়া মোগল আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তৈমুরের অপেক্ষা রাণার সৈন্য সংখ্যা অনেক অধিক এবং অজেয় রাজপুত বীরে গঠিত। মনে হইল যেন সমগ্র হিন্দুস্থান তৈমুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। রাণার সহিত রণক্ষেত্রে অন্যূন এক লক্ষ অশ্বারোহী ছিল। তৈমুরের সহিত দ্বাদশ সহস্র মাত্র অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু তাহাদের সকলেই রণক্ষেত্রে অভিজ্ঞ এবং তাহাদের অধিনায়কের প্রতি প্রবল বিশ্বাসে এবং বহুদিনের অক্ষুণ্ণ জয়োল্লাসে তাহারা অদৃপ্ততেজে দশগুণ অধিক রাজপুত বীরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। উভয় সেনা সম্মুখীন হইবা মাত্র তাতার সেনানায়কেরা শত্রুসংখ্যায় ভীত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল—"এরূপে কতদিন আমরা এই কাণ্ডজ্ঞানহীন খঞ্জের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া চলিব? উঁহার একটি পা ত গিয়াছে, তাহার উপর গজযুদ্ধে আবার একটি হাতও গিয়াছে। নিজের ন্যায় আমাদিগকে অঙ্গহীন পীড়িত করিয়াও কি উঁহার তৃপ্তি হইবে না? উনি কি ইচ্ছা করেন

যে এই বিপরীত জল বায়ুর মধ্যে আমরা প্রাণ হারাইব। কেন না এখানে হিন্দুদের বিষাক্ত তীর হইতে রক্ষা পাইলেও এখানকার দুঃসহ উত্তাপ অসহ্য।” সমগ্র সৈন্তের মধ্যে এই ভাবের আলোচনা হইতে লাগিল এবং তাহারা সকলে রাণার শক্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া হিন্দুস্থান ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এদিকে যখন এই সকল গোলমাল চলিতে ছিল সে সময়ে তৈমুর লঙ্গ নির্ভয়ে, তাঁহার সৈন্যের সাহস ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া, শত্রুর অগণ্য সৈন্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে আপন শিবিরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে তাঁহার সৈনিকেরা হিন্দুস্থান জয়ের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সংকল্প করিতেছে। এরূপ অসন্তোষ নিবারণে অনভিজ্ঞ বলিয়াই হউক বা যুদ্ধে জয়াশা অতি ক্ষীণ বলিয়াই হউক, তৈমুরও সৈন্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিলেন। শিবির সকল উত্তোলিত হইল এবং রসদ অস্ত্র শস্ত্রাদিও শকটে করিয়া স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিল। এরূপ সময়ে এক অশ্বচালক আসিয়া তৈমুরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—“ধর্ম্মাবতার, এতদিন আপনাকে শত্রু রাজের নিকটে জয়ী হইতেই দেখিয়াছি। পারস্য ও সিরিয়া পর্য্যন্ত আপনার-পদানত হইয়াছে। আপনার জন্মভূমি জয় করিয়া, আপনি জগতের অবশিষ্ট অংশ আপনার অধিকার বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতকাল আপনার তাতার সৈন্য আপনাকে অধিনায়ক পাইয়া শত্রু সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইত, আজ আপনি স্বয়ং সৈন্যগণের ভয়কাতরতার সমর্থন করিতেছেন। যান, অশিক্ষিত, অস্ত্রহীন, বিশৃঙ্খল হিন্দুসৈন্তের সম্মুখ হইতে পলায়ন করুন! হয়ত' আপনি জীবন লইয়া পলায়ন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু ভাবী বিজয় গৌরবের আশা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইল।' একজন হীনতম সৈনিকের মুখে এইবার ধিক্কারপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া, সকলের অন্তরে ঈশ্বরের প্রেরণার ন্যায় প্রভূত বল আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং যেন পরস্পরের দৃষ্টি হইতে সাহস সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হয় ত' তৈমুর স্বয়ং এই অশ্বচালককে এইরূপ অভিনয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং এক্ষণে এই সুযোগে সৈনিকগণের হৃদয়ে লুপ্ত সাহসের পুনঃ সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

পোষ্যপুত্র।

৩৫

চন্দননগর ষ্টেশনে নামিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির সাহায্যে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হেমেন্দ্র ও শান্তিকে যোগেশ তাহার শ্যালীগৃহে আনিয়া উপস্থিত করিল। জনবিরল একটি গলির ভিতর কলমিদল, পদ্ম, ও পানাভরা পুষ্করিণীর পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটেগাঁথা ছোট একখানা পুরাতন বাড়ী। তাহার দেওয়াল আগাছায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে ও দরজায় তালা লাগান। যোগেশ বলিল, 'তালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাক, হেমেন্দ্র আপত্তি করিল,—“না না তালা ভেঙ্গে পরের বাড়ী ঢোকে না। আর তাছাড়া যোগেশ, এই পচা পুখুরের ধারে এই নোংরা জায়গায় একদিন থাকলে আমি প্লেগে মারা পড়বো। বাড়িওতো একতালা আর সেঁৎসেতে বলেই মনে হচ্ছে;—এখানে কি কত্তে আনলে!” যোগেশ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল “হ্যাঁ বাড়িটা তেমন ভাল নয় বটে, তা দুদিন এইখানেই

কষ্ট করে থাকলে হতো না? টাকাকড়ি তেমন কিছুতো আমাদের সঙ্গে নেই, এই দেখনা—মোটে সতের টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা আর বাকি আছে—” এই বলিয়া সে হেমেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনিব্যাগ খুলিয়া তাহাকে দেখাইল। আকস্মিক একটা লজ্জার আঘাতে হেম আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে লজ্জার আবরণ আর টানিয়া রাখিতে পারিতেছিল না; জীর্ণ কন্থার মত তাহার একদিকে টানিতে গেলে অপর দিকের নগ্নতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া লজ্জা বর্দ্ধিত করিতেছিল মাত্র। আহতগর্ব্ব হেমেন্দ্র মন্ত্রনিরুদ্ধ বীর্য্যহীন সর্পের মত মনের মধ্যে গুমরিতে লাগিল। জীবনে যে বিনা সংগ্রামে পূর্ণজয়ী হইয়া নিজেকে কমলাসনার বরপুত্র বলিয়া চিনিয়াছিল এখনি তাহার সেই প্রচণ্ড অহঙ্কারে এমনি করিয়া আঘাত দান,—একি বিধাতার বিড়ম্বনা!

তালা ভাঙ্গিয়াই বাড়িতে প্রবেশ করা হইল। যোগেশ শান্তিকে পাশের একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিল “আপনি ওই ঘরে গিয়ে খাটের উপর একটু শুয়ে নিন, বড্ডই ক্লান্ত হয়েছেন, আমি এখনি সব জোগাড় করে ফেল্‌লুম বলে।” শান্তি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মানব-বর্জ্জিত গৃহ ধূলা ও ঝুলে ভরিয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কৃষ্ণকলি ও ডেঙ্গোশাকের সঙ্গে বিস্তর বুনোগাছ জন্মিয়াছে, একপাশে তুলসীহীনমঞ্চ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, যোগেশ সামনের ঘরের শিকল খুলিবামাত্র দুইটা চামচিকে পাখী ভাঙ্গা জানলা দিয়া উড়িয়া গেল। ঘরের ঠিক সামনেই খানিকটা স্থান পাখীর পালকাদিতে অপরিস্কৃত থাকিয়া গৃহস্বামীর পক্ষি প্রিয়তার সাক্ষ্য দিতেছিল। ঘরের মধ্যে একখানি তক্তপোষ ও বড় একটা কাঠের সিন্দুকমাত্র পড়িয়া আছে। একটা কুলুঙ্গীতে দুএকটা মুণ্ডভাঙ্গা মাটির পুতুল ও ঘরের মেঝেয় খানকতক ছেঁড়া কাগজ, ভাঙ্গা হাঁড়ি ও আবর্জ্জনার রাশি। হেমেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই দুইপদ পিছাইয়া আসিল, ঘরের ভারাক্রান্ত বদ্ধ বায়ু মুহূর্ত্তেই তাহাকে হাঁফাইয়া তুলিয়াছিল। যোগেশ জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া কোঁচার কাপড়ে তক্তাপোষের ধূলা ঝাড়িয়া একটা অংশকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া স্তম্ভিত হেমেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিল, “আসুন ছোটবাবু আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করুন আমি একটা লোক ও কিছু খাবার চেষ্টায় যাই।” হেম চৌকাটের নিকট হইতে খুব সাবধানে কোঁচাটা গুটাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীতভাবে বলিয়া উঠিল “এযে ভয়ানক ড্যাম্প! নিশ্চয়ই আমায় ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে মরতে হবে দেখচি।”

যোগেশ আবার মনে মনে একটু হাসিল, কিন্তু বাহিরে সে সহানুভূতি দেখাইতে কোন ত্রুটি করিল না, বলিল “কি করবেন বলুন বিধির বিড়ম্বনা একেই বলে, যাহোক এখন দুদিন কষ্ট সহ্য করুন আবার আমাদের দিনও ফিরে আসবে। তখন সব দুঃখ মেটাবো, যে আপনাকে এতটা কষ্ট দিলে তার কি কখনও ভাল হবে মনে করেছেন? কখন না, ভগবান আছেন তিনিই বিচার করবেন, দেখুন না কেমন মাগীর জাল ফাঁসাই।” হেমেন্দ্র আবেগের সহিত যোগেশকে আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল “ভাগ্যে তোমার

সঙ্গে দেখা হলো যোগেশ, নৈলে আমারতো কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছিল না; তুমিই জগতে প্রকৃত বন্ধু।" যোগেশ বলিল "ওকথা বলবেন না ছোটবাবু। আমরা আপনার ভৃত্য; চিরকাল তো আপনাদের দ্বারেই মানুষ, কি আর কর্ত্তে পারলুম বলুন, ক্ষমতাই বা কতটুকু? তবে এশরীরটা, প্রাণটে দিয়েও যদি আপনাদের বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষে করবার সামান্য সাহায্যটুকুন্ও করতে পারি তাতে পিছুব না। শাস্ত্রে বলে "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।" তা আমি রাজদ্বারে দাঁড়াবার সব বন্দোবস্ত করে দেব কোন ভাবনা নেই।" হেমেন্দ্র পুনশ্চ আবেগ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই যোগেশ, ভাগ্যে তোমায় পেয়েছিলুম!"

যোগেশ একজন দাসী ও আহার্য্য সামগ্রীর যোগাড় করিয়া যখন বাড়ি ফিরিল তখন হেমেন্দ্রের ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া সে সেই শয্যাহীন তক্তপোষের ধূলি-লাঞ্ছিত বক্ষ আশ্রয় করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের পদশব্দে জাগিয়া উঠিল। প্রতিবেশির নিকট হইতে আনা গ্লাসে খানিক ঠাণ্ডাজল ও কিছু কেনা খাবারে জলন্ত ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া হেম বলিল কি জঘন্য জিনিষই কিনেচ হে! কলেরা না হয়। তা যাহোক যোগেশ, তুমিও কিছু খেয়ে নাও, এসো একটা কিছু পরামর্শ দাও, আমিতো ভাই দুদিন এ অবস্থায় থাকলে নিশ্চয়ই মারা পড়বো, তা তোমাকে বলে রাখলুম। বাপ্! এমন করে মানুষে বাঁচতে পারে।"

যোগেশ হঠাৎ ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিল "বৌদিকে একবার দেখবে না? আশ্চর্য্য লোকতো আপনি দেখচি! সে বেচারা এখনও যে মুখে একটু জলও দেয়নি, আমরাতো তবু শ্রীরামপুরে চা টা, খেয়ে নিয়েছিলুম।" হেমেন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তারপর একটু ভাবিয়া কহিল, "তুমিই গিয়ে বলোনা"। যোগেশের সমস্ত হৃদয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেইদিকেই টানিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু তথাপি সে সেই প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল "না না তাকি হয় তিনি কি ভাবলেন, আপনি যান, আমি ঝিটাকে দিয়ে বরং খাবার পাঠিয়ে দিচ্চি, ঝি ঝি গেল কোথা"—"হেমেন্দ্র অনিচ্ছার সহিত উঠিল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করিল না।

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল বদ্ধদ্বার ক্ষুদ্র ঘরের ধূলির উপর শান্তি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না কিন্তু ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিল সে কাঁদে নাই, এবং অনেকক্ষণ হইতেই এই অবস্থায় রহিয়াছে। মনে মনে একটু ভীত হইল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে বরং সে সাহস পাইত। কাছে আসিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে ডাকিল "শান্তি!" শান্তি উত্তর দিল না, হেমেন্দ্রও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এমন বিপদেও সে পড়িয়াছে যে বলিবার নয়, একি গ্রহ! অথচ রাগ করাও অনর্থক, বুঝিবে কে? এবার একটু উচ্চ করিয়া ডাকিল "শান্তি শুনচো?" শান্তি মুখ ফিরাইল, প্রশ্নহীন মৌনদৃষ্টি একবারমাত্র

স্বামীর মুখে স্থাপন করিয়া আবার চোখ নীচু করিল। ঈষৎ লজ্জার সহিত হেম নত হইয়া তাহার হাত ধরিল,—"ওঠো মুখে একটু জল দাও, উঠে এসো।" কোন কথা না কহিয়া শুধু সে হাতখানা টানিয়া লইল। নির্ব্বাক ওষ্ঠ একটুখানি কম্পিত হইয়াই থামিয়া গিয়াছিল, চোখের পাতা আর একটুখানি নামিয়া আসিলমাত্র। নিতান্ত অপমানিত বোধে হেমেন্দ্র দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যোগেশকে গিয়া বলিল "বল্লুম তুমি বলগে তা হলোনা"—ব্যর্থরোষে জলিয়া সে যোগেশের প্রতিই আক্রোশ মিটাইয়া লইল। "তোমাদের কেবল আমায় জ্বালাতন কর্ব্বার ফন্দি বৈতো নয়!" যোগেশ বিরক্ত না হইয়া বরং খুসী হইয়াই উঠিয়া গেল।

দ্বারের নিকটে আসিয়া যোগেশ 'বৌদি' বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখেই কি কোন ক্ষমতা-পন্ন চিত্রকর নির্ব্বাসিতা সীতার চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে নাকি? ঠিক সেই রকমই মুখের ভাবটুকু, বসিবার ধরণটিও যেন তেমনি! করুণস্বরে যোগেশ বলিল 'বৌদি, উঠে আসুন, মুখ হাত ধুয়ে একটু জল টল খেয়ে নিন্, নৈলে আমি প্রসাদ পাইনে যে।" এবার শান্তির নিশ্চলপ্রায় হৃদ্‌পিণ্ড সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তুষার যেমন সূর্য্য কিরণে সহসা গলিয়া জলে পরিণত হইয়া যায় তাহার বুকের মধ্যের জমাট বাঁধা বেদনা তেমনি সেই সহানুভূতির স্বরটুকুতেই গলিয়া আসিল। কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া সে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিল, যোগেশ একবার চকিত কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল—এবার একটু স্বর ছোট করিয়া একটু কাছে আসিয়া বলিল; "আমার কথা শুনুন, আমায় বিশ্বাস করুন্, আমি প্রকৃতই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, —আমি শীঘ্রই সব ঠিক করে দোব, দুদিনেই আবার আপনি লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীরূপে সেখানে ফিরে যাবেন, আমার প্রাণ থাকতে আপনাদের কোন ক্ষতি হতে দোব না এই আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করলুম।" যোগেশের গলা কাঁপিতেছিল, হঠাৎ সে চুপ করিল। শান্তির চোখ দিয়া এতক্ষণ পরে বিন্দুর পর বিন্দু করিয়া অসহ্য বেদনারাশি অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া তাহার উৎসাহিত মুখের আগ্রহ দৃষ্টিতে নিতান্ত আশ্বস্ত হইল। যোগেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ আবেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? আমায় লজ্জা করবেন কেন? আপনি লক্ষ্মীপুরে যেতে চান—না রজনীবাবুর কাছে? বলুন—আমি তারি বন্দোবস্ত করে দেব—" শান্তির সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রতি শিরায় শিরায় উত্তেজনার আনন্দ স্রোতের মতন বহিয়া গেল, সে বালিকার মত সরলবিশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "আমি লক্ষ্মীপুরে জ্যেঠা মহাশয়ের কাছেই যাবো—" যোগেশ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "আমি তারি জন্যে চেষ্টা করবো আর বিশ্বাস করুন সে চেষ্টা সফলও হবে।"

এদিককার সব এক রকম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যোগেশ হেমকে বলিল "টাকার জন্যেই তো বড় মুস্কিল দেখচি ছোটবাবু।

এখনও মশারি আর একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে বাকি এরি মধ্যেই তো দেড়শো টাকা ধার হয়ে গ্যাছে, কি করি?" হেমেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া কুঞ্চিত ভ্রূর মধ্য হইতে অপরিচ্ছন্ন দেওয়াল ও ছাদ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। যোগেশের অভি-যোগ শুনিয়া তাহার অপ্রসন্ন চিত্ত আরো অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, অধীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিয়া উঠিল "নাওনা শ-পাঁচেক টাকা কারু কাছে ধার করে। আমার কি কোথাও তালুক মুলুক আছে!" "তাইতো, শুধু হাতে এখানে যে কেউ ধার দিতে রাজি হয় না, বলে সত্য জমিদার হলে কি ঐ বাড়িতে থাকে! এ আবার ফরাসীর মুলুক, ওরা ভয় পায় যদি এর পর কিছু গোল হয়। আমারও তো জানো 'অন্য ভক্ষধর্ম্ম গুণ!" হেমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, সে কি পরামর্শ দিবে? তাহার নিকট তো আর একটি কপর্দ্দকও নাই! সে কি হাতে কিছু রাখিত, যাহা পাইত তাহাতেই তাহার খরচ পত্রে কুলাইয়া উঠিত না—তবে এখন কি উপায়?

কি ভয়ানক! এমনি ভয়ঙ্কর স্থান এই সংসারটা যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মধ্যে বাস করিতেও অর্থের দরকার! একটা দিন পর্য্যন্ত কেহ কাহারও পাওনা মাপ করিবে না? বেশ, তবে সেইবা কেন তাহার প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবে? সেইবা কেন এ অপমান এ কষ্টের প্রতিশোধ লইবে না? কেন লইবে না, নিশ্চয় নিশ্চয় লইবে! প্রতারণাকারিণী মায়াবিনীর কোন্ শাস্তি তাহার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত হইতে পারে? সে কোন শাস্তি?

হেমেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া যোগেশ বলিল "এক কাজ করো না কেন;—তোমার শ্বশুরকে লেখনা কেন কিছু টাকা পাঠাতে?"

গভীর ঘৃণার সহিত তীব্রস্বরে হেমেন্দ্র বাধা দিল, "চুপ করো ও নাম আমার কাছে করোনা। এই নাও ঘড়িটা ও চেনটা রেখে কোথাও থেকে টাকা আনো। জানো তো ওটা বড় কম দামী জিনিষ নয়।" রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। আকাশ একেবারে মেঘ-শূন্য। চাঁদের আলোকে আকাশভরা নক্ষত্র দীপ্তিহীন দেখাইতেছে। হেমেন্দ্রের শয়ন গৃহের খোলা জানালার মধ্য দিয়া গৃহতলে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিয়াছিল, অল্প অল্প বাতাস গৃহসম্মুখস্থ বাঁশ বনের পাতা কাঁপাইয়া, ঘরের মধ্যে মশারী ও আনলার কাপড় দুলাইয়া ফিরিতেছিল। যোগেশ শান্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল "বৌদিদি!" ধ্যানমুগ্ধার মত শান্তি নীরবে জানলার নিকট বসিয়াছিল, চমকিয়া মুখ ফিরাইয়াই প্রথমে মাথার কাপড় টানিতে যাইতেছিল; যোগেশের অনুযোগে নিবৃত্ত হইয়া তাহা যথাস্থানে স্থাপন করিল। যোগেশ বিস্ফারিত নেত্রে তাহার জ্যোৎস্না বিধৌত মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সে তাহাকে কি বলিতে আসিয়াছিল বোধ হয় তাহা স্মরণও হইতেছিল না। প্রত্যাশিতনেত্রে শান্তিও তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনা আপনি তাহার চোখ নীচু হইয়া আসিল, আবার ক্ষণপরে দৃষ্টি উঠাইয়া দেখিল তখনও সে তেমনি করিয়া চাহিয়া আছে, ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করিয়া সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; যোগেশ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বাহিরের লোক মাত্র!

শান্তিকে উঠিতে দেখিয়া যোগেশ নিজের দুর্ব্বলতায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আপনাকে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া কহিল "আপনি শুতে যান বৌদি; রাত হয়ে গ্যাছে।" তাহার কথায় ও স্বরে শান্তির বিশ্বাস ও আশা আবার যেন তাহার হতাশান্ধকার হৃদয়প্রান্তে সহসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার সেই এক মুহূর্ত্তের সন্দিগ্ধতার জন্য সবেগে তিরস্কার করিয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া সে তখন আগ্রহে বলিয়া উঠিল "কবে আমি লক্ষ্মীপুরে যেতে পারব আমায় আগে বলুন .."

যোগেশ আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "নিশ্চয়ই শীঘ্র যাবেন। আমি—আমি সব ঠিক করে ফেলব। বিনোদবাবুর বউ সেজে যে মাগী আপনার এই কষ্টের কারণ হয়ে এসেছে সেই জালিয়াৎনীকে জেল খাটাব তবে আমার নাম যোগেশ মিত্তির, কিন্তু আপনি আমায় ভুলবেন না।"

পথের মধ্যে চলিতে চলিতে বিশ্বাসী পথিক সহসা সম্মুখে দংশনোদ্যত কালসর্পকে ফণা ধরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলে নির্ব্বাক আতঙ্কে যেমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে যোগেশের কথায় শান্তিও ঠিক তেমনি করিয়া সেইখানেই আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার কোনখানে আশা নাই? তবে সে যে এতক্ষণ আবার নূতন আশায় কত নূতন নূতন কল্পনার কানন সৃজন করিতেছিল সে সকল কিছুই নয়? সব মিথ্যা, সব প্রতারণা কোথাও আর তাহার আশা নাই!

তাহার মনের অবস্থা ঠিক না বুঝিলেও সে যে তাহার কথায় বিশেষ খুসী হয় নাই যোগেশ তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহাকে কি বলিলে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, সে কথাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না, দূরে বারদোয়ারির ঘড়িতে রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অদূর পথে চৌকিদার হাঁকিয়া উঠিল। যোগেশ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল "যান আপনি শুতে যান, বড্ড রাত হয়ে গ্যাছে—"

কলের পুতুলের মতন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে ঢুকিতে পা জড়াইয়া আসিতে লাগিল; বিদ্রোহী চিত্ত পুনঃ পুনঃ বিমুখ হইয়া সবলে তাহাকে বিপরীত দিকে টানিতেছিল,—তথাপি সে অনিচ্ছামন্থরগতিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই, জাগিয়াই ছিল, শান্তির চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিল। "এতক্ষণ ওঘরে কি হচ্ছিল শান্তি?" প্রশ্নটা শুনিয়াই শান্তির হাতখানা মুহূর্ত্তে মশারীর প্রান্ত হইতে সরিয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিল, "যোগেশ আমার খুব বন্ধু তা সত্যি, কিন্তু তাই বলে রাত দুপুর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে বসে গল্প করা আমি পছন্দ করি না, ওরকম নির্লজ্জ ব্যবহার তোমার বাপ তোমায় শিখিয়েছেন তা আমি জানি, কিন্তু আমি ওসব চক্ষে দেখতে পারি না।" মানুষের শরীর কিম্বা মনের ঠিক যেখানটায় সম্প্রতি খুব বড় রকম একটা আঘাতের বেদনা সর্ব্বদা দপ্‌দপ্ করিতেছে সেইখানটিতেই আবার সামান্য একটুখানি আঘাত লাগিলে অত্যন্ত সহিষ্ণু যে সেও আচমকা একটা যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া উঠে। আজিকার তিরস্কারে

প্রতিহিংসার বিষ নিষ্ঠুরভাবেই হেমেন্দ্র ঢালিয়া দিয়াছিল। পিতা ও কন্যার তাহার প্রতি ব্যবহার সে ভুলে নাই,—সুযোগ পাইলেই তাই তাহার প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়া ওঠে!

কিন্তু আজিকার এ আঘাত শান্তির পক্ষে সহ্য সীমানার বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরমুহূর্ত্তে আহতভাবে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। মনের ঝাল ঝাড়িয়া লইতে পাইয়া হেম ঈষৎ লঘুচিত্তে আবার শয্যা আশ্রয় করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে শান্তিকে অপমানিত করিবার পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তখন তাহার পাশের ঘরে শান্তির পরিত্যক্ত ভূমিতে শয্যা প্রস্তুত করিয়া লইয়া যোগেশ শয়ন করিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নক্ষত্র ভূষিত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "হেমের কার্য্যে আমার প্রাণ দিতে হয় তাও আমি দোব। আহা আমার দ্বারা যদি তার এতটু উপকারও হয় তাহলে আমার জন্ম সফল হবে। আমার আর এতে লাভ কি;—শুধু একটু দয়া বৈতো নয়! কিন্তু হেম কি দুর্ভাগ্য এমন রত্ন পেয়েও চিনলে না!

দেবদূতের প্রতি রাজা অরিষ্টনেমি।

(যোগবাশিষ্ঠ প্রথম সর্গ)

চির বসন্ত বিরাজিত সেই নন্দন উপবন!
গন্ধ প্রবাহি স্নিগ্ধ পবনে মুগ্ধ হৃদয় মন!
যন্ত্র মিলিত স্বর্গ রাগিণী দিবস রাত্রি বাজে,
কিন্নরী গাহে কোকিল কণ্ঠে! মোহন অপূর্ব্ব সাজে!
অপ্সরা সেথা চিরসঙ্গিনী—সঙ্গী দেবতা সব;
শয্যা আসন পারিজাত রাশি, পানীয় স্বর্গাসব;
উপাধান সেথা সুররমণীর সুললিত ভুজপাশ,—
শুনে কাঁপে প্রাণ! ফিরে যাও দূত চাহিনা স্বর্গবাস।
বোলো দেবরাজে জানায়ে প্রণতি, দাস আমি চির তাঁর,—
অধমের প্রতি অযাচিত রূপে প্রেরিলা করুণা ভার;
সেবক তাঁহার পারিল না নিতে তাঁর সে করুণা রাশি,—
চাহে না স্বর্গ সুখভোগ দেব, ক্ষুদ্র মর্ত্ত্যবাসী!
যাও নিজালয়ে ওগো দূতবর! প্রণাম তোমারো পায়;
কঠিন কঠোর সাধনা মগ্ন রহিব যাবৎ কায়।
সুকৃতি ফুরালে আবার আসিব জন্ম ও কর্ম্মের্ তরে!—
কেন্দ্র ভ্রষ্ট উল্কা তারাটির মত এই পৃথিবীরই পরে?

শ্রীঅনুরূপা দেবী

বিদায় ও আগমন।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মনস্বী দার্শনিক ও উদার নৈতিক লর্ড মর্লি ভারত সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া ভারত শাসনে নিযুক্ত হন। বিগত নভেম্বরে তিনি এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড মর্লির নিয়োগকালে ভারতের চতুর্দ্দিকে যে কি অসন্তোষ ও অশান্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু দেশের সেই দুর্দ্দিন ও দুর্দ্দশা সত্ত্বেও বৃদ্ধ মর্লি এই গুরুভার গ্রহণে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার চিরদিনের উদারতা, তেজস্বিতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং সর্ব্বজীবে সহানুভূতি হইতে আমরা স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিলাম যে এতদিনে ভারতবাসীর নিষ্ফল ক্রন্দন বুঝি ঘুচিবে, এইবার বুঝি লর্ড কর্জ্জনের যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিকার হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার কর্ম্মের অবসরকালে হিসাবনিকাশের সময় আমরা বলিতে বাধ্য যে লর্ড মর্লির ন্যায় পুরুষের নিকটে আমরা যতটা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, ততটা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহার জন্য লর্ড মর্লি নিজেও দায়ী হইতে পারেন, বা অপরাপর কারণ ও অবস্থাও দায়ী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই যেমন বঙ্গবিভাগ একটি! এ বিষয়ে লর্ড মর্লি স্পষ্টাক্ষরে রাজপুরুষগণের অন্যায় স্বীকার করিয়াও ইহার প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাক, উপরন্তু বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মতে উহা চিরস্থায়ী ব্যাপারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এইরূপ তাঁহার আরও অনেক কর্ম্ম ও মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই বা বিশেষ আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইবার কোনও কারণ দেখি নাই। কিন্তু দুইটি কর্ম্মের জন্য তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইবে এবং সেই দুইটি কর্ম্মের জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকটে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞ। প্রথম ভারতে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ-নীতি পরিবর্ত্তিত করা। কর্জ্জনের কৃপায় দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যে যেরূপ দুস্পৃহনীয় সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছিল, তাহা স্থায়ী হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গল ও অনিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হইত না। বিলাতে লর্ড মর্লি ও ভারতে লর্ড মিন্‌টো দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই এই অপ্রিয় ভাবটিকে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় যে আবার উভয়ের মধ্যে অনেকটা সদ্ভাব ও আমাদের অন্তরে আবার আশা ও আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছে যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কর্ম্ম, ভারতের শাসন সংস্কার। এই সংস্কারের সহিত আমরা সকল স্থানে একমত হইতে না পারিলেও আমরা তাঁহার বিচক্ষণতা, সহানুভূতি, দূরদৃষ্টি ও সাধু চেষ্টার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারি না। এই দুই মহৎ কর্ম্ম সাধিত করিয়া লর্ড মর্লি ইংলণ্ড ও ভারতের এক মহা সমস্যা দূর করিয়াছেন।

আগামী বড়দিনে লর্ড মর্লির বাহাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তিনি ভারত সচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও, রাজ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই।

লর্ড মর্লির স্থানে লর্ড ক্রু ভারত সচিবের

পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও মনস্বী লর্ড রোজবেরির জামাতা। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি বালককাল হইতেই উদারনৈতিক এবং বহুদিন হইতেই পার্লামেণ্টে লর্ড সভার উদারনৈতিক-গণের নেতৃপদ অধিকার করিয়া আছেন। শুনিতেছি তাঁহার ন্যায় ভদ্র, অমায়িক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সুচতুর কর্ম্মচারী খুব বিরল। ১৮৯২ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি আয়র্লাণ্ডের রাজ-প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করার সময় এখনও আসে নাই। তথাপি আশা করি তিনি লর্ড মর্লির দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন।

ভারতেও সাম্রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তরিত হইয়াছে। গত নভেম্বরের শেষে লর্ড মিণ্টো লর্ড হার্ডিংকে শাসনভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদায়ের

লর্ড মর্লি
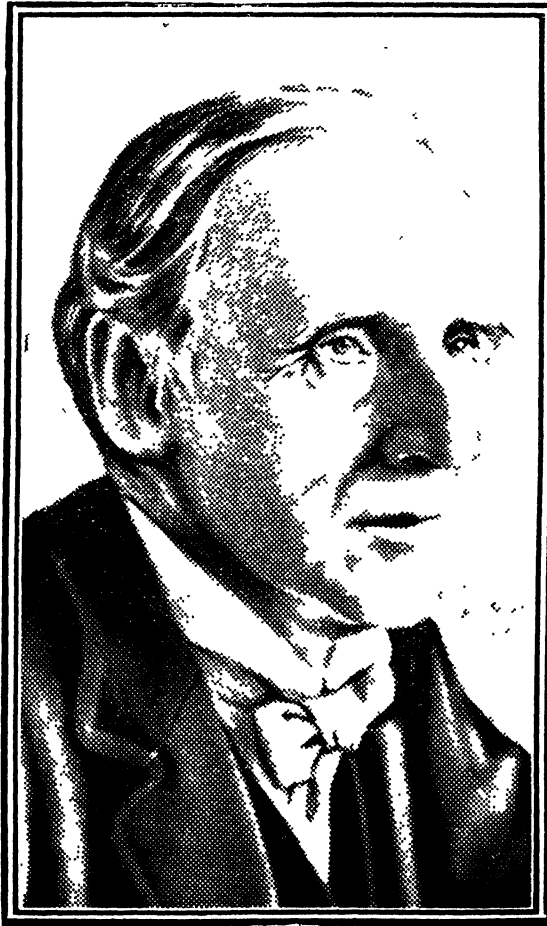
পূর্ব্বে সিমলাশৈলের রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার বিদায় অভিনন্দনের জন্য ইয়ুনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাবে একটি সান্ধ্য ভোজনোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া লর্ড মিণ্টো যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা গত পাঁচ বৎসরে তাঁহার ভারত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও হয়। ভারতে আসিয়া লর্ড মিণ্টোর ধৈর্য্য, দূরদর্শিতা, উদারতা ও বিচক্ষণতার যে কি কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তিনি কিরূপ সগৌরবে যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতা পাঠেই বেশ বুঝা যায়। লর্ড কর্জ্জনের তীব্র প্রতিভার ফলে এবং কতকটা কালেরও গুণে লর্ড মিণ্টো যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকেই অসন্তোষ ও অশান্তি গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। প্রতিভাবান হৃদয়বান রাজ-প্রতিনিধি প্রথমেই বুঝিলেন এ আগুন নিবাইতে হইলে দেশের শাসন-বিধির সংস্কার আবশ্যক। বুঝিবামাত্র তিনি সহস্র বাধা বিঘ্ন, সন্দেহ ও প্রতিবাদের মধ্যে আপন চিত্তের অটল সাহস ও ধীরতার উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহার পরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি, সুতরাং এ স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। তবে তাঁহার বক্তৃতার দুই এক স্থানের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা দেখাইব মাত্র। ভারতের অশান্তি সম্বন্ধে লর্ড মিণ্টো বলিয়াছেন—"আমি ভারতে পদার্পণ করা হইতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথাই আমার চিত্তে সর্ব্বপ্রধান ছিল। আমি এদেশে আসিয়া বুঝিলাম যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ও বজ্রপাতোন্মুখ হইয়া আছে। আমি ইহা বেশ অনুভব করিতাম। দিন দিন যতই অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল, ততই দেখিলাম যে চতুর্দ্দিকেই ঘোর অতৃপ্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে—অনেক রাজভক্তের হৃদয়েও ঘোর অতৃপ্তি। বিদ্রোহ-নীতি হইতে স্বতন্ত্র একটা দেশব্যাপী রাজনৈতিক অশান্তি ছিল। এমন সকল শক্তির ক্রিয়া হইতেছিল যে ভারতগবর্মেণ্টের পক্ষে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। এমন সকল আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, যে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কিসের? অবশ্য এ স্থলে আমি বিদ্রোহবাদীদের কথা বলিতেছি না। এক কথায় মোটের উপর বলিতে গেলে আমার বিশ্বাস যে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীই স্বদেশের শাসন কর্ম্মে অধিক অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। এ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিয়মিত রূপে যে শিক্ষার বীজ এতকাল বপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই সকল আকাঙ্ক্ষা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে জাপানের রুষযুদ্ধে জয়লাভে তাহারা একটু শীঘ্র পুষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও আমাদেরই স্বহস্তে রোপিত বীজ যে একদিন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সকল ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করিয়া আমাদের

লর্ড রু
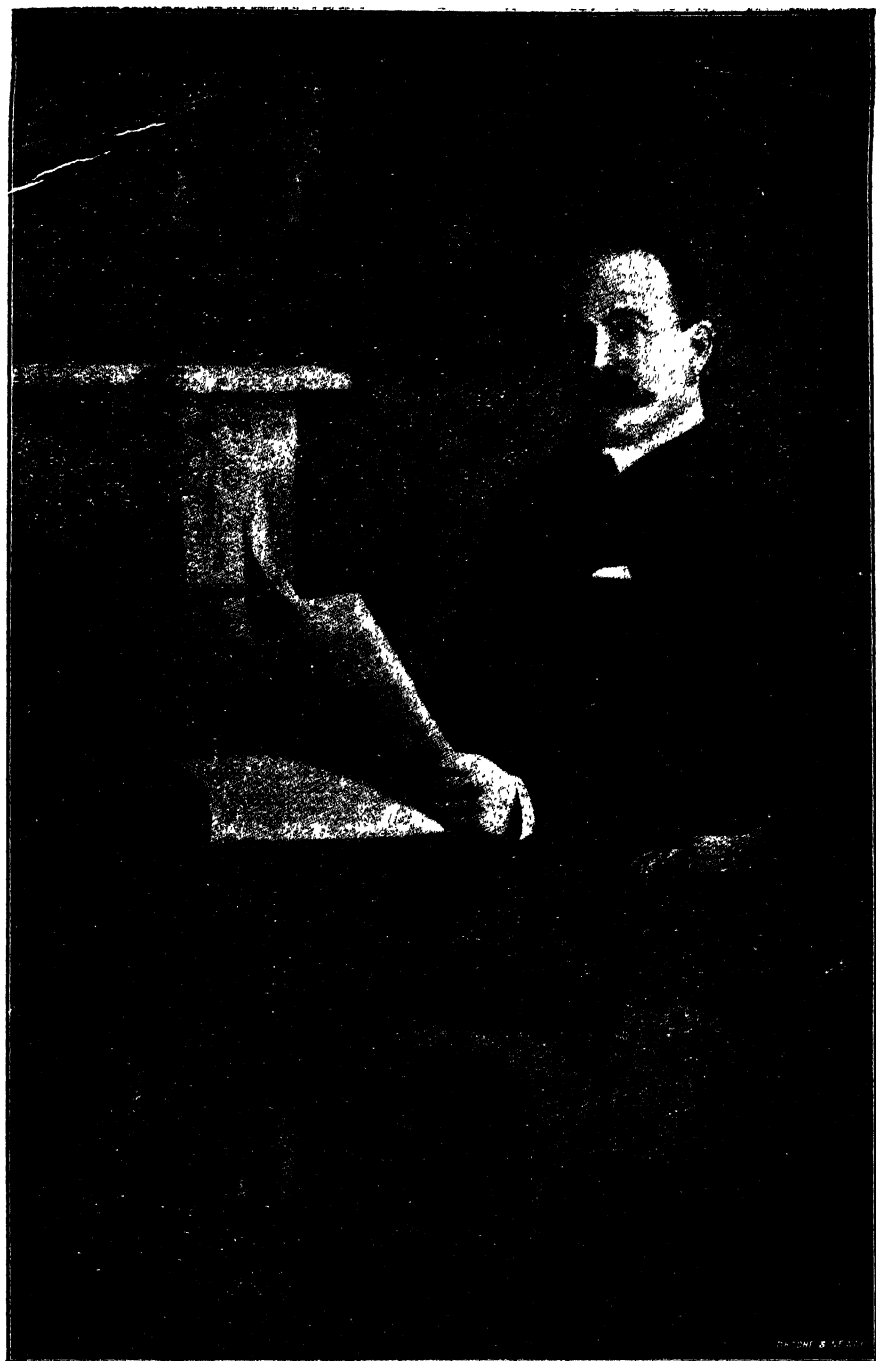
কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছি, ভবিষ্যতের নানা প্রকার বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছি।”

পরে তিনি বলিয়াছেন—“দেশের এই রাজনৈতিক জাগরণকে নিরস্ত করিবার দুইটি পথ ছিল। এক পক্ষে ভারত গবর্মেণ্ট বলিতে পারিতেন—“এ সকল নূতন ভাব আমরা গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি, এ সকল ভাব ব্রিটিশ শাসনের স্থায়ীত্বের বিরোধী।” অপর পক্ষে তাহাদের ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে শাসন বিধি-পরিবর্ত্তিত করাই আমাদের দ্বিতীয় পথ ছিল। দ্বিতীয় পথই যে শ্রেয় পথ সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। ০ ০ * ০ প্রথম পথ অবলম্বন করিলে আমরা ভারতে অশান্তি ও অসন্তোষকেই স্থায়ীত্ব দান করিতাম।”

এ সকল উক্তি শুনিলে লর্ড মিণ্টোর উদারতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সকল কর্ম্ম বা মত আমাদের মনোমত না হইলেও, তিনি যে ভারতের মঙ্গল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পদে পদে ভারতবাসীর মঙ্গল-সাধনেই রত ছিলেন একথা কেবল আমরা কেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস চিরদিনই স্বীকার করিবে। ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকিয়া যথার্থ প্রজা-পালনে ও প্রজারঞ্জনে রত ছিলেন ও থাকিবেন, লর্ড মিণ্টোর নাম সেই সকল প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের সহিত সমাসনে স্থান পাইবে। এই স্থলে লেডি মিণ্টোর মহত্ত্ব ও সদাশয়তার কথাও উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য। তিনি যেরূপ সরল ও অমায়িকভাবে আমাদের দেশের নারীদিগের সহিত মিশিতেন এবং যেরূপ সহানুভূতির সহিত নারীদের কল্যাণ কর্ম্মে যোগদান করিতেন, সেরূপ আমাদের ভাগ্যে খুব অল্পই ঘটে। তাঁহার ব্যবহারের গুণে তিনি যে কেবল আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সকলকেই ভালবাসার বন্ধনে এমন নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন, যে তাঁহার ভারত ত্যাগের সময়ে আমরা বন্ধুবিচ্ছেদের ন্যায় বেদনা অনুভব করিয়াছি। তিনি ও তাঁহার স্বামী যখন আমাদের নিকট বিদায় লইলেন তখন অশ্রু-আবেগে তাঁহাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রাজাপ্রজায় এরূপ আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ আমরা বহুদিন দেখি নাই। এই অবস্থাটি স্থায়ী হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষেই কত সুখের ও শান্তির কারণ হইয়া উঠে!

আমাদের নূতন লাট লর্ড হার্ডিং সম্বন্ধে আমরা এখনও বিশেষ কিছুই জানি না, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে এক্ষণে কোনও মতামত প্রকাশ করাও সঙ্গত হইবে না। তবে ইংলণ্ড হইতে বিদায় উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আদর্শের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের প্রসাদে আমাদের বক্তৃতার মোহ ও মৌখিক আশ্বাসের নেশা অনেকটা কাটিয়াছে। লর্ড মিণ্টোকে দেখিয়াও আমরা বুঝিয়াছি যে কর্ম্মীর পক্ষে অধিক কথার আবশ্যক হয় না। তবে লর্ড হার্ডিংও অধিক কথার ছটা প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্যই আশা হয় তাঁহার শাসনকালে আমরা প্রকৃত মঙ্গল কর্ম্মেরই পরিচয় পাইব। তাঁহার বক্তৃতার

লেডি মিণ্টো

লর্ড মিণ্টো

শেষ ভাগে তিনি বলিয়াছেন—"শাসনকর্ত্তা মাত্রেরই কতকগুলি নীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সার রবার্ট পীল তাঁহার পিতামহ লর্ড হার্ডিংকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনিও তাহারই অনুসরণ করিবেন। পীল লিখিয়াছিলেন—"যদি তুমি শান্তি রক্ষা করিতে পার, বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পার, ব্যয় কমাইতে পার, ভারতবাসীর মনে আমাদের ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার উপর বিশ্বাস জন্মাইয়া আমাদের ভারতাধিকারের ভিত্তি দৃঢ় করিতে পার, তাহা হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে তুমি এখানে যে আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন পাইবে তাহা দ্বাদশ যুদ্ধজয়ী বীরের অভিবাদন অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক আন্তরিক।" লর্ড হার্ডিং বলিয়াছেন "এই নীতি স্মরণ রাখিয়া ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক সহানুভূতির সহিত তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিবেন এবং ভারতবাসীর আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যথাসাধ্য যত্নচেষ্টা করিবেন। শাসন কর্ত্তার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নীতি আর হইতে পারে না। তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা এই উচ্চনীতি সফল করিতে পারিলে, ভারতবাসী মাত্রেরই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

লর্ড হাডিংকে বিদায় দিবার জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই সভাতে তিনি ইংলণ্ডে ইংরাজ ও ভারতবাসী ছাত্রের মধ্যে মিলন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে "এই উভয় শ্রেণী ছাত্রের মধ্যে যে সদ্ভাব ও মিলন নাই সেটা নিতান্তই শোচনীয় ব্যাপার। এই কারণেই ভারতবাসী ছাত্রেরা কুসঙ্গে মিশিতে বাধ্য হয়। বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য ও রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। হ্যারো স্কুলে এই সকল ছাত্রের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে, সকল বিদ্যালয়েই সেইরূপ হওয়া উচিত। ভারতবাসীদের প্রতি ব্যবহার ইংরাজ সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ মনোযোগের বিষয়।" ভারতে অশান্তি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে,—ভারতে জনসাধারণের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার উপযুক্ত কারণ তিনি কিছুই দেখিতে পান না। দুই চারি জন বিকৃত মস্তিষ্ক ভিন্ন সিডিশন প্রচারে যে প্রজাসাধারণের কোনও সহানুভূতি আছে এরূপ বিশ্বাস করা অসঙ্গত। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে ভারতের অশান্তি অচিরে লোপ পাইবে!

সহানুভূতি ও করুণার প্রভাবে জগতের সকল অশান্তিই লোপ পায়। লর্ড হার্ডিং যদি এই দুইটী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার শাসনকর্ম্ম পরিচালিত করেন তাহা হইলে তিনি যে অচিরে দেশের লোকের পূজ্য হইয়া উঠিবেন এবং চতুর্দ্দিকে শান্তি ও সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শক্তির অপব্যবহারেই অশান্তির উৎপত্তি। পুণ্যবৃত্তির দ্বারা শক্তিকে সরল ও সংযত করিলে তাহা প্রেমের আকার ধারণ করে। পিতামাতা শাসন করিলেও তাহা প্রেমেরই শাসন।

লর্ড হার্ডিং ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্ব্বে একটি

বেশ কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে সহসা ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সেখানে ত' এখানকার ন্যায় নিযুক্ত বড় লাটের জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা নাই। তাহার পর আবার গাড়ীটিকে পিছনে হটাইয়া ষ্টেশনের মধ্যে আনা হয়, তখন আমাদের রাজ-প্রতিনিধি তাহাতে আরোহণ করেন। গাড়ী ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে লেডি হার্ডিং চীৎকার করিয়া উঠিলেন; "ঐ তোমার পকেট হইতে চুরি করিতেছে।" লর্ড হার্ডিং ফিরিয়া দেখেন এক বৃদ্ধ তাঁহার পকেট কাটিবার চেষ্টা করিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভিড়ের মধ্য দিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাব স্কন্ধে হস্ত দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল, বৃদ্ধকে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া ষ্টেশনে আসিলেন। রাজপ্রতি নিধি তাহাকে মুক্তি দিলেন দেখিয়া পুলিসেও আর তাহাকে কিছু বলিল না, বিনা উপদ্রবে চোর অন্তর্ধান করিল।

লেডি হার্ডিং

কাউণ্ট লিও টলষ্টয়

মানব সমাজকে ধর্ম্মে, সমাজশক্তিতে এবং স্বাধীনতায় উন্নত ও সঞ্জীবিত করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে যতগুলি মহৎ জীবনের অমূল্য শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রুষিয়ার জনসাধারণের গুরু, ধর্ম্মসংস্কারক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও রাজনৈতিক সংস্কারক কাউণ্ট লিও টলষ্টয়ের আসন সর্ব্বশীর্ষে অবস্থিত। এই মহা-পুরুষ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া, সম্পদ বিপদের দুর্গম পথের মধ্য দিয়া দীর্ঘ দিনের অবসানে এক চিরশান্তিময় বিশ্রামপূর্ণ স্থানে গিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যু আসিয়া মহৎ জীবনের পূত প্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দেয় এবং মানবসমাজের অন্তরালে এক অনন্তরাজ্যে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ইঁহাদের বাণীকে শত শত শতাব্দীর স্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে না। ইহা প্রচ্ছন্নভাবে মানবের অন্তঃকরণকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখে।

টলষ্টয়ের জন্মকালে রুষিয়া ঘোর অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন ছিল। সুপ্তিজাল জড়িত রুষিয়া তখনও সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিজয়গীতি—যাহা ইউরোপের অপরাপর দেশকে মুখরিত করিতেছিল, শ্রবণ করিতে পায় নাই। দুর্দ্দমনীয় রাজশক্তি নির্ম্মমভাবে অসহায় প্রজা-

শক্তিকে নিষ্পেষিত করিতেছিল। কত শত হতভাগ্য যে বিনা বিচারে, বিনা অপরাধে রুষিয়ার নরকতুল্য ভীষণ কারাগারে অশেষ যাতনার পর জীবনত্যাগ করিতেছিল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া হিমময় চিরতুষারাবৃত সুদূর সাইবিরিয়া প্রদেশে চিরনির্ব্বাসিত হইতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তখন দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হতভাগ্যদের আকুলক্রন্দনে রুষিয়ার আকাশ পরিপূর্ণ। কত নিরাশ্রয়া জননী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিজের এবং শিশুসন্তানের মৃত্যুকামনা করিতেছিল! এইরূপ সময়ে কোন এক ধনীর গৃহে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অগষ্টে টলষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয় এবং কোন এক গর্ব্বিতা এবং নীচমনা আত্মীয়ার হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের এবং শিক্ষার ভার পতিত

হওয়ায়, মাতা শিশুর কোমল হৃদয়ে স্নেহ শিশিরশিক্ত করুণার ও ভালবাসার যে উৎস সৃজন করিয়াছিলেন তাহা অকালে রুদ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে বিলাসিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রবল হইয়া উঠিল এবং ঐ সকলের বিষময় স্রোতে পতিত হইয়া দিন দিন তিনি ধ্বংসের মুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পবে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন।

আর্ম্মেণিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি তথায়

প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে সম্মানলাভ করিয়া তিনি সামরিক বিভাগ ত্যাগ করিলেন। সামরিক বিভাগ, বিলাসিতা ও ক্রীড়াকৌতুক তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিল না। এই বিস্তৃত পৃথিবী তাঁহার নিকট এক বিরাট দুঃখ ও শোকে পরিপূর্ণ কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইল এবং নিজের জীবন অত্যন্ত বিষময় হইয়া উঠিল।

একদিন তিনি বৃক্ষতলে বসিয়া নিজের জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, তাঁহার বিলাসমন্দিরের আলোক অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। নিজের চিত্তকে শান্ত করিবার জন্য তিনি নূতন পথে যাত্রা করিয়া এক সহানুভূতির, ভক্তির এবং ধর্ম্মের অমৃত উৎস নিঃসৃত হইতে দেখিলেন। প্রজা সাধারণের নিরাশ্রয়তা ও ক্লেশের কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মানুষ মানুষের উপর এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহা তাঁহার চিন্তার অতীত ছিল। একদিন ইংলণ্ডের এক প্রকৃতির উপাসক কবির হৃদয়ও এইরূপে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—

To her fair works did Nature link
The human soul that through me ran;
And much it grieved my heart to think
What man has made of man.

অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে মানবের আত্মাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছে; সেই আত্মার আমি অধিকারী। তাই মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারের কথা ভাবিলে আমার প্রাণটা বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠে।

সেইদিন হইতে তাঁহার বোধ হইল এই ঈশ্বরের রাজ্যে সকল বিষয়ে মানবমাত্রেরই তুল্য অধিকার! যিনি ইহাকে বিনাশ করিতে যাইবেন তাঁহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে! তিনি দেখিলেন পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত এক আনন্দরূপের স্নেহে ও সহানুভূতিতে মানবসমাজ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সেইদিন হইতে তিনি প্রকৃত খৃষ্টীয় জীবন যাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং যাহারা জীবনে স্নেহ ও ভালবাসা প্রাপ্ত হয় নাই, মানবের প্রীতি যাহাদের অত্যন্ত আবশ্যক সেই সকল ভাগ্যহীন ও প্রীতি-বঞ্চিত মনুষ্যকে ভালবাসা ও স্নেহ করাই টলষ্টয়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। সেইদিন হইতে তিনি নিজের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি প্রজাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। নিজের বিলাসিতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি সাধারণ কৃষকের ন্যায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কৃষকদের সহিত মাঠে কার্য্য করিয়াছিলেন। পুস্তক লিখিয়া তিনি যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা পাইতেন তাহা অকাতরে পরের সুখের জন্য বিতরণ করিতেন। শেষ জীবনে টলষ্টয় সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হইয়াছিলেন।

তিনি যে কেবল সাধারণ লোকের উন্নতির জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে; সাহিত্য গগনেও তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁহার পুস্তক সকল রুষিয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। যে স্রোতস্বতী ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা এখন নূতন পথ পাইয়া বিপুলকায়

গ্রহণ করিয়া দেশ ভাসাইয়া প্লাবন উপস্থিত করিল। তাঁহার পুস্তক সকল পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া মানব হৃদয়ে ভালবাসার ও ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত করিতেছে। সাহিত্যের কোন এক বিশেষ শাখা যে তাঁহার প্রিয় ছিল তাহা নহে; তিনি উপন্যাস, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অর্থ-নৈতিক বিষয়ে বহু পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার War and peace, Kingdom of God is unto you, Anna Karenina, Power of darkness on life, Resurrection প্রভৃতি পুস্তক রুষিয় সাহিত্যের পত্তন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যখন তিনি দেশের প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হইয়া গেল। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মসমাজের নেতাগণ যে সকল গহিত কার্য্য করেন তাহা টলষ্টয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। দেশব্যাপ্ত কুসংস্কারকে বিতাড়িত করিবার জন্য এবং বাহ্যিক কার্য্যকলাপ (ceremonies) ত্যাগ করিয়া একমাত্র জগৎ পিতার উপাসনা করিবার জন্য ধর্ম্মনেতাদের এবং রাজশক্তিকে খর্ব্ব করিয়া তিনি আপনার বাণী জগতের সম্মুখে প্রচার করিলেন। ইহাতে রাজপুরুষগণের বিরাগভাজন হইলেন এবং ধর্ম্ম-পুরোহিতেরা রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে গ্রীক খৃষ্টীয় সমাজ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। এরূপ ব্যাপার নূতন নহে। জগতের মঙ্গলের জন্য যখন কোন মহাপুরুষ আপনার বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হন, তখন কত মোহান্ধ জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার প্রবল পুণ্য প্রবাহকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারে না; তাহা আপনার দুর্দ্দমনীয় বেগে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আজ রুষের তৃষ্ণাতুর দেশে ইঁহার করুণাবর্ষণে প্রেমের অমৃতপ্লাবন আনয়ন করিয়াছে। এখন কি ছাত্র, কি সাধারণ লোক, কি প্রজা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে, এবং তাঁহার মৃত্যুস্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

আজ ৮২ বৎসর পরে এই মহাপুরুষের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনের কথা যখন মনে করি তখন বোধ হয় শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই আর্য্য-ভূমির কোন এক মহাপুরুষ অজানা অমৃত-ময় রাজ্য হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইউরোপের বিলাসিতাপূর্ণ আকাশে এক স্পন্দনের সঞ্চার করিয়া দিয়া গেল। যে দুর্লভ সহানুভূতির পূত প্রবাহে সকল ভেদ ভাসিয়া যায় সেই সহানুভূতি ও প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মৃত্যুকালেও তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন, "There are millions of suffering people in the world, why are there so many of you arround me?" অর্থাৎ "পৃথিবীতে কোটি কোটি ক্লিষ্ট জীব রহিয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া তোমরা এত লোকে আমার কাছে রহিয়াছ কিসের জন্য?" মৃত্যুর সম্মুখে বসিয়া, সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যিনি এই কথা উচ্চারণ করিতে পারেন, জানি না তাঁহার হৃদয় কতখানি ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পূর্ণ।

য স্নেহের স্পর্শে, প্রেমের স্পর্শে তিনি আপনার হৃদয়-বীণাকে স্পন্দিত ও ঝঙ্কৃত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, আমরা যদি তাহার বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারি তবে জীবন ধন্য মানিব। হে অমৃতের পুত্র, তুমি যে অনন্ত পুণ্যলোকে নিজের অমর আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে সেই লোকের দিকেই যদি আমরা আমাদের চিত্তকে সতত উন্মুখ রাখিতে পারি, তবে তোমার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ধন্য হইবে ও আমরাও ধন্য হইব।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

টলষ্টয় সম্বন্ধে লিখিবার ও জানিবার কথা এত আছে যে তাহা এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যদি সুবিধা হয় ত পরে তাহার আলোচনার চেষ্টা করিব। আজ কেবল তাঁহার জীবনের দুই চারিটি মূলমন্ত্র সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব মাত্র।

টলষ্টয় তাঁহার জীবনে যে মহামন্ত্র জগতকে দান করিয়াছেন সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেটি হচ্চে—"আঘাতের দ্বারা অসৎকে বাধা দিও না; সর্ব্বাগ্রে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে যত্নবান হও।"

তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ হইতেই তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এরূপ কর্ম্মে তাঁহার সন্তোষ জন্মিল না। তাঁহার মনে হইল যে তাঁহার শিক্ষা দিবার যথার্থ সামগ্রী তিনি জীবনে কি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া না জানিয়া, শিক্ষকরূপে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইতে—তিনি অধিকারী নহেন। এই মনে করিয়া টলষ্টয় রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গ ত্যাগ করিয়া এক পল্লীগ্রামে গমন করিলেন; এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করেন। টলষ্টয় বলেন যে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে জীবনের কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আমরা তাঁহার প্রথমজীবনের লেখার মধ্যেই তাঁহার পরজীবনের মতের অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাই। বিলাসবহুল জীবনের আবরণে তাহা তাঁহার অন্তরের অগোচর ছিল মাত্র।

এইভাবে একদিন তাঁহার অন্তরে এই মহাপ্রশ্ন জাগিয়া উঠিল—আমার এ জীবনের অর্থ কি? তাঁহার মনে হইল এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিলে, তাঁহার জীবনধারণ অসম্ভব।

কত দীর্ঘ দিন বিনিদ্র রাত্রি ধরিয়া তিনি এই তত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন পথেই তাহার যথার্থ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে সলোমন, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল টলষ্টয়ের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। তাঁহার মনে হইল এ জীবনটা কেবল পাপ তাপ যন্ত্রণাময়! নিজে কিছু নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া তিনি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এ বিষয়ে আধুনিক অভিব্যক্তিবাদের বচন ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। টলষ্টয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এ পৃথিবীতে আসিলাম কিসের জন্য?" বিজ্ঞানবিদেরা উত্তর করিলেন "আমরা এ পৃথিবীতে আসিলাম কি উপায়ে!" উভয়ে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন!

ইহাদের নিকটে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া টলষ্টয় ধর্ম্মযাজকদিগের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা প্রশ্নটাকে স্বীকার করিলেন

বটে, কিন্তু কোন সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারিলেন না। মানুষ যুদ্ধের নামে যে ভীষণ স্বেচ্ছাকৃত হত্যাসাধন করিয়া থাকে, সেইটাই টলষ্টয়ের অভিজ্ঞতায় এ পৃথিবীর হীনতম অসৎ ব্যাপার। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে এই সকল ধর্ম্মযাজক যে কেবল যুদ্ধ নিবারণে সচেষ্ট নহেন তাহা নহে, অনেকেই ইহার পক্ষে সমর্থনেব জন্য বিশেষ উৎসাহী। কেবল তাহাই নহে, প্রেম ও ধর্ম্মের নামে তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকে অশেষ প্রকারে নির্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এক ধর্ম্মের মধ্যেও এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী এবং পরস্পরের অনিষ্টসাধনে সততই সচেষ্ট। তিনি এই ধর্ম্মযাজকগণের মতানুসারে আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর্য্যামী সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।

পরে তিনি প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অবশেষে বাইবেলের মধ্যেই তিনি তাঁহার মহাপ্রশ্নের সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুন্দর উত্তর দেখিতে পাইলেন। জন্ম, মৃত্যু, জীব ও জগদীশ্বর সম্বন্ধে মত জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই প্রায় এক, কিন্তু তিনি তাঁহার নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থেই জীবনের সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিলেন।

যাহা হউক টলষ্টয় অবশেষে জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে উত্তর পাইলেন তাহা এই,—যাহা সৎ তাহাকে উপলব্ধি করিবার এক শক্তি আমার মধ্যেই নিহিত আছে, এবং আমি সেই শক্তির সহিতই যুক্ত রহিয়াছি; আমার বিচার ও বিবেক সেই শক্তি হইতেই উদ্ভূত। এই শক্তির ইচ্ছা সম্পন্ন করাই আমার এ অস্তিত্বের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মঙ্গল সাধনই আমার ধর্ম্ম।

যীশুখ্রীষ্টের যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশটি আজ্ঞা বা উপদেশ আছে, তাহার মধ্যেই টলষ্টয় আমাদের জীবনের সকল নীতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে যীশুর নিম্নলিখিত পাঁচটি উপদেশ পালন করিলেই, এমন কি পালন করিতে চেষ্টা করিলেও আমাদের মানবসমাজের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়ঃ—

(১) কদাচ ক্রোধ করিবে না;

(২) কদাচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবে না;

(৩) বিবেক ভিন্ন অপর কাহারও বশ্যতা-স্বীকার করিবে না;

(৪) তোমার মতের বিরুদ্ধবাদিদের অনিষ্ট করিবে না;

(৫) শত্রু মিত্র সকলকেই ভালবাসিবে।

টলষ্টয় বলিতেন অমঙ্গলকে নষ্ট করিয়া মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করিবার দুইটি উপায় আছে। প্রথম পথটি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা চিরদিনই অবলম্বন করিয়াছেন। এই পথ অবলম্বন করিতে হইলে, প্রথমে সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক পরে সতেজে সেই সত্য প্রকাশ করা আবশ্যক এবং জীবনে সেই সত্য পালন করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। উদ্ভিদরাজ্যে বৃষ্টিধারা ও সূর্য্যকিরণের ন্যায় লোকের জীবন প্রভাব জনসমাজের মধ্যে নীরবে ব্যাপ্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। এই প্রভাবের স্রোত দেশে দেশে, যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

দ্বিতীয় পথের লোকেরা অপরের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা স্থির করিয়া পরে

আবশ্যক হইলে বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত করিয়া অপরকে নিজের ধারণানুসারে চলিতে বাধ্য করে। কিন্তু এ প্রভাব সেই সকল ব্যক্তির জীবনব্যাপী মাত্র—জীবনান্তে তাহা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিতে থাকে।

ভারতের আর্য্য সন্তানের নিকটে এ সত্য ও তত্ত্ব চিরপুরাতন। কিন্তু পাশ্চাত্যের *শিক্ষা দীক্ষা সাধনার মধ্যে থাকিয়া এই সত্য উপলব্ধি করা ও জীবনে পরিণত করার জন্যই* টলষ্টয়ের মহত্ত্ব। এই সত্যের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে টলষ্টয় ধন জন বিলাস সুখ ত্যাগ করিয়া ভোগত্যাগী হিন্দুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাবণ বধ।

বঙ্গের প্রায় প্রত্যেকেই রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব এবং রাবণবধের বিষয় রামায়ণপাঠে অবগত আছেন। বিকানীর রাজ্যে দশহরা ও দীপাবলীর সময় এই পর্ব্ব যেরূপে সম্পন্ন হয় তাহা বেশ একটু কৌতুকজনক। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রাচীন বিকানীর রাজ প্রাসাদ অতি সুদৃঢ় প্রস্তর নির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কেল্লার ভিতরে অবস্থিত। আজও পর্য্যন্ত সিংহাসন সেই পুরাতন প্রাসাদেই। কেল্লার ভিতরে অনেক দেবদেবীর মন্দিরও আছে। বর্ত্তমান মহারাজা কেল্লা হইতে দেড়মাইল দূরে নব্যধরণের এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করেন। দেবদেবীর পূজা কিম্বা দরবার উপলক্ষে তিনি প্রাচীন প্রাসাদে গমন করেন। দশহরার দিন মহারাজার জন্মদিন; তাই সেদিন তাঁহাকে দেবীর আরাধনায় এবং জন্মোৎসব দরবারে যোগদান করিতে পুরাতন প্রাসাদে আসিতে হয়। নেটিবগণ অর্থাৎ ভারতীয় সমস্ত অফিসার দরবারে এবং দেবী নিকেতনে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। দশহরার দিন এগারটার সময় যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা মহারাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় একটার সময় তিনি কেশরিয়া অর্থাৎ হলুদ রঙের আচকান, ছাকা এবং হীরক ও মণিমুক্তার হারে ভূষিত হইয়া দেবী পূজায় অগ্রসর হইলেন। এবং একে একে কয়েক জায়গায় পূজা সমাপ্তির পর দরবারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে আসীন হইলেন। দরবার প্রকোষ্ঠ কিম্বা কারুকার্য্যখচিত সিংহাসন এবং সুবর্ণস্তম্ভোপরি চন্দ্রাতপাদির বর্ণনায় প্রবন্ধকলেবর বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখি না। রাজা সিংহাসন গ্রহণ করিলেন; পশ্চাদ্দেশে এক ব্যক্তি শাসন দণ্ড, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঢাল তরবার এবং তৃতীয় ব্যক্তি চামর লইয়া দাঁড়াইল। চিরন্তন প্রথানুযায়ী নজর সেলামী হইয়া গেল। তার পর রাজা অপর আঙ্গিনায় গিয়া সাধারণের সেলামী গ্রহণ করিলেন এবং তিন চারি জন স্থানীয় লোককে জন্মদিনের উপাধি অর্থাৎ অনুগ্রহ সূচক নিদর্শন প্রদান করিলেন। এদিকে গরীবদের ভিতর স্থানে স্থানে আহার্য্য বণ্টন হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় বেলা শেষ হইয়া আসিল। একটী কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি। দরবারের সময় প্রাঙ্গণে

নর্ত্তকীগণ দল বাঁধিয়া মাঙ্গলিক গীত গাইতেছিল।

তার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাবণবধের জন্য বিশেষ আয়োজন চলিতে লাগিল। কেল্লা হইতে আনুমানিক অর্দ্ধমাইল দূরে মাঠের ভিতর ৪।৫ ফুট উচ্চবেদির উপর একখানা ২০ ইঞ্চি পরিমিত রাবণ চিত্র দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। কেল্লা হইতে চিত্র পর্য্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ষ্টেটের সমস্ত সশস্ত্র অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য শ্রেণী বাঁধিয়া মহারাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং হাজার হাজার দর্শকের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতেছিল। আনুমানিক ৬টার সময় রাজা রাবণ বধ করিতে অশ্বারোহণ করিলেন। এইখানে বলা আবশ্যক বিকানীর রাজা দেববংশ সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত। আমরা পদব্রজে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। সুখের বিষয় রামানুচরের ন্যায় রাজার অনুসরণে আমাদিগকে সেতুবন্ধনের জন্য কোনরূপ প্রয়াস পাইতে হয় নাই। তবে কিনা অফিসারদিগকে পদব্রজে অর্দ্ধমাইল যাইতে আসিতেই অনেকটা অবসন্ন হইতে হইয়াছিল। যে রাজপুতগণ অনশনে অনিদ্রায় দিনরাত বিজনকাননে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্ষণেকর তরেও ক্লান্তি বোধ করিতেন না আজ তাঁহাদের বংশধরগণ এক মাইল পথ চলিতেও কাতর। এখানে দেখিতে পাই পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী ও পদব্রজে চলিতে ফিরিতে কিম্বা সিকি মাইল দূরস্থ আফিষে যাইতে লজ্জা বোধ করেন। পতিত জাতির যতটা অধঃপতন সম্ভবপর তাহা হইয়াছে। যাহা হউক রণসাজে সাজিয়া যখন দশস্কন্ধ-রাবণকে বধ করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম তখন বাদ্য ঘণ্টায় দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল। কতক দূর অগ্রসর হইলে পর মিছিল থামিয়া গেল। মহারাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক কুল বৃক্ষের নীচে দেবীর আরাধনায় নিয়োজিত হইলেন। পুরোহিতগণ সজোরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কুলবৃক্ষ এবং খেজুরি নামক এক জাতীয় বাবুল এ অঞ্চলে অতি পবিত্র। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টায় দেবীর আরাধনা সমাপ্ত হইল; তৎপর একটী ছাগশিশুর হত্যার পর মিছিল সোৎসাহে রাবণের দিকে ছুটিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌছিলাম। দশস্কন্ধ রাবণকে বধ করিব বলিয়া এক মস্ত আশা পোষণ করিতেছিলাম কিন্তু সেখানে গিয়া এক মাথা এবং দুই হাত বিশিষ্ট রাবণকে দেখিয়া একটু উৎসাহ যেন কমিয়া গেল। রাজা পুনরায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া প্রায় পাঁচ হাত দূর হইতে রাবণকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। তীক্ষ্ণশর রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষভেদ করিয়া দূরে চলিয়া গেল। এদিকে অনুচরবর্গ ক্ষিপ্রহস্তে রাবণচিত্রকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ধূলিসাৎ করিল। এমন কি ঐ চিত্র যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান ছিল সে ভিত্তির উপরের স্তর পর্য্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে পর অনুচরগণের আক্রোশ প্রশমিত হইল। রাবণ চিত্রের টুকরা এখানে মাদুলিতে পুরিয়া ছেলে-মেয়েদের গলায় দেওয়া হইয়া থাকে; উহাতে নাকি তাহাদের ব্যারাম পীড়ার আশঙ্কা কম থাকে। রাবণের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিক জয় ধ্বনিতে নিনাদিত হইতে লাগিল, তোপ-

খানার ১০১টী তোপ ধ্বনিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিজয় সন্দেশ বিজ্ঞাপিত হইয়া গেল। জয়োল্লাসে মাতোয়ারাপ্রায় আমরা মহাসমারোহে কেল্লায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ফিরিবার বেলায় মহারাজা সুবর্ণ এবং মণি-মুক্তাখচিত হাওদা এবং আস্তরণে ভূষিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। প্রায় আটটার সময় আমরা নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় দিবস পুনরায় নজরসেলামীর দরবার বসিল এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় সেলামী হইয়া গেল। প্রথম দিন জন্মোৎসব এবং দ্বিতীয় দিবস দশহরা উপলক্ষে সেলামী। দরবারের পর আমরা এক আঙ্গিনা বিশেষে সম্মিলিত হইলাম, সেখানে আমাদের ভিতর "জোয়ারী" অর্থাৎ দশহরার বক্সিস্ বা পারিতোষিক বিতরিত হইল। আমরা প্রত্যেকেই দুইটি টাকা এবং ছয়টী নারিকেল পাইলাম। পূর্ব্বে প্রত্যেককে একটি বিকানীর ষ্টেট মুদ্রা এবং একটী ব্রিটিশ মুদ্রা প্রদত্ত হইত। কিন্তু আজকাল বিকানীর ষ্টেটে মুদ্রা প্রস্তুত না হওয়ায় এবং সঞ্চিত বিকানীরী মুদ্রা নিঃশেষিত হওয়ায় এ বছর হইতে দুইটীই ব্রিটিশ মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে।

দেওয়ালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই আজ এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এ অঞ্চলে দেওয়ালীতে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। বঙ্গের ছোট বড় ধনী দরিদ্র সকলেই যেমন দুর্গোৎসব ব্যাপারে মহাব্যস্ত; এখানে সেইরূপ দেওয়ালীতে সকলেই ব্যস্ত। এমন কি, দীনদরিদ্রগণ পর্য্যন্ত এখানে একবেলা ভোজন করিয়াও দেওয়ালীর জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এখানে ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে প্রস্তর অথবা ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা দালান এবং গরীবের কাঁচা দালান বা কোঠা-বাড়ী, বঙ্গের ন্যায় কাহারও বাড়ীতে খড়ের ছাউনী নাই। দেওয়ালীর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতেই সকলে বাড়ী ঘর, পরিষ্কার করিয়া কোঠাগুলি অনেকটা গেরুয়া রঙের একপ্রকার মাটীতে লেপ দিতে আরম্ভ করে। তারপর উঠান এবং দরজার চারিদিক আলি-পনাচিত্রিত হইয়া থাকে। পিতা মাতা ভাই বন্ধু কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে এক বৎসর কাল ইহারা বাড়ী ঘর রং করে না; যেহেতু ঐ বৎসর ইহাদের শোকের বৎসর।

কার্ত্তিকের অমাবস্যার দিন প্রধান দেওয়ালী। এ অঞ্চলে দেওয়ালী তিন দিন। ত্রয়োদশীর দিন যম দেওয়ালী, চতুর্দ্দশীতে কালী দেওয়ালী এবং অমাবস্যার দিন রাণী দেওয়ালী। প্রথম দুইদিন অর্থাৎ যম এবং কালী দেওয়ালীতে তত্টা সমারোহ হয় না। কোন কোন জায়গায় কিছু আলোকমালা এবং আতসবাজী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বঙ্গে শ্যামাপূজার দিন অমাবস্যা রাত্রি দীপান্বিতা হইয়া থাকে এখানে ঐদিন লক্ষ্মী পূজা। ঘরে ঘরে একখানা লক্ষ্মীদেবীর চিত্র টাঙ্গাইয়া গৃহস্বামীগণ সেদিন নিজে নিজেই উহার পূজা করিয়া থাকে। কোন কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বাড়ীতেই পুরোহিত আসে। চিত্রের সম্মুখে নারিকেল, গুড়, চিনি, লাড়ু, ভাজাভুজি প্রভৃতি রাখা হয়। রাণী দেওয়ালীর দিন এবং তার পর দিন শুধু আফিষ নহে বাজারের ক্রয় বিক্রয় এবং কৃষকের কর্ষণ প্রভৃতিও বন্ধ থাকে। আমাদের

অঞ্চলে সরস্বতী পূজার দিন যেমন দোয়াত পরিষ্কার করা হয় এবং স্বদেশী নলের কলম ব্যবহার করা হয় এ অঞ্চলে দেওয়ালীব দিন সেইরূপ পরিষ্কার দোয়াত, নলের কলম, স্বদেশী কালী, এবং জয়পুরী কাগজ ব্যবহার করা হয়। ঐ দিন যেন হালখাতার কায আরম্ভ হয়, ষ্টেটের ভিন্ন ভিন্ন অফিষেও ঐ দিন হইতে নূতন জিনিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাণী দেওয়ালীর দিন রাত্রিতে খুব সমারোহ। আলোক মালায় অমাবস্যার রাত্রিও যেন দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিকানীর সহরে অনেক লক্ষপতির বাস;—যদিও এরাজ্য রাজপুতানার মরুভূমিতে অবস্থিত তথাপি বিকানীরে যত ধনাঢ্য বণিকের বাস ভারতের আর কুত্রাপি—তেমন নাই; এই জন্য বিকানীর ভারতের চিকাগো নামে পরিচিত। বিকানীর রাজ্যে ছয় শতের উপর লাখপতি, ইহার মধ্যে আবার কতকগুলি ক্রোরপতি,অথচ এ মরুভূমিতে কৃষি নাই বলিলেও চলে; যত কিছু ধনৈশ্বর্য্য সমস্তই বাহির হইতে আহরিত। যে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি এতদিনে বাঙ্গালীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে শুদ্ধ সেই ব্যবসাতেই ইহারা লাখপতি ক্রোরপতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের অনেককে কলিকাতা বোম্বে প্রভৃতি বড় বড় সহরে নিঃসম্বল গিয়া ফেরিওয়ালার কায পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে। অনেককে প্রথম অবস্থায় স্কন্ধে কাপড়ের বস্তা লইয়া "ধুতি, সাড়ি, কাপড়" "এক টাকায় তিন খানা কাপড়" বলিয়া গলিতে গলিতে ফেরি করিয়া ঘুরিতে হইয়াছে। বাণিজ্যে বাস্তবিকই লক্ষ্মীর বাস, তাই এ অঞ্চলে দেওয়ালীতে লক্ষ্মীপূজার এত জঁাক। বিকানীর সহরে ধনী বণিকদের মূল্যবান প্রস্তর অট্টালিকার সংখ্যা যথেষ্ট। সেদিন বোম্বের দেওয়ালী বিবরণীতে দেখিয়াছি যে তাড়িতালোক আজকাল তেলের বাতির স্থান দখল করিয়াছে। এখানে রাস্তা ঘাট এবং রাজপ্রাসাদ তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত হইলেও পর্ব্বোপলক্ষে তাড়িত আলোকমালার বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। কিন্তু তাড়িতের আলো না হইলেও সেদিন মাড়োয়ারী বণিকদের বাড়ী আলোক রশ্মিতে ঝক্‌মক্ করিতেছিল।

উপসংহারে ষ্টেটের দেওয়ালী উৎসব সম্বন্ধে দুই একটী কথা উল্লেখ করিব। রাণী দেওয়ালীর দিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কেল্লায় সমবেত হইলাম, কিছুক্ষণ পরে মহারাজা নূতন প্রাসাদ হইতে কেল্লায় উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে গিয়া দেবী অর্চ্চনা করিলেন। তার পর সকলে পদব্রজে প্রাসাদের বাহিরে অপর এক মন্দিরের বারেন্দায় গমন করিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন ব্যক্তি সমাগত প্রত্যেকের হাতেই দুইটী করিয়া মশাল দিল। মশালগুলি অনেকটা আমাদের হাওয়াই বাজীর মত, নলের মাথায় তেলের ছোট ছোট মশাল। প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটী সুসজ্জিত বলদ রক্ষিত হইতেছিল। আমরা সকলে মসালে আগুন লাগাইয়া মহারাজা নিক্ষেপ করার পর একসঙ্গে মশালগুলি বলদের দিকে নিক্ষেপ করিলাম। বলাবাহুল্য মশালগুলি মাত্র পাঁচ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তার পর বলদকে তথা হইতে লইয়া গেল। অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অনেকেই বলিল, প্রাচীন কাল

হইতে এই প্রথার প্রচলন আছে। কারণ অনুসন্ধানে তাহারা নিতান্তই নিস্পৃহ। তার পর মহারাজা এক শিবিকা বা দোলনায় চড়িয়া অপর এক মন্দিরে চলিলেন, আমাদের কায ঐ পর্য্যন্তই শেষ হওয়ায় আমরা বাড়ী ফিরিলাম। মশালগুলি সাধারণ লোকে কুড়াইয়া লইল। উহা ঘরে থাকিলে নাকি অসুখ বিসুখের আশঙ্কা কম থাকে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আবার আমরা কেল্লায় সমবেত হইলাম। সেদিন মহারাজা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শাসন দণ্ড,চামর, ঢাল তরওয়াল প্রভৃতি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা হইল, তার পর প্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হাতি দৌড়, এবং ঘোড়াদৌড় দেখিয়া রাত্রি আটটায় বাড়ী ফেরা গেল। পরদিন প্রাতে অনেকটা বাঙ্গালা দেশের বিজয়া সম্ভাষণ। জাপানের ন্যায় সকলে পরস্পর দেওয়ালীর রাম রাম জানাইতে বাহির হইলাম। ঐ দিবস এগারটার সময় নজর দরবার বসিল। মহারাজা সশরীরে উপস্থিত না হওয়ায় সিংহাসন দণ্ড প্রভৃতিকে প্রতিনিধি ধরিয়া নজর সেলামী শেষ করা হইল। তার পর দশহরার ন্যায় আমরা প্রত্যেকে নারিকেল এবং দুই টাকার জোয়ারী লইয়া ঘরে ফিরিলাম।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

অন্তঃপুর প্রসঙ্গ।

লক্ষ্মীর শ্রী।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার আবশ্যকতা বুঝিলে কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যাইতে হয় না। মহিলাগণ নিজে নিজেই ঘরে ঘরে সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা স্বভাবতঃ এক হিসাবে অপরিষ্কার। "বিছানা শেষ" মাসান্তেও ধোপার বাড়ী যায় না এমন গৃহস্থ বিস্তর। পরিধেয় বসন নিত্য তিন চার বার ধোয়া হয়—কিন্তু মলিনতার দিকে দৃষ্টি আদপে আমাদের নাই! অনেকে বলিবেন যে "আমরা চব্বিশ ঘণ্টা রান্না বান্না নিয়া ছেলে পিলে নিয়া ব্যস্ত থাকি; আমরা গরীব মানুষ—আমাদের মেম সাজিবার অবসরও নাই, অত ধোপার কড়ি দেবার পয়সাও নাই।" এক কথায় ইহা সকলেরই সঙ্গত মনে হইবে। কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে অবসর বা অভাবের জন্য যে আমরা সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকি তাহা নহে; সে দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়াই আমরা অপরিচ্ছন্ন থাকি।

ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছি রাজকন্যা "গোসা" ঘরে গিয়া শয়ন করিয়া আছেন শুনিয়া রাজা রাণী অস্থির—"কেন মা তুমি রাগ করিয়া কাঁদিতেছ কেন।" অনেক সাধ্য সাধনায় রাজকন্যা বলিলেন —"আমার ধূলামুঠি কাপড় চাই।" তখন রাজা ও রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন —"তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব—সাত রাজার ধন এক মাণিক, আর যা চাও তাই দিব—কিন্তু

ধূলামুঠি কাপড় দিতে পারিব না।" এই কথার অর্থ এই যে, শিশু খেলা করিতে করিতে অপরিষ্কার হাতে মুঠা করিয়া কাপড় ধরিবে সেই অপরিষ্কার কাপড় তিনি চাহেন অর্থাৎ তাঁহার সন্তান হয় নাই তাই মনঃকষ্ট। অতএব দেখা যাইতেছে শিশু সন্তান ঘরে থাকিলেই ঘরদ্বার পারধেয় বসন প্রভৃতি অপরিষ্কার অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এবং ইহাও সত্য যে রাজকন্যারা যে "ধূলামুষ্টি কাপড়" পরিতেন তাহা অসচ্ছলতা বশতঃ নহে অভ্যাস বশতঃ।

এই যে সর্ব্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস ইহা আমাদের বহুদিনের। ধনীগৃহেও ইহার প্রচলন খুব বেশি। প্রচুর দাস দাসী থাকিলেও ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও বিছানা বা শিশু সন্তানের কাপড় চোপড় বা মহিলাদের বসন সর্ব্বদা মলিন দেখা যায়। অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের এখনও এমন বিশ্বাস যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেই সে "বাবু" সে "অকর্ম্মণ্য"। সামান্য আয়াসেই যে পরিচ্ছন্ন থাকা যায়—ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। রেলওয়ে ষ্টেসনের ধারে ধারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীদের বাসা দেখা যায়—তাহা দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাতে বাঙ্গালী অথবা ফিরিঙ্গী বসবাস করিতেছেন। সেই একই বাড়িতে কখনও বাঙ্গালী কখনও ফিরিঙ্গী বাস করেন—কিন্তু ফিরিঙ্গী হইলেও তাহার শ্রী ও পরিচ্ছন্নতা সকলের দৃষ্টি যে বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই ফিরিঙ্গী যে ধনী এবং তাঁহার দাস দাসী যে অনেক তাহা নহে—কেবল অভ্যাস বশেই তাঁরা পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। অভাব যদি অপরিচ্ছন্নতার মূল হইত তবে ধনী গৃহে অপরিচ্ছন্নতা দেখা যাইত না। আমাদের একটী ধনী আত্মীয়া মহিলা সর্ব্বদা দুই তিন সের সোণার গহনা পরিধান করিয়া থাকিতেন—কিন্তু মলিন বস্ত্রের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না তথাপি আমি কখনও পরিষ্কার বস্ত্র পরিতে দেখি নাই। কেবল একদিন কোন নিমন্ত্রণ স্থলে প্রচুর অলঙ্কার ও বহুমূল্য বারাণসী বস্ত্রে ভূষিত দেখিয়াছিলাম। আমাদের দেশে অপরিচ্ছন্নতা অর্থাৎ মলিন বস্ত্র পরিধান বিনয়ের লক্ষণ। মহিলাগণ নিমন্ত্রণে বারাণসী বোম্বাই শিল্ক প্রভৃতির সাড়ী পরিয়া গিয়াছেন—বসিবার জন্য আসন দিবার অপেক্ষা করিয়া থাকা অসম্ভব; "বড় মানুষির" পরিচায়ক; অতএব পরিধেয় বসন যতই বহুমূল্য হউক না কেন "ধুপ" করিয়া যেখানে সেখানে বসিয়া না পড়িলে নিন্দার ভাজন হইতে হয়। এই সকল ভাবিলে দেখা যায় যে অপরিচ্ছন্নতা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। আচার অনুষ্ঠানের ত্রুটির দিকে যেমন আমাদের খর দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি একেবারেই নাই। উঠানের এক কোণে নিকান' পোঁছান তুলসী মঞ্চ—আর এক কোণে আবর্জ্জনার রাশি। সে আবর্জ্জনা যদি প্রতিদিন বেড়ার ও পারে ফেলা হইত তবে উঠানটি ত পরিষ্কার থাকিত। ইহাতে কিছুমাত্র ব্যয় হইত না। মুষ্টি মুষ্টি আবর্জ্জনা জমা হইয়া এখন একটা ভূতের বোঝা হইয়াছে এখন

আর পয়সা ব্যয় ভিন্ন পরিষ্কার হয় না।

পরিধেয় বসন সর্ব্বদা অল্প আয়াসেই পরিষ্কার যে রাখা যায় তাহা অনেকেই জানেন। প্রত্যহ নিয়মিত শিশুদের ও নিজেদের কাপড় গুলি যদি শুধু "জল কাচার" পরিবর্ত্তে একটু সাবান দিয়া লওয়া হয় তবে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। যথেষ্ট ময়লা না হইলে সামান্য সাবান ও অল্প সময়েই কাপড় পরিষ্কার হয়! অনেক মহিলাকে দেখা যায় সন্তানদের জামাটা কিম্বা ধুতি খানা লইয়া ছেলেকে দুধ থাওয়াইতে বসিলেন তার পর তাহাতে দুধ মোছা কাদা মোছা শেষে ঘর শুদ্ধ মোছা হইল—তার পর জলে ধুইয়া দেওয়া হইল পর দিন আবার বালক তাহাই পরিবে। এই প্রকারে যে বস্ত্র ময়লা হয় তাহা শুধু জলে কেন ধোপার বাড়ী গিয়াও ভালরূপ শাদা হয় না। অতএব কাপড় গুলি যাহাতে যত কম ময়লা হয় প্রথমে পরিবারস্থ সকলের সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। জামা কাপড়ে কোন মতেই কাদা ধূলা পোঁছা উচিত নহে। অনেক মহিলার আঁচলে হাত মোছা অভ্যাস আছে। তরকারী খাইয়া হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিলে তেল ঘি হলুদ কাপড়ে মাখামাখি হয়। এ সকল পরিহার করা কর্ত্তব্য। তার পর নিত্য স্নানের সময় নিজ নিজ পরিধেয় বসন ও শিশু সন্তানদের কাপড় গুলি নিয়মিত সাবান দিয়া ধুইয়া দিলে বিশেষ সময় বা পয়সা ব্যয় হয় না। প্রত্যহ এক পয়সার সাবানে ৪।৫ খানা বড় ধুতি ও ছোট ছোট তোয়ালে রুমাল মোজা প্রভৃতি ৫।৭ খানা অনায়াসে ধুইয়া লওয়া যায়। ইহাতে ধোবার ব্যয়ও কমান যায়। যাঁহাদের দাসদাসীর অপ্রতুল নাই তাঁহারা নিয়মিত দাসদাসীদের দ্বারা সাবান দিয়া কাপড় ধোয়াইতে পারেন। তবে যাঁহারা মনে করেন যে সাবানের একটা পয়সা থাকিলে মোহন ভোগ কিনিয়া দিব, এবং যতক্ষণ কাপড় ধুইব ততক্ষণ একটু গড়াইয়া বাঁচিব, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন এই যে, সাবধানে সাবান খরচ করিলে চারি আনার বারসোপে এক মাস চালান যায়। কি ধনী দরিদ্র ভাত সকল ঘরেই রান্না হয়। এই ভাতের ফেনে একটু সাবান ফেলিয়া গুলিয়া তাহাতে ৪.৫ খানা কাপড় বেশ পরিষ্কার হয়। একটু গরম গরম আছড়াইয়া লইলে শীঘ্র ময়লা দূর হয়।

সকলেই অনুভব করিতে পাবেন যে যেদিন ধোপা আসে সে দিন বেশ একটু সচ্ছন্দতা অনুভব করা যায়—মনটা প্রফুল্ল হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে মলিনতা অপ্রফুল্লকর।

অতি শিশুকাল হইতে মলিনতার দিকে যদি শিশু সন্তানের ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া যায় তবে ক্রমশঃ বয়স বৃদ্ধির সহিত সে আপনিই অপরিচ্ছন্নতা হইতে দূরে থাকিবে। জল ঘাঁটিতে সকল শিশুই ভালবাসে; যে কোন কিছু আহারের পর হাত ধুইয়া দেওয়া বা হাত ধুইতে বলায় শিশুরা বিরক্ত হয় না। আমরা ভাত ব্যঞ্জনের বাটীটা যদি স্পর্শ করি তাহা হইলে হাত ধুইয়া ফেলি,—কিন্তু দুধের সরটা হাত দিয়া তুলিয়া বা রসগোল্লাটা ছেলেকে খাওয়াইয়া অনায়াসে কাপড়ে হাতটা মুছিয়া রাখিতে পারি।

কারণ তাহা সখড়ি নহে। এইজন্য সচরাচর দেখা যায় খাবার খাইয়া ছেলেরা হাত ধোয় না। তারপর সেই হাতে দুনিয়ার জিনিষ ধরে। কিছুকাল হইতে এই সকলে ঘৃণা জন্মাইলে বালকবালিকা আপনা-আপনি ধূলাকাদা হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ৪।৫ বৎসরের বালকবালিকা স্নানের সময় অনায়াসে নিজের নিজের কাপড় সাবান দিয়া ধুইয়া দিতে পারে।

একজন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ কর—বাড়ীর গৃহিণী কেমন তাহা "এক নজরেই" বোঝা যায়। সুগৃহিণীর যেখানে সেখানে যখনি যাও দেখিবে সমস্তই পরিপাটি। আলনার কাপড়গুলি গোছান থাকিলে যে ঘরের কতখানি শোভা বৃদ্ধি হয়—বিশৃঙ্খলা কতখানি দূর হয় তাহা সুগৃহিণী বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বাড়ীর মধ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটিই আমাদের শয়নগৃহ—অতিথি যে কোন মহিলাই সেইখানে অভ্যর্থনা লাভ করেন। সেই ঘরে গিয়া দেখিবে একদিকে একখানা খাট তার আধখানা মসারি ফেলা আধখানা তোলা ২,৩টা বালিস এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে—একখানা চাদর জড় করা আছে, একটী ছেলে ঘুমাইতেছে। ওধারে যোড়া তক্তা পাতা তার এক পাশে, কতকগুলা লেপ কাঁথা বালিস স্তূপাকৃতি, এ পাশে কতকগুলা ছোট বালিস কাঁথা, ছোট ছেলের জামা ছড়ান, আর এক ধারে আলনার উপর কর্ত্তার কামিজ কোট, গৃহিণীর ডুরে সাড়ী হইতে ছেলেদের সব কাপড়,—রাশিকৃত ময়লা ফরসা বিবিধ প্রকারের বস্ত্রের বোঝা, আর দিকে আলমারীর মাথায় রাজ্যের বাজে জিনিস—ঘরের মেঝেতে দুধের বাটী ঝিনুক শালপাতা খাবারের গুঁড়া জল কাদা—ইহার মধ্যে কোন মতে আগন্তুকের স্থান হইল। আর যাহাই হউক ইহা যে অশোভন তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুগৃহিণীর ঘরে দ্বারে এমন দৃশ্য কোন সময়েই কখনও দেখা যায় না। ঘর দ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মলিনতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করা যে কেবলমাত্র সুগৃহিণীর গৃহিণীপনায় সাধিত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সকড়ির বিচার" ও "শুচির আচারের" সহিত পরিচ্ছন্নতা মিলিত হইলে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহই সৌন্দর্য্যময় করিতে পারে। একজন দরিদ্র ফিরিঙ্গী মহিলার ঘর দ্বার যে আমাদের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঘর দ্বারকে ধিক্কার দিতে পারে ইহা গৌরবের বিষয় নহে। অশোভনতার দিকে দৃষ্টি পড়িলে অল্প আয়াসে ও স্বল্প ব্যয়ে ঘরে ঘরে পরিচ্ছন্নতা আনিতে পারা যায়। ইহাতে লক্ষ্মীর শ্রীও বৃদ্ধি হয়।

সমালোচনা।

ঠগী কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ সান্যাল মল্লিক প্রণীত। হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। গ্রন্থখানি মেডোস টেলর রচিত সুবিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থের (Confessions of a Thug) বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থের উপকারিতা ও হৃদয়গ্রাহিতা

বিশ্ববিশ্রুত। গ্রন্থখানি এক অত্যাচারের ভীষণ কাহিনী, পাঠে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। অনুবাদের ভাষাও বেশ সরল ও মিষ্ট হইয়াছে। আগাগোড়া দিব্য কৌতূহল জাগরূক রাখে। অনুবাদকের পক্ষে ইহা কৃতিত্বের পরিচায়ক। যাঁহারা Sensational নভেল প্রভৃতির পক্ষপাতী, এ গ্রন্থখানি তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট আনন্দদান করিবে।

পাগলের কথা। ৺ দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। দাস যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। স্বর্গীয় গ্রন্থকার শিক্ষাকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রোফেসার ডি, এন, দাস নামেই তাঁহার পরিচয়। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সরলভাবে এবং এমন অকপট আন্তরিকতার সহিত জীবনকাহিনী অল্প লেখকই বর্ণনা করিতে পারেন। তেজস্বী আচার্য্যের জীবনত্যাগ ও আত্মনির্ভরতার কাহিনীতে সমুজ্জ্বল। বিলাত ফেরত হইয়া তিনি যে অনাড়ম্বর জীবন বহন করিয়া গিয়াছেন আধুনিক বিলাত ফেরত সম্প্রদায় এবং বঙ্গবাসীমাত্রেরই পক্ষে তাহা অনুকরণীয়। আমরা আপামর সাধারণকে এই গ্রন্থ পাঠে অনুরোধ করি,—ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে প্রভূত সহায়তা করিবে, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। গ্রন্থকারের একখানি হাফটোন চিত্র গ্রন্থাগ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কাননিকা। বৈভ্রাজিকা। শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা প্রণীত। ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত। দুইখানিই কবিতাগ্রন্থ। কাব্যরচনায় লেখিকার এই প্রথম প্রয়াস। কবিতাগুলির অধিকাংশই জন্মভূমির প্রতি অনুরাগব্যঞ্জক। লেখিকার সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পাপ ও পুণ্য। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। ভারত সম্রাট অশোকের পুত্র কুণালের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এখানি ক্ষুদ্র কাব্য, মাঝে মাঝে লেখকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসলাম চিত্র। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার সম্পাদিত। বনগ্রাম গফরগাঁও, ময়মনসিং হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। লেখক অল্পায়তনের মধ্যে মুসলমান সমাজের দোষাদি নিরূপণ ও তন্নিরাকরণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সরল, এবং সামাজিক মতাদি বেশ সংযতভাবেই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেগুলির গ্রহণীয়তা অবশ্য মুসলমানগণের বিচার্য্য। লেখকের রচনায় একটী বিশেষ ক্রটি উচ্ছ্বাসের অতিরিক্ত প্রাবল্য! লেখক এ বিষয়ে অবহিত হইবেন কারণ উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বক্তব্য পরিস্ফুট হইতে পারে না।

মক্কা শরীফের ইতিহাস। মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য বার আনা মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে মক্কার ইতিহাস, বেশ সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাটুকুও সুন্দর। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা। শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ গুপ্ত কবিরাজ প্রণীত। ৯৪।২নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে পারা, গন্ধক পর্পটী প্রভৃতির শোধনপ্রণালী, ক্বাথ, অরিষ্ট, মধ্যমনারায়ণ তৈল, ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতির পাকপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রণালীগুলি অল্পব্যয় সাধ্য বলিয়াই কবিরাজ মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
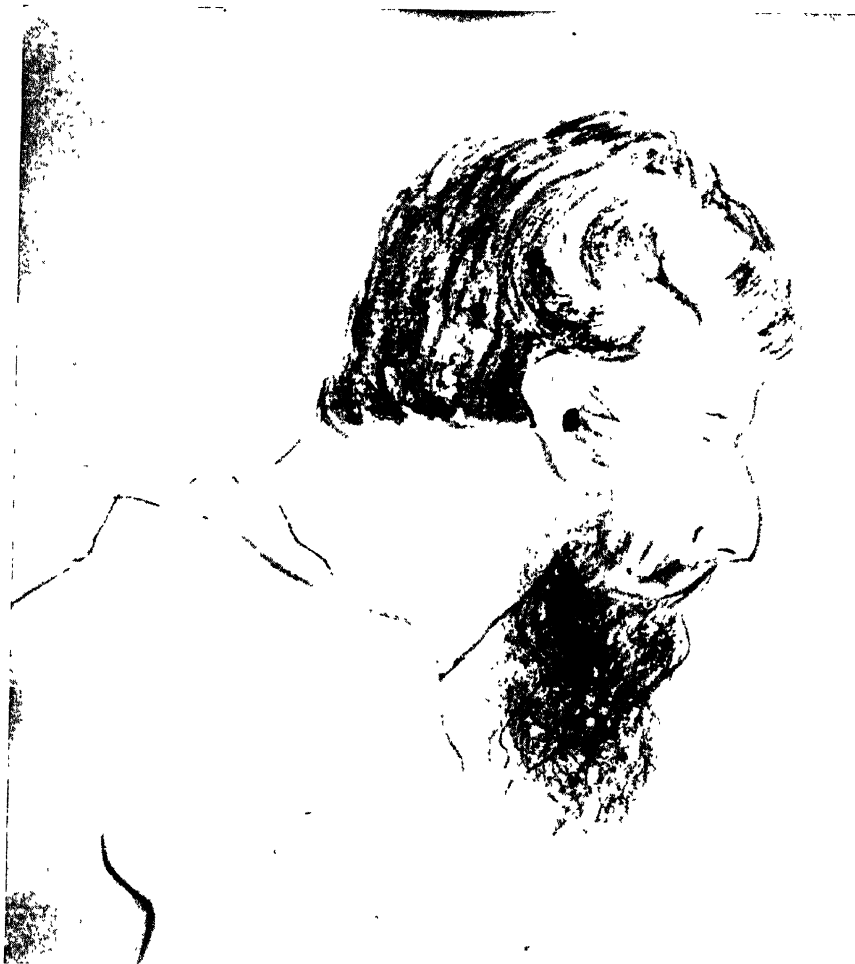
রচনা-নিরত রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ১৪ই পৌষ ১৩১৭ তারিখে অঙ্কিত

সামঞ্জস্য।*

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারদিকেই দেখ্‌তে পাচ্চি সে হচ্চে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক্‌, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্চে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক্‌, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারদিকেই গতি এবং স্ফূর্ত্তি, স্পন্দন এবং নর্ত্তন, অথচ সর্ব্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করচে, সূর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে প্রবলবেগে কোন এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই—আমরা সকাল বেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে একথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেম্‌নি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে; এই অতি প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য ত সহজ সামঞ্জস্য নয়—এ ত মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে সব শক্তির লীলা তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেম্‌নি তাদের বিরুদ্ধতা—কেউবা পিছনের দিকে টানে কেউবা সামনের দিকে ঠেলে, কেউবা গুটিয়ে আনে, কেউবা ছড়িয়ে ফেলে, কেউবা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্চে, কেউবা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্ত্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। এই সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে, তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত; কিন্তু এই সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখ্‌তে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্চে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং।

* বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ই পৌষ সন্ধ্যাকালে পঠিত।

জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তং, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা তার লক্ষ্যও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে—এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে; কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনই প্রমত্ত নন; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্তকাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্চে। "এষ সেতু র্বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়।"

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্ব্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্ব্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায় এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়াল সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়াল; সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসা-শ্রমের স্থলে আধুনিককালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্য্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখ্‌তেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চল্‌চে, তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক্ এই তাঁদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য, এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এম্‌নি সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার

মধ্যে এতবড় একটা বিচ্ছেদ কখনই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না, কী রাষ্ট্রতন্ত্রে, কী সমাজতন্ত্রে, কী ধর্ম্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয় পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে চতুর্দ্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল।

এখন আবার সকলে একেবারে উল্টো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগ্‌ল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগ্‌ল। তাঁর আর সমস্তকেই খর্ব্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগ-চাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগ্‌ল এবং সেই রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাব-বিহ্বলতা জন্মায় সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয় তখনই মানুষ এমন কথা অনায়াসে বল্‌তে পারে যে, ভক্তিপূর্ব্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক্ না কেন তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ যেন, পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষ্যটা যাই হোক্, ভক্তির প্রবলতা দেখ্‌লেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়—কারণ প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয় সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে ত একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিক্‌কে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে, তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবল-মাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চ্চায় মানুষ কখনই মনুষ্যত্বলাভ করেনা এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মত ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কা'কে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার পূজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচার বিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল;—জগদ্ব্যাপারের সর্ব্বত্রই একটা জ্ঞানের, ন্যায়ের, নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দ্দিকে ধূলিসাৎ হতে চল্‌ল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্ম্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্ম্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো-প্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বল্লেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্ম্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড় হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম্ম উভয়কে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়াল তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্ম্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটী সম্পূর্ণ জুড়ে বস্‌ল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোট করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণ গুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্য্যন্ত নিজের প্রকৃতির এ॥ংশের তৃপ্তি সাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার সর্ব্বাংশের ক্ষুধা একদিন না-জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এদেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্ সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্ব্বসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায় তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিষ জগতে অনেক আছে—কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয় যে সত্য চায়, সে ত ভুল্‌তে চায়না, সে পেতে চায়। কাজেই সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরতেই হবে—তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে—কিন্তু উপায় নেই—তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসা মাত্র নয় কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়—এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে;—তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয় আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময় বলেছিল—ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে, গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত্ত তিনি থাম্‌তে পারেননি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হননি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডীর মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেই জন্যেই এদেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী!

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি একথা বুঝেছেন ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায় কেননা সমস্ত রসের সার তিনি—রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন:—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য-প্রকাশ করতে চায় তখন বার বার ফিরে

ফিরে আসে কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা, মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ;—সে গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে একথা কাউকে বলে না যে, তুমি দুর্ব্বল, তোমার সাধ্য নেই, কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়,—আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত করে এতই নিবিড় করে দেখে যে সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য বলে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না—পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হোক্ না এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন—আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন! তাঁরা কেবল না-এর দিক্ থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক্ থেকে নয় এই জন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্ম্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের ও পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনো মতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্চেন তা ভাল করে জানবার পূর্ব্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এই জন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন, পরিমিত পদার্থের মত করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মত যাঁকে না-পাওয়া যায় না—যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব্ব করতে হয় না অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না—যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট নন, যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানিনে সেও তাঁকে জানেনা। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্চে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন ভগবৎ-পিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল! অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্য্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্য্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্চে—সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্য্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখে-ছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুতঃ যারা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন তেমনি পারস্যের সৌন্দর্য্যকুঞ্জের বুল্‌বুল্ হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোক-গুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্য্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলি রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে, এবং কর্ম্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটামাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবার রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করেনি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলে-ছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশ বাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্ম্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এই-জন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হোক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরি-শিখরেই হোক্ নির্জ্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি।—তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়,

তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম;—নির্জ্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা, অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্ম্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্চে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গেই যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা এ'কেই নির্দ্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। একথা মনে রাখ্‌তে হবে আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত প্রিয়কার্য্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্ম্মে যেখানে যথার্থ বীর্য্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্য্যাতন স্বীকার করে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ করে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করিনি। দুর্ব্বলতা বশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্ব্বলতা এপর্য্যন্ত কেবলি বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন—তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রলয় ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্ব্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারি মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধননঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতি-দুর্গের যে রুদ্ধদ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে, আপনার ধর্ম্মকে সমাজকে আপনার আচার ব্যব-হারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ

আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আস্‌তে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, হৃদয়ের সঙ্কোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠ্‌চে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য-ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্চে, সেই-খানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্চে, সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্চে এবং সেই খানেই প্রবল-বেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্চি—এই রকম সময়েই যে সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে করে এখানকার জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে, যে বিশ্লিষ্টতা এদেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্ম্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচার-শক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেল্‌চে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্য্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না, ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিলনা। কি গৃহকর্ম্মে, কি বিষয় কর্ম্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে সম্পন্ন করতেন—তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত যাহাকিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার বা সৌন্দর্য্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে দৃষ্টি, যে ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটবড় এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে, নিয়মের মধ্যে বেঁধে, কাজের মধ্যে সম্পন্ন করে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্য্যন্ত দেখা গেছে তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি—সর্ব্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসী পর্ব্বতে একবার গিয়েছিলুম, তখন দেখেছিলুম

একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যা-ত্যাগ করে পার্ব্বত্যগৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বস্‌তেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করতেন—তেমনি আবার জ্ঞান আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিন খানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের রোমের ইতিহাস ছিল;—তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের যা কিছু পরিণতি ঘট্‌চে সমস্তই মনে মনে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্ব্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসার-যাত্রায় ও ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে;—গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্ব্বদা কি রকম জাগ্রত ছিল তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক ষ্ট্রীট বাস করতেন—একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়া-সাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্কষ্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বল্লেন, দেখ আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্চি কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবেনা।—আমি বেশ বুঝ্‌তে পারলুম শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে ধ্যানমূর্ত্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল—সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণ চিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্য্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় করে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অমুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হোক্! তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্তকালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়চে, এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করচে। সকল শক্তি সকল কর্ম্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ

হোক্! কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্ব্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্ত্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়—সেই-খানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে উঠে' বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আস্‌তে থাকে;—আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্ব্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্ম্মসাধনায় ও কর্ম্ম-সাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্ব্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে; সকল প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসঙ্গত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেল্‌চে; নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধি ও দুর্ব্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্ব্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি, অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি, সেই জন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই, তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ত-তম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সঙ্কোচমাত্র বোধ করিনে এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার চির-প্রচলিত আচার বিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তি-তর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেই জন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সঙ্কুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখ-দারিদ্র্য অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলি নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্ব্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্ব্বেই দুটি একটি করে ভক্ত বিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চম স্বরে আনন্দবার্ত্তা ঘোষণা করচে, আজ আমরা দেশের নব উদ্বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ম্ময় কল্যাণসূর্য্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মান ও প্রেম।

মান চাহে আপনার প্রভুত্বের বলে
প্রিয়জনে রাখিবারে ভৃত্যের মতন।

প্রেম শুধু নম্র পদে ধীরে আসে চলে
বুকে লয়ে ক্ষমাময় আত্ম-সমর্পণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন ঘোষ।

স্বামী রামতীর্থ।

স্বামী রামতীর্থ বা গোঁসাই রামতীর্থ এম,এ, সন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দীপান্বিতার পরদিনে, পঞ্চনদের গুজরানওয়ালা জেলার অন্তর্গত মুরলীওয়ালা গ্রামে, গোঁসাই হীরানন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদগণ ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন এই শিশু জীবিত থাকিলে, কালে একজন মহাপুরুষ হইবেন।

হিন্দী রামায়ণ প্রণেতা মহাত্মা গোঁসাই তুলসিদাস ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। গুজরানওয়ালার গোঁসাইবংশ ধর্ম্মচর্য্যার জন্য চিরদিনই সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফ্‌গানিস্থান প্রবাসী হিন্দুদিগের অধ্যাপনা ও পৌরহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত। শিষ্যদিগের গুরুদক্ষিণা ইঁহাদের পারিবারিক ভরণপোষণের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন।

বাল্যকাল হইতেই রামতীর্থ একজন

স্বামী রামতীর্থ।

ভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। গ্রামে যে কোন গৃহে "কথকতা", রামায়ণ পাঠাদি হইত রামতীর্থ তথায় গমন করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। মহাভারত রামায়ণ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের বিশেষরূপে উদ্দীপনা হয়। যাহা শুনিতেন বা পাঠ করিতেন শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া বার বার সে বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করিতেন এবং প্রত্যেক বর্ণনা ও ঘটনা হইতে একটি না একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। দেব মন্দিরের আরতির সময় যখন শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজিয়া উঠিত তখন রামের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত। তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমা দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

শৈশবকালেই তাঁহার ভক্তিভাব ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া লোকে অবাক্ হইয়া যাইত। এখনও তাঁহার বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশীলতা নির্জ্জন-প্রিয়তা ও ভক্তিমত্তার কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

শিক্ষালয়ে তিনি শিক্ষকদিগের অতি প্রিয় ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে আদর যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষায় তিনি উচ্চস্থান অধিকার করেন। বি, এ পরীক্ষায় ইনি প্রথম হন এবং অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, দেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অঙ্কশাস্ত্র আয়ত্তাধীন করিতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পূরাণ সিংহের * প্রমুখাৎ শুনিয়াছি অধ্যয়ন-কালে তাঁহার অধ্যাপক একদিন তাঁহাকে অঙ্ক শাস্ত্রের একটী জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে দেন। রামতীর্থ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সেই সমস্যা নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া দুঃখে ক্ষোভে ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশেষে অতি পরিশ্রম ও তজ্জনিত অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ রাত্রি শেষে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। নিদ্রাবস্থায় নাকি তাঁহার নিকট ঐ জটিল প্রশ্নের সুচারু সমাধান প্রতিভাত হয়। পরদিন অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার প্রশ্নের এইরূপ সহজ সমাধান দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

রাম দুই বৎসরের জন্য লাহোর ক্রিশ্চান কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের পাঠক (Reader) নিযুক্ত হন। লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বেল সাহেব † (Mr. W. Bell) রামতীর্থের গুণের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। রামতীর্থ প্রাদেশিক শাসনবিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামতীর্থের এ কার্য্য গ্রহণে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার বড় সাধ ছিল তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রের লীলাভূমি কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া "নীল ফিতা"

* শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহ এফ্, সি, এস, Imperial Forest Chemist, স্বামী রামতীর্থের প্রিয়তম শিষ্য তাঁহার জীবন চরিতাখ্যাক ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

† এখন Director, Public Instruction, Punjab.

(Blue Ribbon) পরিধান করিবেন। সেইজন্য তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন এবং যদিও সে বৎসর বৃত্তি তাঁহারই পাইবার কথা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা পাইলেন না। তাই রামতীর্থের নীল ফিতা আর পরা হইল না। তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং বৎসরকালের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

স্বামী রামতীর্থ চিরপ্রফুল্ল ছিলেন। সংসারের কোনও ঘটনাই তাঁহার সদানন্দ ভাবকে তিরোহিত করিতে পারে নাই। তাঁহার সদানন্দভাব যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমেরিকার Great Pacific Railroad Companyর কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহার এই সদানন্দভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইঁহার হাস্য স্বতঃ উৎসারিত,* কিছুতেই ইঁহার প্রফুল্লতা বিনষ্ট হইতে পারে না। সেণ্ট লুই প্রদর্শনীতে (St. Louis Exhibition) তাঁহার প্রশান্ত হাস্যোজ্জ্বল বদনমণ্ডল সকল চক্ষুর কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল।

স্বামী রামতীর্থের প্রেমোজ্জ্বল বদনমণ্ডল দেখিয়া মানুষ কি যেন একটা নূতন জিনিষের আভাষ পাইত, নবজীবনের দ্বার যেন তাহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত, নবাকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়া উঠিত। তাঁহার নিকট কেহ স্থির শান্তভাবে বসিলে তিনি যেন তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতেন, নীচতা, ক্ষুদ্রতা হীনতা, মলিনতা, সকল বিদূরিত হইয়া যেন স্বর্গীয় ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহার আত্মতত্ত্ব ও ভগবদ্‌তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

স্বামী রামতীর্থ—সন্ন্যাসীবেশে।

তাঁহার সেই সুমধুর হাস্যময়, চিরপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল দেখিয়া প্রাণমন আনন্দে পরিপূরিত হইয়া যাইত। তিনি যখন হাসিতেন কয়েক মিনিট ধরিয়াই হাসিতেন—মনে হইত কি যেন এক অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর গিয়াছেন।

স্বামী রামতীর্থ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বিকট অদ্বৈতবাদ তাঁহার অদ্বৈতবাদ এক নহে। তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা বিদূরিত হইয়াছে।

তিনি যখন বজ্র গম্ভীর স্বরে তাঁহার

* "His smiles are iresristible." "A cheerfulnes that nothing could mar was his

স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বলিতেন—"আমি রাম বাদসা, আমার সিংহাসন তোমাদের হৃদয়ে সন্নিহিত। আমি যখন বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম, আমি যখন কুরুক্ষেত্রে জেরুসেলেমে, মেকায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম তখন তোমরা আমাকে চিনিতে পার নাই। আমি এখন আবার গগনভেদী বাণী উত্থিত করিতেছি তোমরা শ্রবণ কর। আমার বাণী তোমাদেরই বাণী। যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি তাহা তুমিই স্বয়ং, অন্য কেহ নহে "তত্ত্বমসি"। রাজা প্রজা দেব দানব কেহই এই সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না, সত্যের জয় অপরিহার্য্য, সত্যের আদেশ অপরিবর্জ্জনীয়। ভীত হইও না। আমার মস্তক তোমারই মস্তক, কাটিতে হয় কাটিয়া ফেল কিন্তু ভাই জানিও এই একটি ক্ষুদ্র মস্তকের পরিবর্ত্তে সহস্র মস্তক উত্থিত হইবে।"

তখন যেন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিত।

রামের প্রাণ প্রেমে পূর্ণ ছিল। একে অদ্বৈতবাদী তাহাতে আবার প্রেমিক। কোথায় পার্থক্য !! কোথায় বিচ্ছেদ !!! তাঁহার নিকট ভেদাভেদ কিছুই ছিল না ; ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই সমান, সকলেই এক। তিনি সকলকেই সমান ভাবে আলিঙ্গন করিতেন, এমন কি তাঁহার কাগজ কলম ছুরী কাঁচি,পেন, পেনসিল সকলি প্রিয় সম্বোধনে সম্বোধিত হইত। সুহৃদবর পুরাণ বলিয়াছেন, তিনি ইতর পশু পক্ষীদিগকে সন্তান সন্ততির ন্যায় সম্বোধন করিতেন। তাঁহার নিকট কেহ পর কেহ দ্বেষ্য বা ঘৃণ্য ছিল না। সকলেই তাঁহার, তিনি সকলের, সকলেই তাঁহার আত্মীয় তাঁহার আত্মার অংশ, সকলেই "আমি" সোঽহং সোঽহং।

কাহারও সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে রামতীর্থ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সহিত আপনার ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। যখন মনে করিতেন তাহার সহিত তাঁহার কোনও প্রকার অনৈক্যভাব ভেদ বা পার্থক্য জ্ঞান নাই তখন স্থির ধীর সমাহিতভাবে সত্যের নামে আপনার বক্তব্যগুলি বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কথা বলিতে বলিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিত এবং মুখ হইতে পারস্য কবিদিগের সুমধুর কবিতা সকল অনর্গল বাহির হইতে থাকিত। কিয়ৎক্ষণ পরে "ওঁ" "ওঁ" "ওঁ" করিতে করিতে নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন, তাঁহার চক্ষু হইতে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিত। তাঁহার সেই সুমধুর দেবদুর্লভ স্বর্গীয় ভাব দেখিলে মনে হইত তিনি যেন আপনাকে ভুলিয়া তন্ময় হইয়া সমাধিমগ্ন হইয়াছেন।

সন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার জাপানের রাস্কিন, (Ruskin) পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক ওকাকুরা (Okakura) ভারতে আগমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের সভাপতিত্বে জাপানে-সিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডলের অনুযায়ী একটি ধর্ম্ম মহাসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করা এবং যদি যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ভারত হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া তাঁহার ভারত আগমনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভারতীয় সংবাদ পত্র সকল সদযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান নেতাগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যাপক ওকাকুরার সহিত এক যোগে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের হঠাৎ অকাল মৃত্যু হইল, অন্যদিকে অধ্যাপক ওকাকুরা আপন স্বদেশবাসীদিগের মতামত গ্রহণ না করিয়া ভারতপ্রবাসকালেই এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া জাপানে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালিদল সংঘটিত হইল। তাহারা অভিমানে ও আক্রোশে এই ধর্ম্মমহাসম্মিলনের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালিত করায় এই প্রস্তাব জাপানে অগ্রাহ্য হইয়া গেল।

এই অশুভ সংবাদ ভারতে পৌছিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। ভারতীয় সংবাদ পত্র সকল এই সংবাদ না পাইয়া অতি আগ্রহের সহিত জন সাধারণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ভারতের নানা স্থানে এই মহা সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য প্রতিনিধি নিয়োজিত হইয়াছিল। এমন কি প্রতিনিধিগণ কোন জাহাজে জাপানে যাইবেন তাহা পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল।

যখন ভারতে এই সব আন্দোলন হইতেছিল তখন স্বামী রামতীর্থ হিমাচল প্রদেশে (Tehri Garhwal) বাস করিতে ছিলেন। তিনি এসব আন্দোলনের কোন প্রকার সংবাদ জানিতেন না। হঠাৎ একদিন সংবাদপত্র পাঠে টিরীরাজ এই ধর্ম্ম মহা-সম্মিলনের সংবাদ জানিতে পারিয়া স্বামী রামতীর্থকে তাহার প্রতিনিধিরূপে এই মহাসম্মিলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। টিরীরাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রিয়শিষ্য শ্রীমান নারায়ণসহ স্বামী রাম কলিকাতা হইয়া জাপান যাত্রা করিলেন। পিনাং, হংকং প্রভৃতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া পঞ্চবিংশ তিদিবস পরে তিনি ইয়োকোমাতে উপস্থিত হইলে। হংকং প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু মুসলমানগণ তাঁহাকে অতি সমাদে ররসহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

যদিও তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন তথাপি মুসলমানগণও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। এমন কি তাঁহারা তাঁহার মুসলমান শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রিয়তম হাফেজের, এবং তাঁহাদের ভক্তিভাজন শামস্বা-ব্রেজের স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া সম্মান করিতেন। ইহা একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে কম সম্মানের বিষয় নহে।

স্বামী রামেরও মুসলমানধর্ম্মের প্রতি একটা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ছিল। মুসলমান শাস্ত্র হইতে কোন বচন অথবা কোন মুসলমান সাধু সন্ন্যাসীর উক্তি স্বামী রাম অতি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিতেন।

স্বামী রাম ষ্টীমার বাসকালে প্রতি সন্ধ্যায় সহযাত্রীদিগকে লইয়া বেদান্তের আলোচনা করিতেন। তাঁহার শ্রমুখাৎ বেদান্তের সুমধুর ও সরল ব্যাখ্যান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

রামতীর্থ দুইদিন মাত্র ইয়োকোহামায় অবস্থান করিয়া টোকিও নগরে গমন করেন।

সেখানে কয়েকটী ভারতবাসী ছাত্র ইন্দো-জাপানিজ্ ক্লাব (Indo-Japanese Club) নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পুরাণ সিংহ মহাশয় সেই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন। রামতীর্থ ইন্দো-জাপানিজ ক্লাবের নাম শুনিয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীমান নারায়ণ, পুরাণকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে "আমরা বিশ্ববাসী" * বলিয়া পুরাণ উত্তর প্রদান করেন। স্বামী রাম তৎক্ষণাৎ আপনার প্রশান্ত বদনমণ্ডল উত্তোলনপূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে বলিলেন "সর্ব্বজীবে হিতসাধন আমার ধর্ম্ম"। তাঁহার এই বিশ্বজনীন প্রেমের বার্ত্তা শুনিয়া সকলে ভক্তি গদগদ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় স্বামী রাম প্রোফেসর চাটার (Prof. Chatre) কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার শর্কাস দেখিতে গমন করেন। সেখানে টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক তাকা কাৎসু (Taka Katsu) উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে স্বামী রাম একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। সুবিখ্যাত দার্শনিকদ্বয় অধ্যাপক হিরাই (Hirai) এবং অধ্যাপক তানাকা (Tanaka) স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক তানাকা বলিয়াছিলেন "আমি অধ্যাপক মোক্ষমূলারের বাড়ীতে ও জর্ম্মানিতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিন্তু রামের ন্যায় বেদান্ত দর্শনের একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি দেখি নাই। ইনি একজন অদ্ভুত মানুষ। †

টোকিও Higher Commercial College এর অধ্যক্ষ Baron Kanda স্বামী রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য আপন ভবনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কেন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করায় স্বামী রাম উত্তর করিয়াছিলেন "আনন্দে আমার অন্তর ফুলিয়া উঠিতেছে, আমি আনন্দে অধীর হইয়া আমার প্রিয়তম ভাই ভগিনীদিগকে এই অপার আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। ভাই ভগিনীদিগের নিকট এই অপার আনন্দের সংবাদ প্রচার করা ভিন্ন আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি সংসার

* তৎকালীন জাপান প্রবাসী স্বর্গীয় বন্ধুবর রমাকান্ত রায় প্রমুখ ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ আপনাদিগকে বিশ্ববাসী বলিয়া পরিচয় দিতেন। রমাকান্তবাবু লেখককে সর্ব্বদাই "তোমার সিকাইজেন (বিশ্ববাসী) বলিয় পত্র লিখিতেন। সিকাইজেন শব্দটী জাপানি ও ইংরাজি ভাষার অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

† Though I have met many Indian Pandits and philosophers at professor Max Mullar's house in Germany but I never saw before a living Picture of Vedanta philosophy as Rama. They knew Vedanta but this man is the teacher of Vedanta and he has full title to the claim. He is simply wonderful.

ত্যাগী নই, আমি ঘোর সংসারী।” ব্যারণ কান্দা রামের সেই আনন্দ বিচ্ছুরিত সমুজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বয়ং আনন্দে অধীর হইয়া পরিবারস্থ সকলের সহিত রামের পরিচয় করিয়া দিলেন।

অধ্যাপক তাকাকাৎসুব বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাম বেদান্তের ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু অধ্যাপক চাটার আপন সার্কাস দল লইয়া আমেরিকা যাইবার জন্য একটী জাহাজ ভাড়া লইয়া স্বামী রামতীর্থকে সেই জাহাজে আমেরিকা গমন করিতে অনুরোধ করায় এবং স্বামী রামের জাপানী ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদান্তের বক্তৃতা প্রদত্ত হয় নাই।

যদিও তিনি জাপানে অত্যল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলেন তথাপি ব্যারণ কান্দার অনুরোধে তিনি তাঁহার কলেজে Secret of Success সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম জাপান টাইমস্ (Japan Times) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পাঠ করিয়া জাপানের রুষ দূত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য স্বামী রামকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। দুঃখের বিষয় এই নিমন্ত্রণ পত্র পাইবার দুইদিন পূর্ব্বে স্বামী রাম জাপান পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন।

স্বামী রাম অন্যত্র বহু শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে মহাত্মা বুদ্ধ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিনিধি মহাত্মা হিরাই বলিয়াছিলেন স্বামী রাম যথার্থই একজন ঈশানুপ্রাণিত ব্যক্তি বটে।

স্বামী রাম প্রিয়শিষ্য নারায়ণকে ভারতে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া সন ১৯৯২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্কো (San-Francisco) নগরে উপস্থিত হন। তখন তাহার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল না বা কোথায় যাইবেন তাহারও কোন স্থিরতা ছিল না। জাহাজ বন্দরে আসিবামাত্র আরোহীগণ নামিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, কিন্তু স্বামী রাম স্থির ধীর গম্ভীরভাবে ডেকের উপর পাদচালনা ক'রতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিশ্চিন্ত-ভাব দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যে তিনি জাহাজের কোন লোক হইবেন। তাঁহার এই নিশ্চেষ্টভাব দেখিয়া কৌতূহলবশত আমেরিকার একটী সুবিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন :—

আপনার নাম কি ?

রাম। আমি একজন ফকীর।

প্রতি। আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি একাকী আসিয়াছেন। আপনি কি জাহাজ হইতে নামিবেন না ?

রাম। আমি সর্ব্বদাই একাকী আপন ভাবে থাকি।

প্রতি। আপনার কোন জিনিস পত্র নাই ?

রাম। আমি যাহা বহন করিতে পারি তদনুরূপ জিনিস রাখিয়া থাকি। তদতিরিক্ত কিছুই রাখি না।

প্রতি। আপনার নিকট যথেষ্ট অর্থ আছে ত ? আমেরিকা বড় শক্ত দেশ এখানে টাকাকড়ি না থাকিলে কেহ থাকিতে পারে না।

রাম। না, আমি টাকা কড়ি রাখি না।

প্রতি। আপনি তবে কি করিয়া এদেশে থাকিবেন?

রাম। আমি আমার প্রতিবেশীদিগের সহিত প্রেমযোগ স্থাপন করি মাত্র। তাহার পর দেখিতে পাই আমার যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহাই পাই। আমার তৃষ্ণার সময় জলের বা আহারের সময় খাদ্যের অভাব হয় না।

প্রতি। বেশ ভাল কথা! কিন্তু ইহাতেই হইবে না। আমেরিকা আপনার ভারতবর্ষ নয়। এখানে হয় টাকাকড়ি না হয় বন্ধু বান্ধব চাই। এখানে আপনার কোন বন্ধু নাই?

রাম। হাঁ, এখানে আমার একজন দয়ালু বন্ধু আছেন।

প্রতি। আমি কি তাহার নাম জানিতে পারি?

রাম সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধোপরি আপন হস্ত স্থাপন করিলেন। ডাক্তার হিলার পূর্ব্ব হইতেই রামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। রাম যখন তাঁহার স্কন্ধোপরি আপনার হস্ত স্থাপন করিয়া জানাইলেন যে তিনিই তাঁহার দয়ালু বন্ধু তখন ডাক্তার হিলার যেন কৃতার্থ হইলেন।

সেই দিন হইতেই রাম ডাক্তার হিলারের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মিসেস্ হিলার কোন বিশেষ কারণে অত্যন্ত মানসিক কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহার অব্যবস্থিত চিত্ত ও মানসিক চাঞ্চল্য দেখিয়া ডাক্তার হিলার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলেন। রামকে পাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া মিসেস্ হিলারের মানসিক অবসাদ দূর হইল। ডাক্তার ও মিসেস্ হিলার রামকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহারা রামের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার হিলার সান্ ফ্রান্সিস্কোর যাবতীয় সংবাদপত্রে রাম সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহাতে নানা শ্রেণীর লোক রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিবার জন্য ডাক্তার হিলারের গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনা ও বেদান্ত চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে মানবাত্মা, ঈশ্বর, ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি নানা বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রাম বিশেষ আনন্দ পাইতেন। একদিন আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে নিগৃহীতা একটী মহিলা রামের নাম শুনিয়া শান্তি পাইবার আশায় তাঁহার নিকট আসিয়া আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী বলিয়া যাইতেছেন আর তাঁহার চক্ষুদিয়া দর দর ধারে অশ্রুজল পড়িতেছে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। রাম যোগাসনারূঢ় হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে সেই দুঃখপূর্ণ কাহিনী শুনিতেছেন, সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ, মা মা বলিতেছেন, আর এক একবার সেই রোরুদ্যমানা মহিলার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। রামের এই স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিয়া মহিলার মনঃপ্রাণ ধীরে ধীরে শান্তভাব ধারণ করিল, তাঁহার নিকট নব আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইল;—তিনি যেন পরম শান্তি লাভ করিলেন। আত্মার অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র ভাব বিদূরিত হইল, তাহার ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অশান্তি যেন অনন্তের মধ্যে মিলিয়া গেল, তিনি উচ্চ জীবনের আস্বাদ পাইলেন এবং এই নব তত্ত্বটী লাভ করিলেন

যে বিশ্বসংসারে মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে দুঃখ কষ্ট শোক অশান্তি বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই; একবার আপনাকে অনন্তের সুরে মিলাইয়া দাও দেখিতে পাইবে এ জীবন তানলয়যুক্ত একটি সুমধুর সঙ্গীত।

স্বামী রাম ইঁহার এই সুমধুর পরিবর্ত্তন দেখিয়া ইহার সূর্য্যানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ইনি অন্য কেহ নন, ভারত প্রদক্ষিণকারিণী সুপরিচিত মিসেস্ ইভা ওয়েলমেন। (Mrs. Eva Wellman]

আর একটী মহিলা আপনার একমাত্র পুত্র হারাইয়া রামকে ঈশ্বরজ্ঞানে শান্তি পাইবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামকে বলিলেন, আমি যখন দেখিতেছি আমার মৃত পুত্র ফিরিয়া আসিবে না এবং মৃত্যুর মধ্যে কি যে এক অদ্ভুত রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা ভেদ করা যখন আমার জ্ঞানের অগম্য তখন আপনার নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন যে, আমি যাহাতে সুখী হইতে পারি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন। স্বামী রাম উত্তর করিলেন, "আমি যাহা করিতে বলিব তাহা যদি অকপট হৃদয়ে করিতে পার, ও তাহার যদি মূল্য দিতে প্রস্তুত হও তাহা হইলে আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারি।" "আপনি যে কোন মূল্য চাহিবেন আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি" এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া স্বামী রাম বলিলেন,—হে নারী আমি তোমার নিকট আমেরিকান ডলার* চাহি না, আমার সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে আমি যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিব তাহাই দিতে হইবে। মহিলাটী ইহাতে সম্মত হইলে রাম বলিলেন হে মাতঃ তোমার গৃহের সম্মুখ দিয়া ঐ যে কাফ্রি বালক যাইতেছে তাহাকে যদি আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতে পার এবং তাহার মধ্যে আপন প্রিয়তম মৃত পুত্রকে দেখিতে শেখ তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি তুমি প্রকৃত সুখ পাইতে পারিবে। মহিলাটী বলিলেন, এ যে বড় কঠিন আদেশ। রাম বলিলেন, এ রাজ্যের এই নিয়ম।

মিষ্টার উইলিয়াম গিবন্‌স্ (Mr. William Gibbons) নামে এক সদাশয় ব্যক্তি রামের সহিত আলাপ পরিচয়াদি করিয়া রামকে খ্রীষ্টাত্মা (Crist-soul) বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। রাম তাঁহাকে স্বামী "নারদ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে ইনি এখন সংসার ত্যাগী হইয়া কালিফোনিয়াতে প্রেমানন্দে নারদীয় জীবন যাপন করিতেছেন।

স্বামী রাম আমেরিকার যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই সকলে তাঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বেদান্ত ও ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়াছেন। পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের মিনেসিওটা (Minnesota) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি "থরো, এমার্সন, ওয়াল্ট্, হুইটম্যান, ও কার্লাইল (Thoreau, Emerson, Walt Whitman, Carlyle) উদ্ভাসিত "নবধর্ম্ম চিন্তায় বেদান্তের প্রভাব" সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সুধিমণ্ডলী

* প্রায় তিন টাকা।

মুগ্ধ হইয়া একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন যে স্বামী রাম ধর্ম্ম ইতিহাসে নবপত্র সংযোজিত করিলেন। রামের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহারা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উপাধি প্রদানের কথা শুনিয়া রাম হাসিতে হাসিতে এই বলিয়া উপাধি গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন যে যিনি মানবকে "ঈশ্বরত্বের" উপাধি প্রদান করিতে চান তাহাকে তোমরা আর কি উপাধি দিবে।

মিসর দেশেও স্বামী রাম অতিশয় সম্মানিত হইয়াছিলেন! স্বামী রাম যেখানেই গিয়াছেন সেইখানেই আপন ধর্ম্মপ্রাণতা, সলজ্জ বিনয় ও সরল মধুর ভাবের দ্বারা সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তাঁহার চরিত্রের প্রভাব, তাঁহারাই বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামী রাম যে কেবল ধার্ম্মিক বা গণিতজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রভূত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কালিফোর্নিয়া প্রবাসকালে ডাক্তার হিলার তাঁহাকে একদিন শাস্তা প্রস্রবণের (Shasta spring) রমণীয় উপত্যকাভূমি দেখাইবার জন্য লইয়া যান। সেখানে কয়েকটী ভদ্রলোক তথাকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতে কে প্রথমে উঠিতে পারেন তাহা লইয়া বাজী রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আল্প পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনকারী কয়েকজন ভদ্রলোকও ছিলেন। কিন্তু স্বামী রামই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া গেলেন। স্বামী রাম আর একবার একজন আমেরিকান সৈনিক পুরুষের সহিত ত্রিশ মাইল ব্যাপী দৌড়ে নিযুক্ত হন, এখানেও তিনি সৈনিক পুরুষের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্বামী রামতীর্থ ১৯০; খৃষ্টাব্দের বড়দিনের সময় ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি আমেরিকায় কি কাজ করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্র পাঠে জানিবার উপায় নাই। তাঁহার কার্য্যাবলীর বিবরণ যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহার আমেরিকার বন্ধুবান্ধবেরা ভারত আগমনকালে তাহা তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই সব বিবরণ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তিনি আমেরিকা হইতে আপন কার্য্যাবলীর কোন সংবাদ দেন নাই বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই।

স্বামী রামতীর্থ ভারতে আগমন করিলে তিনি কোন নূতন ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন কিনা তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতে অনেক ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি কোন নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান না। তাঁহার সকল সম্প্রদায়ের সহিত যোগ রাখিয়া সার্ব্বভৌমিক সত্য ও বিশ্বজনীন প্রেম প্রচার করিবার ইচ্ছা ছিল। তবে যতদূর আমরা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি ব্রাহ্মসমাজের সহিতই তাঁহার মতের বিশেষ ঐক্য ছিল।

স্বামী রাম ভারতে আসিয়া দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দেরাদূন প্রভৃতি স্থানে আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কাশীধামে গিয়া সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।

অভ্রান্ত শাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসবান পণ্ডিতবর্গ সরল যুক্তি মার্গের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যেক প্রতিপাদিত সত্যকে শাস্ত্রবচন দ্বারা সমর্থিত দেখিতে একান্ত প্রয়াসী। যে তর্কের মূলে শাস্ত্রের সমর্থন নাই তাহা অতীব যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত হউক না কেন তাঁহাদের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। স্বামী রাম তাঁহাদের মত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, বিশেষতঃ শাস্ত্রবচন তাঁহার একেবারেই কণ্ঠস্থ ছিল না, সেই হেতু আপন ধর্ম্মমত প্রচারে বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। তিনি নির্জ্জনে শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য টিরীরাজের আশ্রয়ে ভাগীরথে তীরে "রামাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে স্নান করিতে গিয়া হঠাৎ তিনি জলমগ্ন হন। স্নানান্তে ভাগীরথীকূলে বসিয়া প্রাণায়ামে নিযুক্ত ছিলেন হঠাৎ প্রবল জলস্রোত আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার মৃতদেহ দৃষ্টে মনে হয় তিনি তৎকালে সমাধিমগ্ন ছিলেন। স্বামী রামও রাজর্ষি রামমোহনের ন্যায় মানবজাতির একটী প্রকৃতিগত একতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব একদিকে তাঁহাতে বিশ্বজনীন প্রেম অন্যদিকে অসাধারণ স্বজাতি প্রীতি ও স্বদেশ বাৎসল্য উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি "আমেরিকাবাসীদিগের নিকট নিবেদন" শীর্ষক বক্তৃতায় হতভাগিনী জন্মদুঃখিনী জন্মভূমির কথা এইরূপে বলিয়াছিলেন—

"সত্য বটে অতীত কালে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে ভারত জগতকে বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু রাম আজ তোমাদিগকে বলিতে চাহিতেছেন যে আজ কাল যে সকল নব ধর্ম্ম ও নব মত ইউরোপ ও আমেরিকাকে আলোড়িত করিতেছে তাহারও আলোক এখনও ভারত হইতে আসিতেছে। তোমাদিগের নব চিন্তা, নব ধর্ম্মতত্ব, প্রেত বিদ্যা, (Spiritualism) খ্রীষ্টবিজ্ঞান, মানসিক চিকিৎসা (Mental Healing) প্রভৃতি যাহার জন্য আজ তোমরা এত গৌরব অনুভব করিতেছ ইহাদের সকলেরই মূল পুণ্য ভারত ভূমি। যে দেশ পুরাকালে এবং বর্ত্তমান সময়ে জগতকে নানাবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন রাম আজ তোমাদিগকে সেই দেশের কথাই বলিতেছেন। দর্শনেতিহাস আজ সুস্পষ্টরূপে প্রচার করিতেছেন প্লেটো, সক্রেটিস্, পিথাগোরাস্, প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণ ভারতবাসীর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সপেনহার শ্লাগেল, স্লিলিং, কুজিন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা শঙ্কর, বুদ্ধ, উপনিষদ ও গীতা হইতেই উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। যে দেশের উচ্চ চিন্তা ও মহৎ আদর্শ তোমাদিগের ভক্তিভাজন এমার্শন, হুইটম্যান, আর্ণল্ড, মোক্ষমুলার প্রভৃতিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, রাম আজ তোমাদিগকে সেই শঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণের দেশের কথাই বলিতেছেন। ভারত যে কেবল উচ্চ-চিন্তা ও মহৎ আদর্শ কাব্য ও দর্শনের জন্মভূমি তাহা নহে তিনি শৌর্য্য বীর্য্যের জন্যও সুবিখ্যাত। যে দেশ এককালে ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল, যাহার ধনরত্ন আহরণ করিয়া জাতির পর জাতি ঋদ্ধিমান হইয়াছেন এবং যে লোভনীয় দেশের অনুসন্ধানে যাইয়া কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ফেলেন, রাম আজ তোমাদিগকে সেই দেশের কথাই বলিতেছেন। ভারত যে কেবল শৌর্য্য বীর্য্যে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাহা নহে, ভারত জ্ঞানে, গুণে ও ধর্ম্মে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে মাতা জগতকে কাব্য ও দর্শন, উচ্চ চিন্তা ও উন্নত ধর্ম্মদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন জগতের সেই প্রাচীন শিক্ষাদাত্রী জননী

আজ রোগশয্যায় শায়িতা। তোমরা কি এখন তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইবেনা?"

রাম ভারতের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বলিয়াছিলেন যে,—

"তোমরা রামের দেহকে পরিত্যাগ করিতে পার, রামকে নিষ্পেষিত করিতে পার, রামকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পার, রামের দেহ লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার কিন্তু দোহাই তোমাদের ভারতের পক্ষ অবলম্বন কর, সত্যের পক্ষ অবলম্বন কর।"

জাতিভেদের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কে তুমি কে আমি যে নিম্নশ্রেণীর কার্য্যকে নীচ বলিব বা ঘৃণা করিব। পুরোহিত যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী অপেক্ষা তাঁহাদিগের কার্য্য কিসে হীন? ভারতের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পথ দিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যেরা গমনাগমন করেন সে পথ দিয়া শূদ্রের যাইবার অধিকার নাই। যে গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস করিবেন সে গ্রামে নিম্নশ্রেণীর বাসের অধিকার নাই। যদি শূদ্রের ছায়া ব্রাহ্মণের উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, যদি নিম্নজাতির লোক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহা অপবিত্র কলুষিত হইয়া উচ্চ জাতির ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। নিম্ন জাতির বালকগণ উচ্চ জাতির বালকদিগের সহিত একই বিদ্যালয়ে পড়িতে পায় না। ইহা অপেক্ষা অমানুষিক অত্যাচার আর কি হইতে পারে। এ সব কথা ভাবিতে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়!"

নারী জাতিকে রাম বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ইহারা স্বর্গীয় জিনিষ, ইহাদিগকে পূজা করিতে হয়। ইহারা দেবতা, আত্মদেব সৌন্দর্য্যসূর্য্যের সমুজ্জ্বল রশ্মি। যে শাস্ত্র, যে বিধি নারী ও শূদ্রকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত রাখিতে চায় তাহাকে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ কর।"

স্বামী রাম বেদান্তদর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। অনেকে বেদান্ত পাঠ করিয়াছেন বেদান্ত আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু কেহ রামের মতন জীবনে বেদান্ত প্রতিপালন করেন নাই। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য দার্শনিক যিনিই রামের সহিত আলাপ করিয়াছেন, সহবাস করিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

রাম সত্যের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কোনও দিনই শাস্ত্রের অর্থ কদর্য্য করিয়া আপনার মত সমর্থন করেন নাই। যেখানেই শাস্ত্রের সহজ ও সরল অর্থের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইয়াছে সেখানেই সুস্পষ্টরূপে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখানেও রাজর্ষি রামমোহনের কথা মনে পড়ে। তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনি কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

স্বামী রাম সরলতার আদর্শ ছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িকভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা সরল স্পষ্ট কথায় বলিয়া যাইতেন। লোক বা সমাজ বিশেষের খাতির রাখিতেন না। দেরাদুনস্থ আর্য্যসমাজ মন্দিরে বক্তৃতাকালে তাঁহাদের অতি প্রিয় "হোমযজ্ঞে"র অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বায়ু পরিষ্কার করিবার জন্য হোমের প্রয়োজন নাই। প্রতি গৃহে শত সহস্র

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইতেছে, কত শত বনাগ্নি সংঘটিত হইতেছে তাহাতে বায়ু সংশোধিত হইতেছে না আর আর্য্য সমাজে কয়েকটা হোম যজ্ঞ করিলেই বায়ু পরিষ্কৃত হইয়া যাইবে ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক কথা, অতি অসত্য কথা।"

অনেকে বিদেশে গিয়া এদেশের কুরীতি ও কুনীতি সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদিগের গৌরব করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বামী রাম এ সব ঘৃণা করিতেন। যাহা লইয়া ভারতের যথার্থ মহত্ত্ব সেই শাশ্বত সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্বামী রাম মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এমন ধার্ম্মিক, বিনয়ী, সত্যপরায়ণ, সরলতার সৌম্যমূর্ত্তি স্বদেশভক্তের অকাল-মৃত্যুতে ভারতের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। লীলাময় বিধাতার লীলা কে বুঝিবে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পরীক্ষার্থী

পাস কোরতেই হবে এই মনে কোরে যখন সুরেশ তার ছোট্ট পড়বার ঘরটির দরজা জানলা খুলে দিয়ে 'ভবিষ্যুক্ত' হোয়ে পড়তে বসল, তখন সবে ভোর হয়েচে। দরজার ভিতর দিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে প্রভাতের বায়ু, অনন্ত পুরুষের আশীর্ব্বাদের মত, অবাধে ঘরে প্রবেশ করে তার সর্ব্বাঙ্গে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে গেল। সুরেশ আনমনে সাইকলজির পাতা উল্‌টাতে লাগল। ভোর যে হয়েচে সে কথা পাখীরা প্রথম রটিয়ে দিলে। পাখীর প্রভাতী সঙ্গীত রক্তের প্রবাহের মত তার শিরায় শিরায় ছুটে গেল। সে মাথা তুলে চেয়ে দেখলে, ছোট ছোট শাদা শাদা মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে আছে। যখন তাদের উপর সূর্য্যের কিরণ এসে পড়ল তখন মনে হল যেন বিস্ময়ে ও আনন্দে আকাশ রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠেছে। প্রভাতের আসার সংবাদ ক্রমে পৃথিবীর কাছে এসে পৌঁছল। গাছগুলো হাত পা মেল্‌তে লাগল, পাতাগুলো বাতাসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের শরীর দোলাতে লাগল, ফুলের কুঁড়ি জগতের প্রাণের ভিতর ঢোকবার জন্যে সৌরভ নিয়ে বেরিয়ে এল। পথ দিয়ে দু'একটা লোক চল্‌তে আরম্ভ করলে। পৃথিবীর লোক কাজের জন্য ছুটল। একাজের কি শেষ নেই? কি নির্ম্মম কাজ। সুখ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নেই, হৃদয়ের পানে তাকাবার অবসর নেই, প্রাণের প্রতি সুবিচার কোরবার সুযোগ নেই। কি নিষ্ঠুর কাজ! বিয়োগবিধুরা জননী নিঃশব্দে চোখের জল মুছে গৃহকাজে রত হলেন, পতিহীনা রমণী মনের আগুণ চাপা দিবার জন্য উননের আগুণ জ্বাল্‌লেন, শোকসন্তপ্ত পিতা পুত্র-শোক ভুলবার জন্যে সাংসারিক হিসাবে মনোনিবেশ কোরলেন। এত দুঃখ এ পৃথিবীতে, এত কষ্ট এ জীবনে! দু'পাতা সাইকলজি পড়ে কি এ দুঃখ দূর হবে, এক চ্যাপটার লজিক কি এ কষ্টের অপনোদন কোরবে! সুরেশ বই ফেলে রেখে পৃথিবীর

কাজের ভিতর আপনার মন নিয়ে প্রবেশ কোরে দেখ্‌লে, এ কাজের বিরাম নেই, এ কাজের অন্ত নেই। নিষ্ঠুর কাজ বিরাট অজগর সর্পের মত মানুষের হৃদয় পিষে দিচ্চে। সুরেশের তখন আর পড়া হল না।

বেলা এগারটার সময় সুরেশের মা সুরেশের ঘরের দরজা থেকে ডেকে বোল্‌লেন, সুরেশ, নাবি খাবি আয় বাবা। পড়ে পড়ে যে শরীরটা মাটি হোয়ে গেল, ধন। সুরেশ মায়ের কথা শুনে লজ্জিত হোয়ে বই বন্ধ কোরে স্নান কোরতে গেল। দেখ্‌লে, তার জন্যে স্নানের জল তোলা আছে, কাঁচের বাটিতে জবাকুসুম তেল ঢালা আছে। কাপড় খানি ও গামছা খানি পর্য্যন্ত হাতের কাছে সাজান আছে। সুরেশের ছোট বোন মালতী মায়ের আদেশে দাদাকে তেল মাখাতে ব'সল, এবং সুরেশের মা তার ভাত বাড়তে রান্নাঘরে গেলেন। সুরেশ পরীক্ষা দেবে বোলে বাড়ী-শুদ্ধ লোক শশব্যস্ত। সুরেশের বাবা আফিস চলে গিয়েছেন কিন্তু আফিস যাবার আগে গৃহিণীকে বিশেষ ভাবে বোলে গিয়েছেন যেন সুরেশের আহারের উপর নজর রাখা হয়। গৃহিণী তাই সুরেশের জন্য ভোজের আয়োজন কোরেছেন। সুরেশ যখন খেতে বসল তখন তার মা কাছে বসে, 'এটি খাও ওটি খাও' বোলে অনুযোগ কোরতে লাগলেন, মাছের কাঁটা বেছে দিলেন, নিজে হাতে দুধে অনেক কোরে ভাত মেখে দিলেন। সুরেশ ভাত খেতে খেতে ভাবলে, সকালে যেমন পড়া হয় নি, দুপুর বেলা এমন মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, যাতে সকালের ক্ষতিটা পূরণ হয়। ভাত খাওয়া শেষ হোলে যখন সে পড়তে গেল তখন সুরেশের মা বাড়ীর সব মেয়েদের ডেকে নিয়ে উপরে চলে গেলেন এবং তাদের বার বার কোরে বোলে দিলেন যেন তারা সুরেশের পড়বার ঘরের দিকে একেবারে না যায়। দাদা পরীক্ষা দেবে বোলে সুরেশের ছোট ছোট ভাই বোনেরা অতি সম্ভ্রমের সহিত সুরেশের পড়বার ঘরটি এড়িয়ে গেল। সমস্ত দিন তারা চুপে চুপে খেলা কোরতে লাগল। কেউ গোলমাল কোরলে মালতী অমনি বোলে উঠল, চুপ, কর ভাই, দাদা পড়ছে। সুরেশ পড়বার ঘরের সকল দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে কেবল একপাট জানালা খুলে রেখে পড়তে ব'সল। নীতিশাস্ত্রের দরজা ধোরে যখন সুরেশের বুদ্ধিটা বিস্তর ঝাঁকাঝাঁকি কোরচে এমন সময় সুরেশের তন্দ্রা এল। ঘুমের ভারে তার চোখের পাতা বুজে এল, সে বইয়ের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল'। দুর্গরক্ষককে অনবধান দেখলে বন্দী যেমন এক দিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ে, সুরেশের মনও সেই রকম সুরেশকে নিদ্রিত দেখে ওধাও হোয়ে অনন্তের পথে ছুটল'। বাড়ীর উপর দিয়ে কতক গুলা কাক একসঙ্গে কাকা কোরতে কোরতে উড়ে গেল। আততায়ীর দেশে সশস্ত্র সৈনিকের মত, দুঃস্বপ্নময় ঘুম থেকে সুরেশ চমকে উঠে বসল। সেই সময় অনেক দূরে একটা চিল চীৎকার কোরে উঠ্‌ল। তার চীৎকারে আকাশের আধখানা কেঁপে উঠ্‌ল। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা তরঙ্গায়িত হোয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় আবার বাড়ীর পাশের রাজ-মিস্ত্রীরা সমস্বরে গান ধরলে,—রাধে গো তোর সাধের তরী লেগেছে প্রেমের ঘাটে। বাড়ীর

পাশ দিয়ে কতক গুলো রাজহাঁস এক জোটে প্যাঁক প্যাঁক কোরতে কোরতে পাড়া জাগিয়ে চোল্লো। চিলের চীৎকারের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আর সেই হাসের ডাকের সঙ্গে সুরেশের মনের কি ষড়যন্ত্র ছিল জানি না। কিন্তু সেই চীৎকার আর সেই গান আর সেই ডাক আর সুরেশের ঘরের শক্ত মন এমন কোরে সুরেশকে মাতিয়ে দিলে যে সে আর কিছুতেই ঘরের মধ্যে চুপ কোরে বসে থাকতে পারলে না। সুরেশের মনে হ'ল যেন সমস্ত বিশ্বজীবন তাব জীবনকে ডেকে নিচ্চে। তার প্রাণ যেন সব নিস্তব্ধতা সব শব্দের ভিতর তার প্রিয়-তমের সাড়া পেয়েছে। অপরিচিতের মধ্যে মাতৃহারা শিশু যেমন ফুকৃয়ে কেঁদে ওঠে, সুরেশের হৃদয়ও তেমনি শুষ্ক কঠোর অক্ষর রাশির মধ্যে কেঁদে উঠল'। সুরেশ তাড়া-তাড়ি ঘরের বার হোয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তার রৌদ্রতপ্ত ধূলি এমন কোরে তার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল যেন তারা সুরেশের চরণে শরণ লাভ কোরে বাচল। শেষ বেলার পড়ন্ত রৌদ্র কিরণ এমন ভাবে সুরেশেব গায়ের উপর এসে পড়ল যেন সেও সুরেশকে পেয়ে বড় খুসি। আকাশ তার স্থির চক্ষু বিস্তার কোরে নীরব তিরস্কার জানিয়ে যেন বোল্‌লে, নীতিশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের চেয়ে তারই সুরেশের উপর বেশি দাবী। আকাশ বাতাস ও আলোর মধ্যে সুরেশ নিজেকে হারিয়ে ফেল্লে।

সন্ধ্যার সময় সুরেশের পিতা রামতারণবাবু আফিস থেকে ফিরে এসে দেখলেন, সুরেশ তখনো বই হাতে কোরে বসে আছে। ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে তিনি সুরেশকে বল্লেন, "সন্ধ্যা হয়েছে, আর কেন? এখন একটু বেড়িয়ে এস গিয়ে। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে থাকলে অসুখ করবে যে!" সুরেশ খাবার খেয়ে বেরিয়ে গেলে পর রামতারণবাবু স্ত্রীকে বল্লেন, "আমার ত সাতাশ বচ্ছর চাকরী করা হল। তা আমি এই মাস থেকেই পেনসন নিচ্চি।" স্ত্রী বল্লেন, "ভালই হল। তোমার শরীরটা বড় খারাপ হোয়ে গিয়েছে। আর খাটবার বয়স নেই—আর সুরেশও ত মানুষ হয়ে উঠল।" রামতারণবাবু বোল্লেন, "আমি তাই ভেবেই ত পেনসন নিলাম। এই কটা মাস বৈ ত নয়। সুরেশ বিয়েটা পাস কোরতে পারলে আর দুঃখ থাকবে না। বড় সাহেবকে বোলেছিলাম, তিনি ভরসা দিয়েছেন ছেলে বিয়ে পাস কোরলে নিশ্চয়ই বড় চাকরী কোরে দেবেন।" সুরেশের মা তাই শুনে ভারী খুসি হলেন। সুরেশ ভাল ছেলে, বিয়ে পাস কোরবেই। এখন তার বিয়ে দিয়ে একটি সুন্দর বৌ আনতে পারলেই তাঁর সকল সাধ পূর্ণ হয়। রামতারণবাবু আফিসের কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "আজ ঘটক ঠাকরুণের আসবাব কথা আছে না?" স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিতে দিতে বল্লেন, "হাঁ আজকেই ত আসবে, আমি কিন্তু বোলে দিয়েছি নগদ তিন হাজার টাকার কম ছেলের বিয়ে দেব না। মালতী দিদি তার ছেলের বিয়ে দিয়েচে দেখেচ ত? ছেলে ভারী ত একটা পাস কোরেচে। তবু সাড়ে তিন হাজার টাকা নগদ নিয়েচেন, তা ছাড়া ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ছেলের জন্যে বাইসিকেল। এ ছাড়া মেয়েকে এক গা গয়না দিয়েছে। আমার ছেলে কি

যেমন তেমন ছেলে। তবু ত আমি তিন হাজার টাকার বেশি বলি নি।" রামতারণবাবু রসগোল্লাটি গালে পুরে দিয়ে বোল্লেন, সুরেশের বিয়ের জন্যে আবার ভাবনা কিসের ? ওরা তিন হাজার টাকা না দেয় আমি হরি সান্যালের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব, তারা চার হাজার টাকা দিতে চেয়েচে। সুরেশের মা, 'বেশি লোভ কোরতে নাই গো' বোলে প্রদীপটি জ্বেলে নিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। ভাতের হাঁড়িটা উননে চাপিয়ে সরা চাপা দিয়ে যখন তিনি আলুর খোসা ছাড়াতে বসেছেন তখন ঘটক ঠাকরুণ 'বাড়ীর সব কোথা গো' বোলে হেলে দুলে পান চিবুতে চিবুতে এসে হাজির হলেন। সুরেশের মা বটিখানা সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পেতে দিলেন আর মেয়েকে বোল্লেন, "যালো তোর বিরাজী মাসিকে ডেকে নিয়ে আয়। বোল্‌গে ঘটক ঠাকরুণ এসেছে, শীগগীর এস।" বিরাজী ঠাকরুণ আঁচলে চাবির গোছা বেঁধে হাসতে হাসতে এসে উঠলেন। তখন ঘটক ঠাকরুণ ও ছেলের মা ও ছেলের মাসী গয়নার ফর্দ্দ আর টাকার পণ নিয়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত কোরলেন। মেয়ের বাপ মোটে আড়াই হাজার টাকার পণ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বিরাজী ঠাকরুণ গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, "ও মা এই না কি কথা ! তিনটে পাস করা ছেলের বিয়ে কি আড়াই হাজার টাকায় হয় ? সুরেশের মা কোলের মেয়েটাকে ধপ কোরে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে ডালের হাঁড়িতে সজোরে কাঠি নাড়তে লাগলেন। সে রাত্রে কিছুই মীমাংসা হল না।

তার পর দিন সকালে ঘটক ঠাকরুণ পুনরায় এসে বোলে গেলেন যে মেয়ের বাপ তিন হাজার টাকাই দিতে স্বীকার কোরেছেন। তখন বিরাজী ঠাকরুণ শাঁখটা নিয়ে সজোরে তিনবার ফুঁ দিলেন, বাড়ীর ঝি বিয়েতে নগদ নেবে বোলে সুরেশের মার কাছে বায়না ধরলে, ঘটক ঠাকরুণ বোল্লে, আমি দশ টাকার কম বিদেয় নেব না। সুরেশের ছোট ভাই বিপিন বোল্লে, দাদার বিয়েতে আমি জুলী গালী চল্‌ব। বিরাজী ঠাকরুণের পাঁচ বছরের একটি ছেলে রসগোল্লার ভারী ভক্ত। সে বোল্লে, বিয়েতে আমি রসগোল্লা পরিবেশন কোরব। সুনীতি বোল্লে, আমি উলু দেব আর শাঁখ বাজাব। সুরেশের মা হাসতে হাসতে কর্ত্তাকে সুখবরটা দিতে গেলেন। কর্ত্তা শুনে বল্লেন, দেখ বিয়ের টাকা থেকে এক হাজার টাকা আমায় দিতে হবে, আমি একটা কাপড়ের দোকান খুলব ভাবচি। গিন্নী বল্লেন, আমার বাড়ীর তৈরী না হোলে আমি কাউকেই কিছু দে না। কর্ত্তা বল্লেন, তা হবে এখন।

তার পর মিত্তিরদের বাড়ীর মিনু, ভটচাজ্জের বৌ হরিদাসী, সরকারী উকিলের পিসতত ভাইয়ের নাতজামাইয়ের আপন খুড়ির সহোদর বোন নবীনকালী, জজের পেস্কারের শালীর পুত্রবধূ ভুবনমোহিনী, এক এক কোরে এসে হাজির হলেন। কেউ বল্লেন মাসি, কেউ বল্লেন দিদি, কেউ বল্লেন বোন্, ছেলের বিয়ে দিচ্চ আমরা যেন ফাঁক না যাই। সুরেশের মা হাসতে হাসতে সকলকেই বোল্লেন ওমা তাই নাকি হয় ! তোমাদের আগে খবর দেব। তোমরাই হোলে ছেলের মা মাসি। তোমরা কর্ম্মে কর্ম্মাবে না ত পথের লোক ধোরে আনব ?

এতগুলা লোকের সাধ আহ্লাদ মিটাবার ভার যার উপর সে লোকটা কিন্তু ঘরোয়া বিবাদে মাটি হতে চোল্লো। সে যখনই বই হাতে কোরে বসে, তখনি তার মনটা আকাশপথে ছুটে যায়, তার প্রাণটা পথে ঘাটে হাটে বাজারে লোকজনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। সুরেশ বেচারা স্মৃতি শক্তির সাহায্যে কোন রকমে পরীক্ষা অরণ্য পার হচ্ছিল কিন্তু বাইরের জগৎ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোরে তাকে এমন বিপথে নিয়ে ফেল্‌লে যে সে কিছুতেই আর নিজেকে উদ্ধার কোরতে পারলে না।

সুরেশের ফেল হওয়াতে বাড়ীতে শোকের ঝড় বহে গেল। কর্ত্তা দিন কতক ধোরে নিবিষ্ট চিত্তে রামায়ণ মহাভারত পড়তে লাগলেন। গিন্নী অর্দ্ধেক দিন রান্নাঘরেই কাটাতেন। ভাত রান্না খাওয়া হোয়ে গেলেও খোলা চড়িয়ে বসে থাকতেন। মুড়ি ভেজে মুড়ির চাল কোরে নিজের মনকে শান্ত কোরতেন। ঘটক ঠাকরুণ বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আর এক বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সুরেশের বন্ধুবান্ধবেরা কেউ মৌখিক কেউ বা আন্তরিক সহানুভূতি দেখালে। সুধাংশুর মা—যাঁর ছেলে তিনবার ধোরে এফ্‌ এ ফেল হচ্ছিল—আঙুল মটকাতে মটকাতে বল্লেন, "ঐ দেখ, অত অহঙ্কার কি আর সহ্য হয়! দর্পহারী মধুসূদন ত আছেন! সুধাংশু আর সুরেশ একসঙ্গে এফ্‌ এ পরীক্ষা দেয়। সুধাংশু ফেল হয়, সুরেশ পাশ হয়ে যায়। সুরেশের মা ছেলের পাশ হওয়ার সন্দেশ বলে সুধাংশুর মার কাছে এক থালা গোল্লা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুধাংশুর মায়ের সে গোল্লা আজও পর্য্যন্ত জীর্ণ হয় নি। পাড়া-বেড়ানী উমাসুন্দরী যখন সুধাংশুর মার কাছে দৈনিক গেজেট নিয়ে এল, তখন সুধাংশুর মা তাকে হাসতে হাসতে বল্লেন, ওলো সুরেশের মাকে বলিস,—ছেলের বিয়ের সন্দেশটা যেন পাই।

সুরেশ মার্ক আনিয়ে দেখলে সে মোটের উপর আট নম্বরের জন্য ফেল হয়েচে। তবু সে ফেল! সে অন্তের পাসের সঙ্গে নিজের ফেলের তুলনা কোরে তার সঙ্গে নিজের মোটে এক বিঘৎ তফাৎ মনে কোরে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল কিন্তু সে অতি শীঘ্রই টের পেলে যে এই এক বিঘৎ জায়গাতে সমস্ত পৃথিবীটা তার মান অপমান ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য সুখ দুঃখ প্রভেদ নিয়ে এসে দাঁড়াল। সম্মান ঐশ্বর্য্য সুখ তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল কিন্তু সে তাদের কাছ থেকে যেন একটা জীবন পিছিয়ে পড়ল। ব্রজলালের মা যখন নগদ তিন হাজার টাকা, এক প্রস্থ রূপার বাসন এবং সোণা দিয়ে মোড়া বধূটিকে বরণ কোরে ঘরে তুল্‌লেন তখন রামের মা, শ্যামের মা, হরির মা, সকলেই সমস্বরে বল্লেন, আহা, তা হবে না কেন,! ছেলেও যে তেমনি, তিনটে পাস! যথাসময়ে উমাসুন্দরীর মারফৎ ব্রজলালের মার সৌভাগ্যের কথা সুরেশের মার কাছে পৌঁছাল। সুধাংশুর মা উমা-সুন্দরীকে গয়নার ফর্দ্দ লিখে দিয়েছিলেন। এই ধর সিঁথেয় সিঁতি, কানে মাকড়ী, নাকে নথ্‌, বাজু, সাতনর, চিক, চন্দ্রহার, বালা, অনন্ত। এক একখানা গহনা এক একটা কাঁটার মত সুরেশের মার বুকে বিঁধে গেল।

অল্প দিনের মধ্যে সুরেশের পিতাও

রোগশয্যায় আশ্রয় নিলেন। তার স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভেঙ্গে ছিল, পুত্রটি ফেল হওয়ায় তিনি মনে যে আঘাত পেলেন তাতে শরীর আরো বিগড়িয়ে গেল। সুস্থ শরীরে পেনসনের অল্প টাকায় এক রকম চলে যেত। এখন রোগের খরচ বেড়ে যাওয়ায় বড় টানাটানি পড়ল। সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া দেখা দিলে। তার উপর ব্রজলালের ডেপুটী হওয়ার খবর নিয়ে এ পাড়ার মাসী, ও পাড়ার পিসী, নতুন পাড়ার জ্যেঠী সুরেশের মার কাছে এসে সুরেশের ফেল হওয়ার জন্যে কর্ত্তার অসুখের জন্যে আর সংসারে টানাটানি পড়ার জন্যে বিলক্ষণ রসান দিয়ে গেলেন। কর্ত্তার বিছানার কাছে বসে আধখানা ঘোমটা খুলে দিয়ে ব্রজলালের মার সুখ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সুরেশের মার দুঃখ দারিদ্র্যের তুলনা কোরতে লাগলেন। মাসী বল্লেন, আহা ব্রজলাল বড় ভাল ছেলে গো। পিসী বল্লেন, উপযুক্ত ছেলে, বিয়ে পাস কোরেচে. তবে ত ডেপুটী হয়েছে। জেঠী বল্লেন, তাতেই ত তাদের সংসারে সুখ ঐশ্বর্য্য উথলে উঠেছে। শুনে সুরেশের মা গোপনে চোখের জল মুছলেন, সুরেশের বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সুরেশ যে দিকে বসেছিল, সে দিক থেকে অন্যদিকে চোখ্ ফেরালেন।

তার পর সুরেশের বাবা মারা গেলেন। সুরেশের উপর সংসারের ভার পড়ল। সে অনেক কষ্টে অনেক উমেদারী কোরে কোন জমিদারের কাছারিতে কুড়ি টাকা বেতনে একটা চাকরী যোগাড় কোরলে। এতদিন পরে সে আট নম্বরের প্রভেদ বুঝতে পারলে। সে ফেল হয়েছে—তার মানে সে কর্ত্তব্য পালন করে নি। ছাত্রজীবনের যা সর্ব্বোচ্চ পাপ সে তাই অর্জ্জন কোরেচে। জগতের বিচার ঠিকই হয়েচে। অকৃতকার্য্যতার দণ্ড জগৎ এই রকমেই দিয়ে থাকে। তার ব্রহ্মচারী হোয়ে তপস্যা করা উচিত ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত কোরে সাধনা করা উচিত ছিল, সমস্ত অন্তর্জ্জগৎকে অধ্যয়নের কাজে নিযুক্ত করা উচিত ছিল—সে তা পারে নি, তাই তার দাম আজ কুড়ি টাকা। ব্রজলাল পেরেছিল, তাই তার দাম আজ দুশো টাকা। সুরেশ ঠিক কোরলে, সে এবার তপস্যা কোরবে। সে সকালে আর বিকালে কাছারীর কাজ করে, দুপুর বেলা কলেজে যায়। রাশি রাশি বেকন দেকার্ট মিলের টীকা দিয়ে হৃদয়কে চাপা দিয়ে রাখলে, ইংরেজ কবিগণের পার্থিব উন্নতিবিষয়ক শত শত নীতি বচন দ্বারা প্রাণটাকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বেধে রাখলে। এক বৎসর এইভাবে সংযম কোরে পরীক্ষা যজ্ঞে দীক্ষিত হল।

কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এসেই সে রোগে পড়ল। যে উত্তেজনা ভিতরকার মানুষটাকে চাপা দিয়ে তার উপর বুদ্ধির সঙ্গীন চাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে উত্তেজনা সরে পড়বামাত্র ভিতরকার মানুষটা সুরেশকে দণ্ড দেবার জন্য উদ্ধত হোয়ে উঠল। বুকের ভিতর দুর্ব্বলতা, মাথার ভিতর দুর্ব্বলতা, প্রাণের ভিতর দুর্ব্বলতা—সুরেশ ভাল কোরে হাত পা মেলতেও কষ্ট বোধ করতে লাগল। সে বেশ বুঝতে পারলে তার জীবনের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

এক দিন রাত্রে বড় বাড়াবাড়ি হল। ডাক্তার কাছে বসে আছেন। সুরেশের মা

সুরেশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চেন। সুরেশ বোল্লে, জানালাটা খুলে দাও, গরম লাগচে। সুরেশের মা তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দিলেন। নিদাঘের নির্ম্মল আকাশ অনন্তনীল কাগজের মত চোখের সামনে পড়ে ছিল। সুরেশের মনে হল সে আজ বিশ্বপতির বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছে। আজ তার জীবনের পরীক্ষা হবে। আজ তার হৃদয়টা কত বড়, তার প্রাণটা কত মহৎ, তার জীবনটা কতখানি কাজের—সমস্ত জগতের সামনে তারই পরীক্ষা হবে। শত শত তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে, সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হোয়ে আছে, বাতাসটি পর্য্যন্ত স্থির হোয়ে আছে। এতবড় পরীক্ষা সুরেশ কখন দেয়নি, পরীক্ষা দিয়ে এত আনন্দ সুরেশ কখন পায়নি! তার চক্ষু স্থির হয়ে এল, তার মুখে মহিমার শ্রী ফুটে উঠল, তার বুক শান্ত হয়ে এল। সে তার সমস্ত হৃদয়টা আকাশের গায়ে মেলে দিলে, আকাশ আরো কোমল নির্ম্মল স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সে তার সমস্ত জীবনটা তারার উপর ঢেলে দিলে, তারাগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে তার সমস্ত প্রাণটা নিঃশেষ কোরে দিয়ে লিখে চল্লো।

রাত দুটোর সময় ডাক্তার বল্লেন, এবার নীচে নামাও। আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল।

তার পর দিন সকালে টেলিগ্রাম এল—সুরেশ পাস হয়েছে।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুমুসলমানের একতা

হিন্দুমুসলমানের একতা কথা লইয়া রীতিমত আন্দোলন বাধিয়াছে। কথাটি যখন উঠিয়াছে, তখন তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহাতে কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহাতে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

প্রথমে দেখা যাউক, হিন্দু মুসলমানের এই মিলন বাঞ্ছনীয় কি না? কারণ অনেকে আবার এই মিলন আদৌ পছন্দ করেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—

ভারতে এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ ও অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাদর না করেন, যেখানে হিন্দুদিগের পর্ব্বোৎসবে মুসলমানগণ আমোদ প্রমোদ না করেন, যেখানে আপনাদের বিবাহকার্য্যে প্রতিবাসী হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ না করেন। (স্বর্গীয় ভূদেব বাবু)

ভারতে এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে স্নেহ না করেন, মুসলমানের মসজিদদরগাদি সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখেন, যেখানকার হিন্দুমুসলমান পরস্পর পরস্পরকে দৈনন্দিন সংসারিক কার্য্যে সহায়তা না করেন। তবে কেমন করিয়া বলি ভারতে হিন্দু মুসলমানের একতা বাঞ্ছনীয় নহে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সার সৈয়দ আহম্মদ হিন্দু নামক

পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

হিন্দু মুসলমান! একাত্মা হইতে চেষ্টা কর। কারণ একত্রিত হইলে, পরস্পর পরস্পরকে বিপদ আপদে সাহায্য করিতে পারিবে। আর যদি একত্রিত না হও, তাহা হইলে তোমাদের বিরোধ উভয়কে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে। হে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি একই দেশে বাস কর না? তোমরা কি একই দেশে জন্ম গ্রহণ কর নাই? তোমরা কি একই মাতা ধরিত্রী হইতে আহার্য্য দ্রব্য পাওনা? জানিও "হিন্দু," "মুসলমান" শব্দদ্বয় কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই, নতুবা সকল ভারতবাসী এক ও একই "নেশন।" এইহেতু 'নেশন' শব্দ দ্বারা আমি হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য ভারতবাসীকে নির্দ্দিষ্ট করি। আমি এই শব্দ দ্বারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বুঝি না, কেবল বুঝি যে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, একই রাজার প্রজা—একই সুখ দুঃখের ভাগী। আমাদের সকলেরই দেশের উন্নতির জন্য একত্রিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এবং এইজন্য আমি সকল ভারতবাসীকে এক "হিন্দু" নামে অভিহিত করি।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন হিন্দুগণের সহিত একতা হইতেই পারে না,—যেহেতু তাহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা মুসলমানের গো কোরবাণিতে বাধা দিয়া থাকে, তাহারা নাটকে, নভেলে, কাব্যে, উপন্যাসে মুসলমানদিগকে অকথ্য ভাষায় নিন্দাবাদ ও মুসলমান নরনারীর চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করে।

এখন দেখা যাউক, এগুলি কতদূর সত্য,—এবং সত্য হইলেও বাস্তবিকই মিলনের অন্তরায় কি না?

হিন্দুগণ বিধর্ম্মী অতএব তাহাদের সহিত একতা হইতে পারে না—এ কথার কোন সার্থকতা দেখি না। কারণ, একতা ধর্ম্ম লইয়া নহে; একতা স্বার্থ লইয়া। আমার স্বার্থ দেশের উন্নতি সাধন করা, তোমারও স্বার্থ দেশের উন্নতি সাধন করা। আমার স্বার্থ দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষাদি নিবারণ করা, তোমারও স্বার্থ দেশের দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা। এইভাবেই একতার সূত্রপাত হয়। আর মানুষের বৈষয়িক স্বার্থ এক হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিও একতা সূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। আবার বৈষয়িক স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে সহোদরে সহোদরেও ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হয়।

ইহাই যখন একতার সারতত্ত্ব তখন হিন্দু মুসলমানের একতা হইবে না কেন?

আর হিন্দু মুসলমানের একতা অর্থে ইহা নয় যে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করুক কিংবা মুসলমান হিন্দু হইয়া গিয়া এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করুক।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বেষ হিংসা মারে কে?

স্বীকার করি, হিন্দু মুসলমানের হৃদয় দ্বেষ হিংসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবী ত আর স্বর্গ নয় যে এখানে দ্বেষ হিংসা বিবাদ কলহ একেবারে থাকিবে না। যখন পৃথিবী—'পৃথিবী' তখন অবশ্যই এখানে দ্বেষ হিংসা বিবাদকলহ কিয়ৎপরিমাণে থাকিবেই। দ্বেষ হিংসা কাহার মধ্যেই বা নাই? বিপক্ষবাদীগণ হয়ত বলিবেন, কই

খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি জাতির মধ্যে দ্বেষ হিংসা ত আদৌ নাই। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা খৃষ্টান মুসলমানগণের ইতিবৃত্ত—সম্যক জ্ঞাত নহেন।

খৃষ্টানগণের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যাণ্টের অত্যাচার বিভীষিকাময় বিরোধকাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ।

মুসলমানগণের মধ্যেও দুইটী দল আছে সিয়া ও সুন্নী। সিয়া-সুন্নীর মধ্যে দ্বেষ হিংসা যেরূপ পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, বোধ হয় জগতের আর কোন জাতির মধ্যে সেরূপ নাই। সে গুলির বিবরণ শুনিলে পাঠক হয়ত চমকিত হইয়া উঠিবেন।

ইহাদের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব এত প্রবল যে কোন সিয়া একটী সুন্নীকে প্রাণে মারিতে পারিলে পরম সন্তোষ লাভ করেন। সিয়াগণ ধর্ম্মপ্রাণ সুন্নীর পবিত্র মসজিদকে অপবিত্র করিতে পারিলে বড়ই পুণ্যের কার্য্য মনে করেন। হজরত আচুবাকার, হজরত ওমার, হজরত তাওমান, হজরত আলী এই চারি জন খলিফাকে সুন্নীগণ অতীব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। কিন্তু সিয়াগণ এই শেষোক্ত খলিফা ব্যতীত অন্য তিনজনকে এতদূর ঘৃণা করেন যে তাহারা সুন্নিগণের প্রাণে ব্যথা দিবার জন্য, আপনাদের বিনামায় ঐ তিন জন মহাত্মার নাম লিখিয়া রাখে ও সুন্নিগণকে দেখাইয়া বলে এই দেখ তোমাদের আচুবাকার, ওমার, তাওমান আমাদের পায়ের নীচে। সুন্নিগণের প্রতি সিয়াগণের কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণা তাহা সবিস্তারে বলিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে।

আবার সুন্নিগণ যে নিতান্ত নিরীহ ভাবে সহ্য করেন তাহাও নহে। তাঁহারাও এ ক্ষেত্রে সিয়াগণ হইতে কোন অংশে কম নহেন। সিয়ার মহরম উৎসবে সুন্নিগণ বাধা প্রদান করিয়া থাকে ও সুবিধা পাইলে অকারণে সিয়াগণকে নির্য্যাতিত করে। সুন্নিগণও ঘৃণাবশত সিয়াগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করে না। তাহাদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিবাদের বিবরণী দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

স্বাভাবিক দ্বেষ হিংসাদি যে একতার অন্তরায় নয়, প্রাগুক্ত বিষয়গুলি হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুসলমানগণের দ্বিতীয় আপত্তি, গো কোর-বাণীতে হিন্দুরা বাধা প্রদান করিয়া থাকে। হিন্দুর পক্ষে এই কার্য্য নিতান্ত স্বাভাবিক; এবং ইহাকে একতার অন্তরায় বলা যাইতে পারে না। কারণ, হিন্দুগণ গাভীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দুর পক্ষে গাভী সংরক্ষণের প্রয়াস সর্ব্ব-প্রকারে সমর্থন যোগ্য। এই একই কারণে পারাবত বধে মুসলমানের ঘোর আপত্তি। কেননা পারাবত মুসলমানের চক্ষে শ্রদ্ধার সামগ্রী।

তৃতীয় আপত্তি, হিন্দুগণ নাটকে, নভেলে, মুসলমান নরনারীকে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন।

স্বীকার করি অনেক হিন্দু মুসলমান-দিগকে অযথা গালাগালি দিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যরথীগণ প্রধান। বাস্তবিকই বঙ্কিমবাবুর এরূপ কার্য্য নিতান্তই

ক্ষোভের উদ্রেক করে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে একতার অন্তরায় বলা যাইতে পারে না।

দ্বেষহিংসাদি যখন একতার অন্তরায় নয়, তখন এক মায়ের দুইটি সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্য স্থাপন না হইবে কেন? আমার এক বিজ্ঞ বন্ধু বলেন—"হিন্দু মুসলমানে অসদ্ভাব কিসে? এবং কোথায়? যাহারা খাঁটি হিন্দু, তাহারা দোকানপাট চালায়, চাষবাস করে, করিম দাদা, রহীম মামা প্রভৃতি মুসলমান প্রজাদের সহিত বাড়ীর উঠানে কথাবার্ত্তা কহে, চাষ আবাদের বন্দোবস্ত করে, আর কথা শেষ হইয়া গেলেই যে যাহার ঘরে গিয়া উঠে। আবার মুসলমান-কৃষা দাদাঠাকুরের ছেলে মেয়ের জন্য তালটা-বেলটা আনিয়া দেয়, গরু বাছুর গোয়ালে তোলে, বাড়ী যাইবার সময়ে মাঠাকরুণ বা দিদিঠাকরুণের নিকট হইতে তেল, লবণ, লঙ্কা শাকশব্জী চাহিয়া লইয়া যায়। ইহাতে অসদ্ভাবের লক্ষণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যাহারা খাঁটি হিন্দু, খাটি মুসলমান তাহাদের মধ্যে কোন স্থায়ী বিরোধের সম্ভাবনাই নাই। ইহার হেতু এই যে, খাঁটি হিন্দু নিজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে জানে, নিজের অধিকার বুঝিয়া কথা কহিতে জানে, আর খাঁটি মুসলমানও কখনও নিজের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হয় না। যত গোল বাধিয়াছে বাবুর দলের মধ্যে;—বাবু-হিন্দু এবং বাবু-মুসলমান কোনোমতেই সদ্ভাবে থাকিতে পারে না, যেহেতু উভয়েই গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়াছে। উভয়েই যেন এক স্বামীর পত্নী, অতএব সপত্নীবিরোধ অনিবার্য্য; প্রণয়ে অক্ষমতা মারাত্মক বিরোধের মূল। ফলে, এ বিরোধ সহজে লয় হইবার নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই,—মিলনের বাধা কোথা হইতে আসিল? যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা এখন জন্মিতেছে কেন? ইহা কেবল বাহিরের লোকের প্ররোচনায়। একজন বাড়ীর চাকর তাহার মনিবের সদয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট আছে। এখন একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেই চাকরকে যদি ক্রমাগত বলে ঐ দেখ, তোমার প্রভু তোমাকে ভাল করিয়া খাইতে দিল না। তবে সে হয়ত ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে কথাটা হইতেছে তাহাই।

মুসলমানের পক্ষে ভারতভূমিকে মাতৃভূমি স্বরূপ জ্ঞান না করা মিলনের অন্যতম অন্তরায়। অর্থাৎ মুসলমান যদি এই স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তথাকথিত মিলনের অন্তরায় অচিরেই দূর হয়। মিলনের পক্ষে ইহাই সুপ্রশস্ত বিধান। কথাটা আরো পরিষ্কার করিয়া বলি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের একতা স্বার্থ লইয়া অর্থাৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য; কেবল এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিবার জন্য নহে।

কিন্তু সাধারণ মুসলমান এই জাতীয় স্বার্থ দেশের শ্রীবৃদ্ধি কথাটার মর্ম্ম আদৌ বুঝেন না। তাই তাঁহারা তার স্বরে বলিয়া উঠেন "একতায় কি হইবে? দেশের উন্নতি আবার কি? আমাদের আবার দেশ কি? আরব ত আমাদের দেশ—ইত্যাদি।" কোন ভূতপূর্ব্ব কালে আরব জাতি ভারতে আসিয়া মুসলমান

ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া এইরূপ মনে করা যেমন হাস্যকর তেমনি অসার-অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুসন্তান; অতএব ধর্ম্ম ভিন্ন আসলে আমাদের ভেদ কিছুই নাই।—আমরা উভয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই ভারতসন্তান, এবং উভয়ে মিলিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হইলে অনতি-বিলম্বে যে আমাদের প্রণষ্ট গৌরব আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে সর্ব্বজন মাননীয় ভক্তিভাজন নবাব আবদুল জব্বার সি, আই, ই, সাহেবের কথায় এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি। গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার কোন এক সভায় এইরূপ বলিয়াছিলেন—

আমি আশা করি হিন্দুমুসলমান ভ্রাতার ন্যায় কার্য্য করিবে ও রাজনৈতিক অনুশীলনে পরস্পরকে সাহায্য করিবে। প্রতি দ্বন্দ্বিতায় ক্ষতি নাই, কিন্তু দ্বেষ হিংসা ঘৃণার্হ ও ক্ষতিকর। উভয় জাতির সম্বন্ধ সর্ব্বদা সাম্যভাব সূচক হইবে। যেখানে শান্তি নাই, সেখানে উন্নতিও নাই। প্রজাপুঞ্জের সুখ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। যে দেশের লোক অহরহ কলহে মগ্ন সে দেশে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের সম্যক বিকাশ অসম্ভব। যেখানে ভূমিবিষয়ক বিবাদ বিদ্যমান সেখানে শস্য কদাচিৎ জন্মায়। সার্ব্বজনীন শান্তি ব্যতীত শিল্পকলারও বিস্তার হয় না। এমন কি মনে শান্তি না থাকিলে দেবারাধনাও সম্ভব নহে। যাঁহারা দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস পান তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী। আর যাঁহারা ঐ বন্ধুত্বকে ভঙ্গ করিতে উদ্যত, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। আমরা হিন্দু-মুসলমান একই দেশের অধিবাসী ও একই রাজার প্রজা,—বিবাদে আমরা কিছুই লাভ করি না; তাহাতে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হই। এ দেশের কুলতিলক স্বনামধন্য মহানুভব মুর্শিদাবাদ নওয়াব বাহাদুরের ন্যায় যাঁহারা আমাদিগকে সখ্যভাবে থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত হিতৈষী। মতের বিভিন্নতা সময়ে সময়ে হইতে পারে, কিন্তু তাহা যেন আমাদিগকে মন্দ অভিপ্রায় বা ঈর্ষার পথে না লইয়া যায়। শান্তিই আমাদের এখন একমাত্র আদর্শ হউক!

শ্রীমৈনুদ্দীন হোসেন।

বক্তব্য।

যে হিন্দুমুসলমান এতকাল পাশাপাশি আত্মীয়ের মত সদ্ভাবে বাস করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে অকারণে একটা অপ্রীতির লক্ষণ আসিয়া দেখা দিয়াছে। সমাজের এরূপ সঙ্কট সময়ে উভয় পক্ষেরই উদারতা ও সহানু-ভূতির একান্ত আবশ্যক। প্রবন্ধকার মহাশয় এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন সম্বন্ধে যেরূপ অপক্ষপাত উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাহার ন্যায় মিলনব্রতী হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা দেশে অধিক থাকিলে, আমাদের মধ্যে এ মনোমালিন্যের সম্ভাবনাই ঘটিত না। কিন্তু

এই প্রবন্ধে একটা কথা বলিয়া দেওয়া আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। বোধ হয় অনেক শিক্ষিত মুসলমানেরই ধারণা যে হিন্দু লেখকেরা মুসলমান জাতিকে অন্যায় আক্রমণ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহাদের কখনই উদ্দেশ্য নয়। মুসলমানেরা এ দেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা কালে যে সকল আনুষঙ্গিক অত্যাচার হইয়াছিল, এ নিন্দার তাহাই প্রধান লক্ষ্যস্থল। বঙ্কিমবাবু ব্যক্তিগতভাবে স্থানে স্থানে মুসলমানের চিত্র হীন বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ওসমান, আয়েষা, মবারক, মীরকাসিম প্রভৃতি সুন্দর চরিত্রেরও গুণগানে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আর এক কথা, আধুনিক মুসলমানেরা অধিকাংশই হিন্দু সন্তান এবং বিজেতৃবংশের যাঁহারা এখনও বিদ্যমান আছেন তাঁহারাও বহুকাল ধরিয়া আত্মীয়েরই ন্যায় আমাদেরই প্রতিবেশী হইয়া বাস করিতেছেন। এরূপ স্থলে তাঁহাদিগকে অকারণ আক্রমণ করা কোন হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব নহে। আসল কথা ভাল মন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে। মন্দ লোকের নিন্দা করিলেই ভাল লোকের চরিত্রকে খর্ব্ব করা হয় না, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াই উঠে। আশা করি ব্যক্তি বিশেষের নিন্দা দেখিলে শিক্ষিত সহৃদয় মুসলমানেরা তাহা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের উপর আরোপ করিয়া লইবেন না।

প্রাতঃসূর্য্য

অতি সুন্দর গতি মন্থর
ভরি অম্বর রাজে।
দীপ্ত মহিমা স্বর্ণ প্রতিমা
শূন্য নীলিমা মাঝে।
শুভ্র আলোক দিব্য গোলক
ধৌত দ্যুলোক ধায়,
চরণ প্রান্তে আজি একান্তে
ভূলোক বন্দে তায়।
নিত্য ধারায় চিত্ত হারায়
মৃত্যু করায় ত্রাণ,
নশ্বর যত বিশ্বের শত
বন্ধন ক্ষত প্রাণ।

উজ্জ্বল শিখা মঙ্গল লিখা
নিম্মল রেখাপাত,
শ্যাম বরণী সুপ্ত ধরণী
জাগ্রত তার সাথ।
বিশ্ব কেন্দ্র বিরাট তন্ত্র
মিলন মন্ত্র গাহে,
অসীম বক্র কালের চক্র
গ্রথিত একত্র তাহে।
চেতন বিন্দু জীবন ইন্দু
ভুবন সিন্ধু মাঝ—
জগত লক্ষ্যে উদিত চক্ষে
বক্ষে হৃদয়রাজ।

শ্রীহেমলতা দেবী।

শ্রীপঞ্চমী।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

১

মঙ্গল পঞ্চমী আজি ভারতী
গাও পুণ্য সুমিলন গান ;
সুভাব সঙ্গীত বন্যা সারিতে
ঘুচাও,—ঘুচাও এ ভাবতে—
দ্বেষ বিদ্বেষ, হীন স্বার্থ অভিমান।

২

আর্ত্ত শোণিত পাতে, দাপ কবোটি ভাতে!
হের গো—ভারতী!
একি তোমারি অর্চ্চনা—আরতি!
পুণ্য পূজা—অপমান!

দীন অভাজনে, করুণা বিতবণে
দেহ চেতনা—
নিবাব পাপ, কর সুধা বর দান।

৩

প্রসাদ উথলিত, নীরব নিনাদিত
বীণাতানে
দোব, প্রীতি পূবিত কর পৃথ্বী বিমান!
বাক্যে কর্ম্মে ভাবে, ধর্ম্মে যজ্ঞ-যাগে—
প্রাণে প্রাণে গো—
বহাও মিলন রাগ—উদার জ্ঞান।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি।

॥ র্সা -া র্সা ণা। ণা -ধা ধা পা। পধা মা গমা গা। মা -া -া -া I
ম ০ ঙ্গ ল প ০ ঞ্চ মী আ জি ভা র তী ০ ০ ০

I -া -া মা -গা। মা -ণা ধা ণা। ধণা -পা ধা ণা। র্সা -ধা ধণা র্সা II
০ ০ গা ও পু ০ ণ্য সু মি ০ ল ন গা ০ ০ ন্

॥ { মা মা -গা মা। পা -মা পা পা। পা -ণা ধা -ণা। র্সা না র্সা -া I
সু ভা ০ ব স ০ ঙ্গী ত ব ০ ন্যা ০ স রি তে

। র্সা -না র্রর্সা -া। া -া ণা- ধা। (র্সণা -া -া পা। ধা -া -া -পা) I}
ঘু ০ চা ০ ০ ০ ও ০ ঘু ০ ০ ০ চাও ০ ০ ০

। ধণা -র্সা -পধা -ণা। ধণা র্সা -ণধা -পমা I মা মা- গা মা।
ভা ০ র ০ তে ০ ০ ০ সু ভা ০ ব

। পা মা পা পা। পা -ণা ধা ণা। র্সা না র্সা -া I নর্সা -র্রা র্সা র্সা।
স ০ ঙ্গী ত ব ০ ন্যা ০ স রি তে ০ দ্বে ০ ষ বি

। র্সা -ণা ণা -ধা। ধা পা মা গা। মা পা ধা -ণা ॥
দ্বে ০ ষ ০ হী ন স্বা র্থ অ ভি মা ন॥

II {পা -ধা ধা ধা। ধা ধা ধা ধা। ধা -া ধা ধা। ধা ধা ধা ধা I
(১) আ ॰ র্ত্ত শো ণি ত পা তে দী ॰ প ক রো টি ভা তে
(২) প্র সা ॰ দ উ থ লি ত নী ॰ র ব নি না দি ত

I ধণা পা ণা -া। -া -া ণা ণা। ধা -ণা -র্সা -া। ণা -ধা -পা -মা I}
(১) হে র গো ॰ ॰ ॰ ভা র তী ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ এ কি
(২) বী ॰ ণা ॰ ॰ ॰ তা ॰ নে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -া র্সা ণা। ণা- ধা ধা পা। পা মা মা গা। গমা -রা গা -া I
(১) তো ॰ মা বি অ ॰ চ্চ না আ ॰ র তি পু ॰ ণ্য ॰
(২) দে ॰ বি ॰ প্রী ॰ তি পূ বি ত ক ব পু ॰ ণ্যী বি

I মা -া -া রা। গা -া -া রা। সা -া -া -া। -া -া I I I
(১) পূ ॰ ॰ জা অ ॰ ॰ প মা ॰ ॰ ॰ ॰ ন্
(২) মা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ন্

I {মা -া গা মা। পা -মা পা পা। পা ণা ধা -ণা। র্সা না র্সা র্সা I
(১) দী ॰ ন অ ভা ॰ জ নে ক রু ণা ॰ বি ত র ণে
(২) বা ॰ ক্যে ক ॰ স্মে ভা বে ধ ॰ র্স্মে য ॰ জ্ঞ যা গে

I র্সা না র্সা -া। -া -া ণা -ধা। (র্সণা -া -া -পা। -ধা -া -া -পা) I}
(১) দে হ চে ॰ ॰ ॰ ত ॰ না ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰
(২) প্রা ॰ ॰ ॰ ॰ ণে ॰ প্রা ॰ ॰ ণে গো ॰ ॰ ॰

I ধণা -র্সা -পধা -ণা। -ধণা -র্সা -ণধা -পমা I
(১) না ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰
(২) প্রা ॰ ণে ॰ গো ॰ ॰ ॰

I মা -া গা মা। পা -মা পা পা। পা ণা ধা -ণা। র্সা না র্সা র্সা I
(১) দী ॰ ন অ ভা ॰ জ নে ক রু ণা ॰ বি ত র ণে
(২) বা ॰ ক্যে ক ॰ স্মে ভা বে ধ ॰ স্মে য ॰ জ্ঞ যা গে

I নর্সা র্রা -া র্সা। র্সা -ণা ণা -ধা। ধা পা মা গা। মা পা ধা ণা II
(১) নি বা ॰ র পা ॰ প ॰ ক র সু ধা ব র দা ন্ II
(২) ব হা ॰ ও মি ॰ ল ন রা ॰ গ উ দা র জ্ঞা ন্ II

পোষ্যপুত্র।

৩৭

মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিতে ইচ্ছা করিলেও সমস্ত মানসিক শক্তি প্রাণপণ বলে সংগ্রহ করিয়া শান্তি সেই অদম্য প্রলোভনকে জয় করিয়া ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া পাথরের মতন শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর রাত্রি,—বাঁশবনের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে শৃগালের ডাক ভিন্ন আর কোন রকম সাড়াশব্দে কোন জীবিতপ্রাণীর অস্তিত্ব বুঝা যাইতেছিল না। মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে রৌপ্য কিরণবর্ষী চন্দ্র বিরাজমান। এই বৈচিত্র্যময়ী সুখোজ্জ্বলা ধরণী, এই পরিপূর্ণ আশাবিহ্বল রাগিণীর অনাদিগান, এ সমস্তই ব্যথিতপ্রাণা শান্তির নিকট যেন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া স্পন্দনহীন প্রায় চক্ষে সে একবার অতীতের পানে ফিরিয়া চাহিল। অতীত সুখের, অতীত সাধের জীবন! —সে কি আনন্দের কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! এতক্ষণ পরে শান্তির মস্তিষ্কের ভিতরে ফুটন্ততরঙ্গ একটুখানি স্থির হইয়া আসিল। শৈশবের সেই নিশ্চিন্ত সুখ কত মধুর! সেই তাহারা দুটি ছোট ভাই বোনে একসঙ্গে খেলা করিত। একসঙ্গে ঘুমাইত, একসঙ্গে দুটি ছোট প্রজাপতির মতই তাহাদের বাগানে ছুটিয়া বেড়াইত, ছোট পাখীদেরি মত আপনার মনে গান গাহিত, হাসিত, খেলা করিত। জগতে আর কাহারও সহিত কি শান্তির পরিচয় ছিল না? ছিল—ছিল সবই গিয়াছে! ক্ষুদ্র একখানিমাত্র হৃদয়—তাহার উপরে কত দিক হইতে কতখানি স্নেহ বর্ষিত হইত। কি অপূর্ব্ব সে সুখ কি অনাবিল সে শান্তি! শান্তির চোখ দিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে স্বপ্ন তাহার কেন ভাঙ্গিল, কোনো রকমেই কি আর সেই অতীত দিনে ফিরিয়া যাইতে পারেনা? হে ভগবান, শুধু একবার শুধু একটিবার? "এখনো আপনি জেগে আছেন বৌদি?" এই কথাটি শুনিয়াই সে চমকাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল,—যোগেশ। যোগেশের আবির্ভাবে সহসা সচেতন হইয়া শান্তি শিহরিয়া উঠিয়া দেখিল, স্বপ্নের পরিবর্ত্তে বাস্তব তাহার বিরাট অন্ধকার ও অপর্য্যাপ্ত বেদনা লইয়া স্তব্ধ রজনীর অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর তালে জাগিয়া রহিয়াছে, অসহায় সে ইহারই মাঝখানে একেবারে একা। যোগেশের দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শান্তির নিস্পন্দ প্রায় শরীরে শক্তি সঞ্চালন করিয়া দিয়া উত্তেজনায় তাহার মাথার ভিতরে দর্ দপ্ করিয়া উঠিল। বিস্ময়হীন কোমল কণ্ঠে যোগেশ কহিল "বৌদি তুমি কি চাও আমায় ভাল করে বুঝিয়ে দাও—ত। তুমি যা বলবে আমি তাই করতে রাজী আছি, শুধু তুমি বলো একবার,—নিজের মুখে হুকুম দাও—।"

শান্তির চোখের সম্মুখে কুহেলিকাময়

জগৎস্রোত তালে তালে ঘুরিয়া উঠিল; সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল "না না তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না, আমি কিছুই চাই না তোমার কাছে, শুধু তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।" বলিতে বলিতে সে পাগলের মত হেমেন্দ্রের ঘরের দ্বারের দিকে ছুটিয়া গেল। যোগেশ তাহার এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের কোন অর্থ না পাইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদয় ব্যাপারটা তাহার চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শান্তি ঘরে প্রবেশ করিবার পরই সে যেন একবার হেমেন্দ্রের উত্তেজিত কণ্ঠের সাড়া পাইয়াছিল;—ঠিক হইয়াছে,—তাহার মধ্যে যেন যোগেশেরও নাম ছিল না?—যোগেশ রোষে ক্ষোভে অধর দংশন করিল—"বটে, এইটুকু পর্য্যন্ত সহে নাই, বটে? আচ্ছা দেখা যাক্ এই যোগেশ নইলে তোমার কেমন দশা হয়; একবার তবে দেখ। অকৃতজ্ঞ! এত সন্দেহ! এত ভয়—তোমার!"

যোগেশ সহসা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, —"সেও কি কোন রকম সন্দেহ, অবিশ্বাস করেচে? তাই যেন মনে হয়,—ছি ছি! না আমি এমনিই কি দোষ করেছি? আমার উদ্দেশ্য কিছুই মন্দ ছিল না, শুধু দয়া! ওদের অনেক খেয়েছি অনেক পাবারও আশা রাখি তাই। তবে চাঁদকে দেখে চোখ বুজবে এমন মূর্খ কে আছে? ফুলটি দেখলে মন যে সুন্দর বলে তারিফ করবে, তাতে দোষই বা কি?"

খোলা জানালার মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ গৃহে প্রবেশ করায় খুব সকালেই হেমেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। জানালাটা বন্ধ করিতে বলিতে গিয়া হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনাটা মনে পড়িয়া গিয়া মনটা একটু খারাপ হইয়া গেল। শান্তি গেল কোথায়? এই অজানা জায়গা বিশেষ বাড়ীর গায়েই ওই একটা পুকুর আছে। নতুন করিয়া আর ঘুমান হইল না। উঠিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিল; দ্বারের পাশে মাটিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া শান্তি ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আকস্মিক দুর্ভাবনার আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া সে হাঁফ ছাড়িল।

সকাল হইয়াছিল। আজ উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত। উদার উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ-পক্ষের মত লঘু শুভ্র মেঘ প্রাতঃসূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিককার গাছপালা হইতে একটা পাখীর কাকলী, পাতার মর্ম্মর ও ফুলের গন্ধ একসঙ্গেই নির্ম্মল স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

হেমেন্দ্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু দাঁড়াইল।

সেই রাঙ্গামেঘের ছায়ায় শান্তির বিবর্ণ ললাটে, গণ্ডে কি স্নিগ্ধ রক্তিমাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আলুথালু কৃষ্ণচুলের রাশি খুলিয়া পড়িয়া পত্রান্তরালস্থিত ফুলটির মতন আধখানা মুখকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; মুখখানির উপর হইতে সর্ব্বসন্তাপহরা নিদ্রাদেবী তাহার সকল বেদনা সকল ক্লান্তি নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া লইয়া তাহাকে প্রশান্ত বিশ্রাম দান করিয়াছিলেন, তথাপি সেই নিদ্রা নিমীলিত চোখের কোলে অশ্রুজলের একটি

বিন্দু সকালবেলাকার শিশির কণাটিরই মত টলটল করিতেছিল। প্রাতঃ সূর্য্যেরই মতন সেই গৌরবোজ্জ্বল মুখ একবার হেমেন্দ্রের অন্ধকার চিত্তের মধ্যে তাহার কিরণ রশ্মি ছড়াইয়া দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমের আলো জ্বালিয়া তুলিল। হেম শান্তির মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে তাহার মুখের উপর হইতে চুলের গোছাটা সরাইয়া দিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত অনুতাপ ও আত্মগ্লানি পূর্ণচিত্তে তাহার অধরে চুম্বন করিল।

"শান্তি আমায় মাপ করো শান্তি, কাল-মাথাটা ঠিক ছিলনা তোমায় অন্যায় বকেচি ভুলে যাও।" জাগিয়া প্রথমটা শান্তি বুঝিতে পারে নাই সত্যই হেম তাহাকে আদর করিতেছে। ভাবিতেছিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

হেম আবার মুখের উপর নত হইয়া ডাকিল "শান্তি, রাগ করোনা কথাটা বড় শক্ত বলে ফেলিচি—"

শান্তি আশ্চর্য্যে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, সত্য! হেমেন্দ্রের এই সম্ভাষণ! অকস্মাৎ তাহার বেদনা বিদ্ধ বক্ষ আলোড়িত করিয়াও বহুদিনের আঘাত ও অভিমানের ব্যথা একসঙ্গে জাগিয়া উঠিল,—সে স্বামীর কোলে মুখ লুকাইয়া সহসা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজিকার অম্লান প্রভাত তাহার নবীন সূর্য্যকরে না জানি কি সম্মোহন শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আকাশে বাতাসে নাজানি আজ কি করুণার কি প্রেমের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, হেমেন্দ্র শান্তির অশ্রু সিক্ত কপোলে চুম্বন করিয়া আদর করিয়া বলিল,—"আমি তোমায় লক্ষ্মীপুরেই পাঠিয়ে দেবো, শান্তি কেঁদোনা তুমি।" হরিদীনবন্ধু! একি সম্ভব! সত্যই কি শান্তির দুঃখ তোমায় স্পর্শ করিয়াছে প্রভু! শান্তি চোখের জল মুছিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "আজই তবে যাবে কি?—" হেম তাহার চুলের উপর হাত রাখিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ছিল। প্রশ্নটায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল, কথাটা সে শুধু সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু—কিন্তু তাছাড়া উপায়ই বা কি? এমন করিয়া কদিন চলিবে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "না—কাল তোমায় পাঠিয়ে দোব,—আজ আর থাক।" শান্তির ম্লান চোখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া দুই হাতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া সাগ্রহে কহিয়া উঠিল" সেখানে আমরা খুব সুখেই থাকবো,—" হেমেন্দ্র বাধা দিল "তুমি সুখেই থেকো, আমিতো যাবোনা—" শান্তির বাহুপাশ মুহূর্ত্তে স্বামীর কণ্ঠচ্যুত হইয়া পড়িল; বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র উঠিয়া গম্ভীর হইয়া কহিল "আমি সেখানে যাবো না, আর নাই বা গেলুম আমার জন্যে কার কি ক্ষতি? কে আমায় চায়? তুমি যাও,—সুখে থেকো আমার যা খুসী তাই করবো। আমার প্রতি তোমার তো মায়া নেই আমার বেঁচে না থাকাই ভাল।" হেমেন্দ্রের শেষ কথাগুলা জড়াইয়া আসিতেছিল। শান্তি দেখিল, তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সে বেদনাপূর্ণ লজ্জায় স্বামীর হাত

ধরিল "তোমার পায়ে পড়ি ওসব কথা বলোনা, তোমার উপর কার স্নেহ কম? কেন ওরকম মনে করো? ফিরে যাই চলো, আমি সব ছেড়ে তোমার সেবা করবো।" হেমেন্দ্রের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শান্তির হৃদয়ের সমস্তটাই তাহার;—সেই উৎসর্গিত প্রাণের সভক্তি পূজার সযত্ন সেবা—আর কিছু না হোক অন্ততঃ সেইটেও তো সে পাইবে, সেই কি কম? কই আজিকার মত আনন্দ তো ইহার পূর্ব্বে শত ভোগবিলাসের মধ্য হইতেও সে লাভ করে নাই? কি সুন্দর, কি কোমল কি উচ্চ তাহার এই স্ত্রী! আর সে অন্ধের মত এত দিন তাহাকে চাহিয়া দেখে নাই! ব্যগ্র করে সে শান্তিকে বুকে টানিয়া লইতে গেল, আবেগ তাড়িতকণ্ঠে বলিতে গেল "তোমার শক্তি তুমি আমায় দিও শান্তি তোমার জন্য আমি সব সহ্য করবো—" কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দে শান্তি চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল, যোগেশ বারান্দায় পড়িয়া হঠাৎ ফিরিতেছিল কিন্তু দেখিল তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া ঘোমটা টানিয়া শান্তি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, হেম ডাকিল, "যোগেশ!"

হেমেন্দ্রের জন্য চা তৈরি করিয়া নতুন রাঁধুনিকে রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া যোগেশ হেমেন্দ্রের ঘরে আসিয়া দেখিল শান্তি ও হেম নিবিষ্ট মনে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুজনের মুখেই একটা উৎসাহের দীপ্তি; শান্তির অধরপ্রান্তে একটুখানি লজ্জাবিজড়িত সুখের হাসি, হেমেন্দ্রের মুখে তাহার স্বাভাবিক রুক্ষ অপ্রসন্নতার পরিবর্ত্তে একটা কোমল ভাব পরিব্যক্ত!

যোগেশ ভাবিল "একেই বলে দম্পতি কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"। ডাকিল হেম। শান্তি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র প্রসন্ন চিত্তে ডাকিল,—"এস না যোগেশ।"

আসন গ্রহণ করিয়া যোগেশ কহিল "আমার তো এখনি বাড়ি যেতে হবে ছোট বাবু, ছেলেটার ব্যায়রাম দেখে এসেছি।"—হেমেন্দ্র হাসিয়া উঠিল "এতক্ষণে ছেলের কথা মনে পড়লো? তা বেশতো যোগেশ, কালই একসঙ্গে সবাই যাবো এখন। আমরাও তো আবার লক্ষ্মীপুরেই ফিরছি—"

"বটে, আরতোমার যোগেশকে দরকার নাই তবে?" প্রকাশ্যে বলিল "হাঁ। তাইচলুন, মিথ্যে কেন কষ্ট পাবেন, তার চেয়ে বড়লোকের বাড়ি গোমস্তাগিরি করাও ভাল। বৌদিকে বলে দেবেন পিধুঠাকুরুণের হবিষ্যি বেড়ে যেন একটু ভাল করে ঘি ঢালেন তবু প্রসাদটা আশটাও মিলতে পারবে—"

মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমেন্দ্রের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, তাহার মাথার ভিতরে এককালে ঈর্ষার সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে সমস্ত আলোকের উপর একখানা কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া এক মুহূর্ত্তেই সব অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

সান্ত্বনার ও সহানুভূতির সহিত ধীরকণ্ঠে যোগেশ কহিতে লাগিল "আপনার শ্বশুর খুব চালাক লোক। কর্ত্তাকে তিনিই উইল করতে বারণ করেছেন। তাঁর মতলব বোধ হয় বুড় মরলে তোমায় অক্ষম প্রমাণ করে নিজেই না-বালকের অভিভাবক হয়ে বসবেন। তারপর বুঝেছ তো?"

হেমেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল,—এ কি

ব্যাপার! যোগেশ এ কি বলিতেছে! সত্য সত্যই তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর একটা ষড়যন্ত্রই চলিতেছে নাকি? হ্যাঁ সম্ভব বটে,—ঠিক তাই! সে কি মূর্খ, ছিঃ, ভাগ্যে যোগেশ ছিল! সে একটু নড়িয়া বসিল, সন্দিগ্ধভাবে বলিল "তাই কি হবে? আমায় না দেখতে পারলেও নিজের মেয়ে তো আছে?" "হ্যাঃ তুমিও যেমন! মেয়ে আছে আছেই! মেয়েরও ওপোর ভারী দরদ দেখতে গেলেনা? ওরা টাকা বোঝে নিজের স্বার্থ বোঝে। তোমার মতন তো ভালমানুষ নয়, নিজের সর্ব্বস্ব ওদের ধরে দিয়ে পথে দাঁড়ালে যেমন! তা যাহোক ছোট বাবু আমাকে তো আজ যেতেই হচ্চে, ঘরে তো একটা কড়িও নেই! ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে! আমরা ত আর বড় লোক বাপ নই,—ছেলে মেয়েই আমাদের প্রাণ!"

উত্তপ্ত জল একটুখানি তাপ পাইয়াই যেমন টগবগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠে হেমেন্দ্রের প্রতি শিরাস্থ শোণিত স্রোতও তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল। মূঢ়! এতটুকু বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই! কি মোহেই সে ডুবিতেছিল! যোগেশের হাত ধরিয়া বলিল, "যোগেশ তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা,—আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার বল বুদ্ধি ভরসা সব তুমিই। কি করে আমি আমার ন্যায় সঙ্গত অধিকার ফিরে পাব বলো। আদালতে কি প্রমাণ হবে ও মাগী বিন্দার বউ নয়?" যোগেশ মনের মধ্যে জয়ের হাসি হাসিয়া দম্ভ করিয়া বলিল "বলো কি তুমি! ওতো হয়ে রয়েইছে! ওর জন্যে আবার ভাবনা! বৃন্দাবনের বিশ-টে সাক্ষী হলপ নিয়ে বলবে যে ও বিনোদবাবুর বিয়ে করা স্ত্রী নয়। কুছ পরোয়া নেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে ভাবনা এই যে, তোমার মনের সৎসাহস আবার না কোন সময় বৌদির চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। তাঁর হুকুম তামিল তো হওয়া চাই তা—" নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া হেমেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল "রেখে দাও তোমার বৌদিদি! আমায় কি এমনই ভীরু পেয়েছ? তবে আমার এখন কি করতে হবে বলো দেখি?" "তোমায় আর কি করতে হবে বল, তবে আগে বরং একখানা উকিলের চিঠি বুড়কে পাঠান যাক্। কি বলো? যদি ভালয় ভালয় দেয় তা মন্দ কি? নৈলে তখন—হাতেই তো উপায় রয়েছে।" হেমেন্দ্র একটু চিন্তিত ভাবে আপনা আপনি বলিল "উকিলের চিঠি—কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়, হাজার হোক জ্যেঠা হন, এতদিন কাছে ছিলাম।" "ঐ তো গোড়াতেই বলেছি, ওসব আপনার কর্ম্ম নয়। লক্ষ্মীপুরেই বরং ফিরে যান। তবে মাপ কর্ব্বেন তাঁরা কি আপনাকে মায়া করেছিলেন? আপনার শ্বশুর যে শেয়াল কুকুরের মতন করে সেই রাত্রে"—"যোগেশ থামো—তুমি যা বলবে আমি করতে রাজি আছি। ভদ্রতা, চক্ষুলজ্জা-সব ধুয়ে গ্যাছে, ভাই ভাগ্যে তুমি ছিলে।"

ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া দুই বন্ধুতে মিলিয়া পরামর্শ চলিল। এবং বলা বাহুল্য ইহার ফলে যোগেশের বাড়ী যাওয়া ও শান্তির লক্ষ্মীপুরে যাওয়া উভয় যাত্রাই বন্ধ হইয়া গেল।

৩৮

লক্ষ্মীপুরের বাটীতে আবার নিরানন্দ ও হতাশা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামাকান্ত

পীড়িত। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন ও কবিরাজের বড়িপাঁচন ব্যবস্থার ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও সে রোগের কিছুমাত্র উপশম হইতেছিল না। যে রোগ শরীরের অপেক্ষা মনেরই বেশি, ঔষধে তাহার কি করিতে পারিবে?

শিবানী তাঁহার যথাশক্তি সেবার ত্রুটি করিত না। কিন্তু শ্যামাকান্তের তথাপি সকল সময় মনে হইত শান্তি হইলে ইহার স্থলে এই করিত, এটা না বলিয়া হয়ত অন্য কিছু বলিত। প্রতিনিদ্রাহীন রজনীতে স্তিমিতালোক কক্ষে দ্বারের দিকে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতেন, মনে হইত যেন এখনি ঐ দ্বারপথে নিঃশব্দে সে প্রবেশ করিয়া সাবধান গতিতে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে। বুঝি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হাতের চুড়ি গুলির শব্দ বাঁচাইয়া সশঙ্ক ব্যাকুলতায় সে মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। কি সে করুণা-মাখা কোমল দৃষ্টি! স্নেহ কাতরা জননী রুগ্ন সন্তানের মুখে যে দৃষ্টি প্রেরণ করেন তাহাতে কত মাধুর্য্য কত মহিমা!

কতদিন মরিচীকাবৎ আশার প্রতারণায় প্রতারিত বৃদ্ধ সোৎকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছেন 'মা এলি গো!" অমনি স্বপ্নের মোহ টুটিয়া অনন্ত বাস্তব উচ্চ উপহাসে হাহা করিয়া উঠিয়া উত্তর করিয়াছে 'না।"

কোথা গেলে তুমি স্নেহময়ী জননি! তুমি কেন গেলে! শুধু তোমারি জন্য তোমারি অভাবে শুধু এতো কষ্ট এত হতাশা। আর না হয় তুমিই এসো হে বরেণ্য মৃত্যু! তুমিই এই বহনক্ষম শরীরকে তাপক্লিষ্ট জীবনকে মুক্তি দান করো। হে বন্ধু! হে সুহৃৎ! তাই তুমিই এসো।

অমূল্য নূতন ঠেলাগাড়িতে বেড়াইয়া আসিয়া চাকরের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া আসিয়া নালিশ করিল "দাদামশাই আমায় কেস্‌ত নান্তায় নাম্‌তে দেয়নি, ও বড় দুষ্টু হয়েচে। শ্যামাকান্ত সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া শিশুকে ব্যগ্রভাবে কাছে টানিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন; দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িয়া হৃদয়ের পাষাণ ভার সামান্য মাত্র লঘু করিয়া দিতে সক্ষম হইল। এই টুকুই যে তাঁহার সান্ত্বনার অবশেষ! কিন্তু অভাগ্যের ধন অন্ধের নড়িটুকুর উপর দৃষ্টি ফেলিতেও যে সাহস হয় না, নিরালম্বের অবলম্বন যদি তাঁহার দৃষ্টিতে শুখাইয়া যায়!

এই ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করা শিবানীর পক্ষেও একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। আজকাল যদিও শ্বশুরের সেবা ও তাঁহার চিন্তায় তাহার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে অনেকখানি অবলম্বন দিয়া তাহাকে সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে, তথাপি তাহার নিকট সকলি অন্ধকার।

সময় পাইলেই সে বালক বিনোদের পড়িবার ঘরের চাবি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিত। চারিদিকে পুস্তকভরা আলমারি, দেওয়ালে বঙ্গের খ্যাতনামা মনীষীগণের চিত্র; ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে লিখিবার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে বিনোদকুমারের হাতের লেখা ও তাহার টুকিটাকি দ্রব্য সকল সাজান। শিবানী সন্তর্পণে একবার ড্রয়ার খুলিয়া জিনিষ পত্রগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া আবার পূর্ব্বের

মতন করিয়া যথাস্থানেই সাজাইয়া রাখিত। আঁচল দিয়া টেবিলটি মুছিয়া কেদারাখানি ঝাড়িয়া সেই আঁচলখানি মাথায় ঠেকাইয়া তারপর অপরিতৃপ্ত চিত্তে আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিত। কই সেখানে তো তাহার জন্য কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্রয়ই নাই! সে যে বিনোদকে জানিত—যে তাহার স্বামী—তাহার স্মৃতি—তাহার যোগ ত ইহাদের মধ্যে সে দেখিতে পায় না! হাতের লেখাগুলি এমন সুন্দর এমন রচনাসরল! মূর্খ শিবানী তো তাঁহার হস্তাক্ষর পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই তাই তাহার নিকটে তাহাদেরও শক্তি যেন মন্ত্রনিরুদ্ধবীর্য্য! এখানে আসিয়া শিবানী তাহার শ্বাশুড়ির পরিত্যক্ত গৃহে স্থান পাইয়াছিল। সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারের উপরে একখানা বিচিত্র ফ্রেমে বাঁধান বিনোদের চিত্র। কিশোর বিনোদ, অজাত গুম্ফ, কুঞ্চিত কেশ উৎসাহ চঞ্চল দৃষ্টি, মাতা ভুবনমোহিনীর কোল ঘেঁসিয়া তাঁহারই বাহুর উপর ঈষৎ হেলিয়া রহিয়াছে। শিবানী প্রভাতে সর্ব্ব দেবতার পূর্ব্বে ইঁহাকেই প্রণাম করিত।

প্রথম ভাগ্য পরিবর্ত্তনের বিস্ময় ও শান্তির ভালবাসার আবর্ত্তে পড়িয়া কিছুদিন যেন সে একটু শান্তি পাইয়াছিল। কিন্তু শান্তির গমনে তাহার অন্তরে পূর্ব্বের মতন হাহাকারই পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে এখনও চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, আর যে কখনও পারিবেন সে আশাও অধিক ছিল না। সেই সব ভাবিয়া চিন্তাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে বেইমানি মেয়েকে কোন কথাই আর বলিবেন না। তবে নেহাৎ মায়ের প্রাণ কিনা সেইজন্যই যা মধ্যে মধ্যে এক-আধ দিন নেহাৎ অসৈরণ হইলে তাহারি ভালর জন্য দুকথা না বলিলেও, চলে না। পোড়া মেয়ের 'বরাত' যে এখনও মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে, শ্বশুরকে দিয়া ইহার একটা প্রতিকার করান যে তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য এই সামান্য কথাটি 'আবাগীর বেটি'কে না বোঝাইয়াই বা থাকেন কেমন করিয়া? কিন্তু একগুঁয়ে মেয়ে এখনও সেই পূর্ব্বের মতনই নিজের গোঁয়ে হয় চুপ করিয়া শুনিয়া যায়, না হয় কাঠের মতন শক্ত হইয়া শুধু বলে "আমি বলব না"। এদিকে সিদ্ধেশ্বরী শুনিয়াছেন কর্ত্তা নাকি উইল করিতেছেন তাহাতে হেম ও হেমের বউ তাঁহার অর্দ্ধেক বিষয় পাইবে। এমন সময় শিবানী যদি শ্বশুরকে বলে—সেটা ঠিক নয়—তবে অনায়াসে কার্য্য-সিদ্ধ হয়,—তাত সে বলিবে না! পোড়া কপাল অমন বুদ্ধির! রাগ করিয়া একদিন সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন 'আমার এখানে আর মন টিঁকচে না আমি বৃন্দাবনে যাই, কি বলিস্?" শিবানী আগ্রহে তৎক্ষণাৎ বলিল, 'তাই চল মা তাই চল, আমরা দুজনেই যাই।'

হা রে বুদ্ধি! সিদ্ধেশ্বরী আর উচ্চ বাচ্য করিলেন না। কিন্তু শিবানীর চিত্তে এই সম্ভাবনাটা যেমন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল তেমনি শীঘ্রই মিলাইয়া গেল না। এক-দিন রাত্রে সে মায়ের ঘরে গিয়া তাঁহার কাছে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। সে বড় একটা আপনা হইতে তাঁহার কাছে

আসিয়া বসে না। কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে শিবু? এমন সময় এলি যে?" শিবানী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,"এই এলুম একবার।" সিদ্ধেশ্বরী একবার সন্দিগ্ধ নেত্রে কন্যার পানে চাহিয়া দেখিলেন কিছু বলিলেন না, কথাটা বোধহয় তেমন বিশ্বাস হইল না। বিমলাদাসী তাঁহার পায়ে তেল মালিশ করিয়া আগুনের তাপ দিতেছিল তাহার কার্য্য শেষ হইলে আগুনের কড়া লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন শিবানী বলিল 'মা'? 'কি মা?' বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী সস্নেহে চাহিয়া দেখিলেন। শিবানী সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল 'মা চলনা কেন আমরা আমাদের সেই নিজের ঘরেই আবার ফিরে যাই!' সিদ্ধেশ্বরীর ওষ্ঠ প্রান্তে দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। পাগলী! হ্যাঁরে দিন দিন কচিটি হচ্ছিস না কি? কি বলিস্ বলদেখি? অমুটার কি হবে?" শিবানী উত্তর দিল "সে এখানে থাক না, শুধু আমরা দুজনে চল চলে যাই মা; চলো আর আমি এখানে থাকতে পারচি না।"

শিবানীর কণ্ঠস্বরে আজ সিদ্ধেশ্বরী রাগ না করিয়া বরং বেদনা বোধ করিলেন। তাহার প্রাণের প্রচ্ছন্ন ব্যথা, নিগূঢ় অভিমান ও শূন্যতা তাঁহাকে এক মূহূর্ত্ত যেন আঘাত করিল। সত্যিই তো কেমন করিয়া এখানে তাহার মন টিঁকিবে? চারিদিকে সুখ ঐশ্বর্য্য সবই ছড়ান অথচ সে সকল ভোগেই বঞ্চিত! যার জন্য সব—সেই আজ কোথায়? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "যেমন কপাল করে এসেছিলি! কি করবি বাছা, সহ্যি কর। সত্যি ভগবান কি কখনও মুখ তুলে চাইবেন না? এখন কোথায় যাবি—এ যে তোরই ঘর।" শিবানীর সর্ব্বশরীরে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া গেল। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেন? চাহিবেন কি? ওগো সর্ব্বান্তর্যামী! তবে আর কতদিনই বিমুখ থাকিবে? একবার মুখ তোল' একবার চাহিয়া দেখ তোমার একটুখানি দৃষ্টির উপর এখনও কি সব নির্ভর করিতেছে না? এ কথা সে ত প্রায় ভুলিয়াই আসিয়াছিল; যদি আবার স্মরণ করাইয়া দিলে তবে কৃপা দৃষ্টি দাও"। সিদ্ধেশ্বরী শিবানীকে নীরব দেখিয়া তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া ফেলিবার আশায় বলিয়া উঠিলেন "এবার 'পৈরাগে' অদ্ধ কুম্ভ হবে। মনে কচ্চি 'ছান'টা করে চুলগুলো মুড়িয়ে আসবো, কল্পবাস কর্ত্তারও বড় সাধ আছে। মেজবোন, নিস্তারিণী ওরাও যেতে চায়; দেখি শরীরটা ভাল থাকে তো যাবো।"

শিবানী সে কথাগুলা হয়ত সব শুনিতেও পায় নাই, সে তখন ভাবিতেছিল, যদি তাই হয়, তা হলে সবি আবার ফিরে আসে! তিনি নিশ্চয় ঠাকুরপোকে ফিরিয়ে আনেন। চাও ঠাকুর মুখ তুলে চাও।"

যোগেশ মধ্যে মধ্যে বাহিরের ঘরে শ্যামাকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হেমেন্দ্রের সংবাদ দিয়া যাইত। একদিন সে আসিয়া জানাইল; হেমেন্দ্র শিবানীকে ও তাহার পুত্রকে জাল প্রমাণ করিবার জন্য শীঘ্রই মোকর্দ্দমা আনিবে। শুনিয়া বৃদ্ধ জমাদার অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া একদিকে চাহিয়া রহিলেন, জগৎ প্রপঞ্চ স্বপ্নের মতই অলীক প্রতীয়মান হইতেছিল। তারপর বজ্রাহতের মতন সভয়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন; "সত্যি কি হেম এমন কেলেঙ্কারীর কাজটা করতে পারবে? যোগেশ তুমি ত তার বন্ধু তুমি তাকে

বুঝিও বাবা। শুধু শুধু একটা ঝোঁকে পড়ে সে যেন একেবারে কুলমর্য্যাদা ভুলে গিয়ে শত্রু পক্ষের মুখ হাসায় না। আমি ত তাকে আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ করে দিতে এখনি রাজি রয়েছি। সে আমার কাছে না থাকতে চায় স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকতে পারবে। তুমি তাকে ফিরে আসতে বলো। না হয় সে কোথায় আছে—আমায় নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে আমি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসি।”

চতুর যোগেশ টলিল না। বৃদ্ধের কাতরোক্তিতে মনে করুণা আসিতেছিল কিন্তু হেমকে এখন তাহার জ্যেঠার হাতে সঁপিয়া দিলে তাহার কি লাভ হইল? শুধুই কি এতদিন তাহায় বেগার খাটা সার! না, নিজের একটা উপায় না করিয়া শিকার ছাড়া যাইতে পারে না। হেম দারিদ্র্যের মধ্যে এমনি উত্তপ্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে যে অর্দ্ধেক বিষয়েই হয়ত সম্মত হইতে পারে। বলিল, “আপনি হঠাৎ গেলে, সে যে রকম ছেলে হয়ত একেবারেই বেঁকে বসবে, বিশেষতঃ আপনাকে তাদের খপর দিয়েছি, জান্‌তে পারলে আমার উপর শুদ্ধ অবিশ্বাস হয়ে যাবে, কোন কাযই হবে না। তার চেয়ে বরং আমি তাকে বুঝিয়ে স্থুঝিয়ে যাতে নোয়াতে পারি তারি চেষ্টা করি। দেখুন আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদেরই খেয়ে মানুষ!—আপনাদেরই সেবক আমরা—আমার দ্বারা চেষ্টার কিছু ত্রুটি হবে না। এক কাজ করুন তাদের তো একটা কড়া কড়িও হাতে নেই, বৌঠাকুরুণের গহনা বাঁধা রেখে পরশু চারশো টাকা ধার করে দিয়েছি—জানেনতো আমার অবস্থা! আমার নিজের তো কিছুই নেই। তা সেই টাকাটা বরং আমায় চুপে চুপে দিন, গহনা খালাশ করে দিইগে। জিজ্ঞেস করলে না হয় বলব, অন্য জায়গা থেকে ধার করে ছাড়িয়ে এনেছি। আহা বৌঠাকুরুণেরই কষ্ট!”

মর্ম্মের মধ্যে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া যোগেশ খোঁচাইয়া তুলিল। যোগেশ চলিয়া গেলে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া শ্যামাকান্ত বালকের মতন কাঁদিয়া বলিলেন “মা আমার! কি চণ্ডালের হাতে তোকে দিলুম!”

দেওয়ানকে ডাকাইয়া সেইদিন রজনীনাথকে পত্র লিখাইলেন “হেম শুনিতেছি সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য নালিশ করিবে। আমি স্থির করিয়াছি তাহার পূর্ব্বেই আমি আমার বিষয় বিভাগ করিয়া ফেলিব। অর্দ্ধাংশ বিনোদের পুত্রকে ও অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তুমি একবার আসিয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাও। মা ও হেম শারীরিক ভাল আছে বলিয়া শুনিলেও আমার তাহা বিশ্বাস হয় না। যোগেশ তাহাদের দেখিতেছে, সে বড়ই ভাল ছেলে। শুনিলাম চন্দন নগরে তাহারা আছে। কোথায় আছে হেমের বিরক্তির ভয়ে তাহা বলিতে সাহস করিল না।” তিনদিন পরে রজনীনাথের নিকট হইতে পত্র আসিল। এতদিন ধরিয়া শ্যামাকান্ত মনে মনে অনেকখানি আশা গড়িয়া রাখিয়া ছিলেন পত্রপাঠে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে পত্র এইরূপ—

“কিসের পুরস্কার স্বরূপ আপনি তাহাকে এত বড় একটা সম্পত্তির অধিকার দান করিতে চাহিতেছেন? উচ্ছৃঙ্খলতার? অবাধ্য-

পত্র লেখা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে

ইউ, রায় কর্ত্তৃক ব্লক] [কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত
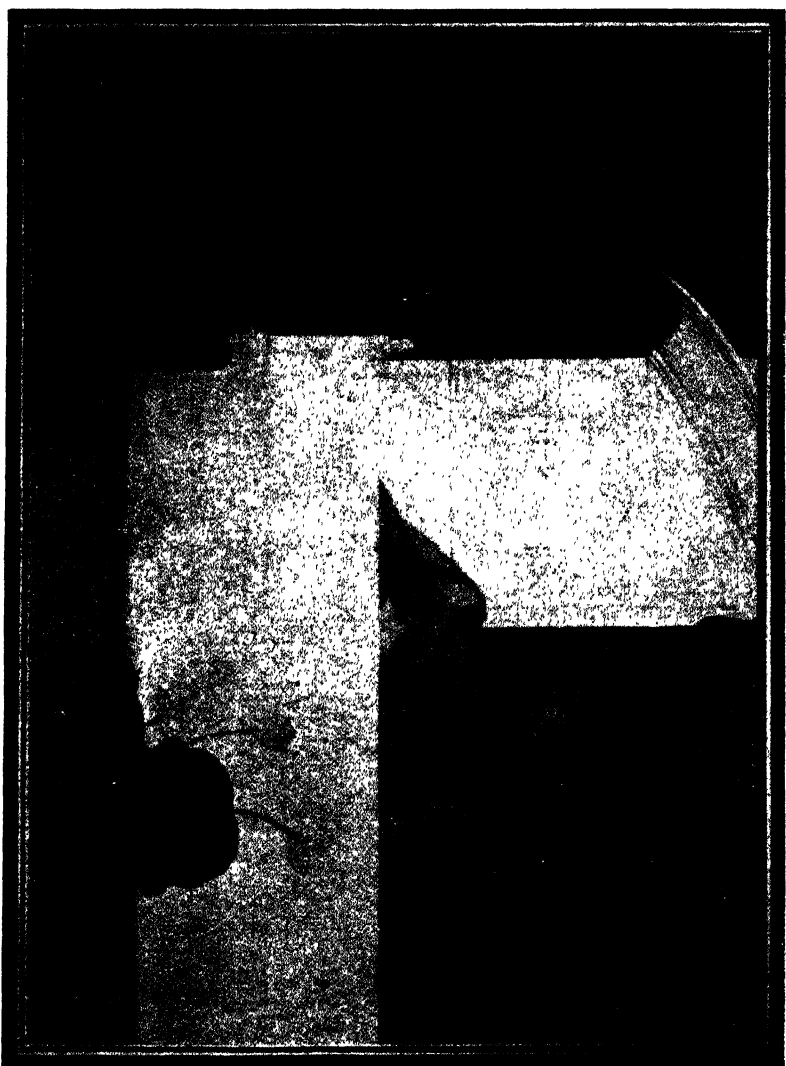
তার? ঈর্ষার? অকৃতজ্ঞতার—কিসের? বিষয় আপনার, আপনি যদি তাহা রাস্তার লোক ডাকিয়াও বিলাইয়া দেন তাহাতে বাধা দিবার আমার অধিকার কি? কিন্তু আমার সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহারই জন্য শুধু এইটুকু স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। দোষীকে দণ্ডের পরিবর্ত্তে পুরস্কার দান যদি নিতান্তই আপনার অভিপ্রেত হয় অন্য কাহারও দ্বারা সে কার্য্য করাইয়া লইবেন আমায় ক্ষমা করুন। আবশ্যক হইলে আপনার দলিলপত্র পাঠাইয়া দিতে পারি কিন্তু আমায় অনুগ্রহ করিয়া কোন সংবাদই দিবেন না।"

কি ভয়ানক! সেই রজনীনাথ সেই সন্তান বৎসল পিতা! প্রাণাধিক স্নেহের কন্যার সম্বন্ধে আজ তাঁহার এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পত্র!

শ্যামাকান্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

স্বপ্রকাশ।

আপন বসন্তবাগে সেথা তুমি পূর্ণ প্রস্ফুটিত
সেথা নাহি দখিন পবন।
নিঃশব্দ বীণায় তব সেথা জাগে সমাপ্ত সঙ্গীত
সেথা নাহি কাকলী কূজন!
অনন্ত মিলন সেথা, চির ভালবাসা;
সেথা স্তব্ধ গুঞ্জরণ, নাহি যাওয়া আসা;
বিরহদহন নাহি, নাহি লুব্ধ আশা;
নাহি স্বপ্ন শুধু জাগরণ!
সেথা তব তন্দ্রাহীন আঁখি জাগে দিনরাত্রি পারে
সেথা নাহি ক্ষণ-চন্দ্র-লেখা।
সেথা পদপ্রান্তে তব চির মেঘ-মুক্ত বক্তরাগ,
সেথা নাহি উষারুণ-রেখা!
নাহি দীপ্তি ক্ষণিকের, নাহি অন্ধকার;
চিরতৃপ্তি, নাহি অতৃপ্তির হাহাকার;
আছে মুক্তি, নাহি সেথা বন্ধন বিকার;
নাহি সঙ্গ, নহ সেথা একা!

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুঃখিনী।*

খে'তে পায়নি, দু'দিন ধরে';
তার উপরে রোগের জ্বালা,
আছে তাহার তিনটি শিশু,—
অন্ন বিনে হাড়ের মালা!
একটি দ্বারের সাম্‌নে এসে
"ভিক্ষে দাওগো" বল্‌লে খালি;
"কোন্ অভাগী, দূর্ হ!" বলে,'
কে যেন তায় পাড়্‌ল গালি!
গরীব বলে' এম্‌নি করে'
সবাই তা'রে কর্‌ছে ঘৃণা;
দেয় না তা'রে কেউ যে কিছুই
গালি কিম্বা প্রহার বিনা!
মধ্যাকাশে তপন তখন
প্রখর তেজে জ্বল্‌তেছিল;
এম্‌নি কালে, বক্ষে-শিশু-
মাকে আমার তাড়িয়ে দিল!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

* গত পৌষ মাসের ভারতীতে প্রয়াণ নামক কবিতায় নিবিড় নীরদ স্থলে ভুলক্রমে 'নিবিড় নদীর' হইয়া পড়িয়াছে।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ই উ-কি।

সিঁড়ির দক্ষিণাংশে ও স্তূপের পূর্ব্ব দিকে তিন ফুট ও পাঁচ ফুট উচ্চ দুইটি খোদিত স্তূপ আছে। আকৃতিতে তাহারা বৃহৎ স্তূপের ন্যায়। চার ফুট ও ছয় ফুট উচ্চ দুইটী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বোধি বৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির ন্যায়। সূর্য্যরশ্মি যখন এই মূর্ত্তিগুলির উপর পতিত হয়, তখন এগুলি উজ্জ্বল সুবর্ণমূর্ত্তির ন্যায় বোধ হয়। এতদ্দেশীয় বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকে যে "কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভিত্তিমূলের ছিদ্রে বৃহৎ সুবর্ণ পিপীলিকা বাস করিত। প্রস্তর নির্ম্মিত সিঁড়িতে ইহাদের দংশনের চিহ্ন অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহারা যে সুবর্ণ বালুকা রাখিয়া গিয়াছে তাহাতেই বুদ্ধদেবের এইপ্রকার সুবর্ণমূর্ত্তি দেখা যায়।"

বৃহৎ স্তূপের সিঁড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ষোড়শ ফুট উচ্চ বুদ্ধদেবের চিত্রিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটির মধ্যদেশ হইতে উপরার্দ্ধ দুইভাগে বিভক্ত। প্রাচীন কিংবদন্তীতে জানা যায় যে এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজ জীবন রক্ষার জন্য অপরের অধীনে কার্য্য করিত। বেতন স্বরূপ একটী সুবর্ণ মুদ্রা পাইলে সে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়; স্তূপের সন্নিকটস্থ একজন চিত্রকরকে নিজের দৈন্যতা জানাইয়া বুদ্ধদেবের সুন্দর একটি মূর্ত্তি একটী সুবর্ণ মুদ্রায় নির্ম্মাণ করিতে বলে। চিত্রকর তাহার ভক্তি ও দৈন্যতার বিষয় অবগত হইয়া মূল্যের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই মূর্ত্তি নির্ম্মাণে প্রস্তুত হয়। অন্য একটী ঐরূপ দরিদ্র ব্যক্তিও একটি সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা বুদ্ধদেবের প্রতিমা নির্ম্মাণে অভিলাষী হয় এবং উপরোক্ত চিত্রকরকে সুবর্ণ মুদ্রা দান করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণে অনুরোধ করে। চিত্রকর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুইটী সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়া উৎকৃষ্ট রং সংগ্রহ করিয়া চিত্র প্রস্তুত করে। একই দিনে উভয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তি.ক পূজার্থ তথায় উপস্থিত হইলে, চিত্রকর উভয়কেই একই মূর্ত্তি দেখাইয়া বলে যে এই মূর্ত্তি উভয়েরই। দরিদ্র ব্যক্তিরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে চিত্রকর তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলে যে সে তাহাদের অর্থ অপহরণ করে নাই এবং উভয়েরই অর্থ যে ঐ চিত্রে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মূর্ত্তির নিকট প্রার্থনা করে। অবিলম্বে দৈবশক্তিতে ঐ মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ দ্বিখণ্ড হইয়া যায় এবং উভয় খণ্ডই তুল্যজ্যোতি বিকাশ করিতে থাকে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আনন্দ মুগ্ধ হইয়া যায়।

বৃহৎ স্তূপের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত অষ্টাদশ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তির অনেক অলৌকিক ক্ষমতা এবং ইহা হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি নির্গত হয়। কোন কোন সময় এই মূর্ত্তি বৃহৎ স্তূপটী প্রদক্ষিণ করে, লোকে এরূপ দেখিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে দস্যুগণ চৌর্য্যাভিলাষে স্তূপের নিকট উপস্থিত হয়। বুদ্ধমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দস্যুগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে; মূর্ত্তিও স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। দস্যুগণ এই দৃশ্যে মোহিত হইয়া, দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া এই অপূর্ব্ব অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল। বৃহৎ স্তূপের বামে ও দক্ষিণে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহার প্রত্যেকটীই সুকৌশলে নির্ম্মিত। মধ্যে মধ্যে এই সকল স্তূপ হইতে সুগন্ধ উদ্ভিত ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে এবং ঋষি ও পুণ্যবাণ ব্যক্তিগণও মধ্যেমধ্যে স্তূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এইরূপ দেখা যায়। তথাগত বলিয়া গিয়াছেন যে এই স্তূপটী সাতবার পুনর্নির্ম্মিত হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। প্রাচীন কাগজপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে মন্দিরটী তিনবার ভস্মীভূত ও তিনবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে।

যখন আমি প্রথম এই দেশে আসি, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই স্তূপটি ভস্মীভূত হয়। পুনরায় নির্ম্মিত হইতেছে। কিন্তু নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় নাই।

বৃহৎ স্তূপটীর পশ্চিমে রাজা কনিষ্ক কর্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন সঙ্ঘরাম আছে। ইহার উচ্চ প্রাসাদ, ছাদ, কক্ষ সকলই যে সমস্ত যতিগণ এই স্থানে থাকিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও এইক্ষণ ইহার কিছু ক্ষয় হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহার অলৌকিক নির্ম্মাণ কৌশল সহজেই প্রত্যয়মান হয়। মাত্র কয়েকজন যতি এই স্থানে বাস করেন; ইহারা হীনযানাবলম্বী। সঙ্ঘরাম নির্ম্মাণকাল হইতে অনেক শাস্ত্রপ্রণয়নকারী যতিগণ এই স্থানে বাস করিয়া অর্হত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁহাদের আদর্শ ধার্ম্মিক জীবনের প্রশংসা এখনও শোনা যায়।

তিনতলাতে মাননীয় পার্শ্বিকের কক্ষ; ইহা অনেক-কাল পূর্ব্বে ধ্বংশ হইয়াছে কিন্তু লোকে এখানে স্মারক লিপি স্থাপন করিয়াছে। পার্শ্বিক প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু অশীতিবৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণাভিলাষে সংসার পরিত্যাগ করেন। নগরের বালকেরা তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে বিদ্রূপ করিতে লাগিল "হে মূর্খ, অজ্ঞ বৃদ্ধ! তুমি কি জাননা যে যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাহাদের উপাসনা ও শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়? তুমি এইক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ! এইক্ষণ শ্রমণ ব্রত গ্রহণে তোমার কি ফললাভ হইবে? তুমি কেবল আহার করিতেই জান—আর ত কিছুই জান না।" পার্শ্বিক বিদ্রূপাত্মক এই কথা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন তিনি ত্রিপিটকে পারদর্শী না হইবেন, যতদিন তিনি অসদিচ্ছা প্রতিকরণে সক্ষম না হইবেন যতদিন তিনি অভিজ্ঞ না হইবেন এবং বিমোক্ষলাভে সক্ষম না হইবেন ততদিন তিনি শয়ন পর্য্যন্ত করিবেন না। সেইদিন হইতে দিবাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ এবং রাত্রিতে উপবেশন করিয়া ধ্যান করিতেন। তিন বৎসরে তিনি ত্রিপিটকে এবং ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। লোকে সেই সময় হইতে তাঁহাকে মাননীয় পার্শ্বিক নামে অভিহিত এবং যথেষ্ট সম্মান করিত। পার্শ্বিকের কক্ষের পূর্ব্বে অন্য একটী পুরাতন গৃহ আছে; তথায় বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব অভিধর্ম্মকোষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্থানে একটী স্মারকলিপি রহিয়াছে।

বসুবন্ধুর গৃহের প্রায় পঞ্চাশপদ দূরে দ্বিতল গৃহে শাস্ত্রজ্ঞ মনোহৃত বাস করিতেন। এই বিজ্ঞ পণ্ডিত বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের সহস্র বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনকালে তিনি বিদ্যাভ্যাসে রত এবং বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন। ধার্ম্মিকদের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট সুযশ ছিল এবং বিষয়ী লোকও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিত। এই সময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত নরপতি বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। দৈনিক তিনি পাঁচ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেন। তিনি দরিদ্র, অনাথ ও আতুরের অভাব মোচন করিতেন। বিক্রমাদিত্যের কোষা-গার অচিরে শূন্য হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার কোষাধ্যক্ষ মহারাজকে এইরূপ নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনার খ্যাতি চরাচর ব্যাপ্ত হইয়াছে। আপনি আমাকে প্রত্যহ পাঁচলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা আর্ত্তের উপকারার্থ ব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আপনার কোষাগার শূন্য হইবে এবং কৃষিগণের উপর কর বৃদ্ধি করিতে হইবে; ক্রমান্বয়ে ইহাতে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি লোপ পাইবে। ইহাতে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে। মহারাজ দানের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন কিন্তু মন্ত্রীবর্গের কুৎসা প্রচারিত হইবে।" রাজা উত্তর করিলেন "আমি আমার ব্যয়াবশিষ্ট হইতেই দরিদ্রের উপকার করিবার চেষ্টা করি। নিজের সুবিধার জন্য অবিবেচনাপূর্ব্বক আমি কখনও প্রজাপীড়ন করিব না।" এই প্রকারে রাজা প্রত্যহ পাঁচলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ব্যয় করিতেন। কিছু দিবস পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য মৃগয়াকালীন শূকর অনুধাবন করিতেছিলেন। শূকর অনুসন্ধানে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে তিনি লক্ষমুদ্রাদান করিয়াছিলেন। মনোহৃত একদিন তাঁহার মস্তকমুণ্ডনকারীকে লক্ষ সুবর্ণমুদ্রাদান

করিয়াছিলেন. প্রধান ঐতিহাসিক এই দানের কথা আখ্যায়িকার লিপিবদ্ধ করেন। রাজা ইহা পাঠে লজ্জিত হইয়া মনোহৃতকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যগ্র হন। তদুদ্দেশ্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী একশত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এইরূপ আদেশ দেন "আমি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ করিতে চাই; বর্ত্তমানে প্রকৃত অপ্রকৃত নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। এইজন্য অদ্য আমার আদেশ পালনে আপনারা বিশেষ যত্নবান্ হউন্।" তর্কের জন্য সকলে সমবেত হইলে তিনি এইপ্রকার দ্বিতীয় আদেশ প্রচার করিলেন যে, "শাস্ত্র বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় পক্ষেই উপযুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের তাহাদের নিয়মাবলী যথাযথ প্রতিপালন করা উচিত। যদি ইহারা জয়লাভ করে, তবে উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববৃদ্ধি পাইবে কিন্তু যদি উহারা পরাজিত হয়, তাহা হইলে উহাদের বিনষ্ট করিতে হইবে।" মনোহৃত এই আদেশে, বিপক্ষপক্ষীয় ৯৯ জনকে পরাজিত করিলেন। তৎপর, সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট একজন তাঁহার সহিত তর্কের জন্য অগ্রসর হইলে, মনোহৃত তাহাকে অগ্নি ও ধূমের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। এই প্রশ্নে রাজা ও অবিশ্বাসীগণ বলিয়া উঠল "সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনোহৃত অগ্রে ধূম ও পরে অগ্নি না বলিয়া প্রথমে অগ্নি ও পরে ধূমের কথা বলিয়াছেন; সুতরাং তিনি পরাজিত হইয়াছেন।" মনোহৃত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু জনতা তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া নিজ জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া শিষ্য বসুবন্ধুকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন "পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট ন্যায় বিচার নাই; প্রতারকগণের নিকট বিচার নাই।" এই লিখন সমাপ্ত হইলেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে, রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনচ্যুত হইলেন এবং অন্য একজন নরপতি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বসুবন্ধু পূর্ব্বোক্ত কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য এই নূতন নরপতির নিকট আসিয়া বলিলেন "মহারাজ, আপনার সদ্‌গুণাবলী দ্বারা আপনি রাজ্য শাসন করিতেছেন। আমার গুরু মনোহৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বিদ্বেষবশতঃ আমার গুরুকে তাঁহার যশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। আমি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে চাই।" রাজা বসুবন্ধুর এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং যে সকল অবিশ্বাসী মনোহৃতের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন তাহাদের আহ্বান করিলেন। বসুবন্ধু তাঁহার গুরুর সিদ্ধান্তগুলি পুনর্ব্বার প্রচার করাতে অবিশ্বাসীগণ লজ্জিত হইয়া তর্কস্থান পরিত্যাগ করিল।

রাজা কনিষ্কনির্ম্মিত সঙ্ঘরাম লইতে ৫০লি উত্তর-পূর্ব্বে আমরা এক বৃহৎ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুষ্কলাবতী নগরীতে উপস্থিত হই নগরীর পরিধি ১৪ কি ১৫লি; লোকসংখ্যা এবং বাসোপযোগী গৃহ যথেষ্ট। নগরের পশ্চিমদ্বারের বহির্ভাগে একটী দেব-মন্দির আছে। তন্মধ্যস্থিত দেবমূর্ত্তি সম্ভ্রমাকর্ষক এবং অনবরত অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। নগরের পূর্ব্বদিকে রাজা অশোকনির্ম্মিত স্তূপ—এই স্থানেই ভূতপূর্ব্ব চারি জন বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন ঋষি এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনেকে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে এই স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অভিধর্ম্মপ্রকরণপদ-প্রণেতা শাস্ত্রজ্ঞ বসুমিত্র এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

নগরের ৪।৫লি উত্তরে প্রাচীন সঙ্ঘরাম আছে—তথায় জনমানব নাই। জনকয়েক হীনযানাবলম্বী যতি থাকেন। সঙ্ঘরামের নিকটে কয়েকশত ফুট উচ্চ রাজা অশোক-নির্ম্মিত স্তূপ আছে। ইহা কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত। শাক্য বুদ্ধ যখন এদেশের রাজা ছিলেন তখন এইস্থানে বোধিসত্ত্বের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। প্রার্থীগণের আবেদনে তিনি সকল দ্রব্যই দান করিয়াছিলেন এবং নিজ শরীর দান করিতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এই দেশে, তিনি সহস্রবার রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্রবারই নিজ চক্ষু পরহিতার্থে দান করিয়াছিলেন।

নিকটেই শতফুট উচ্চ দুইটী প্রস্তর স্তূপ আছে। দক্ষিণেরটী রাজা ব্রহ্মদেব কর্তৃক এবং বামেরটী শক্র কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয়ই বহুমূল্য রত্ন-মণ্ডিত। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে এই সকল রত্নগুলি সাধারণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিল; যদিও স্তূপগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে সুন্দর নহে, তথাপি দেখিতে এখনও তাহারা যথেষ্ট উচ্চ। এই ২টী স্তূপ হইতে ৪০লি উত্তর-পশ্চিমে আর একটী স্তূপ আছে। এই স্থানে শাক্য তথাগত রাক্ষসগণের মাতাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যের প্রতি তাহার প্রকৃতিগত হিংসা দূর করিয়াছিলেন। এই জন্য এতদ্দেশীয় জনসাধারণ সন্তানকামনায় তাহাকে পূজা করে।

এই স্থান হইতে ন্যূনাধিক ৫০লি উত্তরে আর একটী স্তূপ আছে। এইস্থানে সামক বোধিসত্ত্ব তাঁহার অন্ধ পিতাকে শুশ্রূষা করিতেন। একদিন, যখন তিনি উঁহাদের জন্য ফল আহরণ করিতেছিলেন তখন মৃগয়ার্থ রাজা ভ্রমবশতঃ বিষাক্ত তীর দ্বারা তাঁহাকে আহত করেন। ইন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া ঔষধাদিদ্বারা ক্ষত আরোগ্য করেন।

এই স্থানের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ২০০ লি যাইয়া আমরা পোলুসা নগরে পৌঁছি। এই নগরের উত্তরে একটী স্তূপ আছে। তথায় রাজপুত্র সুদান তাঁহার পিতার বৃহৎ হস্তী দান করায় নিন্দিত ও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই স্থানে তাঁহার বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। নিকটেই অন্য সঙ্ঘারামে হীনযানমতাবলম্বী ৫০টী পুরোহিত বাস করেন। পূর্ব্বকালে এইস্থানে শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বর অভিধর্ম্ম-প্রকাশসাধনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। নগরের বহির্ভাগে সঙ্ঘারামে মহাযানমতাবলম্বী প্রায় অর্দ্ধ শত পুরোহিত বাস করেন। রাজা অশোক এই স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত রাজপুত্র সুদান দণ্ডলোক পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে সুদান তাহাদের বিক্রয় করিয়াছিলেন।

পোলুসানগর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দণ্ডলোক পর্ব্বতে পৌঁছি। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি রাজা অশোক এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে নির্জ্জনে রাজপুত্র সুদান বাস করিতেন। রাজপুত্র তাঁহার পুত্র কন্যাকে এক ব্রাহ্মণকে দান করাতে ব্রাহ্মণ তাহাদের এত প্রহার করেন যে এ স্থানে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। অদ্যাপিও অত্রস্থ বৃক্ষলতাদি রক্তবর্ণ। পর্ব্বতগুহায় রাজপুত্র ও তাঁহার পত্নী ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলে বৃক্ষগণ তাহাদের ডাল সকল নত করিয়া দিত। এই স্থানে পূর্ব্বকালে রাজপুত্র বিশ্রাম করিতেন। এই বনের পার্শ্বে পর্ব্বতগুহায় এক বৃদ্ধ ঋষি বাস করিতেন। পর্ব্বত গুহা হইতে ১০০লি দূরে আমরা একটী ক্ষুদ্র ও একটী বৃহৎ পর্ব্বতের নিকটে পৌঁছি। পর্ব্বতের দক্ষিণে সঙ্ঘারামে মহাযানমতাবলম্বী কয়েকজন যতি বাস করেন। ইহারই নিকটে রাজা অশোক নির্ম্মিত স্তূপ আছে। এই স্থানেই পূর্ব্বকালে একশৃঙ্গ ঋষি বাস করিতেন। এই ঋষি এক বেশ্যাদ্বারা প্রতারিত হইয়া স্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

পোলুসানগরের ৫০ লি উত্তর-পূর্ব্বে উচ্চ পর্ব্বতোপরি পীতবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত ঈশ্বরদেবের স্ত্রী ভীমা দেবীর মূর্ত্তি আছে। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের ধারণা যে এ মূর্ত্তি আপনা হইতেই গঠিত হইয়াছে। ইহা অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারে এবং সেই জন্য ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই লোকে উন্নতি কামনায় এখানে আসিয়া ইহার পূজা করে। ধনী দরিদ্র সকলেই এই স্থানে সমবেত হয়। যাহারা দেবতার স্বর্গীয় রূপ দর্শনে অভিলাষী হয়, তাহারা সাত দিবস উপবাসী থাকিয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে ধ্যান করিলে ঐ মূর্ত্তি দেখিতে পায় এবং প্রায়ই তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে। পর্ব্বত নিম্নে মহেশ্বর দেবের মন্দির; ভস্মাচ্ছাদিত অবিশ্বাসীগণ এই স্থানে পূজার্থ সমবেত হয়। ভীমার মন্দির হইতে ১৫০ লি দক্ষিণপূর্ব্বে ও হিন্দদেশে উপস্থিত হই। এই নগর প্রায় ২০ লি বিস্তৃত এবং ইহার দক্ষিণে সিন্ধু নদী। অধিবাসীরা ধনী এবং

সমৃদ্ধিশালী। চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থানে মূল্যবান পণ্যাদি আমদানী হয়। এই নগরের উত্তর পশ্চিমে পোলোটুলো (সলাতুর) নগরে পৌছি। এই স্থানে ঋষি পাণিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে অনেকগুলি বর্ণ (অক্ষর) ছিল; পৃথিবী বিনষ্ট হইলে দেবতাগণ জনসমূহকে শিক্ষা দিবার জন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই প্রকারে প্রাচীন বর্ণ ও রচনার উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে ভাষার বিস্তৃতি হয়। আবশ্যকানুযায়ী দৃষ্টান্তাদি ব্রহ্মা ও দেবেন্দ্র স্থির করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঋষিগণ নানাপ্রকার বর্ণ সৃষ্টি করেন। পরবর্ত্তীকালে মনুষ্যগণ এই সকল ব্যবহার করিতে থাকে। যখন মনুষ্যগণের পরমায়ু শতবর্ষকালব্যাপী হয়, তখন ঋষি পাণিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পাণিনী ঈশ্বর দেবের সাক্ষাৎ পাইলে তিনি পাণিনীকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া অনেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া একসহস্র শ্লোক প্রণয়ন করেন। পুস্তক সমাপ্তি হইলে তিনি উহা রাজার নিকট প্রেরণ করিলে রাজা মহাসমাদরে উহা গ্রহণ করেন এবং রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বত্র উহা পাঠের জন্ত আদেশ প্রচার করেন। রাজা ইহাও প্রকাশ করেন যে, যিনি উহা আদ্যোপান্ত শিক্ষা করিতে পারিবেন তিনি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন। ঐকাল হইতে শিক্ষকগণ ছাত্র-দিগকে উহা শিক্ষা দিতেছেন এবং এই জন্তই এই নগরের ব্রাহ্মণগণ উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ প্রতিভাপন্ন।

এই নগরে একটী স্তূপ আছে। তথায় একজন অর্হৎ পাণিনীর একজন শিষ্যকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথাগতের নির্ব্বাণের পাঁচশত বৎসর পরে কাশ্মীর দেশে একজন অর্হৎ আগমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। এই স্থানে আসিয়া উক্ত অর্হৎ দেখিতে পান যে অনেক ব্রহ্মচারী তাঁহার এক শিষ্যকে শাসন করিতেছেন। ঐ দৃশ্যে অর্হৎ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন "এবালককে তুমি কেন কষ্ট দিতেছ?" ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন "আমি উহাকে শব্দ বিদ্যা শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু বালক কিছুই শিক্ষা করিতে পারিতেছে না।" অর্হৎ ইহাতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মচারী তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রমণগণ সাধারণতঃ সর্ব্বজীবের প্রতি দয়াবান। মহাশয় আপনি কি জন্য হাস্য করিলেন?" অর্হৎ উত্তর করিলেন "তুচ্ছ কথা সকল সময় শোভা পায় না এবং আমি যাহা বলি তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অবশ্যই ঋষি পাণিনীর কথা শুনিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "এই নগরের বালকগণ সকলেই তাঁহার শিষ্য, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে এবং তাঁহার স্মরণার্থ এক মূর্ত্তি এখন পর্য্যন্তও দৃষ্ট হয়।" অর্হৎ বলিতে লাগিলেন, যে বালককে আপনি এইক্ষণ শাসন করিতেছেন, এই বালকই সেই প্রাজ্ঞ ঋষি পাণিনী। পার্থিব শাস্ত্রেই পাণিনী নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে তাহার কেবল পুনর্জ্জন্ম হইতেছে। পূর্ব্ব সুকৃতি বলে তিনি আপনার শিষ্যরূপে এইবার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পার্থিব পুস্তকাদি দ্বারা তাঁহার কোনই উপকার হইবেনা। তথাগতের শিক্ষাই প্রকৃত সুখ ও জ্ঞান আনয়ন করে। দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে পাঁচশত বাদুড় বাস করিত। কোন সময় একদল বণিক ঐ বৃক্ষতল আশ্রয় গ্রহণ করে। শীত নিবারণের জন্য বণিকগণ বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। বৃক্ষে অগ্নি লাগাতে বৃক্ষ ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হইয়া গেল এই সময়ে বণিকগণের একজন অভিধর্ম্মপিটক আবৃত্তি করিতে থাকেন। বাদুড়গণ অগ্নিদগ্ধেও ঐ আবৃত্তিতে মোহিত হইয়া বৃক্ষ পরিত্যাগ না করায় সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ফলে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। উহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে রাজা কনিষ্ক কাশ্মীর দেশে পাঁচশত ঋষিকে এক সভায় আহ্বান করেন। এই পাঁচশত ঋষিই সেই বৃক্ষের পাঁচশত বাদুড়। এ মূর্খও সেই পাঁচশতের একজন। এই প্রকারেই মনুষ্য কেহ অগণ্য ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, কেহবা

উঠে ওঠে। কিন্তু এইক্ষণে, হে ব্রহ্মচারি, আপনার শিষ্যকে সংসার পরিত্যাগে আদেশ করুন। বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।"

অর্হৎ এই বলিয়াই অন্তর্ধ্যান হইলেন। ব্রহ্মচারী এই বৃত্তান্তে মুগ্ধ হইয়া, এই কাহিনী সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন এবং উক্ত বালককে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলেন। পরন্তু, তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। গ্রামের জনসাধারণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং বর্ত্তমানেও গ্রামবাসীরা ঐ ধর্ম্মাবলম্বী রহিয়াছে।

এই স্থান হইতে আমরা কয়েকটি পর্ব্বত ও নদী পার হইয়া উদয়নায় পৌঁছিলাম। (ক্রমশঃ)

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা

ভূমিকা।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীর প্রথমাংশে কাশ্মীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত অবদান কল্পলতা গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখনকালে উল্লেখ করিয়াছেন যে মহারাজ অনন্তদেব যখন কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন তাহার সপ্তবিংশ সম্বৎসরে অবদানকল্পলতা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এখন রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরেতিহাস গ্রন্থ আলোচনা করিয়া জানা যায় যে অনন্তদেবের রাজ্যকালের সপ্তবিংশ-সংবৎসর খৃষ্টীয় ১০৩৫ সাল।

ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতা, চারুচর্য্যাশতক দর্পদলন, ভারতমঞ্জরী প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় বহুতর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে অবদানকল্পলতা গ্রন্থটীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এই গ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত কথনচ্ছলে অনেক উপদেশ গর্ভ সার কথা আছে। ইহার কবিত্বও অতি মনোরম এবং ভাষা অতীব প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থটী মূল সংস্কৃত ও তিব্বতীয় অনুবাদ সহ এসিয়াটিকসোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। আমিই ইহার সংস্করণ কার্য্য করিতেছি। প্রায় তিন অংশ ছাপা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশও যথাসম্ভব সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

যৎকালে এ গ্রন্থটী লিখিত হয় তখন কাশ্মীরদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ তথায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তিব্বতীয় রাজার আদেশে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় কবিতাকারে অনুবাদ হইয়াছিল এবং এই অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত উভয়ই ১২৪০ সংখ্যক কাষ্ঠফলকে তিব্বতীয় অক্ষরে খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই এক একটী কাষ্ঠফলক দুই ফুট দীর্ঘ ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ। এই কাষ্ঠফলক হইতে ছাপা হইয়া উহা তিব্বত দেশে বহুকালাবধি প্রচার ছিল। ভারতে এ গ্রন্থের সৃষ্টি হইলেও কালক্রমে এখানে উহার লোপ ঘটিয়াছিল।

খৃঃ ১৮৮২ সালে আমি যখন লাসা নগরে উপস্থিত হই তখন বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইয়া বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই গ্রন্থটী ১০৮ সংখ্যক পল্লবনামক পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ৯৩তম পল্লবটী সুমাগধাবদান। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত জৈন ধর্ম্ম নামে আরও একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লুপ্ত হইলেও জৈন ধর্ম্ম এখনও প্রচলিত আছে। বুদ্ধের নামও জিন। ইহাতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে যে দেশের উল্লেখ আছে উহা আধুনিক গৌড়দেশ।

এই সুমাগধাবদানটী ভারতী পত্রিকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম ইতি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।

৯৩ তম পল্লব।

(মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ)

সুমাগধাবদান

শ্লাঘ্যা জয়ন্তি জিন ভক্তি বিশেষ ভাজাং
শ্রদ্ধা সুধাপ্রসর নির্ঝর শীকরাস্তে।
নিশ্চেতনোঽপ্যুচিত চেতনতা মিবৈতি
যঃ পূজ্যপূজন বিধৌ কুসুমাদিবর্গঃ ॥১॥

জিনের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তিমান্‌ জনগণের শ্রদ্ধারূপ সুধানির্ঝরিণীর শ্লাঘনীয় বিন্দুগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। পূজ্য ব্যক্তির পূজার জন্য পুষ্প প্রভৃতির যে আয়োজন করা হয় উহা নিশ্চেতন হইলেও যেন সমুচিত চৈতন্যবানের মতই হইয়া থাকে ॥১॥

পুরাকালে শ্রাবস্তীনগরীতে বিজন জেতকাননে সমাসীন ভগবানের নিকট সমাগত হইয়া অনাথপিণ্ডদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "ভগবন্! মহাগুণবতী মদীয় কন্যা সুমাগধা ভবদীয়া ভক্তির ন্যায় সর্ব্বত্রই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এক্ষণে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে শ্রীমান্‌ সার্থনাথের পুত্র বৃষভদত্ত তাহার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি যদি সম্মতি দেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে কন্যাদান করি। আমার ধন ও প্রাণ সমস্তই আপনার অধীন। আপনার আজ্ঞাই আমার একমাত্র আশ্রয়ণীয় ॥ ২, ৩, ৪, ৫ ॥

অনাথপিণ্ডদ এই কথা বলিলে পর বৎসল ও বিমলাশয় ভগবান বলিলেন। দোষ কি? তাহাকেই কন্যাদান কর ॥৬॥

অনাথপিণ্ডদ ভগবানের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে প্রণিপাত করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন ॥৭॥

তৎপরে তিনি প্রচুর বিভব, ভূরি রত্ন এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন ॥৮॥

প্রদত্তা সুমাগধা দূরতর দেশে যাইবার সময় ভগবচ্চরণ স্মরণ করিয়া সবাষ্পনয়না হইয়াছিলেন ॥৯॥

সুমাগধা অনেকদিনে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইয়া এবং পতির শুশ্রূষায় রত হইয়া পতিগৃহে বাস করিয়াছিলেন ॥১০॥

একদা তাঁহার শ্বশ্রূ ধনবতী ভোজ্যসম্ভারকার্য্যে অসংখ্য ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। "সুমাগধে তুমি সমস্ত পূজোপকরণ সজ্জিত কর। জগৎপূজ্যগুণ ভগবান্‌ জিন (জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক) কল্য প্রাতে আমাদের গৃহে আগমন করিবেন ॥১১, ১২ ॥

সুমাগধা শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্টা হইয়া কার্য্যারম্ভে তৎপরা হইয়াছিলেন। যে সকল জৈন ভিক্ষুগণ সেই পরিকল্পিত পূজার বিষয়

জানিতে পারিয়া তৎপরদিনে নগ্ন ও কেশশ্মশ্রুর উল্লুঞ্চনের জন্য অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত অবস্থায় ঐ গৃহে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নির্লজ্জ নগ্ন ও মাসভক্ষণাভ্যাসে স্থূলকায় মহিষের ন্যায় দেখিয়া সুমাগধা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা বদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক খেদ ও নির্বেদে বিনত হইয়া গুরুজনসমক্ষে শ্বশ্রূদিগকে বলিয়াছিলেন ॥১৩—১৭॥

অহো বহুকাল পরে আমি এইরূপ অ চার দেখিতে পাইলাম যে দিগম্বরগণের সমক্ষে বধূজন অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল শৃঙ্গহীন পশুগণ আপনাদের গৃহে ভোজন করিতেছে। ইহারা মনুষ্য নহে এজন্যই অঙ্গনাগণ ইহাদিগকে দেখিয়া লজ্জিত হন না। অস্থানে আপনাদের ভক্তি দেখিতেছি। এ কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম। যে ব্যক্তি ভোজন ত্যাগ করিতে পারে নাই সে কিরূপে বস্ত্র ত্যাগ করে ॥১৮—২০॥

ইহাদিগের কেশ উন্মূলন কর্ম্ম দ্বারাই নির্ঘৃণতা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌপীন বস্ত্র বর্জন দ্বারাই সংস্বভাবের আর কথাই নাই। দম্ভবশতঃ ভয়ঙ্কর ইহাদের বদনে ক্রোধ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইহারা নগ্ন কিন্তু ভোজনার্থী এবং নিয়মবান্ অতএব ইহারা পশুতুল্য ॥২১॥

এই সকল পশুগণ যেখানে পূজনীয় সেখানে তাড়নীয় কে হইবে জানিনা। অথবা ইহা দেশেরই দোষ। লোকসকল গতানুগতিকই হইয়া থাকে ॥২২॥

সুমাগধা এই কথা বলিলে পর তাঁহার শ্বশ্রূ বিষণ্ণ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। "ভদ্রে! তোমার পিত্রালয়ে কিরূপ লোকের পূজা করা হইয়া থাকে তাহা বল ॥২৩॥

তিনি বলিলেন আমার পিত্রালয়ে ভগবান্ জিনের (বুদ্ধের) পূজা করা হয়। তিনি কারুণ্যবশতঃ সমস্ত জগতের কুশললাভের জন্য সতত উদ্যত থাকেন ॥২৪॥

ভগবান জিন সর্ব্বদাই ধ্যানে স্তিমিতনয়ন তিনি পূর্ণলাবণ্যের সিন্ধুস্বরূপ। তাঁহার নাসা বংশীর ন্যায় বিপুল ও সরল এবং সেতুর ন্যায়। তাঁহার বিস্তৃত কর্ণপাশ ভূষা শূন্য হইলেও রমণীয়। অধিক কি তাঁহার কান্তি দেখিয়াই বিদ্বজ্জনের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় শান্তি উদয় হয় ॥২৫॥

তাঁহার মস্তকে একটি স্বাভাবিক মণি আছে তাহার আলোক অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহার বাহুদ্বয় করিকরসদৃশ। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। তাঁহার করতলে শঙ্খ, ধ্বজ ও পদ্মমালা রেখা আছে। তিনি শান্তি ও সংযমের সাম্রাজ্যের উপযুক্ত লক্ষণ ধারণ করেন ॥২৬॥

মহামুনিগণেরও অভিলাষজনক সেই মহাপুরুষের স্বভাব সর্ব্বপ্রকার অভিলাষবর্জ্জিত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সদাই আনন্দময় এবং অনুরাগবর্জ্জিত। তাঁহার অধর অত্যন্ত রক্তবর্ণ ॥২৭॥

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিলেই গাঢ় আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়। মৈত্রী তাঁহার মনে সতত শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার ক্ষান্তি তন্ময়তাকারিণী। তাঁহার হৃদয়বর্ত্তিনী দয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তিনি বহুদয়িতায় আসক্ত হইয়াও সকলেরই আশা পূর্ণ করেন। তিনি অপূর্ব্ব মুনি তাঁহার মহিমা অসাধারণ। তাঁহার শান্তির মধ্যেও বৈরাগ্য রহিয়াছে ॥২৮॥

যিনি আমাদের গৃহে পূজিত হন তাঁহার উপদিষ্ট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শীলবান্ সজ্জনগণের মন মোহাবরণ হইতে মুক্ত হয় ॥২৯॥

তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষামণিস্বরূপ। তাঁহাকে স্মরণ করিলেও রাগদ্বেষরূপ উগ্র দংষ্ট্রাদ্বয়শালী সংসারসর্প আর প্রাণীকে পীড়িত করিতে পারে না ॥৩০॥

শ্বশ্রূ শ্রোত্রের রসায়নস্বরূপ সুমাগধার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্ত্বঃ প্রমোদবশতঃ বৈশদ্যপ্রাপ্ত হইয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥৩১॥

হে বরাননে! তাঁহার দর্শনের কোন উপায় আছে কি। তাঁহার পুণ্যসম্পর্কে আমরাও কি অমৃতাস্পদ হইতে পারি ॥৩২॥

শ্বশ্রূ সমাদরবুদ্ধি ও অনুনয় সহকারে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর ভক্তিমানিনী সুমাগধা বলিলেন যে আমি তোমাদিগকে তাঁহাকে দেখাইব ॥ ৩৩ ॥

সুমাগধা এইরূপ মহাপ্রতিজ্ঞাভার নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষবতী হইয়া সংশয়দোলায় আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন ॥৩৪॥

তৎপরে প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক ক্ষণকাল ভগবৎসেবিত দিক লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূজ্যপূজোপযুক্ত কুসুমাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন ॥৩৫॥

তিনি পুষ্প, ধূপ ও উদক দ্বারা পূজা করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক আনন্দ বাষ্পে সংরুদ্ধ নয়নদ্বয় সেইদিকে প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন ॥৩৬॥

হে ভগবন্ তোমার আশ্রমের মৃগীস্বরূপ আমি যে রত্নত্রয় (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) বিবর্জিত হইয়া এই দূরদেশে আসিয়াছি ইহা তোমার অনুকম্পাই হইয়াছে। হে দয়ালো আমি দূরস্থ হইলেও তোমার পাদপদ্মযুগলের শরণাগত। দৃষ্টিদ্বারা আমাকে স্পর্শ কর। বাৎসল্যবান্ মহজ্জনের করুণা প্রবাসবশতঃ দূরীকৃত জনে অল্পতা প্রাপ্ত হয় না। ॥৩৭, ৩৮॥

হে ভগবন্ আপনার দাসকন্যা আমি অদ্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি। হে বিভো প্রাতঃকালে আগমন করিয়া আমার মান রক্ষা করিবেন ॥৩৯॥

সুমাগধা এই কথা বলিয়া বিচিত্র কুসুমাঞ্জলি সমর্পণ করিলে পর উহা সজীব ভক্তিদূতিকার ন্যায় আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল ॥৪০॥

শ্বেত, রক্ত, হরিত ও অসিতবর্ণ এবং ধূপধূম শোভিত ঐ সুমাগধা-প্রদত্ত পুষ্পাবলী আকাশমার্গে ধীরে ধীরে গমন করিতেছিল। উহা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন শচীপতি ইন্দ্রের ধনু বালাম্বুদ সংলগ্ন হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতেছে ॥৪১॥

অতঃপর ভক্তিশালিনী ঐ পুষ্পাবলী ক্ষণকালমধ্যে জেতবনে উপস্থিত হইয়া শাস্তা অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের উপর পতিত হইয়াছিল ॥৪২॥

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানও সুমাগধার সমস্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ পুরোবর্ত্তী আনন্দকে বলিয়াছিলেন ॥৪৩॥

কল্য প্রাতঃকালে আমাদিগকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে যাইতে হইবে। সুমাগধা আমার ও মদীয় সঙ্ঘগণের পূজা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ॥৪৪॥

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর এখান হইতে শত ষষ্টি যোজনেরও অধিক। একদিনেই সেখানে যাইতে হইবে। এস্থলে বিলম্ব করা উচিত নহে। যে সকল প্রভাবশালী ভিক্ষুগণ আকাশমার্গে যাইতে পারেন তাঁহাদিগকেই তুমি নিমন্ত্রণশলাকা (১) সমর্পণ কর ॥৪৫,৪৬॥

আনন্দ এইরূপে সুগতকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষুগণকে নিবেদন করিয়াছিলেন যে যাঁহারা একাহমধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গমন করিতে পারিবেন শলাকাদ্বারা তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করা হইতেছে ॥৪৭॥

তখন মহর্দ্ধিমান ভিক্ষুগণ শলাকা গ্রহণ করিলে পর পূর্ণকুম্ভোপধানী এক স্থবিরও উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

প্রভাববান্ স্থবির শলাকাগ্রহণার্থে হস্ত-প্রসারণ করিলে পর আনন্দ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। এই দুইপদ দূরবর্ত্তী অনাথপিণ্ডদগৃহে আপনি যান না কিন্তু শতষষ্টিযোজন দিনার্দ্ধে গমন করিতেছেন ॥৪৯,৫০॥

আনন্দ এই কথা বলিলে পর স্থবির লজ্জায় অধোবদন হইয়া চিন্তা করিলেন যে নিজ দলমধ্যে ন্যূনতা প্রকাশ বড়ই দুঃসহ। অনাদিকাল সঞ্চিত ক্লেশ, জন্ম ও জরাদি সমস্তই যত্নদ্বারা বিনাশ করিতে পারা যায় কিন্তু কতদূর বা ঋদ্ধিপদ পাইয়াছি তাহা কি দেখাইতে পারিব না ॥৫১,৫২॥

এইরূপ তীব্র সংবেগযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা-পরায়ণ ও বিশুদ্ধচিত্ত ঐ স্থবিরের মহর্দ্ধি ক্ষণকাল মধ্যেই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ॥৫৩॥

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত ভিক্ষুগণ নানাপ্রকার দেববেশ গ্রহণপূর্ব্বক বিমানদ্বারা আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন ॥৫৫,৫৬॥

ইত্যবসরে মহাবস্তু ও উদ্যোগপূর্ণ সুমাগধার ভর্ত্তৃগৃহে শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তৃসহ ভগবদ্দর্শনাভিলাষে প্রাসাদসমারূঢ়া হইয়া পুষ্প ও ধূপদ্বারা পূজারচনার সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥৫৫,৫৬॥

তৎপরে প্রথমে দিব্যর্দ্ধিসম্পন্ন ও বিবিধ আশ্চর্য্যজনক অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য নামক ভিক্ষু অশ্বরথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন দেখা গেল ॥৫৭॥

শ্বশুরাদিগণ সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রীতিসহকারে সুমাগধাকে বলিয়াছিলেন যে "ইনি কি ভগবান্"। সুমাগধা বলিলেন "ইনি ভগবান্ নহেন। ইনি সূর্য্য-সম তেজস্বী ও অপ্রতিহততেজাঃ ভিক্ষু অজ্ঞাত-কৌণ্ডিন্য বলিয়া বোধ হইতেছে" ॥৫৮,৫৯॥

ক্রমে ক্রমে রথ সকল আসিতে লাগিল এবং প্রত্যেকবারেই শ্বশুরাদিগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "ইনি কি ভগবান"। সুমাগধা বলিলেন ইনি ভগবান্ নহেন। ইহাঁরা সকলেই ভগবানের শাসনাধীন ভিক্ষুগণ। ইহাঁরাও শান্তিগুণে শ্লাঘনীয় ও তপোবলে প্রদীপ্ততেজাঃ ॥৬০,৬১॥

(১) পুরাকালে ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের এই প্রথা ছিল যে তাঁহারা নিমন্ত্রণকালে কর্পূর, চন্দন কস্তুরিকা প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত এক একটী শলাকা পত্রসহ পাঠাইতেন। এখনও তিব্বতে ঐরূপ শলাকার সুগন্ধ প্রাবারক দেওয়া ব্যবহার আছে।

যিনি কমনীয় হেমময় দ্রুমদ্বারা রমণীয় শৈলশৃঙ্গে অধিরূঢ় রহিয়াছেন ইনি আশ্চর্য্যকারী মূর্ত্তিমান্ প্রভাবস্বরূপ ইহাঁর নাম মহাকাশ্যপ ভিক্ষু ॥৬২॥

যিনি জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গভীর ঘোষকারী পঞ্চাননরথে অধিরূঢ় হইয়া আকাশমার্গে আসিতেছেন ইনি বিখ্যাত গুণবান্ ভিক্ষু শারিপুত্র ।৬৩॥

যিনি কৈলাসপর্ব্বতবৎ শুভ্র চতুর্দ্দণ্ড-সমন্বিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন ইনি মহা পুণ্যবান্ মৌদ্‌গল্যনামা ভিক্ষু ॥৬৪॥

যিনি বৈদূর্য্যময়, মৃণালমণ্ডিত ও রত্নাঙ্কুরবৎ কেশরদ্বারাশোভিত কনকপদ্মে আরোহণ করিয়া সৌরভ বিস্তার করিয়া আসিতেছেন ইনি বিখ্যাত ভিক্ষু অনিরুদ্ধ ।৬৫॥

যিনি গরুড়োপরি অধিরূঢ় হইয়া পক্ষানিল দ্বারা মেঘ সকল উৎসারিত করিতে করিতে আকাশাগ্রে অবগাহন করিতেছেন ইনি মৈত্রায়ণীপুত্র ভিক্ষু সুপূর্ণ ॥৬৬॥

যিনি নিতান্ত শান্ত অনন্তে অবস্থান করিয়া প্রভামৃতদ্বারা দিঙ্মুখ তর্পিত করিয়া আসিতেছেন ইনি সত্ত্বমহোদধি, প্রভাববান্ ভিক্ষু এয্যজিৎ ॥৬৭॥

যিনি বিলোল বল্লীবলয়মণ্ডিত বিশাল সুবর্ণময় তালে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন ইনি পুণ্যপূর্ণদ্যুতি, মতিমান্ ভিক্ষু উপালী ॥৬৮॥

যিনি সুবর্ণ ও রত্নে উজ্জ্বল পত্ররেখামণ্ডিত বৈদূর্য্যময় বিমানের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রভাদ্বারা বিলেপন করিতে করিতে আসিতেছেন ইনি ভিক্ষু কাত্যায়ন ॥৬৯॥

যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী বৃষোপরি অধিরূঢ় হইয়া আকাশে অবগাহন করিতেছেন ইনি প্রতিষ্ঠাবান্ ও গরিষ্ঠবুদ্ধি ভিক্ষু কৌষ্ঠিল ॥৭০॥

যিনি বিমান হংসের দ্যুতিদ্বারা অন্তরীক্ষকে হাস্যতরঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া আসিতেছেন ইনি তপোনিধি পিলিন্দবৎস নামক ভিক্ষু ॥৭১॥

যিনি সমুৎফুল্ল লতাবনমধ্যে বিহার করিতে করিতে আসিতেছেন ইনি অক্ষুণ্ণ শোভাবান্ ও গৃহাপেক্ষাবিহীন প্রসিদ্ধ ভিক্ষু শ্রোণকোটি ॥৭২॥

যিনি হেমপ্রভাদ্বারা দিগ্বিভাগ ভূষিত করিয়া অপর সুমেরু পর্ব্বতবৎ সংলক্ষিত হইতেছেন্ ইনি ভগবানের পুত্র চক্রবর্ত্তী রাহুলক ।৭৩॥

এই সকল বিচিত্র রত্নময় আসন ও বাহন-স্থিত অসংখ্য ও অদ্ভুতকর্ম্মা ভিক্ষুগণ পর্ব্বতগণ, দিগন্তর, পৃথিবীমণ্ডল ও আকাশতট হইতে আসিতেছেন ॥৭৪॥

সুমাগধা কর্ত্তৃক এইরূপ ক্রমে ক্রমে নির্দ্দেশ্যমান ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্মুখে অনন্যদৃষ্টিতে বিলোকন করিয়া তাঁহারা যুগপৎ হর্ষ, ও অদ্ভুত বিস্ময়ের বশীভূত হইয়াছিলেন ॥৭৫॥

অতঃপর জগৎ যেন কাঞ্চনবর্ণবৎ উজ্জ্বল-বর্ণ ও শতসূর্য্য প্রকাশজনিত আলোকে আলোকিত হইল। এবং অশেষ সন্তাপের প্রশমন হওয়ায় শীতাংশুশতমালা দ্বারা যেন জগৎ শীতল হইয়া গেল ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর ধনপতি, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান ও বিপুল গগন-যাত্রার অনুরূপ সেব্যমান এবং অমরপুরের পুরন্ধ্রীগণকর্ত্তৃক পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা বিকীর্য্যমাণ ভগবান্ জিনেন্দ্র ঐ সকল পুণ্যবান্ গণের নয়নগোচর হইলেন ॥ ৭৭ ॥

ভগবান্ অষ্টাদশ মূর্ত্তিতে অষ্টাদশ দ্বার সমন্বিত ঐ নগরে যুগপৎ প্রবেশ করিয়া সুমাগধার গৃহ যেন শশিকান্ত মণির প্রভাময় করিয়াছিলেন্।। ৭৮ ।।

তত্রত্য সকলেই প্রণিপাত পূর্ব্বক বহু-প্রকার পরিপূর্ণ উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়াছিল। পুরবাসী জনগণও বহির্দেশে ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত ভগবানের পূজা করিয়াছিল ।। ৭৯ ।।

দয়ালু ভগবান্ সুমাগধার প্রতি কৃপাবশতঃ সঙ্ঘ সহ পূজা গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহালোকন দ্বারা সকলের প্রতিই প্রসাদ বিধান করিয়া-ছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্বশুরাদি বর্গ সহিত সুমাগধা এবং অন্যান্য সমস্ত পুরবাসী জনগণ শাস্তার উপদেশ দ্বারা বিশুদ্ধাশয় হইয়া তৎক্ষণাৎ সত্যদর্শন করিয়াছিল ॥ ৮১ ॥

ভিক্ষুগণ সুমাগধার কুশলসঙ্গত পুণ্য ও বিপুল প্রভাব বিলোকন করিয়া কৌতূহলবশতঃ ভগবান্‌কে পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন্ ॥ ৮২ ॥

সুমাগধার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত।

সর্ব্বদর্শী ভগবান্ সভাস্থলে ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দন্তপ্রভা দ্বারা দিঙ্মুখ আলোকিত করিয়া সুমাগধার কুশলের হেতু বলিয়াছিলেন ।। ৮৩ ॥

পুরাকালে বারাণসীতে কৃকি নামক রাজার কাঞ্চনমালা নামে এক কন্যা ছিল। তিনি কাশ্যপ নামক শাস্তার প্রতি সতত ভক্তি-শালিনী ছিলেন। তিনি পঞ্চশত সখীগণ সহ তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন ॥ ৮৪, ৮৫ ॥

একদা রাজা কৃকি বিকৃত স্বপ্ন দর্শন করিয়া ভয় ও সংশয়ে ভীত হইয়া স্বপ্নফলজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দৈবজ্ঞগণ রাজসুতার প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে অতি প্রিয়জনের হৃৎপিণ্ড হোম করিলে মঙ্গল হইবে ॥ ৮৬, ৮৭ ॥

রাজা দৈবজ্ঞগণের এইরূপ ক্রূরতর বাক্যে অনাদর করিয়া কন্যার কথানুসারে ভগবান্ কাশ্যপকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথায় গিয়া তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি অদ্য এক বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়াছি হে সর্ব্বজ্ঞ ইহার ফল কি হইবে আপনি তাহা বলুন্ ॥ ৮৮, ৮৯ ॥

আমি দেখিয়াছি যে এক রুদ্ধপুচ্ছ গজ বাতায়ন মার্গে নির্গত হইতেছে। এবং কূপ তৃষিত জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। একজন মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় দ্বারা শক্তুপ্রস্থ লাভ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি কুকাষ্ঠ চন্দনের সমান করা হইয়াছে। একটী হস্তি-শাবক একটী মহাগজকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। একটা বানর অশুচি লিপ্তাঙ্গ হইয়া অন্যলোকের দেহে লেপন করিয়া পলা-ইতেছে। কুৎসিত ও চপল একটা বানর স্ফীত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছে। একটা পট অষ্টাদশ পুরুষ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। রমণীয় পুষ্পফলশোভিত উদ্যান চোরগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে। বহুলোক বিদ্বেষ, উপহাস, ও কলহে আসক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরতর ফল অন্যলোক বলিয়াছে। রাজকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান কাশ্যপ বলিয়া ছিলেন ॥ ৯০-৯৫ ॥

শমগুণান্বিত, অমৃতসাগর, ভগবান্ জিন

শাস্তা শাক্যমুনি রূপে শতায়ুঃ জনমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাই তুমি স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছ। তাঁহারও পশ্চিম কালে শ্রাবকগণ কলহ আশ্রয় করিয়া শীল, গুণ ও আচার ত্যাগপূর্ব্বক বিপ্লবকারী হইবে।

ইহারা স্বয়ং সেবা অবলম্বন করিয়া অপক্ব ও অল্প বিবেক সম্পন্ন গৃহস্থগণের নিকট বলপূর্ব্বক ধর্ম্মঘোষণা করিবে। যিনি প্রার্থনীয় তিনিই প্রার্থিরূপে সেবার জন্য ধাবমান হইবেন্ তাই তুমি স্বপ্নে তৃষিতের পশ্চাদ্ ধাবমান কূপ দেখিয়াছ। ইহারাই লোভান্ধ ও মোহহত হইয়া শক্তুপ্রস্থলোভে বোধ্যঙ্গরূপ মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় করিবে। ইহারা মূর্খতা প্রযুক্ত তীর্থবাহ্য কুদারুগুলি বুদ্ধভাষিতরূপ চন্দনের সমান বলিয়া প্রতিপাদন করিবে কোনরূপ প্রভেদ করিবে না। কোথায়ওবা বিনীত ও ভদ্র ভিক্ষুরূপ কুঞ্জরকে দেখিয়া দুঃশীল কলভরূপ ভিক্ষু স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধিক্কৃত করিবে। চপলতারূপ অশুচি দ্বারা লিপ্তাঙ্গ ভিক্ষুরূপ মর্কট সুশীল ভিক্ষুগণকে নিজদোষে লিপ্ত করিয়া নিজতুল্য করিবে। কপিসদৃশ ষণ্ডকেরও অভিষেক হইবে। সংবুদ্ধের শাসনপদ কৃষ্যমাণ হইয়াও নষ্ট হইবে না। ভিক্ষু সংঘের দ্রব্যরূপ ফলোদ্যানে চুরি হইবে। তাহারা পরস্পর নিন্দা করিয়া কলহপরায়ণ হইবে। তোমার স্বপ্নের পরিণামে এই সকল ফল পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইবে। রাজা কৃকি শাস্তার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৬-১০৬ ॥

অতঃপর ভগবান্ অনুচরগণ সমন্বিত রাজার ধর্ম্মদেশনা করিয়া কাঞ্চনমালার কুশলার্হতা আদেশ করিলেন ॥ ১০৭ ॥

ইনি জন্মান্তরে নারঙ্গমালা দ্বারা স্তূপে অর্চনা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যে হেমমালাঙ্কিতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১০৮॥

সেই কাঞ্চনমালাই মহাপুণ্যপ্রভাবে সুমাগধারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য কুশলসেতুতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১০৯ ॥

ভগবান্ জিন এই কথা বলিয়া ভিক্ষুগণসহ আকাশমার্গে কান্তিদ্বারা দিঙমণ্ডল পূরিত করিয়া জেতবনে গমন করিয়াছিলেন ॥১১০॥

জনগণ সৎকুলের অভ্যুদয়ের জন্য বৃথা পুত্র কামনা করে। পুত্র যদি গুণবান্ না হয় তাহা হইলে সমস্ত কুলই দূষিত হয়। এরূপ গুণবতী কন্যাও উৎপন্ন হয় যিনি নৌকার ন্যায় নিজ পুণ্যপ্রভাবে উভয় কুলকেই সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রে পার করিয়া থাকেন ॥ ১১১ ॥

ইতি ক্ষেমেন্দ্র কৃত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার সুমাগধাবদান নামক ত্রিনবতিতম পল্লব সমাপ্ত ॥

পুণ্ড্রবর্দ্ধন—অর্থাৎ গৌড়নগর বৌদ্ধযুগে সভ্যতার কিরূপ উচ্চশিখরে সমারূঢ় ছিল—এবং ভারতে নারীজাতি তখন কিরূপ সুশিক্ষিতা ও সম্মানিতা ছিলেন তাহা এই প্রবন্ধটি হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়।—

ভাঃ সঃ।

জয়পুর।

(ফেলিসিঁয়া-শ্যালের ফরাসী হইতে)

২৮।২৯ জানুয়ারী ১৯০০

জয়পুরের যে একটি চিত্তবিমোহন সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য্য আছে তাহা আমি কিরূপে অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাইব? এই নগরীটীকে একটি রাগিণী বলিলেও হয়। এই রাগিণীর বাদী-সুরটি গোলাপী।

নগরের প্রাচীর গোলাপী। নগরের দ্বারগুলি গোলাপী। রাজপথের সমস্ত বাড়ী গুলি গোলাপী। প্রাসাদগুলি গোলাপী। দেবালয়গুলি গোলাপী। উদ্যানে গোলাপ। স্বর্ণাভ গোলাপী আলোকে সমস্ত উদ্ভাসিত।

রাস্তায় জীবন-উদ্যমের অসীম স্ফূর্ত্তি; সুশ্রী পুরুষেরা শ্মশ্রুল; ইহাদের কাপড় অতি উৎকৃষ্ট, উজ্জ্বল, প্রায়ই গোলাপী রঙের। তরুণীগণ স্মিতমুখী। সুন্দর শিশুগুলি একেবারে নগ্নকায়। রাস্তার মাঝে, হাতী, উট, জেব্রা, মহিষ, ছাগল, গাধা, গরু। বাড়ীর ছাদে—বানর, পায়রা, ময়ূর, টিয়া, কাক। রাস্তায় বিবাহের বরযাত্রী চলিয়াছে—আগে-আগে কোলাহলময় বাদ্যভাণ্ড, বার বৎসর বয়স্ক বরের হাসি মুখ। মহারাজার একজন ভৃত্য, শিকলে-বাঁধা একটা নেকড়েকে লইয়া রাস্তায় ফিরাইতেছে।

আমরা মহারাজার একজন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তিনি একটি গোলাপী রঙের বাড়ীতে থাকেন; বাড়ীর গায়ে বড়-বড় সাদা হাতী চিত্রিত। বৃদ্ধ মন্ত্রী দেখিতে সুশ্রী, ইহাঁর অপূর্ব্ব ধরণের বড়-বড় চোখ্। মন্ত্রী, তাঁহার ছোট ছেলেদিগকে আমাদের সম্মুখে আনিলেন। তাহারা গোলাপী রঙের কাশ্মীরী কাপড় পরিয়াছে। জাফ্রানের ও পেস্তার মেঠাই, ছোটো-ছোটো কমলালেবু, ছাড়ানো বেদানা, এই সব তিনি আমাদের হাতে দিলেন...

এখানকার সমস্ত পরিবেষ্টনটা এরূপ অপূর্ব্ব, আমাদের অভ্যস্থ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এতটা তফাৎ যে, বাস্তবতার ভাবটা যেন মন হইতে শীঘ্রই তিরোহিত হয়। এই সুন্দর দৃশ্য দর্শনে সর্ব্বপ্রকার ভাবনা চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হৃদয় অসীম আনন্দে,—এক প্রকার লঘু ধরণের অহেতুক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

এই গীতি-নাট্যের সাজসজ্জার মধ্যে মানুষ যে বাধ্য হইয়া, বাস্তব-বোধে জীবনের কাজ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে—ইহা যেন সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হয়। জয়পুরের আশপাশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হইয়া গিয়াছে। এই স্বর্গপুরীর দ্বার-দেশে, শত সহস্র হতভাগ্য ব্যক্তি অনাহারে মরিতেছে। জয়পুরের নিকটবর্ত্তী মাঠ ময়দানের উপর দিয়া যখন আমাদের গাড়ী চলিতেছিল, অনেকগুলা মৃতদেহ আমাদের পথের সম্মুখে পড়িয়াছিল। মৃত্যুই তাহাদিগকে ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাণ্ডুয়া

ছোট খাট গ্রাম হইলেও পাণ্ডুয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা চুঁচড়া হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনত্বে হুগলি জেলার মধ্যে ইহা সপ্তগ্রামের অনুরূপ। কথিত আছে এক সময় ইহা জনৈক হিন্দু নৃপতির রাজধানী ছিল। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে সা সোফি (Shah Sofi) নামক এক মুসলমান নরপতি উক্ত নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। এই পাণ্ডুয়া অধিকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ একটি জনশ্রুতি আছে।

একদা পুত্রের জন্মোৎসব-উপলক্ষে পাণ্ডুয়ারাজ এক ভোজের আয়োজন করেন। ঠিক সেই দিনই তাঁহার এক মুসলমান কর্ম্মচারীও আপন বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে একটি গো বৎস নিহত হয়। হিন্দুদিগের অসন্তোষ উৎপাদন ভয়ে তিনি নিহত গো-বৎসের অস্থি ও মাংসাদি কোন নিভৃত স্থানে প্রোথিত করান। কিন্তু রজনীযোগে শৃগালেরা সেই সকল অস্থি মাংসাদি মৃত্তিকা হইতে প্রকাশ্য রাজপথে টানিয়া বাহির করে। পরদিন প্রত্যূষে এই ব্যাপার দেখিয়া সমুদয় হিন্দু অধিবাসী উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং রাজপুত্রকেই সকল অমঙ্গলের কারণ বিবেচনা করিয়া প্রথমে তাহাকে হত্যা করিয়া পরে মুসলমানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ারাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হয়; তখন তাহারা দিল্লীতে পলায়ন করে এবং সেখানে যাইয়া সম্রাটের নিকট তাহাদের সমুদয় দুঃখ নিবেদন করে। সম্রাট সমস্ত ব্যাপার জানিয়া পাণ্ডুয়ারাজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধের পর হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়।

কাহারো মতে পাণ্ডুয়ারাজপুত্রের এবং উক্ত মুসলমান কর্ম্মচারীর পুত্রের জন্মোৎসব একই দিনে হয়। সেই দিনই ঐ মুসলমান কর্ম্মচারী গো-বৎস হত্যা করিয়া আপন বন্ধুবান্ধবগণের প্রীতিভোজ দিয়াছিলেন। এবং হিন্দুরা রাজপুত্রকে হত্যা করে নাই,—মুসলমান কর্ম্মচারীর পুত্রকেই হত্যা করিয়াছিল।

উক্ত যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমানেরা বহুবার হিন্দুদের নিকট পরাস্ত হয়। কথিত আছে পাণ্ডুয়া সহরের সন্নিকটে অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন এক পবিত্র কুণ্ড ছিল। যুদ্ধকালে হিন্দুরা এই কুণ্ড হইতে জল লইয়া আহত সৈন্যদিগের গাত্রে ছিটাইয়া দিলে সেই জলস্পর্শে তাহারা তখনই আরোগ্যলাভ করিত এবং প্রবল উৎসাহে পুনরায় মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিত। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমানগণ এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা জানিত হিন্দু গো-মাংস স্পর্শ করে না। একদিন তাহারা একখণ্ড গো-মাংস লইয়া হিন্দুদিগের সমক্ষেই সেই কুণ্ডের মধ্যে তাহা ফেলিয়া দেয়। অতঃপর হিন্দুরা আর সে জল ব্যবহার করিত না,—কাজেই মুসলমানেরা অতি সহজে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিতে পারিল। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া-

ছিল অধিবাসীরা সেই স্থানটীকে জঙ্গ ময়দান নামে অভিহিত করে।

শুনা যায় এই যুদ্ধে পাণ্ডুয়ারাজ মহানাগ বা মণ্ডরাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া হইতে মণ্ড কয়েক ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত।

এই যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মুসলমানেরা একটী মিনার স্থাপন করেন। এই মিনারটী পাণ্ডুয়া মিনার নামে প্রথিত। বাংলা দেশের মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র মিনারটী উচ্চতায় প্রায় ১২৫ ফুট।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার জীর্ণ অংশগুলি সুসংস্কৃত হইয়াছে। গম্বুজ এবং চূড়াটুকু ছাড়িয়া দিলেও ইহা পঞ্চতল বিশিষ্ট। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে পঞ্চমতল এবং গম্বুজ চূড়া প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া যায়। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হইয়াছে। তলদেশ হইতে গম্বুজ পর্য্যন্ত সমুদয় সোপান-শ্রেণী উত্তমরূপে মেরামত করা হইয়াছে।

মিনারটীর ঠিক পূর্ব্ব দক্ষিণে মুসলমান-দিগের এক বৃহৎ মসজিদ আছে। ইহাও এযাবৎকাল জীর্ণ অবস্থায় ছিল। মিনারের সঙ্গে ইহারও কিয়দংশ মেরামত করা হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া সাত আট মাইল দূর হইতে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদই 'পেঁড়োর মসজিদ নামে বিখ্যাত। এই মসজিদের পূর্ব্বদিকে প্রায় ১০০ শত গজ দূরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর পার্শ্বে আর একটী পুরাতন মসজিদ আছে। এই মসজিদটি প্রায় ২০০ শত বৎসরের প্রাচীন।
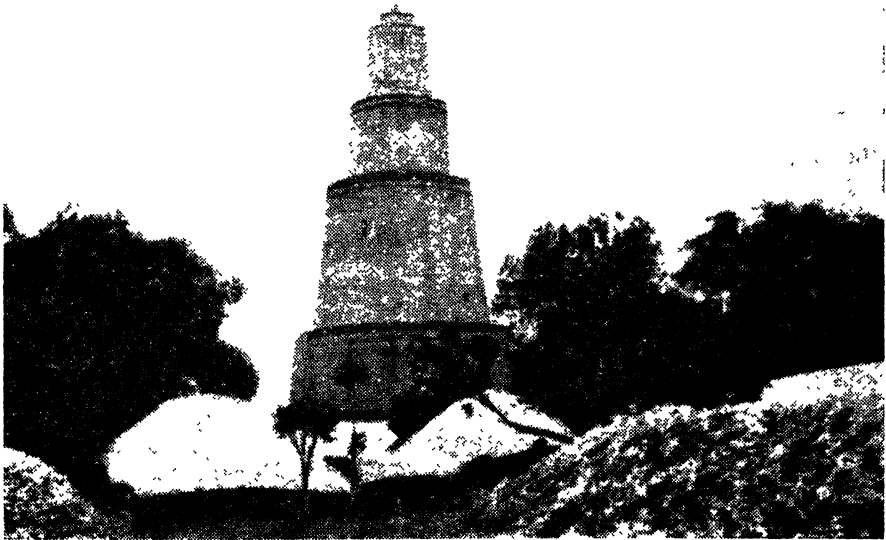
পাণ্ডুয়ার মসজিদ (বর্ত্তমান অবস্থা)

এই মস্‌জিদের পূর্ব্ব পার্শ্বে মুসলমান দিগের গোরস্থান। গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোডের পার্শ্বেই সা সোফির সমাধি মন্দির।

পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বদিকে আর একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর নাম পির পুকুর'। ইহার চতুষ্পার্শ্বে মুসলমানদিগের গোরস্থান। কথিত আছে হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধের সময় যে সকল মুসলমান যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল এগুলি তাহাদিগেরই সমাধি মন্দির। পাণ্ডুয়ায় প্রতি বৎসর মাঘমাসে এক বৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হয়। মেলায় প্রায় দুই তিন সহস্র লোকের সমাগম হয়।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পাণ্ডুয়ায় অত্যধিক। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ১২০০ অধিবাসী এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭০০০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৫২০০ অধিবাসী কাল-গ্রাসে পতিত হয়।

হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া মুসলমান দিগের একটী কেন্দ্র স্থান। কিন্তু সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে প্রায় চতুঃপঞ্চমাংশ হিন্দু। পাণ্ডুয়ার মুসলমানেরা আসরফ্ (Ashrof) শ্রেণীভুক্ত এবং আমেদার (Aimadars) নামে অভিহিত। যখন ইংরাজেরা প্রথম বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন সেই সময়ে প্রজাসন্তুষ্টির জন্ম রাজ্য পরিচালনের অনেক ভার এ দেশবাসীর হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায় এবং বিচার কার্য্য প্রভৃতি মুসলমান কাজিদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকিত। এই সকল কাজি সাধারণত পাণ্ডুয়ার আমেদারগণের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত হইত। প্রধান কাজির পদ পাণ্ডুয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার বংশপরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেন। সেই বংশের শেষ কাজির নাম—কাজি মহম্মদ মজ্‌হর।

এক্ষণে পাণ্ডুয়ার সে পূর্ব্ব গৌরব না থাকিলেও ইহা অন্যান্য অনেক পল্লী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানে একটী থানা এবং মিউনিসিপালিটী আছে। রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। এবং সম্প্রতি একটী ইংরাজি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

পাণ্ডুয়ার নিকটে অনেকগুলি ছোট ছোট গ্রাম।

মণ্ড—পাণ্ডুয়া হইতে চারি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহাও পূর্ব্বে এক হিন্দু নৃপতির রাজধানী ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পাণ্ডুয়ারাজের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধের সময় ইনি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখানকার প্রসিদ্ধ 'জীবৎ কুণ্ড' এখনও বর্ত্তমান এবং অধিবাসিগণ প্রাচীন জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ইহাকে এখনও অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকে। এখানে একটী শিবমন্দির আছে। এই শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়াই কিম্বদন্তী। শিবরাত্রি উপলক্ষে সেখানে বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়।

দ্বারবাসিনী—মণ্ড বা মহানাথ হইতে দুই ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রাম সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্তরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। দ্বারবাসিনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"মুসলমানেরা যখন বাংলা দেশ আক্রমণ করেন সেই সময়ে সদ্‌গোপ জাতীয় কতিপয়

হিন্দুনৃপতি দ্বারবাসিনীর অধিপতি ছিলেন। এই বংশীয় শেষ নৃপতি দ্বারপাল যখন রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে মাহম্মদ আলি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রথম যুদ্ধে হিন্দুরা জয়লাভ করে। কথিত আছে রাজবাটীর সন্নিকটেই যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বে ইহাকে 'জীবৎ কুণ্ড' বলিত। এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিলে শরীরের সমুদয় ক্ষত এবং আহত স্থান তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিত এবং আহত ব্যক্তি দ্বিগুণ বল লাভ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। একদিন সা জোকি নামক একটী মুসলমান স্নান করিবার কালে একখণ্ড গো মাংস গোপনে সেই কুণ্ড মধ্যে রাখিয়া আসে। গো মাংস স্পর্শে কুণ্ডর জল অপবিত্র হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব শক্তিও নষ্ট হয়। ইহার পর হইতে হিন্দুরা সে কুণ্ডে অবগাহন করিয়াও কোন সুফল লাভ করিত না। কাজেই দ্বিতীয় যুদ্ধে দ্বারপাল সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং রাজপ্রাসাদের মধ্যেই সপরিবারে চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষকে এখানকার অধিবাসীরা 'ধনপতি' বলিয়া পরিচয় দেয়।"

'জীবৎ কুণ্ড' পুষ্করিণীর এক্ষণে আর সে শ্রী নাই। জলও তেমন গভীর নহে; ক্রমশই তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণে আর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীটির নাম 'কামনা'। লোকের বিশ্বাস এই পুষ্করিণীতে কামনাস্নান করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। 'জীবৎ কুণ্ড'র পূর্ব্বপার্শ্বে সা জোকির কবর ভূমি। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পুষ্করিণী ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটী প্রসিদ্ধ পুষ্করিণী আছে, যথা—চন্দ্রকূপ,—পাপহরণ,— সাত সতীন * ইত্যাদি।

জনশ্রুতি আছে অনেক সময়ে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে এখানে বিস্তর ধনরত্ন এবং অনেক সময়ে প্রস্তরের বহু ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তর মূর্ত্তি এখনও পাওয়া যায়। দ্বারবাসিনীর অনেক স্থান এক্ষণে উত্তর পাড়ার জমিদার রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক অধিকৃত। প্রাচীন নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষগুলি দেখিলে স্বর্গীয় দীনবন্ধুর নীলদর্পণের কথা সহজেই মনে জাগিয়া উঠে।

পাণ্ডুয়ার ন্যায় দ্বারবাসিনীতেও ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট প্রকোপ আছে।

বৈঁচী পাণ্ডুয়ার অতি সন্নিকটে আর একটী ছোট গ্রাম। গ্রাম্য জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী জীবনসত্ব ভোগ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহা গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে। দাতব্য কার্য্যের সহায়তা কল্পে গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে বৈঁচীগ্রাম ট্রষ্ট সম্পত্তিরূপে রক্ষা করিতেছেন।

বৈঁচীতে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আছে। তাহার গাত্র-ফলক হইতে জানা যায় এই মন্দির ১৬০৪ শকাব্দীতে ইংরাজী ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! সে আজ

* দ্বারপালের সপ্ত স্ত্রীর নাম অনুসারে যে সাতটী পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল তাহাই সাত সতীন, নামে প্রসিদ্ধ।

কতযুগের কথা! কিন্তু কালের প্রভাবে তাহার শেষ চিহ্ন এখনো অন্তর্হিত হয় নাই ইহা অল্প আনন্দ ও গৌরবের কথা নহে।—

শ্রীগুরুদাস আদক।
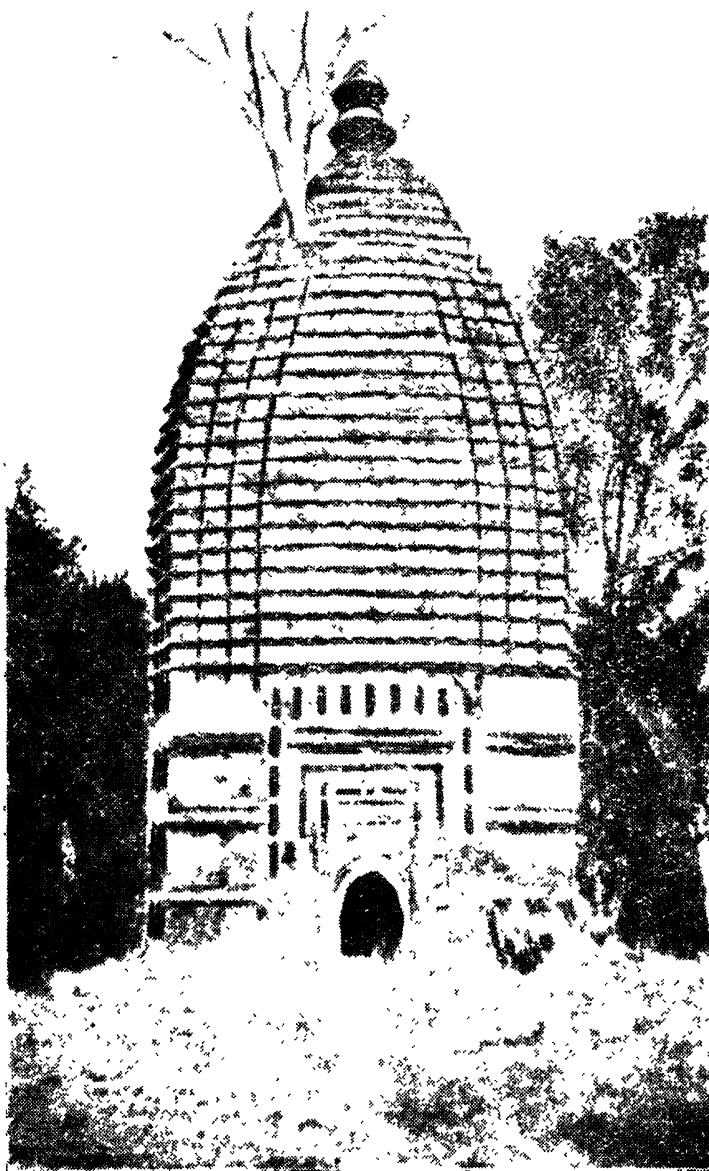
বৈঁচির মন্দির।

তৈমুর-লঙ্গ।

(মানুষী হইতে)

তৎক্ষণাৎ তাতার সৈন্যের ব্যূহ রচিত হইল। তৈমুর তাঁহার স্বল্প সৈন্য লইয়া অসংখ্য শত্রুসেনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এরূপ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা অল্প জানিয়া তৈমুর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন তাঁহার পশ্চাতে তিনি এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ রাখিলেন এবং তাঁহার প্রবেশপথে কতকগুলি সুদক্ষ তাতার সৈনিক রাখিয়া দিলেন। হিন্দুগণ আক্রমণ করিবামাত্র ভয়ের ভাণ করিয়া তাহারা পশ্চাতে পলায়ন আরম্ভ করিল। দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে তৈমুরের অশ্বারোহী সৈন্য নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইয়া নিকটস্থ এক পর্ব্বতের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। হিন্দুরা প্রবল বেগে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, এবং দ্বারপথে তাতারদিগকে পরাজিত করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিল। বিরাট হিন্দুবাহিনীর প্রায় অর্দ্ধভাগ গিরিপথের পরপারে উপস্থিত হইবামাত্র পলাতক শত্রুগণ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিদ্যুদ্বেগে হিন্দুদিগের উপর পড়িল। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণেই হিন্দুরা পরাজিত হইল। বিজয়ী তৈমুর সমগ্র হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হইলেন। রাণা নিরুপায় দেখিয়া বিজয়ী বীরের সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইলেন। স্বাধীন হিন্দুনরপতি তৈমুরকে বাৎসরিক কর দান করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান দুর্গে তৎকর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল। দিল্লী তখন পাঠানরাজের রাজধানী। তৈমুর তাঁহাকেও অব্যাহতি দিলেন না। সেখানেও এক তাতার শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই পরাজয়ের দিন হইতে হিন্দুরাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে আর আর কখনও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হন নাই, শত্রু আক্রমণ করিলে তাঁহারা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেন মাত্র। যাহা হউক বিজয়ী তৈমুর ভারতের অমূল্য ধনসম্পদ হরণ করিয়া অতুল গৌরবে সমরকন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এত শক্তিসম্পদ লাভ করিয়াও বৃদ্ধ তৈমুর সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার তাড়নে তিনি তখনও নূতন শক্তিবিস্তারে লোলুপ। যে বয়সে সাধারণ মনুষ্যের দেহমন অবসন্ন হইয়া আসে, সেই বয়সে তৈমুর যৌবনতেজে নূতন জয়-যাত্রায় সমরকন্দ ত্যাগ করিলেন। সুলতান বেন-এভিসের উপরই তাঁহার প্রথম রোষদৃষ্টি পড়িল। ইঁহাকে তৈমুর পূর্ব্বে পরাজিত করিয়া বগদাদ্ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিশরসুলতানের সাহায্যে তিনি পুনরায় স্বকীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি তৈমুরের পুত্র মিরজার রাজ্যভুক্ত পারস্য ইরাক্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৈমুর তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইলেন। সুলতান বেন-এভিস পারস্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নাটোলিয়া দেশে বাজায়েৎ নৃপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৈমুর ডামস্কাস্ অধিকার করিয়া বগদাদ্ লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার নামে লোকে এত ভয় পাইল যে তিনি যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন অমনি সেখানকার লোকেরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। যে মিশরসুলতান প্রথমে বেন-এভিসকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিই তৈমুরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইলেন এবং তৈমুরের মঙ্গলের জন্য তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক মসজিদে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

একমাত্র কেবল বাজায়েৎ আজিও দুরন্ত তাতারের দুর্দ্ধর্ষ শক্তির পরিচয় পান নাই, এবং সেইজন্য তিনি তাঁহাকে বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনিতেন না। কেবল তাহাই নহে, বাজায়েৎ তৈমুরের দুইজন মিত্ররাজার প্রতিও অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাজায়েৎও তৈমুর অপেক্ষা অল্প যশস্বী ছিলেন না। হাঙ্গেরির রাজা ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বীরগণকে বুলগেরিয়াতে পরাজিত করিয়া তিনি

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌ আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি সম্রাট ইমানুয়েলের নিকট হইতে উক্ত নগরের প্রান্তবর্ত্তী স্থান সমূহ লইয়া মুসলমানের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন এবং তথায় মসজিদ ও মুসলমান বিচারালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রুমের সুলতান অর্থাৎ গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি এই উপাধি গ্রহণ করিয়া মিশরের সুলতানকে তাহা স্বীকার করিতে পর্য্যন্ত বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তিনি তৈমুরের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাতারবীর আসিয়া-মধ্যে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেইজন্য তিনি খৃষ্টান রাজা ইমানুয়েলের পক্ষ লইয়া মুসলমান বাজায়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সমগ্র তাতার সৈন্য বাজায়েতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্রবেগে যুদ্ধযাত্রা করিল। সকলেই প্রচুর লুণ্ঠনের আশায় উৎফুল্ল, কেবল তৈমুর নীরবে চিন্তান্বিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেকে মনে করিল বার্দ্ধক্যের অবসাদ হেতু তিনি এরূপ বিষণ্ণ; আবার অনেকে মনে করিল বাজায়েতের ন্যায় বিজয়ী বীরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের আশা অল্প বলিয়াই তিনি এরূপ বিমর্ষ হইয়া আছেন। যোদ্ধ্‌ পরিবেষ্টিত তৈমুরকে এক সেনাপতি সাহস করিয়া তাঁহার এ বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন —"আমার চিন্তার যাহা কারণ তাহা দূর করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব,—আমি ভাবিতেছি আমার অনুচরগণের মধ্যে আমাদের নববিজিত সাম্রাজ্যের শাসনভার বহনক্ষম বাজায়েতের শূন্য সিংহাসনের উপযুক্ত কোন লোক আছে কি না।" এই আশাপূর্ণ উত্তরে তাতারগণের হৃদয়ে আবার সাহস আসিয়া দেখা দিল। তৈমুর প্রথমে কতকগুলি দূরবর্ত্তী নগর অধিকার করিয়া রাখিলেন, নচেৎ পরাজয় হইলে সসৈন্যে তাঁহার শত্রুমধ্যে আশ্রয়লাভ সম্ভব হইবে না। পম্পি (Pompy) যে রণক্ষেত্রে মাইথিডেটিসকে (Mithridates) পরাজিত করিয়াছিলেন, এই উভয় বীরের বিরাটবাহিনী সেই পুণ্যক্ষেত্রে মিলিত হইল।

তাতারেরা ধনুর্বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী, মুসলমানেরাও খড়্গ চালনায় সেইরূপ সুনিপুণ জানিয়া তৈমুর দূর হইতে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন, কারণ তাহাতেই তিনি শত্রু বিনাশ করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার নিজের সৈন্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তদনুসারে তিনি তাতারগণকে বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তীরের সাহায্যে শত্রুকে নষ্ট করিতে পারে এরূপ দূরে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, এবং শরনিক্ষেপের পরমমুহূর্ত্তেই যেন তাহারা পলায়ন করে এবং পুনশ্চ শরযোজনা সম্পন্ন হইলে যেন ফিরিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে। ফলে তাতারের প্রথম আক্রমণই অতি ভীষণ ও প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রণক্ষেত্র মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মুসলমানেরাও উন্মত্ততেজে মুক্ত অসি লইয়া তাতারগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল, যে কোন দল তাহাদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে পড়িল তাহাই তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন ও পরাস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বিজয়ী সৈন্যের প্রতি শরবৃষ্টি হইবা মাত্র, তাতারেরা পুনরায় তাহাদের ত্যক্তভূমি অধিকার করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের দুই অসাধারণ অধিনায়ক অপূর্ব্ব কৌশলে সৈন্যপরিচালনা করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিল, অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী তৈমুরের প্রতিই প্রসন্না হইলেন। বাজায়েতের সৈন্যমধ্যে কতকগুলি তাতার সৈনিক ছিল। তাহারা তাহাদের স্বদেশীয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বিশেষ অসন্তোষ বোধ করিতেছিল। এক্ষণে তাহাদের স্বজাতির সর্ব্বপ্রধান বীরের এরূপ পরাজয়ে গৌরবহানির ভয়ে তাহারা বাজায়েৎকে পরিত্যাগ করিয়া তৈমুরের পক্ষ লইল। জয়লাভের পক্ষে আর কোন দ্বিধা রহিল না; মুসলমান বাহিনী বহুধা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে তাতার অশ্বারোহীরা পলাতক

মুসলমানদিগকে খড়্গাঘাতে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তৈমুরের যোদ্ধারা পরাজিত শত্রুর বহুদূর অনুসরণ করিয়া চলিল। বাজায়েৎ ক্ষিপ্রগতি তাতার অশ্বারোহীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না কিছুদূর যাইয়াই তিনি বন্দী হইলেন। এই বিপদের মধ্যে পড়িয়া বাজায়েৎ তাতারবীরের দয়া ও মনুষ্যত্বের প্রথম পরিচয় লাভ করিলেন। বিজিত শত্রুর দুরবস্থা দেখিয়া তৈমুর কোনদিন হর্ষ প্রকাশ করেন নাই। প্রতিদিন তৈমুরের শিবিরের ঠিক পার্শ্বেই বেজায়েতের জন্য এক শিবির স্থাপিত হইত, তথায় উভয়ে একত্রে আহার ও আলাপ করিতেন। বাজায়েতের সহিত তৈমুর অতিশয় সম্মানের সহিতই ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার মনস্তুষ্টির যথাসম্ভব আয়োজনের ত্রুটি করিতেন না। শুনা যায় প্রথমে তৈমুর নাকি বাজায়েৎকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গ্রীকগণ তাঁহার দুর্দ্দশার চিত্র অতিরঞ্জিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই কথার সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুসলমান ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় ধিক্কার বশতঃই হউক, বা বিজয়ী শত্রুর নিকট অপমানিত হইবার আশঙ্কাতেই হউক, বাজায়েৎ বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তৈমুরেরও মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিবরণ মুসলমান ইতিহাসের বিবরণ হইতে স্বতন্ত্র। কোন্‌টা ঠিক স্থির করিয়া বলা কঠিন। মুসলমানেরা বলেন তৈমুর চীনরাজ্য আক্রমণ কালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এ কথা সত্য নহে। আসমুদ্র ভারতবর্ষ অধিকার করিবার উদ্দেশে তিনি যখন ভারতে প্রবেশের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কাবুলে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে তাতারগণের মধ্যে দুই সৈন্যদলের মধ্যে যে ভীষণ প্রাণান্তকর যুদ্ধক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তৈমুর তাহা বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন, এমন কি এই অপরাধের জন্য তিনি প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল; এই যুদ্ধ ক্রীড়ার তাঁহার যে সৈন্যক্ষয় হইত রোগে বা শত্রুর সহিত সংগ্রামে তাঁহার সেরূপ সৈন্যক্ষয় হইত না। এই নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার তৃতীয় পুত্র মিরজা তাঁহার পিতা ও সেনাপতির আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া একদল তাতার সৈন্য লইয়া অপর একদল সৈন্যের সহিত এরূপ ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত হন, যে উভয় পক্ষেই মুষ্টিমেয় সৈনিক মাত্র জীবিত ছিল। এই অবাধ্যতায় তৈমুর ক্রোধান্বিত হইয়া দুই দুইবার তিনি তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া দুইবারই তাহা রহিত করেন। শাসন কর্ত্তার কর্ত্তব্যবোধ ও সন্তানস্নেহ এই উভয় প্রবল ভাবের তাড়নাতে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া তুলে। বার্দ্ধক্য, মনস্তাপ, উদ্বেগ, ও দেশের উত্তাপে তাঁহার রোগ কঠিন আকার ধারণ করে। মোগল ইতিহাসের মতে তৈমুর ছয় বৎসর নয় মাস বাইশ দিন রাজত্ব করিয়া, হিজরা ৮০৬ সালের অর্থাৎ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ কাবুলেই সমাধিস্থ হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে।

(সমাপ্ত)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বন্দী।

৪০

মেরি! গোলাপের মত রঙ, আঙুরের মত তার ঠোঁট-দুটি—সুন্দরী মেরি!

কালো পোষাকটিতে কি সুন্দর তাহাকে মানাইয়াছিল! আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম,—তার গালে কপালে অজস্র চুমা দিলাম!

তার মা-ও কেন আসিল না? তার অসুখ!

আমার পানে কি বিস্ময়ের সহিত সে চাহিয়াছিল! চোখে একটা কেমন যেন ভাব! যেন একটা কাতরতার লক্ষণ! মাঝে মাঝে সে শুধু ঘরের কোণে তার ধাত্রীর পানে চাহিতেছিল—ধাত্রী কাঁদিতেছিল।

মেরির গালে চুমা দিয়া তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধস্বরে আমি ডাকিলাম,—"মেরি, মেরি আমার!"

মেরি আমাকে মৃদুভাবে ঠেলিয়া মুখ সরাইয়া লইল! কহিল, "আঃ—ছাড়ুন আপনি আমাকে!"

'আপনি!' প্রায় এক বৎসর পরে সাক্ষাৎ! এই এক বৎসরে সে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে! আমার কথা, আমার মুখ, আমার আদর আজ মনের মধ্যে কোথায় সব মিলাইয়া গিয়াছে! তারই বা অপরাধ কি?

আমার এই দীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে জটার মত কেশের ভার, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কয়েদীর পোষাক, রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠস্বর—কি করিয়া সে চিনিতে পারিবে?

একমাত্র যে আমাকে মনে রাখিবে বলিয়া হৃদয়ে সান্ত্বনা ও সুখ ভোগ করিতেছিলাম আজ সে,—সে-ই আমাকে ভুলিয়া বসিয়াছে—চিনিতেও পারে না! হা ভগবান!

আজ আমি তার 'বাবা' নহি! নিজের কন্যার মুখে পিতৃসম্বোধন, কচি ফুলের পাপড়ির মত তার হাসিমাখা মুখে সেই মধুর সম্বোধন, "বাবা"! হায়, আজ আমি তাহা হইতেও বঞ্চিত! কি এ দারুণ অভিশাপ!

এ সময়, জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে, একবার, শুধু একবার ঐ একটি সম্বোধনের পরিবর্ত্তে আমার কন্যার মুখের ঐ একটি আহ্বান মুহূর্ত্তের জন্য শুনিতে পারিলে, চল্লিশ বৎসরের এই সুদীর্ঘ জীবন আমি হাস্যমুখে দান করিতে পারিতাম!

"মেরি"—তার দুটি হাত মুঠার মধ্যে পুরিয়া আমি ডাকিলাম, "মেরি, মা আমার—আমাকে চিনতে পাচ্ছ না?"

সে তার উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু আমার পানে ফিরাইয়া, ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, "না!"

আমি কহিলাম, "দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ—কে আমি?"

সে কহিল, "আপনি—আপনি একজন ভদ্রলোক!" কি অম্লান তার কণ্ঠস্বর!

হায়—জগতের যে একটি প্রাণীর প্রতি সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছি, যার একটা কথা, একটু হাসির জন্য সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পারি, তার মুখে আজ এই কথা, তার চক্ষুতে আজ এই দৃষ্টি! কি বিড়ম্বিত এ জীবন!

আমি কহিলাম, "মেরি,—তোমার বাবা আছে?"

সে কহিল, "আছেন!"

আমি কহিলাম, "কোথায় সে?"

মেরি আমার পানে চাহিয়া বলিল, "তিনি বলুন!"

হা রে কন্যা আমার! হা রে দীর্ণ পিতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। আমি কহিলাম, "কোথায় তিনি?"

মেরির চক্ষে নিমেষে একটা ম্লানিমা লক্ষ্য করিলাম—মেরি কহিল, "তিনি স্বর্গে!"

আমি কহিলাম, "স্বর্গে? মেরি, জানো, এ স্বর্গ কোথায়? এ স্বর্গের মানে কি?"

মেরির চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে শুধু ঘাড় নাড়িল! আমি মেরির মুখে চুমা দিলাম।

আমি কহিলাম, "মেরি একবার ভগবানকে ডাক।"

সে কহিল, "না মশায়,—দিনে দুপুরে বিনা কাজে তাঁকে ডাকতে নেই—সকালে সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকতে হয়! সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে আমি প্রার্থনা করব।"

আমার সারা চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছিল! এ কন্যা—এই মেরি—আমারি, আমারি সে বুকের ধন—হায়, তবু সে আমার নয়—আমি আজ কত দূরে চলিয়া গিয়াছি! না, না, যেমন করিয়া পারি, তাকে বুঝাইব, আমি—তার সেই "বাবা!" স্বর্গে নয়, নরকে নয়, মর্ত্ত্যে—এই জেলের মধ্যে ফাঁসির জন্য প্রস্তত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি!

আমি কহিলাম, "মেরি, তুমি চিনতে পাচ্ছনা, আমিই তোমার বাবা।"

ভর্ৎসনার স্বরে সে কহিল, "মশায়—"

আমি কহিলাম, "কেন মাণিক, আমাকে চিনতে পাচ্ছনা! দেখ, চেয়ে, দেখ,—সেই তোমাদের গোলাপগাছগুলার ধারে চাতালে বসে তোমাকে গল্প বলতুম—কত পরীর গল্প, রাজার গল্প—"

মেরির ছোট মুখখানি আমি বুকে চাপিয়া ধরিলাম!

মেরি কহিল, "আঃ, ছাড়ুন, লাগে!"

তখন তাহাকে আমার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমি বলিলাম, "তুমি পড়তে জানো?"

"জানি!"

আমি একখানা খবরের কাগজ টানিয়া একটা জায়গা তার সম্মুখে ধরিলাম, সে পড়িতে লাগিল, "প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী—"

হঠাৎ সবলে আমি কাগজখানা টানিয়া লইলাম—কাগজখানা তার ধাত্রী কিনিয়াছিল—কাগজওয়ালারা খুব বড় বড় অক্ষরে আমার নামের জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়াছে। ফাঁসির তামাসা দেখিবার জন্য লক্ষ দর্শককে সমারোহের সহিত বিজ্ঞাপন দিয়াছে!

আমার মনের ভাব অক্ষরে বুঝাইবার নয়! আমার সে রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া মেরি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল! সে বলিল, "দাও, আমার কাগজ দাও! আমি খেলা করব!"

ধাত্রীর হাতে কাগজ দিয়া আমি কহিলাম, "একে নিয়ে যাও—আর বাড়ীতে বলো—" মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! কি বলিব—জানি না! তার পর জানালার ধারে চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম—চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলাম—মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ করিয়া রক্তের স্রোত ছুটিয়াছে!

কোথায় তারা—যমালয়ের দুরন্ত দূতগুলা! আসুক তারা—আর কি! জগতে আমার কেহ নাই, কিছু নাই, জীবনে আমার স্পৃহা নাই! যে শৃঙ্খলটি দ্বারা ইহলোকের সহিত বদ্ধ ছিলাম—আজ সে শৃঙ্খলও ছিন্ন হইয়াছে—তবে আর কেন,—আর কেন—?

৪১

আচার্য্যের হৃদয়ে করুণা আছে, কারাধ্যক্ষের প্রাণটাও পাষাণে গঠিত নয়! ধাত্রী যখন মেরিকে লইয়া গেল, তখন তাদেরও চোখে জল আসিয়াছিল!

শেষ! এখন সব শেষ! শুধু সাহস, বল,—মৃত্যু! পথে বিপুল জনতা, ফাঁসিকাঠের

নিকট অগ্রসর হওয়া—তার পর, কোথায় জগৎ, কোথায়ই বা আমি!

৪২

কেহ হাসিবে, কেহ আনন্দে করতালি দিবে, কেহ বা চীৎকার করিবে! অথচ ইহাদেরি মধ্যে কত লোক—অদূর ভবিষ্যতে আমারি পথের পথিক হইবে! আমার জন্য আজ যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়া দল বাড়াইয়াছে, একদিন আবার তাহাদেরি মধ্যে কত লোক, নিজেদের প্রয়োজনেই এখানে আসিবে!

৪৩

মেরি! মাণিক আমার! ধাত্রী তাহাকে লইয়া গিয়াছে! গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া সে এই বিপুল জনতা নিশ্চয় লক্ষ্য করিবে, ভাবিবে, দেশে আজ কি এক প্রকাণ্ড তামাসার আয়োজন হইয়াছে! কিন্তু এই "ভদ্রলোকটির" কথা তার তখন মনেও থাকিবে না—অথচ এই 'ভদ্রলোক'কে দেখিবার জন্যই আজ এত লোক আসিয়াছে এবং সেই ভদ্রলোক আর কেহই নহে, তারই স্বর্গগত "বাবা!"

তার জন্য কয় ছত্র লিখিয়া যাই—একদিন সে পড়িয়া বুঝিবে! এবং পনেরো বৎসর পরে সে আজিকার দিনের এই মুহূর্ত্তটির কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়া যাইবে!

হাঁ! আমার সমস্ত কাহিনী আমি তাহার জন্য লিখিয়া যাইতে চাহি! সমস্ত কথা অকপটে বলিয়া যাইব—আমার সমগ্র ইতিহাস—কেন আজ দেশের বুকে রক্তের অক্ষরে আমার নাম চিরকালের জন্য লিখিত রহিল! সেই কাহিনী টুকু এই কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে লিখিয়া ফেলি!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মেন্তু।

১

"ভুবনে অতুল তুমি!—একি অপরূপ!
কোথা পেলে কুহকিনি! এ মোহন রূপ?
ধরারে করে গো ধন্যা তোমার ও রূপ-বন্যা,
শোকহরা উষার আলোক;
তোমার চরণ স্পর্শে, মুঞ্জরি উঠে গো হর্ষে
অরি-তরু, অরুণ অশোক!
আমি গো বকুলতরু, কাঁপিতেছি দুরু দুরু
তোমার ও মুখখানি চুমে;—
অধরে কি করে বাস, বারমাস মধুমাস?
ছেয়ে দিলে কুসুমে কুসুমে!"—
এই চারু সম্বোধনে, সে রূপসী নারী-ধনে
তুষিতেছিলাম সঙ্গোপনে:
হেনকালে থর থর্, রোষে তনু থর্ থর,
স্ত্রী আমার, গজেন্দ্রগমনে,
আসিয়া রাগিয়া কহে—"এতো প্রাণে নাহি সহে!
চিরদিন জ্বালাইয়ে হাড়।
এত যে হয়েছ বুড়া, তবুও রসিক-চূড়া!
অবাক!—যুবক মানে হার!"—
শুনি কথা, অপরাধী মোরা দুইজনে,
হাসি মৃদু, থাকি বসে' আনত বদনে!

২

"কাড়িয়া লয়েছ তুমি বিশ্বের সৌন্দর্য্য!
গরবিনি! একি তব রূপের ঐশ্বর্য্য!
একি লাবণ্যের সৃষ্টি!— এহেন চঞ্চল দৃষ্টি
নাই নাই, হরিণ-নয়নে!

হেরি তব কেশগুচ্ছ, প্রসারিত শিখী পুচ্ছ
নৃত্যলীলা ভোলে অভিমানে।
লাজে হয় হীনবর্ণ চম্পক-অতসী স্বর্ণ
চাহি তব চন্দ্রানন পানে!
বিম্বাধরে একি হাসি! দন্তকুন্দ পরকাশি,
কি সুধা ঢালিছ মোর প্রাণে!"—
এত বলি, বসি চুপে, বিমুগ্ধ সুন্দরী-রূপে,
মুখ তার হেরি বার বার!
হেনকালে পেয়ে সাড়া, ক্রুদ্ধা পাগলিনী পারা
স্ত্রী আমার হয় আগুসার।
ঘন ঘন হাত নাড়ি, আকাশ উপাড়ি পাড়ি,
কত কহে ঘূর্ণিত-লোচনা!
লোলজিহ্বা, অসিকরা, ত্রিনয়নী ভয়ঙ্করা,
কালী যেন করালবদনা!
হেরি সেই দাবাগ্নির দাউ দাউ শিখা,
স্তব্ধ হই মোরা দুই নায়ক-নায়িকা!

৩

"তব স্পর্শে পুলকে ধরণী হোলো সারা!
ঊর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, কোথা লাগে তারা!
তুমি মম সুখ স্বপ্ন, ভব জলধির রত্ন;
জনম জনমে তব ধ্যানে,
দিবানিশি অবিরত, করেছি তপস্যা কত;
তুমি এলে বিধির বিধানে!
আহা কিবা মনোহরা, তোমার ও ভুরু জোড়া,
অনুচর যেন দুটি ধনু!
নেত্র-তূণ মনোহর করিয়াছে জর জর,
আমার এ বাণবিদ্ধ তনু!"—
এত বলি, অতঃপর, হই আমি অগ্রসর,
অধর-অমৃত-পান হেতু,
কোথা হ'তে আচম্বিত, আসি তথা উপস্থিত
স্ত্রী আমার, কাল-ধূমকেতু!
"ও যেন যুবতী বালা, পাইতে চিকণকালা,
আকুল ব্যাকুল ওর চিত;
কিন্তু তুমি এত বুড়া, তবু চাও প্রেমচূড়া!
স্বভাবের একি বিপরীত!"—
শুনি কথা, আপনারে মানি অতি তুচ্ছ;—
আমি যেন দাঁড়কাক, পরি শিখীপুচ্ছ!

৪

"তিল ফুল জিনি নাসা, মরি কি সুন্দর;
দোদুল দুলিছে তাহে সোনার বেসর!
শ্রাবণে সুনীল চুল, চারু ঝুমুকার ফুল
ধরা যেন পরিয়াছে কানে!
নেত্রে জাগে কি পিয়াস, কিছুতে মিটেনা আশ,
চাহি ধনি তব মুখপানে!
কিছুদিন, হেথা থাকি, তুমি যাবে, চক্রবাকি,
আন্ দেশে করিবে প্রয়াণ,
কেমনে ধৈরজ ধরি, পোহাইবে বিভাবরী,
আমার এ চক্রবাক-প্রাণ?"
এতবলি, ছল্ ছল্ নেত্রে বহে অশ্রুজল!—
কোথা হ'তে আসি মোর প্রিয়া,
গালভরা শুভ্র হাসি, আচম্বিতে লয় আসি,
সুন্দরীরে ক্রোড়েতে তুলিয়া!
"ছয় বছরের কন্যা, রূপে গুণে তুই ধন্যা
স্নেহময়ী মোদের নাতিনী,
বহু পুণ্যপুঞ্জফলে, বহু তপস্যার বলে,
পাইয়াছি এ হেন সতিনী!"
শুনি কথা মেস্ত দেয় ঘন করতালি;
সে গো মোর ব্রজরাণী, আমি বনমালী।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

জ্ঞান ও কর্ম্ম।*

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা, প্রথম অভ্যুদয়কালে এদেশবাসীর মধ্যে এক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। তখন অন্ধ অনুকরণের প্রবল উচ্ছ্বাসে দেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের অবস্থায় প্রথম এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ক্রমশঃ এভাবের বন্যা চলিয়া যায় কিন্তু একটি সন্দেহের আবর্ত্ত তাহার স্থান অধিকার করে। জাতির পক্ষে সে বড় দুর্দ্দিন! পুরাতন রীতিনীতি, পুরাতন আচার ব্যবহার, পুরাতন ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণভাবে রাখা অসম্ভব, অথচ নূতনের সমাবেশ করা বড় সহজ নয়! এই সঙ্কটের সময় সময়োচিত সংস্কার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান ও জাতীয় জীবন উন্নত করিবার জন্য স্বতঃই চেষ্টা জাগিয়া উঠে। এই সংস্কার কার্য্য অদ্যাপিও চলিতেছে এখনও হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তিত আকারে গঠিত হইয়া উঠে নাই। আরও কতকাল লাগিবে তাহা বলা যায় না। এই সময়ে চিন্তাশীল লেখকের পুস্তক সমাজের হিতের জন্য বিশেষ উপযোগী। এইজন্য মনস্বী শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক গ্রন্থখানির আমাদের নিকট বিশেষ সমাদর।

মনুষ্যত্ব বিকাশই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। যে গ্রন্থ যে পরিমাণে উহার সহায়তা করিবে, সেই পরিমাণে সে গ্রন্থের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে। এ হিসাবেও এ গ্রন্থখানি মূল্যবান। এস্থানে আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করি। অনেকে উপদেশ দিয়া থাকেন এবং অনেকে গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু সকলের কথা সমান ফলপ্রসূ হয় না। The Deserted Village নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় গ্রাম্য পাদ্রির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত বাণী যেন দ্বিগুণ প্রভাব লাভ করিত। এ কথা কেবল ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। আজন্মনির্ম্মলস্বভাব, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের যে মহতী বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার যে একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই পুস্তকের বিষয়ালোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। বিষয়টা গভীর দার্শনিক এবং জটিল সামাজিক সমস্যাপূর্ণ কিন্তু ভাষা স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ও লঘুগতি নদীর ন্যায় অবাধে চলিয়াছে। কোথাও আবিলতা বা অস্পষ্টতার লেশ নাই। সর্ব্বত্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তিতর্কের অনুসারী। বাহুল্য বর্ণনায় গ্রন্থের কোন অংশই গুরু-ভারাক্রান্ত হয় নাই।

সমুদয় গ্রন্থখানি প্রায় তুল্যাংশে দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথমভাগে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, অন্তর্জ্জগৎ, বহির্জ্জগৎ জ্ঞানের সীমা, জ্ঞান-

* জ্ঞান ও কর্ম্ম। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এস, কে লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

লাভের উপায়, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এই সাতটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, কর্ত্তব্যলক্ষণ, পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, কর্ম্মের এই সাতটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। যুগ-যুগান্ত হইতে যে সকল প্রশ্ন মানবের চিত্তে গভীরভাবের উদ্বোধন করে, তরঙ্গ তুলে, বহু-

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাস্ত্রকার ও দার্শনিক পণ্ডিত যাহাদের মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আত্মজ্ঞান, অভিব্যক্তিবাদ, কার্য্যকারণ. প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, অদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তবাদ, জগতের শুভাশুভ প্রভৃতি অনেক দার্শনিক সমস্যা গুরুদাস বাবু কেবল আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আপনার স্বাভাবিক মনীষা বলে, সে সকলের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব শুনিলেই অনেকে ভয় পাইয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। স্বীকার করি দার্শনিক প্রসঙ্গ স্বভাবতঃ নীরস এবং অনেক সময় তাহার আলোচনায় নীরসতা বাড়িয়া উঠে এবং আলোচ্য বিষয় অধিকতর দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে! কিন্তু সে দোষ কাহার? বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝিতে না পারিলে সে বিষয়ে তাহার আলোচনা বিকলাঙ্গ এবং দীর্ঘ দীর্ঘ 'কোটেশন' আপনার বক্তব্যের অভাব পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

আলোচনা দ্বিবিধ এক মূল কারণানুসন্ধান, আর ব্যবহারিক কার্য্যে তাহার প্রয়োগ নিরূপণ। গুরুদাস বাবু উভয় ভাবেই 'জ্ঞান ও কর্ম্মের' আলোচনা করিয়াছেন। এ গ্রন্থে, একদিকে যেমন বুধমণ্ডলী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্র বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্যজাল কিরূপে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় বিমূঢ় হইবেন অন্যদিকে সাধারণ পাঠক জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং কর্ম্মে বলিষ্ঠ হইবার উপযোগী চরিত্রগঠনের অনেক উপাদান পাইবেন। সরসতা বিধানের জন্য ইহাতে মধ্যে মধ্যে মনোহর গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে লর্ড কর্জ্জনের শাসনধীনে ছাত্রনিবাস সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সে সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর অভিমত জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, তজ্জন্য আমরা নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যে সকল ছাত্র দূর হইতে আইসে ও যাহাদের কোন অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদের থাকিবার জন্য বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ছাত্রনিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক একত্রে অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্রবাস সুশৃঙ্খলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার এবং তত্ত্বাবধানের একটু ত্রুটি হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। স্বজনবর্গের মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির যেরূপ বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাতন্ত্র্য ও সংসারের সর্ব্বদিকে দেখাশুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহা না। সুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মানুষের মত চলিতে শিখে কি না সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, এবং তত্ত্বাবধারণের বিশেষ সুযোগ না থাকিলে ছাত্রনিবাসে থাকা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্ব্বদা সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্র নিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে

গুরুগৃহে বাসের ন্যায় ফলপ্রদ। এ কথা ঠিক নহে। কারণ প্রথমতঃ ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থান করেন না, এবং নিজের বা গুরুর স্বজন পরিবৃত থাকিয়া ছাত্র যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহা হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ পুবাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি উপহার দিত ও স্নেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও স্নেহ এই দুই মাত্র আদান প্রদানের সামগ্রী ছিল এবং এ দুয়েব বিনিময়ই এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান কবিত। বর্ত্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্যাদি পায় ও বুঝিয়া লয় বা লইবাব চেষ্টা কবে। এই অর্থ ও দ্রব্যের আদান প্রদান মূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্নেহেব সম্ভূত সম্বন্ধের সহিত কোনমতে তুলনীয় হইতে পারে না।

যে স্থলে মতভেদ, সে স্থলে গুরুদাসবাবু নিজের স্বাধীনমত জ্ঞাপন করিতে কখন কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বীরের ন্যায় অগ্রসর হইয়াছেন কখন পশ্চাৎপদ হন নাই।

যে দুইটী সামাজিক বিষয়ে মৃতপ্রায় হিন্দু-সমাজকেও বিচলিত করিয়াছে পারিবারিক "নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম" পরিচ্ছদে গুরুদাসবাবু কিছু বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সে দুইটী বিষয়—

১। অল্প বয়সে বিবাহ।

২। বিধবা বিবাহ।

আজকাল এই দুইটী বিষয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ, সভাসমিতিহইতেছে। এক পক্ষে প্রাচ্যভাবেনিমজ্জিত রক্ষণশীলতা অপর পক্ষে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা—এতদুভয়ের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ইহার ফলাফল জানিবার জন্য যখন সর্ব্ব চিত্ত অধীবভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন গুরুদাসবাবু কিরূপে এই দুইটী জটিল প্রশ্নের সমাধান করিলেন, তাহা অবগত হইতে কাহার না বিশেষ ইচ্ছা হইবে? যদিও এ সকল বিষয়ে মতবিভেদ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যেরূপ ধীরতার সহিত ও গভীর ভাবে গুরুদাস-বাবু ইহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং যেরূপ যুক্তি তর্ক অবলম্বনে আপনার প্রতিপাদ্য স্থির করিয়াছেন, তাহার কেবলমাত্র উল্লেখ করিলাম; সম্যক্ পরিচয় পুস্তকে পাইবেন।

এই সকল স্থানে আমাদের মনে হয় তিনি যেন বিচারপতির আসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে উভয় পক্ষের বক্তব্য অবহিত হইয়া শুনিয়া, অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তিগুলি একে একে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এ কথা যেন কেহ মনে না করেন, যে প্রাচীন প্রথা হইলেই তিনি তাহার সমর্থন করিবেন কিম্বা অবিকৃতভাবে রাখিবার পরামর্শ দিবেন। সহসা কোন প্রাচীন প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করা বিগর্হিত এই মতের তিনি পক্ষপাতী। ইহাতে তাঁহাকে রক্ষণশীল বলিতে হয় বলুন, এ হিসাবে মহামতি এড্‌মণ্ড বাকও রক্ষণশীল। তিনি একস্থানে যথার্থই বলিয়াছেন যে সংস্কারকদিগের পক্ষে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে চলা আবশ্যক। গতির বেগ বৃদ্ধির সহিত গতির দিক স্থির রাখিতে হইবে। এ পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে সর্ব্বত্রই একটি শান্ত সংযতভাব বিরাজ করিতেছে। এমন উদারতার সহিত প্রতি-

পক্ষের মতের আলোচনা একান্ত দুর্লভ! এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি গ্রন্থের সর্ব্বত্র সকলের মতের ঐক্য হউক না হউক কাহারও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না!

এ পুস্তক পড়িয়া মন উন্নত হয় প্রাচীন আদর্শের প্রতি সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠে এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও গতি লক্ষ্যাভিমুখে সহজে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

হাইকোর্টের বিচারপতির আসন হইতে অবসর লাভ করিয়া দেশের কল্যাণকামনায় গুরুদাসবাবু বঙ্গের প্রতিগৃহে যে অমৃত বিতরণের জন্য সোৎসুক, আশা করি এ সুধার আস্বাদ হইতে যেন কেহ না বঞ্চিত হন। তিনি তাঁহার শান্তিময় বিরাম-অবসরে পরিণত চিন্তার সুমধুর ফল দেশবাসীকে মধ্যে মধ্যে উপহার দিয়া কৃতার্থ করুন, ভগবৎ-সমীপে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

পরিশেষে একটি বক্তব্য আছে। আমাদের এই দরিদ্র দেশে এই প্রয়োজনীয় পুস্তক খানির একটি সুলভ সংস্করণ হওয়া অত্যাবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে ইহা সহজেই সাধারণের করায়ত্ত হইতে পারিবে।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়।

জাপানের সংবাদপত্র।

জাপানে সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তন বেশী দিনের কথা নহে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কিশিদা নামক জনৈক জাপানী একজন ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম এক পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করেন। তাহার পর হইতে দেখিতে দেখিতে জাপানে সংবাদপত্রের প্রচলন এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তেমন দেখা যায় না। জনসাধারণ সকলেই শিক্ষিত এবং সকলেরই জ্ঞান তৃষ্ণা এতদূর প্রবল যে উঁহাদের বিশ্বাস যে দৈনিক সংবাদপত্র না পড়িয়া কোন ব্যক্তি জীবনাতিবাহিত করিতে পারে না। মুটে মজুরের বাড়ীতেও অন্ততঃ একখানা দৈনিক পত্র আসিয়া থাকে। আমাদের একটী চাকরকেও দৈনিক পত্রিকা রাখিতে দেখিয়াছি। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে বাহির হইবার পূর্ব্বে মোটামুটি দিনের নূতন খবরগুলি দেখিয়া লয়। অবসর না থাকিলে গাড়ী কিম্বা ট্রামে উঠিয়া অথবা রাস্তায় চলিবার বেলায় দেখিয়া লয়। অবসর মত গাড়োয়ানগুলিও (রিকশাওয়ালা) তাহাদের গাড়ীর উপর বসিয়া সংবাদপত্র পাঠে ব্যস্ত। দোকানে ছেলে মেয়ে যাহারা দোকান রক্ষার ভার লইয়া বসিয়া থাকে, দৈনিক সংবাদপত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করা তাহাদের একটী প্রধান কায। কোন কোন দোকানে ৫০।৬০ বছরের বৃদ্ধাকেও চশমা পরিয়া সংবাদপত্রপাঠে ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি। বড় বড় দোকানে গেলে দোকানদার গ্রাহকের হাতে সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতে দিয়া ৫।৭ মিনিটের মধ্যে গ্রাহকের অভীষ্ট জিনিস খুঁজিয়া আনিয়া দেয়। নাপিতের দোকানে কিম্বা টিফিন ঘরে গিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বৃথা সময় অতিবাহিত না হয় এজন্য আগন্তুকের সুবিধার

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া টেবিলের উপর নানারকম দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক পত্রিকা রাখিয়া দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য রেল ষ্টেশনে ত পত্রিকা আছেই। বড় বড় ষ্টেশনে আরোহীদের সুবিধার জন্য জাপানী পত্রিকার সহিত দুই একখানা দৈনিক ইংরাজী পত্রিকাও থাকে।

আমাদের দেশে কোন গ্রাম্য সহরে একখানা দৈনিকপত্র চলিতে দেখা যায় না। অথচ জাপানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গ্রামে সুন্দরভাবে দৈনিকপত্র চলিতেছে। জাপানের উত্তর প্রদেশে ইয়োছো বা হোক্কাইকো দ্বীপ। ঐ স্থান শীতপ্রধান। বছরে ৫।৬ মাস প্রায় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। মধ্যযুগে ঐ দ্বীপে জাপানের অসভ্য পরাজিত আইনুজাতি বাস করিত। এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুসভ্য ভদ্রলোকও তথায় গিয়া বসতি বিস্তার করিতেছেন। ঐ দ্বীপে লোকসংখ্যায় যে সহরটি তৃতীয় তথায় আমি প্রায় এক বৎসরকাল অবস্থান করি। তথাকার লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার। আমি তথায় গিয়াই আমার জনৈক সহাধ্যায়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তথায় কোন দৈনিক খবরের কাগজ আছে কিনা। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন এ দ্বীপও জাপানের অন্তর্গত—কাজেই এখানেও জাপানী সভ্যতা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান। যদিও এ দ্বীপের লোকসংখ্যা বিশেষতঃ শিক্ষিত ভদ্রের সংখ্যা তুলনায় কম তথাপি এই সহরে ছয়খানা দৈনিকপত্র আছে। এবং বিশ মাইল দূরবর্ত্তী দ্বীপের দ্বিতীয় সহর ও তরু নামক স্থানে ইহার চেয়ে বেশী সংখ্যক দৈনিক খবরের কাগজ প্রচলিত। তিনি আরো বলিলেন যে এমন কি এই দ্বীপেরই কয়েকটী বড় গ্রামে দৈনিকপত্র ছাপা হয়।

রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় হইতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা জাপানে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সঠিক সংখ্যা অবগত হইতে পারি নাই। তবে তৎপূর্ব্বের পাঁচ বৎসরের তালিকা আলোচনা করিলেই অনেকটা ধারণা হইতে পারে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৮২৯ খানা। কিন্তু পাঁচবৎসরে অর্থাৎ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ১৪৯৯ খানায় দাঁড়ায়। আমার মনে হয় এখন হয়ত ঐ সংখ্যা অন্ততঃ দুই হাজারে পরিণত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে জাপানের সংবাদপত্রের সংখ্যা চারি হাজার বলিয়া উল্লেখ করে। বোধহয় শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক মাসিক, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট বা বিবরণীকে সংবাদপত্রের তালিকা-ভুক্ত করিলে চারিহাজারের ন্যূন হইবে না।

জাপানের অধিকাংশ বড় বড় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে সম্পাদক খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছি যে কোম্পানীর প্রত্যেক অংশীদারই তাঁহাদের কাগজের সম্পাদক। "জিজি" নামক পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চাশজনের কম নহে।

মফস্বলস্থ সহরে এজেন্টের দ্বারা কাগজ বিলি করা হয়। অনেক কাগজ শুধু পুরুষের দ্বারা, কতক স্ত্রীপুরুষ উভয়ের দ্বারাই এবং কতক শুধু স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। অধিকাংশ স্কুল কলেজ এবং প্রত্যেক সমিতি হইতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক

কিম্বা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পত্রিকায় ছেলেমেয়েদের এবং সাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সামান্য সামান্য ব্যবসায়ীদেরও মাসিক পত্রিকা দেখিয়াছি। যথা ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, চামার, দরজি প্রভৃতি। উহাতে উহাদের ব্যবসাবিষয়ক বিবরণ এবং উন্নতির পন্থাদি বিবৃত হইয়া থাকে।

শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া অধিকাংশ কাগজেরই বেশ কাটতি। ব্যবসা বাণিজ্যে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে কাজেই বিজ্ঞাপনেরও অভাব নাই। ইত্যাদি কারণে কাগজ দামেও সুলভ। বিখ্যাত দৈনিক-গুলির মূল্যই পাঁচ আনা হইতে স-ছয় আনা পর্য্যন্ত। জাপানী ভাষায় জিজি, কোকুমিন, মাইনিচি, মিয়াকো, হোচি, চুয়ো, নিপ্পন, দেম্পো, নিরোকু, আছাহি, চুগাঁই, শোগিও, ইমোমিটরি, এবং ইয়োরোজু প্রভৃতি কয়েকখানা দৈনিকই তোকিও সহরের প্রধান পত্রিকা। জাপান টাইম্‌স্‌ নামক একখানা দৈনিক জাপানীদের দ্বারা ইংরাজিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইংরাজী ছাড়া জার্ম্মাণ, ফরাসী এবং রুষভাষার পত্রিকাও জাপানে রহিয়াছে। ইংরাজ, জার্ম্মাণ, মার্কিণ এবং রুষগণও তথায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। বৈদেশিক দ্বারা ইংরাজীতে জাপান য়্যাড্‌ভার্টাইজার, জাপান ক্রণিকল্‌, জাপান গেজেট, জাপান হেরাল্ড, জাপান মেল কোবে হেরাল্ড, নাগাসাকি প্রেস প্রভৃতি কয়েকখানা উল্লেখ যোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত থাকে।

ইংরাজী পত্রিকার কাটতি কম। প্রবাসী বৈদেশিকদের ভিতরই উহার অনেকটা কাটতি দেখা যায়। কাযেই উহা তেমন সুলভ নহে; দৈনিক দুই আনা হইতে চারি আনা।

বিশেষ বিশেষ ঘটনার সময় অতিরিক্ত পত্রের (গোঙ্গাই) বিশেষ সমারোহ দেখিতে পাওয়া যায়। রুষজাপযুদ্ধের সময় প্রত্যেক বড় পত্রিকার অফিষ ছাড়াও অনেক স্থান হইতে দিনের মধ্যে কতবার গোঙ্গাই অর্থাৎ তারের সংবাদ অতিরিক্তপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি।

প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সংবাদপত্রের দুই চারিজন পরিচালক ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়া পরিচালন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সংবাদপত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। কাযেই বিদেশের নানারূপ আচার ব্যবহার, লোকচরিত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্ব্বসমক্ষে সুন্দরভাবে উপস্থিত করিতে সমর্থ হয়েন। ভারত সম্বন্ধেও অনেক সময় অনেক বিষয় লিখিত থাকে সত্য, কিন্তু ভারতবাসীকে সেদেশে আজকাল অনেকটা অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া গণ্য করে তাই আমাদের যাহা কিছু সুন্দর তাহা গোপন করিয়া কেবল কেলেঙ্কারীর কথা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী এস্থলে উল্লেখ করিলাম। ভারতে বালবিধবা নিগ্রহ সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছে যে, "কোন বালিকা বিধবা হইলে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলে বলিয়া থাকে এই অলক্ষ্মীর জন্যই আমাদের ছেলের অকাল মৃত্যু হইল। বালিকাকে নানাভাবে উৎপীড়ন আরম্ভ

করে। তাহার সুন্দর বসন ভূষণ কাড়িয়া লয়, মস্তকের দিব্য কেশ কাটিয়া ফেলে, সুখাদ্যে বঞ্চিত করে, এমন কি মাত্র একবেলা সামান্য কিছু খাইতে দেয়। বাড়ীর অন্যান্য সকলে কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে আমোদ উৎসবে মাতোয়ারা হয় কিন্তু দুঃখিনী বালিকাকে নির্জ্জনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় ইত্যাদি।" আর একদিন দেখিলাম "ভারতের বাল্যবিবাহ অতি আশ্চর্য্য। তিন বৎসরে মেয়েদের বিবাহ হয় এবং ছয় সাত বৎসর বয়সে তাহাদের সন্তান হয়।" "নানারূপ রাসায়নিক দ্রব্যের আবিষ্কার সত্ত্বেও পচা গোবরে ঘর পরিষ্কার করা হয়। উহাতে ব্যারামের বীজ এবং দুর্গন্ধ নাশ করার পরিবর্ত্তে বরং উহার সহায়তা করে।" "বংশ মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য কুলীনের ঘরে ৫০।৬০ বছরের কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তিন বছরের ছেলে ৮।১০ টা বিবাহ করিয়া বসে। এবং কোন কোন স্ত্রীর বয়স ২০।২৫ বৎসর।"

সংবাদ পত্রের এইরূপ টিকা টিপ্পনী এবং সহাধ্যায়ীদের উপহাসব্যঞ্জক মন্তব্যে কত যে ঝালাপালা হইয়াছি তাহা বলা যায় না। বালক বালিকাদিগের প্রথম শিক্ষার গ্রন্থে আমাদের দেশীয় লোকের যেরূপ আকৃতি ও গঠনের বর্ণনা করিয়াছে তাহা রামায়ণের রাক্ষসের চেহারার চেয়ে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। তবে একটী কথা এই যে, জাপানে অনেক বিষয়ে ভারত-বাসীকে হীনতা স্বীকার করিতে হইলেও স্কুল কলেজে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে, হোটেলে এবং দোকানে এখনো ততটা নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় না। সভাভূমি আমেরিকায় সাধারণের ভিতর ভারতবাসীর নিগ্রহের সীমা নাই। তাহা বোধ হয় অনেকেই সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইয়া থাকিবেন। আমার এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন তিনি সমস্ত দিন হোটেল হইতে হোটেলান্তরে স্থান না পাইয়া একদিন এক পল্লীর ধারে গাছ তলায় শুইয়া রাত্রি যাপন করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার হাতে টাকাও ছিল অথচ হোটেলওয়ালারা ইহা হোটেল নহে বলিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। এরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। কিন্তু উহার পর আমাদের ভারতীয় কোন এক বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া জাপানে আইসেন। তিনি এক এক সুসভ্য দেশে ৫।৬ মাস কাটাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক চরিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন ইন্‌ষ্টিটিউশন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। আমি জাপানে তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি যে, তাঁহাকেও অনেক হোটেলে হাতে টাকা লইয়াও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল।

সংবাদ পত্র সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কি করিব অবস্থায় টানিয়া আনে। জাপানের সাময়িক 'পঞ্চ' হাস্যোদ্দীপক ব্যঙ্গব্যঞ্জক রং-তামাসাজনক চিত্রে পূর্ণ। সেখানকার অনেক কাগজে মজার গল্প, হেঁয়ালী প্রভৃতি থাকে। ইহা ছাড়া ঐতিহাসিক এবং উপন্যাসিক গল্পের কাগজ ত আছেই।

সংবাদ পত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় রসদ সংগ্রহ করা মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই অতি নগণ্য সংবাদ সমূহেরও স্থানাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন মতের সংবাদ-পত্র আছে কিন্তু সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য দেশের উন্নতিতে সহায়তা করা। আমাদের দেশে উহার বেশ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা দেশে পরিবর্দ্ধিত, দেশের বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ এবং দেশবাসীর অভাব অভিযোগ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কাগজ একরূপ; আর যাঁহারা অন্যদেশ হইতে নূতন এদেশে পদার্পণ করেন এবং দেশের আভ্যন্তরিক কেন বাহ্যিক বিষয়ও একবার মনোযোগের সহিত দেখিতে প্রয়াস পান না তাঁহাদের পরিচালিত কাগজ অন্যরূপ। উভয়ের ভিতর এত পার্থক্য যেন উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

জাপানে কয়েক বৎসরে প্রেসের বিরুদ্ধে একটী মাত্র মোকদ্দমা দেখিয়াছি। যখন বাল্টিক ফ্লিট জাপানের বিরুদ্ধে আসিতেছিলেন, সেই সময় জাপান গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে জাপানের কোন পত্রিকা, জাপানের সেনাপতি সৈন্য সামন্ত অ্যাড্মিরাল এবং যুদ্ধ জাহাজ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয়দের জন্য কখন কোথায় প্রতীক্ষা করে তাহা যেন প্রকাশ না করে। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষীয়দের গতিরোধ উল্লেখ করিতে এবং যুদ্ধের ফলাফল প্রকাশ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

এদিকে বাল্টিক ফ্লিট্ মাদাগাস্কর অতিক্রম করিলে এক খানা পত্রিকা প্রকাশ করে যে রুষের জাহাজ অগ্রসর হউক কোন ভয়ের কারণ নাই। আমাদের অ্যাড্মিরল টোগো হয়ত তাঁহার উপযুক্ত অনুচরগণসহ শত্রুপক্ষ সমূলে নিধন করিতে দক্ষিণ অঞ্চলে চীন সাগরের কোন প্রদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টঘোষণা অমান্য করিয়া এই সংবাদ রটনা করায় এবং ইহাতে শত্রুদের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়া বিচারে সেই সংবাদপত্রের পঁচিশ ইয়েন অর্থাৎ উনচল্লিশ টাকা অর্থ দণ্ড হয়।

কাগজ পাঠ সমাপ্তির পর যিনি যে বিষয় ইচ্ছা করেন কাটিয়া সযত্নে রাখিয়া দেন। এবং পুরাতন কাগজ বিক্রয় করিয়া ফেলেন। জাপানের দোকানদার যে কোন জিনিষ হউক না কেন অনাবৃত অবস্থায় গ্রাহকের হাতে দেয় না। বিক্রীত দ্রব্যাদি সম্ভ্রান্ত দোকানে সাদা কাগজে এবং ছোট ছোট সাধারণ দোকানে পুরাতন সংবাদ পত্রে মোড়াইয়া সুন্দর রঙিন ডোরে বাঁধিয়া, ধরিয়া লইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বাবুদের ন্যায় জাপানের বিশিষ্ট লোকও বাজারের ক্রীত ভারী দ্রব্য হস্তে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে লজ্জা বোধ করেন না।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

মৃত্যু।

মৃত্যু যদি হয় সখা অমৃতের দ্বার
আমাদের 'পরে তার আছে অধিকার;
কিংবা যদি জীবনের এই সমাপন
ইথে কোন আশঙ্কার নাহি প্রয়োজন।

শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ।

এলাহাবাদে জাতীয় সম্মিলন।

এবার আমাদের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন এলাহাবাদে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দুই বৎসর সমিতিতে যোগদান লইয়া দেশের দুই পক্ষের মধ্যে যে শোচনীয় মতভেদ দাঁড়াইযাছিল, এবারকার প্রতিনিধি সংখ্যা দেখিয়া আশা হয়—যেন উভয়পক্ষই ব্যক্তিগত মতামত ত্যাগ করিয়া দেশের এই সাধারণ কর্ম্মে যোগদান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কিছুদিন হইতে স্থানে স্থানে মুসলমানেরা হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য যে উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে বলিযাই আমাদের বিশ্বাস। জনকয়েক শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ মুসলমানও সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই জাতীয় কর্ম্মে হিন্দুর সহিত সমস্বরে যোগদান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। সুতরাং এবারকার জাতীয় সমিতিকে যথার্থ জাতীয় সম্মিলন বলা যাইতে পারে।

ভারতের কল্যাণরত উদারনৈতিক স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় সার উইলিয়ম ওয়েদারবর্ণ তাঁহার বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও দেশের সঙ্কট সময়ে ভারতে আসিয়া সমিতির সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের মঙ্গল সাধনই তাঁহার মহৎ জীবনের ব্রত। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তিনি ভারতবাসীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের ও পরার্থপরতার জন্য ভারতবাসী মাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ এবং এবারে আমরা তাঁহাকে আমাদের জাতীয় যজ্ঞের অধিপতি নির্ব্বাচিত করিয়া সেই কৃতজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছি মাত্র।

সার ওয়েদারবর্ণের বক্তৃতার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। দেশের রাজনৈতিক কর্ম্ম ও ব্যবস্থার তিনি উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই—করা আবশ্যকও বোধ করেন নাই। সকল দেশের সকল জাতির সকল কর্ম্মের মূলে যে তিনটি মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তিনি তাহাই ভারতের রাজা ও প্রজা উভয়ের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে ধরিয়া দিয়াছেন মাত্র। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—"আশা, প্রীতি ও সমবেত উদ্যমই আমাদের সকল কর্ম্মের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক।" আশা,—ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের উপর, ভারতবাসীর উত্থানশক্তির উপর, রাজপক্ষের উদারতা ও প্রজারঞ্জনের আন্তরিক ইচ্ছার উপর। প্রীতি,—ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, রাজনৈতিক বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে এবং প্রধানতঃ রাজা ও প্রজার মধ্যে। আর সমবেত উদ্যম ত' সর্ব্বকালে সর্ব্ব সমাজেই আবশ্যক। এই তিনটি নীতিই তাঁহার মুখ্য বক্তব্য। ওয়েদারবর্ণ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে নূতন কথা নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টার ফলে তিনি আমাদের মধ্যে এই তিনটি নীতিকে সার্থক করিবার যত্ন করিলে অনেকটা সুফল হওয়া সম্ভব বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

ওয়েদারবর্ণ এই প্রীতি ও সমবেত চেষ্টা প্রতিষ্ঠার সূচনা করিয়া যাইবার যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যাহাতে ভবিষ্যতে অপ্রীতির কোন কারণ না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এবারে এরূপ একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের চেষ্টা কতদূর সফল হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু এরূপ মিলনের চেষ্টাতেও যে একটা সুফল আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

ওয়েদারবর্ণ সাহেবের মতে আমাদের সমবেত উদ্যম তিনটি পথে চালিত হওয়াই কর্ত্তব্য,—প্রথম, ভারতবাসীকে শিক্ষাদান করা, দ্বিতীয় প্রস্তাবিত সংস্কার লইয়া গবর্মেণ্টের নিকট উপস্থিত হওয়া এবং তৃতীয় ইংলণ্ডে তাঁহাদের প্রার্থনা প্রচার করা।

সার ওয়েদারবর্ণ মনে করেন প্রতি বৎসরেই জাতীয় সমিতির কয়েকজন প্রতিনিধির তাঁহাদের প্রস্তাব লইয়া বড়লাটের নিকট উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্য। এরূপ চেষ্টা পূর্ব্বেও দুইবার হইয়াছিল, কিন্তু লর্ড এলগিন ও লর্ড কর্জ্জন উভয়েই কংগ্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করেন। সৌভাগ্যবশতঃ লর্ড হার্ডিং সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী নহেন। ওয়েদারবর্ণ সাহেব তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণের অভিলাষ জ্ঞাপন করায় তিনি তাঁহার সম্মতি জানাইয়াছিলেন এবং গত ৫ই জানুয়ারি প্রাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃগণ ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণ ওয়েদারবর্ণ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বড়লাটের প্রাসাদে যাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া আপনাদের অভাব জ্ঞাপন করেন। লর্ড হার্ডিং যেরূপ ভদ্রতা ও উদারতার সহিত তাঁহাদের প্রস্তাবের উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি সাধারণের সমবেত ভিক্ষাকে তিনি কর্জ্জনের ন্যায় পদাঘাত করিবেন না। লর্ড হার্ডিং স্পষ্টতঃ যে তাঁহাদের কোন কথা কার্য্যে সম্পন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা নহে, বরং বলিয়াছেন কতকগুলি বিষয় কর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয়ের আবশ্যক। তবে দেশের অভাবটাকে যথার্থ অভাব বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যথাসম্ভব সহানুভূতির সহিত তাহা দূর করিতে যে তিনি যত্ন করিবেন তাহারও আভাষ দিয়াছেন। যাহা হউক এতদিনে গবর্মেণ্ট যে কংগ্রেসকে গ্রাহ্য করিলেন, ইহাই আমাদের পরম লাভ বলিতে হইবে।

সার উইলিয়ম ওয়েদারবর্ণ।

জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের পরে শিল্পসমিতি, হিন্দুমুসলমান মিলনসমিতি, সমাজ সংস্কার সমিতি, নারী সমিতি ও আরও দুই একটি সমিতির অধিবেশন হয়। শিল্প সমিতির সভাপতি হইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সকল কথার সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও, তাহা তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যবসাবিশারদের যোগ্যই হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার দুইটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একটি সমগ্র ভারতের জন্য এক বিরাট শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা;

অপরটি ভারতের অর্থহীন নূতন শিল্পের রক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের সাহায্য। এরূপ একটা শিল্প বিদ্যালয়ের যে নিতান্তই আবশ্যক সে কথা বলাই বাহুল্য। শিল্পোন্নতি ভিন্ন ভারতবাসীর আত্মরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। গবর্মেণ্টও এ বিষয়ে যে বিশেষ উৎসাহী সে কথা বলা যায় না। সুতরাং আমাদের জাতীয় চেষ্টায় এরূপ একটা ব্যবস্থা না করিলে দেশের হাহাকার ও অধঃপতন অনিবার্য্য।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে গবর্মেণ্টের সাহায্য করা সম্বন্ধে আমাদের নূতন বলিবার কিছুই নাই। রাজেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন গবর্মেণ্টের জ্ঞানোৎপাদনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। লর্ড হার্ডিং তাঁহার শাসন কালে যদি এরূপ একটা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া যান, তাহা হইলে ভারতে তাঁহার কীর্ত্তি অমর হইয়া থাকিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী প্রবর্ত্তিত ভারতে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য যে নারীসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, বিজয়নগ্রামের রাণী তাহার অধিনায়িকা হইয়াছিলেন। নারীজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন তাহা হৃদয়গ্রাহী। আমাদের দেশের উচ্চপদস্থা মহিলারা যে স্বজাতির উদ্ধার কল্পে এরূপ আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। বস্তুত দেশে নারীসমাজ যতদিন শিক্ষায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ না করিবে ততদিন আমাদের উন্নতির চেষ্টা কেবল ভিত্তিহীন প্রাসাদের কল্পনা মাত্র।

সার উইলিয়াম ওয়েদারবর্ণ স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বদিন বঙ্গ-শিল্প-বিদ্যালয় (Bengal Technical Institute) পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। নিম্নের চিত্রটি বিদ্যালয়েই লওয়া হয়। মধ্যে সার উইলিয়ম, দক্ষিণে তাঁহার সহচরী নার্স ও সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; বামে অনারেবল মদনমোহন মালব্য ও অনারেবল গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা। পশ্চাতে গুরুদাস বাবুর দিক হইতে প্রথমে অনারেবল দেবপ্রসাদ

সর্ব্বাধিকারী, পরে শ্রীযুক্ত সদানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, বিদ্যালয়ের একজন কর্ম্মচারী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যালয়ের ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় দণ্ডায়মান। সার উইলিয়মের শরীর এতই অসুস্থ যে একজন 'নার্স'কে সঙ্গে লইয়া ভারতে আসিতে হইয়াছে।

অন্তঃপুর প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সন্তান পালন।

টাইম্‌স্ নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের লেখক বলেন, সন্তানপালন সম্বন্ধে ইংলণ্ড আমেরিকায় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে পুত্রের এবং আমেরিকায় কন্যার প্রতি সমধিক যত্ন প্রকাশ করা হয়। কিসে কন্যাটি সুখে থাকিবে, কেমন করিয়া নিত্য নূতন আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে, আমেরিকায় পিতা-মাতার ইহাই বিশেষ চেষ্টা। কন্যার উপর সেখানে প্রায় কোন কর্ত্তব্যেরি গুরুভার অর্পণ করা হয় না, তাহার আনন্দবিধানের জন্য পরিবারের সকলেই সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকেন।

আমেরিকায় বালিকা-জীবন দুই অংশে বিভক্ত, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের—দ্বিতীয় সামাজিক। এই দুই জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাঁহারা সামাজিক জীবনযাপনে মনো-নিবেশ করেন তাঁহাদের সময় অতি লঘুভাবেই কাটিয়া যায়। কিসে লোকপ্রিয় হওয়া যায় স্ত্রীলোক মাত্রেরই তাহা সহজসংস্কারবশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় না এবং সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সমাজপ্রিয় রমণী আপন বুদ্ধি এবং চেষ্টাকে নিয়োজিত করেন। কোন্ পরিচ্ছদ কেমন ভাবে পরিলে সুন্দর দেখাইবে, কোন বিষয়ের আলোচনায় অতিথি অভ্যাগতকে সমধিক প্রীতিদান করিতে পারা যাইবে ইহাই তাঁহার বিশেষ ধ্যান ধারণার বিষয় হইয়া থাকে। স্বভাবতঃই তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং প্রকৃতি প্রফুল্ল, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বড়ই আনন্দলাভ করা যায়। বেশবিন্যাসবিষয়ে যে রীতি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন তিনি তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন; বাক্য ব্যবহারে তাঁহার চতুরতা, উত্তর প্রত্যুত্তরে ক্ষিপ্রকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি যে কেবলমাত্র সুন্দর এবং মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন; এমন নয় প্রত্যেক সামান্য খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ দান করেন, এই নিমিত্ত যখন সাজিয়া বাহিরে আসেন তখন তাঁহাকে একখানি জীবন্ত ছবির মত দেখায়। যেখানেই দৃষ্টি পড়ে সেখানেই সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ইংরাজ মহিলা বর্ণসৌকুমার্য্যে, কেশের প্রাচুর্য্যে, এবং স্বাস্থ্যের লালিত্যে আমেরিকার রমণীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও সাজসজ্জায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাজিয়া দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইলে আমেরিকা মহিলাকে অধিকতর মনোরমা দেখায়। সামাজিক জীবনের পারদর্শিতাতে ইহারা ইংরাজ মহি-লাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন। জীবনের অধিকাংশ সময় নগর হইতে দূরে অবস্থান জন্য ইংরাজ বালিকা বহুকাল অবধি একটু অধিক লজ্জা কাতর থাকে, এবং সমাজে যে সহজ প্রফুল্ল চতুর কুশল ব্যবহার আদৃত তাহাতে অভ্যস্ত হইতে কিছুকাল তাহার বিলম্ব হয়। নগর হইতে দূরে নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক দৃশ্যে সুন্দর পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যদিও ইংরাজবালিকারা নিয়ত নগরবাসিনী আমেরিকা বালিকার চঞ্চলতা লাভ করে না, তবুও এই পল্লীবাসের জন্য আজীবনকাল তাহারা প্রকৃতির সহিত একটি মধুর সম্বন্ধে গ্রথিত থাকে, আকাশ বাতাস, সুন্দরী তটিনী, পুষ্পপল্লব, পাখীর আনন্দগান চিরদিনই তাহাদিগকে আকৃষ্ট এবং আনন্দিত করে। বাল্যাবধি প্রত্যেক বালিকাকেই কোন না কোন লোকহিতকর কার্য্যে সংসৃষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া তাহাদের স্বভাব দয়াদাক্ষিণ্য এবং পরদুঃখকাতরতায় শোভিত হয়। আমেরিকায় যাহারা লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়,—তাঁহারা জীবনের অন্য সকল

কর্ত্তব্যই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। আমেরিকার রমণী সমাজে যে সকল পুরুষের সংসর্গে আসেন প্রায় তাহাদের সকলেরি তীক্ষ্ণ বাণিজ্য বুদ্ধি, এই আলাপ পরিচয়ের ফলে রমণীগণের বিষয় বুদ্ধি পরিণত হইয়া উঠে—তাঁহারা সুচারু নিপুণতার সহিত আপন আপন বিষয় কর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। যদিও ধনলাভই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে তবুও সাধারণ্যে প্রতিপত্তি লাভ যে তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ইহা অস্বীকার করা যায় না। দেশ ভ্রমণের উৎসাহে, নিত্য নূতনের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া তাঁহারা কত স্থানে উপনিবেশ স্থাপনের নেতা হইয়াছেন, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হৃদয়ের সহানুভূতি এবং আবিষ্কার কৌতূহল সংযত করিয়া রাখা তাঁহাদের স্বভাব নয়, তাঁহাদের দয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিনী। ইউরোপ, আফ্রিকা, অতি সুদূরতম দেশেও তাঁহাদের হৃদয়ের সমবেদনা প্রসারিত হইয়া যায়, রোগ শোকদারিদ্র্যে মুক্তহস্তে দান করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না। ইংরাজ মহিলাগণ রাজনীতি এবং ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী, তাঁহাদের স্বাস্থ্যময় জীবন এবং নির্ম্মল চিত্তবৃত্তি সকল এই পক্ষপাতিতার বিশেষ সহায়।

আমেরিকার রমণী স্বভাবতঃই ইংরাজ রমণীগণের অপেক্ষা স্থিরচিত্ত, সহসা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হওয়া কিম্বা অধিক ভালবাসায় কাতর হওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, পুরুষের সহিত তাহাদের প্রণয় অপেক্ষা বন্ধুত্বের সম্বন্ধই সুলভ। আমেরিকা দেশের পুরুষগণ তাঁহাদিগকে সিংহাসনস্থিত দেবতার ন্যায় স্বতন্ত্র এবং উন্নততর লোকবাসীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন। যদিও অস্বীকার করিবেন তবুও মনে হয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এখনও তাঁহাদের ধারণা মধ্যযুগের অনুরূপ। আর এক বিষয়ে ইংরাজ এবং আমেরিকাবাসীর বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ইংরাজ মহিলার সহিত তাঁহার ভাবী স্বামীর দেখা সাক্ষাৎ তেমন অধিক হয় না। কিন্তু বিবাহের পর স্ত্রী সর্ব্ববিষয়ে গৃহে, সমাজে, সাধারণে তাহার সহযোগিনী, সহধর্ম্মিনী এবং সহায়স্বরূপা। কিন্তু আমেরিকায় বিবাহের পূর্ব্বে বাকদত্ত স্ত্রীপুরুষের বন্ধুত্ব সুদৃঢ়, আমোদ প্রমোদ কিম্বা কর্ত্তব্য কার্য্যে সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়ের সহায়ক, কিন্তু বিবাহের পর তাঁহাদের এ সম্বন্ধ আর থাকে না, উভয়ের জীবন যেন স্বতন্ত্র হইয়া যায়। স্বামী আপন ব্যবসায় বাণিজ্যে একেবারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন এবং স্ত্রী গৃহকার্য্যের অবসরকাল সামাজিক আমোদে অতিবাহিত করেন—তখন আর তাঁহাদের উভয়ের সাধারণ পারিবারিক জীবন থাকে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় স্বামীর দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। কেননা স্ত্রীকে তিনি কোন কঠিন কর্ত্তব্যের সহভাগিনী না করিয়া তাঁহাকে খেলার পুতুলের মত সুন্দর করিয়া সাজাইয়াই সুখী হন। স্ত্রী স্বামীর জীবনের কোন দায়ীত্বের অংশই বহন করেন না, স্বামীর আয় ব্যয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—কেবল আবশ্যক সময়ে যথেষ্ট টাকা পাইয়া থাকেন মাত্র। আমেরিকার রমণী আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করিয়া যতই গৌরব অনুভব করুন না কেন কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে, তিনি নিতান্তই পরাধীন; কেননা একটিমাত্র পয়সার জন্যও তাঁহাকে স্বামীর নিকট হাত পাতিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভদ্র ইংরাজ মহিলা বিবাহ সময়ে সম্পত্তি লাভ করেন।

আমেরিকার রমণীগণ তাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুন্দর হৃদয় বৃত্তি, এবং উন্নত শিক্ষার অধিকারী হইয়াও ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন না ইহা অসম্ভব মনে হয়। বর্ত্তমানে যদিও তাঁহাদের এই সকল গুণ ব্যর্থ এবং অপব্যয়িত হইতেছে, তবে নিরাশ হইবার কারণ নাই, এখনই কতকগুলি চিহ্ন দেখা যাইতেছে যাহা হইতে মনে হয় তাহারা আর অধিক দিন কর্ত্তব্যবিমুখ থাকিবেন না; নিকট ভবিষ্যতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য, নিঃস্বার্থ সেবা, উন্নততর চেষ্টা, জাতীয় জীবনে নবীন যুগ আনয়ন করিবে।

শ্রীমতী প্রি।

আসামে খাসীদিগের মধ্যে নারীর প্রাধান্য।

ভারতের অনেক আদিম পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বিষয়ে নারীদিগের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। খাসীদিগের মধ্যে এই নীতিটা কিছু অধিক প্রবল। তাহাদের মধ্যে বিষয়ের উত্তরাধিকারত্ব নারীর দিক হইতেই নামিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা যেমন সরল, বিবাহভঙ্গও সেইরূপ সহজ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদের আবশ্যক হইলে সেই মর্ম্মে প্রথমে একটা সাধারণ ঘোষণাপ্রচারিত হয়। পরে পুরুষটি তাহার স্ত্রীকে সামান্য পাঁচটি মুদ্রা দেয়, স্ত্রী আর পাঁচটি মুদ্রা সমেত তাহা স্বামীকে ফিরাইয়া দেয়। স্বামী সেইগুলি লইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিবা মাত্র উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। খাসীদের মধ্যে ৩৫ বা ৪০ বৎসরের এক জন পুরুষ ৩৭ বার বিবাহ করিয়াছে এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। স্বনামধন্য পূর্ব্ববঙ্গের লাট ফুলার সাহেব তাঁহার ভারত সম্বন্ধে নূতন পুস্তকে খাসীদের বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছেন। মাতামহীই খাসী-পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। খাসীরা পত্রের শেষে নাম লিখিবার সময়ে লিখিয়া থাকে—"তোমার আন্তরিক বন্ধু—মেরি য়্যানের পিতা।" ফুলার সাহেব বলেন খাসীদের সহিত তিব্বত বা ব্রহ্মের লোকের কোন সাদৃশ্যই নাই। তাহারা ভারতব্যাপী একটা বহু প্রাচীন জাতির অবশিষ্ট অংশ মাত্র। ইহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতিরই প্রায় অনুরূপ, কিন্তু তাহাদের একটি সংস্কারের বিশেষত্ব আছে। তাহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এক সময়ে এক অজাগর সর্প বা থ্লেন অসংখ্য মনুষ্য ও পশুকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। অবশেষে এক অসমসাহসী খাসী তাহাকে নানা কৌশলে হত্যা করে। তখন খাসীরা সেই সপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া আহার করে। অসাবধানতাবশতঃ একটা ক্ষুদ্র মাংস খণ্ড অভুক্ত ছিল। সেই খণ্ড হইতে আবার অসংখ্য 'থ্লেনের' জন্ম হইল। এক একটি 'থ্লেন' এক একটি পরিবার মধ্যে আশ্রয় লইল। খাসীদিগের বিশ্বাস যে নরবলির দ্বারা এই সকল বাস্তু 'থ্লেন'কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে গৃহস্থের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। এই সংস্কারের ফলে তাহারা যে কত ভীষণ নরহত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ কাল তাহারা অনেকেই সভ্য শান্ত হইতেছে। খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাদের মধ্যে অনেককেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। শ্রীভঃ।

শিল্পসমিতির দানপ্রাপ্তি।

পূর্ব্বের জের	৯৯॥০
শ্রীযুক্ত সুকুমার পাকড়াশী	১৲
শ্রীমতী কিরণশশী দেবী	১৲
জনৈক ভদ্রমহিলা	২০৲
মিসেস এন, চৌধুরী	২৲
শ্রীমতী প্রতিভাময়ী রায়	১৲
শ্রীমতী মণিকুন্তলা রায়	২৲
" সৌদামিনী রায়	১৲
" পুষ্পবিহারিণী দাসী	১৲
" হরিপ্রিয়া মিত্রা	১৲
" ইন্দিরাকুমারী রায়	৫৲
	১৩৫॥০

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

দেশের উন্নতি

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে।

[illegible] | কান্তিক প্রেস মুদ্রিত

ভারতী

৩৪শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৭ [১১শ সংখ্যা

কর্ম্মযোগ।

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্চে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বল্‌চে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে—দেখচি, যা কিছু সব নিয়মেই চল্‌চে এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাস্‌চে।

সূর্য্যচন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠ্‌চে অস্ত যাচ্চে যে, মনে হচ্চে তারা যেন ভয়ে চল্‌চে পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয় যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই—সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয়, সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাইনে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সাম্‌নে দেখে আমরা চম্‌কে উঠি তাকেও জোড় হাতে নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয় একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে"—তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়—"ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"—তাঁর নিয়মের অমোচ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্রসূর্য্য চল্‌চে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাট্‌বার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে বলে মনেও হয় না সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চল্‌চে।

তবে ত দেখ্‌চি ভয়েই সমস্ত চল্‌চে কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানা ঘরে আগাগোড়া কল চল্‌চে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু ত আজ আনন্দের সুর উঠেছে এ কথা ত কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে ত মানুষ এমন করে ডাকে, বলে চল্‌ ভাই আনন্দ করবি চল্‌? এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন?

সে দেখ্‌তে পাচ্চে, নিয়মের কঠিন দণ্ড

একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুট্‌তে দেখিনি? দেখিনি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য? দেখ্‌চিনে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরমরূপে প্রচার করচে না—একটি অনির্ব্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারিদিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্চে। সেই জন্যেই, যে উপনিষৎ একবার বলেছেন, অমোঘ শাসনের ভয়ে যা কিছু সমস্ত চলেছে, তিনিই আবার বলেছেন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে" আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্চে। যিনি আনন্দস্বরূপ মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করচেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাধন মানে। কিন্তু যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্বোধন হয়নি, সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখ্‌চি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়—কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না—সে বলে রস কিছুই নেই সে মাথা নেড়ে বল্‌চে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু ঐ যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে—রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখ্‌তে পাচ্চেন। জগতের নিয়ম ত তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্চে না, তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" জগতে তিনি ভয়কে দেখ্‌চেন না, আনন্দকেই দেখ্‌চেন সেই জন্যেই বল্‌চেন "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্ব্বত্র জান্‌তে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন—তিনিই বলেছেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" এই মহদ্ভয়কে এই উদ্যত বজ্রকে যারা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করেন তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয় কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন,—সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজবন্ধনের মত; তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুসি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না, কেননা সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে, সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনি সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট

শিশুর মত কেঁদে উঠে বলে "মা মা হিংসীঃ," আমাকে আঘাত কোরোনা। সে বলে বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো, আমাকে আচ্ছন্ন করে, আবৃত করে বেঁধে রাখো, কোথাও কিছু ফাঁক রেখোনা—শক্ত করে ধর, তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি—আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা কর।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান ক'রে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যারা কর্ম্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্ম্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্ম্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্ম্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করচে, তাই যদি না হত তাহলে কখনই সে ইচ্ছা করে কর্ম্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম্ম করচে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলচে, ততই যে আপনার সুদূরবর্ত্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসচে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলি স্পষ্ট করে তুলচে—মানুষ আপনার নানা কর্ম্মের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে সমাজের মধ্যে আপনাকেই নানাদিক থেকে দেখতে পাচ্চে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মত ভয়ঙ্কর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের চেষ্টা। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্চে। আমাদের আত্মাও অনির্দ্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলি কর্ম্ম সৃষ্টি করচে। যে কর্ম্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয় তাকেও কেবলি সে তৈরি করে তুলচে। কেননা সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্য্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য্য—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে, সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ—বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করেনা। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্য্যকে, মঙ্গলকে, নিজের

আত্মাকে নানাবিধ কর্ম্মের ভিতরে কেবলি বন্ধনমুক্ত করে দিচ্চে। যতই তাই করচে, ততই আপনাকে মহৎ করে দেখ্‌তে পাচ্চে—ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে।

উপনিষৎ বলেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকৃতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্চে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্ব্বল মুহ্যমানভাবে বলেননা, জীবন দুঃখময় এবং কর্ম্ম কেবলি বন্ধন। দুর্ব্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আলগা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্ব্বেই খসে যায়—তাঁরা তেমন নন্‌। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়চিনে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্ম্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্ঘাটিত করে আপনাকে দেখে' এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মত সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করচে —তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে;— তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্য্যালোকের আনন্দ,মুক্ত সমীরণের আনন্দ সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তরবাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকৃতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই যে জীবনের আনন্দ, এই যে কর্ম্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। একথা বল্‌তে পারব না এ আমাদের মোহ, একথা বল্‌তে পারব না যে এ'কে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্ম্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারবনা। ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্ম্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কথনই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্ম্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্য-দৃষ্টিতে দেখ। যদি তা দেখ তাহলে কর্ম্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে? তাহলে আমরা দেখ্‌তে পাব কর্ম্মের দুঃখকে মানুষ বহন করচে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য, কর্ম্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করচে, বহু ভার লাঘব করচে; কর্ম্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেল্‌চে অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম্ম করচে,—তার একদিকে দায় আছে, আর একদিকে সুখও আছে; কর্ম্ম একদিকে অভাবের তাড়নায়, আর এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করচে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্ম্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করচে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে—নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে

মারচে। কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠ্‌লনা;—পশু পক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্চে তাতেই সে চুপ করে থাকৃতে পারলে না,—কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। মানুষের মত কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে; এইখানে কতকাল থেকে সে কত ভাঙচে গড়চে, কত নিয়ম বাধ্‌চে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্চে, কত পাথর কাটচে কত পাথর গাঁথচে, কত ভাব্‌চে কত খুঁজ্‌চে কত কাঁদ্‌চে; এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড় বড় লড়াই লড়া হয়ে গেছে; এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে, এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়; এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায়নি নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে; এইখানেই মানুষ সেই মহত্তত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারদিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বড়, এই জন্যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকৃলে তার আরাম হতে পারে কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়—সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না—এই জন্যই, তার বর্ত্তমানকে ভেদ করে বড় হবার জন্যই, এখনো সে যা হয়ে ওঠেনি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলি বারবার দুঃখ পেতে হচ্চে; সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব; এই কথা মনে রেখে মানুষ আপনার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নি; কেবলি তাকে প্রসারিত করেই চলেছে; অনেক সময় এতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়চে যে, কর্ম্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্চে, কর্ম্মের স্রোতে বাহিত আবর্জ্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক একটা কেন্দ্রের চারদিকে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত রচনা করচে, স্বার্থের আবর্ত্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত্ত; কিন্তু তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই, সঙ্কীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে; কারণ চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠ্‌তে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম্ম করতে হবে, কর্ম্ম করে বেঁচে থাকৃতে হবে এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম্ম করা এবং বাচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্চে এই, যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই; তাকে বাইরে আস্‌তেই হবে। তার সত্য অন্তরে এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকৃতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয় তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখনা কেন, শরীরকে ত নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই। তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের

কাজ করেও স্থির থাক্‌তে পাবে না। তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্ত চলাচলেই তার তুষ্টি নেই, নানাপ্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্ব্বদাই তার চাই—কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে—দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে ত্যাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচিনে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যেদিকে ত্যাগ করব সেইদিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেননি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব বাইরের কর্ম্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব, কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না—কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই বলে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল একদিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তাহলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখ্‌চি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য, সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভাল করে বিশ্বাসই করেনা। এতদূর পর্য্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখ্‌তে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বল্‌চে বিশ্বজগৎ কেবলি পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি য়ুরোপ আজকাল বল্‌তে আরম্ভ করেছে, জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠ্‌চেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মান্‌তে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুল্‌চেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি আর একদিকে সমাপ্তি; একদিকে পরিণতি, আর একদিকে পরিপূর্ণতা; একদিকে ভাব আর একদিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে, গান এবং গান গাওয়ার মত অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্চে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা, যে, গান কোন জায়গাতেই নেই কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখ্‌চি, কোনো সময়েইত সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখ্‌চিনে—কিন্তু তাই বলে কি এটা জানিনে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে?

এমনি করে কেবলমাত্র করে যাওয়া চলে যাওয়ার দিক্‌টাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্যজগতে আমরা

একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে এই পণ করে বসে আছে—তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ্—জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না—সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানেনা।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে ব্যাপ্তির দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখ্‌ব তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখ্‌ব না এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থানু হয়ে বসে আপনাকেই আপনি নিরীক্ষণ করতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখিনি—আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে, তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ইতিহাস পুরাণ সমাজ সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁৎভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখিনে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, একদিকে আনন্দ। তার একদিকে ধ্বনিত হচ্চে ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, আর একদিকে ধ্বনিত হচ্চে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। একদিকে বন্ধনকে না মান্‌লে অন্যদিকে মুক্তি পাবার জো নেই। ব্রহ্ম একদিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর একদিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতর? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয় তখন সেই তারে গান বাজে, এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। একদিকে সে নিয়মের

মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্যদিকে সে সঙ্গীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয়নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না—সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুল্‌তে পারলেই সে বদ্ধ থেকে এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্ম্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুল্‌তে পারি। কিন্তু তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে ব্যর্থতার মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বল্‌ছিলুম, কর্ম্মকে ত্যাগ করা নয় কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোল্‌বার সাধনাই হচ্চে সত্যের সাধনা, ধর্ম্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্চে—যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাক্‌বে—অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্চে আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কর্ম্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে—কর্ম্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,—তখন সংসারই ত আনন্দনিকেতন।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে এ'কে কে অবজ্ঞা করতে চায়, সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করচে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্ম্মের চরম সাধনা। ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনি শুন্‌তে কি পাচ্চনা, ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জ্জনে আপনার কর্ম্মের বিজয় রথে—চলেছে, বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্ব্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্চে; বনজঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্য্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মত তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করচে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্চে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করচে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেল্‌চে—তার চারদিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্ম্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্চে। বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরন্তায় পথে মানবাত্মার এই যে বিজয় রথ অহোরাত্র

পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বল্‌তে চাও তার কেউ সারথী নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্চেনা? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথীর যথার্থ মিলন ঘট্‌চে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্য্যোগও সেই সারথীর অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারচে না—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্চে না;—আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথীর—চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নাববার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথীর। ওরে কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়: তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চল্‌তে চায় না! কে বল্‌তে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিল্‌ব। কে বল্‌তে চায় এই সমস্তই মিথ্যে, এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তরবাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ সমস্তকেই মিথ্যে বলে কত বড় মিথ্যে তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে এত বড় ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে

তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়—ভীরু যে, পালাতে যে চায় সে কোথাও তাঁকে পায় না—সাহস করে বল্‌তে হবে এই যে তাঁকে পাচ্চি, এই যে এখনি, এই যে এখানেই—বার বার বল্‌তে হবে আমার প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্চি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্চি; কর্ম্মের মধ্যে আমার যা কিছু বাধা, যা কিছু বেসুর; যা কিছু জড়তা, যা কিছু অব্যবস্থা সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসঙ্কোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্ম্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করচেন।

উপনিষদে "ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠ" ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেচেন? আত্মক্রীড় আত্ম-রতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাংবরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই এ কখনো হতেই পারে না—সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়—সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম্ম। ব্রহ্মে যার আনন্দ, তিনি কর্ম্ম না হলে বাঁচবেন কি করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম্ম করতেই হবে যে কর্ম্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এই জন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর

সকল কাজই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে ; তাঁর খেলা, তাঁর স্নান আহার, তাঁর জীবিকা অর্জ্জন, তাঁর পরহিত সাধন সমস্তই হচ্চে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার, তিনি "ক্রিয়াবান," ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্ম্মে প্রকাশ না করে তিনি থাক্‌তে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলি কর্ম্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্চে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটবড় সকল কাজেই, সত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যের দ্বারা শৃঙ্খলার দ্বারা মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও ত আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করচেন—তিনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।" তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করচেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন ত তিনি নিজেই। তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলি নানা আকারে দান করচেন। কাজ করচেন, তিনি কাজ করচেন—নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কি করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলি উৎসর্গ করচে, সেই ত তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ঐখানে—ঐখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তি যোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলি দান করতে হবে—বেদে তাঁকে "আত্মদা বলদা" বলেছে—তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্চেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্চেন যাতে করে আমরাও তাঁর মত আপনাকে দিতে পারি। সেই জন্মে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেট'চ্চেন ঋষি তারই কাছে প্রার্থনা করচেন, মনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চল্‌বেনা যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন, আমাদের শুভবুদ্ধি দিন তাহলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব তাহলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভ বুদ্ধি হচ্চে সেই বুদ্ধি যাতে সকলের সার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্ম্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভ-বুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম্ম কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম্ম নয়,—আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম্ম কিন্তু অভাব-তাড়িতের কর্ম্ম নয়,—তখন আমাদের কর্ম্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্ত্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখ্‌চি "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত কর্ম্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্চে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্চে তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি, তাই আমার সকল কর্ম্মই শান্তিময় কল্যাণময় আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ" তাঁর জ্ঞান, শক্তি এবং কর্ম্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমাশক্তি আপন স্বভাবেই

কাজ করচে—আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়; আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেন না হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাইনে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়—আপনার সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাইনে। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিইনে বলে, দান করিনে বলে কর্ম্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্ম্মে তোমার আনন্দমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মত তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মত তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক্, ফুলের গন্ধের মত তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত ক্ষয় পূরণ, সমস্ত উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালবাসতে পারি এমন বীর্য্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিকে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই বলে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মত এ'কে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্ব্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্ম্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্ন সূর্য্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করচে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌চে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্ত্তগাড়াকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুল্‌চে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়চে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করচে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলি কর্ম্মে রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করচে, সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্ব্বল ক্রন্দনের সুরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলি অভিশাপ দিচ্চে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্ম্মে মানুষের অনাস্থা সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্চে, সেই খানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সঙ্কীর্ণ—সেইখানেই যত সঙ্কোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্ম্মণ, আজ আমরা তোমার

সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ—বিশ্ব সংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখ-তাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমাসৃষ্টি চলচে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ! সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবলবেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মত ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক, নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্ম্মরধ্বনিকে বহন করে—আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক্—আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্য্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক্! দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহুতুলে আপনাকে একবার দিগ্বিদিকে ঘোষণা করুক্। মোহের আবরণকে উদ্ঘাটন কর, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও—এখনি এই মুহূর্ত্তে অনন্ত দেশেকালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলাসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই, তারপরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক্ থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্য্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করচে, যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মত সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্চে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবশক্তি।

জ্বলিয়া উঠেছে অগ্নি ধরি ধীর বেশ,
জগতের তমোরাশি করিবারে শেষ,
তিরোহিত করিবারে সর্ব্বদুঃখ ভয়
জীবনের সর্ব্বগ্লানি মিথ্যা সমুদয়
করিতে নিঃশেষ,—যাহে মানব জীবন
অন্ধকারে মোহ ঘোরে থাকে অচেতন।
সর্ব্বগ্রাসী বিশ্বনাশি অগ্নি মহাবীর
প্রজ্বলিত করি শিখা হইল বাহির :—
বিশুদ্ধ-মঙ্গল-মূর্ত্তি, নাশি পাপ ভাব,
বিনাশিয়া জগতের গূঢ় অন্ধকার,
সাধিয়া মঙ্গল, তবে হইল নির্ব্বাণ,
দিব্য রথে শূন্য পথে করিল প্রয়াণ।
সেথা হতে শান্তিধারে হয়ে বরষণ,
সুন্দর শ্যামল করি তুলিবে ভুবন।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

পোষ্যপুত্র।

৩৮

শ্যামাকান্তের প্রথম পত্রের উত্তর যে রজনীনাথ তেমন নিষ্ঠুরভাবে দিয়াছিলেন, তাহার একটা গোপন রহস্য ছিল।

শান্তির প্রতি অবিচার দণ্ড প্রদান করিবার পর যখন অনুতপ্ত চিত্ত বেদনার কষা পুনঃ পুন আঘাত করিয়া বলিল 'মূঢ়, তুমি নিতান্তই মূঢ়, ধিক্ তোমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে। এই বুদ্ধিতে তুমি নিরীহ মক্কেল ঠকাইয়া খাও।" তখন ইহাও স্মরণ হইল যে হেমেন্দ্র কোথায় গিয়াছে সে সন্ধান বাহির করিবারও কোন উপায় রাখা হয় নাই। সেদিন তাহাদের সঙ্গে কোন লোকও দেন নাই—যে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিল, কিম্বা কলিকাতার ভিতরেই রহিল, অন্ততঃ এইটুকুও জানা যাইবে। ছিঃ ছিঃ, একি আত্মবিস্মৃতি! একি বিচারের ভানে পূর্ণ অবিচারকে আশ্রয় করা! শান্তির সেই জলসিক্ত পদ্মপাপড়ির মত সজল চোখ দুটি বেদনাবিক্ষত বক্ষে রাত্রি দিন কাঁটার মতন বিঁধিতে লাগিল।

অনুসন্ধানের পথ নাই, কাহারও নিকট বলিতে আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে, বসুমতী অসুস্থতার দোহাই দিয়া শয্যাশ্রয় করিয়াছেন তাঁহার নিকটেই বা সান্ত্বনা কোথায়? গুরুভার চিত্ত কর্ম্মস্রোতে ভাসাইয়া দিন কাটিতে-ছিল বটে কিন্তু বিদ্রোহী রাত্রি যেন কিছুতেই আর পোহাইতে চাহিত না। নিঃশব্দে নিরানন্দে সময় নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মুকু এখন অনেকটা বড় হইয়াছিল, সে এখন লোকের সুখদুঃখ অনেকটা অনুভব করিতে পারে, দিদি হঠাৎ আসিয়া অন্তর্ধ্যান হইয়া যাইবার পর হইতেই যে পিতার মনে কষ্ট আশ্রয় লইয়াছে তাহা সে প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিতে পারিত। তবু দিদির সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ সত্ত্বেও পিতাকে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিত না। কিন্তু এবার দিদি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাহার চারখানা চিঠির একখানাও জবাব দিলে না কেন? এপ্রশ্ন সে বসুমতীকে দিনের মধ্যে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়া বলিত, 'দিদি কি যেন হচ্চে।' 'দিদি আমায় বোধ হয় ভুলে গ্যাছে!" বলিয়া অভিমান করিত; আবার মধ্যে মধ্যে "মা আমি দিদির কাছে যাব, আমায় পাঠিয়ে দাওনা" এই আব্দার ধরিয়া কাঁদিয়া রাগিয়া মাকে অস্থির করিয়া তুলিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও রজনীনাথ আজ ঘর হইতে বাহির হন নাই। চাকর তাহাকে একখানা ডাকের চিঠি আনিয়া দিল। চিঠিখানা লইয়া ডাকের ছাপ ও হাতের লেখার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই চকিত ভাবে রজনীনাথ বলিয়া উঠিলেন 'চৌধুরী মশায়ের চিঠি—' ক্ষিপ্রহস্তে খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মানসিক উদ্বেগে থর থর করিয়া হাত কাঁপিতে ছিল। কোন সংবাদ আছে নাকি? তারা কি তবে সেখানে? পত্রপড়া শেষ হইলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাগজ-খানার উপরেই দৃষ্টি স্থির করিয়া নত মুখে রহিলেন। তবে তাহারা ফিরিয়া আইসে

নাই! তবু খপর তো পাওয়া গেল, ফরাসডাঙ্গা কি এমন মস্ত সহর সেখানে তাদের সন্ধান—মিলিবে না? সুপ্রকাশ আসিয়া উৎফুল্ল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রজনীনাথ কিছু পরে সাগ্রহ আনন্দে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া হঠাৎ অজস্র চুম্বনে তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দিলেন, সুসংবাদের আনন্দ চাপিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সুকুও বুঝিয়াছিল এ আদরটা ঠিক তাহার জন্য নহে এর মধ্যে তাহার দিদির প্রাপ্যই অধিকাংশ। জিজ্ঞাসা করিল "বাবা দিদি ভাল আছে?" রজনীনাথ চিঠিখানা আবার একবার পড়িতে পড়িতে উত্তর দিলেন "ভাল আছে।" "দিদি কি আর আসবেনা বাবা?" পিতা শিহরিয়া উঠিলেন বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত সহসা একটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থমকিয়া গেল, কিন্তু তখনি জোর করিয়া মনকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—আমি কাল ভোরেই তাকে আনতে যাবো।' সুপ্রকাশ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল "আর আমি?" "তুমি তোমার মার কাছে থাকবে, দিদির জন্যে নতুন নতুন জিনিষ সব তৈরি করে রাখবে, দিদি এসে বলবে সুকু যেন বাঙ্গলার বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্ হয়েচে।" গৌরবে বালকের ললাট ও নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

একটা শিল্পকার্য্য লইয়া বসুমতী অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিলেন, কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। আজকাল আঙ্গুলের মধ্যে সূঁচ বিঁধিয়া যায়, চোখের ভিতর করকর করে, এমনি নানা রকম বাধায় আজকাল শিল্পকুশলা বসুমতীর সকল কার্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া থাকে, তথাপি সময় কাটাইবার একটা অবলম্বন তো চাই।

সবে মাত্র একটা ভুল করিয়া মনটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বাহিরে দুপ দাপ শব্দ সুপ্রকাশের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল। রজনীনাথেরও সাড়া পাইয়া বসুমতী হঠাৎ কাজের উপর অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া ফেলিলেন। সুকু ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল "মা মা, বাবা কাল সকালবেলাই দিদিকে আনতে যাবেন" সেলাইটা বসুমতীর হাত হইতে ভূমে পড়িয়া গেল, বিদ্যুৎসঞ্চালিতের মতন স্বামীর পানে ফিরিলেন। রজনীনাথ ধীরকণ্ঠে কহিলেন "আমি কাল ফরাসডাঙ্গায় যাবো।" "ফরাসডাঙ্গা! কেন, সেখানে—" "হ্যাঁ সেখানে তারা আছে খপর পেয়েছি।"

দাসীকে ডাকিয়া বসুমতী হরিরলুটের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। ফরাসডাঙ্গায় গিয়া একজন ধনী মক্কেলের সাহায্যে তাহাদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হেমেন্দ্রের বাসার সন্ধান কেহই আনিতে পারিল না। কাজে কাজেই রজনীনাথকে সে রাত্রি সেইখানেই থাকিতে হইল।

পরদিনও অনুসন্ধান ব্যর্থ হইল। ডাকঘরেও খপর লওয়া হইল, হেমেন্দ্র চৌধুরীকে কেহই চেনে না। হতাশ হইয়া রজনীনাথ ফিরিয়া চলিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া যোগেশের সন্ধানে লক্ষ্মীপুরে যাইবেন স্থির করিলেন। ষ্টেশনে পৌছিয়া প্রবেশ পথের সম্মুখেই দেখিলেন যোগেশের বাহু অবলম্বনে প্রবেশ করিতেছে হেমেন্দ্র। অভাবনীয় সাক্ষাৎ! প্রথমটা দুইজনেই হতবুদ্ধি হইয়া গেল,

এবং রজনীনাথও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যোগেশ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দুইহস্তে রজনীনাথের পদধূলী মাথায় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে এসেছিলেন, কাজ ছিল?" হেম যোগেশের আড়ালে আপনাকে একটুখানি ঢাকিয়া অল্পদূরেই দাঁড়াইয়া রহিল, সম্মুখেও আসিল না প্রণাম পর্য্যন্ত করিল না। রজনীনাথ উত্তর করিলেন "হ্যাঁ কাজেই এসেছি, তবে সে কাজ এখনও আমার বাকি রয়েছে, যোগেশ! শান্তির কাছে আমায় নিয়ে চলো, আমি বাড়ির সন্ধান করতে না পেয়ে ফিরছিলুম।" যোগেশ হেমেন্দ্রের দিকে চকিত কটাক্ষনিক্ষেপ করিল, দেখিল তাহার মুখ ঈর্ষার বিদ্বেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বলিবার জন্য অধর কম্পিত হইতেছিল। ইঙ্গিতে যোগেশ তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল "বেশতো আসুন না, আপনি না এলে আমিই বোধ হয় কাল আপনার ওখানে যেতুম।—দাঁড়ান্ একটা গাড়ি ঠিক করি"—যোগেশ গাড়ি ডাকিতে একটু অগ্রসর হইয়া গেল, তাহার অনুসরণ করিয়া হেমেন্দ্র বিরক্তির স্বরে বলিল "যোগেশ তোমার মতলবটা কি? ওকে কেন তুমি নিয়ে যেতে রাজি হলে? কি তেজ দেখেচ? আমাকে দৃক্‌পাতও নেই, যেন দেখতেই পেলেন না! মনে করেছেন মেয়ে নিয়ে যাবেন, দিচ্চি তাই নিয়ে যেতে!" যোগেশ মৃদুস্বরে বাধা দিল 'থামো না, লোকটাকে চটিয়ে কি হবে? দেখনা সহজেই কাজ সারা যাবে এখন, তবে আমার ওপোর যদি নির্ভর করো তো তুমি একটিও কথা কয়োনা, আর যদি পারতো ভাল ব্যবহারই করো।"

হেম যোগেশের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহাকে যেমন গড়িতেছে শিব বা বানর সে নির্ব্বিবাদে তাহা হইতেই প্রস্তুত আছে। সে সম্মত হইল। গাড়ি আসিলে প্রথমেই রজনীনাথ উঠিয়া বসিলেন, হেমের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন "এসো যোগেশ।" যোগেশের ইঙ্গিতে হেম সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। যোগেশ ও হেম গাড়িতে উঠিলে মুমূর্ষপ্রায় অশ্বদ্বয় চাবুকাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

পথ অনেকটা দীর্ঘ, অশ্বের গতি অত্যন্ত মন্থর, সময় লাগিল অনেক। পথের মধ্যে যোগেশ বলিল; "আপনার কাছে যাবো বলছিলুম এইজন্যে যে বোঠাকরুণের মাথাটা যেন দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্চে তাই ছোটবাবু বড় ভয় পেয়েছেন। এই আজই তিনিই আমায় বলছিলেন আমি হঠাৎ রাগের মাথায় বড়ই গর্হিত কাজ করে ফেলেচি, এখন কি করবো ভেবে পাচ্চি না, কেমন করেই বা ওঁদের কাছে মুখ দেখাই, তাছাড়া তোমার বোঠাকরুণেরও যে কি হয়েচে সে কিছুতেই লক্ষ্মীপুরে বা কলকাতায় যেতে চায় না। জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বলে ট্রেণের তলায় পড়ে মরবো, তুমি কিছু উপায় করো। তা দেখুন এর আর আমি কি করবো? আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হোল এই যে আপনাকে আমি গিয়ে সব বলি। আপনি যখন নিজেই এসেছেন তখন আর কথাই কি? আমরা নিশ্চিন্ত হলুম আপনি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যান।"

রজনীনাথ ভালমন্দ কোন কথাই বলিলেন না, কিন্তু মনের মধ্যে হঠাৎ যে বেত্রাঘাতের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, গাম্ভীর্য্যের চেষ্টার মধ্য দিয়াও তাহা মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যোগেশ পুনশ্চ একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল "নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে, তা নৈলে আর অমন বুদ্ধি কি এমনি হয়েই বদলে যায়? কর্ত্তার নামও শুনতে পাবেন না, আপনার কাছে যাবার কথা শুনলেও;—তা ওসব কথায় কাজ নেই আর, আপনাকে দেখলে হয়ত আবার মন ফিরতেও পারে। আমি কত বোঝালুম তা বল্লেন কি,—আমি মনে করি আমার কেউ নেই, এখন বুঝতে পেরেচি স্বামীই জগতে শুধু আপনার, কেউ আপনার নয়,—কারুকে চাই না।"

রজনীনাথের আত্মসম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি একটা সন্দেহ, একটা আশা—কিন্তু লাভ কি? যোগেশের এত মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? লাভ থাকিলে অনেক লোকে মিথ্যাকে কি রকম সাজাইয়া তুলিতে পারে সে কথা রজনীনাথ ভালই জানিতেন, কিন্তু একি অহেতুক মিথ্যা নয়? কষাঘাতে জর্জ্জরিত অশ্ব একটা গলির সম্মুখে থামিলে তেমনি আত্মজর্জ্জরিতচিত্তে রজনীনাথ যখন সেই প্রদর্শিত গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন আবার তাঁহার হৃদয় অনুতাপ পূর্ণ বেদনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেননা এইখানে সে বাস করিতেছে আর সেই ব্যবহার পাইবার পর! কিন্তু হায়! বৃথা তাহাকে দোষী করিতেছেন। সম্মুখেই হেমেন্দ্রের বাড়ী, যোগেশ দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, রজনীনাথকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগেশের ইঙ্গিতে হেম কহিল "আসুন"। যোগেশ কহিল "হঁ্যা, আসুন আপনার কথা শুনলে তাঁর মন ফিরতেও পাবে।"

রজনীনাথ কিছুই বলিলেন না, বলিবার শক্তিও বোধ হয় অল্পই ছিল, আবার দারুণ সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। সত্যই কি তবে সে এতখানি ভুল বুঝিয়াছে! পিতার একান্ত বিশ্বাস ও স্নেহও কি সেই দণ্ডের মধ্যে সে প্রকটিত দেখিতে পায় নাই? সে কি জানেনা কি কষ্টই এতদিন ধরিয়া তিনি ভোগ করিতেছেন? কই সে বুঝিয়াছে? এতদিন একখানা পত্রও কি সে কোন রকমে লিখিতে পারিত না? হায়! বুকের রক্ত দিয়া গড়া তাঁহার শাস্তি! উত্তেজনায় মাথায় ও মুখে গরম রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হেমেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া, কহিল সে দেখা করতে চায় না,—বলে"—রজনীনাথ উদ্যত আঘাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবারই জন্য যেন দুই পদ পিছাইয়া গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বাধা দিয়া উঠিলেন "থামো আমি শুনতে চাই না সে কি বলে, নিজে একবার"—"তীক্ষ্ণ শ্লেষের মৃদু হাসি হাসিয়া হেমেন্দ্র বলিল "তবু শুনুন কি বলে। সে বলে কুকুর শেয়ালের মত তো রাতদুটোর সময় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েচেন, তাতেও কি সাধ মেটে নি, আর কেন? একবার চলুন দেখা কর্ব্বেন,

আমার কোন আপত্তি নেই—"সমরনিপুণ সেনাপতি যেমন তাঁহার দৃঢ় বর্ম্মাচ্ছাদিত বক্ষে সহসা একটা অলক্ষ্য গোলার আঘাত পাইলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ বেদনাত্রস্ত হইয়া উঠে সেইরূপ আশাহতভাবে রজনীনাথ দ্রুতপদে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যোগেশও তাঁহার অনুসরণ করিল। হেমেন্দ্রকে আসিতে ইঙ্গিত করিলেও সে গেল না। নিকটে গিয়া যোগেশ তাঁহার ভূতাহতের মত বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া একটু যেন চমকিয়া উঠিল একটু যেন অনুতপ্তও হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিক স্বার্থপরতা করুণাকে সর্ব্বদা পরাজয় করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও অসুরের জয় হইল। হেমেন্দ্র শ্বশুরের সহিত মিলিত হইলে মোকর্দ্দমাটা বাধে না, তাহা না বাধিলেও যোগেশ যে তাহার ভাঙ্গা বাড়ি মেরামত করিয়া দ্বিতল গৃহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহা অসমাপ্তই থাকিয়া যায়, সেজবধূর কোমরের বিছা ও ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ পরার সাধও অপূর্ণ থাকে। যোগেশ শ্যামাকান্তের ন্যায় রজনীনাথকেও তাহার স্বার্থসিদ্ধির কল প্রস্তুতের লোভে সঙ্গে আসিয়াছিল। আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল— "আমায় মাপ করবেন,—নিজে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই ভাল হতো না, হেম যদি ঠিক না বুঝতে পেরে থাকে। তা ছাড়া যদি অভিমান করেই কিছু বলে থাকেন, আপনারই ত সন্তান—" রজনীনাথ দাঁড়াইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল "আমার সন্তান? না আমার সন্তান হলে আমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিতে পারত না, এ আমি কাকে খুঁজতে কোথায় এসে পড়েছিলাম। আমার সন্তান কাকে বলচো যোগেশ! যে আমায় চেনে না সে আমার সন্তান? না।"

রজনীনাথ একরকম প্রায় ছুটিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, ডাকিয়া বলিলেন "ষ্টেশন চলো, হাঁকাও"। হতবুদ্ধি যোগেশ দাঁড়াইয়া রহিল, বুঝিল সবাই শ্যামাকান্ত নহে। হেমেন্দ্র যখন সেই জনহীনপ্রায় নিস্তব্ধ বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তাহার দুই চোখে যেন একটা আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল। তাহার ওষ্ঠে নিষ্ঠুর মৃদু হাসি অত্যন্ত গৌরবের ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সুন্দর চেহারাখানাকে উপাখ্যানবর্ণিত দৈত্যের মতন ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ সে যে অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া লইতে পারিয়াছে তাহার জন্য যোগেশকে ও নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল। শ্বশুরের সম্মুখে মনটা এখনও সঙ্কুচিত হইয়া আইসে বটে কিন্তু তথাপি সে পৌরুষের সাহায্যে সেই দুর্ব্বলতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে।

পশ্চিম দিকের ছোট ঘরখানায় তক্তপোষের উপরে মলিন শয্যায় ম্লান ছায়াখানির মতন শান্তি শয়ন করিয়া আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘর কনকনে হইয়া উঠিয়াছিল, দুএকদিন বোধ হয় মেঝেয় ঝাঁট পড়ে নাই। হেমেন্দ্র দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "আমি মনে করচি একবার আজ কল্‌কাতা যাবো। কাঁহাতক আর এই বনের মধ্যে পড়ে থাকি। তোমার অসুখ ত কমই আছে?" শান্তি দেওয়ালের দিক হইতে মুখ ফিরাইল "আমি? আমি ভালই আছি—বাইরে কে এলো?

ও জুতোর শব্দ যে আমি চিনি,—উঠতে গেলুম পারলুম না, কে এলো ?”

হেমেন্দ্র একটু চকিত একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিল “ও একটি বাবু, ঐ রায়েদের বাড়ির”। শান্তি ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে আপনাআপনি কহিল “বাবার মতন জুতোর শব্দ কিন্তু—”হেমেন্দ্র মনে মনে আশ্চর্য্যানুভব করিলেও প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না, বিদ্রুপ করিয়া বলিল “হাঁগো হাঁ, তোমার বাবার ত তোমার জন্য ঘুম হচ্চে না। তুমিই বাবা, বাবা করে মর, তাঁর ত ভারী মায়া !” আহত ভাবে শান্তি মাথা তুলিল “অমন কথা বলোনা, তাঁর দোষ কি ? তিনি তো বলেছেন জ্যেঠামশাই ক্ষমা করলেই তিনি ক্ষমা কর্ব্বেন, আমরা”—

হেম অধৈর্য্য হইয়া উঠিল—“থামো থামো আমার লেকচার শুনবার সাবকাশ নেই। আমি চল্লুম কালও হয়ত আসতে পারব না, যা দরকার হয় ঝিকে দিয়ে করিও, আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি আর পারছি না—”

হেমেন্দ্র গমনোদ্যত হইল, শান্তি ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে কহিল “পারবার দরকার কি ? আমায় জ্যেঠামশায়ের কাছে দিয়ে এসোনা—”

হেমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল “ক্ষেপেচ।”

সেদিন সন্ধ্যার পর রজনীনাথ বাড়ি পৌঁছিলে প্রথমেই সুপ্রকাশ গাড়ির কাছে ছুটিয়া আসিল। “দিদি এলি ভাই ?” গাড়ির মধ্য হইতে রজনীনাথ ধীরভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। গাড়ির ভিতরে দিদির কোন চিহ্নই না পাইয়া বালক তাহার গভীর আনন্দের মধ্যে অত্যন্ত আঘাত বোধ করিল। বিস্ময়বেদনাবিস্ফারিত নেত্রে পিতার পানে তাকাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল “বাবা, দিদি ?” রজনীনাথ কোন উত্তর করিলেন না বা পুত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না, একেবারে নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। শ্যামাকান্তের পত্রের উত্তর লিখিয়া ভৃত্যকে তাহা ডাকে দিতে দিয়া যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন বসুমতী পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন, শান্তি যে আইসে নাই তাহাও জানিতে বাকি ছিল না, ভয়ে ভাবনায় তিনি শুথাইয়া উঠিয়াছিলেন, সুপ্রকাশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

৩৯

যমুনার পোলের উপর হইতে মথুরাপুরীর প্রাসাদমন্দিরময়ী সমৃদ্ধনগরী বড়ই মনোরম দেখায়। সারি সারি উচ্চোচ্চ প্রাসাদমালা ও তাহার নীচে প্রশস্ত প্রস্তর সোপান শ্রেণী অগ্রসর হইয়া যমুনার সুনীল জলতলে নামিয়া গিয়াছে। প্রতি ঘাটেই ঘাট আলো করিয়া অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গী ব্রজরমণীগণ স্নান করিতেছে, তাহাদের হাস্যের ঝঙ্কারে ও সৌন্দর্য্যের ছটায় জড়প্রকৃতি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। নীরদ গাড়ীর গবাক্ষ হইতে প্রীতিপূর্ণনেত্রে চারিদিককার দৃশ্য পরম আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল। অনেকদিনের পর কোন আত্মীয়জনকে দেখিতে পাইলে মনের মধ্যে যেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ জাগিয়া উঠিয়া নানা কথা, নানা স্মৃতিকে চারিদিক হইতে টানিয়া

আনে তেমনিতর একটা স্মৃতিপূর্ণ আনন্দের ভাব তাহার চিত্তকে ইহাদের দিকেই টানিতে লাগিল। ক্রমে পোল ছাড়াইয়া হরিৎ শস্য ও পুষ্পখচিত মাঠের মধ্য দিয়া কৃষক বালিকার সকৌতুক কালোচোখের সম্মুখ দিয়া মৃদুমন্দ গমনে ট্রেনখানি যথাস্থানে আসিয়া থামিল। সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে একটিমাত্র ব্যাগ ও একখানা ছাতা, কাজেই কুলীদের ঝাঁক চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ফেলিল না বটে তবে ঘেরিয়া ফেলিল পাণ্ডারা। কি নাম? গোত্র কি? কোথায় নিবাস? বাসা স্থির আছে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন ও তাহাদের পরস্পরের শিকার পাকড়াইবার বিবাদে যাত্রীকে এক মুহূর্ত্তেই কণ্ঠাগত প্রাণ করিয়া তুলিল। নীরদ তীর্থদর্শন করিতে আসেন নাই, আত্মীয় গৃহে আসিয়াছেন এই সামান্য কথাটা কোনমতেই যখন তাহাদের বুঝাইয়া দিতে পারিল না, তখন অসহায়ভাবে তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়া বলিল 'তবে আমায় কোথায় যেতে হবে না হয় চলো তাই যাই।' কিন্তু তাহাতেও মুক্তি পাইল না। সে কাহার ভাগের সম্পত্তি তাহা স্থির না হইলে কেহই তো ছাড়িয়া দিবে না। ক্রমে রীতিমত সংগ্রাম বাধিয়া হাতাহাতির উপক্রম হইল, একজন নীরদের ডান হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল "চলুন বাবু আমি আপনার পাণ্ডা হলুম, রঘুবল্লভ মিশ্র সাড়েসাত ভাই আমরা, আমরাই সকলের প্রধান; আমার সঙ্গে চলুন" আর একজন তাহাকে ধাক্কা দিয়া তাহার অন্য হস্ত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, বলিল "কি মতলববাজ লোক তুমি! এ বাবু আমার, এসো বাবু আমি তোমায় ভাল বাড়ি দোব আমার সঙ্গে এসো।"

এইরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়াই পণ্যদ্রব্যের মতন কাড়াকাড়ি টানাটানির পর নীরদ অবশেষে প্রথম পাণ্ডার অংশভুক্ত স্থির হইলে বাকি সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিকারের সন্ধানে চলিয়া গেল। নীরদ মুক্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ভাবিল, রক্তপিপাসু কুকুরগুলাই বা ইহাদের চেয়ে কি বেশি অত্যাচার করে!

গাড়িওয়ালারাও একবার এইরকম একটা অভিনয় করিবার ইচ্ছায় প্রস্তুত ছিল কিন্তু সে 'গাড়ি চাহিনা' বলিয়াই তাড়াতাড়ি তাহাদের সীমানা ছাড়াইয়া আসায় একটু ডাকাডাকি করিয়াই অগত্যা তাহারা ক্ষুণ্ণ মনে নিবৃত্ত হইল। নীরদ ষ্টেশন পার হইয়া সহরের দিকে গেল না, বিপরীত পথ ধরিল, দেখিয়া সঙ্গী পাণ্ডা কহিল "বাবু এই তোমার পাণ্ডা চাইনা, এক্ষুণি পথ ভুল করলে, ও রাস্তা নয় এই সহরে ঢুকবার রাস্তা।" নীরদ দাঁড়াইল, পকেট হইতে মনিব্যাগটি বাহির করিয়া তাহা হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া পাণ্ডার হাতে দিয়া বলিল, "তোমার যা পাওনা তা দিলুম বাপু, তুমি ঘরে যাও, আমার সঙ্গে ঘুরতে তুমি পেরে উঠবে না।" পাণ্ডা বিস্মিত হইয়া নূতনধরণের লোকটাকে সন্দিগ্ধভাবে দেখিতে লাগিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুর দেখবেন না? নীরদ বলিল "তোমার কাজতো হয়ে গেল, তুমি কেন এইবার যাওনা।" পাণ্ডা ভাবিল এলোকটা নিশ্চয় খৃশ্চান! যাই হোক দুটো টাকাতো দিয়াছে

অথচ পরিশ্রমও লাগিল না! সে আশীর্বাদ করিয়া ফিরিয়া গেল। নীরদ সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

তিন দিকে অসীম প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, একদিকে যমুনা। মাঠের মধ্যে মধ্যে গম, সরিষা, ও ছোলা মটরের ক্ষেত অর্দ্ধ পক্ক শস্যে হরিতাভ হইয়া উঠিয়া মাতা বসুন্ধরার শ্যামাঞ্চলের মতন শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে কলাইসুঁটির প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ বেগুনী রংয়ের উজ্জ্বল আভায় ভায়োলেটের মতন ক্ষেত আলো করিয়া রহিয়াছে! কোথাও সর্ষে ফুলের নিকট মৌমাছির দল মাতাল হইয়া ঘুরিতেছিল। মৃদু বাতাসে গাছের মাথা নুইয়া নুইয়া পড়িয়া একটা সর্ সর্ তর্ তর্ শব্দ উঠিতেছে, এবং তাহার সহিত মিশিয়া যমুনার তীর হইতে কোন একটি যুবকের সুমিষ্ট কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের একটি চরণ ভাসিয়া আসিতেছিল। নীরদ শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিল "কৈসে যাঁউরে যমুনা?" নীরদ মুগ্ধনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। পশ্চিমদিকে সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাধাহীন মাঠের শেষে সূর্য্যাস্তের বিপুল সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিল। ভূমার সহিত ভূমির, ক্ষুদ্রের সহিত মহতের এই যে অনাদি সম্বন্ধ-চিরসম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা কি কোন একদিনের জন্যও ছেদিত হইতে পারে! রক্তবর্ণ কিরণছটা সহস্রবাহু বিস্তার করিয়া ধরণী বক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চাহিতেছে; আকাশে পুঞ্জমেঘের শুভ্র স্তর তাহার গোলাপী আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরদ নিকটবর্ত্তী একটা দেবদারু গাছের তলায় বসিয়া দেখিতে লাগিল। আর অল্পক্ষণ পরেই সসীমের সহিত অসীমের মিলনে যে একটু বাধা আছে অন্ধকার সেটুকুও মুছিয়া দিবে। এই যে মিলনের জন্য ব্যগ্র ব্যাকুলতা, এই যে দুই বাহু বাড়াইয়া কাতর আবাহন, অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার মধ্যে সমর্পণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হইবার যে একটা ঐকান্তিকতা ইহাদের তো ফল আছে? নীরদ নীরবে চাহিয়া রহিল। চারিদিকের সাড়াশব্দ ডুবিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, মধুকরের গুঞ্জন ও রাখাল সখার হাস্য পরিহাস থামিয়া এখন কেবল এক অবিচ্ছিন্ন মহারাগিণীর অনন্ত অব্যক্ত সঙ্গীত জনহীন প্রান্তরে ও অন্ধকার জগতে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নীরদ নক্ষত্র বিরল আকাশের পানে চাহিল। স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সেই অনন্ত আকাশ চিরপ্রশান্ত চিরউদাসীন ভাবে সস্নেহ নেত্রপাতে জাগিয়া আছে। সূর্য্যের প্রতপ্ত কিরণ গ্রহ তারকার বিমল জ্যোতিঃ কিছুই তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কি মহান্ উদারতা কি অপূর্ব্ব মহিমা! নীরদ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, স্তব্ধ অন্ধকারে ঝিল্লীর একতান বিশ্বতপোবনো-চ্চারিত এক অনাদি ধ্বনির সহিতই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, শীত রাত্রির মুক্ত আকাশ ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকিয়া গিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতিকে যোগীন্দ্রের সমাধিমূর্ত্তির মতনই স্থির ও প্রশান্ত দেখাইতেছিল।

নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, কিসের লজ্জা কিসের সঙ্কোচ! এখনও এত অভিমান! আমিত্বের এতখানি অহঙ্কার এখনও হৃদয়দ্বারের কপাট চাপিয়া প্রহরা দিতেছে?

না—বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডিত বিভক্ত যেমন এই একের মধ্যে মিশিয়া এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ও অবিভক্ত ভাবে পরিণত হইয়া গেল তেমনি করিয়া লজ্জা সঙ্কোচ সব সেই এক কর্ত্তব্যের মধ্যে ডুবাইয়া ফেলিতে হইবে। অন্ধকারে কষ্টে পথ চিনিয়া সে সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল।

সূর্য্য পৃথিবীকে ও গ্রহগণকে, আকর্ষণ করিতেছেন, সেই আকর্ষণের বলে সূর্য্যের পানে তাহাদের অবিরাম গতি, আবার গ্রহগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উপগ্রহ সকল তাহাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইরূপে কত কোটি সূর্য্য, কত গ্রহ, উপগ্রহকে অবিশ্রান্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে। আবার সেই সমুদয় সৌরজগৎই যে কোন এক অতীন্দ্রিয় মহাশক্তির পার্শ্বে ক্ষুদ্র নক্ষত্রবিন্দুরই মতন আকৃষ্ট হইয়া অহোরহঃ ভ্রমণ করিতেছে না তাহারই প্রমাণ কোথায়! আকর্ষণই সৃষ্টির ধর্ম্ম, তাই দৃষ্ট পদার্থমাত্রেই আকর্ষণধর্ম্মী, পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট! নীরদ কল্পনানেত্রে দেখিতে লাগিল যমুনা-তীরের সেই ক্ষুদ্র বাতায়নটি। যমুনার জল স্থির হইয়া রহিয়াছে আকাশ আপ্রান্তনক্ষত্র খচিত, বাতাস গাছের পাতার মধ্য দিয়া থামিয়া থামিয়া বহিতেছিল, আর সেই স্তব্ধ নির্জ্জনগৃহে দূর আকাশের দিকে অচঞ্চল নির্নিমেষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একজন একা বসিয়া। কোথাও কোন মনুষ্যের সাড়াশব্দ নাই, বিশ্রাম শয়নে সকলেই শান্তি উপভোগ করিতেছে, শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকেই তাঁহার স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। শুধু সেই একা জাগিয়া! নীরদ নিজেরও অজ্ঞাতে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, ওই যে দুটি নিদ্রাহীননেত্র তাহাদের সুদীর্ঘ কৃষ্ণপল্লবের মধ্য হইতে যুগল তারকার মত রাত্রির পর রাত্রি অনিমেষে চাহিয়া আছে, ওই যে হৃদয়খানি তাহার বাহিরের সকল ঝটিকা, সকল বজ্রনাদ উপেক্ষা করিয়া মৌন দৃঢ়তায় আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিয়া সম্প্রজাগ্রত রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে কি একটা আকর্ষণীশক্তি নিহিত নাই?

জগতে কোন শক্তি ব্যর্থ যায় না, চুম্বক লোহাকে বুঝি এমনি করিয়াই টানিয়া আনে? গভীর রাত্রে বদ্ধগৃহের দ্বার ঠেলিয়া স্পন্দিত বক্ষে রুদ্ধপ্রায় নীরদ ডাকিল "শিবানী! শীতের রাত্রে রুদ্ধদ্বার প্রতিবাসীগণ সকলেই নিদ্রামগ্ন, গলির মধ্যে অন্ধকার নিবিড় হইয়া জমিয়া রহিয়াছে, সম্মুখেই জল কল কল শব্দ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, ঘুমন্তরাত্রে কেবলমাত্র পল্লীর প্রান্তবর্ত্তী কোন স্থান হইতে এসরাজ ও তবলার চাটির সঙ্গে একটা সঙ্গীতের সাড়া আসিতেছিল ও প্রমত্তকণ্ঠে 'হাহাহাঃ, অথবা 'হায় হায়' ইত্যাদি সঙ্গত শোনা যাইতেছে। নীরদের আহ্বান তাহারি বক্ষে কম্পিত হইয়া উঠিল, কেহই উত্তর দিল না। গৃহে কেহ বাস করিতেছে এমন কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, কোথাও আলোকের রেখাটি পর্য্যন্ত নাই। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল দ্বারে বাহির হইতেই তালা বন্ধ। নীরদের হৃদয় স্তম্ভিত বেদনায় নিশ্চল হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট রাতটুকু—যে দ্বারে সে একদিন আশ্রয়হীন, নিরাত্মীয় ও রোগাক্রান্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেই নিতান্ত

দুরদৃষ্টের]• সময় যে তাহাকে নিজের কোলে সাদরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, আবার একদিন যাহার অনুযোগ তিরস্কার ও মিনতি উপেক্ষা করিয়া সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল সেই দ্বারে বসিয়াই সে কাটাইল। যেটুকু সুখ সে মাতৃহীন হইবার পর লাভ করিয়াছিল, তাহা এইখানেই—সেকথাআজ সে অনুভব করিতে পারিল। অভাগিনী যে তাহাকে তাহার সর্ব্বস্বই দিয়াছিল, আর সে তাহার মূল্য না বুঝিয়া তাহাকে ধূলায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এতদিন পরে আবার সেই অনাদৃত দান কুড়াইয়া লইতে আসিয়াছে, কিন্তু কই? তাহার পশ্চাতে কি এই ক্ষুদ্র দ্বার চিররুদ্ধ হইয়া গিয়াছে?

ভোবের আলোক প্রকাশিত হইতে না হইতে রাস্তায় লোক চলাবলা আরম্ভ হইয়া গেল, ঠাকুরবাড়িতে নহবতে ভৈরবী রাগিণী বাজিতে লাগিল, নীরদ নিকটবর্ত্তী দোকানের সদ্যজাগ্রত ছোকরা দোকানীকে সিদ্ধেশ্বরীর বাটীর অধিবাসিদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। এ দোকানী নূতন লোক নীরদকে চিনিত না, সে বাঙ্গালী বাবুকে একজন ভাল খদ্দের মনে করিয়া খাতির দেখাইয়া বলিল "আপনি ও বাড়ী ভাড়া নেবেন? তা নেন্ না, কলি ফিরিয়ে নিলেই সব দোষ কেটে যাবে এখন। না হয় একটু বিলিতি ওষুধ ছড়িয়ে দিলেই হবে।" নীরদ তাহার কথার প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কেন ও বাড়ির কি হয়েছে? বাড়ীর লোকেরাই বা গেল কোথায়?"

দোকানী গম্ভীর হইয়া বলিল "আর সে কি কথা বল্‌বো বাবু! ঐ সে দিন পেলেগ হয়ে বাড়িতে দুজন মারা গেল না! আহা মেয়েটি ত নয় যেন সাক্ষাৎ রাধিকা ঠাক্‌রুণ একখানি থানপরা—তাতেই যেন রূপ ফেটে পড়চে—"

নীরদ্ আর দাঁড়াইল না।"

বন্ধন কাটিয়া আসিতেছে! শিবানী নাই, পাষণ্ডের নিষ্ঠুর অত্যাচার বক্ষে লইয়া নীরবে জীবনের দুঃখভার বহন করিয়া সে সকল যন্ত্রণার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে! ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মচ্ছেদি তৃষা আজ তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া নাই। অনাদৃত সেই প্রেমমাল্য যাহা সে ছিঁড়িয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই সুরভি হার আজ যাহার কণ্ঠ হইতে কোনদিন স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই তাহার বক্ষে লুণ্ঠিত! অনাদৃত ও অনাদৃতা উভয়কেই তিনি তাঁহার অমৃত বক্ষে তুলিয়া লইয়া সাদরে স্থান দিয়াছেন!

নীরদ আজ মুক্ত! যে বন্ধনের ব্যথা বন্ধন ছাড়াইয়া গিয়াও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়ে নাই, আবার যে বন্ধনের মধ্যে আসিতে হইবে মনে করিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও ভাবনায় তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া থামিয়া গিয়া তাহাকে পৌরুষহীন জড়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিতে প্রায় সক্ষম হইয়া আসিয়াছিল সে আজ স্বয়ংই যখন তাঁহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিল তখন নীরদ, —কই মনে করিতে ত পারিল না যে সে আজ ভাগ্যবান, সে আজ মুক্ত! মুক্ত! এরি নাম মুক্তি? সে কি ইহাই চাহিতেছিল?

সে অনাহারে অনিদ্রায় যেমনি আসিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে হিম কুহেলিকার ন্যায় সমস্ত নগরী তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল। বাষ্পযান প্রচুর ধূমোদ্গারণের সহিত উচ্চ চীৎকার করিতে করিতে দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিল। দুই পাশে গিরি, নদী দেবালয় গ্রাম ও সুবিস্তীর্ণ মাঠ বায়স্কোপের বিচিত্র চিত্রের মতন একটার পর একটা দেখা দিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল। কত পুরাতনের স্মৃতি, কত নূতন অধ্যবসায়, কত সুখদুঃখ, হাসি কান্নার সম্মিলিত রূপ ইহাদের মধ্যে মিশ্রিত, কতদিনের কত কথাই ইহাদের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। নীরদ অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। চলন্ত গাড়ির সহিত দৃশ্য সমুদয়ও চলিতেছে, চঞ্চল চিত্তের ভিতরেও সহস্র স্মৃতি ওতপ্রোত ভাবে উঠিতে পড়িতেছিল, তাহার জীবনের গতিও এই রকম মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছিল না কি? বেদনায় বুকের ভিতর হৈ হৈ করিয়া উঠিতেছে, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল, হাত পায়ের তলা শীতল ও বলহীন হইয়া আসিতেছিল। হায়! কোন দিনই কি সে শান্তির মুখ দেখিতে পাইবে না? অভিশপ্ত! এমনি করিয়া কি আমরণ বিমান মার্গে কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতন লক্ষ্যহীন পথেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, কক্ষায় ফিরিতে পারিবে না?

ইহার পূর্ব্বে আর কখনও তাহার আশা উৎসাহ ও উন্নতির সহিত শিবানীর কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, বরং তাহাদের নিকট হইতে মূর্খ শিবানীকে সে সম্পর্কে দূরেই সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু যখনই সে কল্পনা করিতেছিল তাহার তপোবনে ওই ক্ষুদ্র আশ্রম গৃহের মধ্যে শিবানী গৃহলক্ষ্মীর আসনে উপবিষ্টা,—ক্ষৌম্য-বসনা শঙ্খবলয়ধৃতা প্রশান্তবদনা নারী তাহার পূতহস্তে আশ্রম খানিকে পবিত্রতম করিয়া তুলিয়াছে, আনন্দময়ী জননী রূপে শিষ্যবৃন্দকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সে তাহার কর্ম্মভার লঘু করিয়া দিয়া নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিতেছে, আবার নিয়মিত পূজা উপাসনা কালে তাহার পার্শ্বে বিরাজিতা রহিয়া তাহার শাস্ত্রালোচনা, তাহার শাস্ত্র ব্যাখ্যায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়া বিশ্রামে কর্ম্মে ক্লান্তিতে সুখেদুঃখে এক হইয়া গিয়াছে,—যখন এমন করিয়া তপস্বিনী সহধর্ম্মিনীর একখানি ছবিকে বড়ই সাবধানের সহিত অল্পে অল্পে হৃদয় ফলকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার দিকেই লোলুপ দৃষ্টি সংন্যস্ত করিতেছিল। তখনি নীরদের সেই আশা কল্পনা যেন মরু মরিচীকা বাগান পুষ্পবৎ কল্পনাতে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। শূন্য কামরার জানালার কাঠের উপর মাথা রাখিয়া নীরদ জ্বালাময় চক্ষু মুদিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, হায় সে যদি আরও কিছুদিন আগে আসিত! সেই যখন আসিলই তখন এত বিলম্ব করিল কেন!

হাট্‌রাস্ জংশনে গাড়ি থামিয়া গিয়াছে আরোহিগণের এইখানেই, অন্য গাড়ি ধরিবার কথা। কুলীর "বাবু! বাবু!" ডাকে সজাগ হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি নীরদ নামিয়া পড়িল —তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

অদূরে বিশ্রাম স্থান, পঞ্জাবমেল আসিতে তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরি, একটা কুলীর

হাতে ব্যাগটা দিয়া নিশ্চল প্রায়-চরণকে টানিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল শরীর যেন বহিতে পারিতেছিল না, মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছিল। এমন সময় 'মিঃ রায় না? এই যে তুমি কোথা থেকে?' বলিয়া-পিছন হইতে কে কাঁধে হাতে দিল। নীরদ ফিরিয়া দেখিল মাদ্রাজের একটি পরিচিত বন্ধু বীরেশ্বর। নীরদকে দেখিয়া সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিল তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা গেছলে? এখন যাচ্চো কোথায়?" নীরদ বলিল "বৃন্দাবন থেকে আসচি, বোধ হয় কলকাতায় যাবো" "বোধ হয়?" নীরদ একটু খানি ইতস্ততঃ করিল 'না কলকাতাতেই যাবো? তুমি কোথায়"? "আমি যাচ্চি একটু ভ্রমণে। এই দিল্লি। তুমি গিয়েছিলে? নীরদ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে না। "বলোকি জগতের মধ্যে একটা প্রধান জিনিষই দেখলে না, এ্যাঁ? না না, তাকি হয় চলো আমার সঙ্গেই চলো একটু ঘুরে আসবে। কটা দিনই বা! তার পর আমি চন্দন নগর, আর তুমি হাবড়া ব্যস্; কিহে কথা কওনা যে, যাচ্চো তো তাহলে? তোমার চেহারাটা বড্ড শুখিয়ে গ্যাছে তা অসুখ বিসুখ হলে কিচ্ছু ভয় নেই, আমার সঙ্গে এই দেখো হোমিওপ্যাথিক বক্স, 'রুবিনীর কাম্ফার 'কুইনিন' এই সব। পেটেণ্ট টেটেণ্টও কিছুই আমি কিনতে বাকি রাখিনি, আমার হৃদয়টা ভারি দুর্ব্বল কিনা তাই ওষুধের বিজ্ঞাপন দেখলেই পড়ি,—হ্যাঁ তবে আমার রোগটার একটা সুলক্ষণ এই, সকল রকম রোগের ব্যবস্থার সঙ্গেই মেলে। এখন ডাক্তারের হুকুমে বেড়াতে বেরিয়েচি। হ্যাঁ তাহলে তুমি দিল্লীই যাচ্চো কেমন? একা মন লাগেনা"।

নীরদ দুটো দিন তাহার অন্তরের আঘাতটা সামলাইয়া লইবার জন্যও ব্যয় করার প্রয়োজন বুঝিয়াই উত্তর করিল "চলো তবে কিন্তু ঐখান থেকেই ফিরবো"। বীরেশ্বর মহাস্ফূর্ত্তির সহিত তাহার হাতটায় একটু ঝাঁকা দিয়া সোৎসাহে কহিয়া উঠিল "ভয় নেই তাই হবে"।

অন্তরতর।

তখন দু'জনে দেখা হয়েছিল
সেথায় মুক্ত মাঠের মাঝে;
ফাল্গুনে মিঠে বসন্ত বায়
বহেছিল ধীরে উদাস সাঁঝে।
দূর হ'তে সেই দেখেছিনু তোরে,
লুব্ধ আমার দু'টি আঁখি ভরে',
কি জানি কি ভেবে হেরিয়া গো মোরে
চকিতে অয়ি,
আনত চক্ষে চলে' গেলে তুমি
লো সুধাময়ি!

এখন যে হেথা কঙ্কণ-করে
কুন্তলজাল এলিয়ে দিয়ে—
লীলায় বহিছে মন্দ মলয়
পুলকে আঁচল দুলিয়ে নিয়ে।
কাছাকাছি আজি রয়েছি হেথায়,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে দেখিগো তোমায়,
সরম-পাতার বাঁধন টুটিয়া
ফুটিয়া যেন—
'গুণ্ঠন টানি' নাহি চলে' গিয়ে
হাসিছ কেন?

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

জাপানের খেলা।

জাপানীরা ক্রীড়ায় বড় সিদ্ধহস্ত; বুড়াবুড়ি পর্য্যন্ত খেলিবার জন্য পাগল। জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানাচার্য্য কৃষিকলেজের অধ্যাপক কে মিয়াবে ডি, এম্, সি (হার্ব্বার্ড) প্রতি নববর্ষ দিনে তাঁহার কলেজস্থ যাবতীয় বৈদেশিক ছাত্রকে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় আহারান্তে খেলা আরম্ভ হয়। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের উপর। তাঁহার স্ত্রীর বয়স দুই এক বৎসর কম। খেলায় তিনি তাঁহার স্ত্রীপুত্রসহ যোগদান করেন। জাপানের অনেক খেলাতেই সর্ত্ত থাকে। ইহাতে পরাজিত ব্যক্তিকে হয়ত নাচিতে হয়, গাইতে হয় অথবা জন্তুর ন্যায় অব্যক্ত শব্দ করিতে হয়; স্থূল কথা কোন না কোন উপায়ে হাসাইতে হয়। আবার কোন কোন খেলায় পরাজিত ব্যক্তির মুখে চুনকালী দিতে হয়। অধ্যাপকের বাড়ীতে শেষোক্ত সর্ত্তে খেলা আরম্ভ হইল। ছাত্রগণ এবং অধ্যাপক সাহেব পরাজিত হইলে পরস্পর পরস্পরকে রঙে সাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু যে সময় অধ্যক্ষ পত্নী পরাজিত হইলেন তখন ছাত্রগণ তাঁহাকে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ অধ্যক্ষ মহাশয় সানন্দে পত্নীকে রঙে ঢাকিয়া ফেলিলেন।

তোকিও সহরে মুক্ত কয়েদীদিগকে সৎপথে চালাইতে এবং তাহাদের দ্বারা দেশের অনেক রকম মঙ্গলজনক কায করাইতে অনেকগুলি আশ্রম আছে। এইরূপ একটী বিখ্যাত আশ্রমের সেক্রেটারী মিঃ হারা। মিঃ হারার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের পরমবন্ধু। তাঁহার এক ছেলে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে আছেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদিগকে তাঁহার বাড়ীতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং অনেক সময় ভারতীয় ছাত্রদের বাড়ীতেও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং পরিবারস্থ সকলেই সর্ত্তের খেলা খেলিতে বড় আমোদ বোধ করিয়া থাকেন। অনেক সময় বুড়োবুড়ীকে অব্যক্ত জন্তুর ডাক ডাকিতে শুনিয়াছি। কোন পরিবারে নিমন্ত্রিত হইলেই বুঝিতে হইবে সেখানে কোন না কোন খেলায় যোগ দিতে হইবেই। কোন জায়গায় ৫।৭ জন মিলিত হইলেই তথায় হাসি তামাসা এবং রসিকতার ফোয়ারা ছুটিতে থাকে।

জাপানে গরমের দিনে অনেকে দোল্‌নায় (হেমকে) দুলিতে বড় পছন্দ করে। আমাদের বাড়ীতে একটী দোল্‌না ছিল। একদা কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি আমাদের ৬৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা ঝি (ওবাছান) কষ্টশ্রেষ্ঠে কেদারায় ভর করিয়া তাহার উপর উঠিয়া এক যষ্টির সাহায্যে দুলিতেছে।

ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এবং যুবক যুবতী খেলিবার জন্য কত বেশী উদ্‌গ্রীব। জাপানের প্রাচীন খেলা অধিকাংশই বীরজনোচিত। দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, ধনুর্ব্বাণ চালান, কুস্তি, ডন প্রভৃতি সে কালের খেলা। আজও পর্য্যন্ত বিশেষ আগ্রহের সহিত উহারা এ সব খেলা

খেলিয়া থাকে। বরফ এবং বৃষ্টিপাতের সময় ঘরের ভিতর কারুতা (তাস) সতরঞ্চ এবং গোলকধাঁধাঁ ধরণের কতিপয় খেলা এবং গোঁ খেলা হয়। আমাদের দাবার ন্যায় গোঁ খেলিতে বেশ বুদ্ধির দরকার। কাষ্ঠ ফলকে ৩৬১টি ঘুঁটি রাখিবার ঘর আছে। দুই ব্যক্তি সমান সংখ্যক ঘুঁটি অর্থাৎ সৈন্য লইয়া বুদ্ধি ও কৌশলে ঘর দখল করিতে থাকে। এই গোঁ খেলায় যিনি যত বেশী ঘর দখল করিতে পারেন তিনি উহাতে তত বেশী নিপুণ। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বিখ্যাত গোঁ খেলোয়ারদের নাম দেখিতে পাইতাম।

ছেলেদের প্রধান খেলা যুদ্ধবিগ্রহ। রাস্তাঘাটে ভদ্র লোকের ছেলেদের সাধারণত স্থলসৈন্য অথবা নৌসৈন্যের পোষাকেই ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে অনেক সময় মাতা সন্তানকে রঙিন কাগজের জাতীয় পতাকা ক্রয় করিবার জন্য একটি পয়সা অথবা অর্দ্ধ পয়সা দিয়া থাকেন। নিশান পাইয়া কান্না ভুলিয়া যায়। মিঠাইওয়ালা অথবা মজাদার ঘুংড়িদানা কিম্বা সাড়ে বত্রিশ ভাজি ওয়ালাদের ন্যায় ফেরিওয়ালারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের জাতীয় পতাকাগুচ্ছ সঙ্গে লইয়া ফেরি করিয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ক্রেতাদিগকে এক একটী পতাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। উহাদের পতাকার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য মিঠাই উপলক্ষ মাত্র।

বঙ্গের পল্লীগ্রামে সময় সময় যাত্রার দল রামায়ণ মহাভারতের কোন কোন বিষয় অভিনয় করার পর তথাকার বালকেরা দুই এক সপ্তাহকাল কেহ ভীম, কেহ শকুনী, কেহ রাম, কেহ হনুমান সাজিয়া যষ্টিদণ্ডকে অস্ত্র-স্বরূপ ধরিয়া "আয় পাপাত্মা যুদ্ধ করি" বলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। গত রুষ-জাপ-যুদ্ধের সময়ও জাপানের ছেলেদের ভিতর যুদ্ধের খেলা ছাড়া অন্য কোনরূপ খেলা ছিল না। সে বৎসর আমাদের শিল্প বিজ্ঞান সমিতির প্রথম বৎসর। আমরা সাত জনে একসঙ্গে জাপানে গিয়া এক বাড়ী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছিলাম। বাড়ীর সঙ্গে লাগানই একটা ক্ষুদ্র পাহাড়। প্রায় প্রতিদিনই সে পাহাড়ের উপর ছেলেদের যুদ্ধ চলিত। সৈন্যদের ন্যায় সারি বাঁধিয়া বিউগলের তালে তালে পাহাড়ের তলদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া দুই দলে বিভক্ত হইত। এক দল পাহাড়ের উপর উঠিয়া এখানে ওখানে কাগজের তাঁবু তৈয়ার করিত, অপর দল নীচেই তাঁবু রচনা করিত। দুই পক্ষের যোগাড় যন্ত্র হওয়ার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইত। তালে তালে বিউগল্ বাজিতে থাকিত। হাওয়া বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে সংগ্রামের গুরুত্ব যেন আরো বাড়িয়া উঠিত। দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটিতে অনেক সময় খোকাদের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিত। যখন দুই পক্ষ একেবারে সম্মুখীন হইত তখন অনেককে যষ্টি এবং বন্দুকের প্রহারে আহত হইতে হইত। আহত ব্যক্তিকে রেড্ ক্রশ সোসাইটির লোকেরা স্কন্ধে করিয়া পরিচর্য্যার জন্য শিবিরে লইয়া যাইত; ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিত। স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়া তাম্বু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর যখন ছেলেরা একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িত

তখন একপক্ষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত অপর পক্ষ তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া যাহা কিছু মূল্যবান তাহা আত্মসাৎ করিত এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস লণ্ডভণ্ড করিয়া শিবিরে আগুন লাগাইয়া দিত।

বড় বড় যোদ্ধাগণ সমরক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীর নিকট যে ভাবে বিদায় লইয়া থাকেন, জাপানে খেলিবার যুদ্ধে যাইবার প্রাক্কালেও খোকা তেমনি ভাবে খুকীর নিকট বিদায় লইতেছে। খুকীও বিমর্ষভাবে বিদায় দিতেছে।

খোকার যুদ্ধযাত্রা।

খোকাদের এই নকল যুদ্ধ সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পন্ন করিবার জন্য দুই পক্ষেই দুই একজন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তি নেতা হন। এইরূপ খেলায় ছোট বড় সকলেই উৎসাহ দিয়া থাকেন। কিণ্ডার গার্টেন হইতে কলেজ পর্য্যন্ত সকলপ্রকার বিদ্যালয়েই—খেলার চর্চ্চা বড় বেশী। লাঠিখেলা, বন্দুকচালান, তরওয়াল-ভাঁজা প্রভৃতি মধ্যস্কুলে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্যস্কুলে উত্তীর্ণ যে কোন ছেলে তিন মাস অভ্যাসের পর উপযুক্ত যোদ্ধার ন্যায় যে কোন যুদ্ধে রণকৌশল দেখাইতে সক্ষম।

বালিকা বিদ্যালয়েও অনেক রকম খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়, ন্যাণ্ডো, নৃত্য, গীত, বাদ্য ইত্যাদি মেয়েদের নিত্য শিক্ষণীয়। তাহাদের নৃত্যকেও এক প্রকার কাওয়াজ বলিতে হইবে, অনেক শিক্ষিত মেয়েকেও তরওয়াল খেলিতে দেখিয়াছি।

আজ কাল ইউরোপ আমেরিকায় অনেকে জাপানী মাষ্টারের সাহায্যে জিউজুৎসু শিক্ষা করিয়া থাকেন। মার্কিণ রাজ্যের কর্ম্মবীর ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজবেল্ট স্বয়ং এবং তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে প্রতিদিন জিউজুৎসু অভ্যাস করিয়া থাকেন। বোধ হয় এ খেলা সম্বন্ধে পাঠকগণ অনেকেই বিদিত আছেন। ইহাতে শক্তির চেয়ে কৌশলের অধিক আবশ্যক। দুর্ব্বল ব্যক্তি কৌশলে স্থূলকায় শক্তিশালীকে অনায়াসে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে পারে। জিউজুৎসুর ইতিহাসে দেখা যায় জনৈক জিউজুৎসুনিপুণা জাপানী রমণী সতীত্বনাশে উদ্যত এগার জন পরাক্রান্ত দস্যুকে একে একে পরাস্ত করিয়া সসম্মানে উহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

জাপানী স্কুল কলেজে প্রতি বৎসর হেমন্ত এবং বসন্তকালে ছেলে মেয়েদের ক্রীড়া (Sport) প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সে ক্রীড়া

নব্য এবং পাশ্চাত্য ধরণের। একটু বিশেষত্ব এই, কয়েকটি খেলার পর পর এক একবার প্রহসন দৃশ্য বা সামাজিক সঙের দৃশ্য দেখান হয়। সে দৃশ্য অতি কৌতূহলোদ্দীপক। বার্ষিক ক্রীড়া প্রদর্শনীতে উপযুক্ত ছেলে মেয়েকে পুরস্কার দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্থলেই নোটখাতা, রুমাল, তোয়ালে, পেন্সিল, কাগজ, কলম, গেঞ্জি, বাক্স, টুল ইত্যাদি পুরস্কারের দ্রব্য।

অনেক দোকানদার নিজ নিজ দোকান সর্ব্বসাধারণে বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করে। সংবাদ পত্রে ঐ সকল মুদ্রিত হইয়া থাকে। তামা, দস্তা, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত মেডেলও বিস্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আমাদের ধনাঢ্যনন্দনদের ন্যায় জাপানের লর্ড সন্তানগণ সূর্য্যোত্তাপে গলে না, ঠাণ্ডায় জমে না, বাতাসে হেলিয়া পড়ে না, পদব্রজে চলিতে পায়ে ফোস্কা পড়ে না, মাথা ধরেনা, অপাকে পেটফাঁপা বা অজীর্ণে ভোগে না। তাঁহারা সবল ও হৃষ্টকায়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা কেন তাঁহারা প্রতিদিন দুই মাইল দূরবর্ত্তী কলেজে মোটার গাড়ীর পরিবর্ত্তে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকেন। এবং কুস্তি ডনেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। আমার সঙ্গে পাঁচটি লর্ড সন্তান পড়িতেন, উঁহারা কাউণ্ট এবং ভাইকাউণ্টের ছেলে। উঁহাদের চারিজন প্রতি বৎসর বার্ষিক ক্রীড়ায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়া তোয়ালে, রুমালের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎকর পুরস্কার গ্রহণ করিতেও কত আনন্দ বোধ করিতেন। পিয়ার্শস্কুলের ছেলে মেয়েদের পুরস্কারও একই প্রকার। একদা আমার এক অধ্যাপক ধান্য রোপন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে করিতে আমাকে বলিয়াছিলেন ধানের চারা গাছগুলি যখন নার্শারিতে তোমাদের দেশীয় রাজপুত্রদের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্ব্বল রোগীর ন্যায় ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে তখন উহাদিগকে যথাস্থানে রোপন করা দরকার। আমাদের শুধু রাজপুত্রগণ বলিয়া কেন, যাহাদের স্বচ্ছলভাবে বসিয়া খাইবার পন্থা আছে তাহাদের অনেকেই এরম্বধ ধান্যবৃক্ষ স্বরূপ। আর যাহাদের বসিয়া খাইবার যো নাই অতিরিক্ত শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে তাহাদের অনেকেই শুষ্ক দণ্ডবৎ।

ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত খেলাই জাপানে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জাপানীরা টেনিশ ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, পিংপং, হকি, বেছবল, ফুটবল, রাগবি ইত্যাদি সমস্তই খেলিয়া থাকে। টেনিশ এবং পিংপং খেলিতে নব্য ছেলে মেয়ে অনেকেই সিদ্ধহস্ত, এবং এই দুইটি খেলা মেয়েদের খেলা বলিয়াই ধর্ত্তব্য। আমাদের দেশে ফুটবল ও ক্রিকেটের ন্যায় জাপানে বেছবল খেলার চলনই বেশী। বেছবল খেলা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নাই। ইহা আমেরিকার প্রধান খেলা। তোকিওর ওয়াছেদা নামক একটী প্রাইভেট ইউনিভার্সিটীর বেছবলপার্টি জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ পার্টি জাপানস্থ অনেক বৈদেশিক পার্টিকে পরাস্ত করিয়া থাকে। দুই বৎসর পূর্ব্বে উহারা হাওয়াইস্থ আমেরিকান পার্টিকে পরাস্ত করিয়াছে।

সহরের অনেক স্থানে পাশ্চাত্য খেলার

অনেক ক্লাব রহিয়াছে। এমন কি বাজারের জায়গায় জায়গায় বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিল রহিয়াছে। সামান্য খরচেই ইচ্ছামত তথায় যে কেহ খেলিয়া আসিতে পারে। সভা সমিতিতে বক্তৃতার ছড়াছড়ির চেয়ে খেলার প্রচলনই বেশী।

জাপানে লুকোচুরি, ছুটোছুটি, কাণা-মাছির ন্যায় অনেক খেলাও আছে। ছোট ছোট মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের ন্যায় বৌ সাজিয়া রান্না, খাওয়াদাওয়ার খেলাও খেলিয়া থাকে।

দুটি বোন একসঙ্গে খেলা করিতেছে, এখন উহারা বোন নহে, বন্ধু সাজিয়াছে। ছোট বোনটি আগন্তুক। জাপানে আগন্তুকের পরিচর্য্যা যে ভাবে করিয়া থাকে এ চিত্রে তাহাই দেখাইতেছে। বন্ধুকে উপবেশন করিতে আসন দিয়া কিঞ্চিৎ গল্প প্রসঙ্গের পর চা, বিস্কিট, অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতিদ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বন্ধুর পরিতোষের জন্য গান বাজনা আরম্ভ হয়। বন্ধু গম্ভীর ভাবে একখানা রুমাল হাতে লইয়া আগন্তুকের ন্যায় বসিয়া আছে বড় বোন তিন তারের একটি বাদ্য যন্ত্র বাজাইতেছে। গীত বাদ্যের পর কড়ি, সতবঞ্চ, কিম্বা গোলকধাঁধার ন্যায় কোন খেলা আরম্ভ হইবে। এইরূপ আমোদ উৎসবে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন তাহাদের খেলা বন্ধ হয়।

আর একটী জাপানী খেলার কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছিলাম। উহা নববর্ষের "হানেৎছুকুবী" অর্থাৎ একপ্রকার ব্যাট্‌লডোর শাট্‌লকক্। হানে অর্থে পাখীর পালক আর ৎছুকুবী প্রয়োগ করা; এই অর্থেই খেলাটির নামকরণ হইয়াছে। এ খেলা

দুই বোনে খেলিতেছে।

দুই দুই জনে খেলিতে হয়, দুজনের হাতে দুইখানি ব্যাট্। ব্যাটগুলি চিত্রিত এবং উহার একধারে রঙ্গিন কাপড়ে এবং অলঙ্কারে সজ্জিত একটি মূর্ত্তি। যে ধারে মূর্ত্তি নাই সেই ধারের সাহায্যে পালকে লাগান ক্ষুদ্র সুপারীর ন্যায় বল অর্থাৎ শাটলকক্ ফিরাইতে হয়। বল ফিরাইতে না পারিলেই পরাজয়। নববর্ষদিনে স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ছেলে মেয়ে সকলেই এ খেলায় পাগলপ্রায় হইয়া উঠে। জননী ক্ষুদ্র শিশুটিকে পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া হয়ত নিজের ছেলে কিম্বা মেয়ের সহিতই খেলিতে-ছেন, পরাজিত ব্যক্তিকে মুখে গালে চুণ-কালীতে এক অদ্ভুত সজ্জায় ভূষিত হইতে হইয়াছে। ভারতীয় ছাত্রদিগকে ৬।৭ বছরের খোকাখুকীর সহিত খেলিতেও যাত্রার দলের মহাদেব কিম্বা ভূতপ্রেত সাজিতে হয়।

জাপানীরা খর্ব্বাকৃতি হইলেও পৃথিবীর মধ্যে হাইজাম্প রেকর্ডে সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু কুস্তি ডন প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়ায় জাপানীরা বিশেষ দক্ষ হইলেও এবং সেদেশে বহু সার্কাস পার্টি থাকিলেও আমাদের প্রফেশর ব্যানার্জ্জির কিম্বা বোম্বে গ্রেট সার্কাস পার্টির ন্যায় কোন পার্টি সেখানে নাই। অর্থাৎ বাঘের সহিত এবং ঘোড়ার উপর আমাদের দেশে যেমন খেলা হয় ওদের দেশে তেমন নাই। ওদের সাইকেলের খেলা বেশ। অনেক সার্কাস পার্টিতেই সেখানে মেয়েরা খেলা করে। কোন কোন পার্টিতে কেবল মেয়েরাই খেলে।

আত্মারাম সরকারের ভেল্কিবাজীতে পাঁচ মিনিটে আমের বীজ হইতে গাছ জন্মায়, ফল ফলে। এ বাজিতেও ভারত শ্রেষ্ঠ। জাপানীরা তেমন পারে না।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

হার-জিত।

(১)

নন্দলাল তার মাতুলের মুখের উপরেই বলিয়া বসিল—"তাই বেশ!—আমি কালই চলে যাচ্ছি!"

এ পর্য্যন্ত পরাণবাবুর মুখের উপর এমন ভাবে কেহ কখনো জবাব দিতে সাহস করে নাই। তিনি রোষে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে জাগিয়া বলিলেন—"এখনি বেরোও!"

নন্দলাল স্থির ও পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর করিল—"বেশ!—টাকা কড়িগুলো ফেলে দিন—যাচ্ছি!"

পরাণবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—বলিলেন—"টাকাকড়ি!"

নন্দলাল কহিল—"আজ্ঞে—হাঁ!—মার তিন হাজার টাকার গহনা আর বাবার বিষয় বিক্রীর টাকা।"

পরাণবাবু একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ও!—তোমার বাবার জমিদারী ছিল!—তাই বুঝি তুমি ছোট বেলা থেকে মামার অন্নে 'মানুষ' হয়ে আসচো?"

নন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল—সে বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"আঁ্যা!—এত কু-অভিসন্ধি!"

পরাণবাবু তাঁর এক অনুচরের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"শুন্‌চো শ্যামলাল!"

সমগ্র স্তাবকের দল বলিয়া উঠিল—ছিঃ—ছিঃ—একি অসম্মানের কথা!"

পরাণবাবু আল্‌বোলার নল টানিতে টানিতে মোটা গলায় বলিলেন—"কলিকালে উপকার করার ফল—এই!"

সকলে বলিল—"যা বলেচেন!" পরাণবাবু নন্দলালের দিকে চাহিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন—"যাও!—নালিস করে নাও-গে!"

নন্দলাল একবার ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিল—"এর বিচার তিনিই করবেন।" বলিয়া সে তথা হইতে দ্রুত চলিয়া গেল।

পরাণবাবু একবার স্তাবকমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ হলো কি?—এত আস্পর্দ্ধা কিসের?"

এক ব্যক্তি বলিল—"ও 'বালামে'র গুণ!" পরাণবাবু একটু কৃপার হাসি হাসিয়া বলিলেন; "তাই দেখচি!"

২

নন্দলাল শৈশবেই পিতৃহীন হয়। তাহার পিতা পশ্চিম অঞ্চলে বহুদিন চাকুরী করিতে করিতে অবশেষে সেই দেশেই বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আরো কয়েকটী সন্তানাদি হইয়াছিল কিন্তু দু-এক বৎসরের হইতে না হইতে সবগুলিরই জীবন মুকুল অকালে ঝরিয়া পড়ে। ইহাতে নন্দলালের পিতার, অর্থসঞ্চয়ের দিকে তেমন দৃষ্টি ছিল না—তিনি উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই লোকহিতে ব্যয় করিতেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে বিধাতা সেই নিরানন্দ সংসারে আবার একটি স্নেহের ধন সন্তান পাঠাইয়া দিয়া পিতামাতার শোকদগ্ধ প্রাণে আনন্দরস সঞ্চারিত করিয়া তুলিলেন।

শোকজীর্ণ প্রৌঢ় কাশিনাথ কিন্তু 'ভাঙিয়া' পড়িয়াছিলেন। নন্দলালকে বেশী দিন বুকে করিয়া জুড়াইবার অবসর পাইলেন না!—পূর্ণিমার এক স্নিগ্ধ রাত্রে তাঁর ডাক পড়িল। অন্তিমকালে অতৃপ্ত পিতৃস্নেহ মায়ার শৃঙ্খলটি আরো জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল! মৃত্যুকালে, পত্নীর হাতখানি ধরিয়া দুই চক্ষে ধারা বহাইয়া বলিলেন—"তুলসি! ছেলে বুকে ধরে সুখ ভোগ করার কপাল আমার নয়!—তবু একে যে রেখে যেতে পারলাম, এই ঢের!"

নন্দলাল তখন পাঁচ বৎসরের। পিতৃকুলে তাহার তেমন কোন আত্মীয় ছিল না। যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা যে অনাথ শিশুর 'রক্ষক' হইবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তুলসী সহোদর পরাণবাবুর শরণাপন্ন হইলেন—হাজার হ'ক তিনি 'মারপেটে'র ভাই!

পরাণবাবু লোকটী খুব 'পাকা'। তিনি কলিকাতায় বাস করেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি যৎকিঞ্চিৎ আছে বটে কিন্তু তাহাতে কলিকাতার বিলাস ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। অথচ পরাণবাবুর সংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল,—বরং স্বচ্ছলেরও বেশী। ইহাতে 'পাঁচজনে' পাঁচ রকম কথা বলিলেও বাহিরে তাঁহার প্রতিপত্তি অটুট—!

তুলসী পাঁচ বছরের ছেলে লইয়া ভায়ের সংসারে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই আশ্রয় গ্রহণের মূলে দৈন্যের দংশন জ্বালা যে এতটুকু ছিলনা এবং অভিভাবকের একমাত্র অভাবই যে

তাঁহাকে—ভ্রাতৃসংসারে টানিয়া আনিয়াছে একথা তুলসী কাহাকে কোনদিন বুঝাইতে চান নাই। তিনি আশ্রিতের মতই কুণ্ঠিত ভাবে জীবনের অবশিষ্ট কালটুকু পূজা অর্চনায় কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন!—তিনি ভাবিতেন বৈধব্যের চেয়ে নারীর কপালে আর কি বেশী অভাগ্যের—অধিক দীনতার বিষয় হইতে পারে!

পরাণবাবুও ভগিনাকে মর্য্যাদার সহিত গৃহে স্থান দিলেন; ভাগিনেয়ের যাহাতে মঙ্গল হয় তার জন্য 'প্রাণপণ যত্ন করিতে' ত্রুটি হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ভগিনীর বিষয় কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া পরাণবাবু অনেক সময় নিজের ক্ষতিও স্বীকার করিতেন।

এইরূপে এক বৎসরের উপর অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন পরাণবাবু ভগিনাকে কহিলেন—"এত দূরে থেকে বিষয় রক্ষা করা বড়ই শক্ত ব্যাপার! আমার দ্বারা দেখাশুনা আর হয়ে ওঠে না—আর সে সম্ভবও নয়··· অথচ বিশ্বাসী লোকও পাওয়া দুষ্কর···"

তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি করলে ভাল হয়!" পরাণবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমার মতে বিদেশের বিষয় সম্পত্তি সব বিক্রী করে সেই টাকা সুদে খাটানো ভাল!—তা'তে কিছু কম লাভ হয় সেও বরং ভাল—'বিষয় আশয়ে'র ঝঞ্ঝাট ঢের!—এই দেখতেই তো পাচ্চো!

কথাটা বিধবার নিকট কতকটা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল, তিনি বলিলেন—"তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর—তুমি তো আর নন্দর 'পর' নও!"

পরাণবাবুর চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল—তিনি আর্দ্রস্বরে কহিলেন—"দিদি, নন্দ যে আমার 'পর' নয় তা কি আর বলে বোঝাতে হয়!—ভাগনে আর ছেলেতে তফাৎ কি?—বিশেষ যখন অমন সোণার চাঁদ ছেলে! যে দেখে তা'রই বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করে!" কথাটা বলিয়া পরাণবাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে পরাণবাবু পশ্চিম যাত্রা করিলেন। ভগিনীপতির মৃত্যুর পর এই চতুর্থবার পরাণবাবুর পশ্চিম যাত্রা। বাহিরে প্রকাশ—তার 'শরীর খারাপ'।

বিষয় বিক্রয় হইল, কিন্তু তেমন 'দর' উঠিল না—পরাণবাবু সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিলেন। ভগিনীর অলঙ্কার আদি ইতিপূর্ব্বেই তিনি আপনার লৌহসিন্দুকের নিরাপদ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সুদের টাকাটাও পরাণবাবুর ক্যাশবাক্সে আশ্রয় লাভ করিত, তবে, ভগিনীর আবশ্যক হইলে পরাণবাবু টাকা লইয়া প্রস্তুত!

তুলসী নিশ্চিন্ত, তাঁহার শিশুপুত্র নন্দলালও নিশ্চিন্ত! একজন নিশ্চিন্ত—গভীর বিশ্বাসে; আর একজন নিশ্চিন্ত—শৈশব সরলতায়!

শুধু নিশ্চিন্ত নহেন—পরাণবাবু!

এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।—সেই সঙ্গে তুলসীর বৈধব্য জ্বালারও অবসান হইল! মৃত্যুকালে তুলসী পুত্রকে ভ্রাতার হস্তে জন্মের মত সঁপিয়া দিয়া গেলেন!

তুলসীর মৃত্যুর পর হইতে পরাণবাবুর চক্ষু খুলিয়া গেল—তিনি ভাগিনেয়টীতে অনেক ত্রুটি দেখিতে লাগিলেন;—সে দুরন্ত—উদ্ধত—অসহিষ্ণু—বুদ্ধিহীন—মিথ্যাবাদী—লোভী

—বিলাসপ্রিয়,—এবং উত্তরকালে সে যে একজন দারুণ—দুর্দ্দান্ত লোক হইবে পরাণবাবু যেন তাহা ভবিষ্যতের দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখতে পাইলেন। পরাণবাবু যখন দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহার 'উপগৃহ'রা যে না দেখিতে পাইবেন এমন কোন মতেই হইতে পারে না।

পরাণবাবুর পত্নী রাজলক্ষ্মীই কেবল স্বামীর মত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি লাভে বঞ্চিতা হইলেন। তিনি পূর্ব্বের মতই নন্দলালকে স্নেহ ও শাসন করিতেন।

শাসন করা হয়—হোক্, পরাণবাবুর তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু এত স্নেহ দেখাইয়া অমন 'আব্দারে' করিয়া তুলিবার কি প্রয়োজন! দুধ না হইলে খাওয়া হয়না,—ডালের সঙ্গে 'ভাজি' দরকার,—সকালে-বিকালে জলখাবার,—এত কেন?—কিসের জন্য?

রাজলক্ষ্মী যদি বলিতেন "আহা চিরকাল ও ভাল খেয়ে ভাল পরে' এয়েছে!" পরাণবাবু অমনি আঁখি রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেন—"পরের বাড়ীতে এসে আর ও সব আব্দার করলে চলেনা!"

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া গালে হাত দিয়া বলিতেন—"ওমা!—সেকি গো! 'পরের বাড়ী' কি গো!"

পরাণবাবু বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"হাঁ—হাঁ আর 'আপনার' হয়ে কাজ নেই!—কে কার?"

এই কথায় পত্নী মর্ম্মাহত ও বিরক্ত হইয়া একদিন বলিলেন—"তা না হয় ওর 'খোরাকী'র দাম ধরে নিও—ওর বাপের টাকা-ত তোমার হাতে আছে!"

পরাণবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি?—'বাপের টাকা'।—বাপ কত 'নশ-পঞ্চাশ' রেখে গিছলো যে আজো তাই আছে?"—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ও!—"

অতি অল্প দিনের মধ্যে নন্দলাল পরাণবাবুর 'চক্ষুশূল' হইয়া উঠিল। লাঞ্ছনায় ও অপমানে নন্দলাল আরো কিছুকাল কাটাইয়া দিল! পরাণবাবুর অমনোযোগে ও কু-শাসনে নন্দলালের 'লেখাপড়া'ও তেমন হইল না। শেষে একদিন তিনি নন্দকে চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে বলিলেন। নন্দ কহিল—"নিজে চাকুরীর যোগাড় করে নেওয়া বড় কঠিন বিশেষত—এই কোলকেতায়।"

পরাণবাবু একটু রুক্ষ স্বরে কহিলেন—"চাকরী করবার ইচ্ছা থাকলে তার চেষ্টা করতে,—সে ইচ্ছা তো নেই!"

নন্দলাল বলিল—"আজ্ঞে চাকরী পেলে আর করিনা!"

"নাঃ—চাকরী আর কোলকেতা সহরে মেলেনা!—এই তো সেদিন ট্রামোয়ের কণ্ডাক্টারী চাকরী কতকগুলো খালি ছিল, একবার তার চেষ্টা করেছিলে?"

নন্দলালের মুখখানা অভিমানে ও অপমানে লাল হইয়া উঠিল!—তাহার অধর বারেকের জন্য স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে একটা ঢোক গিলিয়া যথাসম্ভব আত্মভাব সংযত করিয়া বলিল—"খেতে না পাই সেও-ভাল তবু আমি ও চাকরী করছিনা!"

সুবিধা পাইয়া পরাণবাবু স্পষ্টই বলিলেন

তবে তুমি তোমার বাসা ঠিক কর আমি আর তোমায় বসিয়ে খাওয়াতে পারব না!"

নন্দলালও রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিল—"তাই বেশ!—আমি কালই যাচ্ছি!"

৩

রাজলক্ষ্মী সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া নন্দলালকে বলিলেন—"সত্যি! এত লাঞ্ছনায় আর এখানে থাকা তোমার উচিত নয়—তা' তোমার টাকা উনি না দেন আমি দেব!—আমার তো যা হোক দু-দশখানা গয়না আছে! অবিশ্যি তাতে তোমার সব টাকা হবে না—তবু যতটা হয়।"

নন্দলালের বুকটা দুর-দুর করিয়া উঠিল—সে বলিল—"আপনার ..গয়না!"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন—"হ্যাঁ—তাতে কি? আমার গয়না—সেত তাঁরি পয়সায়!"

নন্দলাল ভাবিল—"তাও তো সত্য! আমি কেন অনর্থক ফাঁকীতে পড়তে যাই?—তবু যতটা পাওয়া যায় তাই লাভ!"

গহনার বাক্সো রাজলক্ষ্মীর কাছেই থাকিত। গহনা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার হইবে। রাত্রে কর্ত্তা নিদ্রা যাইবার পর রাজলক্ষ্মী নন্দকে তাহা দিয়া গেলেন। হাতে রহিল শুধু দুগাছি 'রুলী! নন্দলাল রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া বলিল—"মামিমা আপনাকে বড় বিশ্রী দেখাচ্চে…না আমি গয়না চাইনে—আমার কপালে যা আছে তাই হবে!"

রাজলক্ষ্মী গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"না, তোমার নিতে হবে—নইলে আমার সংসারে দোষ লাগবে—আমার ছেলের অমঙ্গল হবে!" বলিয়া তিনি গহনার বাক্স নন্দলালের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন!—পরমুহূর্ত্তে আবার রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—"নন্দ! শুধু একটী অনুরোধ করতে এসেচি—রাখতে হবে!—কাল খুব সকালে বেরিয়ে যেয়ো—উনি ওঠবার আগে—"

"নন্দলাল কঠিনদৃষ্টিতে তার মামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"চোরের মত চুপ চুপি?"

রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন—তাঁর কথাটা নন্দলালের কোথায় বাজিয়াছে! তিনি তখনি মায়ের মত স্নেহের ভাবে বলিলেন—দূর পাগল!—তা কেন?—বলছিলুম এই জন্যে,—তুমি যাচ্ছো জানতে পারলে উনি যেতে না দিতে পারেন,—কিন্তু এই রকম বারবার অপমান সহ্য করে যে তুমি এখানে থাকো আমার তা মোটেই ইচ্ছা নয়!—

নন্দলালের মনে কিন্তু কেমন একটা খটকা লাগিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগল—তাইত! আমার যথাসর্ব্বস্ব মামা ঠকাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন!—আমার মার গহনাগুলি পর্য্যন্ত! আহা আমার মরা-মা! যিনি মরবার সময় আমাকে তাঁর ভায়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন! আর সেই ভাই—তার এই কাজ!!—চোর তস্করের মুখ হইতে যদি কিছু ছিনাইয়া লইতে পারা যায়, তাহাতে কি দোষ?—কিসের সঙ্কোচ?

ভাবিতে ভাবিতে নন্দলাল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কপালে রিন্-রিন্ করিয়া ঘাম বাহির হইতে লাগিল—সে অস্থির চিত্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িল।

পথে কেরোসিনের একটা টিন পড়িয়াছিল সেটা সশব্দে সিঁড়িতে গড়াইয়া পড়িল। কুকুরটা সতর্কতা অপেক্ষা ভারুতাব বশে চীৎকার করিতে লাগিল—নন্দলাল কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বহির্দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একেবারে রাস্তার গিয়া উপস্থিত! ভৃত্য জনার্দ্দনের নিদ্রা তখন 'পরিপক্ক' হইয়া আসিয়াছিল—সে জাগ্রত হইয়া "চোর—চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই জাগিয়া উঠিলেন এবং বাহিরে আসিয়া দেখিলেন নন্দের ঘরের দ্বার উন্মুক্ত—আলো জ্বলিতেছে। পরাণবাবু 'নন্দ' 'নন্দ' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নন্দলাল সেখানে নাই। তখন হঠাৎ পরাণবাবুর দৃষ্টি নন্দের টেবিলের উপর পড়িল—তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে—গহনার বাক্স এখানে!—একি?—অ্যা!" এই বলিয়া তিনি পশ্চাদনুগামিনী স্ত্রীর পানে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন!—তাঁহার স্ত্রী একরূপ নিরাভরণা!

বিস্ময় ও উদ্বেগে বাক্‌শক্তির কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল—তিনি নির্ব্বাক নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরাণবাবু ছুটিয়া টেবিলের নিকট গেলেন; দেখিলেন গহনার বাক্স অলঙ্কারপূর্ণ আর তার মধ্যে একখানা চিঠি!—এ যে নন্দেরই হাতের লেখা!

নন্দ লিখিয়াছে—"মাসিমা! গহনা নিতে পারলুম না—আমার সর্ব্বস্ব গেলেও যা আমার আজো আছে তাও হারাতে বসেছিলুম!—এই রইলো আপনার গহনা—এর বড় নেশা!—আমি পালালুম—দেখচি পাগল হবার জোগাড় হয়েচি!"

প্রণত নন্দ।

জীবনে এই প্রথম পরাণবাবুর চোখের পুরু আবরণ সরিয়া গেল! তিনি চকিতে দেখিলেন,—তিনি কত নীচে, আর অসংযত সর্ব্বস্ব পলাতক অনাথ নন্দলাল—কত উচ্চে!

কিন্তু এ ভাব মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র! ইহার পর পরাণবাবুর সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনিই চলিতে লাগিল!—নন্দলালের কথা কেহই তুলিত না! বরং তুলিলে, পরাণবাবু বিরক্ত হইতেন!

কেবল একটী স্নেহকোমল নারীহৃদয় সেই মাতৃহীন অনাথ সন্তানের জন্য মাঝে মাঝে ব্যথিত হইয়া উঠিত!

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

ভক্তি ও ঘৃণা।

ঊর্দ্ধে ছুটি উৎস সম ভক্তি, হৃদি ভেদিয়া,
স্বর্গ পানে টানিতে চাহে হৃদয়ে।
ঘৃণা সে প্রপাতসম মরম দ্বার ভাঙ্গিয়া,
হৃদয়ে নাচে অ নিতে চাহে নিরয়ে।

ভক্তি কিবা মরমফুলে আলোকে তুলে ফুটায়ে,
পুলকভরে গন্ধমধু বিতরি,—
ঘৃণা তাহারে সঙ্কোচেতে মুদিয়ে আনে গুটায়ে
অন্ধকারে বৃন্তদলে আবরি।

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রয়াগে শিল্পপ্রদর্শনী।

প্রয়াগের শিল্পপ্রদর্শনীর ন্যায় বিরাট-প্রদর্শনী আমাদের দেশে বহুকাল হয় নাই। এবারকার এ প্রদর্শনী যুক্ত প্রদেশের গবর্মেণ্টের উদ্যোগে ও ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহা জাতীয় মহাসমিতিরই অন্তরঙ্গ। মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত প্রতি বৎসরে যে প্রদর্শনী হইত, তাহাই অবলম্বন করিয়া যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট এই বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। সমস্ত প্রাদেশিক গবর্মেণ্টই এই প্রদর্শনীর সফলতার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন ও ব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই, এবং ভারতগবর্মেণ্টও প্রদর্শনীকে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ঋণ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এ টাকাটা অবশ্য প্রদর্শনীর আয় হইতেই শোধ যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের করদ ও মিত্র রাজারাও গবর্মেণ্টের এই কর্ম্মে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন এবং আপন আপন রাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছেন। ব্যাপার যে কত বিরাট ও চমৎকার তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমরা সংক্ষেপে তাহার অল্প আভাষ দিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগের প্রাচীন দুর্গের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ-প্রান্তরে এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। এক একটি বিষয়ের এক স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ছাড়া ভ্রমণ, বিশ্রাম ও আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও আয়োজনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আমরা প্রধান কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ করিব। প্রথম দেশীয় রাজাগণের বিভাগ। এই বিভাগে বরোদা, গোয়ালিয়ার, জম্মু, কাশ্মীর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, কোটা, আলোয়ার ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন মনোহর ও বহুমূল্য শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক রুচির অনুগত ও ব্যবহারের উপযোগী শিল্পজাত সামগ্রীতে গোয়ালিয়র রাজ্যই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ সকল দ্রব্য সুন্দর বা মনোহর না হইলেও নিত্য ব্যবহারে নিতান্তই আবশ্যকীয়। গোয়ালিয়রের চামড়ার কলে প্রস্তুত ঘোড়ার সাজ হইতে জুতা পর্যন্ত নানা প্রকার চামড়ার দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব শিল্পেরও অভাব নাই—বাক্স প্যাটরা হইতে আরম্ভ করিয়া কুলুপ পর্য্যন্ত সকল প্রকার জিনিষই আছে। আবার এই বিভাগে ভুবন-খ্যাত চান্দেরি মস্‌লিনের অপরূপ শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। সম্প্রতি গোয়ালিয়রে একটি নিবের কল খোলা হইয়াছে। এই কলের বহুপ্রকার নিবও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহুমূল্য কার্পেট, প্রস্তর ইত্যাদি অসংখ্য বস্তুর অভাব নাই।

জয়পুরের বহুমূল্য রত্নাদি ও খোদিত মর্ম্মরে শিল্প চাতুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জয়পুরের প্রাচীন চিত্রগুলি বর্ণ বৈচিত্র্যে ও শিল্পগৌরবে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

যোধপুরের গজদন্ত নির্ম্মিত বস্তুগুলি অতুলনীয়। এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যোধ-পুরের শিল্পীরা যে কতকগুলি খোদিত মর্ম্মর

প্রদর্শনীর তোরণ।

দেশীয় রাজগণের বিভাগ
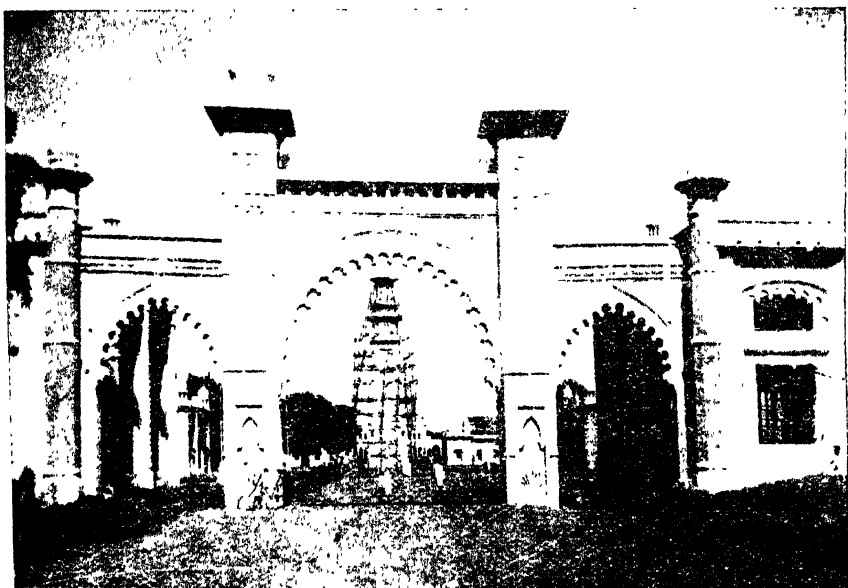
প্রস্তরের চেয়ার, ফুলদান ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন সেগুলি দেখিলে এ সকল দেশের অতীত গৌরবের কথা মনে পড়ে এবং সুখের সঙ্গে একটা দুঃখের ভাব আসিয়া প্রাণটাকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

তাহার পর অযোধ্যা বিভাগ। এখানকার দ্রব্যগুলি অযোধ্যা প্রদেশের বর্ত্তমান ভূস্বামীরা দান করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ দ্রব্যই এককালে অযোধ্যার মুসলমান নৃপতিগণের সম্পত্তি ছিল, এবং এক্ষণে সেগুলি অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় কতকগুলি 'ঝোরি' রহিয়াছে। এই সকল 'ঝোরি' অর্থাৎ রেকাব নবাবেরা ব্যবহার করিতেন। দিল্লীর ঘোরিবংশের রাজাগণ এই 'ঝোরি' এদেশে প্রচলিত করেন। এই সকল রেকাবে নাকি বিষমিশ্রিত খাদ্য রাখিবামাত্র এগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। আলোকচিত্রিত হস্তলিপির মধ্যে দুই একটি এরূপ অমূল্য বস্তু আছে যে তাহা একবার নষ্ট হইলে আর তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব। একটি আবুল ফজলের স্বহস্ত লিখিত আকবর নামার পাণ্ডুলিপি। আকবর স্বহস্তে স্থানে স্থানে যে সকল সংশোধন করিয়াছেন, সেগুলি পর্য্যন্ত আজিও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। আর একটি আওরঙ্গজেবের কন্যা জয়বনের অনুরোধে সম্রাটের আদেশক্রমে লিখিত কোরাণের প্রতিলিপি। আওরঙ্গজেব এই কোরাণখানি জুম্মা মসজিদে রাখিয়া রাজ্যমধ্যে ঘোষিত করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ইহাতে কোনও ভ্রম বাহির করিতে পারিবে, সে প্রত্যেক ভুলের জন্য লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবে। অযোধ্যার নবাবদিগের চিত্র এবং তাঁহাদের ব্যবহৃত স্বর্ণ রৌপ্যের হাওদা, পরিচ্ছদ, শাল ইত্যাদি রহিয়াছে। সে কালে চীনরাজ্য হইতে দূতেরা নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া উপস্থিত হইতেন। এইরূপ একটি উপঢৌকন প্রদর্শিত হইয়াছে। জিনিষটি একখানি অত্যন্ত পাতলা কাগজে লেখা বই। ইহার পত্রে পত্রে সেকালে চীন দেশে যে সকল ভীষণ শাস্তি প্রদত্ত হইত, তাহারই চিত্র রহিয়াছে।

তাহার পর মহিলাবিভাগ। এ বিভাগে ভারতের নানা স্থানের বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুর হইতে নানাপ্রকারের বিচিত্র শিল্পজাত বস্তু আসিয়া সমবেত হইয়াছে, সকলগুলিই সুন্দর ও মনোহর।

শিক্ষা বিভাগটি একটি নূতন ব্যাপার। ইতিপূর্ব্বে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কোন প্রদর্শনীতেই খোলা হয় নাই। দেশের শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান করা ও জনসাধারণকে শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহিত করাই এ বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে মূক ও বধিরের শিক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত শিক্ষার এক একটি স্বতন্ত্র অন্তর্বিভাগ খোলা হইয়াছে। এবং ভারতীয় এই সকল ব্যাপারের পার্শ্বেই ইংলণ্ডের প্রচলিত শিক্ষানীতি দেখান হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন শিল্পবিদ্যালয়ের দ্বারা নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে, সেগুলি দেখিলে মনের মধ্যে বেশ একটা আশা ও আনন্দ জাগ্রত হইয়া উঠে।

ইহারই একপার্শ্বে প্রাচ্যশিক্ষা বিভাগ। এখানে প্রাচীন আরবী, পারসী ও সংস্কৃত হস্তলিপিগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোহর।

পোষ্ট কার্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র একখানি কাগজ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কাগজের উপর দুইখানি পারসী পুস্তক লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও লিপিচাতুর্য্য। একস্থানে সম্রাট আকবরের প্রিয় কবি ও মন্ত্রী আবুল ফজল এবং ফৈজির লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। একখানি বাবরনামা অর্থাৎ বাবরের স্বহস্ত-লিখিত আত্মজীবনী রহিয়াছে। ইহার মধ্যে আকবরের প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের চিত্রিত কয়েকখান অতি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ হিন্দিতে পৃথ্বীরাজের রাজত্বের যে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহারও পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

তারপর এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এখানে বিলাতী কোম্পানীরা আধুনিক নানাপ্রকার কলকারখানা দেখাইয়াছেন। এ বিভাগটিতে আমাদের চিহ্ন কোথাও নাই। কলকারখানা ব্যাপারে পাশ্চাত্যেরা এতদূর অগ্রসর, হইয়াছেন, যে এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নিকট আমাদের শিক্ষালাভ করিতেই দীর্ঘকালের আবশ্যক; প্রতিদ্বন্দ্বতা ত' পরের কথা!

বস্ত্রবিভাগের মধ্যে প্রবেশ করিলে যুক্তপ্রদেশের কলপ্রস্তুত নানা প্রকারের কাপড় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এবিষয়ে যুক্তপ্রদেশ অল্পদিনের মধ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে তাহা প্রশংসা যোগ্য। কলগুলি বিলাতী সত্য, কিন্তু সে দোষ বিলাতবাসীর নয়, আমাদেরই অজ্ঞতা ও উদ্যমহীনতার ফল!

তাহার পর ভারতের শিল্পকলা ও অলঙ্কার বিভাগ। কলাবিভাগে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ সাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন শিল্পযুগের স্বাতন্ত্র্য অনুসারে দ্রব্যগুলি বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।

মোগলশিল্প হস্তলিপির দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে স্তরে স্তরে কেবল প্রাচীন আরবী ও পারসীগ্রন্থ রহিয়াছে। অপর একস্থানে মোগল সম্রাটদিগের প্রাচীন চিত্র রহিয়াছে। চিত্রগুলির বর্ণবৈচিত্র্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

অলঙ্কারবিভাগে কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যত প্রদেশের যত শ্রেষ্ঠ সামগ্রী সবই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন কয়খানি জাপানী মুদ্রা রহিয়াছে। সেগুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত, এবং আকারে এক একখানি দশ টাকার নোটের মত। অলঙ্কার বিভাগের সুন্দর দ্রব্যগুলির অধিকাংশই সাধারণের পক্ষে দুর্ম্মূল্য। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন আলাদিনের রত্নগৃহে প্রবেশ করিয়াছি।

এবারে বনজ দ্রব্য লইয়া একটি স্বতন্ত্র বনবিভাগ খোলা হইয়াছে। বনবিভাগের স্থানটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোরম এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। একটি বাটীতে নানা প্রকারের কাষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর একটিতে নানা প্রকারের মৃগয়াহত বন্য জন্তু এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অস্ত্রাদি আর একটি বাটীতে সহস্র প্রকারের শস্য ও বাজ প্রদর্শিত হইয়াছে। বনবিভাগটি দেখিলে অনেক অজ্ঞাত ব্যাপার শিক্ষা করা যায়।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একস্থানে মেজর বি, ডি, বসু নানাপ্রকারের ভারতীয় ভৈষজ্য প্রদর্শিত করিয়াছেন। তিনি একসহস্র তিনশত
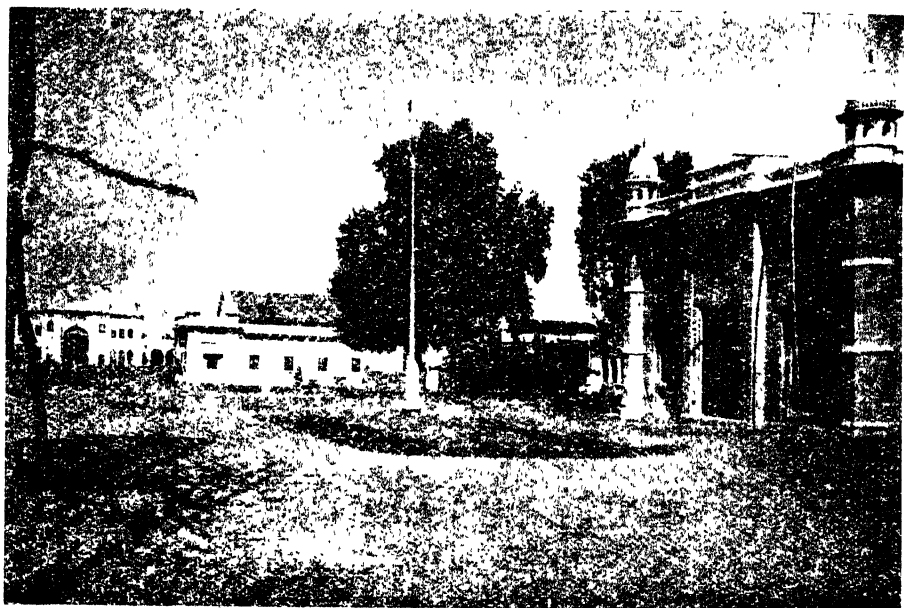
শিল্প ও অলঙ্কার বিভাগ
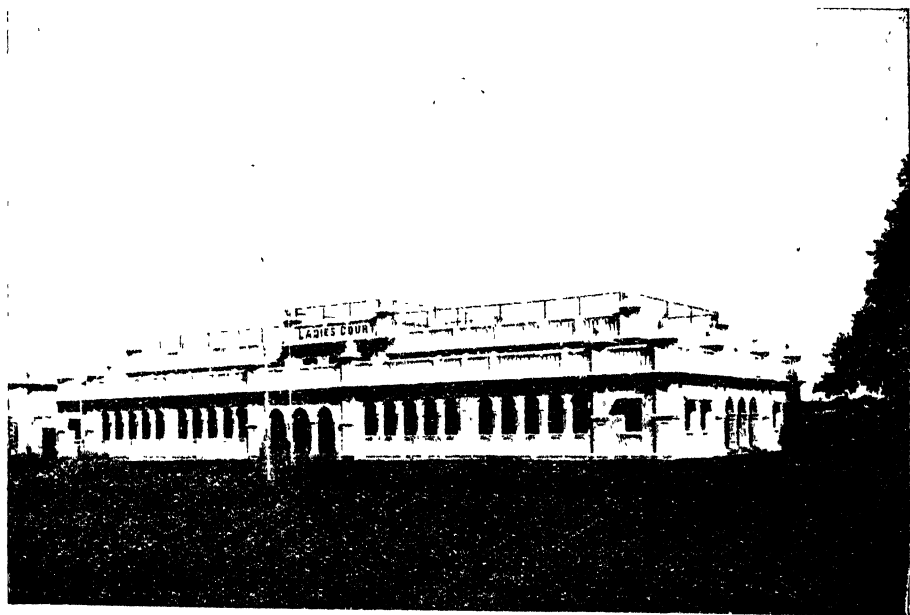
মহিলা বিভাগ।

প্রকারের লতা-গুল্মাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। 'এক্স রে'র ক্রিয়া, প্লেগের বিষপুষ্ট মাছি, ম্যালেরিয়া পুষ্ট মশা ইত্যাদি দেহরক্ষার জন্য জাতনা নানা বিষয় এই বিভাগে পরীক্ষা বা চিত্রদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আর একটি নূতন ব্যাপার এবার প্রদর্শনীতে দেখা গেল। কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্যদেশে অনেকে উড়িয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ভারতে এরূপ ব্যাপার দেখিবার সুযোগ ইতপূর্ব্বে ঘটে নাই। বিলাত হইতে দুইজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া উড়িবার যন্ত্র লইয়া আকাশমার্গে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের কলিকাতাতেও সম্প্রতি দুইবার এরূপ ব্যাপার আমরা দেখিয়াছি, এখন আমাদের কাছে ইহা আর নূতন নাই।

কাব্যে নিদাঘ-চিত্র।

গ্রীষ্মঋতুকল্পনায় শুষ্কশীর্ণতা, রৌদ্রকর-বিচ্ছুরিত অগ্নবৃষ্টি, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের মর্ম্মনিহিত আর্ত্তনাদ, ক্ষীণকায় সলিলাধার, বুকফাটা প্রান্তর এবং অলস ও শিথিল কর্ম্মপ্রবাহের একটা চিত্র হঠাৎ আমাদের চোখের সাম্‌নে পড়ে।

ইহার মাঝে কবিচিত্ত কোন রসের সন্ধান পাইয়াছে, ভ্রমরের ন্যায় ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোন্ অমৃত কবিকে লুব্ধ করিয়াছে তাহা জানিতে উৎসুক হওয়া অস্বাভাবিক নহে!

নিদাঘ-মরুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খর্জ্জুর-বীথিকা ও তালীবনের অন্তরালে এই গোপন অমৃতাস্বাদ, খরতর উগ্রতার মাঝে গুণ্ঠনময়ী ললিত রম্ভার অমূর্ত্তমূর্ত্তি সুকুমার শিল্পীর শিরীষ-কোমল তুলিকায় অঙ্কিত।

আরব কবির সুস্থ মুক্ত আনন্দ সাহারার অগ্নির-সমুদ্র নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। তাহার প্রলুব্ধ দৃষ্টি, শত শত হরিদ্বর্ণ উষ্ণীষধারী নীলবস্ত্রের শোভন প্রাচুর্য্য ভরপুর, দীর্ঘকায় মরুপান্থ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দীর্ঘগ্রীব উষ্ট্রপর্য্যায়ের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। স্বেদাক্ত ললাট, কঠিন ক্লিষ্টহস্ত, রক্তাক্ত কপোল, তীক্ষ্ণনয়ন নরনারী আরব কবির চোখের সাম্‌নে প্রবল ঔদাস্যের সহিত অগ্নিতপ্ত মরুশ্রেণীর মাঝে ডুব দিয়া ছোটে। উষ্ট্রের অনিচ্ছা ও বঙ্কিমদৃষ্টি, রাসবজ্জুদ্বারা সংযত হইতেছে। চারিদিকের ক্ষুধার্ত্ত বিপুল শূন্যতা, শুভ্রকরোজ্জ্বল সুদূরের চক্রবাল, যেখানে সুরম্য মরীচিকায় অলীক-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে তাহার প্রান্তশায়ী আরব-পল্লী কোণের কুটির-প্রাণ, এই সাহারা-সমুদ্রে অহরহঃ ভাসিয়া বেড়ায়। এই বিচিত্র, উদ্যম-চঞ্চল, সুদীর্ঘ প্রয়াণে নরনারীর চিত্ত বৈশাখী ঝড়ের হিল্লোলে কম্পমান রক্ত-গোলাপগুচ্ছের ন্যায় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে কম্পিত হইয়াছে। এই প্রয়াণের আবর্ত্তমোহে, মরুনির্ঝরের আকর্ষণ বোধহয় পর্য্যাপ্ত নহে। রুদ্রতর দেব, সেই পাগল নিদাঘের হিংস্রতার মাঝে যেন বনলতাকে অয়স্কান্তমণির ন্যায় আকর্ষণ করে।

আরব নরনারী মরুর নিষ্ঠুর কোলে ওমানের শুভ্র মুক্তা, হদ্রমঠের কস্তুরীগন্ধ,

আদীনের বুলবুল বল্লরী ও উপবন এবং বিমেনের এলাইচ ও দারুচিনির সুবাস প্রভৃতির স্বপ্ন দেখে।

আবার চিত্তস্তর হারুণ-অল-রসিদের ন্যায় সম্রাট রহস্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে—ইবন্ মোকনেমের ন্যায় কবি, আয়েষা ও লয়লার ন্যায় নারী, কসিদা ও গজলগানে মরুভূমে উর্ব্বরতার হিল্লোল তুলিয়াছে।

পূর্ব্বদেশীয়গণের ন্যায় অন্যত্র কেহই নিদাঘে কাব্যকে বিশেষভাবে জীবনের অঙ্গ করে নাই। চারণগণের কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া, আরব, তুর্কী, পার্সী, ভারতবর্ষের সহিত একাসনে বসিয়া সহজেই বর্ত্তমানের দৈন্য ও দারিদ্র্য স্মৃতি কল্পনার মধুরক্রোড়ে হারাইয়া ফেলে।

আরবীয়গণ মরুনিশীথের কঠোর শীতার্ত্ত সময়, তাঁবুর মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে উপবেশন করিয়া কাল্পনিক আখ্যান ও কাব্যরসের মাদকতায় নিবিষ্ট হইয়া দিবসের সকল কর্ম্ম, ও শ্রম ভুলিয়া যায়। অন্যত্র নিপুণ ভীষকগণ পীড়িতগণের চিত্তবিনোদনার্থে ভেষজরূপে কবিতা আবৃত্তির ব্যবস্থা করে।

আরব্য কল্পনা আরবগণের জীবনের ন্যায়ই বিচিত্র, উজ্জ্বল, ও রসময়ী! আরব্য নিশীথের কথাহীন একাদশ সংস্রটি সুন্দরী কাহার না চিত্ত হরণ করে? এইজন্য কল্পনাকুশল কবির আরবসমাজে সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। নরনারীর প্রেম ও আকাঙ্ক্ষা বেদনা আরব কবির চিত্তে প্রতিধ্বনিত এবং সকলের আকাঙ্ক্ষা তাহার মাঝে সহানুভূতি লাভ করে।

মরুভূমি আরবচিত্তে বড়ই মহার্হ। তাহার নানা ইতিহাস, নানা সংগ্রাম নানা স্বপ্ন ও আড়ম্বর আরবচিত্ত যেন পূর্ণ করিয়া রাখে।

তাহারই ফলে আমরা সুদূর হইতে দ্রুত সঞ্চরণশীল, বিদুইন-আরবীয়কে কটিস্থ শাণিত ছুরিকা, উদ্গ্রীব দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি লইয়া প্রান্তরে ছুটিতে দেখি। আন্দোলনের উত্তেজনা, বিস্ফারিত দৃষ্টি, চিরপ্লাবী, অর্গলহীন সমুজ্জ্বল হাস্য লইয়া যেন ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বিদুইনগণ হরিণের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

রৌদ্রতীর্থের এই অধিবাসীর হৃদয়কোণে কি নিদাঘের কল্লোল শুনিতে পাইব? খর-রৌদ্রের উষ্ণতার কোলে বর্দ্ধিত ইহাদের প্রকৃতিও যেন খররৌদ্র ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রবল জিঘাংসা, শ্রান্তিহীন সংগ্রাম, শাণিত তরবারির ক্ষোভবিহীন অনুতপ্ত রক্তহিল্লোল একদিকে, অন্যদিকে মরুঝরণার ন্যায় হৃদয়কোণে লুক্কায়িত, অপরিসীম অপত্যস্নেহ, প্রেম ও ভক্তি, এবং শৈলকন্দরে গ্রীষ্মাপরাস্পৃহা—উভয়রসে, যেন যুগপৎ উষ্ণতা ও শৈত্যে অনুসিক্ত মরুরাজ্যের সহিত ইহাদের অবিচ্ছেদ্য যোগ সংঘটন করিয়াছে।

আরবীয়গণ কাব্যচিত্রে একেবারে পাগল হইয়া উঠিতে পারে। কালিফ বৈঠকের রাজত্বকালে সঙ্গীতজ্ঞ আবু মহম্মদ, কালিফকে এমন অভিভূত করিয়াছিলেন যে তিনি সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহার নিজের বহুমূল্য হীরক-খচিত পরিচ্ছদ কাবর দেহে নিক্ষেপ করিলেন। বিখ্যাত ওস্তাদ অল ফেরবী কালিফ নৈকন্দল্লকে যুগপৎ হাস্যে উল্লসিত, ক্রন্দনে বিগলিতাশ্রু, এবং পরিশেষে নিদ্রাতুর করিয়া
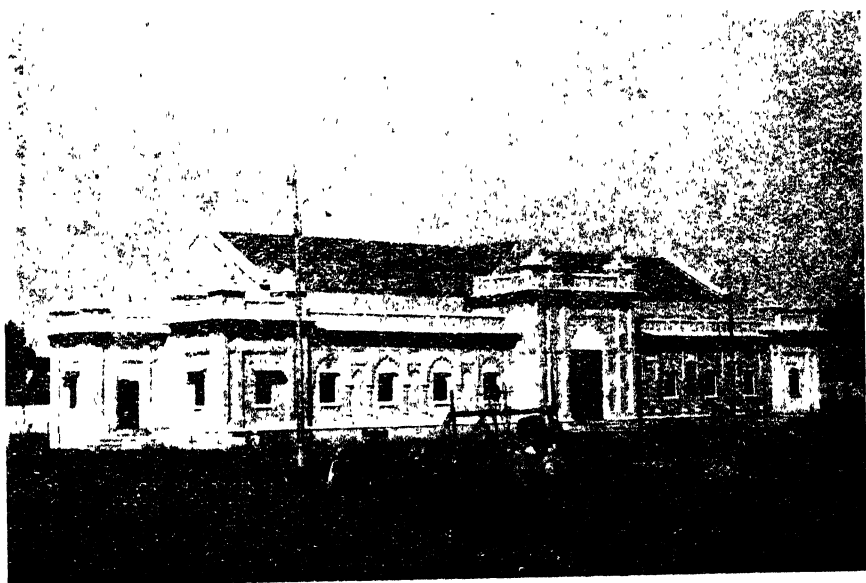
কৃষি বিভাগ।

বন বিভাগ

সঙ্গীতের গৌরব ও বিশ্বজয়ী শক্তি প্রমাণ করিয়াছিলেন।

পারস্য কবির কথাও আসিয়া পড়িতেছে। খরতর নিদাঘে বিপণিশ্রেণীর সুস্ছায় স্নিগ্ধতার মাঝে হেনার গন্ধ, তরমুজের সুবাস, আঙুরের গুচ্ছ প্রাচুর্য্য ও কিস্‌মিসের সরবৎ খুঁজিতে হইলে পারসিক ভূমিতে পদার্পণ করিতে হয়। তরল লোহিত মদিরার অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণ এমন আর কোথায় আছে? গোলাপী রঙের কাজল-পরা, অঙ্কিত ভ্রূ রমণীর তরুণ মুখশ্রী এমন সুলভ কোথায়?

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুনীল-উজ্জ্বল আকাশ তলে আলোক ও হাওয়ার মাঝে সরিৎ-সরোবরের স্রোতময়ী জলধারা উপভোগের সুখ, শীতার্ত্ত জাতির কল্পনায় তেমন স্থান পায়না। গ্রীষ্মভূমিতে এই কারণেই বহির্জগতের সহিত মেলামেশার সুযোগ বেশী ঘটে। কাজেই উদ্যান, উৎস, মুক্ত গবাক্ষ, কুঞ্জবন, তরণীবিহার, জ্যোৎস্না-উৎসব, দক্ষিণ-পবন প্রভৃতির সহিত ভাবের বাণিজ্য একটু বেশী হয়! এখানে মৃগনাভি গন্ধে, গোলাপ-মাল্যের শয্যাস্তরণ, কুঙ্কুম রক্ত গালিচা, উৎসমুখর স্ফটিক-স্নানাগার প্রভৃতির মোহিনী শক্তির আকর্ষণ বড়ই প্রবল। আহমেদের তরমুজপ্রীতি, হাফেজের প্রলাপ-মরীচিকা ও আকাঙ্ক্ষাহীন সামাজিকতা, ওমর খৈয়মের স্বপ্ন, এসব ত ক্রমশই বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পল্লব-পরাগ প্রভৃতির মাঝে তন্ন তন্ন করিয়া পারসিক চিত্ত সৌন্দর্য্য খুঁজিয়াছে; এজন্য খণ্ড ও গীতিবাদ্যে ইহার সমকক্ষ জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। পারস্য কবির যে কোন কবিতার সৌন্দর্য্য জগতের এই শ্রেণীর অন্যান্য কাব্যচেষ্টাকে ম্লান করিয়া দেয়!

অপরদিকে ভারতবর্ষে এক বিচিত্র ব্যাপক রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছে। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ, কবিতার মাঝে কোন খণ্ডগীতি ঝঙ্কৃত করে নাই। কলারাজ্যে ব্যাপকত্বের প্রতি একটা নৈসর্গিক আকর্ষণে, চিত্তবস্তু বৃহৎকে উপলব্ধি করিয়া অংশকে তাহার সম্পর্কেই প্রচার করিয়াছে। প্রতি খণ্ডের সৌন্দর্য্য সমগ্রের মাঝে তাহার সুনির্দ্দিষ্ট আসন অনুসারে, চিহ্নিত হইয়াছে। এজন্য বর্ত্তমান যুগে যাহাকে গীতি কবিতা বলা হয় তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়।

ভারতে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অনুরূপে হৃদয়ের পরিধিও বিস্তৃত হইয়াছে। নিবিড়তর সংযোগরজ্জু বসুধাকে আত্মীয়তার আলিঙ্গনে ঐক্য দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকতর চরমের, দৃঢ় সৌন্দর্য্য গুণ্ঠনবিহীন সজ্জায় উন্মুক্ত হইয়াছে।

প্রথমেই গাঙ্গসৈকত, সিন্ধুবিতস্তার বেলা-বলয়, নর্ম্মদা কালিন্দীর ললিত লাস্যভূমি, কদম্ববনচ্ছায় যমুনার নীলতোয়া, কাশ্মীরের স্নিগ্ধ হ্রদপ্রাচুর্য্য, চিত্রকূট ও বিন্ধ্যের সমারোহ; পঞ্চবটির মহার্হ সম্ভার, কৈলাস ও হিমালয়ের উদার মহত্ব—এ সমস্তের সজ্জা বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ আমাদিগকে চকিত করিয়া তোলে।

পরম রমণীয়, উপভোগ্য গ্রীষ্মকে অবহেলা করিয়া, ভারতে কে কখন শৈলকন্দরে লুকাইয়াছে? ভারতের সুন্দরতম নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রীষ্মকে উপলক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে।—

নটী। তবে কোন ঋতু অবলম্বন করিয়া গান করিব?

সূ। আর্য্যে, তুমি অচিরাগত, উপভোগভোগ্য গ্রীষ্মসময় অবলম্বন পূর্ব্বক গান কর। দেখ এখন অতিশয় সুখদ সলিলস্নান; পাটলীকুসুমের সংযোগে অরণ্যসমীরণ সুরভিময়, ছায়ায় নিদ্রা অতি সুলভ, এবং দিবসের পরিণামভাগ অতি রমণীয়।

নটী। তাহাই হোক্—শিরীষকুসুমের সুকুমার কেশর শিখাসমূহ, ভ্রমর কর্ত্তৃক ক্ষণে ক্ষণে চুম্বিত হইতেছে এবং সদয় হৃদয়া রমণীগণের কর্ণে তাহা ভূষণ রূপে শোভা পাইতেছে।

ভারতবর্ষে গ্রীষ্মে উৎসবের উদ্দামতা বাড়িয়া উঠে। শ্যামল বনরাজির ছায়াঘন প্রান্তরের মাঝে স্তিমিত কল্লোল লোকালয়ের অজস্র গুঞ্জনধ্বনির অবকাশে নিদাঘের উৎসব আয়োজন চলিতে থাকে। বিশেষতঃ দিবসে, অলস আবেশের মাঝে নিদ্রাতুরের, সদ্য অন্তর্হিত বসন্তের উজ্জ্বলস্মৃতি এবং ভবিষ্য-বর্ষার সামীপ্য চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে।

কাব্য বলে, গ্রীষ্মে "সুভগ সলিলাবগাহাঃ।" প্রখর রৌদ্রাতপদগ্ধ কলেবর সলিল মাতার আলিঙ্গনে যে লোভনীয় স্নিগ্ধতা আনয়ন করে, তাহা বীচিবিক্ষোভ শীতল চম্পক গন্ধভরপূর বায়ু একান্ত পুলকময় করিয়া তোলে। তরুণীরা চন্দন ও পদ্মরেণু মাখিয়া কুঞ্জবনে অলস জীবন যাপন করে।

সংস্কৃত কবিরা গ্রীষ্মপীড়া ও প্রেমসন্তাপকে অনেকটা সমধর্ম্মী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা দুষ্মন্ত মনে ভাবিল:—

"তবে কি ইহা আতপদোষ অথবা আমার চিত্তের প্রেমসন্তাপ?"

"অথবা সন্দেহে প্রয়োজন কি? * * একটি মাত্র মৃণালবলয়—তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব প্রিয়ার এই দেহ পীড়াযুক্ত হইলেও অত্যন্ত মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রেম-সন্তাপ নিদাঘ সন্তাপ তুল্য হইলেও গ্রীষ্মসন্তপ্ত তরুণীদের শরীরে এরূপ কমনীয়তা দেখা যায় না, অতএব ইহা প্রেমসন্তাপই বটে।

বৈজ্ঞানিকগণ এই নূতন আবিষ্কৃত 'সিম্‌প্‌টম'টি তাহাদের গ্রন্থে যোগ করিতে পারেন এবং অনুরাগ শাস্ত্রের ডাক্তারগণও ইহা স্মরণ করিতে পারেন।

নিদাঘ ক্লান্তির মূলেও আনন্দরস লুক্কায়িত আছে। তরুণীগণের শ্রান্তি গ্রীষ্মকালে মেঘবাতাহতা মদিরীর মূর্চ্ছার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পুষ্পময় শয্যা, উষ্মাবলেপন, শিলাতল, নলিনীদল রচিত তালবৃন্ত, লতামণ্ডপ, মৃণাল-বলয়, কর্ণোৎপল, নিদাঘের সুশীতল এ সমস্ত সজ্জা ভারতের হৃদ্‌রাজ্যে বড়ই উপভোগ্য।

সরিৎ সরোবর, কান্তার কন্দর গ্রীষ্মে কতনা উপভোগ্য। ভবভূতির দণ্ডকারণ্য চিত্র মনে পড়িতেছে।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ

ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া পরিমুদিত মৃণালের ন্যায় দুর্ব্বল অঙ্গের অলসলুলিত অশিথিল পরিরম্ভের কত চিত্রই চোখের সামনে ভাসে।

চম্পাসরোবরের মদকল মল্লিকাক্ষের পক্ষ সঞ্চালিত পুণ্ডরীক এবং নীলোৎপল প্রভৃতির দৃশ্যে চিত্ত মোহিত হইয়া উঠে।

পদ্মগন্ধ আকর্ষণকারী শীকরশীতল বীচিমরুৎ, রামচন্দ্রের মোহ অপনয়নে যেরূপ সমর্থ হইয়াছিল, গ্রীষ্মবিভাষিকাপীড়িত শৈলশীর্ষে পলায়নপর বর্ত্তমানের শিমলা-মরীচিকালুব্ধগণকে উহা আকর্ষণ করিতে পারিবে কিনা জানিনা।

এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একাংশ

শিক্ষা বিভাগ

ভবভূতির বিরহপীড়িত রাম সীতাস্পর্শকে মনে করিতেছেন ;—

প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দন পল্লবানাং ; ইত্যাদি।

রত্নাবলীর মদনমহোৎসব প্রভৃতির মাঝে গ্রীষ্মভোগ্য কদলীগৃহের ব্যবস্থা আছে!

নিদাঘমিলনের এক অপরূপ শ্রী কালিদাস অঙ্কিত করিয়াছেন।

"প্রচণ্ডসূর্য্য, স্পৃহনীয় শশাঙ্ক, অবিরল অবগাহনে শীর্ণজলাশয়, রমণীয় দিনান্ত প্রভৃতিযুক্ত গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল।"

ইহাছাড়া বিচিত্র যন্ত্রমুখর মন্দির, সরস চন্দন, সুবাসিত হর্ম্ম্যতল, প্রিয়ামুখোচ্ছাস কম্পিত মধু, সুতন্ত্রিগীত, রমণীয় স্নিগ্ধদৃশ্য-দুকূল, গন্ধদ্রব্য, সুরভিত কবরী, লাক্ষা রসরাগ লোহিত চরণতল, হংসকাকলি অনুকরণকারী নূপুরসিঞ্চন, চন্দনাম্বুসিক্ত বায়ু, বীণাঝঙ্কার-আহুত নিদ্রা,—এ সমস্ত চিত্র পরিস্ফুটভাবে কাব্যে স্থান পাইয়াছে!

কিন্তু এইরূপে শুধু নরনারীর হৃদয়ে প্রেমোন্মাদনা জাগাইয়াই গ্রীষ্মের কার্য্য শেষ হয় নাই। ইহা মানব-বর্জ্জিত সৃষ্টিচিত্র সম্বন্ধেও উদার হৃদয় ভাবত কবির কল্পনাকে বিচলিত করিয়াছে।

ক্ষুধাপুষ্ট জিঘাংসা, খাদ্যখাদকের সংহারতন্ত্র অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্মের প্রভাবে সর্প ময়ূরের ক্রোড়ে, সিংহ হস্তীগণের সমীপে বিচরণ করিতেছে। আহুতদ্রব্যে বর্দ্ধিততেজ অগ্নির ন্যায় রুদ্রপ্রচণ্ড রৌদ্রে ময়ূরগণের শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে; এ জন্য সর্প নিকটে আসিয়া আতপভয়ে পুচ্ছচক্রছায়ায় মুখ রাখিলেও উহাকে বধ করিতেছে না! এই চিত্র দেখিয়া নিদাঘের কল্যাণ প্রভাবের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়!

অন্যত্র ভেক ক্লান্তদেহে তৃষ্ণাতুর সর্পের ফণার নীচে নিঃশব্দে শীতল হইবার আশায় অবস্থান করিতেছে। বেচারা বোধ হয় আতপত্রটি ভালরূপে নজর করিবার সুযোগ ও সময় পায় নাই।

যাহা হউক কাব্যেও অন্ততঃ এরূপ মিলন মন্দ কি? যাহাদের চিত্ত অহরহঃ মিলন, অহিংসা প্রভৃতি বিষয়ে চিন্তায় মগ্ন তাহারা কালিদাসের এই সুন্দর সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।

গ্রীষ্মের কঠোরশ্রীও আছে। আর এই কঠোর রুদ্র চিত্রের মাঝেও কবি সুন্দরের সন্ধান পাইয়াছেন। নিষ্ঠুর দাব-হুতাশনের দিক্‌দাহ-হাহাকারের মাঝে কবি নির্ম্মল সিন্দুর বর্ণে বিভোর হইয়াছেন; শাল্মলীবনে রাশীকৃত সূর্য্যকরবহ্নি কবির চোখে সুবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। বহ্নির দাহিকা-শক্তিও কবিকল্পনায় যেন সৌন্দর্য্যে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কালিদাসের সমাপ্তিও বড় সুন্দর :—

কমল বন চিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ
সুখ সলিল নিষেকঃ সেব্যচন্দ্রাংশুহাসঃ
ব্রজতু তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো
নিশি সুললিতগীতে হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুখেন॥

নিদাঘনিশীথের জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া কবি পুলকিত হইয়াছেন। গ্রীষ্মপীড়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজের ফার্ম্মাকোপিয়ায় এই প্রেসক্রপসনটি লিখিয়া রাখিলে হানি কি?

ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

ক্রমবিকাশে অভ্যাসের প্রভাব।

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্থূলতঃ দেখা যায় যে দুইটি স্বাভাবিক নিয়মের বশে মানবের সমস্ত কার্য্য ও ব্যবহার পরিচালিত হইতেছে। মানব জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক সেই দুই নিয়মের বশীভূত হইয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল অবস্থায় সকল সময়েই কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথম অভ্যাস; দ্বিতীয় বংশানুগত্য; এই দুইটি স্বাভাবিক নিয়ম।

প্রথম নিয়ম অভ্যাসমূলক (Law of Habit)। ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মানব অভ্যাসের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত। ক্রমশঃ যেমন তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সতেজ হইতে থাকে, অভ্যাস তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। নবজাত শিশুর চক্ষু উন্মীলিত হয় বটে, কিন্তু সে উহার ব্যবহারে অক্ষম। কারণ পূর্ব্ব হইতে তাহার অভ্যাস নাই। তাহার পক্ষে সমস্ত জগৎ গর্ভকোটরের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখাই অভ্যাস করিয়াছে ও সেই অভ্যাসপ্রযুক্ত সকল দিকই অন্ধকার দেখে। এক দিন, দুই দিন, করিয়া প্রত্যহ তাহার সে অভ্যাস মন্দীভূত হইয়া আসে—সে আলোক দেখিতে অভ্যস্ত হয়। আগ্রহের সহিত আলো দেখিতেই তখন তাহার সুখ বোধ হয়। ঐ সুখের লালসায়, ঐ সুখ বোধের প্ররোচনায়, সে কেবল আলো দেখিলেই সুখী হয় বলিয়া ক্রমশঃ তাহার আলোকের জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয় তখনও কিন্তু কোন বস্তুর বিস্তার অবধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে সে সময় চক্ষুর আভ্যন্তরীণ রেটিনা (Retina) নামক ঝিল্লি অপরিপক্ক থাকায়, সেখানে কোন দ্রব্যের ছায়া পড়িলে উহাদ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয় না, সুতরাং বাহ্য বস্তুর জ্ঞান মস্তিষ্কে পরিচালিত হইতে পারে না। ক্রমশঃ অভ্যাসের গুণে সে অভাবও দূরীভূত হইয়া যায় এবং অভক সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়। চক্ষুর সম্মুখ ভাগে যে মসুরাকৃতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুটক (crystalline lens) আছে, উহার আলোকরশ্মি বক্রীকরণের ক্ষমতা আছে। সেই বক্রীভূত আলোকরশ্মির সম্মিলনে সম্মুখস্থিত বস্তুর আকৃতিযুক্ত একটি ছায়া রেটিনায় আসিয়া প্রক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু যেমন ফটো ক্যামেরার কাচে, বা ম্যাজিক-লণ্ঠন, বায়োস্কোপ্ প্রভৃতি আলোক যন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত ছবি বাহ্য বস্তুর বিপর্য্যস্ত প্রতিকৃতি, উহার উল্‌টা ছায়া, সেইরূপ রেটিনার ছবিও উল্‌টা। বাহ্য বস্তুর উপরিভাগের ছায়া বক্রীভূত হইয়া রেটিনার নিম্নদেশে পড়ে এবং ছবি উল্‌টা দেখায়। শিশু প্রথমতঃ সমগ্র বস্তু উল্‌টা দেখে—তাহার ঐরূপ দেখিয়া দেখিয়া অভ্যাস হইয়া যায়, এবং প্রবীণ চক্ষুতে উল্‌টা ছবি পড়িলেই সেই ছবি যে বস্তুর, সেই বাহ্যবস্তু যে সোজা তাহাই বুঝিবার অভ্যাস আসিয়া পড়ে। ছবি উল্‌টাই পড়ে, আমাদের অভ্যাসবশতঃই আমরা সোজা দেখি।

যেরূপ চক্ষু, সেইরূপ কর্ণ প্রভৃতি অপর অপর ইন্দ্রিয়বোধ ও অভ্যাস সাপেক্ষ।

শব্দ শুনিয়া দূরত্ব বোধ ও শব্দোৎপত্তির দিঙ্‌নির্ণয় আমরা ক্রমশঃ অভ্যাস করি। এমন কি শব্দের উচ্চতা বা নীচতাব তারতম্য লইয়া আমরা যে দূরত্বের উপলব্ধি করি তাহাতে হরবোলা প্রভৃতি (ventriloquist) দ্বারা অনায়াসে প্রতারিত হই। তাহারা উদরাভ্যন্তর হইতে এরূপ ভাবে শব্দ করে যে তাহাতে মনে হয় যে বহু দূর হইতে অথবা ভিন্ন দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। এটি অভ্যাসের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

ত্বকের দ্বারা আমরা যে উষ্ণতা বা শৈত্য অনুভব করিয়া থাকি তাহাও অভ্যাসবশতঃ আমাদের যথার্থ জ্ঞান উৎপাদনে অনেক সময় ব্যাঘাত জন্মায়। দক্ষিণ হস্তে বরফ ও বাম হস্তে গরম দুধের বাটি কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে পরে দুই হস্ত এককালে একটা বাল্‌তীর জলে ডুবাইয়া দিলে, বাম হস্তে ঐ জল শীতল বোধ হইবে ও দক্ষিণ হস্তে উষ্ণ বোধ হইবে। অথচ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে বাল্‌তীব জলের উত্তাপ সর্ব্বত্র সমান। এই প্রকার অনুভূতির বিভিন্নতার মূল কারণ আমাদের অভ্যাস। দক্ষিণ হস্ত পূর্ব্ব হইতে বরফ সংযুক্ত আছে বলিয়া উহাতে উত্তাপগ্রহণক্ষমতা আসিয়াছে এবং বাম হস্তে উষ্ণ বস্তু ছিল বলিয়া উহা উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় বাল্‌তীর জলে হস্তদ্বয় ডুবাইলে বাম হস্ত হইতে উত্তাপ শীতলতর জলে চলিয়া গেল এবং ঐ জলের উত্তাপ শীতলতর দক্ষিণ হস্তে আসিল। যে বস্তু আমাদের ত্বক্ হইতে উত্তাপ দূরীভূত করে সেই বস্তুকে আমরা শীতল বলিয়া অনুভব করিবার অভ্যাস করিয়াছি। যে বস্তু হইতে উত্তাপ আসিয়া ত্বচে প্রবেশ করে সেই বস্তুকে আমরা উষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে অভ্যাস করিয়াছি। সুতরাং বাল্‌তীর জল সমতাপসম্পন্ন হইলেও বাম হস্তে শীতল ও দক্ষিণ হস্তে উষ্ণ বোধ হইল। মার্ব্বেল পাথরেব টেবিল শীতল বোধ হয়, কাষ্ঠ বা কাপড়মোড়া টেবিল তত শীতল বোধ হয় না, অথচ থার্ম্মমিটর্ বলে উভয়ে সমান গরম। ইহাও আমাদেব ত্বচের বিশেষত্ব ও আমাদের অভ্যাসমূলক। মার্ব্বেলের উত্তাপ পরিচালন ক্ষমতা কাষ্ঠ বা কাপড় অপেক্ষা অনেক বেশি; সুতরাং মার্ব্বেল স্পর্শ করিলে ত্বচ্‌স্থিত উত্তাপ শীঘ্রই স্থানান্তরে পরিচালিত হইয়া যায়, কাষ্ঠেব দ্বারা তত শীঘ্র হয় না। আমাদের উত্তাপ শীঘ্রই হ্রাস প্রাপ্ত হয় বলিয়া মার্ব্বেলকে কাষ্ঠ অপেক্ষা শীতল অনুভব করি।

আমাদের অভ্যাসনিবন্ধন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া ও তৎপ্রযুক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। অভ্যাস যে কতদূর আমাদের কার্য্যের জন্য দায়ী তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। আমি যে অভ্যাস করিলাম তাহার দাগ আমার শরীরে এবং মনে চিরকাল রহিয়া যায়। ক্রমশঃ অভ্যস্ত অনেক প্রক্রিয়া সময়ান্তরে কাল ও অবস্থা ভেদে পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করা বড় দুরূহ ব্যাপার। একটা গল্প মনে পড়িল। গোয়ালিয়র প্রদেশে গীতবাদ্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ কোন এক পেশাদার গায়ক একটি সুকণ্ঠ বালককে গীত শিখাইত। বালক শুইয়া শুইয়া গীত অভ্যাস করিত এবং শীঘ্রই সুগায়ক হইয়া উঠিল। একদিন ওস্তাদজী চেলা লইয়া রাজবাড়ী গান শুনাইতে গেলেন। ওমরাহগণ বালকের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে ওস্তাদজি

তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তানপূরায় সুর বাঁধিলেন। বালক বসিয়াই রহিল, কিছুতেই তাহার কণ্ঠ হইতে গান নির্গত হইল না। হতাশ হইয়া ওস্তাদ ঘৃণায় বালককে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিবামাত্র বালক অতি সুমিষ্ট গানে সভাসুদ্ধ সকলকে মোহিত করিয়া দিল। হায়! ওস্তাদ জানিত না, এবং খোদ বালকও জানিত না যে গানের সহিত ধরাশয়নও অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে!

যে অভ্যাস বাহ্যবস্তু লইয়া ও যাহা আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির প্রক্রিয়ার মূল, তাহা আয়াসে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে; কিন্তু যে অভ্যাস আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার প্রভাব শুদ্ধ আমাদেরই উপর নহে, অধস্তন বংশধরগণেরও উপর বিস্তৃত হয়। এই আভ্যন্তরীন অভ্যাসবশতঃ অতি নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমবিকাশে উন্নত সুগঠিত মানবের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়। এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

কখন কখন প্রকৃতি অভ্যাসের অনুকূলতা সাধন করে, তখন অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। ইহার দৃষ্টান্ত দুই একটি আমাদের শরীরেই বর্ত্তমান। আমরা লিখিবার সময় ও অন্য কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য প্রায় দক্ষিণ হস্তই ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি লেখার বিষয়ে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার যেন স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহা অভ্যাসমূলক মাত্র। যাহাদের দক্ষিণ হস্ত কোন কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে তাঁহারা বাম হস্তে অতি উত্তম দ্রুত লিখিতে অভ্যাস করিয়াছেন, দেখা যায়। বালককে প্রথমেই দক্ষিণ হস্তে লিখিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রথার সুবিধা অনেক, প্রকৃতি এ বিষয়ে অনুকূল এবং পিতৃপিতামহাদি পুরুষানুক্রমে ঐ দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার অভ্যাস করা নিবন্ধন বালকের দক্ষিণ হস্তে লিখন অভ্যাস করা বামহস্ত অপেক্ষা সুসাধ্য হইয়াছে। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে যে মানব শক্ত কার্য্যে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করে বলিয়া ঐ হস্তের মাংসপেশী বামহস্ত অপেক্ষা অধিক বলবান ও শক্ত হইয়া পড়িতেছে। অভ্যাস আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া ক্রমশঃ এমন রূপান্তর ঘটাইতে পারে যে বামহস্তের মাংসপেশী জন্মাবধিই (ভ্রূণাবস্থাতেই) ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে এই অভ্যাসের বলেই মানবের পুচ্ছহীনতা ও পদদ্বয় হইতে হস্ত দ্বয়ের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। অনভ্যাসের বলে ও অব্যবহারের অভ্যাসে পুরুষানুক্রমে আমাদের উক্ত দ্বিবিধ কায়িক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই রূপে ক্রমশঃ হয়ত সভ্য জগতে মানবের বামহস্ত একটা অকর্ম্মণ্য কিম্ভূতকিমাকার প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়া অবশেষে লোপ পাইতে পারে। পূর্ব্বে যে মানবের পুচ্ছ ছিল তাহার নিদর্শন খান কয়েক অস্থি মাত্র আজিও নরকঙ্কালে দৃষ্ট হয়।

অভ্যাসের আর এক দৃষ্টান্ত আমাদের দাঁড়াইয়া দুই পায়ে চলা। প্রাণীর মধ্যে এক জাতীয় মর্কট (Gorilla) কেবল মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবে সোজা হইয়া চলিয়া থাকে। এখনও অভ্যাসের প্রভাব আমাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই — মানবশিশু জন্মিয়াই দাঁড়াইতে পারে না। ক্রমশঃ তাহার সে অভাবও দুরীভূত হইবার

উপক্রম দেখা যাইতেছে। পদদ্বয় হইতে হস্তদ্বয়ের গঠন একেবারে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহা যুগযুগান্তরের অভ্যাসের ফল। সোজা হইয়া চলিবার দরুণ আমাদের পদদ্বয় হস্তদ্বয় অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ লম্বাকৃতি ও দৃঢ় অস্থি সংযুক্ত। আমরা যে সকল কার্য্যের জন্য হস্তের অঙ্গুলি ব্যবহার করিয়া থাকি ;—মুঠা করা, অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরা প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে হস্তাঙ্গুলী ও হস্ততালুর বক্রীভাব ধারণ করাই, পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে সে সকল কার্য্য করা আমাদের আবশ্যক না হওয়ায় আমাদের সে অভ্যাস চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মর্কট হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বানর জাতিকে চতুর্হস্ত (quadrumana) ও মানব জাতিকে দ্বিহস্ত (Bimana) এই দুই প্রাণীবিভাগে ফেলিয়াছেন। মানব দ্বিহস্ত জীবের একমাত্র প্রাতভূ। উপরি উক্ত কারণে আমাদের পদদ্বয়ের অঙ্গুলি ছোট, ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। পায়ের আঙ্গুল এখন না থাকিলেও ক্ষতি নাই ; ক্রমশঃ হয়ত মৎস্যের ডানার ন্যায় আমাদের সমস্ত পদাঙ্গুলি চর্ম্ম ও মাংসপেশী দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িবে ও পদতল পাদুকাতলের ন্যায় সমক্ষেত্র হইয়া যাইবে।

ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী যে হস্ত ব্যবহার করেন না, তাহা ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া তদবস্থ একখণ্ড কাষ্ঠপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় যদি তাঁহার ঔরসে ঐরূপ ঊর্দ্ধবাহুযুক্তা কোন রমণীর গর্ভে সন্তান জন্মে তবে সেই ভ্রূণের ঐ অঙ্গহীন হইবে ইহাই সম্ভব। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নাও হইতে পারে। সেই ভ্রূণ হইতে যে মানব হইল সেও যদি ঐরূপ ঊর্দ্ধবাহুত্ব অভ্যাস করে এবং ঐরূপ অঙ্গহীনা রমণীর সহিত বিবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানের ঐরূপ অঙ্গহীন হওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। এইরূপে ৫।৭ বংশ ধরিয়া যদি একই অভ্যাস চলিয়া আসে তাহা হইলে স্থায়ী প্রকৃতিগত বিকার আসিয়া পড়ে, আর সে বিষয় অভ্যাস করিতে হয় না। ইহাই অভ্যাসের নিয়ম—Law of Habit।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এইরূপ অভ্যাসের কারণ কি ? যে অভ্যাসের বলে একটা বিষম পরিবর্ত্তন আমাদের শরীরে ও মনে ঘটিয়া থাকে, সে অভ্যাসের দাস আমরা হই কেন ? এ প্রশ্ন বড়ই জটিল। স্থূলতঃ দেখা যায়, সুবিধা ও সুখবোধ বা দুঃখ ও কষ্ট নিবারণের স্পৃহাই অভ্যাসের মূল। অনেক স্থলে অজ্ঞাতসারে একটা অভ্যাস পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে জ্ঞাতসারে একটা সুবিধা বা সুখের চেষ্টায় অভ্যাসটা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই সুবিধা বা সুখ ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইত বলিয়া ঐ অভ্যাসের ফল এক্ষণে একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তনে আসিয়া পড়িয়াছে। জলচর ও খেচর পক্ষীর পুচ্ছের আবশ্যক ; সেই প্রাণী যখন স্থলে বিচরণ করে তখন তাহাকে পুচ্ছের ব্যবহার আদৌ করিতে হয় না। ক্রমশঃ যে জীব জলে বা আকাশে গতিবিধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অব্যবহারের অভ্যাস বশতঃ পুচ্ছ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে একেবারে অন্তর্দ্ধান করে। কিন্তু যদি কোন

স্থলচর জন্তু পুচ্ছের ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই অভ্যাসের বলে তাহার পুচ্ছের আকৃতি ও গঠন বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ়, লোমশ ও মাংসল হইয়া পড়ে। যথা শৃগাল প্রভৃতি।

অধ্যাপক হেকেল্ তাঁহার Evolution of Man নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে বহু গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানব ভ্রূণাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিপক্ব অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যায়, তাহাতে সে যে অতি নিম্ন প্রাণী হইতে ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। গর্ভে উহার এক এক অবস্থা, কোন না কোন নিম্নতর প্রাণীর গর্ভাবস্থার সহিত একেবারে মিলিয়া থাকে। এ বিষয় বারান্তরে আলোচিত হইবে। এরূপ যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন যে ক্রমবিকাশবাদ আর সন্দেহ করিবার যো নাই। ইহার মূলে অভ্যাস ও বংশানুগত্য এই দুইটি নিয়ম বিদ্যমান।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহর্ষি রুদ্র

অতি পুরাকালে, মানব-সভ্যতার সেই আদিম অবস্থায়, মানবজাতির আদিগুরু ঋষিগণ মনুষ্যত্বের দিব্যবীজ মানসক্ষেত্রে বপন করিয়া অঙ্কুরিত করিবার জন্য যখন তাহাতে তপস্যার সলিল সেচন করিতেছিলেন; মনুষ্যত্বের সেই নবশাঙ্কুর সাধনা, সভ্যতার বিচিত্র কোলাহলের আবর্ত্তে ঘূর্ণিত না হইয়া, স্বভাবের পথে, সহজে তাহার চরম লক্ষ্যের সান্নিধ্য লাভে যখন সক্ষম হইয়াছিল, সেই সময়ে এ দেশে পশ্চিম অঞ্চলে রুদ্র নামে এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দস্যু বাস করিত। কত শত নিরপরাধ পথিক যে এই দস্যুর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার নাম শ্রবণমাত্র দেশবাসী সকলেই সংপরোনাস্তি ভীত হইয়া উঠিত।

এই দস্যুর সপ্তবর্ষ বয়স্ক একটি পুত্র ছিল। দস্যু তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। পুত্র-স্নেহ ব্যতীত দস্যুর পাষাণ হৃদয়ে অন্য কোনো কোমল বৃত্তির লেশমাত্র দেখা যাইত না। একদিন মধ্যাহ্নকালে বাড়ী ফিরিবার সময়ে দস্যু দেখিল যে জঙ্গলের ধারে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র তাহার সেই প্রিয়পুত্রকে আক্রমণ করিয়া নখদন্তাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছে। দেখিয়া দস্যুর প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। দস্যু অত্যন্ত বলশালী ছিল। সুতরাং তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্র, শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রবল বেগে দস্যুকে আক্রমণ করিল। দস্যুও স্বীয় বাহুবলে সেই ভীষণ আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিয়া ব্যাঘ্রকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল। আর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দস্যু সেই ব্যাঘ্রকে নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু

যখন সে দেখিল যে তাহার একমাত্র পুত্রের প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে এবং তাহার রক্তাক্ত মৃত দেহ ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, তখন কে যেন তাহার শরীরের সমস্ত বল মুহূর্ত্তমধ্যে অপহরণ করিয়া লইল। সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। এদিকে সুযোগ পাইয়া সেই মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র যথাশক্তি সেই পুত্রশোকাতুর দস্যুকে বারংবার আহত করিয়া মৃত্যুমুখে পাতিত করিল।

ব্যাঘ্রের বারংবার আক্রমণে রুদ্র মৃতবৎ হইয়া পড়িলেও একেবারে তাহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। সে সমস্ত দিন ঐরূপ অবস্থাতেই সেই জঙ্গলের ধারে পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার সময়ে চারিজন পথিক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। পথিপার্শ্বে বালকের রক্তাক্ত মৃতদেহ, ভীমকায় মৃত ব্যাঘ্র ও ক্ষত বিক্ষত শরীর রুদ্রকে দেখিয়া পথিকেরা যারপর নাই ভীত হইল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরিদর্শনের পর যখন তাহারা দেখিতে পাইল, যে আহত ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে, তখন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সকলে রুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইল ও তাহাকে স্কন্ধদেশে স্থাপনপূর্ব্বক বহন করিয়া লইয়া চলিল।

নিকটেই পরম দয়ালু মহর্ষি সৌম্যের আশ্রম ছিল। পথিকেরা মৃতপ্রায় রুদ্রকে বহন করিয়া সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল ও মহর্ষির চরণোপান্তে উপনীত হইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিনয়ে নিবেদন করিল। পরম কৃপালু মহর্ষি পথিকগণের নিকট সবিশেষ অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদিগের সহৃদয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক ক্ষতবিক্ষত দেহ রুদ্রকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া একান্ত মনে তাহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

হোমধূমের পূতগন্ধে আশ্রমস্থ বায়ু সততই পবিত্র থাকিত। তপোবনের সেই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ও মহর্ষি সৌম্যের ঐকান্তিক যত্নে দীর্ঘকালের পর সে ক্রমশ আরোগ্য লাভ করিল। এই দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া রুদ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির দীপ্ত শিখা যখন নিরীক্ষণ করিত; সমবেত ঋষিবালকবালিকাগণের সুকোমল কণ্ঠোচ্চারিত বেদপাঠ ও গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ যখন শ্রবণ করিত, তখন তাহার অন্তঃকরণ এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের রসাবেশে অবশ হইয়া আসিত। বালকবালিকাগণের মধ্যে মহর্ষি সৌম্যের কন্যা দীপিকারই এই কার্য্যে বিশেষ নিষ্ঠা দেখা যাইত। যখন প্রজ্বলিত হোমাগ্নির ঊর্দ্ধশিখা আকাশমার্গ আলোকিত করিত, তখন তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি প্রেমানন্দে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত; আনন্দের উদ্দাম প্রবাহ তাহার সরল শিশু হৃদয় ভাসাইয়া দিয়া নয়ন প্রান্তে অশ্রুর তরল তরঙ্গ বিস্তার করিত! সে তখন আপন অন্তরস্থিত আনন্দকে কোন্ ঊর্দ্ধলোকে বিসৃত করিয়া দিয়া অনন্ত আনন্দকে আপনার মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিত কে তাহা বলিতে পারে!

দীপিকা স্বভাবতঃ অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ছিল; সে একাকিনীই সমস্ত গৃহকর্ম্ম ও আশ্রমের অন্যান্য কার্য্যসমূহের তত্ত্বাবধান অনায়াসেই করিত। মহর্ষি সৌম্যের এই

কন্যা ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। দুহিতার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বিশেষ যত্নে তাহাকে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গৃহকর্ম্ম, আশ্রমোচিত কার্য্য ও সাধনার অত্যল্প অবসরেও এই কোমল হৃদয়া ঋষিতনয়া, পিতার সহিত দস্যু রুদ্রের সেবা শুশ্রূষায় যথাশক্তি যোগদান করিত।

একদিন রুদ্র বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল :—

"ঋষি তনয়ে, তোমরা প্রতিদিন কাহার অর্চ্চনা কর এবং সেই অর্চ্চনারই বা ফল কি"?

বালিকা উত্তর কবিল :—

"যিনি আমার অন্তর্যামী পরম পুরুষ, যিনি এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে, দিবসে আলোক মালায়, রজনীর গাঢ় অন্ধকার পুঞ্জে, জলে, স্থলে এবং আকাশে সতত বর্ত্তমান আছেন আমি তাঁহাকেই এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকি; এইরূপেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত প্রতিদিন যোগযুক্ত হই; পরম আনন্দই ইহার একমাত্র পরিণাম! আমি ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিনা। পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সবিশেষ সমস্তই জানিতে পারিবে।"

বালিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া দস্যু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলঃ—

"ভাগ্যবতি, আমি আরোগ্য লাভ করিয়া আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না; তোমাদেরই আশ্রমে থাকিয়া তোমাদেরই ন্যায় আমিও সেই অন্তর্য্যামী পরম পুরুষকে জলে, স্থলে, অনলে, আকাশে, আলোকে অন্ধকারে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে শিক্ষা করিব!"

রুদ্র সেই হইতেই সৌম্যের তপোবনে থাকিয়া গেল; এবং মহর্ষির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সেই পরম পুরুষের দর্শন মানসে ব্রহ্ম সাধনায় নিযুক্ত হইল।

এই দস্যু রুদ্রই পরে মহর্ষি-রুদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

চয়ন।

আগ্রা।

৩১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০।

আগ্রাই ভারতীয় মুসলমান-সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, উদারচেতা মোগলসম্রাট্ আক্‌বার দিল্লী হইতে তাঁহার রাজধানী আগ্রায় উঠাইয়া আনেন:—এই মহাপুরুষের স্মৃতি এই বৃহৎ নগরটিকে সজীব রাখিয়াছে।

যে সময়ে য়ুরোপীয়েরা, ধর্ম্মসংক্রান্ত তুচ্ছ বিবাদ লইয়া আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি করিতেছিল, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে এই ভারত-সম্রাট্ সকল ধর্ম্মকে এক করিবেন বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি প্রথমে, উচ্চতম হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত দুইটি কন্যাকে বিবাহ

করিয়া, আত্মবিসর্জ্জনের কমনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। তাহার পর তিনি মহা-ধর্ম্মমণ্ডলী বা ধর্ম্মের 'পার্লেমেণ্ট' আহ্বান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সেই মহাধর্ম্ম-মণ্ডলীতে;—ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, পার্সি, ইহুদী উপস্থিত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—তাহাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। প্রত্যেকেই যে ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া গেল।

এই আকবর, যমুনার তীরে যে প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আজও মুগ্ধ হইতে হয়। ধূসর-লাল রংএর প্রকাণ্ড 'বুরুজ'-বিশিষ্ট দস্তুরপ্রাচীর;—সাদা মার্ব্বেলে গঠিত এই দুর্গ প্রাচীর, গম্বুজ ও চূড়াবিশিষ্ট একটি রাজপ্রাসাদকে আগলাইয়া রহিয়াছে। এই রাজপ্রাসাদটি প্রকাণ্ড ও পরী স্থানের ন্যায় রমণীয়: ইহার অভ্যন্তরে কত প্রাঙ্গণ, কত ছাদ, কত বড় বড় দালান। সেই সমস্ত হইতে বিযুক্ত মার্ব্বেলের মসজিদ—সমস্ত সাদা—সুনীল গগন-পটে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। সুলতানা-বেগমদিগের কক্ষগুলি অতি সুন্দর: যাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিয়া, ভিতরে তাপ সংরক্ষিত হয় এইরূপ সূক্ষ্ম খোদাইকাজবিশিষ্ট জালি-কাটা মার্ব্বেলের দেয়াল। নেত্রসমক্ষে প্রসারিত বিশাল ময়দান, মন্থরগতি যমুনার জল ও দূরস্থ তাজমহল।

তাজমহল! ইহাই আগ্রার চিরন্তন গৌরবের সামগ্রী। আকবরের একজন বংশধর শা-জেহান, তাঁহার প্রিয়তমা বেগমের স্মরণার্থ এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিলে, নিখুঁত-সুন্দর একটি শিল্পসামগ্রীর একটা অপূর্ব্ব ও অলৌকিক স্মৃতি মনোমধ্যে রহিয়া যায়।

ধূসর-লাল রংএর একটা বৃহৎ সিংহদ্বার; তাহার উপর, সাদা মার্ব্বেলে উৎকীর্ণ কোরাণের কতকগুলি বয়েৎ। তাল, কমলা-লেবু, দাড়িম, ঝাউ প্রভৃতি বৃক্ষে সুশোভিত একটি চমৎকার উদ্যান। গোলাপ ও যুঁই-এর গন্ধে সমস্ত স্থান আমোদিত। পদ্মফুলে আচ্ছন্ন কৃষ্ণাভ জলবিশিষ্ট একটি দীর্ঘিকা, তাহার চারিধারে সাদা মার্ব্বেলের সান। কালো-কালো ঝাউ-গাছের মাথা ছাড়াইয়া,—সাদা মার্ব্বেলে গঠিত, সূক্ষ্ম খোদাই-কাজ-করা, বহুমূল্য রত্নখচিত, গম্বুজবিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড ইমারৎ সমুত্থিত হইয়াছে। চারিধারে, চারিটা সাদা মার্ব্বেলের মিনার-স্তম্ভ। ইমারতের অভ্যন্তরে, শাজাহান ও তদীয় প্রিয়তমার সমাধিস্থান, তাহার চারিধারে জালিকাটা মার্ব্বেলের ঘের—কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য! তাহার তুলনা নাই...

তাজমহলের জটিল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, দিবারাত্রির সকল সময়েই উহাকে দেখিতে হয়। প্রাতঃকালে, উদীয়মান সূর্য্যের রক্তিম আলোকে, উহাকে অস্পষ্ট ও অবাস্তব বলিয়া মনে হয়; আরও কিয়ৎকাল পরে, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর রশ্মির প্রভাবে, উহার জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্ববিজয়িনী উগ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পায়; অবশেষে রাত্রিকালে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, কবিকল্পনাসুলভ পাণ্ডুবর্ণ, রহস্যময় কোমলকান্ত, মর্ম্মস্পর্শী, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়।

স্থপতি ও জহুরী—এই উভয়ের হস্তগঠিত

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসামগ্রী এই তাজমহল; কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য সকল জাতির লোকেই এই তাজমহল দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। উত্তর-ভারতীয় সমস্ত দেবালয়ের ও সমস্ত সমাধি-মন্দিরের সৌন্দর্য্য এই তাজমহলে যেন একাধারে অবস্থিত। বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সমবায়ে ইহার সৌন্দর্য্য একটা বিশালভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু বিশাল হইলেও গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় রমণীয়। সুবঙ্কিম ও ঋজু— এই সকল রেথারই বা কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—এই সকল রেখাগুলির কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য! তার পর, অমল-ধবল মার্ব্বেলের শুভ্র সৌন্দর্য্য। আবার যেমন কোন রত্নালঙ্কারে সযত্নরচিত অতি সূক্ষ্ম কত কি খুঁটিনাটি কাজ থাকে, সেইরূপ ইহার সূক্ষ্ম সুকুমার সৌন্দর্য্য। খোদাই মার্ব্বেলে সুন্দর ফিতার কাজ (Lace)। ঝিনুকের পাতের মধ্যে, প্রবালের মধ্যে, ফিরোজা প্রভৃতি মণির মধ্যে ফুল বসানো। বিলাসময়, ছায়াময়, সুগন্ধময় উদ্যানের সৌন্দর্য্য। অক্ষয় প্রস্তর-গাত্রে, মুসলমান-মস্তিষ্ক-প্রসূত যে সকল সুন্দর বাক্য খোদিত রহিয়াছে সেই সকল বাক্যের সৌন্দর্য্য। বৃহৎ সিংহদ্বারের গায়ে লেখা আছে;—"কেবলমাত্র ঈশ্বরই মহান্;" "ঈশ্বরের উদ্যানে শুদ্ধাত্মারাই প্রবেশলাভ করিবে।" তারপর, সেই ভাবের সৌন্দর্য্য যাহা এই সমাধিমন্দিরটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে: সুন্দর সেই জলন্ত প্রেম, সুন্দর সেই নির্ভয় মৃত্যু, সুন্দর সেই অনন্যপরায়ণ প্রেমিকের তীব্র শোক! এবং প্রেমের স্বপ্নকে—ঐশ্বর্য্য-বিভবের স্বপ্নকে বাস্তবতায় পরিণত করিবার জন্য, যতদিন মানবজাতি থাকিবে ততদিন, একজন মৃত রমণীর স্মৃতিকে মানুষের মনে সজীব রাখিবার জন্য, সুন্দর সেই বিরাট্ প্রযত্ন! তাজমহলের দীপ্ত মহিমা,—এই সান্ত্বনাদায়ক বচনটির সত্যতা সপ্রমাণ করে: —"মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের বল বেশী।"

হাঁ, পৃথিবীতে যত স্মৃতি-মন্দির আছে তন্মধ্যে তাজমহলই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। একবার যে তাজমহল দেখিয়াছে, তাহার জীবন সার্থক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বন্দী

৪৪

আমার কাহিনী।

সম্পাদকীয় বক্তব্য—বহু সন্ধানেও এই উল্লিখিত কাহিনীটি আমাদের করায়ত্ত হয় নাই। বোধ হয় সময়ের স্বল্পতা হেতু তিনি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার অবসর পান নাই।

৪৫

ভিলা হোটেলের একটি কক্ষ হইতে।

ভিলা হোটেল হইতে!...আমি এখানে আসিয়াছি! সে স্থানটা—ঐ যে আমার জানালার নিম্নেই! বিস্তর লোক জমিয়াছে। কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ বা হাসিতেছে।

এখন সাহস—শুধু সাহস! ঐ লালরঙের কাঠের থাম দুইটা দেখিয়া আমার বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিয়াছে!

কয়টা কথা আমি বলিয়া যাইতে চাহি! সরকারী উকিলকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি—যেটুকু সময় এমন করিয়া পাওয়া যায়!

ঐ যে কাহারা আসে! সময় হইয়াছে! আর অবসর নাই! সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছে! এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া, ছয় মাস ধরিয়া যাহা ভাবিতেছিলাম তাহা ঘটিতে চলিল! এতক্ষণ ভাবিয়াছি—তবু মনে হইতেছে এ মুহূর্ত কি অতর্কিতভাবেই আজ আসিয়া পড়িল!

কতকগুলা অলিগলি, সোপানশ্রেণী ঘুরাইয়া তাহারা আমাকে লইয়া চলিল। শেষে একটা ছোট ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম—ছোট বায়ুপথের মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল—চারিধার কুয়াশাতে ভরিয়া গিয়াছে! রৌদ্র নাই! আমি চেয়ারে বসিলাম।

ঘরে আরো তিন চারজন লোক ছিল—আচার্য্য ছিলেন!

সহসা আমার কেশে লোহের শীতলস্পর্শ অনুভব করিলাম এবং কাঁচির শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। কেশের ভার নিমেষে আমার পদতলে লুণ্ঠিত হইল! আমি স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। আশ পাশে সকলে চুপি চুপি কথা কহিতেছিল!

একজন কহিল, "এ কি হচ্ছে?"

আর একজন কহিল, "মাথার চুলগুলো কেটে—দাড়িটা কামিয়ে তবে নিয়ে যাব।"

চোখ তুলিয়া দেখি—কাগজের তাড়া ও পেন্সিল লইয়া একটা লোক প্রশ্ন করিতেছে—বুঝিলাম সে কোন পত্রিকার সংবাদদাতা! কালিকার কাগজের জন্য তথ্য সংগ্রহে আসিয়াছেন! কাল প্রত্যুষে সংবাদ-পত্রের বাজারে আমার বিষয় লইয়া মহাধুম বাধিয়া যাইবে—হায় তখন কোথায় আমি?

একটা প্রহরী আসিয়া আমার হাত ধরিল—আমি কহিলাম, "আঃ!

সে কহিল, "ক্ষমা করবেন—আপনার কি ব্যথা লাগ্‌ছে?" এই সে—আমাকে যে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইবে—সরকারী জল্লাদ! যে হাতে আমাকে সে স্পর্শ করিয়াছে, সেই হাতে কত লোকের প্রাণ নিয়াছে! এমন নম্র কথা-বার্ত্তা তার এমন শান্ত স্বর! আশ্চর্য্য!

তারা একটা সূক্ষ্ম দড়িতে আমার পা দুইটা আল্গা করিয়া বাঁধিয়া দিল—যাহাতে আমার গতি একটু লঘু হয়—দ্রুত না চলিতে পারি!

আচার্য্য ডাকিলেন, "এস বৎস!"

দুইটা প্রহরী আমার দুই হাত ধরিল। আমি ধীর পাদক্ষেপে আচার্য্যের অনুসরণ করিলাম।

বাহিরের দ্বার খুলিয়া গেল! খানিকটা কোলাহল, দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ও অস্ফুট আলোক-তরঙ্গ একসঙ্গে ভিতরে ঢুকিল! বাহিরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে—এই বৃষ্টি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া আজ দেশের নরনারী এই বীভৎস হৃদয়হীন অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে! কি নির্লজ্জ কৌতুক স্পৃহা! কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে ছাতাটুপির সংখ্যাই নাই! চারিধারে সশস্ত্র প্রহরীর শ্রেণী—পাছে কোনরূপে শান্তিভঙ্গ

হয়! আমি বাহিরে আসিলেই চীৎকার উঠিল—"ঐ-ঐ-ঐ যে আসছে একধারে বিপুল করতালির ধ্বনি উঠিল! রাজার যোগ্য সম্মানে আমি পথে চলিয়াছি! চমৎকার!

বাহিরেই একটা ছোট ঠেলাগাড়ী—আমি তাহাতে চড়িলাম। সশস্ত্র কয়েকটা প্রহরী গাড়ীর চারিধার ঘেরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী চলিল!

একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"নমস্কার, মশায়।" আর একজন কহিল "বহুৎ আচ্ছা! সুপ্রভাত!"

একটি স্ত্রীলোক কহিল, "মরতে চলেছে"।

চারিধারের এই বিকট কোলাহলে মনে একটা সাহস পাইলাম।

পথে আমারি জন্য আজ এই বিপুল জনতা। আবার কে কহিল, "টুপি খুলে ফেল সব!" যেন রাজা চলিয়াছেন!

আমি হাসিলাম—হায় ইহারা টুপি খুলিতেছে,—আমাকে মাথাটা খুলিয়াদিতে হইবে! ফুলের বাজারের পাশ দিয়া গাড়ী চলিতেছিল! মিষ্ট গন্ধে প্রাণ যেন কতকটা আশ্বস্ত হইল; লাল নীল সাদা নানা রঙের ফুলে শোভাও সুন্দর হইয়াছিল! বাজারে-বাড়ীতে—কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই—লোক—কেবলি লোক—বাড়ীওয়ালারা বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জনে সুযোগ পাইয়াছে! ক্রমে ভিড় বেশী হইতে লাগিল! মুখখানাতে প্রফুল্লতা আনিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলাম—যেন কেহ কাপুরুষ না মনে করে।

হারে বৃথা দর্প! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এখনো এত মায়া কিসের জন্য? লোকের স্তুতি-নিন্দার প্রতি এত শ্রদ্ধা, এত আগ্রহ!

আচার্য্যের হাত হইতে ক্রুশ লইয়া বুকে চাপিলাম, একান্ত আগ্রহে বলিলাম,—"দয়া কর প্রভু—দয়া কর—বল দাও ভগবান, হে আর্ত্তের বন্ধু—"! সমস্ত বাহ্যজগৎটা উড়াইয়া চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিলাম! কিন্তু লোকের কোলাহলে একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কেমন একটা কম্পন আসিল সারা অঙ্গও বৃষ্টি-জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য কহিলেন, "কাঁপছ তুমি? শীত লাগছে বুঝি?"

মুখে বলিলাম, "হাঁ!" কিন্তু ভগবান জানেন, এ কম্পন শীতের জন্য নহে!

কয়েকটি স্ত্রীলোকের করুণ সহানুভূতি কানে গেল—আমার এই তরুণ বয়স দেখিয়া তাহার করুণায় গলিয়া গিয়াছিল!

ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার দৃষ্টি ও শ্রুতি-শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। এই কোলাহল, এই অগণিত পরিচিত অপরিচিত নরশির—আমি উন্মাদের মত হইয়া পড়িলাম—এতগুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে—ইহা ভাবিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলাম!

ক্রমে সেই মিশ্র কোলাহলের একটি বর্ণও আয়ত্ত করা দুরূহ হইয়া পড়িল। সমস্ত মিলিয়া একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত কাণে বাজিতেছিল!

দোকানের নাম ও রাস্তায় বিজ্ঞাপনগুলা আপন মনে পড়িয়া যাইতে লাগিলাম!

একধারে নদী চোখে পড়িল—উপরে ছায়ার মত উচ্চচূড়াও অল্প দেখা যাইতেছিল! ইহার মধ্যে কখন সেতু পার হইয়া এপারে আসিয়া পড়িয়াছি—জানিতেও পারি নাই!

হঠাৎ এক সময় গাড়ী থামিয়া পড়িল! আমি শিহরিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখেই ফাঁস-কাঠ!

আচার্য্য বলিলেন, "মনে বেশ সাহস আনো, এবার!"

তার পর আমার হাত ধরিয়া প্রহরীগুলা আমাকে উপরে তুলিল! মাতালের মত আমার পা টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল।

আচার্য্যকে বলিলাম, "একটা কথা আছে।"

তিনি কহিলেন, কি?"

আমি কহিলাম, "একটু সময় দিন—ক্ষমা—ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেছি—যদি দয়া হয়, যদি ক্ষমা মেলে—দোহাই আপনার দয়া করে একটু সময় দিন—একটু শুধু—আমি মরে গেলে যদি ক্ষমার খবর আসে, তখন আর কোন উপায় থাকবে না, তাই—"

আচার্য্য সরিয়া গেলেন! প্রহরী আসিয়া বলিল, "আসুন—সময় হয়েছে!"

আমি কহিলাম—"দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, ভাই—ক্ষমার খবরটা আসতে দাও, এখনি এসে পৌঁছিবে—এমন ত কত হয়েছে! শুধু সময় দাও,—একটু সময়—তাতে কারো কোন ক্ষতি হবে না—!"

কেহ সে কথা কাণে তুলিল না।

ওঃ!—ঐ সব উৎসুক দর্শকের সারি! কি বিকট তাদের চীৎকার-ধ্বনি—মানবের কণ্ঠের ভাষা এমন পরুষ, এমন ভীষণ!

তবে কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে না-কেহ বাঁচাইবে না? ক্ষমা—ক্ষমা—কিছুতে না!

প্রহরী দুইটা যমদূতের মত হাত ধরিল—ফাঁসিকাঠের নিকট আনিয়া দাঁড় করাইল—আমার চারিধারে একটা পর্দ্দা খাটাইয়া দিল—

* * * * *

ঘড়িতে চারিটা বাজিতেছে!

সমাপ্ত।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

(তৃতীয় খণ্ড)

১। উচাংনা (উদ্যান)

উচাংনা দেশ প্রায় পাঁচ হাজার লি বিস্তৃত। এ দেশীয় পর্ব্বত ও উপত্যকা সমূহ অবিচ্ছিন্ন। উপত্যকা ও জলাভূমির মধ্যে উচ্চ ভূমি। নানা প্রকার শস্য বপন করা হয় কিন্তু তত সুন্দর ফসল হয় না। যথেষ্ট আঙ্গুর পাওয়া যায় কিন্তু ইক্ষুদণ্ড অধিক পাওয়া যায় না। স্বর্ণ ও লৌহ পাওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় ভূমি হরিদ্রা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। দেশের জল বায়ুও উত্তম। অধিবাসীগণ ভীরু কিন্তু ধূর্ত্ত ও চতুর। ইহারা যাদুবিদ্যা আচরণ করে। কেবলমাত্র কাপাস নির্ম্মিত শুভ্র বস্ত্র এইদেশে ব্যবহৃত। এই বস্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই ইহারা পরিধান করে না। সামান্য প্রভেদ সত্বেও এতদ্দেশীয় ভাষা ভারতবর্ষীয়-ভাষার ন্যায়। অক্ষর ও আচরণেও এই প্রথা প্রচলিত। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং মহাযান মতাবলম্বী।

সুভাবস্তু নদীর উভয় তীরে প্রায় চৌদ্দশত প্রাচীন সঙ্ঘারাম। বর্ত্তমানে উহারা জনশূন্য। পূর্ব্বে তথায় অষ্টাদশ সহস্র যতি বাস করিত কিন্তু ক্রমে ক্রমে কম

হইয়া এইক্ষণ অতি অল্প সংখ্যক যতিই বাস করে। ইহারা মহাযান মতাবলম্বী; নির্জ্জনে ধ্যান করে এবং শাস্ত্রপাঠও করে কিন্তু শাস্ত্রে বোধ কম। যতিগণ যাদুবিদ্যা আচরণ করিতে নিষেধ করে। সর্ব্বাস্তিবাদিন, ধর্ম্মগুপ্ত, মাহিশশাক, কাশ্যপীয়, এবং মহাসঙ্গিকা—এই পাঁচ প্রকার বিনয়-সম্প্রদায় প্রচলিত। দেবতাদিগের দশটী মন্দির আছে এবং অবিশ্বাসীগণ উহাতে বাস করে। চারিটী কি পাঁচটী সুরক্ষিত নগর আছে। রাজা মুঙ্গলি নগরে বাস করেন। এই নগরটী প্রায় ১৬।১৭ লি এবং লোকপূর্ণ। মুঙ্গলীর ৪।৫ লি পূর্ব্বে একটী বৃহৎ স্তূপে অনেক প্রকার নৈসর্গিক ঘটনা দৃষ্ট হয়। এই স্থানে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বরূপে বাস করিয়া কলিরাজার জন্য নিজ শরীর উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মুঙ্গলি নগরের ২৫০ কি ২৫০ লি উত্তর পূর্ব্বে আমরা এক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া অপলাল নাগের উৎসে উপস্থিত হই। এই উৎস হইতে স্বাস্ত নদীর উৎপত্তি। এই নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। বর্ষা ও বসন্তকালে এই নদীর জল জমিয়া যায় এবং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বায়ু তাড়িত তুষার রাশির সুন্দর শোভা দৃষ্ট হয়। এই নাগ, কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গাঙ্গি নামে অভিহিত হইতেন। যাদুবিদ্যা বলে এই ব্যক্তি দৈত্যগণকে দমন করিয়া দেশকে ঝটিকা হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহারই অনুগ্রহে দেশে প্রচুর শস্য জন্মিত। এই জন্য প্রত্যেক পরিবারই তাঁহাকে বাৎসরিক কিছু কিছু করিয়া শস্যদান করিতে মনস্থ করিল। কয়েক বৎসর পরে এক ব্যক্তি এই প্রতিশ্রুত শস্য দিতে বিস্মৃত হওয়ায় গাঙ্গি প্রার্থনা করিলেন যে তিনি যেন বিষাক্ত সর্পরূপ ধারণ করিয়া এতদ্দেশবাসীর শস্য বৃষ্টি ও ঝটিকা দ্বারা নষ্ট করিতে পারেন। জীবনান্তে তিনি সর্পরূপ ধারণ করিলেন; এবং উৎস হইতে একপ্রকার শ্বেত বারি ছড়াইয়া এদেশের সকল শস্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শাক্য তথাগত দেশবাসীর দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সর্পকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। বজ্রপাণির দণ্ডধারণ করিয়া তিনি পর্ব্বতে আঘাত করিতে লাগিলেন। সর্পরাজ ভীত হইয়া গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তথাগতকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বুদ্ধদেবের বাক্যে সর্পের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইল। বুদ্ধদেব সর্পকে কৃষকগণের শস্য বিনষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন; ইহাতে সর্পরাজ উত্তর করিল আমার সকল আহারীয় সামগ্রী এই সকল কৃষকদিগের ভূমি হইতে সংগ্রহ হয় কিন্তু এইক্ষণ আপনার উপদেশে কৃতজ্ঞ হইয়া, আমি এরূপ সংগ্রহ বন্ধ করিব; কিন্তু আমি দ্বাদশ বৎসর অন্তর যাহাতে আহার সংগ্রহ করিতে পারি, তাহার আদেশ প্রদান করুন।" তথাগত করুণা পরবশ হইয়া এইরূপ অনুমতি দেওয়াতে দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই দেশে শ্বেত নদীর জল বৃদ্ধ হইয়া অধিবাসীগণের দুর্দ্দশা হয়।

অপলাল নাগের উৎসের ৩০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে বৃহৎ পর্ব্বতে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে। দর্শকের পুণ্যানুযায়ী এই চিহ্ন হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সর্পদমনের চিহ্ন বুদ্ধদেব এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন। পরে জনসাধারণ এই স্থানে প্রস্তরের আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে। বহুদূর হইতে জনসাধারণ এই স্থানে আসিয়া গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পদ্বারা এই পদচিহ্ন পূজা করে। ৩০ লি দূরে বুদ্ধদেব যে স্থানে তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়াছিলেন আমরা তথায় উপস্থিত হই। কশায় বস্ত্রের সূতের চিহ্ন অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়।

মুঙ্গলি নগরের ১০০ লি দক্ষিণে আমরা হিল পর্ব্বতে উপস্থিত হই। নদীতীরে নানাপ্রকার পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। উপত্যকায় অনেক গুহা ও নদী আছে। অপ্রশস্ত খট্টাঙ্গের ন্যায় অনেকগুলি প্রস্তর আছে; দেখিলে বোধ হয় যেন ইহারা মনুষ্যের সৃষ্ট। এই স্থানে তথাগত একটী গাথা অর্দ্ধেকাংশ শ্রবণ করিয়া আত্মহত্যা করিয়া ছিলেন।

মুঙ্গলি নগর হইতে দুই শত লি দক্ষিণে আমরা মহাবান সঙ্ঘরামে পৌঁছি। এই স্থানেই প্রাচীনকালে তথাগত 'সর্ব্বদাতা রাজা' নামে আখ্যাত হইয়া বোধিসত্ত্বের ন্যায় জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া

গোপনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই স্থানে তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে এবং তাঁহার সঙ্গে কিছুই না থাকাতে তিনি তাঁহাকে বন্ধন করিয়া তাঁহার শত্রুর নিকট লইয়া পুরস্কার গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণকে আদেশ দেন। মহাবান সঙ্ঘারাম হইতে ৩০।৪০ লি উত্তর পশ্চিমে যাইয়া আমরা "মহ্নসঙ্ঘারামে" পৌঁছি। এই স্থানে একশত ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটী স্তূপ আছে। এই স্তূপের নিকটেই চতুষ্কোণ প্রস্তরে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কোটি কিরণরশ্মি দ্বারা মহাবান সঙ্ঘারাম আলোকিত করিয়াছিলেন এবং পরে দেবতা ও মনুষ্যের উপকারার্থে নিজের পূর্ব্বজীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই স্তূপের নিম্নদেশে শ্বেত ও পীত বর্ণের একখানি প্রস্তর আছে; এই প্রস্তর হইতে সদাসর্ব্বদা একপ্রকার ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এই স্থানে প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন, তখন প্রকৃত ধর্ম্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় শরীরস্থ অস্থির চর্ব্বি দ্বারা একখানি পুস্তকের সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

মোস্থ সঙ্ঘারাম হইতে ৬০।৭০ লি পশ্চিমে অশোকরাজ নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। তথাগত এই স্থানেই পুরাকালে বোধিসত্ত্বরূপে শিবিকারাজ নামে খ্যাত ছিলেন। একটী শ্যেনপক্ষী হইতে একটী পারাবতকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এই স্থানেই নিজের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে ২০০ শত লি উত্তর-পশ্চিমে আমরা সান-নি লোসির উপত্যকায় পৌঁছি। এই উপত্যকায় সাপোও-সাটির মঠ আছে। এইস্থানে আশি ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটি স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধদেব শক্র নামে খ্যাত ছিলেন, তখন এই দেশে সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি ছিল। ঔষধে কোন উপকারই হইত না এবং রাজপথ মৃত-পূর্ণ থাকিত। বুদ্ধদেব কি প্রকারে সকলকে রক্ষা করিতে পারিবেন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ সর্পমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপত্যকায় নিজ মৃত শরীর বিস্তৃত করিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে সকলে সানন্দ চিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতসর্পের শরীর কাটিতে আরম্ভ করিল। যতই তাহারা সর্পের দেহ কাটিতে লাগিল ততই তাহারা সুস্থ হইতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির কোনরূপ প্রকোপ রহিল না।

এই স্তূপের নিকটেই বৃহৎ সুম স্তূপ। এই স্থানে তথাগত করুণ চিত্ত হইয়া সুম নামক সর্পে পরিণত হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার মাংস গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। উপত্যকার পার্শ্বেই অন্য একটী স্তূপ। পীড়িত ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হইলে আরোগ্য লাভ করে। পুরাকালে তথাগত ময়ূরের রাজা ছিলেন। এক দিন তিনি সহচরবর্গ সহ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার সহচরগণ জল অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। ময়ূররাজ তাঁহার চঞ্চু দ্বারা পর্ব্বতে আঘাত করাতে জল নির্গত হইল; ঐ জলে হ্রদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পীড়িত ব্যক্তি এই হ্রদের জল পান বা ইহাতে অবগাহন করিলে আরোগ্য লাভ করে। পর্ব্বত গাত্রে এখনও ময়ূরের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

মুঙ্গলি নগরের ৬০।৭০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে বৃহৎ নদীর পূর্ব্বদিকে ৬০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। ইহা উত্তরসেনা নির্ম্মিত। পুরাকালে তথাগত ধর্ম্ম-মণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন "আমার নির্ব্বাণের পরে উদ্যানরাজ উত্তরসেনরাজ আমার শরীরের চিহ্ন-বিশেষ পাইবেন"। যখন রাজগণ বুদ্ধদেবের শরীরের চিহ্ন সমভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যত তখন উত্তরসেন রাজ তথায় উপস্থিত হন। বৈদেশিক রাজা বলিয়া অন্য কোন রাজা তাঁহাকে কোন প্রকার সম্মান করেন নাই। এই সময়ে দেবতাগণ বুদ্ধদেবের শেষ কথাগুলি পুনর্ব্বার প্রচার করেন। পরে চিহ্নের অংশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপের নিকটেই গজাকার এক পর্ব্বত আছে। উত্তরসেনরাজ শ্বেত হস্তী পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন আনয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইলে

অকস্মাৎ হস্তীটী প্রাণ পরিত্যাগ করে এবং তৎক্ষণাৎ প্রস্তরে পরিণত হয়। ইহার সন্নিকটে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুঙ্গলি নগরের ৫০ লি পশ্চিমে আমরা ৫০ ফুট উচ্চ অশোক রাজ নির্ম্মিত রোহিতক স্তূপে উপস্থিত হই। তথাগত যখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন তখন তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন। এই স্থানে তিনি নিজ শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া পাঁচজন যক্ষকে নিজ রক্ত দ্বারা আহার করাইয়াছিলেন! মুঙ্গলি নগরের ৩০ লি উত্তর পূর্ব্বে ৪০ ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানে, পুরাকালে তথাগত মনুষ্য ও দেবতাগণের জন্য ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তথাগতের প্রস্থানের পরে পৃথিবী গর্ভ হইতে সহসা এই স্তূপ উত্থিত হয়। জনসাধারণ এই স্তূপকে যথেষ্ট ভক্তি করে এবং অনবরত পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা পূজা করে। প্রস্তর স্তূপের পশ্চিমে আমরা নদী পার হইয়া একটী বিহারে উপস্থিত হই। এই বিহারে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। ইহার অনৈসর্গিক ক্ষমতা প্রহেলিকাপূর্ণ। সকলে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া অনবরত ইহাকে পূজা করে।

বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি হইতে ১৪০ কি ১৫০ শত লি উত্তর পশ্চিমে যাইয়া আমরা লালপোলু পর্ব্বতে পৌঁছি। এই পর্ব্বতের শিরোভাগে ৩০ লি আন্দাজ পরিধিবিশিষ্ট সর্প-হ্রদ আছে। ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। পুরাকালে বিরুদ্ধকরাজ শাক্যগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে শাক্যগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। একজন শাক্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এবং ভ্রমণক্লান্ত হইয়া রাজপথের মধ্যস্থলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। এক বন্যহংস আকাশমার্গ হইতে তথায় উপস্থিত হইল এবং উক্ত শাক্য বংশীয় ব্যক্তি উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে লইয়া হংস এই সরোবর সমীপে উপস্থিত হইল। এই প্রকারে পলায়িত শাক্য নানাদিকে নানাদেশ ভ্রমণে সক্ষম হইলেন। একদিন তিনি পথশ্রান্ত হইয়া সরোবর তীরে বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক যুবতী নাগকন্যা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ শাক্য যুবককে দেখিতে পাইল। অন্য উপায়ে নিজ অভিলাষ চরিতার্থ করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া নাগ কন্যা মনুষ্য মূর্ত্তিতে শাক্য যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। যুবক ইহাতে ভীত হইয়া নিদ্রাভঙ্গে যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "আমি দরিদ্র ক্লান্ত পর্য্যটক; সুতরাং তুমি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ কেন দেখাইতেছ?" অতঃপর যুবক যখন যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, তখন যুবতী উত্তর করিল যে "তাহার পিতামাতার আদেশ ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। যুবক যুবতীর গৃহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবতী উত্তর করিল যে, সে ঐ সরোবরের নাগরাজের কন্যা।" এবং সে শাক্যগণের পরাজয়ের কথা এবং ঐ যুবকের গৃহ তাড়িত হইয়া যত্রতত্র ভ্রমণের কথা শ্রবণ করিয়াছে। এইক্ষণ পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত সে যুবকের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।

শাক্যযুবক তৎপর বলিলেন যে তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এই নাগ স্ত্রী মনুষ্যরূপে পরিণত হউক। বলিবামাত্রই নাগ-যুবতী তদ্রূপ হইল। ইহাতে যুবতী পরম সন্তুষ্টা হইয়া শাক্যযুবককে কৃতজ্ঞচিত্তে নিবেদন করিল "আমার কুকর্ম্মফলে আমি নানারূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়া এইক্ষণ আপনার পুণ্যবলে মনুষ্য দেহ পরিধারণ করিলাম। আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই এবং কোটী কোটী বার আপনার নিকট যাইয়া প্রণিপাত করিলেও ইহার শোধ হইবে না। আমি আমার পিতামাতাকে এই বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া পরে আপনার অনুবর্ত্তিনী হইব। নাগিনী পরে সরোবরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার পিতামাতার নিকট বর্ণনা করিয়া বিবাহে সম্মতি প্রার্থনা করিল। নাগরাজ ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বিবাহে সম্মত হইলেন। পরে সরোবর হইতে যুবকের নিকট গমন করিয়া শাক্য যুবককে নিবেদন করিলেন যে "আপনি অন্য জীবকেও ঘৃণা করেন না; অনুগ্রহ করিয়া আমার আবাসে উপস্থিত হইয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।" যুবক এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নাগরাজের ভবনে

উপনীত হইলেন। ইহাতে নাগরাজের সকল আত্মীয় অত্যন্ত আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল কিন্তু যুবক উৎসবাদি কার্য্যে নিযুক্ত সর্পগণের আকৃতিতে ভীত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ তাঁহাকে বলিলেন যে অনুগ্রহ করিয়া তিনি যেন প্রস্থান না করেন। নিকটবর্ত্তী কোন বাসস্থানে তিনি থাকিলে, নাগরাজ শাক্য যুবককে শীঘ্রই ঐ দেশের রাজা করিয়া দিবেন। ঐ দেশের সকল ব্যক্তিকেই তিনি বশীভূত করিয়া দিবেন এবং শাক্যযুবকের বংশ অনেক দিন ধরিয়া ঐস্থানে রাজত্ব করিতে পারিবে।

যুবক এই প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন কিন্তু নাগরাজের কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। নাগরাজ ইহাতে মূল্যবান এক তরবারী উৎকৃষ্টনির্ম্মিত এক আধারে স্থাপন করিয়া যুবককে বলিলেন যে "ইহা লইয়া আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এই শুভ্র উৎকৃষ্টাধার রাজাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করুন। রাজা ইহা যেমন গ্রহণ করিতে যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি এই তরবারীদ্বারা তাহাকে হত্যা করিবেন। এই প্রকারে আপনি ঐ রাজ্যাধিকারে সক্ষম হইবেন।" শাক্য যুবক নাগাবেশে উদ্যানদেশের রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে হত্যা করিলেন। উপস্থিত মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গ ইহাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শাক্য যুবক তাঁহার তরবারী উত্তোলন করিয়া বলিলেন যে "এই তরবারী আমাকে পুণ্যাত্মা নাগরাজ দিয়াছেন; ইহাদ্বারা আমি গর্ব্বিতকে শাসন করিব।" ঐশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট যোদ্ধার নিকট তাহারা পদানত হইল এবং তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিল। শাক্যযুবক দেশে শান্তিরক্ষা ও কুপ্রথা দমন করিলেন। পরে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে নাগরাজের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু এ যাবৎ নাগিনীর পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপের ক্ষয় না হওয়াতে রাত্রিকালে তাহার মস্তক হইতে নয়টা মস্তক বিশিষ্ট সর্প বহির্গত হইত। শাক্যরাজ ইহাতে ভীত হইয়া একদিন রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রিতা রাজ্ঞীর মস্তক উত্থিত সর্পের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন। রাজ্ঞী জাগরিতা হইয়া সভয়ে বলিলেন যে "ইহাতে আমার জীবনে আমাকে বিশেষ কিছু কষ্ট দিবে না, কিন্তু আপনার উত্তরাধিকারীগণ চিরকাল মস্তকের বেদনায় কষ্ট পাইবে।" সেই সময় হইতে এতদ্দেশীয় রাজবংশীয়গণ এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। শাক্য যুবকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উত্তর সেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন।

উত্তর সেনের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মাতার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। তথাগত নাগ অপলালকে দমন করিয়া শূন্য হইতে এই স্থানে অবতীর্ণ হন। উত্তর সেন অনুপস্থিত ছিলেন তথাগত তাঁহার মাতাকে ধর্ম্মোপদেশ দেন। বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ হইতে এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া রাজমাতা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন। তথাগত উত্তরসেনের মাতাকে পুত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মাতা নিবেদন করেন যে রাজা মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছেন। তথাগত ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণ প্রস্থানোদ্যত হইলে রাজমাতা নিবেদন করিলেন যে "বহুপুণ্য বলে তিনি পুণ্যবংশীয় রাজপুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তথাগত বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আমার পুত্র শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া কিছু কালের জন্য অপেক্ষা করুন।' পৃথিবীপতি উত্তর করিলেন যে "রাজমাতার পুত্র তাঁহারই বংশীয়। ধর্ম্মের কথা শ্রবণ মাত্রই তিনি বিশ্বাস করিবেন। যদি রাজা উত্তর সেন তাঁহার আত্মীয় না হইতেন, তবে তিনি এইস্থানে থাকিয়া তাঁহার সম্মুখে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তিনি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে বলিবেন যে তথাগত এই স্থান হইতে কুশীনগরে গমন করিয়াছেন; শালবৃক্ষতলে শীঘ্রই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; আপনার পুত্র যেন স্মরণ চিহ্নের জন্য তথায় গমন করেন।"

তথাগত এই কথা বলিয়া সপারিষদ আকাশমার্গ দ্বারা প্রস্থান করিলেন। পরে উত্তর সেন

মৃগয়াকালীন দেখিতে পাইলেন যে তাহার প্রাসাদ সহসা আলোকিত হইয়াছে। সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মাতাকে দৃষ্টি-শালিনী দেখিয়া সানন্দচিত্তে কি প্রকারে তিনি দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিলেন এই প্রশ্ন করিলেন। রাজমাতা বলিলেন যে রাজার প্রস্থানের পর তথাগত তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপাসনা শ্রবণান্তে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিলাভ হইয়াছে। তথাগত কুশীনগরে গমন করিয়াছেন; তথায় তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন এবং স্মরণচিহ্ন সংগ্রহের জন্য রাজাকে তথায় প্রয়াণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে জ্ঞান লাভ হইলে তিনি সপারিষদ যথায় শালবৃক্ষ মধ্যে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তথায় উপনীত হইলেন। বৈদেশিক রাজা বলিয়া প্রথমতঃ অন্যান্য সকল রাজাই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু দেবতাগণ বুদ্ধদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিলে অন্যান্য রাজাগণ তাঁহাকেও স্মরণ-চিহ্নের ভাগ দান করিলেন।

মুঙ্গলিনগরের উত্তর পশ্চিমে আমরা পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা পার হইয়া পুনরায় সিন্ধুনদীর মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাজপথ বন্ধুর এবং গড়ানে। উপত্যকাগুলি অন্ধকার। কোন কোন সময়ে রজ্জু সাহায্যে এবং কোন সময়ে লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা আমাদের পার হইতে হইয়াছে। প্রায় এক সহস্র লি যাইয়া আমরা টালিলো দেশে পৌঁছি। পূর্ব্বে এইস্থানেই উচাংনা দেশের রাজধানী ছিল। এই দেশে যথেষ্ট সুবর্ণ ও হরিদ্রা পাওয়া যাইত। বৃহৎ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে কাঠের মৈত্রেয় বোধিসত্বের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সুবর্ণরঞ্জিত, দেখিতে উজ্জ্বল এবং অলৌকিক ক্ষমতাশালী। উচ্চে ইহা এক শত ফুট এবং ইহা অর্হৎ মধ্যানতিক নির্ম্মিত। এই অর্হৎ তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে একজন ভাস্করকে নিজচক্ষে মৈত্রেয়ের শরীরের চিহ্ন সকল দেখিবার জন্য তিনবার স্বর্গে প্রেরণ করেন। এই মূর্ত্তি গঠনের সময় হইতেই পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। পূর্ব্বদিকে অনেক তুঙ্গ পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইয়া এবং উপত্যকা পার হইয়া আমরা ৫০০ লি যাইয়া পোলুলো (বোলর) দেশে উপস্থিত হই।

বোলরপ্রদেশ

এই প্রদেশ ৪০০০ লি; ইহা তুষার পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই দেশ খুব লম্বা কিন্তু উত্তর দক্ষিণে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই দেশে গম, কলাই, সুবর্ণ ও রৌপ্য জন্মে। প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া, এতদ্দেশবাসীরা অর্থশালী। দেশটি শীতপ্রধান। অধিবাসীরা অসভ্য। তাহারা ন্যায়ের ধার ধারে না এবং আদৌ বিনয়ী নহে। উহারা পশমের বস্ত্র ব্যবহার করে এবং অশিষ্ট। প্রচলিত অক্ষরগুলি ভারতবর্ষের ন্যায় কিন্তু ভাষা স্বতন্ত্র। শতাধিক সঙ্ঘারামে সহস্র যতি আছেন কিন্তু উঁহারা জ্ঞানার্জ্জনে উৎসুক সাধু চরিত্র নহেন। এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আমরা সিন্ধু নদী পার হই। এই নদী ৩৪ লি বিস্তৃত এবং ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। নদীতীরে বিষাক্ত সর্প এবং হিংস্র জন্তু বাস করে। যদি কেহ মূল্যবান পণ্য বা রত্ন অথবা পুষ্প ও ফল বিশেষতঃ বুদ্ধের স্মরণচিহ্ন লইয়া এই নদী পার হইতে চেষ্টা করে, তবে নদীর ঢেউ নৌকাকে গ্রাস করে। এই নদী পার হইয়া আমরা তক্ষশীলায় পৌঁছি।

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা রাজ্য প্রায় ২০০০ লি এবং ইহার রাজ-ধানীর ১০ লি পরিধি। রাজবংশ নির্ব্বংশ হওয়াতে উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ ক্ষমতা পরিচালনের জন্য বিবাদ করে। এই দেশ প্রথমে কপিশা রাজ্যের অধীন ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা কাশ্মীরের অধিকারভুক্ত। জমী বিশেষ উর্ব্বরা এবং প্রচুর পরিমাণে ফসল জন্মে। দেশে অনেক নদী ও উৎস আছে। নাতিশীতোষ্ণ এই দেশে যথেষ্ট পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। অধিবাসীরা সাহসী, প্রফুল্ল এবং ত্রিরত্নকে সম্মান করে। অনেকগুলি সঙ্ঘারাম আছে কিন্তু বর্ত্তমানে সেগুলি জনশূন্য; তথায়

কয়েকজন মাত্র যতি বাস করে। ইহারা মহাযান মতাবলম্বী। রাজধানীর ৭০ লি উত্তর পশ্চিমে নাগরাজ ইলাপত্রের সরোবর অবস্থিত। ইহার জল সুস্বাদু ও পবিত্র। নানারঙের পদ্ম পুষ্প এই সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করে। এই নাগ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতীয় ছিল এবং কশ্যপ বুদ্ধের সময় ইলাপত্র বৃক্ষ নষ্ট করিত। এইজন্য এতদ্দেশীয় লোকের যখন বৃষ্টির আবশ্যক হয়, তখন ইহারা শ্রমণগণের সহিত সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা শব্দ করে অথবা প্রার্থনা করিলেই অভীষ্টপূর্ণ হয়।

নাগ সরোবরের ৩০ লি দক্ষিণ পূর্ব্বে দুইটী পর্ব্বতের মধ্যস্থ গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হই। এইস্থানে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপ আছে। উচ্চে এই স্তূপ প্রায় একশত ফুট। এইস্থানে শাক্য তথাগত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশ করেন যে যখন পৃথিবীপতি মৈত্রেয় এই জগতে আবির্ভূত হইবেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চারিটী রত্নও আপনা হইতে আবির্ভূত হইবে এবং ঐ চার রত্নের একটী এই দেশে থাকিবেন। লোক-পরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, যখন চতুর্দ্দিকে ভূমিকম্প হয়, তখন এই স্থানের একশত পাদভূমি বেষ্টন করিয়া কোনপ্রকার আন্দোলন হয় না। যদি কোন ব্যক্তি এই স্থান খনন করে, তবে পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হয়। স্তূপের নিকটে সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অনেকদিন হইতে এই সঙ্ঘারাম জনশূন্য এবং এখানে কোন যতি বাস করেন না।

নগরের উত্তরে ১২।১৩ লি দূরে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপ আছে। উৎসবদিবসে এই স্তূপ আলোকিত হয় এবং ঐশ্বরিক পুষ্প এই স্থানে পতিত হয় সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক বাদ্যও শ্রুত হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে পুরাকালে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত কোন স্ত্রীলোক এইস্থানে বাস করিত। গোপনে স্তূপে আসিয়া সে নানাপ্রকারে পূজা করে এবং নিজ পাপ স্বীকার করে। পরে স্তূপের আঙ্গিনা গোময় এবং ধূলি পরিপূর্ণ দেখিয়া সে উহা পরিষ্কার করে এবং পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য বিক্ষিপ্ত করে। পরে নীলপদ্ম সংগ্রহ করিয়া উহাও এইস্থানে প্রদান করে। ইহাতে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক সে দিব্য দেহ লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লাবণ্যময় অঙ্গ হইতে নীলপদ্মের গন্ধ বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং এই স্থানও উক্ত গন্ধ লাভ করে। তথাগত এইস্থানে বোধিসত্ত্বরূপে বিনয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি এই দেশের রাজা ছিলেন এবং চন্দ্রপ্রভা নামে খ্যাত ছিলেন। বোধি লাভের জন্য তিনি নিজ মস্তক ছেদন করেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে তিনি সহস্র জন্ম ঐরূপ করিয়াছিলেন।

এই স্তূপের পার্শ্বের সঙ্ঘারাম জনশূন্য, কেবলমাত্র কয়েকজন যতি তথায় বাস করেন। প্রাচীনকালে সূত্রের সম্প্রদায়ান্তর্গত কুমারলব্ধ এই স্থানে কয়েকখানি শাস্ত্র রচনা করেন। নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে পর্ব্বতপার্শ্বে ১০০ফুট উচ্চ স্তূপ আছে। এই স্থানে তাহারা কুনালের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছিল। এই স্তূপ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। অন্ধ ব্যক্তিরা এই স্তূপের সম্মুখে প্রার্থনা করিলে তাহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। কুনাল পাটরাণীর সন্তান ছিলেন। তিনি দেখিতে সুন্দর এবং দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। যখন পাটরাণীর মৃত্যু হয়, তাহার স্থলাভিষিক্তা ইন্দ্রিয়পরায়ণা রাণী রাজপুত্র কুনালের নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিলে, কুনাল তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে বিমাতা কুপিতা হইয়া রাজাকে বলে যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করা উচিত। রাজপুত্র কুনাল দয়ার্দ্রচিত্ত এবং সুধীর। রাজা ইহাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কুনালকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। এদিকে কুনালের বিমাতা প্রতিশোধ লইবার মানসে মোম দ্বারা পত্র লিখিয়া নিদ্রিত অশোকের দন্ত চিহ্ন পত্রে স্থাপন করিয়া দূত দ্বারা ঐ পত্র তক্ষশীলার মন্ত্রীগণের নিকট প্রেরণ করে। কুনালের মন্ত্রিগণ এই পত্র পাঠ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে থাকে। রাজপুত্র মন্ত্রীগণকে তাহাদের বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রীগণ উত্তর করেন যে মহারাজা উক্ত পত্রে রাজপুত্রকে অপরাধী

বিবেচনা করিয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন পূর্ব্বক সস্ত্রীক পর্ব্বতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা রাজার এইরূপ আদেশ পালনে সাহসী নই; আমরা দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আপনাকে বন্ধন করিয়া রাখিব।"

রাজপুত্র উত্তর কহিলেন যে "পিতা যখন এরূপ আদেশ করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে; তাঁহার দন্তের মোহর দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে এই আদেশ সত্য। ইহাতে কোন প্রকার ভ্রম নাই।" এই বলিয়া তিনি চণ্ডালকে তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিতে আদেশ দিলেন। এই প্রকারে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া তিনি ভিক্ষাদ্বারা উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে একদিন পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পত্নীর নিকট ইহা শুনিয়া রাজপুত্র কুনাল বলিলেন যে, তিনি এককালে রাজপুত্র ছিলেন; এখন পথের ভিখারী। যদি তিনি সুবিধা পাইতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দোষস্খালনের চেষ্টা করিতেন। এই মানসে তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া রাত্রিতে বংশীবাদন ও সঙ্গে সঙ্গে করুণস্বরে গান করিতে লাগিলেন। রাজা উপরতলা হইতে এই করুণস্বর শুনিয়া ঐ গায়ককে তাহার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার সমীপে আনীত হইলে তিনি শোকাভিভূত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কে কুনালের এই দশা করিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুনালও ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পিতাকে ধন্যবাদ দিয়া উত্তর করিলেন "বস্তুতঃ, পিতৃভক্তির অভাব হেতুই ভগবান তাঁহাকে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। অমুক বৎসরের অমুক মাসে এবং অমুক দিনে রাজাদেশ তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। এবং সেই আদেশ প্রতিপালনের জন্যই তিনি অন্ধ হইয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীই এইরূপ করিয়াছেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার হত্যার আদেশ দিলেন।

বোধি বৃক্ষের নিকটস্থ সঙ্ঘারামে ঘোষ নামে এক অর্হৎ বাস করিতেন। তিনি বিনা আয়াসেই ভবিষ্যৎগণনা করিতে পারিতেন। তিনি ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অশোক তাঁহার নিকট অন্ধকুনাল সহ উপস্থিত হইয়া কি প্রকারে তাঁহার পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। অর্হৎ রাজার অনুরোধ শ্রবণ করিয়া বলেন যে "যে আগামী কল্য আমি ধর্ম্মপ্রচার করিব, প্রত্যেকে একটি পাত্র হস্তে লইয়া আমার নিকট যেন উপস্থিত হয় এবং চক্ষুর জল সেই পাত্রে রক্ষা করে।" পর দিবস, দেশ দেশান্তর হইতে স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইলে অর্হৎ দ্বাদশ নিদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন এবং তাঁহার বাক্যে সকলেরই চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়। স্ব স্ব পাত্রে এই চক্ষুজল সকলেই রক্ষা করিলেন এবং পরে অর্হৎ এই চক্ষুজল সুবর্ণপাত্রে লইয়া বলিলেন "বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যদি সত্য না হয়, তবে যাহা আছে তাহাই থাকুক; আর যদি সত্য হয়, তবে এই অন্ধ ব্যক্তি যেন এই জলদ্বারা চক্ষুধৌত করিয়া নিজ দৃষ্টি শক্তি লাভ করে।" এই বলিয়া তিনি কুনালের চক্ষু ধৌত করিলে পর তাঁহার চক্ষু পূর্ব্ববৎ হইল। রাজা পরে তাঁহার মন্ত্রিদের নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিলেন ও অন্যান্য সহকারীগণকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এই রাজ্য হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে ৭০০লি যাইয়া আমরা সিংহপুর রাজ্যে পৌঁছি। (ক্রমশঃ)

খেয়ালির গান।

(ওশগ্নেসি হইতে)

স্বপ্ন-সুখে আমরা সুখী ছন্দে গাঁথি গান,
সিন্ধুকূলে আমরা শুনি ভাঙা ঢেউয়ের তান!
দুনিয়া ভুলে জ্যোৎস্না-জলে আমরা ফেলি জাল,
মোরাই আবার দুনিয়াটারে নাচাই চিরকাল!

গল্প মোরা সত্য করি যখন করি মন,
অমর শ্লোকের ভিত্তি দিয়ে রাজধানী পত্তন!
খোস্-খেয়ালি মুকুট পরে রাজ্য করে জয়,
সুরের হাওয়া ফিরিয়ে কভু সৃষ্টি কভু লয়!

স্বর্গ নরক আমরা রচি, সন্দেহ নেই লেশ,
হাসির ঝোঁকে আমরা গড়ি হবু রাজার দেশ;
অশ্রু দিয়ে গড়েছিলাম সোনার অশোক বন;
গড়েছিলাম অন্ধরাজের হস্তিনা শোভন!

আমরা আবার গেয়েছিলাম পতন তা' সবার,
পুরাতনের অবসানে নূতন অবতার!
একটি ক'রে যুগ চলে যায়, একটি স্বপন শেষ,
নূতন যুগে আমরা রচি নূতন স্বপন-দেশ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবিধ।

পৃথিবীর আলোক।

জ্যোতির্ব্বিদগণ আকাশের আলোক লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত তারকাকে একত্র করিলে যতটা আলোক পাওয়া সম্ভব, আমাদের আকাশ তাহার অপেক্ষা অধিক আলোকে আলোকিত থাকে। কেবল তাহাই নহে; রাত্রের যামানুসারে এবং এক রাত্রি অপেক্ষা অপর রাত্রে এই আলোকের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া আসে এবং উর্দ্ধ অপেক্ষা দিঙ্‌মণ্ডলে এই আলোক অধিক প্রবল বলিয়া বোধ হয়। অনেকে বলেন নক্ষত্রালোক ভিন্ন পৃথিবীর নিজের একটা আলোক আছে। সে আলোকের উৎপত্তি যে কোথায় তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

মিশরের প্রাচীনতম শবদেহ। (Mummy)

প্রাচীনকালে মিশরদেশে মৃতদেহকে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করিত যে তাহা সহস্র বৎসরেও ধ্বংস হইত না। এই সকল রক্ষিত শরীরের নামই মামী; (Mummy) তাহারা মৃত দেহের সর্ব্বাঙ্গে একপ্রকার প্রলেপ লাগাইত। তাহার দ্বারাই শবেরা ঠিক স্বাভাবিক আকৃতিতে অমর হইয়া থাকিত। আজকাল মিশরে এরূপ অনেক 'মামী' আবিষ্কৃত হইতেছে। ১৮৯১ সালে অধ্যাপক পেট্রি (Petrie) মিডাম পিরামিডে যে মামীটির আবিষ্কার করেন, এক্ষণে মিশরের সেইটিই প্রাচীনতম যুগের বিজ্ঞানকৌশলে রক্ষিত মামী' বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। জীবিতাবস্থায় এই ব্যক্তির নাম রাণেফার (Ranefer) ছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজা সেনফ্রু (Senfru) রাজত্বকালে ইহা রক্ষিত। আবিষ্ক্রিয়ার পর 'মামী'টিকে লইয়া ইংলণ্ডের রয়েল কলেজে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ইহার কথা আর বড় কাহারও মনে ছিল না। তাহার কারণ লোকের একটা বিশ্বাস ছিল যে এরূপ অনেক প্রাচীন 'মামী' এমন কি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর 'মামী' আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে মিশর বা ইংলণ্ডের কোথাও খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব ১৫৮০ বৎসরের অধিক পুরাতন 'মামী' রক্ষিত নাই। দশম ও দ্বাদশ রাজবংশের কালে অর্থাৎ ২০০০ হইতে ২৩০৯ খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব বৎসরের মধ্যে যে সকল 'মামী' প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেগুলি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে তাহা

স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই। মিডাম পিরামিডে (Medum pyramid) যে মামীটি পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার বেস্‌নার (Beisner) বলেন যে সেটি খৃষ্টপূর্ব্ব ২৮৭০ সালের। সুতরাং অদ্যাবধি আবিষ্কৃত মামী অপেক্ষা ১১০০ বৎসর পূর্ব্বেকার।

প্রজ্বলন্ত সূর্য্য।

আদিম অবস্থার মনুষ্য ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে জগতের আলোক উত্তাপের উৎস যে সূর্য্য তাহা কেবল একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড মাত্র। কিন্তু যে সকল বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস স্বতন্ত্র। তাঁহারা বলেন যে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি জ্বলন্ত হওয়া অসম্ভব, কারণ তাহা হইলে বহুযুগ পূর্ব্বেই ইহার দাহের অবসান হইত। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার উজ্জ্বলতা দাহ্যমান বাতি বা গ্যাসের আলোকের ন্যায় কারণ হইতে উৎপন্ন নহে। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে যেরূপ অম্লজানের অভাবে বিনা রাসায়নিক ক্রিয়াতেই আলোক দান করে ইহাও সেইরূপ। সূর্য্য গ্রহে যথেষ্ট অম্লজান বর্ত্তমান আছে সত্য, কিন্তু ইহার উত্তাপ এতই অধিক যে কোনপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও আলোক দান করিতে হইলে বস্তু মাত্রেরই শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে এবং এক প্রকারে না এক প্রকারে এই শক্তির পূরণ হওয়া আবশ্যক। দাহ্যমান শিখা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে এই শক্তি লাভ করিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক ল্যাম্পে তাড়িৎপ্রবাহই এই শক্তিকে পূরণ করে। কিন্তু সূর্য্যের মধ্যে এ শক্তি কোথা হইতে আসে? বহু বৎসর ধরিয়া এ প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিগণের সাধারণ মত এই যে, সূর্য্যের অংশগুলি অবিরাম তাহার অন্তরমধ্যে পতিত হইতেছে বা সঙ্কুচিত হইতেছে তাহারই ফলে সেই বিরাট গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এই প্রচণ্ড উত্তাপে পরিণত হইতেছে। অনেকে অবশ্য এ মতের বিরোধী আছেন। মিষ্টার এইচ্‌. এস্‌. শেল্টন (H. S. Shelton) Knowledge and scientific News নামক পত্রে সূর্য্যগঠনের এক নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যগ্রহের গঠন প্রণালী অপেক্ষা অধিক মনোহর বা অজ্ঞেয় বিষয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে নাই। সূর্য্যের উজ্জ্বল পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে এরূপ একটা তীব্র আলোকের আবরণ আছে যে পার্থিব কোন বস্তুর তুলনায় তাহা কল্পনা করা অসম্ভব। এই আলোক আবরণটি অতি সূক্ষ্ম, সূর্য্যের বাষ্পের তুলনায় ক্ষুদ্র পরমাণুর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এত সূক্ষ্ম যে সময়ে সময়ে যে সৌরবাত্যা বহিতে থাকে তাহার আঘাতে ইহা অবিরামই ছিন্ন হইতে থাকে। এই সকল ছিন্ন স্থলকেই আমরা সূর্য্যের কলঙ্ক চিহ্ন বলিয়া থাকি।"

"অনেকের মতে এই আলোকপ্রদ আবরণটি কঠিন বা তরল অঙ্গার (carbon) ও সিলিকনে (Silicon) গঠিত এবং ইহা সূর্য্যের তরল বা বাষ্পীয় দেহের উপরে স্থিত। এই একমাত্র প্রচলিত মীমাংসাই বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে, কিন্তু এ মতের সমর্থন করার পক্ষে অনেকগুলি কঠিন বাধা আসিয়া উপস্থিত। এই অঙ্গার ও সিলিকন যে কি কারণে সর্ব্বদা সূর্য্যের উপরিভাগেই থাকিবে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তদ্ভিন্ন আমরা সূর্য্যের উত্তাপের পরিমাণ ঠিক না জানিলেও, নিতান্ত অল্প করিয়া ধরিলেও তাহা এত অধিক যে তাহাতে কেবল অঙ্গার বা সিলিকন কেন, পার্থিব যাবতীয় বস্তুই দগ্ধ হইয়া বাষ্পে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।"

"অধিকন্তু সূর্য্যের উপরিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও উক্ত মতের সমর্থন করা কোনমতেই সম্ভবে না। এই আবরণটি যে এক স্বভাবাপন্ন একটা উজ্জ্বল বস্তু তাহা নহে, পরীক্ষা দ্বারা ইহার গঠনপ্রণালী বেশ স্পষ্টরূপে দানাদার বলিয়াই বুঝা

যায়। ধারের দিকে এই আবরণটি উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হইয়াছে। এই রেখাগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় facula বলে।"

"অনেকগুলি বিশেষত্বের বিষয়ে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই আবরণটি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। সূর্য্যের কোন কলঙ্কচিহ্ন যখন অপসৃত হইতে থাকে তখনই ইহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। আবরণের ছেদস্থলের পূরণটি যে ধীরে ধীরে হয় তাহা নহে। সেগুলি সহসা এরূপভাবে পূর্ণ হইয়া যায় যাহা দ্বারা অনুমান হয় যেন একটা বিরাট শিখাস্তম্ভ বেগে সেই অন্ধকার গহ্বরের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। ইহার অপেক্ষা এ সম্বন্ধে আর অধিক স্বাভাবিক বর্ণনা হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক মতের দ্বারা না পাইলে আমাদের পরীক্ষা ও কল্পনা আপনিই বলিতে থাকে যে সূর্য্যগ্রহ একটি বিরাট অনল শিখার আবরণে পরিবেষ্টিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতহিসাবে এ কথা বলা চলে না, কারণ অনলশিখা বলিতেই দাহক্রিয়া বুঝায়, দাহক্রিয়া বলিলেই রাসায়নিক ক্রিয়া বুঝায় এবং তথাকার রাসায়নিক ক্রিয়া যে ঠিক কি হইতে পারে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও অক্ষম। লর্ড কেল্‌ভিন ত স্পষ্টই বুঝাইয়াছেন যে সমস্ত সূর্য্যটা জ্বলন্ত কয়লা হইলেও, কয়েক সহস্র বৎসর মধ্যেই তাহা দগ্ধ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইত।

"সম্প্রতি জ্যোতিষ ও রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে সূর্য্য সম্বন্ধে এই আদিম স্বাভাবিক ধারণা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অপেক্ষা অধিক সত্যানুবর্ত্তী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এক্ষণে ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে সূর্য্যের এই প্রচণ্ড উত্তাপের অধিকাংশভাগই কোনপ্রকার স্বাভাবিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন উদ্ভূত। সাধারণ রাসায়নিক বা আণবিক ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্ম আমরা ইহাকে রাসায়নিক-অতীত (Meta chemical) ক্রিয়া বলিব।"

তাঁহার এই মতের সমর্থনের জন্য শেলটন সাহেব যে প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম।

(১) এরূপ একটা কোন 'মেটাকেমিকেল' শক্তি না থাকিলে অবিরাম সূর্য্যের উত্তাপদানের শক্তি কোথা হইতে আসা সম্ভব তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না। পৃথিবী কত শত কোটী বৎসর হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত উত্তাপের কথা বিশ্বাস করিলে পৃথিবী ৫ কোটী বৎসরের অধিক থাকা সম্ভব হয় না।

(২) সার নরম্যান লকিয়ার ও অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে শূন্যস্থিত রাসায়নিক মূল উপাদানগুলি (elements) অবিরামই পরিবর্ত্তিত হইতেছে ধরিয়া লইলে শূন্যস্থিত অনেক ব্যাপারের সহজেই মীমাংসা হওয়া সম্ভব।

(৩) আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের চক্ষের সম্মুখেই একটি রাসায়নিক মূল উপাদান অপর উপাদানে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে এক অতুলনীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়।

এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শেলটন্ সাহেব বলেন—"এই সকল কারণে আমরা মনে করিতে পারি যে রাসায়নিক প্রত্যেক মূল উপাদানের (element) পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, এবং এইরূপ রাসায়নাতীত পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া হইতে অনন্ত শক্তি উদ্ভূত।"

"সৌর উত্তাপের এইটিই প্রধান কারণ ধরিয়া লইলে আমরা সূর্য্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান করিয়া লইতে পারি। সূর্য্যের মধ্যে যে একটা ভীষণ উত্তাপতপ্ত বিরাট জড়পিণ্ড রহিয়াছে তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। এই জড়পিণ্ডের অধিকাংশ ভাগেই উত্তাপের একটা সমতা আছে, সুতরাং সে স্থলে কোন প্রকার 'মেটাকেমিকেল' পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে সকল স্থান শীতল হইতেছে তথায় উত্তাপ নির্গত হওয়ার জন্য সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই সকল স্থানেই মেটা কেমিকেল পরিবর্ত্তন হওয়া

স্বাভাবিক। ইহার ফলে শক্তি উদ্ভূত হয় এবং আমাদের মনে হয় যে, এই আণবিক পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্র হইতেই উত্তাপ বহির্গত হইতে থাকে।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে নূতন মত।

ডাক্তার জোসেফ্ সিমস্ (Dr. Joseph Simms) মস্তিষ্ক সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রচার করিতেছেন। এই বিষয়টি আলোচনা কালে তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মনুষ্য হইতে পশু পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র জীবের মস্তিষ্ক ওজন করিয়া দেখিয়াছেন। এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহার মতে সাধারণতঃ যে সকল ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্ককে গৌরবদান করা হয়, সেগুলি তাহার গুণ নহে, সেগুলি আমাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মাত্র। তাঁহার মতে মস্তিষ্কের চিন্তা করিবার কোনও শক্তি নাই। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে আরিষ্টটল্ হইতে ডারুইন পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বীগণ তাঁহারই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন—"বিজ্ঞান বলে যে, ১৪ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যেই মনুষ্যের মস্তিষ্ক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। বিংশতি বৎসর বয়সেই মস্তিষ্কের চরম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনুষ্যের জন্মকালে তাহার মস্তিষ্ক তাহার দেহের তুলনায় যেরূপ অধিক ভারী থাকে এরূপ জীবনের আর অন্য কোন কালেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ বৎসর বয়স হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের দিন দিন হ্রাস ও ক্ষয় হইয়া থাকে, মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত প্রতি দশবৎসরে প্রায় এক আউন্স কমিয়া যায়। এ কথা অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে মস্তিষ্কের এইরূপ অবিরাম ক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বুদ্ধির বল ও শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, দেশের জল বায়ুর উপর মস্তিষ্কের আকারের পার্থক্য নির্ভর করে। শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের মস্তিষ্ক বড় এবং গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ছোট ;—ইহা আমি বহু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি এবং জাতীয় অভিমান ব্যথিত হইলেও ব্যাপারটা সত্য সন্দেহ নাই।

"মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুবরেখাবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল স্থানের জীবেরই মস্তিষ্ক আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। স্কটল্যাণ্ডের তিমি মৎস্যের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহা আকারে সাধারণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক। অনেকগুলি হস্তীকে পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি তাহাদের মস্তিষ্ক আমাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক বৃহৎ। সাধারণ ভাবে দেখিলে বোষ্টনের মনুষ্যের অপেক্ষা ইংলণ্ডের লোকের মস্তিষ্ক ওজনে আধ আউন্স কম, তাহার কারণ বোষ্টন ইংলণ্ড অপেক্ষা শীতপ্রধান। আমেরিকার দক্ষিণ অংশের লোকের অপেক্ষা নরওয়ে বা স্কটলণ্ডের লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন তাহা নহে।

"আমার মতে মস্তিষ্ককেই বুদ্ধির স্থান বলা ভ্রম। আমি পরীক্ষার দ্বারা যাহা পাইয়াছি তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের মন আমাদের দেহময় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইউরোপের অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও আমার এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে আমাদের চিন্তাক্রিয়া আত্মার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আত্মার বাসস্থানের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সর্ব্বদেহেই তাহা ব্যাপ্ত এবং সর্ব্ব যন্ত্রের দ্বারাই তাহা রক্ষিত। শরীরের কোন একটি অংশ অসুস্থ হইলে যে আমাদের মনও কতকটা অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহা আমরা নিত্যই দেখিতে পাই।

"মনুষ্যদেহে মস্তিষ্কের একটা উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন দেহের উত্তাপ পূরণ করাই ইহার কর্ম্ম। রক্তের উত্তাপ অপেক্ষা মস্তিষ্কের উত্তাপ অধিক সন্দেহ নাই এবং দেশের উত্তাপের ফলে মস্তিষ্কের আকারের পরিবর্ত্তন হয় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। নির্ব্বোধের মস্তিষ্ক বুদ্ধিমানের অপেক্ষা বৃহৎ হয়, কি তাহাদের হৃৎপিণ্ড নিতান্ত ক্ষুদ্র হইতে দেখা যায়। মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, বোতাল্

ও মাকোড়শার কর্ম্ম কৌশলের কথা চিরদিনই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের যে মস্তিষ্ক বলিয়া কিছুই নাই তাহা আমরা সকলেই জানি।

"গ্লাস্‌গো বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন্ ক্লেলাণ্ড (John Clıland) প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন যে মস্তিকের সহিত আমাদের স্মৃতি, বিবেচনা বা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ নাই তাহা তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত।

মস্তিষ্ক আমাদের মন বা বুদ্ধির আসন এটা নিতান্তই অনুমান। ইহার কোন প্রমাণই দেখিতে পাওয়া যায় না। আধুনিক অনেক বিজ্ঞানবিদ্ বরং আমার মতেরই পক্ষপাতী। মস্তিষ্ক বাহির করিয়া লইলেও যখন আমাদের বুদ্ধির কোন বিপর্য্যয় ঘটে না, তখন মস্তিষ্ককে বুদ্ধিস্থান বলা অযৌক্তিক।"

বণ্টন।

সকলেই অবগত আছেন যে অর্থোৎপাদনে তিনটি শক্তি আবশ্যক—ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। এই তিন শক্তির অধিকারীগণের মধ্যেই উৎপাদিত অর্থের বণ্টন হয়। ভূমির অধিকারী ভূম্যধিকারী,—পরিশ্রমের অধিকারী শ্রমিক এবং মূলধনের অধিকারী কর্ম্মকর্ত্তা—এই তিনজনে উৎপাদিত অর্থের যে যে অংশ পায় বা ভোগ করে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে খাজনা, বেতন এবং লাভ বলে। সাধারণতঃ উৎপাদিত অর্থ এইভাবে তিন প্রকার ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন হয়।

অবশ্য সকল স্থলেই যে অর্থ এইভাবে ও এই তিনজনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া বণ্টন হয় তাহা নহে। কৃষকের নিজেরই যদি জমী থাকে, মূলধন যদি ধার না করিতে হয় এবং নিজে ও তাহার সন্তানগণ দ্বারাই যদি জমীর চাষ ও বুননাদি চলে, তাহা হইলে তাহার আর জমিদারকে খাজনা দিতে হয় না; শ্রমিক রাখিয়াও মাহিয়ানা দিতে হয় না এবং মূলধনের জন্য মহাজনকেও সুদ দিতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে, খাজনা, বেতন ও ও সুদ (লাভের অংশবিশেষকেই সুদ বলে) কৃষক নিজেই পায়। কৃষকের নিজের যদি জমী না থাকে কিন্তু শ্রমিকের এবং মূলধনের অভাব না হয়, তবে খাজনাটা কেবল জমীর মালিককে দিলে তাহার আর অন্য কোন দেনা থাকে না। বেতনের বাবত তাহার যাহা খরচ হয় ও সুদের বাবত মহাজনকে যাহা দিতে হয় তাহা তাহার নিজেরই প্রাপ্য হয়। আবার অনেক সময় তাহার নিজের জমী হইতে পারে, মূলধনও তাহার নিজের কিন্তু লোকজন নাই, মাহিনা দিয়া শ্রমিক রাখিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বেতনের অংশ মাহিনা করা লোককে দিতে হয়, অন্য দুটি অংশ কৃষকই পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে অবস্থা বিশেষে উৎপাদিত অর্থের তিন অংশই একব্যক্তি পাইতে পারে—পক্ষান্তরে একব্যক্তি এক বা ততোধিক অংশ এবং কোন কোন সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিকারী হয়। অদ্য আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিব।

ভূম্যধিকারীগণ তাহাদের জমী ভোগ দখলের জন্য অপরের নিকট যে পাওনা দাবী

করেন ও পান, তাহাই খাজনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপরে তাঁহাদের ভূমি ভোগ দখল করার জন্য তাঁহারা যে মূল্য গ্রহণ করেন, তাহাই খাজনা। কোন কোন দেশে এই খাজনার হার দেশাচারের উপর, কোথাও প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। ইতিহাস পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্যের আদিম অবস্থায় কেহ প্রতিযোগিতার ধার ধারিত না। "জোর যার মুল্লুক তার" এই নীতিই সকলে অবলম্বন করিত। পরে দেশাচারই ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বলকে বলবানের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। (১) মনুষ্যের আদিম অবস্থায় যদিও বলবান দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া সময় সময় নিজ অধিকার বৃদ্ধি করিত, তত্রাপি মোটের পর দেশাচার সকলকেই অল্পবিস্তর মানিয়া চলিতে হইত। অর্থনীতিবিৎ মিল এই সম্বন্ধে প্রকৃত কথাই লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে অতি অল্প দিন হইতেই মানুষ প্রতিযোগিতা মানিয়া আসিয়াছে। আমরা যতই প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্বে দেশাচার অনুসারেই সকল চুক্তি সম্পাদিত হইত। ইহার কারণ সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। বলবানের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার একমাত্র অস্ত্র—দেশাচার। (২) দুর্ব্বল যে সকল অধিকার বা সত্ব লাভ করে তাহা দেশাচারের জন্যই—বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নয়। ভূম্যধিকারী এবং কৃষকের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং প্রথমোক্ত পক্ষ শেষোক্ত পক্ষের নিকট যে পাওনা আদায় করে তাহা প্রায়ই ব্যবহার বা দেশাচারের নিয়মাধীন। মিল বলেন যে আদিম কাল হইতে অনেকদিন পর্য্যন্ত এই নিয়মেই ভূম্যধিকারী ও প্রজার দেনা পাওনার সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হইত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিল ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের খাজনার হার দেশাচারের উপরই চিরকাল নির্ভর করিয়া আসিয়াছে।

অনেক স্থলেই কৃষক বা প্রজাদের দলিলাদি নাই কিন্তু যতদিন তাহারা নির্দ্ধারিত খাজনা দিতে থাকে, ততদিন নিরাপদে জমী দখল করে। প্রকৃত খাজনা কত তাহা জানিবার কোন উপায় নাই—অনেক স্থলেই ইহা তমসাচ্ছন্ন। বলপূর্ব্বক দখল, স্বেচ্ছাচার, বৈদেশিকগণের কবলে পতিত হওয়া প্রভৃতি কারণে ইহার উদ্ধারেরও কোন উপায় নাই। কিন্তু যখন কোন হিন্দুরাজ্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের দখলে আইসে, তখনই দেখা যায় যে যদিও হিন্দুরাজা যতদূর ইচ্ছা পাওনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তত্রাপি প্রত্যেক পাওনা ভিন্ন

(1) "Custom is a barrier which, even in the most depressed condition of mankind, tyranny is forced in some degree to admit" Mill—Political Economy.

(2) To the industrious population, in a turbulent military community, freedom of competition is a vain phrase ; they are never in a condition to make, terms for themselves by it ; their is always a master who throws his sword into the scale and the terms are such as he inposes. But though the law of the strongest decides, it is not the interest nor in general the practice and the strongest to strain that law to the utmost and every relaxation of it has a tendency to become a custom and every custom to become a right." Ibid.

ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রিটিশ রাজত্বে গবর্ণমেণ্ট একটা নির্দ্ধারিত হার স্থির করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য প্রজারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা ভোগ করিতেছে।

সাধারণতঃ জমার উর্ব্বরা শক্তি যতই বেশী হয়, ততই সেই জমির খাজনা বেশী হয়। অবশ্য শুধু যে কেবল জমীর উর্ব্বরার উপরই জমীর খাজনা নির্ভর করে তাহা নয়। স্থান বিশেষেও জমার খাজনার তারতম্য ঘটে। বড় বড় নগরের নিকটবর্ত্তী জমীর খাজনার হার বেশী; কেননা ঐ সকল জমীতে উৎপাদিত দ্রব্য অল্প বা বিনা আয়াসেই বিক্রেতা সুবিধা দরে বিক্রয় করিতে পারে। মাল লইয়া অধিক টানাটানি করিতে হয় না। কিন্তু বড় বড় নগরাদি হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে ভূমি উর্ব্বরা হইলেও তাহার খাজনা কম কেন না সে স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য খরিদ্দারের অভাবে বিক্রয় করিতে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হয়। এবং তজ্জন্য কৃষক সে জমী সহসা চাষ করিতে চাহে না। এই জন্য জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও জমার অবস্থানের সুবিধা অসুবিধানুসারেও খাজনার যথেষ্ট তারতম্য হয়। যখন ঐ দুটীর কোন একটীর অভাব হয় তখন খাজনা কমিয়া যায়। যে জমার উর্ব্বরাশক্তি এত কম যে উহাতে যে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করা হয় তাহার ব্যয় যদি উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা পূরণ না হয়, তবে কেহই ঐ জমী চাষ করিতে চাহিবেনা। পক্ষান্তরে, যদি মনুষ্যের অগম্য স্থানে অত্যন্ত উর্ব্বরা জমীও থাকে, তাহা হইলেও কেহই তাহা লইতে চাহিবে না। আমেরিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় এরূপ অনেক জমা আছে কিন্তু ঐ সকল স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে টানাটানিতে এত অধিক ব্যয় পড়িয়া যায় যে সেখানে চাষ করা আদৌ লাভজনক নহে।

রিকার্ডো নামক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ পণ্ডিত ভূমির খাজনা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এক নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মনে করুন ক ও খ নামে দুই খানি জমী আছে। হয় উর্ব্বরাশক্তির জন্য কি সুবিধামত স্থানে স্থিতির জন্য 'ক'-র খাজনা খ অপেক্ষা বেশী। এই উভয় জমীর খাজনার বিভিন্নতা হইতে আমরা এক জমীর উৎপাদন শক্তি (অর্থাৎ উর্ব্বরা শক্তি ও সুবিধা মত স্থান স্থিতি) হইতে অন্য জমীর পার্থক্য বুঝিতে পারি। এইক্ষণে এই ক ও খ ব্যতীত গ নামক আর একখানি জমী আছে যাহাতে এই সকল শক্তির অভাবের জন্য নাম মাত্র খাজনা আদায় হয়। এই গ জমী যাহা হইতে নাম মাত্র খাজনা আদায় হয় ও পূর্ব্বোক্ত ক জমির খাজনা—এই দুই খাজনার যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে তাহার খাজনা হইতে উভয় জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু গ জমির নাম মাত্র খাজনা, কেননা উহা অনুর্ব্বরা বা অল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট। সুতরাং উৎকৃষ্ট জমী নিকৃষ্ট জমী অপেক্ষা যে সকল সুবিধা ভোগ করে ঐ সকল সুবিধার আর্থিক মূল্যই হইতেছে খাজনা।

রিকার্ডোর মতে যে জমী নাম মাত্র খাজনা দেয় উহা "কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত" (margin of cultivation) এইরূপ

বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক। রামের জমীর উৎপাদিকা শক্তি ও আয় শ্যামের জমীর অপেক্ষা বেশী। আয় কথাটী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—স্থূল আয় ও আসল আয়। চাষের জন্য যে খরচ হয় উহা বাদ না দিয়া মোট যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্থূল আয় বলে। কিন্তু কৃষকের আসল আয় নিদ্ধারণ করিতে হইলে এই স্থূল আয় হইতে ঐ জমীর আবাদে যত প্রকার খরচ হয় তাহা বাদ দিতে হইবে। জমীতে যে মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহার সুদ স্বরূপ কিছু অংশ ঐ স্থূল আয় হইতে বাদ দিতে হইবে; কৃষক যে তত্ত্বাবধান করিবে তাহার বাবদও কিছু বাদ দিতে হইবে; ইহার পর শ্রমিকের বেতন বাবদ, জমির সার অর্থাৎ জমির ফসল উৎপাদন করিতে যত প্রকার খরচ হয় উহা বাদ দিয়া যে আয় অবশিষ্ট থাকিবে উহাকেই আসল আয় বলে। এখন রামের জমার আসল আয় যদি শ্যামের জমী অপেক্ষা বাৎসরিক ১০৲ বেশী হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝিতে হইবে যে আবশ্যক হইলে রাম শ্যামের অপেক্ষা ১০৲ বেশী খাজনা দিতে সমর্থ। যদি শ্যামের জমার অল্পোৎপাদিকা শক্তির দরুণ নাম মাত্র খাজনা ধার্য্য হইয়া থাকে, তবে ঐ জমার আসল লভ্যও নাম মাত্র ইহাই বুঝিতে হইবে। অনেকে বলিবেন, এ ক্ষেত্রে শ্যাম জমী চাষ করিবে কেন? তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, সমস্ত প্রকার খরচাদি বাদ যৎসামান্য উদ্বৃত হইলেও কৃষকের ক্ষতি হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্যামের জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা রামের জমীর উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য ১০৲ বেশী এবং আবশ্যক হইলে এই ১০৲ রাম জমিদারকে খাজনা স্বরূপ বেশী দিতে পারে। কেননা, সচরাচর দেখা যায় যে, সকল প্রকার খরচ বাদে সামান্য মাত্র লাভ হইলেই লোকে সে জমী বা ব্যবসায় ছাড়িতে চাহে না। এইক্ষণ, রামের ভূম্যধিকারী যদি রামের খাজনা ১০৲ বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলেও রাম জমা ছাড়িতে চাহিবেনা কেন না এই ১০৲ এবং অন্য সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়াও আসল আয় স্বরূপ সে কিছু পায়; কিন্তু ভূম্যাধিকারী যদি ১০৲ স্থলে ১১৲ খাজনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে রাম আর সে জমা চাষ করিতে চাহিবে না। ঐ জমীতে রাম যে প্রকার অর্থ পরিশ্রম ইত্যাদি প্রয়োগ করিত উহা অন্য জমীতে বা অন্য ব্যবসায়ে প্রয়োগ করিলে রামের অধিক লাভ হইবে এবং উক্ত কারণে ভূম্যধিকারী রামের নিকট ১০৲ টাকার অধিক দাবী করিলে রাম জমা ছাড়িয়া দিবে এবং তিনিও এই কারণে ইহার খাজনা আর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই প্রসঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, জমীদার যেমন খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন, রামও সেই প্রকার খাজনা হ্রাসের চেষ্টা করিবে। করুক, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে রামের সমব্যবসায়ীগণ উক্ত জমীতে কত লাভ হইতে পারে অনায়াসে উহা নির্দ্ধারণ করিয়া রামের খাজনা হ্রাসের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে। রিকার্ডোর নিয়ম এই জন্য প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেই প্রযুজ্য।

আমরা পূর্ব্বে কয়েকস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে কোন কোন জমী কর্ষণের শেষ মাত্রায় অবস্থিত। 'কর্ষণের শেষ মাত্রা' অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে ঐ জমীর উর্ব্বরাশক্তি ও স্থিতি

এত খারাপ যে অন্য উৎপাদিকা শক্তি প্রযুক্ত না হইলে উহার কোন লাভ হইবে না। দুই প্রকারে এই উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রথমতঃ, কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ সমুন্নত কৃষি পদ্ধতি দ্বারা ঐ জমী হইতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। পূর্ব্বে যে গ ভূমির জমীর কথা লিখিয়াছি ঐ গ জমী হইতে কৃষক কোন প্রকারে নিজের খরচাদি উঠাইতে পারে। কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় এই শেষ মাত্রা আরও নামিয়া পড়িতে পারে এবং সেই জন্য খাজনারও তারতম্য হয়। সে ঘটনাগুলি নিম্নে বর্ণনার প্রয়াস পাইতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লাভের হার ভিন্ন। অষ্ট্রেলিয়ায় শত করা ১০৲ টাকা অনায়াসেই পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে প্রচলিত হার ৫৲ মাত্র। আমাদের দেশের মহাজনেরা শতকরা ২০।২৫ টাকা সুদ লাভ করেন। ইংলণ্ডদেশে লাভের হার খুবই নীচু। মনে করুন, সহসা কোন কারণ বশতঃ ইংলণ্ডের লোক প্রচলিত শতকরা পাঁচ টাকা অপেক্ষা আরও কম লাভে টাকা কর্জ্জ দিতে বা ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে প্রস্তুত! এক্ষেত্রে জমীর শেষ মাত্রাও নামিয়া যাইবে। কৃষক কম লাভে ঐ জমী চাষ করিতে চাহিবে, ভূম্যধিকারীও পূর্ব্বাপেক্ষা কম খাজনায় ঐ জমী দিতে চাহিবে। গ নামক যে জমীর কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তখন ঐ প্রকার জমী অপেক্ষাও খারাপ জমী লোকে চাষ করিতে চাহিবে। এবং গ ও শেষোক্ত প্রকারের খুব খারাপ জমীর উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইবে। এই প্রকারে, অষ্ট্রেলিয়ায় যখন লাভের হার ১০৲ হইতে আরও কমিয়া যাইবে, তখন আরও জমি চাষ হইবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, কেন না লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের গ্রাহকও বৃদ্ধি পায়। গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও বৃদ্ধি পায় এবং যে সকল জমি কর্ষণের শেষ মাত্রার সামান্য উপরে ছিল তাহাও লোকের আহার সরবরাহ করার জন্য চাষ করিতে হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে কর্ষণের শেষ মাত্রা আরও নিম্নে পড়ে অর্থাৎ আরও অল্পোৎপাদিকা শক্তি বিশিষ্ট জমীর চাষ হইতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমীর খাজনার হারেরও তারতম্য হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভূম্যধিকারী খাজনার হারও বেশী করিতে পারেন।

কিন্তু লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যে দেশের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে তাহা নয়। কোন কোন দেশে এইরূপই হয় বটে কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ ঘটে না। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে উর্ব্বর-ভূমি আছে এবং সেইজন্য তথায় আহার্য্য দ্রব্যাদিও যথাসম্ভব সুলভ। ভারতবর্ষের পক্ষে এই নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে না। এখানে লোকসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু অর্থ বৃদ্ধি হয় নাই।১

( ) "The standard of comfort of the population has been lowered and vast numbers are constantly living just on the verge of pauperism and starvation." Mrs. Fawcett.

অধিবাসীগণের অবস্থা স্বচ্ছল নহে এবং অনেকেই কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অধিবাসীগণের সঞ্চিত অর্থ নাই এবং কোন কারণে এক সময়ে ফসল না হইলেই তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আর্থিক উন্নতির কোন সংস্রব নাই। (১)

অনেকেই মনে করেন যে উৎপাদিত দ্রব্যাদির খরচের বিভাগে খাজনার সম্পর্ক বেশী। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে খাজনা আদৌ ধর্ত্তব্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতেছে যে যদি গবর্ণমেণ্ট একদিন অকস্মাৎ আদেশ দেন যে জমীর বাবত কাহারও কোন খাজনা গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন ভূম্যধিকারী গ্রহণ করিবেন না তাহা হইলেও কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় কিছুই কমিবে না বা বাড়িবে না। পেটের ও হস্তের কার্য্য সমভাবেই চলিবে। অর্থাৎ এই আদেশের পূর্ব্বে অধিবাসীগণের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্যের আবশ্যক হইত, এখনও তাহাই হইবে এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমী চাষ হইত এখনও তাহাই হইবে। এই কারণেই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত খাজনার কোন সম্পর্ক থাকে না।

অতঃপর আমরা বেতনের বিষয় আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পল্লীগ্রামে ডাইনে খাওয়া

মানুষের উপর ভূতের প্রবল প্রভাবের কথা তো আজি কালি অনেক সুসভ্য শিক্ষিত সমাজেও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পল্লীগ্রামে আর এক জাতীয় জীব যে কিরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। ভূতের ন্যায় ইহা অশরীরী কল্পনা মাত্র নহে, একটা জলজীবন্ত আস্ত মানুষ, এস্থলে গ্রামের ভীতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার নাম ডাইন্ বা ডান্! অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকই উক্ত পদ স্থিতা. পুরুষ ডান্ অতি কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী, মৎস্য জীবি-মালো বা চাঁড়াল দুহিতা, পণ্য বিক্রেত্রী বেনিয়া রমণী ইহারাই অধিকাংশ স্থলে এই সম্মান লাভ করিয়া থাকে। তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিলে বালবৃদ্ধরমণী মহলে সামাল্ সামাল্ পড়িয়া যায়। যুবারা প্রকাশ্যে তাহাদের উদ্দেশে অনেক আস্ফালন করিয়া থাকে

(1) The people have no reserve of any kind and the failure of a crop immediately brings the pinch of want ; they cannot meet bad times by giving up luxuries in order to buy necessaries ; they have no luxuries ; they have no cheaper kind of food to which they can resort ; they are already at the bottom of the scale of human existence and to fall any lower means actual famine "Mrs Fawcet." এই উক্তির মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও ইহা যে একটু অতিরঞ্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বটে কিন্তু অন্তরে 'ডাইন' নামে সকলেরই হৃৎকম্প হয়। ডাইনী বেচারাদের স্থানে স্থানে লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। আমরা অদ্য এই বিষয়ের দুই চারিটি চাক্ষুষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেছি!

পৌষ মাস। দরিদ্র কৃষকের অঙ্গনে ধন্ন বাশিস্থ সূর্য্যের মন্দ কিরণ ক্রমে মন্দতর হইতেছে। কৃষকের গৃহে সুখ নাই, দুই তিন বৎসরের অজন্মায় তাহাদের দুরবস্থার একশেষ। এবারে দুরন্ত বন্যায় আউস ধান্য সব ভাসিয়া গিয়াছে। আমন কিছু হইয়াছিল কিন্তু মহাজনের ঋণ এবং জমিদারের খাজনা তাহাতে শোধ করিয়া লওয়ায় অঙ্গনের শূন্য 'গোলা' দুইটা হুম্ড়ী খাইয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে। পৌষ যায়, অগ্রহায়ণ হইতে এক ফোঁটা বৃষ্টি ন' হওয়ায় রবি শস্যের আশাও এবারের মত শেষ।

উঠানের 'আগায়' কৃষকবধূ ধান "ওসাইতে" ছিল। পৃষ্ঠে বেতের ঝাঁপি, তন্মধ্যে গাছ চাঁচিবার তীক্ষ্ণধার অস্ত্র 'দাউলা,' কোমরে জড়ানো প্রকাণ্ড একগাছা দড়া, হস্তে দুইটা কলসী লইয়া যুবা কৃষকপুত্র অঙ্গনে প্রবেশ করিল। কলসী দুইটা একপাশে নামাইয়া, ঝাঁপি ইত্যাদি অঙ্গনে আছ্ড়াইয়া ফেলিয়া হতাশ ভাবে "পিঁড়ে"র এক ধারে বসিল। মাতা, পুত্রের ভাবান্তর দেখিয়া বলিল "কিরে-'রমূল্য'? অমন ক'রে বস্‌লি যে?" পুত্র কোন' উত্তর দিল না! মাতা আবার বলিল "'অস্' কি "চোরে গিয়েছে" সব? "আরে "আরে না, না; এই 'অসের' জন্তেই ত আজ ম'লাম"! মাতা শঙ্কিত হইয়া বলিল "ম'লাম কিরে? কি হ'ল তোর?" "হবে আর কি! এখনি ফটকে মালোর মা মাগী কোথায় ছিল জানিনা, খেজুরে পুকুরের পাড় থেকে 'অসে'র 'ঠিলি" হাতে করে নাম্‌তেই আমার দফা সেরেছে।"

"ওরে সেকি? সেকি 'অস্' চেয়েছিল? দিলিনে কেন তাকে?"

"হাঁ-সে 'অস্' নেবে কিনা? আমার প্রাণডা বড় কেমন কর্‌ছে শুই একটু।" বলিয়া অমূল্য সেই খানেই ধুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! ওগো তোমরা কে কোথায় আছ', আমার "রমূল্য রতনে'র কি হ'ল এসে ছাখ' সে"!

অবিলম্বে পাড়ার লোক সব আসিয়া জুটিল। অমূল্য তখন মাটিতে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। সকলে 'ওঝা আনাইবার পরামর্শ দেওয়ায় একজন পরোপকারী তৎক্ষণাৎ গ্রামান্তরে 'ওঝা' ডাকিতে ছুটিল। ইতি মধ্যে ডাইনে খাওয়ার ঔষধ যে যাহা জানে রোগীর উপরে তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিল। হলুদ ও লৌহ পুড়াইয়া কপালে ছ্যাঁকা দেওয়া, নানা প্রকার লতা পাতার রস হস্তে পদে বক্ষে লেপন, তেল পড়া, জল পড়া খাওয়ানো ইত্যাদি। অমূল্যের মা উঠানে বসিয়া হতাশ ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "ওরে 'রমূল্যের' ভরসাতেই যে চালের তলায় মাথা দিয়ে আছি। 'ম্যালেরি' জ্বরে তিন বছর ভুগে ভুগে মোড়ল, যদু, দুজনেই ফাঁকী দিলে। পুঁটে টাত' নিত্যি রোগা, জন্মকালই জ্বরে ভুগ্‌ছে। বেনে মাগী যেদিন পাড়ায় আসে সেই দিনই আমার পুঁটে 'কেঁথা' ঢাকা দিয়ে শোয়। তার ভরসাত

আমি করিই নে। একা 'রমূল্য'। সে বলে "মা জমী জমা যা আছে ভাগে করি।" একটা 'দোহর' নেই তাব, যা আছে তাও আবাদ্ করতে পারে না। তিন বছর ধান হয়'নি, এবার যা হ'ল মহাজনের 'দেন' শোধ করলাম, খন্দ ছুটো হয়—সরকারীতে তুলে নেবে, আজ তিন বছর খাজনা দিতে পারিনি! ভাবি 'রমূল্যের' বিয়ে দেব, 'রমূল্য' বলে মা তুব্বছরের ধাক্কা আগে সামাল্ দিই, আর 'দেন্' কবিস্‌নে এখন"। তিন কুড়ী খেজুর গাছ জমা নিয়েছে, বাছা আমার সকল দিন গাছে গ'ছে আর 'বাইনের আগুনের জ্বালেই থাকে! পুঁটে জ্বালানি কুড়িয়ে কুড়িয়ে ব'সে ব'সে জ্বাল দেয়। সেদিন সাঁজ বেলায় গাছ থেকে প'ল—বলি মা কি হবে! তা আমার "নোয়ার বাঁটুল" রমূল্যর কিছু হয়নি, আজ আমার কপাল বুঝি ভাঙ্গ্‌ল! সর্ব্বনাশীরে আমার কপালই এমন করে খায় কেন রে?"

ইতি মধ্যে রোগী একবার বমি করিয়া একটু সুস্থ হইল। সকলে আশ্বাস দিতে লাগিল, ভয় নেই—ভয় নেই, ওঝা এলেই এখনি সব ভাল হবে।

গরু চরাইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে পুঁটে আসিয়া সব ব্যাপার দেখিলএবং সেও দাঁড়াইতে না পারিয়া ঘরে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল! মা দ্বিগুণ কাঁদিয়া বলিল "নিশ্চয় আজ বেনে মাগী ওকে দেখেছে। আজ তিন দিন একটু ভাল ছিল, 'রমূল্য' মাঠে যেতে বারণ করে, তা ভাল থাক্‌লেই যায়! আমার কত "ছুখ" সইয়ে 'ধনেরা সব। আমার ছার কপালে বাঁচলনা?"

ওঝা আসিল। অমূল্যের সর্দ্দিগর্ম্মী ভাবটা তাহার আসিবার পূর্ব্বেই কমিয়া আসিয়াছিল। দু তিন বার দাস্ত ও বমি হইয়া সে তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। ওঝা দেখিয়া বলিল "আর ভয় নেই। আমার আসার আগেই ভয়ে সে সরে গিয়াছে। এই ওষুধটা ভাতের আমানির সঙ্গে বেঁটে খাইয়ে দাও আর এই সর্ষের পুঁটুলিটা তিন দিন কাছে রেখো। তেমন কিছু কর্‌তে পারেনি। আমি এখনি রতনপুর থেকে আসছি। সে গ্রামের রায়েদের বৌকে আজ তিন দিন ডানে খেয়েছিল। আজ তিন দিন তিন রাত আমি সেইখানে ছিলাম! কত সব ইংরাজি জানা ছেলে পিলেরা 'ফিট্' 'ফিট্' 'হিষ্টির' 'মিষ্টিরি' বলে ডাক্তার এনে কিছুতে কিছু কর্‌তে পারেনি! তখন আমি 'রুগী' হাতে নিয়ে তিন দিন তিন রাত খেটে ভাল করে দিয়ে এলাম। ইংরিজি পড়া ছেলেরা সব তখন গাল হাতবসে রইল"। সকলে অমূল্যকে ছাড়িয়া তখন ওঝাকে মহা ঔৎসুক্যে ঘিরিয়া বসিল। ওঝাও সাড়ম্বরে বলিতে লাগিল,—

"আত্ম সাবধান" করে বাড়ী থেকে তো বেরুলাম। 'রুগী'র বাড়ীর দুয়োরে গিয়ে আগে বাড়া বাঁধলাম, আসামী আগেই না পালায়! আমায় দেখে ত সে রেগেই আগুন! "তুই কোথাকার রোজা,—দেখি ত তোর কতবড় সাধ্যি, আমায় কেমন তাড়াতে পারিস্"।* আমিও বলি "দেখি তুমিই কেমন ডান্!" মন্তর পড়ে পড়ে হায়রাণ হয়ে, দড়ী দিয়েবেঁধে কিছুতে যখন পার্‌লাম না তখন একগাছা ঝাঁটা এনে দুএক ঘা বসাতেই

* বলা বাহুল্য এসব কথা ভূতগ্রস্ত রোগীর মত ডাইন-প্রাপ্ত রোগী স্বমুখেই বলিয়া থাকে।

বল্লে "আর না, আর না, এইবার যাচ্চি!" আমি বল্লাম "তোকে যেতে ত হবেই, কিন্তু আমি কেমন রোজা তা টের পেয়ে যেতে হবে। বল্ তুই কে, তবে তোকে ছেড়ে দেব।" বল্লে "না, তাহলে বড় লজ্জায় পড়্‌ব আমায় ছেড়ে দে!" সেকথা কে শোনে! ঝাঁটা আন্‌তেই বল্‌লে "আমি বুড়ো মানুষ, আর মারিস্‌নে! আমি ন গাঁয়ের বুড়ো বষ্টমী! এ গাঁয়ে ভিক্ষে করতে আসি! বৌটা এলোচুলে সিঁদুর পরে ব'সে বড়ী দিচ্চিল! আমায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে উঠ্‌ল! ভারি কটু কথা বলেছে আমায়, "ভিক্ষে করে মরিস্ কেন, খেটে খেতে পারিস্‌নে, মাগী ডান!" তা যা করেছে তা করেছে এইবার আমি যাচ্চি। তখন বল্লাম অমনি ত যাওয়া হবে না, কিছু নিয়ে যেতে হবে ত। নইলে রুগীর ক্ষেতি। ঐ শিলখানা নিয়ে যেতে হবে!" তা বল্লে "আমি বুড়ো মানুষ। শিল মুখে নিতে পার্‌ব না।" "তবে জুতো নে!" "আমি এই মুখে হরিনাম করি, আমায় জুতো দিস্‌নে তোদের অধর্ম্ম হবে।" "মাগীর ধর্ম্মজ্ঞানও যে বিলক্ষণ" জনৈক শ্রোতা মত ব্যক্ত করিল! অন্য একজন অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বলিল, ওদের জ্বালায় তো মানুষের শোয়াস্তিও নেই! 'বিটি'দের জব্দ করাও তো সহজ নয়। আমার মামাদের গাঁয়ে এমনি এক 'বিটি' ডান্ ছিল, তার জ্বালায় গাঁয়ের লোকের সোয়াস্তি ছিল না। শেষে গাঁয়ের ক'জন লোকে ষড় করে তার ঘরে দুতিনটে দামী জিনিষ লুকিয়ে রেখে 'চোর' বলে ধরিয়ে দিলে! 'বিটি' তখন জেলে গেল,—তবে লোকের শোয়াস্তি!" আর এক ব্যক্তি বলিল "কেন আমাদের গাঁয়ের কৈলেস সেখ! সে এমন "ডোকো হাজরা" মানুষ ছিল যে এক 'বিটি' ডান্‌কে তিন মাসের ভাত খাইয়ে দিয়েছিল! আখের ভুঁইয়ে আখ্ বোঝাই কর্‌ছে গাড়ীতে, আর—সে এক মাগী ডান্ তখন এ গাঁয়ে আস্‌ত, একখানা আখ্ চাইলে তার কাছে। কৈলেস্ আখ্ দিলেও মাগী গাড়ীর পানে তাকাতে তাকাতে যায়, এই সেখের পো আগুন হ'য়ে বল্‌লে "খেলি খেলি আমার একগাড়ী আখ্ খেয়ে নাশ কর্‌লি শালি!" এই বলে দুগাছ মোটা আখ্ না নিয়ে মাগীকে গো বেড়োনে বেড়ুলে! সেই হ'তে মাগী গাঁ ছাড়ে, তিন মাস নাকি পড়েছিল!" প্রথমোক্ত ব্যক্তি বাধা দিয়া বলিল "কৈলেস কি সোজা লোক ছিল, নইলে ঐসব লোকের গায়ে হাত দিতে পারে। ওদের মোছলমানের কালী-তলায় 'প্রীতে' আমাবস্যায় সে মোরগ দিত!"* "ওদের ও মন্তোর শিখে কি হয়? ডান্ হ'য়ে লোকের ক্ষেতি ক'রে 'বিটি'দের লাভটা কি?" ওঝা বিজ্ঞতার বোঝা নামাইয়া বলিল "তা বুঝি জাননা? ওরা কি স্ব-ইচ্ছেয় ডান্ হয়? ডাইনেরা নিজের

---

* পৌষের 'প্রবাসী'তে হেমলতাদেবী "ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে হিন্দুয়ানী" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে বহু-দূরদেশের মুসলমানের হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণের কথা অনেক বলিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, এই বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার ঘোর পল্লীগ্রামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমুসলমানের আচার ব্যবহারে তফাৎ খুবই কম। এখানে মুসলমানেও গাছতলায় কালী পূজা করে এবং পুত্রের নাম কালিদাস, দ্বারিক, মথুরানাথ, গোপাল, হরি এবং কন্যার নাম গোলাপ, কামিনী প্রভৃতি রাখে।

মন্তর কারুকে না দিলে ত' তাদের প্রাণ বেরোয় না! মর্‌বার সময় মানুষ না পেলে তারা ন্যাকড়ায় গিঁট বেঁধে ঝাঁটার বাড়নে মন্তর রেখে যায়, অজান্‌তে যে সেই গিঁট খোলে বা ঝ্যাঁটা বাড়ন ছোঁয় অমনি সেই মন্তর তাকে গছে। তারপরে শোন! ডান্ মাগীকে বল্‌লাম আমার রুগী ভাল হবে? ঠিক করে বল্? নইলে তোর "ঠিক ঠিকানা তো জান্‌লাম, এমন ক'রে 'বাণ' মারব যে মুখে রক্ত উঠে তখনি মর্‌বি।" জনৈক শ্রোতা বাধা দিয়া বলিল "তা পারা যায় না কি?" "তা বুঝি জাননা? আচ্ছা বেশ ত' তুমি। হরশে মুচী মিন্সে অম্‌নি ডান্ হ'য়েছিল। কাকে কোন্ গাঁয়ে খেয়ে এসেছিল! কোন্ শক্ত রোজায় 'বাণ' মেরেছিল; ভাল না মন্দ না হরশে মুচী ঘরের মধ্যে জলের কল্‌সীর গোড়ায় মুখে রক্ত তুলে মরে আছে!" ওঝা বলিলেন "হ্যাঁ জলের কলসীর গোড়ায় যখন—তখন নিশ্চয় ওঝাতেই মেরেছে বটে! তারপর শোন! মাগী শুনে বলে কি তাত বল্‌তে পারিনে! কচুর পাতে ক'রে বৌর প্রাণটুকু জলের কলসীর কাছে রেখেছিলাম কি হ'ল তা কি জানি!" "জানিস্‌নে বটে!" বলে একটা কুমড়ো এনে মন্তর প'ড়ে যখন বলি দিতে যাই তখন মাগী সোজা হ'য়ে প্রাণটা ফিরিয়ে দিল! তা কি অম্‌নি যেতে দিলাম! সেই হরিবলা মুখে জুতো নিয়ে যেতে হ'ল!" "জুতো কে মুখে নিল—সেই বৌটা?" "সে কি আর তখন বউ? সেই ডান্ মাগী? জুতো মুখে ক'রে উঠোন পর্য্যন্ত গিয়েই বউ ধড়াস্ ক'রে অজ্ঞান হ'য়ে গেল! দুদণ্ড পরে যখন দাঁত ছাড়্‌ল তখন সে মেয়ে আর সে মেয়েই নয়! এক গলা ঘোম্‌টা দিয়ে বস্‌ল!"

গৃহের মধ্য হইতে পুঁটে সহসা বিষম চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলে শশব্যস্তে ঘরে গিয়া দেখিল অন্ধকার ঘরে শুইয়া ঐ সব ভীতিজনক কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুর্ব্বল রুগ্ন বালক ভয়ে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। ওঝা দেখিয়া বলিল "কিছু নয় এও ডান্।"

পুঁটেকে তখন বাহিরে আনা হইল, অমূল্য তখন সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বসিয়াছে! 'ডানে' পাওয়ার প্রতিকারের ব্যবস্থামত সেই বালকের উপর তখন জুতা ঝাঁটা বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে সকলে তাহাকে ধমক দিতে লাগিল "ন্যাকা মাগী এ মার্ কি ওর গায়ে পড়্‌ছে! ছেড়ে গেলে দেখিস্ একটুও গায়ে দাগ থাক্‌বে না! মাতার প্রাণ কিন্তু এ সান্ত্বনায় প্রবোধ মানিল না।

ভীত কম্পিত বালক ওঝার বাক্যের প্রতিধ্বনির মতই প্রায় ঐ রকম কথাবার্ত্তাই বলিয়া গেল। ডান্ ছাড়িয়া যাইবার কালে বালকের মুখে একখানা গুরুভার শিল তুলিয়া দেওয়া হইল। সেই শিল দাঁতে কাম্‌ড়াইয়া ধরিয়া বালককে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না। দুই চারি পা গিয়াই শিলসহ দাওয়ার নীচে পড়িয়া গেল। "আর কোন' ভয় নাই। এই বারে ঘরে তুলে নিয়ে এস। এই ওষুধটা বেঁটে মাখিয়ে দাও, দু চার দণ্ড পরেই জ্ঞান হবে, তখন এইটে বেঁটে খাইয়ে দিও। যা খেতে চাবে দেবা, আর এর ওষুধটা সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখবা! আমি এখন চল্লাম!" সকলে অমূল্যর মার পানে চাহিয়া

বলিল "ওনার বিদায় ?" ওঝা বাধা দিয়া বলিল" এখন ওসব কথা নয়! ছেলে দুটি ভাল হোক্, তখন নিজেই উনি খুসী হয়ে 'বিদেয়' করবেন!

তখন ওঝা বিদায় হইয়া গেলেও অমূল্য ও তাহার মাতা পরদিন ওঝাকে ডাকাইয়া সন্তোষ করিয়া বিদায় দিল, পুঁটেও দু চারি দিন একটু উঠিল বসিল কিন্তু সেই গুরুভার প্রস্তর বক্ষে করিয়া পতনের ধাক্কা সে রুগ্ন বালক সাম্‌লাইতে পারিল না। কয়েক দিন পরেই তাহার মাতার ক্রন্দনে সমস্ত গ্রাম ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে 'হায়' 'হায়' করিয়া বলিল, "মাগীর কপাল বড়ই মন্দ! অমন রোজা অমন ক'রে ছেলেকে ডানের মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল! এত আর মানুষের হাত নয়, মাগীর কপালই খারাপ!—ছেলেটা সেই জন্যই বাঁচ্‌ল না"!

শ্রী নিরুপমা দেবী।

শিশিরকুমার ঘোষ

বাংলা দেশের যে সকল কর্ম্মবীরের দ্বারা দেশের নানা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। সেই জন্য আজ তাঁহার বিয়োগে বঙ্গবাসীমাত্রেই ব্যথিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কে না তাঁহাকে চিনিতেন? নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার কর্ম্ম-জীবন তাঁহার যে উজ্জ্বল পরিচয় রাখিয়া গেছে তাহাই যথেষ্ট; সে পরিচয়কে উজ্জ্বলতর করিবার সামর্থ্য কাহারো নাই।

১২৪২ বঙ্গাব্দে যশোহর জেলায় মাগুরা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ ঘোষ। হরিনারায়ণ ঘোষের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে শিশির-কুমার ও বিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষই বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এই অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমে শিশিকুমারের উদ্যোগে, তাঁহার চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। কি কষ্ট স্বীকার করিয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজারপত্রিকা বাহির করেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই পত্রিকা খানি তিনি প্রথমে নিজের গ্রাম হইতে বাহির করেন;—সেখানে না ছিল, প্রেস, না ছিল কম্পোজিটার! একটা কাঠের প্রেস ও কতকগুলা পুরাতন টাইপ সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। শিশিকুমার কলিকাতায় আসিয়া প্রেসের সমস্ত কার্য্য নিজে শিক্ষা করিয়া ভ্রাতৃগণকে তাহা শিক্ষা দেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতারা মিলিয়া প্রবন্ধ রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, নিজের হাতে কম্পোজ, ছাপা সব কাজই করিতেন। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আর কেহ আমাদের দেশে কাগজ বাহির করিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার এ উদ্যম সত্যই বিস্ময়াবহ ও প্রশংসনীয়! যে অমৃতবাজারপত্রিকা একদিন দারিদ্র্যের মাঝে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কালে তাহা কিরূপ বিভবশালী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন

হইয়াছে তাহা বলিবার আবশ্যক করে না। প্রথমে অমৃতবাজার বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হইত। পরে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে যে সময় সংবাদপত্র আইন বিধিবদ্ধ হয় সেই সময় হইতে ইহা ইংরাজিতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। শোনা যায়, শিশিকুমার রাতারাতি বাংলা কাগজকে ইংরেজি করিয়া ফেলেন।

বহুদিন এই পত্রিকা যোগ্যতার সহিত চালাইয়া শিশিরকুমার তাহার পরিচালন ভার তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষকে অর্পণ
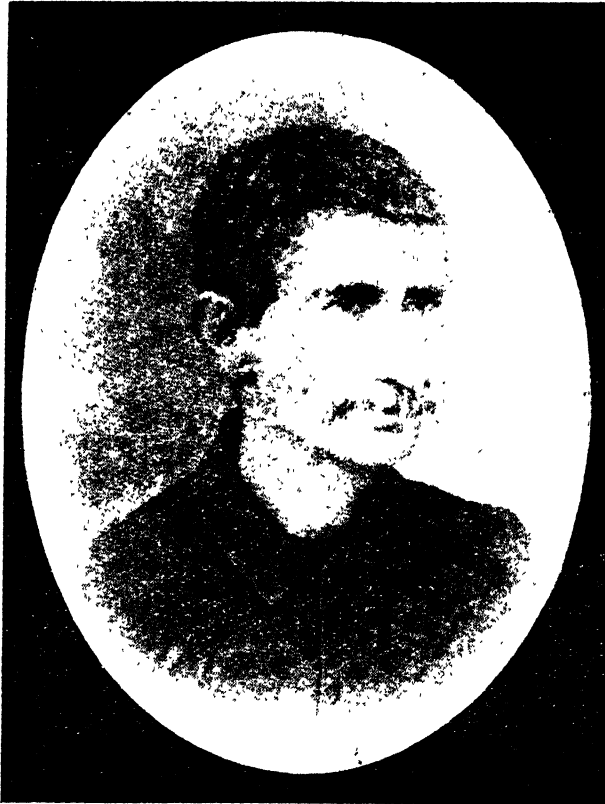
শিশিরকুমার ঘোষ।

করেন এবং নিজে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একখানি বাংলা কাগজ বাহির করেন। সে কাগজ আজিও চলিতেছে।

সংবাদপত্রের সম্পাদন ব্যতীত শিশির-কুমার 'অমিয় নিমাই চরিত' প্রভৃতি কয়েকখানি বিখ্যাত বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেগুলি বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পুণ্যস্মৃতি ও তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাস বহন করিয়া অমর হইয়া থাকিবে।

সমালোচনা।

বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা। প্রথম ভাগ। মৌলবী সেখ আবদুল জব্বার প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র। অধুনা প্রচলিত কিণ্ডেরগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগী করিয়া ছাত্রগণের জন্য এই গ্রন্থ রচিত।

শিক্ষাকোষ। শিক্ষাব্যবসায়। পঞ্চম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রতি সংখ্যা ৵৹। সমগ্র গ্রন্থ ১০৲ টাকা। শিক্ষাকোষ কার্য্যালয়, বিনোদকুটীর, লক্ষ্ণৌ। ইহার পূর্ব্ব সংখ্যাগুলি দেখিবার আমাদিগের সুযোগ ঘটে নাই -সুতরাং একেবারে পঞ্চম সংখ্যা দেখিয়া গ্রন্থকারের "প্ল্যান" বা উদ্দেশ্যের কোন একটা ধারণা করিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সংখ্যায় "ভূগোল-শিক্ষা" আলোচিত হইয়াছে। ভূগোল-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ভূগোলের ইতিহাস, ভূগোলশিক্ষায় পর্য্যায় প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের আলোচনা ও সংগ্রহ বেশ তথ্যপূর্ণ ও সুখপাঠ্য। এখানি প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় কিনা তাহাও বুঝিলাম না।

চণ্ডিকা-বিজয়। (সটীক শক্তিবিষয়ক আদি বাঙ্গালা কাব্য গ্রন্থ) দ্বিজ কমললোচন প্রণীত। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল সম্পাদিত। বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত। রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। এখানি প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরনিবাসী কবি দ্বিজ কমললোচন রচিত পুরাতন কাব্য; সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন। গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এখানি শক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, বৈষ্ণবগ্রন্থ নহে। কাব্যখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; গ্রন্থের ভূমিকায় কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কবিতাশক্তি বেশ দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। কবি কমললোচনের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, উপমাবৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রকৃতই উপভোগ্য।

পত্রলেখা। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী। প্রণীত কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। কবির রচনার নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। এই গ্রন্থে প্রায় দেড়শতাধিক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাবে ছন্দে এমন একটি করুণ সুর বহিয়া গিয়াছে যে তাহা নিমেষেই হৃদয় স্পর্শ করে। ভাষার গতি লীলাময়-সরল। কবিতাগুলি পাঠ করিবার সময় পাঠকের মনে হয়,—

"গাঢ়তর সন্ধ্যার আঁধারে
লুপ্ত আমি, লুপ্ত লেখা অশ্রুবারি ধারে।"

কবির মর্ম্মবেদনায় পাঠকের চিত্ত একটা করুণ সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। সে বেদনা একান্ত নিজস্ব বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালায় কাব্যসাহিত্যে পত্রলেখা বিশিষ্ট উচ্চস্থান লাভ করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস আছে। শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

শঙ্খ। গীতি কাব্য; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। "সান্যাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস" হইতে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ৸৹ আনা। এতদিন পরে বঙ্গসাহিত্যের প্রিয় "বড়াল কবির" মাসিক পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে পাইয়া অনেকেই প্রীতিলাভ করিবেন। অক্ষয়বাবু নূতন কবি নহেন, বহুদিন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিয়া সাহিত্যে আপনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান কবিতাগুলিতে, কবির, নিজস্ব সকরুণ সুরটা সর্ব্বত্র ঝঙ্কৃত। এই সকরুণ সুরটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইলেও, ইহার অন্তর একটা গূঢ় নির্ভরতা আছে যাহা নিতান্তই বিশ্বাসলব্ধ। এই গ্রন্থে কবির নানাদিগাভিমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—একদিকে লঘু গীতি অন্যদিকে গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব। আশা করি বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা কাব্যখানি উপভোগ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন। এবং আমরা অচিরে তাঁহার অন্য সঙ্কলন পাঠ করিবার সুযোগ পাইব।

পরলোকগত চন্দ্রনাথ বসু। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

মূল্য ।• আনা মাত্র। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যতদূর সম্ভব, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার বিষয়টী সেই ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রনাথবাবুর রচিত গ্রন্থাবলীর অপেক্ষা চন্দ্রনাথবাবুর ব্যক্তিগত জীবনের অধিকতর আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ নূতন কথা না থাকিলেও, খগেন্দ্রবাবু প্রবন্ধটী বেশ মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। আশা করি খগেন্দ্রবাবু এই ক্ষুদ্র রচনা, কালে বৃহত্তর করিতে অবকাশ পাইবেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা (পূর্ব্বভাগ)

শ্রীযুক্ত দুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য লিখিত। মুরশিদাবাদ কণিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন" * * * সম্পাদকেরা কিরূপ সমালোচনা করেন এবং অর্থের বিনিময়ে কেহ পুস্তক লন কিনা তাহা দেখিয়া দ্বিতীয়াংশ প্রকাশিত করিব"। অথচ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন তাঁহার নিজের প্রেস আছে! গ্রন্থকার শিক্ষা দিতেছেন "ঔষধ বর্জ্জন করুন"। বলা বাহুল্য এ ধূয়া পাশ্চাত্যজগতে অনেকদিন উঠিয়াছে। এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম তবে যাঁহাদের উৎসাহ আছে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গ্রন্থকার যদি তাঁহার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে যে ব্যক্তি ফল লাভ করিয়াছেন, তাহার একটী বিস্তৃত বিবরণ দিতেন তাহা হইলে উপকার হইতে পারিত। নতুবা একটী নূতন বিষয়ে গ্রন্থকার আহ্বান বলিয়া, সাধারণ তাহা সহজে গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু এবং প্রশংসার্হ।

গৃহধর্ম্ম। শ্রীমতী বিদ্যাবতী আরিয়ার সরস্বতী প্রণীত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য ॥• আনা। গ্রন্থকর্ত্রী সাধারণতঃ "সন্তানের শিক্ষা ও পালন রীতি" সহজ ভাষায় বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে বঙ্গীয় মাতৃগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকর্ত্রী পরিশিষ্টে সন্তান ও মহিলাগণের পীড়ার সহজসাধ্য হোমিওপাথিক চিকিৎসা প্রণালী সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা এই সঙ্কলনের পক্ষপাতী নহি। যিনি স্বয়ং চিকিৎসক নন তিনি কঠিন চিকিৎসা গ্রন্থের সঙ্কলন করিতে উপযুক্ত নহেন। তাহার উপর, হোমিওপাথিক ঔষধ গুলির অধিকাংশ স্থলে মাত্রা বা ক্রম উল্লিখিত হয় নাই।

শ্রীপঃ

আমার কর্ম্মভূমি।

১

ধন্য মান্য যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস আছে, সব আপিসের সেরা,
ও যে ইট-পাথরে তৈরী সেটি, রেলিঙ্ দিয়ে ঘেরা,—
এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল বুদ্ধি হানি-করা, আমার কর্ম্মভূমি!

২

কেরাণী দপ্তরী তারা, কোথায় এমন খেটে সারা,
কোথায় এমন বিষাদ জাগে, এমন মলিন মুখে,
ও তার 'বেলের' ডাকে আঁৎকে উঠি গভীর মনের দুখে!
এমন আপিস ইত্যাদি।

৩

এত রুক্ষ সাহেব কাহার, কোথায় এমন গালি আহার
কোথায় এমন লোহিত নেত্র কটমটিয়ে থাকে।
এমন কাণের উপর হাত খেলে যায় মধু মধুর পাকে!
এমন আপিস ইত্যাদি।

৪

ঘরে ঘরে ভরা বাবু, কলম পিষে দেহ কাবু
এপ্রেণ্টিস পড়ে তবু পালে পালে গিয়ে
তারা টুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, টেবিলে শির দিয়ে।
এমন আপিস ইত্যাদি।

৫

কেরাণীদের জীর্ণ দেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ
চাকরি, মা, তোর চরণ দুটি নিত্য পূজা করি,
আমার এই আপিসে কর্ম্ম যেন মজায় রেখে মরি!
এমন আপিস ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম,এ।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

ভারতী

৩৪শ বর্ষ]　　　　চৈত্র, ১৩১৭　　　　[১২শ সংখ্যা

প্রাচীন ভারতের লোকশিক্ষা।

আমাদের জীবধাত্রী বসুন্ধরার একটা সুচিত্রিত ইতিহাস আছে। বায়স্কোপের মত একটির পর একটি স্তরবিন্যস্ত ছবি—ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, একটির অঙ্কে আরেকটি বিশ্রাম করিতেছে। অকস্মাৎ একদিন তত্ত্ব-বিদের হস্ত তাহার লুকানো স্প্রিংটিকে স্পর্শ করে—আর লক্ষ লক্ষ বৎসরের কাহিনী পলি মাটির তল হইতে, প্রস্তর-স্তরের ভিতর হইতে, অঙ্গারীভূত অরণ্যের অন্তর্কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দাঁড়ায়,—তাহার বিরাট বপু বহু বহমানকালের প্রত্যেক উর্ম্মি রেখায় আচ্ছন্ন দেখা যায়। শুধু এই খানেই তাহার সমাপ্তি নয়: তাহার জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন অভিব্যক্তির পথে পাশাপাশি চলিয়াছে। সৌরকক্ষে ঘূর্ণণ-ক্ষিপ্ত অনলাঙ্গী দ্রবময়ী পৃথ্বী যখন সজল মৃত্তিকার স্নিগ্ধ শ্যাম-লিমা লাভের জন্য মুহুর্মুহু ভূকম্পনে ও বারিধারা পাতে আপনাকে পর্য্যুদস্ত করিতে-ছিল, তখন তাহার চিৎশক্তি তাহারই পাশ দিয়া আপনাকে অশেষ প্রকারে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিল। যুগ যুগান্তরের সংগ্রামের পর অবশেষে চিন্ময় মাহাত্ম্যরূপ মনুষ্যের অভিব্যক্তিতে আপনার সফলতার প্রতিষ্ঠা করিল, সমস্ত সৃষ্টি তাহার পদানত হইল, অন্ধশক্তি জাগ্রত চেতনার করায়ত্ত হইয়া পড়িল।

সেই আদিম দিবসটির সহিত আজিকার দিনটিকে যদি মিলাইয়া লইতে যাওয়া যায়, তবে সেই আত্যন্তিক বিরোধময় পরিবর্ত্তনটির মূলে যে উল্লিখিত বিকাশ আমরা দেখিতে পাই তাহা বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সার্থকতার নামই শিক্ষা। পর্ব্বত যেমন সমস্ত সমভূমির মাঝ-খানে শুধু উচ্চতার দ্বারা আপনার পার্থক্যকে জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তেমনি সমগ্র-জন্তব সৃষ্টির মাঝখানে শিক্ষা দ্বারা আপনাকে স্বতন্ত্র ও অনায়ত্ত করিয়াছে এবং সমস্ত জড় জগৎ ও জীব জগতের মুখে বল্গা লাগাইয়া আপনার পদানত করিয়াছে!

এই শিক্ষার ঠিক একটি প্রতিশব্দ যদি বলিতে হয়, তবে "মনুষ্যত্বের বিকাশ" বলা বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত হইবে। তাহার এই বিশেষ উদ্দেশ্য ও বিশেষ সফলতা তাহাকে একটি অপূর্ব্ব মহিমা দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছে। অচেতন উদ্ভিদ্ সূর্য্যালোক লাভ করিবার জন্য যেমন উর্দ্ধে বাহু বিস্তার করে, মানবাত্মা তেমনি একটি স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণে শিক্ষার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে। তাহার অন্তঃকরণের

ভিতর সে জন্য একটা সুগভীর তৃষ্ণা জাগ্রত রহিয়াছে, নিখিল লোক তাহার পানীয় যোগাইয়া কুলাইতে পারিতেছে না।

শিক্ষাকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, ব্যক্তিগত শিক্ষা ও লোকশিক্ষা। একটি ব্যষ্টি ভাবের অনুষ্ঠান, অপরটি সমষ্টি ভাবের। সমাধিনিষ্ঠ ভারতবর্ষে শেষোক্ত প্রকারের শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এখানে তাহারই কিছু আলোচনা করা যাক।

অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষ তাহার লোক-শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ কোনো নৈশ বিদ্যালয় অথবা "ইন্‌ষ্টিটিউশনের নাম করিতে পারিবে না, অথবা নিম্ন শ্রেণীর লিখন ও পঠন পদ্ধতির সহিত সবিশেষ পরিচয়ের কোনো উদাহরণ দিতে পারিবে না, কিন্তু তত্রাচ লোকশিক্ষাকে সে এমন একটি বৃহৎ স্থানে বৃহত্তর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে আজিকার এই লোক শিক্ষার (mass education) দুর্ব্বল চেষ্টার সহিত তাহার কোনো উপমাই চলে না। কথকতা, যাত্রাগান, পুঁথিপাঠ—এই সমস্ত ব্যাপার গুলি তাহার লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল, এবং ইহা হইতে এমন একটি সুপরিণত সফল মূর্ত্তিতে এই শিক্ষা বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা লইয়া বিচার বা দ্বন্দ্ব করিবার অবকাশ ছিল না। বর্ষার কূলমগ্নীর নদীর মতই সে একটি অখণ্ডনীয় পূর্ণতায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছিল! দাতা ভারতের এ যেন একটি অন্নসত্র—দেশে যত দুঃখী কাঙ্গাল নিরন্ন আছে, সকলেই তাহার অবারিত দ্বারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, অন্নপূর্ণার বেশে বীণাপাণি স্বর্ণথালে ভোজ্য লইয়া তাহাদিগকে সুধা বণ্টন করিয়া দিতেছেন!

ষ্টুয়ার্ট মিল সভ্য জগতের অবস্থা সমন্বয়ের একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অর্থ সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার না থাকিয়া সাধারণ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার সুদূরতর আশা ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যে লোক সমাজে এমন একদিন আসিবে, যখন ধনী তাহার পৈতৃক অথবা স্বোপার্জ্জিত অধিকারের বিপুল বিত্ত বিলাসব্যসনে ব্যয় করিতে পাইবেন না এবং দুস্থ শ্রমজীবী ও ভিখারীর দল আপনার গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ হইয়া কীট পতঙ্গের মত প্রাণত্যাগ করিবে না, সাধারণ ভাণ্ডার মাঝখানে থাকিয়া সামাজিক তুলাদণ্ডের সমতা বিধান করিবে। ষ্টুয়ার্ট মিলের এই অতিপ্রাকৃত স্বপ্নটী—যাহা অধিকাংশ লোকেরই "আকাশগামী ভাবুকতা" বলিয়া মনে হইয়াছে—একমাত্র ভারতবর্ষ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিয়াছে। কি সামাজিক উৎসবে, কি ধর্ম্মোৎসবে, কি আনন্দোৎসবে,—সে শুধু আপনার চিত্ত বিনোদনকেই কেন্দ্রস্থল করে নাই, তাহার চারিদিকে যে পিপাসু হৃদয়গুলি আছে, পানীয় অভাবে যাহাদের তৃষ্ণা দূর করিবার সামর্থ্য নাই,—তাহারা তাহার উৎসব ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ, তাহাদের ম্লান চক্ষের আনন্দ-জ্যোতি তাহার প্রধান দীপালোক!

আমাদের যাত্রাগানে ধনী সাধারণের হইয়া মূল্য দান করেন, সকলের সেখানে অবারিত দ্বার, সকলের সেখানে সমান প্রবেশাধিকার। দরিদ্র সাধারণ—তাহাদের মুষ্টিমেয় অন্ন হইতে তাহার অংশ দিতে বাধ্য

হয় না। এই সব নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোক গুলি—বর্ণমালা যাহারা কখনো চোখে দেখে নাই, তাহাদের চক্ষের কাছে ব্যাস বাল্মীকি কবি কঙ্কণের সৃষ্টি পর্য্যায়ের পরে পর্য্যায়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে,—কত জ্ঞান, কত শিক্ষা, কত ধর্ম্ম—কত প্রেম, ভক্তি, পাপ, পুণ্য—অনাদি কালের কত অনাদি কথা নির্ঝর ধারার মত তাহাদের প্রাণের ভিতর আসিয়া নামিতেছে, তাহাদের জীবনের গ্লানি দুঃখ হতাশা মনস্তাপ সব তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে! রাম যখন পিতৃসত্য পালন করিতে বনে যাইতেছেন, সীতা যখন শ্রীরামের মনস্তুষ্টির জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন, রুক্মাঙ্গদ যখন সত্য রক্ষার জন্য বালক পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতেছেন, সাবিত্রী যখন সত্যবানের শিয়রে আগত মৃত্যুকে তর্জ্জনী শাসনে ফিরাইয়া দিতেছেন—তখন তাহাদের অন্ধকার হৃদয় গুলি একটি অপরূপ শিক্ষার আলোক উত্তাপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রতি দিনকার ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখ বাদ বিসম্বাদ তরঙ্গ-তাড়িত তৃণের মতন সরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বিজ্ঞানময় সম্বিৎ সে আলোক-স্পর্শে শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, এই ক্ষণিকের হ্রস্ব প্রভাতটি চিরদিনের জন্য তাহাদের হৃদয়ে একটা স্পন্দনের বেগকে জাগরিত করিয়া যাইতেছে। নীহারিকা ঘনীভূত হইয়া যে পৃথিবীর আকার ধারণ করিয়াছে, অথবা সৃষ্টির কীট পতঙ্গ হইতে বহুপদ চতুষ্পদ প্রভৃতির ক্রম পর্য্যায়ে দ্বিপদ মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে—বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া তাহারা তাহা নাই বা শিখিল, তাহারা দেখিতেছে তাহাদের চক্ষের সম্মুখে পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছে, জল হইতে স্থল উদ্ভূত হইতেছে, অন্ধকার হইতে আলোক জন্ম লইতেছে—অভিব্যক্তির পর্য্যায় ক্রমে তাহাদের দেবতা মৎস্য রূপ হইতে কূর্ম্মরূপে, কূর্ম্ম হইতে বরাহ রূপে, বরাহ হইতে অর্দ্ধনরাকার রূপে অর্দ্ধনরাকার হইতে খর্ব্ব বামন রূপে, বামনরূপ হইতে অবশেষে বিরাট-দেহ বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ সুঠাম নরাকারে প্রকাশিত হইতেছে! সভ্যজগতকে বুঝাইতে গিয়া ডারুইন যে গবেষণা করিয়াছিলেন (যদিও এখন ডারুইনের সেই মত সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশিত হইতেছে) —কলালক্ষ্মীর অঙ্গনে সঙ্গীতের সৌন্দর্য্যালোকে তাহারা তাহাকে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিতে দেখিতেছে! তাহাতে কোনো কঠোরতার লেশ নাই, পীড়নের অসহিষ্ণুতা নাই, শিক্ষার অত্যাচারের জগদ্দল পাষাণটিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কাব্য সাহিত্য, দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র একটি প্রবল নির্ঝর ধারার মত উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে! তাহার অমৃতের এই অনন্ত প্রস্রবণটিতে আপামর সাধারণ তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতেছে, তাহাদের জীবন যাত্রার তিমিরাবৃত পথগুলি এই অপরূপ দীপের শত-শিখা বর্ত্তিকার আলোকে ঝক্মক্ করিয়া উঠিতেছে! তাহাদের সম্মুখে তাহারা দেখিতেছে বিধাতার জগৎ-সৃষ্টির লীলাভিনয়—পাপপুণ্যের দণ্ডাভিনয়, মহৎ ও ক্ষুদ্রের কর্ম্মাভিনয়;—ভক্তিতে আনন্দে ও মহৎ ভাবের উদ্দীপনায় তাহাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের চারিদিককার কারা-প্রাচীর তাহাদের চোখের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে!

এই নিম্ন শ্রেণীকে অশিক্ষিত বলিয়া শিক্ষিত

সমাজ যতই ঘৃণা করুক না কেন, শ্রদ্ধাযোগ্য চরিত্র তাহাদের ভিতর বিরল নহে এবং মার্জ্জিত রুচি-ই যদি শিক্ষার পরাকাষ্ঠা না হয়, তবে বহুস্থলে-ই তাহারা তাঁহাদের সহিত সমশ্রেণীতে দাঁড়াইবার যোগ্য। একটি বিস্ময়কর বিষয় এই, যে অনুপাতে তাহারা "অশিক্ষিত" সেই অনুপাতে তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ। ইহা বেশ দেখা যায় যে ধর্ম্মকে তাহারা বিচার করিবার মত কোনো ক্ষুদ্র জিনিস বলিয়া মনে করে না ও তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও অনুশাসন লইয়া আপনার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিমাপ-যন্ত্রে তৌল করিতে বসে না। যে বৃহৎ শক্তি এই আবহমান কালের ধর্ম্মবুদ্ধিকে ও ধর্ম্মশাসনকে জন্মদান করিয়াছে, একান্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাহারা তাহাকে মানিয়া লয়, প্রত্যেকের খণ্ড বুদ্ধি দ্বারা সেই অখণ্ড সত্বাটিকে খণ্ডিত করে না। বৃন্তচ্যুত হইলে বৃক্ষের ফল শূন্যমার্গে ভ্রমণ না করিয়া কেন ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় অথবা মানবকুলের পূর্ব্ব পুরুষ কপিবংশ ছিল কি না তাহা তাহারা অবগত না থাকিলেও বিধাতার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘন করিলে যে ফল হয় তাহার সহিত যথেষ্ট পরিচিত আছে। এই বিশ্ব ভুবনের ভিতরে, সমস্ত সংশয়, দ্বিধা ও মূঢ়তার কোলাহলের পাশ দিয়া নিত্য প্রেমের যে শুদ্ধ নির্ম্মল ধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, জীবন তরণী গুলিকে বিশ্বাসের পাল তুলিয়া তাহার প্রবাহ-মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং তাহাদের শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতা ঝড়ের বাতাস ঠেলিয়া গুণ টানিয়া তাহাদিগকে তীরের দিকে টানিয়া লইতেছে।

এই সব সংখ্যাতীত পথ—সংখ্যাতীত দিক্ দিয়া একটিমাত্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার ভিতর হইতে সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথটি বাছিয়া লইয়াছে। জ্ঞান জিনিসটা খানিকটা মরীচিকার মত—তাহা শুধু লুব্ধ করে, তৃপ্তিদান করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, তাহার অসংখ্য নীর অনুসরণ করিয়া যতদূরই যাওয়া যাক্ না কেন, কাহারও কখনও তাহা পানে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হন নাই। নিউটন যাহার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; "লোকে আমাকে কি মনে করে তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় জ্ঞানমহার্ণব আমার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপলখণ্ড আহরণ করিতেছি মাত্র।"

মুষ্টিমেয় আয়ু ও ক্ষণভঙ্গুর কায়া লইয়া সেই মহাসমুদ্র উত্তরণের দুরাশার অনুসরণ করিতে ভারতবর্ষ উদ্যত হয় নাই। ভোরের বেলা পাখী যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন সেই উড়িবার আনন্দটুকু ছাড়িয়া যদি সে তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটা হিসাব খাড়া করিতে উদ্যত হয়, তবে অবোধ ক্ষুদ্র প্রাণী সূর্য্য-রশ্মি-স্পৃষ্ট হইয়াই মরিবে, কোনো আনন্দ সে তাহা হইতে লাভ করিতে পারিবে না। এই সহজ ও সুদূর জ্ঞানকে হৃদগত করিয়া ভারতবর্ষ তাহার লোকশিক্ষার মূলে সেই একটি শিক্ষাকেই জাগ্রত রাখিয়াছে, সমস্ত যাত্রাপথে সেই একটি স্থানকেই লক্ষ্যস্বরূপ করিয়া নয়নাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সমস্ত আয়োজনের ভিতর সেই একটি প্রতিপাদ্য বিষয়কে ঘোষণা করিয়াছে! সে কেবল বলিতেছে "যাহাতে তোমরা অমৃতত্ব লাভ

করিবে না—তাহার দিকে তোমাদের চেষ্টাকে পরিচালিত করিয়ো না, আত্মদান কর তোমরা সেই শাশ্বত ভূমাকে—যাহা তোমাদিগকে তোমাদের ক্ষুদ্রতা ও নশ্বরতার উপর উত্থিত করিবে!" প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি শিরায় সে বাণী স্নায়ুপ্রাণের মত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, মজ্জার মত অস্থির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, মনের মধ্যে আত্মার মত বিরাজ করিতেছে! যুগ যুগান্তরের স্থিতিতে ক্রমশঃ তাহা প্রস্তরীভূত হইলেও তাহাকে সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না, চারিদিক্ হইতে যখন তাড়নার কশা তাহার উপর পড়িতেছে, তখনও সে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। সকলে তাহাকে বলিতেছে—"জাগ, জাগ, তোমার বুকের উপর হইতে ঐ পাষাণ পিণ্ডটা ফেলিয়া দিয়া লঘুপদে আমাদের সহিত ছুটিয়া চল। দেখিতেছ না, দৌড়ের (race) ঘণ্টা পড়িয়াছে—এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিষম দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যে আগে যাইবে, সেই জিতিয়া যাইবে, পিছনে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ছুট্! ছুট্!" কিন্তু তবু সে তেমন করিয়া ছুটিতে পারিতেছে না, তাহার বুকের ভিতর ভঙ্গুর জগতের কঠিন সত্যের গুরুভার তাহার গতি মন্থর করিয়া দিতেছে!

অবশ্য একথা সত্য যে ইউরোপ লোকশিক্ষাকে কোনো ক্রমেই অবহেলা করে নাই। কর্ম্ম ও চেষ্টা দ্বারা যতদূর করা যায় তাহার কোনো দিক্ হইতেই তাহার অভিযুক্ত হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। চন্দ্রের আলো যেমন সূর্য্যালোকেরই আভাসমাত্র—তাহার নিজস্ব কিছু নয়, মানুষের শক্তি মাত্রই ঠিক্ তেমনি একটি মহান্ শক্তির আভাস মাত্র, তাহা ঠিক্ তাহার আত্মগত ক্ষমতা নহে। এই ধীশক্তি—জ্ঞানকে যাহা স্তন্যদান করিয়া পূর্ণবয়ঃ করিয়া তুলিতেছে—তাহার ভিতর যে মহিমার দিব্য জ্যোতি আছে—'সাধারণ' ভূমিতে কচিৎ তাহার বিকাশ দেখা যায়। সুপরিণত বিদ্যা—বংশগত ফলের অপেক্ষা রাখে, পুরুষানুক্রমিক প্রবণতার উপর তাহা বহুপরিমাণে নির্ভর করে। চাষার ছেলে যখন চাষের কাজ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাকে সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া কোথাও গিয়া কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিতে হয় না, তাহার কাজের সমস্ত কৌশলই শৈশব হইতে তাহার অজ্ঞাতসারেই সে অধিগত করিয়া বসিয়াছে। সুতরাং তাহার কার্য্যে তাহার সফলতার মূলে আমরা দেখিতে পাই তাহার বংশগত প্রবণতা তাহার পৃষ্ঠপোষক শক্তিস্বরূপ কাজ করিতেছে এবং তাহার আশৈশবের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা—তাহাকে নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সংগ্রামের জন্য প্রভূতরূপে ক্ষমতাপন্ন করিয়াছে। দেবী বীণাপাণি আশুতোষের মত স্বল্প পূজায় প্রসন্ন হন না, অগভীর বিদ্যা উচ্চ জলসেকের মত কল্যাণের মূল বিনষ্ট করে, পুষ্পোদ্গমের সহায়তা করে না। এই শ্রমজীবিগণ ললাটের স্বেদ সিঞ্চন করিয়া যাহারা অন্ন ও লোকসমাজের প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্যাদি উৎপাদন করে—বিদ্যামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবক (amateur) হওয়া তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র—অন্ততঃ আমাদের দেশে তাহাদের

চেষ্টা ও কর্ম্মকে কমলার দ্বারে অঞ্জলি প্রদান করিয়া যখন তাহারা বীণাপাণির প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তিনি বরের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

ইউরোপ সাধারণের শিক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া বিদ্যা শিক্ষার বহু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়, অবৈতনিক বিদ্যালয়, ফ্রি লাইব্রেরী—কোনো দিক্ দিয়া সে কিছু বাকি রাখে নাই। তাহার অতি সচেতন সভ্যতা লিপিবিদ্যার পরিচয়ের অভাবকে জীবনের সমস্ত দৈন্যের ভিতর হীনতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং বিদ্যাশিক্ষাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অভি-রুচির উপর ছাড়িয়া না দিয়া সে দেশের আইনকে ও সমাজশক্তিকে তাহার রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার বিধান অনুসারে প্রত্যেক শিশু পঞ্চম বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ না করিলে তাহার অভিভাবকগণের দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। এখন দেখা যাক্ শিক্ষার এই বৃহৎ চেষ্টা ও বিরাট্ আয়োজন কি পরিমাণ সার্থকতার দ্বারা পুরস্কৃত হইতেছে। হার্ব্বাট স্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, "শিক্ষার প্রধান কার্য্য আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপনের উপযোগী গড়িয়া তোলা।" সোনাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে গেলে যেমন কষ্টি পাথরে আঁক দিয়া লইতে হয়, তেমনি পশ্চিমের প্রবল চেষ্টা ও কঠিন ব্যবস্থার এই শিক্ষা পিণ্ডটাকে আমরা যদি পরীক্ষা করিতে যাই তাহা হইলে নিকষ সোনার বহ্নিপীত রেখাটির পরিবর্ত্তে একটি মলিন কৃষ্ণ রেখাই আমাদের চোখে পড়িবে। ইউরোপ নিজেও আজ একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছে না, যে গুরুভার নিস্ফলতা বৃহৎ বাঙ্গের মত তাহার আশা-দীপ্ত চক্ষের আনন্দ-জ্যোতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইতেছে—তাহা তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা অস্ফুট ভীতির বেদনা-শিহরণ প্রেরণ করিতেছে। আজ আমরা তাহাদিগকে বলিতে শুনিতেছি যে, "শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার বহুতরবিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রচুর পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার ফলে এখন এইরূপ প্রমাণই পাইতেছি যে শিক্ষা যখন আইন-নির্দ্দিষ্ট ছিল না তখনকার কাজই সর্ব্বাংশে প্রশংসা যোগ্য ছিল। তখনকার ইমারতের গঠনপ্রণালী আধুনিক প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর ছিল, এবং গৃহ-সজ্জার উপকরণাদি অধিকতর স্থায়ীভাবে নির্ম্মিত হইত। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর তাপরক্ষার উপযোগী পুরু দেয়াল ও ওক কাষ্ঠের থামওয়ালা কৃষিবাটিকা অথবা বৃহৎ প্রাসাদের সঙ্গে আধুনিক পল্লীস্থাপত্যের কোনো উপমাই চলে না। প্রাচীনকালের কাঠের সিঁড়ি যে বাড়ীতে আছে সে বাড়ীতে তাহা একটি সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে,—তাহা শুধু প্রাচীনত্বের জন্য নহে, গঠনের অনুপমত্বের জন্যই তাহার আদর। আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পীগণ চেষ্টার দ্বারা তাহার অনুকরণ করিতে পারে বটে কিন্তু কখনও অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে আমাদের অপেক্ষা আমাদের

পিতামহগণ যোগ্যতা ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরার্চ্চনার জন্য নির্ম্মিত এখনকার এই অশোভন ধর্ম্মমন্দিরগুলির তুলনায় তখনকার মন্দিরগুলি দেখিয়া এ কথার সত্যতা বেশ বোঝা যায়।”

*　　*　　*　　*

“যখন আমরা মনস্বিতার উন্নততর ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে আর্ট স্কুলের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কোনো ব্রিটিশ বড় আর্টিষ্ট নাই এবং যদিও প্রত্যেকেই লিখন ও পঠনপদ্ধতির সহিত পরিচিত, তথাপি সেক্‌সপীয়র্, স্কট্, থ্যাকারে, ডিকেন্সের মত উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের এ যুগে একান্ত অভাব। শিক্ষা যে যুগে আইননির্দ্দিষ্ট ছিল না, তাঁহারা সেই যুগেরই লোক ছিলেন।”

শিক্ষা সম্বন্ধে এই অসন্তোষের গুঞ্জরণ এখন চারিদিক হইতেই ধ্বনিত হইতেছে। সভ্যতা বাহিরের ঐশ্বর্য্যকে যতই স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, ভিতরের দৈন্য ততই যেন গভীর হইতেছে। মানুষ সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটিকে বুজাইবার জন্য হাতের কাছে যাহা পাইতেছে তাহাই যেন চোখ বুজিয়া তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্বে ত্বরাগ্রস্ত জনসমূহ যেন তাহাদের হাতের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইতেছে না। যুদ্ধ যখন ঘোরতর বাধিয়া ওঠে আগ্নেয়াস্ত্রের ধূমে অন্ধ সেনারা তখন যেমন আপন দলের লোকের উপরেই অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে তেমনিতর একটা প্রচণ্ড লাভের চেষ্টা আজ তাহাদের এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহার প্ররোচনায় কল্যাণবুদ্ধিকে তাহারা যেন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে!

কিন্তু সাধারণের ভিতর শিক্ষা কোনো সফলতা উৎপন্ন করিতে পারে নাই একান্ত ভাবেই যদি একথা বলা যায় তাহা হইলে শুধু নিজের মতকেই প্রচার করা হয় সত্যকে নয়। ভিক্টর হুগো বলিয়াছিলেন “বিদ্যামন্দিরের দ্বার যে উন্মোচন করে সে বন্দীশালার দ্বার রুদ্ধ করে।” তাঁর কথা মতই আমরা সার জন লাবকের প্রকাশিত ইংলণ্ডের অপরাধী তালিকায় দেখিতে পাই—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডে ‘এডুকেশন আইন প্রতিষ্ঠার পর তাহার পরবর্ত্তী সাত বৎসরের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা ২০৮০০ হইতে ১৩০০০তে নামিয়া গিয়াছিল। প্রতি বৎসরের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির হারের সঙ্গে যোজনা করিলে ইহা একটি বৃহৎ সার্থকতার পরিচয় প্রদান করে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ শিক্ষার একটি বৃহত্তর আকার দিয়াছিল। শুধু সভ্যতার জন্য নয়, জ্ঞান-গরিমার গৌরবের জন্য নয়, সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য নয়, মনুষ্যাত্মার মুক্তির একটি অত্যুন্নত লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া সে তাহার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়াছিল! একটু একটু করিয়া পথ না চলিয়া সে একদমেই সমস্তটা পথ চলিবার আয়োজন করিয়াছে, পথের ধারে প্রমোদ নিকেতন গুলিতে থাকিয়া দীর্ঘ যাত্রাকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে নাই, পথশ্রমে তাহার শ্রান্ত পদ যখন বেদনায় টন্ টন্ করিয়াছে তখন সে এক মনে সেই চিরবিশ্রামের জায়গাটিকে স্মরণ করিয়া তাহার মনের সমস্ত কাঠিন্যকে পুঞ্জীভূত করিয়া যষ্টির মত হাতে আঁটিয়া ধরিয়াছে! বাড়ীতে যাইবার জন্যই যে

পথের সৃষ্টি, পথের জন্য বাড়ীর সৃষ্টি নয়—সেইটে মনে করিয়া সে অলস বিশ্রামে পথের ধারে দাঁড়াইয়া আমোদ উপভোগের বাসনা করে নাই, তাহার স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় ছায়া রৌদ্র বিচার না করিয়া আপনার দুঃসহ তাগিদে বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে, তাহার সমস্ত আনন্দ, উল্লাস, বিশ্রাম সেইখানেই অপেক্ষা করিয়াছে, এবং সেইখানে না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাহার তৃপ্তি হয় নাই! তুঙ্গ গিরি শিখরে অবস্থিত সেই চির স্থির মৃদু জ্যোতির দিকে তাহার চক্ষু অনিমেষ হইয়া আছে, জীবনের পরপারের অন্ধকারে যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতা হঠিয়া দাঁড়াইবে—যে অজ্ঞাত পথের সম্মুখে আসিয়া ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের দীপ্তি কৃত্রিমতার ব্যর্থতায় মলিন হইয়া নিভিয়া যাইবে—সেইখানে সে দীপ্ত-হস্তে জাগিয়া বসিয়া আছে, চারিদিকে তাহার যে সব যাত্রী আনাগোনা করিতেছে তাহাদের সে ডাকিয়া বলিতেছে "গৃহ-গমনোৎসুক কে আছ সে এস, জীবনের এই হ্রস্ব বেলার পারে যে অনন্ত দিবস আছে সেখানে কে পৌঁছিবে এস, তাহার জন্য কে প্রস্তুত হইতে চাও এস!"

ক্লেশের উপর ভারতবর্ষের একটা সহজ স্বাভাবিক প্রবল অবজ্ঞা ছিল। দুয়ারের কাছে করোটি-কপাল-ভগ্নালঙ্কারে সজ্জিত দুঃখকে দেখিয়া সকলে যখন সভয়ে কপাট বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তখন সে হাস্যমুখে আপনার ঘরের ভিতর তাহার বসিবার আসন বিছাইয়া দিয়াছে, তাহার অপেক্ষা শক্তিতে যে সে হীন নয়, তাহার প্রবলতম আঘাতকেও যে সে উপেক্ষা করিতে পারে তাহা সে সদর্পে প্রকাশ করিয়াছে।

দারিদ্র্যে, অনাহারে, রোগে, মহামারীতে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে কিন্তু এ বিরাট মৃত্যু কি নিস্তব্ধ, নীরব, জড়ের মত কি ভয়ানক মূর্ত্তি! কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, কেহ তাহার কণ্ঠ শ্রবণ করিতে পাইতেছে না, আলোকিত আকাশের নীচে চলমান্ নিস্তব্ধ মেঘ-পুঞ্জের বিস্তৃত অন্ধকার ছায়ার মত নীরবে তাহা সমাজের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ! তাহার অন্তরের ভিতর সহিষ্ণুতার যে অপরিসীম বীর্য্য রক্ষিত আছে, তাহা বিভীষিকায় বিচ্যুত হয় নাই, ঝঞ্ঝার পর্য্যুদস্ত হয় নাই, কঠোরতায় নম্র হয় নাই; যুগযুগান্তরের সাধনা তাহাতে সঞ্চিত হইয়া আছে, বিপুল তপোতেজে তাহা অক্ষতপ্রায় রহিয়াছে! অবশ্য ইহা সত্য যে ভারতীয় জল বায়ু তাহার অধিবাসীগণের একটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে পরিগণিত। মুষ্টিমেয় তাম্রখণ্ড ও জীর্ণ চীর—ইহা হইলেই তাহারা জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা প্রকৃতি-জননীর নিকট হইতে এই অনুকূলতা প্রাপ্ত হয় না। হিংস্র প্রকৃতি ক্রূর বিমাতার মত তাহাদের আপনার তীক্ষ্ণ নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রক্তপানের জন্য লোলুপ হইয়া বসিয়া আছে, এবং গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে অসমর্থ হতভাগ্যগণ তাহার কবলে পতিত হইয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিতে বাধ্য হইতেছে।

দরিদ্র ভারতের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে ইউরোপে 'charity'র অশেষ

বিস্তার সত্ত্বেও তাহার নিবন্ন অধিবাসীগণকে মনুষ্যত্ব রক্ষার বীর্য্য দান করিতে পারিতেছে না। জাতীয় সাহিত্যকে যদি জাতীয় অবস্থার নজির ধরা যায় তবে একথা কিছুতেই অস্বীকার করিবার যো নাই। অন্য সব লেখকগণকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র ডিকেন্সের উপন্যাস হইতে দরিদ্র পল্লীর রজনীর অতি সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র দেওয়া যাক্। ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ক্রূর আবর্ত্তে পড়িয়া গৃহহারা বালিকা রাজধানীর ভিতর আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, ডিকেন্স বর্ণনা করিতেছেন—

"এই ভয়ঙ্কর স্থানে রাত্রি! ধূম যখন বহ্নিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেক চিমনি শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সেই সব জায়গা গুলি—সমস্ত দিন যাহা মৃতের সমাধি মন্দিরের মত অন্ধকার ছিল, অকস্মাৎ শোণিত-দীপ্ত বর্ণে ঝলকিতে লাগিল। রাত্রি—যখন প্রত্যেক কলের শব্দ ভয়াবহ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—যখন তাহার চারিধারে লোকগুলি অধিকতর বর্ব্বর ও বন্য দেখাইতে লাগিল, কর্ম্মহীন শ্রমজীবির দল দলে দলে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, অথবা মশালের রক্ত আলোক ধরিয়া তাহাদের নেতৃদলকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া কর্কশ ভাষায় তাহাদের কৃত দুষ্কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল এবং ভয়াবহ চীৎকারে ও ভয় প্রদর্শক বাক্যে তাহাদের উত্তেজিত করিতে লাগিল। সেই সব রমণীরা—যাহারা প্রার্থনা ও অনুনয়ের দ্বারা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহাদের দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষিপ্তবৎ লোকগুলি মশাল ও তরবারি লইয়া ভয়াবহ কার্য্য ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল, ধ্বংস—যাহাতে অন্যের অপেক্ষা নিজেদের বিনাশই সর্ব্বাপেক্ষা সাধিত হইতেছিল! রাত্রি—শকট সমূহ যখন মৃতের সজ্জাহীন শবাধার বহন করিয়া আনিতে লাগিল, অনাথ বালকবালিকার ক্রন্দন ধ্বনিত হইতে লাগিল, উন্মাদ রমণীগণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং সুপ্তির ভিতর ভ্রমণ করিতে লাগিল! রাত্রি—যখন কেহ আহার্য্যের জন্য, কেহ যন্ত্রণা ভুলিবার উদ্দেশ্যে পানের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ অশ্রুচক্ষে, কেহ স্খলিত গতিতে কেহ রক্ত চিহ্নিত চক্ষে অন্ধকার চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বাড়ী ফিরিতে লাগিল, রাত্রি—যাহা ঈশ্বরের প্রেরিত রাত্রির মত শান্তি, বিরাম, ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পূত নিদ্রা বহন করিয়া আনিতে ছিল না!"

কি ভয়ানক শোচনীয় এই ছবি! ভারতের নিদ্রামৌন ঝিল্লিমুখর নক্ষত্রের আলোকপাত মধুর রাত্রির সঙ্গে এই রাত্রির কি প্রভেদ! এই সন্ধ্যা—যখন

"মৌন নভস্থল
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন মৌন জল স্থল
স্তম্ভিত বিষাদে নম্র। নির্ব্বাক নীরব
দাঁড়াইয়। সন্ধ্যা সতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল
অনন্ত আকাশ পূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের তলে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ দান।
ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়াছে নীড়ে
শিশুরা খেলে না, শূন্য মাঠ জনহীন
ঘরে ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন

কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,—
কে ঐ গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়। অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা দিবসের কর্ম্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে, ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোক স্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে, আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত।
ক্রমে ঘনতর হয়ে
নামে অন্ধকার, গাঢ়তর নীরবতা,
বিশ্ব পরিবার তাহে সুপ্ত নিশ্চেতন"—

ইহার সঙ্গে এই রক্তচক্ষু বহ্নি-শিখা-স্ফুরিত কোলাহল দুঃসহ আহ্লাদ ঝঙ্কৃত ভয়াবহ দৃশ্যে পরিপূর্ণ সন্ধ্যার কি প্রভেদ! আমাদের এই দরিদ্র, প্রাচীন, অবজ্ঞাত ভারতবর্ষ! তাহার এই পার্থক্য কি অপরিমেয়, কি অনমুমেয়! এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সুরুচির ক্ষেত্রে জগতের অপরাপর জাতির সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া সে না দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু যাঁহাকে পাইলে "পুমান সিদ্ধোভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি, যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি—" তাঁহাকে আপনার বক্ষতলে বন্দী করিয়া সে বিশ্ব সংসার ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, হাসিতেছে। অভাবের ভিতর তৃপ্ত, ভোগের ভিতর রিক্ত, সমস্ত কাঠিন্যের ভিতর আপনার অন্তরের অক্ষয় অমৃত রসধারায় সিক্ত হইয়া ভারতবর্ষ শুধু হাসিয়া বলিতেছে "ঐ খেলার সীমানা দেখিতেছ? আমি তাহা ছুঁইয়া পার হইয়া আসিয়াছি, আমার ছুটী হইয়া গিয়াছে, তোমরা এস, আমার পিছনে এস! তোমাদের বুড়ি যখন ছোঁওয়া হইয়া যাইবে তখন আমি পুরোবর্ত্তী থাকিয়া পরম পরিণামের পথ তোমাদিগকে দেখাইয়া লইয়া যাইব!

শ্রীআমোদিনী ঘোষজায়া।

সন্ন্যাসী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়াছে চঞ্চলা মধুমতী, আর তার দক্ষিণকূল হইতে নামিয়াছে, সোপান শ্রেণীবদ্ধ জীর্ণ ঘাট্‌লা! সেই প্রস্তর বাঁধা ঘাট্‌লা, কোন্ অতীত যুগের সাক্ষ্য বহন করিতেছে, তাহা সে মুখ ফুটিয়া বলেনা! ঘাট্‌লার অদূরে বিগ্রহশূন্য ভগ্ন মন্দির—তার মাঝে খানিকটা ছাই আর ভস্ম,—কিছু কাঠ, আর একটা ভাঙ্গা হাঁড়ি,—কবেকার এক নৌকারোহী অতিথির রন্ধন-আয়োজন চিহ্ন!

মন্দিরের পাশ দিয়া গ্রামের পথ চলিয়াছে —তার পাশে পাশে দু'একটা ঝাউ, এক আধটা আম কাঁঠালের গাছ; সে পথটিকে শ্যামল ছায়াবৃত করিয়া রাখিয়াছে! পল্লীর লোক দল বাঁধিয়া সেই পথে ঘাটে আইসে,— স্নান করে। বালকবালিকারা ঘাট্‌লার

দাঁড়াইয়া মধুমতীর তরঙ্গ দেখে, আর নৌকা গণে! বধূরা গুণ্ঠনের অন্তরাল হ'তে কৌতুহলী দৃষ্টিতে খোলা মাঠ, নদীর দুকূল আর মৃদুবায়ু কম্পিত হরিৎ ধান্যশীর্ষ দেখিয়া, মধুমতীর মিঠা জলে কলসী ভরিয়া লইয়া, ঘরে ফেরে!

এমনি প্রত্যহই দিন কাটে। সেদিন সকালে গ্রাম্যবধূরা কলসী কক্ষে জল লইতে আসিয়া দেখিল, ছাই ঠেলিয়া, কাঠ সরাইয়া, হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া সেই ভগ্নমন্দির কে পরিষ্কার করিয়াছে! মন্দির মার্জ্জনায় ভক্ত হস্তে সেবাচিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে? যুবকেরা আসিয়া দেখিল, সে এক গৈরিক পরিহিত তরুণ সন্ন্যাসী! অঙ্গ তাহার ভস্মপ্রলিপ্ত নহে, শিরে তার জটাভার নাই, তবু দেবাদিদেবের ন্যায় তাহার কান্তি—প্রভাতারুণের ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব শ্রী;—ম্লান মন্দির রূপের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

তার সঙ্গে ছোট একটী বীণ্! ভক্ত হস্ত স্পর্শে সে বীণ্ সায়াহ্নে প্রভাতে বাজিয়া উঠে—আর সেই তরুণ সন্ন্যাসীর মধুরকণ্ঠ নীলাকাশ প্লাবিত করিয়া বীণের সুরের সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। বিহঙ্গ কাকলী ভুলিয়া স্তব্ধ হইয়া সে গান শোনে—মধুমতী সে কণ্ঠ শুনিবার জন্য ঘাট্‌লার পাথরের উপর আছাড়িয়া পড়ে!

বৃদ্ধারা সন্ন্যাসীকে দেখে—মনে করে, 'আহা কার বাছাগো"!"—অশ্রু আসিয়া তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ম্লান করিয়া দেয়! যুবতীরা দেখে,—ভাবে,—'কোন্ অভাগীর হৃদয়পিঞ্জর ভাঙ্গা পাখীরে!'—অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাহাদের পদ্মচক্ষু করুণাপ্লুত হইয়া উঠে!

যে যাহার উপহার আনিয়া মন্দিরের দুয়ারে আনিয়া স্তূপ করে—আর সে তাহার পুঁথি নিয়া, বীণ্ নিয়া, গান নিয়া তন্ময় থাকে! বৃদ্ধারা প্রৌঢ়ারা ছাড়েনা—যেদিন যাহার হাত থেকে সে দুটা ফল গ্রহণ করে, সে কৃতার্থ হইয়া চলিয়া যায়!—এত প্রেম, এত স্নেহ সঞ্চিত মানুষের হৃদয়ে;—সন্ন্যাসী মানুষের মুখে ভগবানের প্রতিচ্ছবি দেখে,—আর তাহার নয়নে অশ্রু ফুটিয়া উঠে!

একজন আসে—সে সন্ন্যাসীকে উপহারও দেয়না—কথাও বলেনা! দিনান্তে সে একবার আসে, দুয়ারে যারা থাকে তারা সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়! দরিদ্রের কুটীরে, মধ্যবিত্তের গৃহে, ধনীর প্রাসাদে, সর্ব্বত্র তাহার অবাধ গতি! সে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ক্ষমতাশালিনী কন্যা, যুবকগণের স্নেহশালিনী ভগিনী,—বধূদিগের সখী, বালক বালিকাদিগের ক্রীড়াসঙ্গিনী;—সে জমীদারকন্যা বিধবা জ্যোতির্ম্ময়ী!

সন্ন্যাসী প্রতিদিন গ্রামে বাহির হয়;—শুধু একবাড়ী হতে ভিক্ষা চাহিয়া আনে—মুষ্টিভিক্ষা! যে গৃহস্থের বাড়ী সে ভিক্ষার জন্য যায় সে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে অগ্রসর হয়—সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া তাহার মন্দিরে ফিরে! সঙ্গে ছেলের দল—মন্দির পর্য্যন্ত ছোটে—দুয়ারের স্তূপীকৃত উপহারগুলি সে এই নগ্নশিশুদের হাতে হাতে আনন্দে বিতরণ করিয়া দেয়! পরদিন স্নেহের দান আবার মন্দিরের দুয়ারে স্তূপীকৃত হইয়া ওঠে!

অপূর্ব্ব প্রভাশালিনী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রত্যহ একবার আসে—সে তাহার মৌন স্নিগ্ধ দৃষ্টিদ্বারা মন্দিরবাসীকে কি উপহার নিবেদন করিয়া যায়, কে জানে? সন্ন্যাসী তাহাকে

দেখে,—ভাবে,—আবার তাহার পুঁথির মধ্যে তন্ময় হইয়া থাকে! আবার যখন তাহার শান্তদৃষ্টি উৎসারিত করিয়া চাহে, তখন দেখে জ্যোতির্ম্ময়ী—চলিয়া গিয়াছে—আর সেখানে হয়ত দাঁড়াইয়া আছে,—একদৃষ্টে তাহারি দিকে চাহিয়া, একটী চীরপরিহিত রাখাল বালক!

গ্রামে এমন সময়ে একদিন হাহাকার উঠিল—মহামারীতে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিল! পুঁথি বন্ধ করিয়া, বীণ্ ফেলিয়া, সন্ন্যাসী সেই মৃত্যু তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল! সেখানে তাহার সহায় মিলিল জ্যোতির্ম্ময়ী,—আর সন্ন্যাসীর ডাকে দল বাঁধিয়া আসিল গ্রামের যুবকেরা! তার পর চলিল পীড়িতের সেবা, পথ্য ও ঔষধ বিতরণ! —সন্ন্যাসীর আদেশ মত গ্রাম্য যুবকেরা ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করে—শবদাহ করে,—কেহ কেহ রোগীর সেবাও করে!

মুমূর্ষুর শিয়রে বীজনরতা জ্যোতির্ম্ময়ী,—আর প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে রোগীর তত্ত্বাবধান ও সেবা করিতে ব্যস্ত, তরুণ সন্ন্যাসী! উভয়েই নীরব, উভয়েরই দৃষ্টি পরস্পরের গুণমুগ্ধ,—কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক! কি অকুণ্ঠ তৃপ্তি, কি আনন্দ উভয়ের হৃদয়ে!

(২)

সেদিন বীজনরতা জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল, কখন রজনীর শেষযাম অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সে তরুণ সন্ন্যাসী তো সেবা ও শান্তি লইয়া ফিরিয়া আইসে নাই! সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া তার যে এখানেই আসিবার কথা ছিল!

সেবানিরতা মাতৃহৃদয়খানি আজি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় ব্যথিত হইয়া উঠিল! নত মস্তকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল প্রভাতের স্নিগ্ধ করস্পর্শে রোগী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।—মুখে তার আরাম ও শান্তির চিহ্ন!

তাহার অন্তর বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কি যেন করুণ সঙ্গীতের সুর বাজিয়া উঠিল!—সে যেন সেই চির পরিচিত পুরাতন আবাহন বাণী "ওগো, এস, এস, এস!"

(৩)

পার্শ্বে সুরবাঁধা বীণ্—মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে বুঝি গায়কের শান্ত করস্পর্শে মৃদুঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল! আর অদূরে আস্তৃত গৈরিক অঞ্চলোপরি তন্দ্রানিমীলিত নয়নে ও কে ওগো!

জীবন ও মৃত্যুর পুণ্য সন্ধিস্থলে অবস্থিত;—সেই দীনের বান্ধব, আর্ত্তের সেবক, তরুণ সন্ন্যাসী!

জ্যোতির্ম্ময়ী পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার আননে উচ্ছ্বসিত শান্তির পুণ্যলেখা! সে তরুণ তাপসমূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ীর নিমেষহীন নয়নের সম্মুখে দেবতার মূর্ত্তির মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

কোন্ পাষাণ মন্দিরের অভ্যন্তরে এই দেবতার অধিষ্ঠান ভূমিরে!

সসম্ভ্রমে, ধীরে, অতি ধীরে জ্যোতির্ম্ময়ী সেই তরুণ তাপসের চরণ স্পর্শ করিল!—এতটুকু চরণ ধূলির ভিখারিণী সে!

চক্ষু চাহিয়া সন্ন্যাসী দেখিল, কে আসিয়াছে!

ইঙ্গিত পাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী পুঁথি আর বীণ্ কুড়াইয়া সন্ন্যাসীর হাতের কাছে আনিল! মৃদুকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিল,—

"পুঁথি—আর বীণ্—আমার সর্ব্বস্ব—তোমাকে দিলাম—আর"—

সেবা, শুশ্রূষার করস্পর্শ করিল!

সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইয়া ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল!

তখন পৃথিবীর কোলাহল তাহার চতুর্দ্দিকে যেন মৃদু সঙ্গীতের মত বাজিতেছিল!—আর সেই সঙ্গীত গুঞ্জনের মধ্যে শ্যামসুন্দরের চরণনূপুর শব্দ তাহার কাণের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।

গুজরাতে অতিথি।

"অতিথির বেশে ঘুরি দেশে দেশে,
কানন কান্তার শৈল লোকাবাসে,
সতত রয়েছ তুমি পরকাশি
স্নেহ মায়া লয়ি আপনা বিকাশি।"

প্রায় চারি বৎসর কাল গুজরাতে অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছি। দীর্ঘ চারি বৎসরের স্মৃতি গুজরাতি নরনারীর সৌজন্যে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

জীবসেবা গুজরাতের জাতীয় অঙ্গের একটা শ্রেষ্ঠ দিক; কিন্তু ইহা কালে কালে মানবসেবা অপেক্ষা বহুলাংশে পশুপক্ষী সেবার দিকে অধিকতর খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ কুকুর বিড়াল বানর প্রভৃতির আহার্য্যের সংস্থানের জন্যই ইহাদিগকে বিশেষ ব্যগ্র দেখা যায়। গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে পিঁপ্‌ড়ার জন্য গুজরাতিরা চিনি ফেলিয়া রাখে; কাঠবিড়ালীর আহারের জন্য অর্থব্যয়ে স্থানে স্থানে মঞ্চ নির্ম্মাণ করে; বানরের আহারের জন্য বনে জঙ্গলে প্রভূত পরিমাণ রুটী প্রতিদিন বিতরণ করিয়া আসে এবং মাছের আহারের জন্য আটা, বাজরী, 'মুরমুরা' জলে নিক্ষেপ করে; আর গৃহে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই তাহাকে স্নেহ যত্নে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। গুজরাত ও মহারাষ্ট্র ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই এ ভাব বিরল। প্রবাসীর প্রতিও গুজরাতীরা খুব স্নেহশীল ও অতিথিবৎসল।

গুজরাতের দ্বিতীয় পুলকচঞ্চলদৃশ্য—গরবা-গান। ইহা গুজরাত জাতীয় জীবনের অনিন্দ্য আনন্দ উৎস; শরৎ প্রকৃতির নির্ম্মল নীল আকাশতলে রবিকর বিকীর্ণ শ্যামায়িত তরুলতা শস্যের আনন্দ উচ্ছ্বাস পরিব্যাপ্ত প্রাঙ্গণতলে গুর্জ্জরী রমণীগণের আনন্দ আবেগ সঙ্গীতস্রোতে দিগ্‌মণ্ডল প্লাবিত করিয়া তোলে;—এই সময় তাহাদের নওরাত্রি, দিওয়ালী, দেবদিওয়ালী নববর্ষ প্রারম্ভ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব। এই উৎসব সময়ে গুজরাতি রমণীগণের মহিমা-কীর্ত্তন গরবা-গান সুধার মত সুমন্দ পবনে ছড়াইয়া পড়ে।

সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বালবৃদ্ধযুবতী রমণীগণ সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া দেবমন্দির প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হয়; তারপর একটী দীপশিখা মধ্যস্থলে রাখিয়া করতালি-

তালে দেহ লতা নত করিয়া দুলিতে দুলিতে তাহা প্রদক্ষিণ করিয়া গরবা গান গাহিতে থাকে। তখন যমুনাতীরবিগত—সেই অতীত স্মৃতি,—ব্রজগোপীগণের আবেগ পদকম্পন যেন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়। সেই সুদূরতম কাল যেন ছায়া বিক্ষেপণকারীগতিতে আসিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে,—তাহার সেই সরল বিলাসশ্রীর মধ্যে যে পবিত্রতা ও নিরাকাঙ্ক্ষ প্রেমতন্ময়তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়।

গুর্জ্জরী রমণীর কণ্ঠতল-নিঃসৃত বন্দনা-গীতি কঙ্কণসিঞ্চিত করতাল স্বনিত লহরীর সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপে তালে তালে ঢলিয়া পড়ে। প্রথমেই উমা মহেশের বন্দনা, রামসীতাজির মহিমা, তৎপর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গ লীলা তালে তালে মুখরিত হইয়া উঠে। মহারাধা মীরাবাই যে পরাপ্রেমে বিগলিত হইয়া গীতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা গুর্জ্জরী রমণীকণ্ঠে অমিয়ধারা বর্ষণ করে। রাত্রির আঁধার যতই গাঢ় হইয়া আসে স্ত্রীকণ্ঠের আনন্দ উচ্ছ্বাস ততই নিবিড় হইয়া উঠে।

গুজরাতের এই জাতীয় আনন্দ উৎসবের মূলে পরাপ্রেমের আকাঙ্ক্ষা আছে; প্রবাদ এই,—শ্রীহরি বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া স্ত্রী মূর্ত্তিতে সময় সময় এই গরবা গানে নাচিতে আসেন।

গুজরাতে এই আনন্দ উৎস—নওরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবদিওয়ালী পর্য্যন্ত একমাসকাল খুব সঞ্জীবিত থাকে।

বাঙ্গলা দেশ ছাড়াইয়া বেহারে আসিলে স্ত্রী অবরোধ প্রথা একটু লঘু—অযোধ্যা দিল্লী আগ্রাতে একটু বেশী—রাজপুতানায় এ প্রথা বহুলাংশে লাঘব হইয়াছে; রাজপুতানা ছাড়াইলে মালব, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে রমণীগণের আর্য্য স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণ বিদ্যমান,—কাজেই গুজরাতি রমণীরা সাহসী বলবান ও সৌষ্ঠবপূর্ণা, তৎসঙ্গে শ্রমশীলা ও নির্ভরপরায়ণা।

বোম্বাই সুরত প্রভৃতি স্থানের গুজরাতি রমণীরা বেশভূষা ও বিলাস উপকরণের ব্যয়ে কিছু মুক্ত হস্ত। কিন্তু জনসাধারণ গুজরাতের লোক অতি পরিমিতব্যয়ী। তবে বিবাহ শ্রাদ্ধ উৎসবাদিতে তাহারা অনেক সময় এত ব্যয় করে যে অনেককে সেজন্য নিঃস্ব হইতে দেখা যায়। গুজরাতের পল্লীবাসীরা অধিকাংশই মিতাচারী

গুজরাতের তৃতীয় দৃশ্য—রমণীগণের জল সংগ্রহ। পল্লীগ্রামে বা ছোট সহরে—যেখানে জলের কল বা কোন পুষ্করিণী নাই,—প্রায়ই তাহারা মিঠা কুয়ার জল সংগ্রহ করে। প্রতি গ্রামেই একটা না একটা মিঠা জলের কূয়া থাকে; আবালবৃদ্ধরমণীরা দল বাঁধিয়া সেখানে জল আনিতে যায়—অনেক সময় ২।৩ মাইল দূর হইতেও জল আনিতে হয়; মস্তকে জলপূর্ণ কলসী-একটীর উপর আর একটী, হস্তে আর একটী কলসী লইয়া অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া আসে।

২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্ব পল্লিবাসিনীরাও এইরূপ জল সংগ্রহ করিত। "সই জলকে চল" বলিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া মিঠা পুকুরের জল আনিতে যাইত। এখন সমস্ত মিঠা পুষ্করিণীর জল নল খাগ্‌ড়ার বনে পূর্ণ হইয়া অপানীয় ও দূষিত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়া দেশের

লোককে উৎসন্ন দিতেছে। সকলেই সহরে আসিতেছেন আর পল্লিগ্রামগুলি নানা রোগের জন্মভূমি হইতেছে।

গুজরাতের চতুর্থ দৃশ্য—পল্লীগুলি—বঙ্গবাসীর চক্ষে এক অভিনব ব্যাপার। পল্লীগুলিতে প্রাচীন সনাতন প্রথা এখনও বিদ্যমান। পল্লীতে এখনও পঞ্চায়িত নির্ব্বাচিত হয়, তাহার হস্তে পল্লী শাসনের কিছু ক্ষমতাও থাকে। এই পঞ্চায়িত এ দেশী ভাষায় পটেল। মেথর, ধোবা, নাপিত ইত্যাদি সে নিযুক্ত করে; তাহাদের বেতনাদি ও গ্রাম সংস্কারের জন্য প্রতি গ্রামে একটী অর্থভাণ্ডার থাকে। পল্লীগ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয় ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে পড়ান—কেবলমাত্র মাসে একদিন প্রতি বাড়ী হইতে এক মুষ্টি চাল ডাল সংগ্রহ করেন।

গুজরাতের পঞ্চম দৃশ্য—গুজরাতের তীর্থগুলি। মঠের কর্ত্তা বা তীর্থের মোহান্তগুলির অখণ্ড প্রতাপ। গুজরাতির অন্ধ ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাহার একমাত্র কারণ। এদেশে মোহান্তেরা ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিলেও হয়।

গুজরাতের ষষ্ঠ দৃশ্য,—আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে অর্থ দত্ত-শোকার্থীগণের আগমন; তাহারা আসিয়া তালে তালে চীৎকার করিয়া ও ঘন ঘন বুক চাপড়াইয়া দিক্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া যায়।

গুজরাতের সপ্তম দৃশ্য—অসংখ্য বর্ণবিভাগ; যেমন ৮৪ রকম ব্রাহ্মণ, ৩৬ রকম ক্ষত্রিয় ১২ রকম শূদ্র ৪৬ রকম বেনিয়া—ইহার মধ্যেও আবার শাখা প্রশাখা আছে। এই বর্ণের নাম, নাথ। নাথশ্রেণীর মধ্যেও পরস্পর আচার ব্যবহার বিবাহ সম্বন্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রচলিত নাই। যেমন খেরা ব্রাহ্মণ নাথের জল নাগর ব্রাহ্মণ নাথের লোকেরা পান করিবে না। বর্ণ বৈষম্যের এতদ্‌অপেক্ষা—"লঘুতর" সমস্যা জগতের কোন জাতির মধ্যে আছে কি না সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

ইয়োরপে সাহিত্য।

অতি অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গ সাহিত্য যেরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তবে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডার যতই বৃদ্ধি হউকনা কেন তন্মধ্যস্থ স্তূপীকৃত বিস্তর আবর্জ্জনা রাশি সত্বেও ইহার গহ্বরদেশ এখনও বহু পরিমাণে শূন্য, এবং এই শূন্যতা পূরণের জন্য বহু রত্ন সংগ্রহের আবশ্যক।—কিন্তু ইয়োরপের সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ শূন্যতা অপবাদ মোটেই খাটে না। সেখানে রাশি রাশি গ্রন্থ, ম্যাগ্যাজিন, সংবাদ পত্র জলপ্রবাহ বেগে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া ছুটিয়াছে। তবুত হাহাকারের বিরাম নাই! তফাৎ এই আমরা কাঁদি—অভাবে, তাহারা কাঁদিতেছে আধিক্যে। মানুষের কিছুতে দেখিতেছি সুখ শান্ত নাই। বন্যাকার সাহিত্য মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া একজন ফরাসী লেখক (Anatole France) যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলে মনে হয়—তাঁহার মতে, দ্বিতীয় ওমার

ওদেশের প্রধান প্রধান পুস্তকাগারগুলি সব যদি অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলে তবেই দেশের মঙ্গল। তিনি বলিতেছেন,—

"পুঁথির পুঞ্জ আমাদের গ্রাস করিতে বসিয়াছে, আমি তাহাদের খুবই ভালবাসি কিন্তু বলিতে কি তাহাদের ভারে আমরা চাপে পড়িয়া মরিতেছি। তাহারা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে গণনা করা দুঃসাধ্য—এত রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে মনে করিলে, থতমত খাইতে হয়। সে কালের লোকদের বইপড়া অভ্যাস ছিলনা—তাঁরা কাজের লোক ছিলেন, ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন, কেন না বর্ব্বর অবস্থা হইতে তখন তাঁহারা সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এইরূপ বিনা গ্রন্থে হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অথচ তখন তাঁহাদের কবিত্ব ছিল, ধর্ম্ম ছিল—সৌন্দর্য্য বোধ ছিল—কবিতা গান এ সমস্ত তাঁহাদের মুখাগ্রে ছিল। দিদিমাদের কাছে সরস গল্প শুনিতে শুনিতে তাঁহারা কল্পনা ছাড়িয়া দিতেন।"

"সে কাল আর এ কাল! এখন এ বিষয়ে আমাদের কি বিষম উন্নতি হইয়াছে! ১৬ হইতে ১৮ শতাব্দী পর্য্যন্ত পুস্তক সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজিকার কালে পুস্তকের যেন অন্ত নাই। একমাত্র প্যারী নগরীতেই প্রতিদিন ৫০ খানি করিয়া গ্রন্থ বাহির হইতেছে—তাছাড়া সংবাদ পত্রের ত কথাই নাই। কি প্রকাণ্ড কাণ্ড! শেষে আমাদের ক্ষেপাইয়া তুলিবে। আর একটু রশ্মি সংযত করা কি প্রার্থনীয় নহে? বই পড় ক্ষতি নাই কিন্তু ভাল বই বাছিয়া পড়—আমার উপদেশ এই,—তাহা ভিন্ন আর কিছু নয়।"

তিনি আরো বলিতেছেন,

"একদল সাহিত্যব্যবসায়ী উঠিয়াছে তাহাদের মত এই যে ঐতিহাসিক উপকরণ কাগজ পত্র যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই আগে ছাপান হউক—সে সমস্ত সংগ্রহ করিবার পর ইতিহাস লেখা সুরু কর। তাঁদের কথামত কাজ করিতে গেলে দু তিন শত বৎসর চলিয়া যায়। প্যারীর ম্যুনিসিপাল সভা এইরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব লেখা সকল ছাপাইবার আদেশ দিয়াছেন এবং সেই কাজ এক্ষণে বিলক্ষণ দ্রুতবেগে চলিতেছে। মঁস্যো তুর্ণো এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সে কার্য্যভার এরূপ গুরুতর যে তাহাতে পূর্ব্বকার শ্রমশীল মঙ্কেরাও হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন সন্দেহ নাই। যাহা হইতেছে খুবই ভাল। কিন্তু আর সমস্ত বিষয় রাখিয়া শুধু ফরাসা বিপ্লবের বিষয় ভাবিয়া দেখ। যখন দেখি যে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র যাহা ইতি মধ্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৫০০০০ এবং যাহা এখনো ছাপানো হয় নাই তাহা আরো অধিক সংখ্যক, তখন ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমরা যে কখনও আয়ত্ত করিতে পারিব সে আশা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই কথা হইতে একটী গল্প মনে পড়িল তাহা তোমাদের বলি :—

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জেব শিষ্য পারস্য যুবরাজ যখন সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন তখন তিনি রাজ্যের সমস্ত মৌলবীদিগের ডাকাইয়া বলিলেন,—

"গুরুজি জেব আমায় এই উপদেশ দিয়াছেন যে রাজা যদি অতীতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন তবে রাজ্যে

সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়,—নহিলে তাঁহাদের নানা ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়া অশেষ দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু আমি এই পৃথিবীর জনপদের ইতিহাস শিখিতে ইচ্ছা করি। তোমরা এই সার্ব্বজনীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া আমাকে জানাইতে চাও। সেই ইতিহাস যাহাতে সর্ব্বাবয়ব সম্পূর্ণ হয় তাহাতে তোমাদের যত্নের যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয় এই আমার আদেশ।”

পণ্ডিতেরা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজদরবার হইতে বিদায় লইলেন। সেখান হইতে গৃহে ফিরিয়াই প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ৩০ বৎসর পরে তাঁহারা পুনরায় রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে দ্বাদশ উষ্ট্র গ্রন্থভার বহন করিয়া চলিয়াছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ৫০০ পুস্তক। সভাপণ্ডিত রাজসিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রাজাকে অভিবাদন পুরঃসর নিবেদন করিলেন --

“মহারাজ আপনার আজ্ঞানুসারে মৌলবীগণ যে সার্ব্বজনিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা মহারাজের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে তাঁহারা সমাগত। এই বিরাট পুস্তক ৬০০০ খণ্ডে বিভক্ত—লোকাচার, রাজনীতি, শাসন তন্ত্র, মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক তাহা সকলি সংগ্রহ করিতে আমরা কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। প্রাচীন ইতিহাস যত পাওয়া যায় তাহার মধ্যে সকলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ভূগোল, খগোল, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করিবার জন্য যত প্রকার টিপ্পনী আবশ্যক তাহা দেওয়া আছে। সূচী অনুক্রমণিকাই এত বিস্তৃত যে তাহাদের বোঝাই দুই উষ্ট্র বহন করিয়া আনিতেছে।”

রাজা উত্তর করিলেন—

তোমরা যে এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই আজ্ঞা পালন করিয়াছ তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি কিন্তু এক্ষণে আমার হাতে রাজকার্য্য বিস্তর; আর তোমরা এত বৎসর ধরিয়া যে লেখা সংগ্রহ করিয়াছ তাহাতে আমার বয়সও বাড়িয়া গিয়াছে। আমি এক্ষণে মধ্যবয়স উত্তীর্ণ করিয়াছি, এই সুদীর্ঘ ইতিহাস পড়িয়া শেষ করিতে না করিতেই আমার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। অতএব আমার অনুরোধ এই যে, ইহার সংক্ষিপ্তসার লিখিয়া আমার কাছে লইয়া আসিবে, তবেই আমি আমার জীবদ্দশায় তাহা পড়িয়া উঠিতে পারিব।”

পারস্যের মৌলবীগণ ২০ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্য করিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া ১৫০০ গ্রন্থাবলী রাজার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিলেন!

তাঁহাদের অগ্রণী কাজী সাহেব অগ্রসর হইয়া বলিলেন, মহারাজ এই আমাদের নূতন রচনা দর্শন করুন। ইহার মধ্যে সার্ব্বজনিক ইতিহাসের সারকথা সমস্তই রক্ষিত হইয়াছে।

রাজা কহিলেন,

তুমি যাহা বলিতেছ সকলি সত্য কিন্তু আমার পড়িবার অবকাশ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এই বয়সে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া উঠিতে পারিব না। আরো সংক্ষেপ করিয়া আন, বিলম্ব করিও না।

তাঁহারা আর অধিক বিলম্ব না করিয়া ১০ বৎসর পরে পুনরায় রাজদরবারে উপস্থিত

হইলেন। পুস্তকখানি ৫০০ কাণ্ডে বিরচিত, একটী উটের বোঝা মাত্র।

কাজি নিবেদন করিলেন "মহারাজ যেমন অনুমতি করিয়াছেন আমরা তেমনি সংক্ষেপে সারিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

রাজা—"সত্য বটে কিন্তু আমি যেমন চাই তেমনটি হয় নাই। এখন আমি আমার জীবনের শেষ দশায় পৌঁছিয়াছি। তোমরা যদি চাও যে আমি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে পারিয়া তদনুসারে কাজ করি, তাহা হইলে আরো ছাঁটিয়া সংক্ষেপ করিয়া আনিতে হইবে।"

পাঁচ বৎসর পরে কাজী সাহেব পুনরায় রাজপ্রাসাদে আসিয়া হাজির। এক যষ্টির উপর ভর দিয়া একটি গাধার রাসরজ্জু ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। গাধার পীঠে মহাভারতের মত একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক।

মন্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন—কাজি সাহেব একটু তাড়া করুন মহারাজ মৃত্যু শয্যায় কাতর আছেন।

সত্য সত্যই রাজা মৃত্যু শয্যায় শয়ান। তিনি সেই গ্রন্থের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "পৃথিবীর ইতিহাস না দেখিয়াই আমি পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলাম।" কাজিও সেই সময় রাজার ন্যায় মুমূর্ষুভাবাপন্ন। বলিলেন, "আমি তিন কথায় পৃথিবীর ইতিবৃত্ত নিবেদন করি মহারাজ শ্রবণ করুন।"

রাজা—বল আমি শুনিয়া বিদায় হই।

কাজী—

১ জন্ম। ২ সুখদুঃখ ভোগ। ৩ মৃত্যু ও পরলোক যাত্রা।

আমি সংক্ষেপে মনুষ্য জীবনের সমুদায় ব্যাপার মহারাজের কর্ণগোচর করিলাম।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক অনুমতি করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরেই সুখনিদ্রায় দেহত্যাগ করিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রহ্মপুত্রে উমানন্দ

অবিশ্রান্ত ধারাবাহী বর্ষা মাথায় করিয়া বিগত ১৩১৫ সনের ১২ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় কর্ম্মস্থল শিলং রওয়ানা হই। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হিলসেক্‌সনের অপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ও চতুর্দ্দিকের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য সন্দর্শনের সুযোগ হইবে বলিয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টিমারে চাঁদপুর আসি। বদরপুর ছাড়াইয়া আসিলেই 'হিল সেক্‌সনে উপস্থিত হইতে হয়। এসব স্থানে পাহাড়ের গা' দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রেল চলিয়াছে,—দুই দিকে পর্ব্বতশ্রেণী বিশাল নগ্নদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল হইতে পৃথিবীর এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল শ্যামায়মান স্নিগ্ধদর্শন বৃক্ষবহুল পাহাড়ের গাত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীগুলি উদ্‌ভ্রান্ত

মধুরিমাময়ী চঞ্চলা বালিকার মত সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া হেলিয়া দুলিয়া আপন মনে চলিয়াছে। বৃষ্টিপাতেই তাহারা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে কল গান গাহিয়া বনভূমি মুখরিত করিতে করিতে আপনাদের সজীবতা নিবেদন করে। কোনও স্থানে নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত শাল্মলী বৃক্ষে বসিয়া কলকণ্ঠ বিহগকুল তাহাদের সুললিত গীতধ্বনিতে সেস্থান নিয়ত মুখরিত করিতেছে। সে গান কত মধুর ও ভাবোদ্দীপক!

বদরপুর ছাড়িয়াই আমরা ১নং টানেল (সুরঙ্গে) প্রবেশ করি। রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্যই বড় বড় পাহাড়ের ভিতর বহু অর্থব্যয়ে ও সুকৌশলে ডিনামাইট দ্বারা পাথর ও মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই সুরঙ্গগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুরঙ্গের ভিতর গাড়ি প্রবেশ করিলে কিছুই দেখা যায় না, কেবলি পুঞ্জীভূত অন্ধকার! তখন মনে হয় আমরা কোন পাতালপুরীতে আসিয়াছি, আর বুঝি আলো দেখিতে পাইব না। পূর্ব্বে কখনও টানেল দেখি নাই, এই রেলপথে ৩২টী টানেল। মাহুর টানেল সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ইহার ভিতর দিয়া গাড়ী বাহিরে আসিতে দুই মিনিট লাগে। দুপুর ১-৩৯ মিনিটের সময় এই সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়া ১-৪১ মিনিটের সময় বাহির হইয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার সময় লামডিংএ গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি ২টার কিছু পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলের প্রধান হিন্দুতীর্থ গৌহাটিতে পৌঁছিলাম। সে সময়ে খুব বৃষ্টি হইতেছিল। মেল টোঙ্গায় স্থান হইল না বলিয়া সে রাত্রে শিলং যাওয়া বন্ধ হইল। এবং পূর্ব্ব হইতে টোঙ্গা কি মোটরে স্থান রিজার্ভ করি নাই বলিয়া পরদিনও গোহাটিতেই অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে আমি ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে অবস্থিত 'উমানন্দ' দর্শনে রওয়ানা হইলাম। কতকাল হইতে উমানন্দ-মন্দির ব্রহ্মপুত্রের স্রোতমুখে পাহাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া আছে কে বলিবে? এমন সুন্দর সুমোহন দৃশ্য সংসারে দুর্লভ! ব্রহ্মপুত্রের স্রোতমুখে তিনটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম কর্ম্মনাশা, উর্ব্বশী ও উমানন্দ। কোন হিন্দুই ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া কর্ম্মনাশার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না। তাহাদের বিশ্বাস, ভুলেও যদি কেহ স্নানান্তে কর্ম্ম-নাশা দর্শন করে, তবে তাহাদের সেদিনের কোন কোন কার্য্যই সুফলপ্রসূ হইবে না। পুরাণে কথিত আছে, মহাদেবের কপালের বিভূতি হইতে উমানন্দের উৎপত্তি। জনশ্রুতি এই, শান্তিনিকেতনে শিব "যোগিনী-তন্ত্র" অর্থাৎ আসামের ইতিহাস উমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। উমানন্দের দিকে চাহিলে মনে হয়, কোমল-কঠোরে মিশ্রিত এই পাষাণ দেবমূর্ত্তি প্রকৃতি মায়ের স্নেহাঞ্চলে ঢাকা তাহার মন্দিরের সুষমাময় পবিত্র চিত্রখানিকে অনাদিকাল হইতে মূর্ত্তিমতী ভক্তির ধারায় হিন্দুর প্রাণ অভিসিঞ্চিত করিতেছে। প্রকৃতি দেবীর স্বহস্ত সজ্জিত এই দেবমন্দির—অদূরে হিন্দুর গৌরব-মহিমাময়ী সতীর প্রিয়-ভূমি বিখ্যাত কামাখ্যা শৈল, আর পুণ্য পাদমূলে প্রবাহিত অমোঘা-গর্ভ-সম্ভূত ব্রহ্মপুত্র নদ—এ সব পবিত্র দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নয়।

ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়া সুন্দর ষ্ট্রাণ্ড রোড চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্বদিকে

কিছু অগ্রসর হইয়া নদের চড়ায় নামিয়া ষ্টিমার ষ্টেসনের দিকে নৌকার অনুসন্ধানে চলিলাম। শুনিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে পদব্রজেই যাত্রীরা উমানন্দ পাহাড়ে যাইত, এখন বর্ষার প্রারম্ভ বলিয়া স্রোতের জল অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই নৌকা না হইলে আর পাহাড়ে যাওয়া যায় না। ষ্টীমার ঘাটে নৌকা ভাড়া করিতে অসমর্থ হইয়া পাহাড়ের বিপরীত দিকে খেয়ার প্রতীক্ষায় উৎসুক চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

উমানন্দমন্দির।

এই সময় পর পার হইতে একখানা ডিঙ্গি নৌকা চারিটি লোক সহ আমার নিকটে আসিল! আমি তাহাতে চড়িয়া লইলাম।

অল্পক্ষণেই তরঙ্গায়িত খরস্রোত নৌকাখানিতে দ্রুতবেগে পাহাড়ের পাদদেশে আনিয়া ফেলিল। স্রোতে নৌকাখানিকে ভাটির দিকে লইয়া যাইবে ভয়ে মাঝি নৌকার অর্দ্ধেকখানি টানিয়া চড়ার উপর রাখিয়া দিল। আমি জুতা, ছাতা নৌকাতেই রাখিয়া মাঝির সহিত তীরে

অবতরণ করিলাম এবং সিঁড়ি বাহিয়া উমানন্দ পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির দুই ধারে পাহাড়ের গায় স্থানে স্থানে সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত খোদাই হিন্দুদেবদেবী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মপুত্র চুম্বিত শৈলমালার দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কথঞ্চিৎ শ্রান্তদেহে আমরা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একজন পুরোহিত প্রভু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দূর হইতে পাহাড়ের শীর্ষভাগে জাহাজের মাস্তুলের মত একটা উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে আসিয়া দেখিলাম এই বিশাল স্তম্ভের উপর গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফের তার দুই দিকে সংযুক্ত রহিয়াছে। নগ্নদেহ পুরোহিত প্রভুর সঙ্গে আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। বর্ত্তমান মন্দিরের অধিকাংশই ইট দিয়া গ্রথিত। চারিদিকের ভগ্ন প্রস্তর দেখিয়া মনে হয় এই মন্দির পূর্ব্বে প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। সম্ভবতঃ গদাধর সিংহের রাজত্বের সময় প্রাচীন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের কারুকার্য্য খুব উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। মন্দিরের পুরোভাগে একটী নাটমন্দির আছে। সেখানে প্রবেশ করিয়া প্রতিনিধি শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এ সময়ে পাণ্ডা ঠাকুর 'বাবা উমানন্দ' দর্শনে 'দর্শনীর' চুক্তি প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, "কাঞ্চনমুদ্রার অভাবে রজতমুদ্রা না হইলে মন্দির গর্ভস্থ ভৈরবদর্শন সম্ভবপর নয়।"

এস্থলে কামাখ্যার হিন্দুমন্দির সংরক্ষিণী সভার (যদি উপরোক্ত নামে কোনও সভাসমিতি থাকে) সভ্যদিগকে আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা পাণ্ডা প্রভুদের অন্যায় আক্রমণ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটা উপায় করুন। যাহা হউক, পুরোহিতের জ্বালাতন অসহ্য হইলেও সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ রূপে তাহা সহ্য করিয়া লইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া মন্দিরস্থ গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের এই অংশ ব্রহ্মপুত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। মন্দিরগর্ভ অন্ধকারময়; সেই গুহাস্থ ভীষণ আঁধারের ভিতর একটি ক্ষুদ্র ঘৃতপাত্রে দীপ শিখা আলোক বিতরণ করিতেছে, এখানে লিঙ্গরূপী উমানন্দ ভৈরব জল হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত। জগতের কারণ এই স্নিগ্ধ ও বিরাট মূর্ত্তি দেখিলে ভয় ও ভক্তিতে মস্তক আপনা আপনি অবনত হইয়া আসে। আমরা ভূমিতে লুটাইয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

সহসা শিবের ডানদিকে কিসের একটা ফোঁ ফোঁ শব্দ শুনিতে পাইলাম। প্রশ্ন করিলে পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন, "ইহা সাপের ডাক।" উমানন্দের সেই সৌম্য দিব্যমূর্ত্তি দর্শনের পর পুনরায় আমরা নৌকারোহণে সন্নিকটস্থ "উর্ব্বশীকুণ্ডে" অবতরণ করিলাম। কথিত আছে, এই কুণ্ডে স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী স্নান করিয়াছিলেন। এখন আর সেই কুণ্ড অথবা কুণ্ডের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বর্ষাগমে উর্ব্বশীকুণ্ড জলে ডুবিয়া যায়। ষ্টীমার রক্ষা করিবার জন্য এই মগ্নশৈলের উপর একটী স্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছে। এইখানে নানা দেবদেবীর ও বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ দুই একটী মূর্ত্তিও দেখিতে পাইলাম। পদ্মাসনে উপবিষ্ট

সে মূর্ত্তির নয়নে ও অধরে স্নিগ্ধ প্রশান্তভাব বিরাজমান। তথায় শিলার উপর শুইয়া একবার ভৈরব উমানন্দের মন্দির ও আর একবার কামাখ্যা পাহাড়ের নীরব সৌন্দর্য্যের দিকে পুনঃ পুনঃ সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিলাম। ব্রহ্মপুত্রস্থিত উর্ব্বশী-কুণ্ডের শিলাতলে শুইয়া স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়া যে সুখ ও আনন্দ হয়, তাহা মানব-ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ক্ষণকালের জন্ত এই বিশাল সৌন্দর্য্যের রাজ্যে আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিলাম। তখন কে যেন বলিয়া গেল, 'এই সৌন্দর্য্যের চির-উপাসনাই ব্রহ্মভক্তি। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি কেহ কখনও করিয়াছে কি ?

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পোষ্যপুত্র।

৪০

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ দুর্গ প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান সকল খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখা হইয়া গেলে চারদিনের দিন বীরেশ্বর নীরদকে মুক্তি দিয়া বলিল "এবার ফেরা যেতে পারে, আর তোমায় ধরে রাখবো না।" শুনিয়া নীরদ যেমন উচিত ছিল সে পরিমাণে খুসী হইতে তো পারিলই না বরং একটু যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল ? কোথায় যাইবে সে ? স্থিতিতে তাহার শান্তি কোথায় ?

সন্ধ্যার সময় আকাশের বিচিত্র শোভা যমুনার বক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। কূলে কূলে পরিপূর্ণা নদী সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বক্ষমগ্ন গগনছবি আনন্দে নাচাইতেছিলেন। মৃদুমন্দ বাতাসে জল পুলককম্পিত ও মৃদুতরঙ্গিত হইয়া অন্তর্জগতে ও বহির্জ্জগতে অলক্ষ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছিল। নদীবক্ষে একখানি নৌকা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া ধীবর গাহিতেছিল "দিন চলিয়া গিয়াছে সম্মুখে গভীর রজনী সমাগত যাত্রীর দল চলিয়া গেল। এখনও ওরে মূঢ়! ওরে ভ্রান্ত! পশ্চাতে ফিরিয়া কাহার পানে চাহিতেছিস ?" নীরদ তাহাদের অল্পদিনের বাসাটির একতল বারান্দায় একা দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল। যে চলিয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গ তো একদিনও তাহার ইপ্সিত প্রার্থিত ছিল না ? হায়! তবু ত সে অভাগিনী তাহারি প্রতীক্ষার অবশেষে ম্লান বিশুষ্ক হইয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছে! শুধু যদি নীরদ দুদিন আগে আসিত! তবে এখন আর কেন তাহার অনুসরণে ছুটিয়া ফিরা ? না কিছু প্রয়োজন নাই, যা ছিল না তা নাইবা থাকিল! লঘুচিত্তে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত সে তাহার স্বহস্তরচিত কানন পাদপছায়ায় নিঃসঙ্কোচে ফিরিয়া যাইবে। কোনও লজ্জা আর তাহাকে পীড়িত করিবে না, অলক্ষ্য উপহাস বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া হৃদয়ের নিভৃতপ্রান্ত হইতে আকর্ণ কপোল রঞ্জিত করিয়া তুলিবে না, জগতের একটিমাত্র প্রাণী ভিন্ন এতবড় একটা কলঙ্কের কাহিনী, কাপুরুষতার ইতিহাস জগৎ হইতে চিরবিস্মৃতির

সমাধিগর্ব্ভে লীন হইয়া গেল, উঃ কি মুক্তি দিলে তুমি শিবানী! নীরদ উর্দ্ধনেত্রে আকাশে চাহিয়া কাহার উদ্দেশে যেন তাহার কৃতজ্ঞতা প্রেরণ করিল।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন চিত্তের লঘুতা একেবারে লঘুতর হইয়া ক্রমে শূন্য হইয়া আসিল। সে যে তাহাকে বিদায় দিল তবে কাহাকে সেখানে স্থাপন করিবে? এত দিন তো তাহার স্মৃতিও কষাঘাতের মতনই যন্ত্রণার ছিল। ইহাকে তো সে দূরে ঠেলিয়াই ফেলিতে গিয়াছে; কখনও ত করুণা কটাক্ষে কাছে টানিয়া লয় নাই! আজ কি ইন্দ্রজাল মায়ায় সেই অনাদৃত মূর্ত্তি তাহার গোপন সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশ করিয়া শত প্রলোভনে তাহারই দিকে সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। আজ সংযমসংযত চিত্তের শতচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মনের ভিতর পুঞ্জীকৃত অনুশোচনা তীক্ষ্ণ ছোরার মতন বিঁধিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছে, সব বৃথা! সব শূন্য! বৃথা এতদিন নষ্ট করিলি, চিরদিনই নষ্ট করিলি!" সত্যই সে চিরদিনই নিজের সম্বন্ধে নিজে অন্ধ, কোনদিনই আপনাকে চিনিল না।

আজ রাজরাজেন্দ্রাণীর মহিমায় সেই সংযতবাক্ রুদ্ধপ্রকৃতি দীনহীনা বালিকা তাহার নিজের অধিকার মধ্যে সগর্ব্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আর তাহার সেই কৃষ্ণ তারকোজ্জ্বল বিশাল চক্ষে ভিক্ষার আবেদন নাই, মৌন দৃঢবদ্ধ অধর প্রান্তে, নিবিড় ছায়া ফেলিয়া অভিমানের হতাশা স্থির হইয়া দাঁড়ায় নাই, দীপ্তিময়ী রমণী তাহার আলোকপ্রদীপ্ত অথচ স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া নিজের পরিপূর্ণ গৌরবে পত্নীর আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। কোথাও যেন তাহার কোন একটু অসম্পূর্ণতা নাই। নীরদের সর্ব্বশরীর পুলকে বিস্ময়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল, মুদিতনেত্রে স্তম্ভিতবক্ষে স্বপ্নাভিভূতের মত সে আপনা আপনি বলিল "এসো তুমি! সতী! পুণ্যবতী! সহধর্ম্মিণী! হৃদয় আসনে অধিষ্ঠিত হও।"

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিবার সময় নীরদ বলিল, "এসো বেনারসের টিকিট কিনি"। বীরেশ্বর হঠাৎ বিস্মিত হইল কহিল "কখন তোমার কি খেয়াল যাচ্চে! প্রথমে তো দিল্লী যেতেই নারাজ! এখন আবার ফিরতেই চাও না। তা যাহোক যাবেতো চলো আমার কোন আপত্তি নেই। কাশীতে আমার মাসিমা আছেন, সেখানে বেশ দুদিন থাকা যেতে পারবে! তাছাড়া যাচ্চিতো কটা দিন থেকে কংগ্রেসটাও দেখে আসা যাবে।" নীরদ জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ছুটী কদ্দিনের?" বীরেশ্বর কহিল "বোধ হয় চির-দিনেরি। আমার আর পোষাচ্চে না সেখানে, কলকেতায় ফিরে যদি কোথাও একটা সুবিধে করতে পারি তো আর নাবালকের মোসায়েবী করতে যাচ্চিনে।" টিকিট কাশীরই কেনা হইল। প্ল্যাটফর্ম্মে লোক বেশি ছিল না, দুজনে বেঞ্চে আসিয়া বসিলে নীরদ জিজ্ঞাসা করিল "কত পাও ওখানে?" বীরেশ্বর শালখানা ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া কাসির একটা পিল পকেট হইতে বাহির করিয়া মুখে দিয়া বলিল "তা মন্দ দেয় না। দেড়শো টাকা মাইনে তা ছাড়া বাড়ী" "তবে হঠাৎ ছাড়বে যে?" "কি

করি বলোনা, ও রকম হস্তিমূর্খ ছেলেকে পড়ানোর চেয়ে সপরিবারে না খেয়ে মরাও ভাল। তাকে আবার কিছু বলবারও যো নেই; একদিন রাজকুমারকে একটু ধমক দিয়ে ছিলুম অমনি দুদিক থেকে দু বেটা মোসাহেব ছুটে এসে তার মাথায় খানিকটা ফুলোন তেল থাবড়ে হাওয়া করতে আরম্ভ করলে। পাছে ধমক খেয়ে ছেলে মূর্চ্ছা যায়! শোন কথাটা! এখানেই শেষ না। বিকেলবেলা গিয়ে শুনলুম আমার ধমকে বাবুয়াজীর জিউ ঘবড়ে গেছে, আজ রাণীজী তাই তাকে পড়তে আসতে দিতে পার্কেন না। এই ত ব্যাপার! তুমিই বল না এমন চাকরী করা কি পোষায়?" ঘণ্টা পড়িল ও গাড়ী হুস হুস শব্দে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নীরদ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল "আমার স্কুলে কিন্তু পারিশ্রমিক কম! কি করে তাতে পোষাবে?" বীরেশ্বর সেন বর্ত্তাইয়া গেল, "আঃ তা হলে তো ভালই হয়, তুমি ত ৫০ টাকা দাও বলছিলে? তাতেই কোনরকমে চলে যাবে এখন। গিন্নিও কিছু তাঁর পৈতৃক ধন পেয়েছেন। সম্প্রতি বলচেন ব্যবসা করতে, তা তোমার সঙ্গে থাকি ত বিলিতি জিনিষ আর ব্যবহার কর্ব্বোনা তা বলেই রাখচি! আর গায়ত্রী সন্ধ্যোটন্ধ্যোও ক্রমে ক্রমে শিখবো এখন।" নীরদ আবেগের সহিত তাকে আলিঙ্গন করিল।

৪১

বর্ষার বাতাস হুহু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। মেঘে এখনও আকাশ ভরা। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টিরও যেন কয়দিন ধরিয়া বিরাম নাই। এক পা কাদা মাখিয়া ছাতা বা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া পথিকেরা পথে চলিতেছিল। রাস্তার ওপারে মুদির দোকানে বিলাতি কম্বল গায়ে বুড়া দোকানী, কারিগরকে বেগুনির জন্য ডাল ফেনাইতে উপদেশ দিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে থেলো হুকার কলাপাতার নলে টান দিতে দিতে খাঁচায় পোষা ময়নাটিকে সীতারাম 'বুলি শিক্ষা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। শীতে ও বাদলায় পক্ষীশিশু একেবারে অস্ফুটবাক হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গলিপথ,—দু একখানা গোরুর গাড়ি কেরোসিনের টিন বোঝাই লইয়া বলাইচন্দ্র শীলের আড়তের দিকে অত্যন্ত অনিচ্ছুক মন্থর গমনে চলিয়াছে; তাহাদেরি চক্রমথিত কর্দ্দমে পাশের ইষ্টক প্রাচীরগুলা চিত্র বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল!

সেই অপ্রশস্ত পথের ধারের ক্ষুদ্র একখানা বাড়ির মধ্যে রাস্তার ধারের একটি একতল ক্ষুদ্র গৃহের খোলা জানালার নিকট বসিয়া একটি রমণী সেলাই করিতেছিল। ঘরখানি ক্ষুদ্র, ঘরের আসবাব পত্রও তেমনি সামান্য,—দেখিলে দরিদ্রের গৃহ বলিয়াই মনে হয়।

রমণী কোলের উপর সেলাইটা রাখিয়া কিছুক্ষণ কার্য্য করিতেছে আবার অল্পপরেই যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জানলার বাহিরে রাস্তার দিকে চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, মধ্যে মধ্যে জানালার কপাটে পিঠ রাখিয়া চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ক্লান্তিদূর করিয়া লইতেছে।

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণজ্যোৎস্নার মত শীত রাত্রির কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন পাণ্ডুচন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণা এই অপরিচিতা নারীই যে শান্তি তাহা তাহাকে দেখিলে সহসা কেহই বিশ্বাস করিতে

পারে না। সুবিধা এইটুকু যে এখানে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে কোন একটি পরিচিত লোকের সহিত ইহার সাক্ষাৎ ছিলনা। তাহার স্বামী সেই যে তাহাকে তাহার সকল আশ্রয় সকল আনন্দ সকল গৌরব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্বামীত্বের সমস্ত দাবী পরিশোধ করিয়া দিয়াছে সেই পর্য্যন্তই এই নিরানন্দ নির্ব্বাসনে সে বন্দিনী। সেই পর্য্যন্তই জগতের সমস্ত আশা আনন্দের আলোক যেন তাহার সম্মুখ হইতে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পর গোধূলীর ম্লান আভাটুকু সন্ধ্যার শ্যামাঞ্চলে নিঃশেষে মিলাইয়া আসিবার পূর্ব্ব-ক্ষণে যেমন তাহা বিষণ্ণ কাতরতার সহিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া ধরণীর পানে চাহিয়া দেখে, বিগত দিবসের সুখস্মৃতির পানে শান্তিরও বর্ত্তমান জীবন তেমনিই যেন অবসানোন্মুখ ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এই পথ দিয়া দিনের মধ্যে একটিবার করিয়া লালপাগড়ীপরা ডাকের পিয়ন স্কন্ধবিলম্বিত চামড়ার ব্যাগ দুলাইয়া 'চিঠি আছে' হাঁক দিয়া দু একটা দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় এবং চিঠি বিলি করিতে করিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায়। দূর হইতে যতোই সে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে শান্তির আশাউদ্বেলিত বক্ষ ততই যেন স্থির হইয়া আইসে। অবশেষে সে যখন তাহার দ্বার অতিক্রম করিয়া সম্মুখস্থ আম বাগানের জুলী পথ ধরিয়া দত্ত বাবুদের বাগান বাড়ির অভি-মুখে চলিয়া যায় তখন তাহার অশ্রুজল বন্ধন-মুক্ত জলস্রোতের মতনই অদম্য হইয়া উঠে।

সেদিন সে রাস্তায় আর লাল পাগড়ী দেখা গেল না, শীতের বাতাসে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল, আলস্যে সমস্ত শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি লৌহাকৃষ্ট চুম্বকের ন্যায় সেই রাঙ্গাপাগড়ীধারী চামড়া ব্যাগস্কন্ধ পিয়নের আকর্ষণে জানালা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছিলনা। ক্লান্ত মস্তক জানালার কবাটের উপর রক্ষা করিয়া অদূরস্থ বৃহৎ অট্টালিকার শ্বেত প্রাচীরের দিকে তাকাইয়া ছিল।

সেও একদিন ঐ অমনি বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিত। এই রকমই আমগাছের ছায়ায় মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘিকার সান বাঁধান ঘাট পাখীদের মধুর সঙ্গীতে ও পুরবাসিনী নারী-গণের হাস্য কলরবে মুখরিত হইয়া থাকিত। যখন অদূরের কোন দেবালয় হইতে সন্ধ্যারতির কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে তখন তাহার মনের মধ্যে ব্যাকুলতা আরও যেন উদ্দামভাবে জাগিয়া উঠে। দুই চোখের জলধারার অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে সেই এক পরিচিত মন্দিরের পরিচিত মূর্ত্তিটি মনে পড়িয়া যায়। হয়তো এতক্ষণে সেখানেও এমনি করিয়া কাঁশর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি প্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকিত মন্দিরের মৃদুগন্ধ সৌরভরাশির মধ্যে দেবপ্রতিমার সমস্ত দৃশ্যটা মনের ভিতরে একখানা ছবির মতন স্পষ্ট হইয়া উঠে। সবি যেন তেমনি আছে শুধু সে নাই! শ্যামাকান্ত সেই যে নববধূর হলুদে সূতা বাঁধা হাতখানি ধরিয়া আনিয়া সর্ব্বপ্রথম দিনেই শ্যামসুন্দরের নিকটে দাঁড় করাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন "হরি! আমার মা তোমায় স্থাপন করে গেছলেন এই দেখ, আবার তিনি

তোমার কাছেই এসেছেন।” শ্যামার দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন “দেখছিস মা পাষাণি! এই দেখ মাতৃহীন আবার মা পেয়েছে। তুইতো ভাল করে আদর করলিনে শুধুই কাঁদালি—তাই আবার নিজের মাকে খুঁজে আনলুম।” তাহার অধিকৃত স্থানটি আজ কেবল শূন্য আর সবি তেমনি আছে। পাষাণ প্রতিমা তেমনি হাস্যভরা, মন্দিরকক্ষের শুষ্ক বায়ু তেমনি সুরভি স্নাত, সাধক পুরোহিত ও দর্শকগণ তেমনিই ভক্তি বিহ্বল। এইরূপে দিনে নিশীথে—তাহার শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ীর কত কথা, কত আদরযত্ন অবিরামই মনে জাগিয়া ওঠে!

সহসা রাস্তার গমনশীল পথিক জনের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি বিরক্তি সূচক শব্দ করিয়া উঠিল “আঃ পিছল দেখ! মিউনিসিপালিটী এখানের কি ঘুমুচ্চে? রাস্তা, ঘাটের এমন অবস্থা!”

পরিচিত স্বর! শান্তি চমকিয়া মুখ তুলিল, পথিকযুবকের প্রতি চোক পড়িতেই সে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল “মিঃ রায়।” পথিকও শব্দানুসরণ করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল, স্বপ্নপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল “রজনীবাবুর মেয়ে না?” অনেক দিন পরে শান্তির পাণ্ডুমুখখানা একটু খানি লাল হইয়া উঠিল, ঈষৎ ম্লানহাসি হাসিয়া সে বলিল, “চিনতে পারচেন না মিষ্টার রায়?” “না পারলে কি কথা কইতে সাহস কর্ত্তেম? কিন্তু একি আশ্চর্য্য সাক্ষাৎ শান্তি! কাদের বাড়ি এ?”

শান্তি উত্তর দিল না, তাহার সব টুকু শক্তিই যেন নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখের অস্বাভাবিক বিবর্ণতা দেখিয়া নীরদকুমার ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল “আমি কি বাড়ির মধ্যে যেতে পারি? কেউ আপত্তি কর্ব্বেন না তো?”

শান্তি উঠিয়া কম্পিত স্বরে “আসুন না” বলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নীরদ দুএক কথার পর ব্যাপারটা মোটের উপর এক রকম বুঝিয়া লইল। যে কারণেই হোক হেমেন্দ্র তাহার পিতা ও শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া শান্তিকে তাঁহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছে—এই অপরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র আবাসই এখন শান্তির গৃহ,—তাহা বুঝিতে নীরদের বিলম্ব হইল না। সহসা ঈষৎ তীব্রভাবে সে বলিয়া ফেলিল “এমন নিকৃষ্ট লোকের হাতে তুমি পড়েছ শান্তি, কি ভয়ানক! বলিতে বলিতে শান্তির আহতভাবে লজ্জা পাইয়া হঠাৎ থামিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করিল;—“সংসারে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহাও শিখিলাম না।”

নীরদ অত্যন্ত আহতভাবে কাতর হইয়া কহিল “আমায় কিছু লুকিও না। সব কথা খুলে বলো, মনে করো আমি তোমার বড় ভাই, তোমার দাদা আমি, তেমনি বিশ্বাস করে সব আমায় বলো। কেন তোমরা লক্ষ্মীপুর থেকে চলে এলে? আর এলে যদি তবে এ অবস্থায় কেন? রজনীবাবুর মেয়ে তুমি, তুমি আজ এই অবস্থায়? উঃ কি রকম চেহারা হয়ে গেছে! এ সবের মানে কি?”

এই অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী স্নেহসম্ভাষণে শান্তির এতদিনকার অনাদৃত বেদনারাশি আবেগ তরঙ্গে উথলিয়া উঠিতে উদ্যত হইল,—সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। কতদিন যে এমনস্নেহের ভাষা সে শুনে নাই! মহুরার সেই বিদায় দৃশ্যের পর আজ এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মহৎ বন্ধন স্থাপন! এত কষ্টের মধ্যেও যেন তাহাকে অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল। সে চোখ মুছিয়া বলিল "সেখানে দিদি এসেছেন; তাই আমরা থাকতে পারিনি, চলে এসেছি।" বলিতে বলিতেই মুখ ফিরাইয়া লইল। নীরদ আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি? দিদি কে?" শান্তি অন্যদিকে ফিরিয়াই উত্তর দিল,—

"আপনি বুঝি জানেন না,—আমার মা; তিনি বৃন্দাবনে তাঁর ছেলেটিকে নিয়ে, থাকতেন আমরা গিয়ে তাঁকে এনেছি।" বজ্রপাতে স্তম্ভিত পথিকের মতন স্তব্ধ দৃষ্টি, বহুক্ষণ পরে ফিরাইয়া নীরদ গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল "কে এসেছে? বিনোদের স্ত্রী! সে বেঁচে আছে? সত্যি কথা?" তাঁহার ভাব দেখিয়া শান্তি বিস্ময়বোধ করিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিল "আছেন বই কি। তাঁর নাম শিবানী, তাঁর ছেলেটি কি রকম যে সুন্দর আর এমন শান্ত।"—নীরদ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল "বুঝেছি শান্তি। শিবানীর নাম নিয়ে কোন পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোক তোমাদের বিষয় অধিকার করতে এসেছে। সেতো বেঁচে নেই সে স্বর্গে। তাই হেম সহ্য করতে পারেনি রাগ করে চলে এসেছে। আচ্ছা আমি তার ষড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করে দিচ্চি দাঁড়াও—"

লজ্জায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া শান্তি আর্ত্তভাবে কহিয়া উঠিল "ও কথা বলবেন না, আপনি অমন কথা বলবেন না! ঐ একজন ভিন্ন কেউ এ কথা বলেনি। তিনি সতী লক্ষ্মী পুণ্যবতী তিনি আজন্ম দুঃখ পাচ্চেন, তার ওপরে এরকম অপবাদ দেওয়া মহা অধর্ম্ম! নিজে তো তিনি আসেনও নি, আর তার স্বামীর পরিচয়ও তিনি এতদিন জানতেন না। জ্যেঠা মশাই-ই প্রথমে আমার ভাসুরের সঙ্গে অমুর মিল দেখে কাঁদতে লাগলেন। তার পর তাঁর কাছে জ্যেঠাইমার একখানি ছবি ও আংটি ছিল তাই থেকে বোঝা গেল কে তাঁরা! সব্বাই বলে,—অমু ঠিক তার বাপের মত দেখতে।

নীরদকুমার শান্তির কথাগুলি স্থির হইয়া শুনিল। সত্যই এমন কিছু ত সে শুনে নাই যাহাতে সে মনে করিতে পারে,—নিশ্চয়ই শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে। কি ভয়ানক! সে তাহার সন্তানের মাকে এত দিন ঘৃণা তাচ্ছিল্য ভরে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহাকে নিজের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইয়া আবার একজনকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল? শান্তি যখন তাহাকে তাহার দিদির স্বামী বলিয়া জানিতে পারিবে! গভীর লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়া নীরদ মাথা হেঁট করিল। একটু পরে প্রশান্ত ভাবে কহিল,"হেম কোথায়?" ক্ষীণকণ্ঠে শান্তি উত্তর করিল "কি জানি"? "কখন আসা সম্ভব?" "তাও ঠিক নেই। আজও আসতে পারেন দুদিন দেরিও হতে পারে"। নীরদ বিস্মিত হইল,"এই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে একলা তোমায় ফেলে সে বাড়িও থাকেনা নাকি?" বিরক্তিতে তাহার চিত্ত

উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। "তোমার বাবার সঙ্গে বোধ হচ্চে সে ঝগড়া করেচে? নিশ্চয়ই তাই না?" অশ্রুজলে শান্তির দৃষ্টি লোপ পাইয়া আসিতেছিল। সে উত্তর দিল না। বিরক্ত, বিস্মিত, অনুতপ্ত নীরদ কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় বিদ্যুৎ হানিয়া কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। আকাশ ঘন মেঘে ছাইয়া আসিতেছে। নীরদ বিপন্নের মত খানিকক্ষণ জানালার ভিতর দিয়া বাহির আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল তারপর আবার শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিল—নিঃশব্দে উদাস দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। সেই অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাহার বক্ষে সজোরে আঘাত করিল। সেই শান্তি! সুন্দর চঞ্চল, আনন্দময় সংসার সুখোদ্যানের সেই ফুটন্ত সুবাসিত ফুলটি দেবতার পায়ের নির্ম্মাল্য টুকুরই মত পবিত্র! সংসারের এই সমরক্ষেত্রের আঘাত হইতে সেও রক্ষা পাইল না! কি বিচিত্র এই জগতের গতি।

সহসা নীরদ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা বাবা তো ভাল আছেন শান্তি? তাঁদের কাছে তো গেলেও হতো? তাঁরা কেন তোমায় এখানে থাকতে দিয়েছেন?"

আবার দমিত অশ্রু উথলিয়া উঠিতে চাহিল, জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া সে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

নীরদ একটুখানি উত্তরের অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া তারপর হঠাৎ মনে ঠিক করিয়া ফেলিল, মহৎপ্রকৃতির লোক রজনীনাথের সহিত তাহার লঘুপ্রকৃতির জামাতা হেমের বনিবনাও না হওয়া মোটেই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সমবেদনা ও আত্মগ্লানি মিশ্রিত করুণচক্ষে চাহিয়া রহিল।

শীতের অপরাহ্ণ মেঘাড়ম্বরে বর্ষারজনীর ন্যায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। আসন্ন বর্ষণের একটা বড় রকম যোগাড় হইয়া উঠিতেছে। দুর্য্যোগময়ী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরদের হঠাৎ স্মরণ হইল তাহাকে যাইতে হইবে, এখানে সে পুরুষহীনগৃহে একজন বাহিরের লোকমাত্র। অথচ শান্তিকে এই দুর্য্যোগ রাত্রে একা ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াও তো তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য হয় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হেম যদি না আসে রাত্রে কি একাই থাকো? চাকররা বিশ্বাসীতো?" শান্তির ম্লান অধরে অতি সূক্ষ্ম বিষাদের এক ফোঁটা হাসি ফুটিতে ফুটিতে বিদ্যুতের ক্ষণ রেখা পাতের ন্যায় চারিদিকের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার রাশির মধ্যে মিলাইয়া গেল। "চাকর তো নেই, একজন ঝি আছে সেই থাকে, সে খুব ভাল।"

নীরদ আবার দণ্ডাহতের মত চমকিয়া উঠিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল "আমি তোমার এ অবস্থায় একা এই বনের মধ্যে ফেলে তো চলে যেতে পারি না,—না হয়—" তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়াই তড়িতাহতের মত চমকিয়া উঠিয়া শান্তি তাহার আর্ত্তদৃষ্টি মেলিয়া ঈষৎ উৎকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "নানা আমার কোন সাহায্য আপনি কর্ব্বেন না, আমিতো কত দিনই এই রকম থাকি।" পাছে হেমেন্দ্র আসিয়া আবার কোন একটা বিরুদ্ধভাব ইঁহার সম্বন্ধে মনে আনে সেইজন্যই হঠাৎ শান্তি এতখানি উত্তেজনা-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু নীরদ তাহার

ভিতরের অর্থ টা না বুঝিয়া উল্টাই বুঝিল। পূর্ব্বেকার লজ্জাস্কর অভিনয়গুলা চকিতের মধ্যে বায়স্কোপের জীবন্ত চিত্রের মতন মনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা করিয়া তুলিল। ধিক্কারের সহিত সে নীরব হইয়া রহিল। এখন যে সে সকল দুরাশাস্বপ্ন মনের কোণেও জাগিয়া নাই যৌবনের সে সব দুর্দ্দাম চপলতা তাহার উৎপত্তির মধ্যেই নিঃশেষে লীন হইয়া গিয়াছে সে কথা সে কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে? একবার ইচ্ছা হইল বলিয়া উঠে,– আমি তোমার রক্ষা করিতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃই অধিকারী। সেই আত্মীয়তার সম্পর্কেও আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারি না।" কিন্তু সে কথাটা বলা এখন যেন আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। যে দিদি শান্তির শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সামগ্রী সেই দিদিরই স্বামী সে! অমু তাহারই অংশ, তাহার হৃদয় শোণিতের বিন্দু—তথাপি এ কথা কেমন করিয়া ঘৃণা লজ্জার মাথা খাইয়া সে সমুখে ব্যক্ত করিবে! দর্পহারী! এ কি প্রায়শ্চিত্ত!

তারপর আবার একটা বাধার কথাও মনে আসিল। হিন্দুর ঘরে তাহাদের সম্পর্কটাও এমনি জটিল সমস্যাযুক্ত যে তাহার প্রকাশেও এ অবস্থায় বড় একটা সুবিধা না ঘটিতেও পারে। মৃদু অনিচ্ছুকভাবে সে বিদায় চাহিল, শান্তি ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আর একবার আসবেন কি?" নীরদ আগ্রহের সহিত উত্তর করিল "নিশ্চয়, কাল সকালেই আমি আসবো।"

সে চলিয়া গেল। শুষ্ক অশ্রুহীননেত্রে শান্তি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়ান্ধকারের মধ্যে গলির বাঁকের মুখে তাহার সুদীর্ঘাকৃতি মিলাইয়া গেল, তখনও সে পলকহীন চক্ষুকে সেই দিকেই স্থির রাখিয়া গঠিত মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে যখন মেঘভরা আকাশ হইতে বজ্রপাতের সাড়া আসিয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঘরখানাকে শুদ্ধ কাঁপাইয়া তুলিল, এবং ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল তখন সে সেই লক্ষ্যহীন দৃষ্টি বহুদূর হইতে টানিয়া আনিয়া বিছানার উপরে লুটাইয়া পড়িল।

৪২

শান্তি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল "চন্দর, আজ কি রোদ উঠেছে? তবে জানলাটা খুলে দাওনা আমার প্রাণটা যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে।"

কয়েকদিন হইতেই শান্তির অসুখ চলিতেছে—গত রাত্রি হইতে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই দ্বারে জুতার শব্দ হইল ও পরমুহূর্ত্তেই হেমেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিল; শান্তির উৎসুক-নেত্র মুহূর্ত্তে নিরাশায় ম্লান হইয়া আসিল। সে অবসন্নভাবে বালিসের উপর মস্তক নিক্ষেপ করিয়া একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। হেমেন্দ্র তাহার অবস্থা লক্ষ্যও করে নাই,—সে আজ বহুদিন পরে অনেকটা যেন প্রফুল্ল। ছাতা ও শালখানা একটা বাক্সর উপর নিক্ষেপ করিয়া পরিশ্রান্তভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া

পকেট হইতে একখানা রসিদ বাহির করিয়া শান্তির সম্মুখে ধরিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল "আঃ এতদিন পরে কতকটা সুবিধা হয়ে এসেছে, —এইখানা ভাল করে রেখে দাও দেখি? শান্তি বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল, কাগজখানা লইতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। হেম তখন নিজে হইতেই বলিল "তোমার গহনাগুলো লক্ষ্মীপুর থেকে যোগেশ আদায় করে এনে একজন ব্যারিষ্টারের কাছে বন্দক রাখিয়ে দিলে। টাকাগুলো তাঁরি কাছে জমা রইলো, তিনি তো খুব উৎসাহ দিচ্চেন। তিনি নিজে সব ভার নিচ্চেন, বলচেন কোন ভাবনা নেই! এইবার একবার তবে, অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখাই যাক্,—আর তো চলে না নৈলে। চারিদিকে ধার, কেবল নেই নেই! বাসন্তী থিয়েটারে কাল যমুনা প্লে হলো তাতে কুমার উৎপলাদিত্য সেজে উঃ কি নামটাই আমার হয়ে গ্যাছে! ম্যানেজার তো যোড়হাতে দেড়শো মাইনে দিতে চায় হপ্তায় একবার করে অভিনয় কর্ব্বার জন্যে। কিন্তু এখন দিনকতক সব ছাড়তে হবে, ভাল করে এইবার অদৃষ্টকে বোঝা যাক্।"

শান্তি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবু ঘরে ঢুকিতেই চন্দর ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল। বাহিরে যোগেশের সহিত তাহার কোন্দলের একটা উচ্চ স্বর শোনা যাইতেছে। সহসা সে তাহার রক্তহীন পাংশু মুখ স্বামীর পানে ফিরাইয়া প্রদীপ্ত চক্ষু তাহার মুখে স্থির রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল "ভাগ্য পরীক্ষা! ভাগ্য পরীক্ষা বলোনা ভাগ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলো,—বিদ্রোহ বলো"—উত্তেজনায় তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—"বেশিদিন নয় আর দুচারটে দিন অপেক্ষা করো, আমায় মরতে দাও, তারপরে তোমার যা খুসী করো, কে বারণ করবে? শুধু এই সামান্য দিনকটা ধৈর্য্য রাখো, ভিক্ষা চাইচি দয়া চাইচি কিছুই কি পেতে পারিনা? শেষ ভিক্ষা শেষ—"

হেমেন্দ্র ধড়মড় করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আকস্মিক একটা ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, শান্তি! শান্তি তুমি পাগল হলে নাকি? একি করচো? থামো—" আলুথালুভাবে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চিরসহিষ্ণু শান্তি সবেগে মাথা নাড়িয়া তেমনি তীব্র উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল। "আর আমি থামতে পারি না, কত আর থামবো, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে, একটুখানি তুমিই থামো—আমার মরতে দাও, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে যা তোমার সাধ তাই করো, কেউ বাধা দেবার নেই। মাগোঃ।" বলিয়া সহসা সে আবার বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল, শক্তির অতিরিক্ত ব্যয়ে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। নির্ব্বাক হেম তাহার নিশ্চেষ্ট অসাড় শরীরের দিকে কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অল্পক্ষণ পরে তাহার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, "শান্তি! শান্তি!" পায়ে হাত দিয়া দেখিল নিশ্চল, তখন ভয়ে বিস্ময়ে তাহার হাত পা যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "যোগেশ!" যোগেশ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া ক্রোধোত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কি পাজী তোমার ঐ ঝি মাগীটা! বলে কিনা তুমিই তো

বাবুর শনি হয়েচ,—এ কি হেমবাবু?" হেম মাটিতে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া তীব্র যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদের মতন করিয়া কহিয়া উঠিল "দেখ যোগেশ! আমি ওকে খুন করেচি!"

"এঁ্যা! সে কি!" কিন্তু সেই সময়েই শান্তিকে একটু নড়িতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া কাছে আসিল "না, না মূর্চ্ছা হয়েচে! একটু জল আন দেখি এক্ষণি সেরে যাবে, কপালটা ভয়ানক গরম! আমি একজন ডাক্তারকে বরং ডেকে আনি, তুমি কাছে থাকো" হেম আতঙ্কে বলিয়া উঠিল "না যোগেশ আমিই তার চেয়ে ডাক্তারের জন্তে যাচ্চি। তুমি এখানে থাক।"

যোগেশ বলিল "আচ্ছা তাইযাও"মনে মনে বলিল ভীরু! সবেতেই তোমার সমান ভয়, এদিকে আবার যোগেশকে স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথা কইতে দেখলেও সয় না।" শান্তির পরিণাম তাহাকেও যেন অলক্ষ্যে অনুতাপের কষাঘাতে ক্লিষ্ট করিতেছিল, সেইতো হেমের মন্ত্রণাদাতা! সেওতো কম পাপী নয়! আহা দুজনে পড়িয়া কি তবে সত্য সত্যই বেচারাকে হত্যা করিয়া ফেলিল না কি? এতোটা হইবে কে জানিত!

হেমেন্দ্রকে অধিকদূর যাইতে হইল না। গলির মধ্যেই পরিচিত প্রসন্নবাবু ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে হেম ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

"আঃ বাঁচা গেল! আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম যে, আসুন ডাক্তারবাবু শিগ্‌গির একবার আমার বাড়ি আসুন—"

ডাক্তার কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকটি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন বলো দেখি? শান্তি কেমন আছে?"

হেমেন্দ্র অপরিচিতের এই অযাচিত আত্মীয়তায় মনে মনে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও এ বিপদের সময় বিরক্ত হইতে পারিল না বা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাব প্রকাশ করায় আগন্তুকের ধৃষ্টতার কথা মনেও পড়িল না। সে তখন ঘোর বিপন্ন,—মনে হইল হয়ত ইহার নিকটও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সে যে কে সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত না তুলিয়া ঈষৎ যেন আশ্বস্ত চিত্তেই বলিল "হঠাৎ তার মূর্চ্ছা হয়েচে, আপনারা শিগ্‌গির আসুন।"

ডাক্তারের সঙ্গেই যোগেশ তাঁহার লিখিত প্রেস্‌ক্রিপ্সন দুখানা লইয়া চলিয়া গেলে নীরদকুমার পরুষকণ্ঠে মুহ্যমানপ্রায় হেমেন্দ্রকে বলিয়া উঠিলেন "এমনি করেই মেরে ফেলতে হয়?" নীরদের ব্যবহারে হেম বুঝিয়া লইয়াছিল—তিনি রজনীনাথেরই কোন আত্মীয়,—শান্তির আপনারই লোক। হেমেন্দ্র লজ্জিত মৃদুস্বরে গুণ গুণ করিয়া বলিল "চিকিৎসা হচ্ছিল তো, ডাক্তার বল্লে ম্যালেরিয়া—"

নীরদ বাধা দিল "ছাই চিকিৎসা হচ্ছিল! ওকি জীবনে কখনও এমন অবস্থায় থেকেচে? তা একবার মনে হলোনা!"

অপরিচিতের এই তীব্র তিরস্কারে গর্ব্বিত হেমেন্দ্র আজ রাগ করিল না, বরং লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। সে যে কত বড় অপরাধে জগতের ও নিজের হৃদয়ের নিকটে অপরাধী সে কথা যে জলন্ত লোহার

বাড়ি দিয়া বুকের ভিতরে আগুনের অক্ষরে বিধাতা সম্প্রতি লিখিয়া দিয়াছেন! নীরদ তাহার পাশে আসিয়া বসিল। একটুও ইতস্তত না করিয়া একেবারে সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল—"শুনলে তো ডাক্তার কি বলে গেলেন? এখনও কি রজনীবাবুকে খপর দিতে তোমার কোন আপত্তি আছে? ভেবে দেখ শান্তি যদি না বাঁচে চির দিনের জন্য কি আক্ষেপ থেকে যাবে!"

হেমেন্দ্র তড়িতাহতের মত শিহরিয়া উঠিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সেকি বাঁচবে না? দয়া করে আপনি তাকে বাঁচান, আমায় যা করতে বলবেন আমি করতে প্রস্তুত আছি। আমিই তাকে মেরে ফেল্লুম!"

হেমেন্দ্রের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। বিমর্ষ মুখে কহিল "সে যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে। আমার এ সংসারে শান্তি ছাড়া আর আছেই বা কে! আমার—" গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল "বেঁচে থাকা অসহ্য হয়ে উঠবে, আপনার বলতে কেউ আমার নেই।"

নীরদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, হেমকে সে যে রকম কঠোর চিত্ত, মমতাহীন পাষণ্ডরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহাকে সে রকম ঠিক না দেখিয়া অনেকটা যেন আশ্বস্ত হইল। অবস্থার গতিতে পড়িয়া সেও যে কত সময় তাহার স্বভাবের বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে! যে দোষী সে অন্যের বিচারক হইবে কোন মুখে? তাহাকে যে তিরস্কার গুলো করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল নিঃশব্দে সেগুলা মনের ভিতরেই চাপিয়া ফেলিয়া সান্ত্বনা পূর্ণ কণ্ঠে সে কহিল "হতাশ হয়োনা হেম, প্রারব্ধ প্রবল বটে, কিন্তু পুরুষকারও সামান্য বল নয়। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করতে যেন পরাঙ্মুখ না হই। তারপর কর্ম্ম-ফলদাতা তাঁর কাজ কর্ব্বেনইতো। তবে টেলিগ্রাম করি? শান্তির পক্ষে এখন তার রোগের মূল ওষুধেই সব চেয়ে বেশি কাজ করবে।" লজ্জায় হেমেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ বাক্যহীন হইয়া রহিল। তারপর মুখ না তুলিয়াই মৃদু কণ্ঠে কহিল "তাঁরা কি আমাদের ক্ষমা করবেন?"

হেমেন্দ্র সব কথাই অপরিচিত আত্মীয়ের নিকটে খুলিয়া বলিল,—কেমন করিয়া সে রজনীনাথকে যোগেশের সাহায্যে বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অপমানের তীব্র প্রতিশোধ—তাঁহার আহতমুখের সেই রক্তহীন বিবর্ণতা স্মরণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আজ সে লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র কষাঘাত অনুভব করিল। এমন বিপদের মধ্যেও নীরদ একটা অদম্য কৌতূহলের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। অদূরে দত্তবাবুদের শ্বেত প্রাসাদের উপর হইতে ধীরে ধীরে সূর্য্য-রশ্মি নামিয়া যাইতেছিল এবং শীতের অকাল-সন্ধ্যায় শান্তির ললাটের মতই পশ্চিম আকাশের প্রান্তটা ম্লান হইয়া আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া যেন অনাগ্রহভাবে প্রশ্ন করিল "তোমার বিনোদদার স্ত্রী সত্যি সত্যিই জাল নাকি? সে নাকি ভাল লোক নয়?"

হেম ঈষৎ বিস্মিত ও অপমানিত ভাবে হঠাৎ মুখ তুলিয়া অপরিচিত প্রশ্নকারীর প্রতি চাহিল, তাহার মুখের সাগ্রহ সকৌতুকভাব

হঠাৎ তাহাকে কতকটা উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ঈষৎ গর্ব্বিত ভাবে কহিল "তা আমি কি করে জানবো? তা ছাড়া সে সব পারিবারিক কথা—' বলিতে বলিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হেমেন্দ্র ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল "আমায় মাপ কর্ব্বেন সেও যা ঘটেছে সব আমারি দোষে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাঁকে কিছুই জানিনা, তবে শান্তির তাঁর উপরে যে রকম ভাব তাতে তা'কে দেবী বলেই মনে করা উচিত।' আবার দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। "সেখানেও একটা খপর দিলে হয় না? তিনি হয়ত এলেও আসতে পারেন। শুনেছি জ্যেঠা মশাই এখনও আমায় স্নেহ করে থাকেন। শান্তির স্বামী বলেও তাঁরা হয়ত আমায় ক্ষমা করতে পারেন, আমার জন্যে না হলেও।"

হেমের এই কথায় নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "তুমি শান্তির কাছে যাও, আমি টেলিগ্রাম দুটো করে আসচি।"

হেমেন্দ্র আসিয়া দেখিল, শান্তি জাগিয়াছে, সে যেন ব্যাকুলনেত্রে কাহাকে অন্বেষণ করিতেছিল, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘোর অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

সেই রোগক্লিষ্ট চিত্তের অভিমানের নীরব বেদনা হেমকে অত্যন্তই আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিগত আত্মাভিমানের বশে মুখটা একবারের জন্য একটু লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাবটা সামলাইয়া ফেলিয়া বিছানার উপরে তাহার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া বসিল ও কিছুক্ষণ তাহার অভিমানাহত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "শান্তি!" সেই এক উৎসব রজনীর পুষ্পমণ্ডিত প্রাঙ্গণে শঙ্খরোলের মধ্যে যে দুইটি লজ্জা মুকুলিত নেত্র পুষ্প কলিকার মতন, তাহার দিকে প্রথম সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল তখন তাহার মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতাই তো শুধু ভরা ছিল, কে তাহার পরিবর্ত্তে এ হতাশা ও বেদনা মাত্র প্রতিদান দিল?—সেই না!

"আমার দিকে চাও শান্তি।" এই বলিয়া সে শান্তির একখানা শীর্ণ হস্ত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল। তাহার কণ্ঠশব্দে অশ্রুজল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, শান্তি আশ্চর্য্য হইয়া মুখ ফিরাইল, নিঃশব্দে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমার জন্যে দুঃখ করচো? আমি মরে যাবো বলে?"

হেমেন্দ্র দুই হাতে শান্তির দুর্ব্বল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর নত হইয়া তাহার ক্লিষ্ট অধরে চুম্বন করিয়া রুদ্ধ আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "হ্যাঁ তোমারি জন্যে শান্তি, তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব? আমি সব দুরাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে মানুষ হবো শান্তি, শুধু তুমি আমায় ছেড়ে যেও না! শান্তি লক্ষ্মী তুমি আমার, তোমায় চিনিনি তাই আমি লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি, আমার মঙ্গললক্ষ্মী অমঙ্গলের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে আমায় তুমি চলে যেও না।"

বলিতে বলিতে হেম দেখিল তাহার কথাগুলা সব ব্যর্থই হইতেছে শান্তি জাগিয়া নাই। তাহার ক্ষীণ হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। রোগের গতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হেম তাহার সেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আনন্দের মূর্চ্ছাকে নিদ্রা

ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাছে বসিয়া বসিয়া তাহার রুক্ষ চুলগুলাকে মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিতে লাগিল। শান্তির মুখখানার এত সৌন্দর্য্য আর কখনও তাহার চক্ষে পড়ে নাই, নির্ব্বাপিত প্রায় দীপশিখাটুকুর ম্লান আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গিয়া যেন সেখানে দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হইয়া উঠিল।

অন্বেষণ।

এহি বিশ্বের মাঝে বিয়াকুল প্রাণ
নিয়ত কাহারে চাহে ?
কাহার লাগিয়া, মরে সে কাঁদিয়া
দারুণ মর্ম্ম-দাহে !
গাহে বিহঙ্গ অম্বর ছাপি' ;
সারা হিয়া মোর তাহে ওঠে কাঁপি' !
সেই গানে হায়, মরি বেদনায়
গুমরি মরম মাঝে !
মনে হয় মোর—কত কি যেন রে
সে সুরে লুকানো আছে !

যবে নিকুঞ্জ মাঝে, তরু-শাখা' পরে,
অপরূপ গরিমায়,
গোলাপের কলি ধীরে পড়ে ঢলি'
মধুর মন্দ বায় ;—
সোহাগ-মুগ্ধ আগ্রহ ভরে
ছুটে যাই কাছে ; পরম আদরে
যেই তুলি তা'রে, মুঠির মাঝারে
অমনি পড়ে সে ঝরি' !
নিরাশা-দিগ্ধ পরাণ তখনি
ওঠে হাহাকার করি' !

হেথা যেথানে যা'কিছু আছে অভিরাম,
ত'ারেই এ প্রাণ চায়।
যেন কি আভাসে, অধীর হুরাশে
"ঐ ঐ" বলে' ধায় !
হেরিলে কাহারে মনের মতন,—
তুলে' লয় বুকে করিয়া যতন ;
যত চেপে' ধরে বুকের উপরে
ততই জ্বলিয়া মরে ;
"এ তো নয়, ওগো, এ তো নয়"—বলে'
কাঁদে সে আর্ত্ত স্বরে !

শুধু এমনি করিয়া, ব্যর্থ আবেগে
ফিরি আমি দিবানিশা !
চলেছি কোথায়, কি যে চাহি, হায়—
করিতে পারি না দিশা !
হে মোর তৃপ্তি, ওগো অজানিত,
হে চিরন্তন, চির-বাঞ্ছিত,
আর কত দিন হেন উদাসীন,
ফিরিব পাগলপারা ;
দেহ, দেহ দরশন হে হৃদি-রমণ !
—মুছাও নয়ন-ধারা !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

শতদল-রচয়িত্রী।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

'শতদল' শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী-রচিত একখানি কবিতাগ্রন্থ। একশতটি ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতার দলে কবির হৃদয় পদ্ম বিকশিত হইয়াছে। কবিতাগুলিতে সুমধুর বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে, একঘেয়ে নহে। বিধাতার করুণার উপর অটল নির্ভর স্থাপন করিয়া, জগতে সকল কাজের মধ্যে বিধাতার করস্পর্শ অনুভব করিয়া তাঁহারি মহিমা কীর্ত্তনরতা কবি 'পূজিবার শতদল' লইয়া 'পবিত্র মন্দির'দ্বারে আসিয়াছেন। তাঁহার শতদলের মিষ্ট সৌরভে, তাঁহার ভক্ত্যুচ্ছ্বাসের আন্তরিকতায় এ পূজা ব্যর্থ হইবে না। এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি।

কবি গাহিয়াছেন,—

"আমার হৃদয় মাঝে প্রেমভক্তি দিয়া'
তোমার পূজার গান রাখিব রচিয়া।
পুষ্পসম যেন প্রাণ তোমার পরশে।
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে।"

কিন্তু 'শতদলে'র কবি আজ নূতন এ পূজার সাজি লইয়া বাণীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হন নাই। বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কমকণ্ঠের সঙ্গীত রবে পূজার মন্দির ভরিয়া রহিয়াছে। কবিরচিত "হাসি ও অশ্রু," "অশোকা" প্রভৃতি বহুদিন পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠার আসন দান করিয়াছে। সে আজ অনেকদিনের কথা, যখন ভারতী-সম্পাদিকা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে সরোজকুমারীর "হাসি ও অশ্রু" প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই এক সঙ্কোচে সরমে মৃদু সঙ্গীতের অস্ফুট রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছিল! কবির প্রথম গান,—

আকুল মর্ম্মের মাঝে, যে উন্মাদ সুর বাজে
দুটি ছত্রে লিখিতে বাসনা
গোপন হৃদয় ছায় যে সিন্ধু উচ্ছ্বসে হায়
কি জানাবে দুটি অশ্রু-কণা?

আজ আর সে সুর রুদ্ধ নাই, গুমরিয়া মরে না—আজ তাহা সমস্ত বাধা সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলিয়া বিশ্ববাসীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে!

"হাসি ও অশ্রু"তে কবির হৃদয়ের উদারতা ও ভাবের বিশালতা প্রথম পরিলক্ষিত হইয়াছিল! 'সন্ধ্যার তারকা' দেখিয়া কবির 'দুইটি নয়ন' ছলছল হইয়া আসিত—'আঁখি স্বপ্নে ভোর' হইয়া আসিত। ভাবের সেই প্রথম বিকাশ—কবির তুলিকায় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! শতাধিক খণ্ড কবিতা—সবগুলিই কবিত্বে পূর্ণ—বিমল সহানুভূতির রসে সুস্নিগ্ধ! "হাসি ও অশ্রু"তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-বর্ণিত নায়ক-নায়িকাগণের উদ্দেশ্যে লিখিত যে কোন 'সনেট' পাঠ করিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে! বিষবৃক্ষের কুন্দকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন,

প্রণয় দেবতা তাই হয়ে মূর্ত্তিমান
এসেছেন পূজা তব লইবারে পায়ে;
এইবার সঁপ বালা আপন পরাণ,
লাজে 'না' বলিছ কেন আপনা লুকায়ে?
নীরব তোমার প্রেম দিবানিশি ঝরে;
প্রণয়-দেবতাপদে প্রেমের মন্দিরে।"

রবীন্দ্রনাথের "রাজারাণীর এবং সম্পাদিকা মহাশয়ার উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রও তাঁহার

ছন্দে বেশ নিপুণভাবে ফুটিয়াছে—স্থানাভাবে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

"অশোকা" কবির আর একখানি কাব্য-গ্রন্থ। ইহাতে প্রায় শতাধিক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাই সরল, মিষ্ট ও ভাবপূর্ণ।

কাব্য-গ্রন্থত্রয় ভিন্ন কবিরচিত ক্ষুদ্রগল্প গ্রন্থও একখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানির নাম, "কাহিনী"। গল্পগুলি ঠিক ছোট গল্প নহে। সেগুলি ছোট নভেল। কেবল দুঃখের কাহিনী! অধিকাংশই ইংরাজি গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত। গল্পের ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী এবং তাঁহার স্বামী ও শিশু পুত্র।

ও সহজ। লেখিকা মনোযোগ প্রদান করিলে মৌলিক উপন্যাস লিখিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সরোজকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ গুপ্ত মহাশয় সবজজ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ট্রিবিউন সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গভাষায় একজন প্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস-লেখক। সিভিলিয়ান বঙ্গসাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সরোজকুমারীর খুল্লতাতপুত্র।

সরোজকুমারী বাল্যে পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। দশ বৎসর বয়সে কলুটোলার প্রসিদ্ধ সেন বংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর যত্নে সরোজকুমারীর রীতিমত শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। যোগেন্দ্রবাবু সম্বলপুরের গভর্ণমেণ্ট উকীল। সরোজকুমারী বলেন, "আমার জীবনে যাহা কিছু সুখ-সৌভাগ্য, যাহা কিছু শিক্ষা, সব স্বামীর জন্য।"

অতর্কিত।

লীলাকে আমি একটি বৎসরমাত্র পেয়েছিলাম।

সে বৎসরটা যেন আরব্যোপন্যাসের একটা কাহিনী। আমার অন্ধকারাবৃত জীবনের মাঝখানে লীলা যে আলাদিনের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল, সে যে শুধু আনন্দ ও আলোকের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করেছিল তা নয়, আমার নিশ্চেষ্ট প্রাণকে যেন কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীবনীশক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। আকাশের নীলিমা, শূন্যের উদারতা পৃথিবীর সম্পদ তেমন করে আর কখনও আমি উপভোগ করি নি এবং প্রেম ও আনন্দের মধ্যে আমি আর কখনও তেমন করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে পারিনি।

কিন্তু মাত্র একটি বৎসর। তারপর আমার জীবনের আনন্দ মুছে গেল, আলোক নিভিয়া গেল, এবং এক বর্ষণসিক্ত ঘনান্ধকার বজ্রবিদীর্ণ সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে লীলা তাহার ইহজীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী সমাপ্ত করিয়া দিল!

১

ঝঞ্ঝাবসানে ভগ্নশির বৃক্ষের মত আমার মনে হইল হায় এ কি খেলা, এ কি নিদারুণ খেলা! একটি বৎসরের জন্য এ প্রতারণা কেন?

লীলা বলিয়াছিল আবার তাহাকে দেখিতে পাইব। সেই আশা বুকে করিয়া দীর্ঘ দিবস কাটাইয়া দিতাম, তাহার পর যখন সন্ধ্যা হইয়া যাইত, তখন শয্যাবিস্তার করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। মনে হইত দূরে যেন কাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে। উন্মুখ ব্যগ্র হৃদয়ে দুয়ারের পানে চাহিয়া থাকিতাম যদি সে আসে! রাত্রি যখন গভীর এবং স্তব্ধতা সুনিবিড় হইয়া আসিত, তখন মনে হইত

সে যেন আরো কাছে আছে। পাছে আমি দেখিলে সে চলিয়া যায় তাই প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিতাম। যদি তার উপস্থিতি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি! সমস্ত দেহ তাহার স্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কর্ণ তাহার নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দের প্রতীক্ষা করিত! তাহার পর যখন নিশ্বাস রোধ এবং হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হইবার উপক্রম করিত তখন অকস্মাৎ চাহিয়া দেখিতাম বৃথা, বৃথা! সে আলোয় নাই, আঁধারে নাই, ঘরে নাই, বাহিরে নাই, কোথাও নাই!

তখন তাহারই জন্য রচিত শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম, অশান্ত হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিত, এবং চারিদিকের আলো অন্ধকার এক হইয়া যাইত!

৩

এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গেল, তবু সে আসিল না!

ঠিক সেদিন তাহার মৃত্যু হইয়াছিল—আমি কর্ম্মোপলক্ষে গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম, যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতে লাগিল তখন মনে হইল আর আমার দূরে থাকা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে!

সেদিনও আকাশ গাঢ় কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আর্দ্র বাতাস বহিতেছিল এবং আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। পাষাণ নগরী ভীত স্তব্ধভাবে আগতপ্রায় ঝঞ্ঝার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পথিক পথত্যাগ করিয়াছিল, এবং ফেরিওয়ালা গৃহে ফিরিয়াছিল।

একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্য দিয়া আমার রাস্তা। খানিকদূরে ঠিক রাস্তার উপরেই একটা বাড়ি। এবং গলিটা তাহারই পার্শ্ব দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

আমি ত্রস্তপদে চলিতেছিলাম, আজ আমার মনে হইতেছিল কি জানি কেন তাহাকে দেখিতে পাইবই! আজ আমার এক বৎসরের প্রতীক্ষা সফল হইবে;—সেই তাহার ছোট ঘরটিতে, সেই তাহার প্রিয় শয্যায় হয়ত ক্ষণেকের জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাইব!

গলিতে পড়িতেই ঠিক সম্মুখে সেই বাড়ী। তাহার নীচেকার দুয়ার বন্ধ কিন্তু জানালাগুলা খোলা, বোধ হয় ঝঞ্ঝার ভয়ে উপরকার জানালাগুলা বন্ধ ছিল।

মনে হইল যেন নীচেকার জানালার গরাদ ধরিয়া কে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে আমার পানে চাহিয়া আছে। সুদীর্ঘ গলি যতক্ষণ অতিক্রম করিলাম সে তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিলাম কে তাহার দূরগত প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, হয়ত আমার মুখের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তাই ভুল করিয়া আমাকে দেখিতেছে!

জানালার আরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, সে তেমনি স্থির। সহসা মনে হইল সে আমার লীলার মত দেখিতে, তেমনি মুখ তেমনি চোখ! থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে দেখিতে লাগিলাম,—সে স্থির অচঞ্চল! আমারই পানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিতে আনন্দ নাই, শোক নাই!

কড়কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল—সেই শব্দে চমকিয়া ভাবিলাম এ কি করিতেছি, পরের ঘরের সম্মুখে কিসের জন্য দাঁড়াইয়া আছি! লোকে যদি দেখে,—লীলা যদি দেখে।—ত্বরিত পদে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

কিন্তু আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই দুইটি চোখ আমারই পানে চাহিয়াছিল। গলি বাঁকিয়া গেল, তবু আমি পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, সামান্য অপ্রশস্ত স্থানের মধ্য দিয়াও বাঁকিয়া চুরিয়া কোনপ্রকারে সে আমাকেই দেখিতেছে!

তাহার পর যখন আর দেখা গেল না, তখন সহসা একটা অনুতাপ বোধ হইল, মনে হইল সে যেই হ'ক, সে যখন আমার লীলারই মত দেখিতে, তখন তাহার এ প্রতীক্ষা অবহেলা করা উচিত হয় নাই। যদি সে লীলা হয়,—আজ এক বৎসর পরে এমন করিয়াই যদি লীলা আমাকে দেখা দিয়া থাকে! তখন সেই চিন্তা আমাকে পীড়িত করিয়া তুলিল, দ্রুতপদে জানালার নিকট ফিরিয়া গেলাম—কোথাও কেহ নাই। তখন দুইহাতে দুয়ারের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিলাম—বজ্রের ভীষণ গর্জ্জনের মধ্যে তাহা লুপ্ত হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্বপ্নে ও জাগরণে তাহাকে এক অন্ধকার গৃহের মধ্যে জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আমারই পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহাকে অবহেলা করিয়া আমি চলিয়া আসিলাম—তথাপি তাহার সে দৃষ্টি ফিরিল না! হায় অন্ধ, হায় মূঢ়! সে দৃষ্টির স্মৃতি সমস্ত রাত ধরিয়া আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল! তখন বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় মাতামাতি করিতেছিল।

ভোর বেলা উন্মত্তের মত আবার সেই বাড়িতে গিয়া দুয়ারের কড়া নাড়িতে লাগিলাম।

পাশের বাটির একজন লোক আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন "কাকে খুঁজছেন, মশায়, দেখছেন না, ও বাড়ী খালি,—ওপরে চেয়ে দেখুন"। চাহিয়া দেখিলাম লেখা "বাটি ভাড়া দেওয়া যাইবে—"। নিশ্বাস প্রায় তখন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম "কতদিন খালি আছে!" খানিকটা ভাবিয়া তিনি কহিলেন "এক মাসের উপর হবে।"

তখন নতশিরে নম্রচিতে সেই জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। এবং যে গরাদ সে কাল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার উপর শির রক্ষা করিলাম। সে কাল এইখানেই আসিয়াছিল। মনে হইল আজও সে সেইখানেই আছে তাহার দেহের সৌরভ আমাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিল, তাহার শেষ কথা যেন শুনিতে পাইলাম। এবং তাহার স্নেহ-স্পর্শ যেন আমার বেদনা-কাতর সর্ব্বাঙ্গে অমৃত সিঞ্চন করিল!

তখন বিশ্বের আলো নিভিয়া গেল, এবং আমার চোখের সম্মুখে একটা ঘন কালো পর্দ্দা পড়িয়া গেল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল।

"নারীর যে সুকোমল হস্ত শিশুকে দোলাইয়া ঘুম পাড়ায় সেই হস্তই পৃথিবীর শাসন দণ্ড ধারণ করে।" ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক রমণীকেই সমাজ এবং সংসারের শাসন ভার বহন করিতে হয়। আমাদিগকে সেই সম্মানপদবীর যোগ্য করিবার জন্য, সেই পদের যোগ্য শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত; এবং ভারতবর্ষীয় সমাজকে উন্নত ও সুশিক্ষিত করিবার জন্যই এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে।

দেশের নারী শক্তি এক মহতী শক্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন সমাজই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, সেই মহাশক্তিই যদি সুপ্ত থাকে তবে কেমন করিয়া জাতীয় শক্তি জাগ্রত এবং প্রবুদ্ধ হইবে? সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তিগত ভাবে নারীশক্তির উদ্বোধন আবশ্যক। প্রভাতের আলোকে মঙ্গল শঙ্খ রবে যখন আমাদের এই বিশাল ভারতের মন্দিরে মন্দিরে নব দিবসের উদ্বোধন ধ্বনিত হয় তখন আমাদিগকেও জাগ্রত হইতে হইবে। সূচনায় পূর্ণরূপে ধারণা করিতে হইবে আমি এই গৃহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি আছি। পরে ধারণা করিতে হইবে মানব সমাজও সংসারের সম্রাজ্ঞী আমরা আছি। পরমা শক্তি যখন সুষুপ্তা তখন বিশ্বপ্রকৃতি প্রলয়নিমগ্না, কালরাত্রির অন্ধকারে লীন এবং নির্লুপ্ত। ভারতনারীরাজ্যের পরমা শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারিলেই সংসার এবং সমাজ জাগ্রত এবং জীবন্ত হইবে।

মহর্ষি পাতঞ্জল তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন—শব্দের একটি বিশেষ এবং মহতী শক্তি আছে।

উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচন এবং প্রয়োগ, মন্ত্রকে সার্থক এবং সফল করে। 'ভীত হও' এই বাক্যটি উচ্চারণ মাত্র শ্রোতাদিগের হৃদয়ে এক অস্বচ্ছন্দতার উদয় হয় আবার মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণে অস্বচ্ছন্দতা দূর হইয়া সঙ্কোচ অপসারিত হয় হৃদয় উদার উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া আবার স্ফীত হইয়া উঠে।

কত যুগ যুগান্তর হইতে ভারতবর্ষীয় নারীগণ আপনাদিগকে কেবলি হীন তুচ্ছ অক্ষম এবং দুর্ব্বল বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছেন। সহস্র প্রকারে সহস্র ঘটনায় এই ধারণা তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। শিশু পুত্রের জন্মে গৃহে গৃহে যে আনন্দ উৎসব হয়, বাঁশরীতে যে আনন্দের রাগিনী বাজিয়া উঠে আত্মীয় স্বজন যেমন মুক্ত হস্তে দান ও পারিতোষিক বিতরণ করেন শিশু কন্যার আগমনে তাহার একাংশও দেখা যায় না। সেদিন মাতা যে সুকুমার শিশু কন্যাটিকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া সূতিকা গৃহে শয়ন করিয়া থাকেন কোন আনন্দ কোলাহল কোন উৎসব বাদ্য কোন আত্মীয়ের সাগ্রহ আগমন সে নিভৃত কক্ষের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে না, কোন মঙ্গল অনুষ্ঠান সেই নবীন জীবনের শুভাগমন সূচনা করেনা। তাহার অস্তিত্ব যে আছে তাহা স্বীকার করিতে যেন সকলে কুণ্ঠিত সেই জন্যই ভারতের প্রত্যেক বালিকা যখন নারী পদবীতে উন্নীত তখনও সে আপন গৌরবের অধিকারী হইতে শিক্ষালাভ করেনা,

সে মনে করে সে কিছুই নয়, তাহার কোন শক্তি কিম্বা কোন কর্ম্মের অধিকার পর্য্যন্ত নাই। সে বলে আমি তুচ্ছ মূঢ় নারী আমার দ্বারা সংসারের কোন্ উপকার হইবে! নিত্য নিয়ত আপনাকে এই দীন হীনভাবে ধারণা করিয়া তাহার জীবনের মূল্য যথার্থই হীন হইয়া পড়ে, তাহার দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তে পরিবার সমাজ এবং জাতির শাসন কুশাসনে পরিণত হয়।

হায় ভগিগণ একি ভ্রান্তি! এই অশুভ ভ্রান্তির জন্য আমাদের জাতির কতই না ক্ষতি হইয়াছে। প্রত্যেক শিশু কন্যার জন্ম দিবসকে দুঃখের অকল্যাণের নগণ্য দিন মনে না করিয়া তাহা এক এক জন বিশ্ববিজয়িনী শাসন-দণ্ড-ধারিনী সম্রাজ্ঞীর জন্মোৎসব স্বরূপ শুভ অনুষ্ঠান সমূহে পরিপূর্ণ করা কর্ত্তব্য। এই জন্মের আনন্দ বার্ত্তা চারিদিকে প্রচার করিয়া অতি শিশুকাল হইতে তাহাকে আপন রাজকীয় শক্তি অনুভব করিতে শিক্ষা দান করা আবশ্যক। যাহাতে ভবিষ্যত অভিষেকের দিনে সে আপনার সঞ্চিত সমগ্র শক্তির প্রভাবে সেই মহাভাগ্যের যোগ্য হইতে পারে।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ বিকাশের জন্য প্রথমে 'আমি আছি' পরে 'আমরা আছি' এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে। এই মন্ত্র সাধনায় আমাদের হৃদয় যতই বিকশিত হইতে থাকিবে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদিত হইবে 'কেন আছি'? আমার ব্যক্তিগত এই নারী জীবনের কর্ত্তব্য এবং উদ্দেশ্য কি? সমাজে আমার এই নারী অস্তিত্বের সার্থকতা কি? এই যে ভারত মহা-বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহা সার্থক করিব কেমন করিয়া, কেমন করিয়াই বা বিশ্বনারী-সমাজের সমকক্ষ গৌরব রক্ষা করিতে পারিব?

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্নগুলি হৃদয়ে উদয় হইবার পরে ক্রমে কেমন করিয়া সে উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব তাহারি চেষ্টায় আমরা অনুপ্রাণিত হইব। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে দূরে যাইতে হইবে না, জড়প্রকৃতি জীবদেহে কেমন করিয়া আপন কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করে তাহা বুঝিয়া দেখিলেই আমরা আমাদের পথ দেখিতে পাইব।

জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলীর গঠন এবং কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় ইহা তিনটি পদার্থ যোগে নির্ম্মিত—যথা ইন্দ্রিয়, স্নায়ু এবং মাংসপেশী। বাহিরের সংস্পর্শ যখন কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আঘাত করে তখন সেই স্পর্শের উত্তেজনায় সেখানে পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই পরিবর্ত্তনের স্রোত স্নায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া মাংসপেশীতে নীত হয়। তাহার ফলে কঠিন পদার্থের সান্নিধ্যবশতঃ আমাদের দেহ সঙ্কুচিত হয়। আমরা সেই কাঠিন্যের আঘাত বাঁচাইবার জন্য আপনাকে সতর্ক করি। স্নায়ুমণ্ডলী প্রধানতঃ পেশীসঞ্চালক সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা গঠিত, এই সূক্ষ্ম শিরাগুলির দ্বারা মাংস-পেশীতে বাহিরের উত্তেজনা বাহিত হয়।

মানব জগতেও তেমনি কতক লোক আছেন যাঁহারা আমাদের দৈহিক ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বহির্জগৎ হইতে ভাব সংগ্রহ করেন, সংযোজক পন্থা দ্বারা সেই ভাবগুলিকে অপর কাহারও কাছে উপস্থিত করিলে আবার কতক লোক আছেন যাঁহারা মাংসপেশীর ন্যায় সেই ভাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে

পারেন। আমাদের মহামণ্ডলের ন্যায় সভা সমিতিগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্নায়ুমণ্ডলীর ন্যায় ভাব সঞ্চার করিবে এবং আমাদের কার্য্যকুশল সভ্যগণ মাংসপেশীর ন্যায় সেই ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবেন।

এতদিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক মহিলাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল—তাহারা যেন জীবজগতের প্রথম প্রাণীর (Jelly fish) সর্ব্বাপেক্ষা সরল স্নায়ুমণ্ডলের ন্যায়। সেই প্রথম সরল স্নায়ুমণ্ডলী হইতে ক্রমে যেমন এই জটীল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানব স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশ হইয়াছে তেমনি প্রাথমিক প্রাদেশিক সমিতি সকলের ক্রমোন্নতি স্বরূপ আজিকার এই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল জন্ম লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ভারতে চিন্তাশীলা এবং হৃদয়বতী রমণীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে, অবস্থার জটিলতার বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং চিন্তাশীলা রমণীদিগের সহিত কার্য্যকুশলা নারীগণের সংযোগ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, এই সংযোগ সাধনের জন্যই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের স্থাপনা। পূর্ব্বে কোন ভাবের সঞ্চার কিম্বা বিকাশ তাহার উৎপত্তিস্থানের আশপাশের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, এখন মহামণ্ডল স্থাপনের জন্য প্রত্যেক নূতন ভাব, নবীন উদ্যম যে কোনও প্রদেশেই উদ্ভাবিত হউক না কেন তাহা ক্রমে শরীরের রক্তস্রোতের ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সঞ্চারিত হইবে।

চিন্তাশীলা এবং কার্য্যকুশলা ভারতরমণীগণের নিমিত্ত এই স্ত্রী মহামণ্ডলী একটি সাধারণ কেন্দ্র স্থল, ইহার অবলম্বনে প্রথমতঃ আপন জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া ক্রমে সমাজের দেশের এবং বিশ্বসংসারের উন্নতি সাধন করিতে আমরা সক্ষম হইব। একই মহৎ আদর্শ আমাদের প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় রমণীর জীবনের লক্ষ্য হইলে আমরা একতার যে সুদৃঢ় সূত্রে গ্রথিত হইব তাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নয়। এই এক লক্ষ্যের আনন্দ আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে উৎসাহিত এবং মহত্ত্বে প্রণোদিত করিবে। পরে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় আপনাদের সামান্য পরিচয় লাভের পর যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাৎসরিক সম্মিলনীর সময় মিলিত হইব তখন সেই অর্দ্ধপরিচিত কিম্বা শ্রুত মাত্র নামা ভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ পরিচয় লাভে এবং দেশহিতকর বিবিধ বিষয় আলোচনা করিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিব? বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র স্বভাবের রমণীগণ একত্রিত হইয়া যখন কেহ আপনার বিবিধ চিন্তা ও উন্নতি চেষ্টা কেহ বা সম্পন্ন কার্য্যের বিবরণী প্রকাশ করিবেন তখন সহানুভূতি দান এবং গ্রহণ করিয়া আরও কত ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহময় বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইব।

এইরূপে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল দেশের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত নারী শক্তি একত্র করিয়া প্রভূত উন্নতি সাধন করিবে—পুঞ্জীভূত তড়িৎ শক্তি বিবিধ তারসংযোগে সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া যেমন আলোক এবং আরাম বিস্তার করে তেমনি আমাদের ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের পুঞ্জীভূত শক্তি বিবিধ শাখা সমিতির দ্বারা ভারতবর্ষের দূরতম প্রদেশ

সমূহে নীত হইয়া উন্নতি শিক্ষা এবং আনন্দ বিস্তার করিবে। শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিসকল পর্ব্বত, মরু, নদী ও সমুদ্রের দূরতার ব্যবধানে যথার্থই ভিন্ন ছিল, কিন্তু আজিকার দিনে বাষ্পীয় যান এবং তড়িৎশক্তি প্রভাবে মানব বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের উদ্ভাবনে তাহারা ভিন্ন নাই এক হইয়া গিয়াছে, দূরতা দূর হইয়াছে, সেতু, সুরঙ্গ, জলপ্রণালী, তাড়িতবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় যান এবং অর্ণবপোত আজ তাহাদের সন্নিকট করিয়াছে। ভারত মহাদেশের ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশ গুলি যে একত্রে সংযোজিত হইয়া এক হইয়াছে; বিভিন্ন জাতি সকল যে এক রাজনৈতিক শাসনাধীন হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ একদিন তাহাদিগকে এক আধ্যাত্মিক সূত্রে গ্রথিত করিবেন ইহাই তাহার পূর্ব্ব সূচনা।

হিন্দুজাতি আমরা আমাদিগকে জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপাপাত্র মনে করি। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র আমাদের চতুর্ব্বেদ তাঁহারি স্বহস্তের দান বলিয়া বিশ্বাস করি। আমরা যে অংশে সকল জাতির মধ্যে কল্যাণবিস্তার করিতে পারি সেই অংশে আমাদেরপ্রতি তাঁহার দয়ার বিশেষ পরিচয়। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে এই বিশাল বিশ্বে যে বিবিধ মানব জাতি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশ্বমানব সংসারের উন্নতির নিমিত্ত কিছু না কিছু গুণ সঞ্চিত আছে, সেই গুণাবলীর সম্মিলনেই সমগ্র মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হইবে। তাই কেবল আর্য্য রমণীকে এই স্ত্রী মহামণ্ডল ভুক্ত করিলে হইবে না, ইণ্ডো-আরিয়ান (ভারতীয় আর্য্য) ইণ্ডো-সেমিটিক, ইণ্ডোমঙ্গোলিয়ন এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সকলকেই ইহার উদার বেষ্টনের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। জাতি বর্ণ ধর্ম্ম রাজনৈতিক মতামত বা দল নির্বিশেষে সকলেই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। এক কর্ম্মসূত্রে ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মনস্বিনীগণকে গ্রথিত করিবে, তাহাদিগকে উদার উন্নতির পথে অগ্রসর করিবে। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সমুদ্রের ন্যায় উদারবক্ষে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সমিতি সকল অসংখ্য স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় আসিয়া একত্র সম্মিলিত হইবে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল একটি প্রকাণ্ড যন্ত্র স্বরূপ, ইহা দেশের বিভিন্ন অংশের সর্ব্বত্র নারী-সাধিত কার্য্যের সংবাদ সংগ্রহ করিবে এবং তাহাদিগকে নিত্য নূতন শুভ কার্য্যের প্রেরণায় উৎসাহিত করিবে। প্রারম্ভে ইহার কার্য্যপ্রণালির বিবিধ স্খলন এবং ত্রুটি থাকিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা করা যায় কাল সহকারে সে সকল সংশোধিত হইয়া উত্তরোত্তর, ইহা অধিকতর সফলতা ও কার্য্যকুশলতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং শোভা ও সম্পদের অধিকারী হইবে।

ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল দেহস্বরূপ এবং বিভিন্ন শাখাবলী তাহার অবয়ব সমূহের ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তারিত থাকিয়া তাহাতেই সংযোজিত থাকিবে। শাখাসমিতিসমূহ প্রাদেশিক সকল মহিলা সমিতিকে একত্রিত করিয়া মহামণ্ডলের সহিত সংযুক্ত করিবে, বাৎসরিক সম্মিলনের সময়ে প্রত্যেক

প্রাদেশিক মহিলাসমিতিগুলি প্রতিনিধির দ্বারা আপনাপন কার্য্যাবলী পাঠ করাইবেন —প্রশংসা ভাজন হইবার জন্য প্রত্যেকেরি চেষ্টা হইবে যাহাতে অপর অঙ্গগুলির অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন হইতে না হয়।

নিম্ন লিখিত প্রকারে ইহার সংগঠন সাধিত হইবে—দেশের মহারাণী রাণী এবং বেগমগণ পর্য্যায় ক্রমে ইহার সভাপত্নীর পদলাভ করিবেন, অভিজাত এবং ভদ্র বংশোদ্ভূতা মহিলাগণ প্রতিনিধি সভাপত্নীর আসন প্রাপ্ত হইবেন! ভারত সাম্রাজ্ঞী ইহার প্রধান পোষয়িত্রী,বড়লাট পত্নী এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক লাট পত্নীগণ ইহার প্রতিনিধি পোষয়িত্রী হইবেন। কার্য্যকরী সভার সভ্য এবং সম্পাদিকা পদের দায়িত্ব প্রায়শঃই ভারতীয় নারীর উপর ন্যস্ত হইবে, এদেশ বাসী ইংরাজ মহিলাদিগের মধ্য হইতে বিশিষ্ট সহায়কারিণী সভ্য গ্রহণ করা হইবে—তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শদ্বারা আমাদিগকে লাভবান করিবেন।

আগামী বৎসরের জন্য কি কি কর্ত্তব্যভার হাতে লওয়া যাইবে এখন তাহাই বিবেচ্য। আমাদের বর্ত্তমান জীবনের প্রধান সমস্যা নারীদিগের শিক্ষা সাধন। একজন ইংরাজ মহিলা যথার্থই বলিয়াছেন—গৃহের সৌষ্ঠব সাধনই নারী জীবনের প্রধান এবং বিশেষ কর্ত্তব্য—কোন পুরুষই আমাদিগকে এ অধিকার চ্যুত করিতে পারেন না। কেননা অলস মধুমক্ষিকা যেমন মধুচক্র রচনা করিতে পারেনা তেমনি কোন পুরুষই একক গৃহ রচনা করিতে পারেন না—তিনি প্রাসাদ এবং দুর্গ নির্ম্মাণে সক্ষম কিন্তু কুবেরের ন্যায় অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের কিম্বা বৃহস্পতির ন্যায় অপার বুদ্ধির অধিকারী হইয়াও তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ চেষ্টা সার্থক হয়না, একার্য্য এই আনন্দ মন্দির রচনা কেবল মাত্র নারীদ্বারাই সাধিত হয়।

গৃহরূপ আনন্দ মন্দির রচনাই যদি নারী জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য হয় তবে তাহাকে তদুপযুক্ত শিক্ষা দান করিতে হইবে। এখন দেখা যাউক গৃহটি কি কি উপাদানে গঠিত। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর আবাস, সুচরিত স্বামী, সখি ও পতিব্রতা স্ত্রী এবং সুবাধ্য সন্তান এই কয়টি জিনিষে মিলিয়া একখানি সুন্দর গৃহ হয়—গৃহকে স্বাস্থ্যের আধার করিতে হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইতে হইবে এবং সেই নিয়মানুসায়িক বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। গৃহকে পরিপাটি ও আরামের আধার করিতে হইলে শিক্ষার দ্বারা নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনের অভ্যাস রাখিতে হইবে, তাহা সর্ব্বদা সুগোছাল রাখিতে হইবে,—মনে রাখিতে হইবে তাহা দুদিনের পান্থশালা নহে তাহা আজীবনের আশ্রয়।

স্বামীর অনুরতাও সঙ্গিনী, তাঁহার সচিব ও সহকারিণী, তাহার বন্ধু ও সান্ত্বনাদাত্রী হইতে হইলে শুধু রন্ধন কার্য্যে নিপুণতায় কুলাইবে না—অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে।

কেবল মাত্র স্বামীতে ভক্তিমতী হইলে হইবে না, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আকাঙ্ক্ষা সকলের সহিত বুদ্ধিপূর্ণ সহানুভূতি থাকা প্রয়োজনীয়—শিক্ষা লাভ না করিলে ইহা ভালরূপ হওয়া অসম্ভব। একজন পুরুষ এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন দেখ,—"কোন ভারত রমণী যথার্থ ভাবে স্বামীর বন্ধু হইতে

পারেন না কেননা আজিও তিনি নিরক্ষর। সংসার ও জগৎ সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা না থাকায়, নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার ছাড়া আর কোন বিষয়ে স্বামীকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নাই বলিলেই হয়। অতীত কালের ভগিনীদিগের ন্যায় আজ তাঁহার সে সাহস নাই যাহার বলে তিনি আপন স্বামীকে অধর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। হিন্দু রমণীর হৃদয়ে সে তেজ সে বিজ্ঞতা আজ কোথায় যার প্রভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন "তুমি যদি মনে করিয়া থাক আমি একক অসহায় তবে আপন অন্তর্যামী বিধাতাপুরুষকে জাননা। তিনি তোমার অন্যায় জানিতেছেন—তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে তুমি পাপকারী। পাপ করিয়া অজ্ঞ মনুষ্য মনে করে তাহা বুঝি কেহই জানিতে পারিল না; কিন্তু দেবতাগণ এবং অন্তর্যামী পুরাণ পুরুষ তাহার পাপের নিত্য সাক্ষী"। কোন আধুনিক মূর্খ ভীরু দুর্ব্বল রমণীর মনে উপরোক্ত কথা বলিতে সাহসে কুলায়না। বর্ত্তমান নারীগণ সাহস এবং গম্ভীর ধৈর্য্যের সহিত না পারেন বিপদ বহন করিতে, না পারেন দুর্ব্যবহারের প্রতিকূলতা করিতে। বিপদসঙ্কুল সংসারসমুদ্রের কাণ্ডারী হওয়াত দূরের কথা তিনি আজ কাল স্বামীর বন্ধু নামেরও যোগ্যা নহেন।"

স্বামীর নৈতিক ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্ত্রীর কল্যাণপ্রভাবের উপর নিভর করে। অন্য একজন পুরুষ বলিয়াছেন "ভারত নারী অশিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষিত পুরুষগণ তাঁহাকে আপনাদিগের যোগ্য সঙ্গিনী মনে করেন না কাজেই তাঁহাদের বিবাহিত জীবন নৈতিকশক্তি বিহীন। স্ত্রী যদি সহধর্ম্মিণী সহকর্ম্মিণী না হইয়া কেবলমাত্র বিলাস এবং উপভোগের সামগ্রী হয় তবে গৃহের মঙ্গল প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। গার্হস্থ্য জীবনের এই হীন অবস্থা দাম্পত্য সম্বন্ধকে নিতান্ত কলুষিত করিয়া ফেলে—এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় পুরুষগণ দিন দিন হীনচরিত্র এবং ধর্ম্ম সম্বল শূন্য হইয়া পড়িতেছেন।" স্বামীকে ধর্ম্ম এবং মহত্বের পথে উৎসাহিত করাই পত্নীর প্রধান এাং শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—অশিক্ষিতা হইলে ইহাতে অকৃতকার্য্য হওয়া ও তৎফলে দুঃখ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে আমরাত বিশেষরূপে জানি ক্ষুদ্র শাখা যেদিকে আনত হয়—বৃহৎ মহীরুহ সেই দিকেই ঝুঁকিয়া থাকে। পরজীবনে সংশোধন চেষ্টা সর্ব্বথা বৃথা হয়। মাতা স্বয়ং যদি সংযম, বাধ্যতা, সত্যবাদিতা, আত্মরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার শিক্ষা না প্রাপ্ত হয়েন তবে কেমন করিয়া সন্তানকে সে শিক্ষা দান করিবেন? সন্তানের যথার্থ শুভজ্ঞানবিরহিত সন্তান স্নেহ ভারতবর্ষীয় গৃহে অকল্যাণের বীজ। পতির কোন দুরূহ উদারকর্ত্তব্য ও চিন্তার অংশে ভাগগ্রাহিতাশূন্য পতিপ্রেম ভারতীয় দাম্পত্যে শনির গ্রহ। স্বাস্থ্য নিয়ম, পরিচ্ছন্নতা ও সময়ের মূল্য জ্ঞানহীন গৃহকার্য্য পরায়ণতা ভারতে গাহস্থ্যধর্ম্মের অঙ্গহানিতা। অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া লজ্জার পরিচয় দান অথচ অশ্লীল বাক্যব্যবহার এবং অশ্লীল সঙ্গীত গান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করা ভারতে নারীত্বের কলঙ্ক। নারীগণের বিবেচনা হীন অযথা দান যথার্থ পক্ষে

ভারতে পরোপকার সাধনের বিশেষ বাধা। উল্লিখিত প্রত্যেক ভ্রান্তি অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্যই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যক।

শিক্ষা বিভাগের কার্য্য বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় শতকরা একজন মুসলমান বা হিন্দুবালিকা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যাইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা স্ত্রী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই জন্যই গৃহে থাকিয়া বালিকাগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহারি ব্যবস্থা বিশেষরূপে ভারতবর্ষীয় সমাজের উপযোগী। আমাদের খ্রীষ্টান ভগিনীগণ এই সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। তবে তাঁহাদের বাইবেল প্রচারের চেষ্টা তাঁহাদের অন্তঃপুর প্রবেশের বিশেষ বাধা—বিশেষতঃ বিদেশী, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন পরিচ্ছদ পরিহিত ও আহার বিহারের রুচি স্বতন্ত্র হওয়ায় শিক্ষয়িত্রী এবং শিষ্যার মধ্যে সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় হয় না এবং কচিৎ তাঁহারা ছাত্রীদিগের হৃদয় স্পর্শ করিতে কিম্বা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে সক্ষম হয়েন। অশিক্ষিত ভগিনীদিগকে শিক্ষা দান করা তাহাদের জীবনে শিক্ষার নবীন আলোক ও আনন্দ আনয়ন করাই আধুনিক শিক্ষা সৌভাগ্যবতী ভারত রমণীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

সেই জন্যই অন্তঃপুর-শিক্ষা-প্রচার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সর্ব্ব প্রথম সাধ্য! এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশে অর্থ ও স্বেচ্ছা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ ও বেতনপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। ভবিষ্যতে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে এই উদ্দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংগৃহীত টাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন রাখা যাইবে।

ভারত নারীর জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা এবং ভারতীর সাহিত্যের উন্নতি সাধন আমাদিগের দ্বিতীয় সাধ্য।

এই নিমিত্ত প্রথম প্রথম আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইংরাজী পুস্তক সকল ভাষান্তর এবং আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মহামণ্ডলের প্রত্যেক শাখা সভায় এই কার্য্যের জন্য লেখিকা নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় নির্ব্বাচিত পুস্তক সকল অনুবাদ করিবেন—তৎপরে তাহা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়া অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইবে। যতদিন না হয় ততদিন যোগ্য যে কোন পুস্তক পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারী হস্তের শিল্পকার্য্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ভাণ্ডার স্থাপন করা মহামণ্ডলের তৃতীয় সাধ্য।

বিস্তৃত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারীগণের চিকিৎসার জন্য যে যে আয়োজন আছে—ভারতীয় নারীগণ তাহা হইতে কতদূর লাভ উঠাইতেছেন, এ বিষয়ে কোন্ কোন্ বাধা বর্ত্তমান আছে এবং কোন্ উপায়েই বা সে সকল সুন্দররূপে দূর করা সম্ভব এই বিষয়ক অনুসন্ধানই এই বৎসরের চতুর্থ এবং সর্ব্বশেষ কার্য্য। *

শ্রীসরলা দেবী।

* গত ৩০ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে আহূত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের বৃহতী সভায় ইংরাজী ভাষায় পঠিত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত।

চয়ন।

হিউয়েনসাং প্রণীত সিউ-ইউ-কি।

সাংহোপুলো (সিংহপুর)।

সিংহপুর রাজ্য ৩৫০০ কি ৩৬০০ লি বিস্তৃত। ইহার পশ্চিমে সিন্ধু নদী। রাজধানী ১৪।১৫ লি; চতুস্পার্শে দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে সুরক্ষিত রাখিয়াছে। ভূমি রীতিমত কর্ষণ করা হয় না কিন্তু তত্রাপি দেশে প্রচুর শস্য জন্মে। শীত ঋতুই প্রবল; অধিবাসীরা নিষ্ঠুর, সাহসী এবং অত্যন্ত প্রতারণা-পরায়ণ। এই দেশ কাশ্মীরের অধীন। রাজধানীর দক্ষিণে অশোক-রাজ নির্ম্মিত স্তূপ। কারুকার্য্যগুলি বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু অনবরত এই স্তূপে অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। নিকটেই জনশূন্য সঙ্ঘারাম; উহাতে কোন যতি নাই।

নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বে ৪০ কি ৫০ লি দূরে অশোক-রাজ নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ। ইহা উচ্চে ২০০ ফুট। এই স্থানে দশটী পুষ্করিণী; ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সংযোগ আছে। দক্ষিণে ও বামে আবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ রাশি। পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ কিন্তু তরঙ্গগুলি মধ্যে মধ্যে শব্দ করে। সর্প ও অন্যান্ত নানাপ্রকারের মৎস্য ইহাতে বাস করে। চতুর্ব্বর্ণের পদ্ম স্বচ্ছ জল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। শত শত প্রকারের ফলের বৃক্ষ পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে থাকিয়া নানারূপে ছায়া প্রদান করে। বৃক্ষের ছায়া জলে প্রতিবিম্বিত হয় এবং ভ্রমণের জন্য এই স্থান অত্যন্ত উপযোগী।

নিকটে জনশূন্য সঙ্ঘারাম। শ্বেতাম্বরদিগের শিক্ষক স্তূপের সন্নিকটে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। নিকটেই দেবতাদিগের মন্দির। যে সকল ব্যক্তি এই মন্দিরে বাস করে, তাহারা কঠোর তপস্যা করেন। দিবারাত্রির মধ্যে একবারও অবসর গ্রহণ করেন না। ইহাদের প্রবর্ত্তক, বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক হইতে বুদ্ধের আদেশাবলী অপহরণ করিয়াছেন। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং তদনুযায়ী নিজেদের উপদেশ নির্ব্বাচিত করেন। প্রধানগণ ভিক্ষু নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন; কনিষ্ঠগণ শ্রমণ নামে অভিহিত হন। আচার ব্যবহারে তাহারা বৌদ্ধ যতিগণের ন্যায় কিন্তু ইহাদের মস্তকে শিখা আছে এবং ইহারা উলঙ্গ। যদি কোন সময় বস্ত্র ব্যবহার করিবার ইচ্ছা হয়, তবে শুভ্র বস্ত্র ব্যবহার করে। অপরের সহিত ইহাদের এই মাত্র প্রভেদ।

টাচাসিলোর উত্তর সীমার দিকে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া আমরা দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ২০০ শত লি অগ্রসর হইয়া যে স্থানে মহাসত্ত্ব রাজকুমার রূপে মার্জ্জারের আহারের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হই। এই স্থানের ৪০।৫০ পদ দক্ষিণে প্রস্তর স্তূপ আছে। এই স্থানেই মহাসত্ত্ব মার্জ্জারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বংশদণ্ড দ্বারা নিজ শরীর বিদ্ধ করিয়া নিজ রক্ত মার্জ্জারকে দান করিয়াছিলেন। মার্জ্জার এই রক্ত পান করিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই স্থানের মৃত্তিকা ও বৃক্ষাদি রক্তবর্ণ। মৃত্তিকা খনন করিলে কণ্টকময় যষ্টি এখনও পাওয়া যায়। গল্পটী বিশ্বাসযোগ্য কিনা ইহা বিচার না করিলেও, ইহা যে করুণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে স্থানে মহাসত্ত্ব নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরেই রাজা অশোক নির্ম্মিত দুই শত ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তূপ আছে। ইহা কারুকার্য্যে সমন্বিত। মধ্যে মধ্যে অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। এই স্মরণীয় স্থানের চতুস্পার্শে একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপে চলনশীল প্রস্তরের কুলঙ্গী আছে। পীড়িত ব্যক্তি এই স্থান প্রদক্ষিণ করিলে আরোগ্য লাভ করে। স্তূপের পূর্ব্বে একটী সঙ্ঘারাম আছে। তথায় মহাযানমতাবলম্বী একশত যতি বাস করেন। ৫০ লি পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া আমরা এক নির্জ্জন পর্ব্বতে উপস্থিত হই। এই স্থানে এক সঙ্ঘারামে

২০০ শত যতি বাস করেন। ইহারা সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। এখানে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও ফল পাওয়া যায়। পুষ্করিণী ও ঝরণার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। এই মাঠের নিকটে প্রায় ৩০৫ শত ফিট উচ্চ স্তূপ আছে। তথাগত পুরাকালে এইস্থানে বাস করিতেন এবং এক দুষ্ট যক্ষকে মাংস ভক্ষণ হইতে বিরত করেন। দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ৫০০ লি যাইয়া আমরা উলাশি (উরাস) দেশে পৌঁছি।

উ-লা-সি।

এই রাজ্য প্রায় ২০০০ লি বিস্তৃত। উপত্যকা ও পর্ব্বতগুলি অবিচ্ছিন্ন। রাজধানী ৭।৮ লি বিস্তৃত। এদেশে রাজা নাই; দেশ কাশ্মীরের অধীন। ভূমি কর্ষণ ও বপনের উপযোগী কিন্তু ফল পুষ্প কম। জল বায়ু উত্তম; অধিক বরফ বা তুষার নাই। অধিবাসীরা বর্ব্বর ও প্রতারণা-পরায়ণ। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহাদের আস্থা নাই।

রাজধানীর ৪।৫ লি দক্ষিণ পশ্চিমে অশোকরাজ নির্ম্মিত স্তূপে কয়েক জন যতি বাস করেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও গিরিশৃঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় এক সহস্র লি যাইয়া আমরা কিয়া সিমিলো (কাশ্মীর) পৌঁছি।

কাশ্মীর।

কাশ্মীর প্রায় সাত সহস্র লি বিস্তৃত এবং এই রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতশ্রেণী। পর্ব্বতগুলিও খুব উচ্চ। পর্ব্বতমধ্যস্থিত গিরিসঙ্কট গুলি সঙ্কীর্ণ। নিকটবর্ত্তী কোন রাজাই ইহাকে আক্রমণ করিয়া জয় লাভ করিতে পারেন নাই। রাজধানীর পশ্চিমাংশে বৃহৎ নদী। রাজধানী উত্তর দক্ষিণে ১২ কি ১৩ লি এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪ কি ৫ লি। শাক সব্জী উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত এবং দেশে যথেষ্ট ফল পুষ্প পাওয়া যায়। এই দেশে দৈত্য—ঘোটক, সুগন্ধি, হরিদ্রা ও ভেষজ লতা পাওয়া যায়।

জলবায়ু শৈত্যপ্রধান। যথেষ্ট বরফ পড়ে কিন্তু ঝটিকা নাই। অধিবাসীরা চর্ম্মের অঙ্গরাখা ও শুভ্রবস্ত্রব্যবহার করে। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের জনসাধারণের উপরে ইহারা কর্তৃত্ব করে। অধিবাসীরা দেখিতে সুশ্রী কিন্তু প্রতারক। ইহারা উপযুক্ত রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যাভ্যাসে রত। অবিশ্বাসী ও ধার্ম্মিক উভয় প্রকার লোকই ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় একশত সঙ্ঘারাম ও ৫ সহস্র যতি আছে। অশোকরাজ নির্ম্মিত ৪টী স্তূপ আছে। প্রত্যেকটীতেই তথাগতের শরীরচিহ্ন বিদ্যমান। দেশের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ—এই দেশে পূর্ব্বে এক বিশাল হ্রদ ছিল। পুরাকালে বুদ্ধদেব উদ্যান দেশ হইতে এক দৈত্যকে দমন করিয়া মধ্যদেশে (ভারতবর্ষে) আগমন করিতেছিলেন। তখন মধ্যাকাশে তিনি আনন্দকে বলিলেন "আমার নির্ব্বাণের পরে অর্হৎ মধ্যান্তিকা এই দেশে রাজ্যস্থাপনা করিবেন, ও অধিবাসী-দিগকে দমন করিয়া স্বকীয় ক্ষমতায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন। নির্ব্বাণের অর্দ্ধশত বৎসর পরে, আনন্দের শিষ্য মধ্যান্তিকা, ষড়ভিজ্ঞ হইয়া এবং অষ্ট বিমোক্ষ লাভ করিয়া বুদ্ধের ভবিষদ্বাণী অবগত হন। তাঁহার অন্তঃকরণ এ সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, তিনি এই দেশে আগমন করেন। উচ্চ এক পর্ব্বতের শীর্ষভাগে অধিবেশন করিয়া তিনি দৈত্যকে অনৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইতে লাগিলেন। দৈত্য এই দৃশ্যে আশ্চর্য্য হইয়া অর্হতের কি ইচ্ছা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। অর্হৎ দৈত্যের নিকট কেবল মাত্র তাঁহার বসিবার স্থান প্রার্থনা করিলেন। দৈত্য তাঁহার বসিবার জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থান হইতে জল অপসরণ করিল। অর্হৎ তৎপরে নিজ দৈবশক্তিবলে নিজের শরীর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যরাজও জল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। এই প্রকারে হ্রদ জলশূন্য হইল। ইহাতে নাগ পরাজিত হইয়া বাসের জন্য স্থান প্রার্থনা করিল। অর্হৎ তখন বলিলেন যে ঐস্থানের উত্তর পশ্চিম কোণে ১০০ লি বিস্তৃত একটী ক্ষুদ্রজলাশয় আছে। ঐস্থানে দৈত্য ও তাহার বংশাবলী বাস করিতে পারিবে। দৈত্য তখন নিবেদন করিল যে হ্রদ ও দৈত্যের আবাস স্থল যখন হস্তান্তর হইয়াছে, তখন অর্হৎকে পূজা করিবার জন্য তাহাকে আদেশ দেওয়া হউক।

মধ্যান্তিকা উত্তর করিলেন যে "কিছুদিন পরেই আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইব ; সুতরাং আমার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন করিয়া আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি ?" নাগ তখন উত্তর করিল যে তাহা হইলে ৫০০ শত অর্হৎ যেন বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পূজা গ্রহণ করেন। তৎপর সে মধ্যান্তিকার নিয়োজিত স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া বাস করিবে।" মধ্যান্তিকা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

অর্হৎ এই প্রকারে নিজ দৈবশক্তিবলে এই দেশ গ্রহণ করিয়া ৫০০ শত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপর যতিগণের সেবাশুশ্রূষার জন্য তিনি নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ হইতে অনেক গুলি দরিদ্র লোক ক্রয় করিলেন। কিন্তু তদ্দেশীয় উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যান্তিকার নির্ব্বাণের পর এই নিম্ন-শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের 'ক্রীত' আখ্যা দান করিল। কারণগুলি হইতে এইক্ষণে বুদ্বুদ বাহির হইতেছে।

তথাগতের নির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে মগধরাজ অশোক পৃথিবীপতি হইলেন এবং দূর দেশের লোকের নিকটও তিনি সম্মানিত হইতেন। তিনি ত্রিরত্নকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং সকল জীবকেই সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তিনি ৫০০ অর্হৎ এবং ৫০০ শত ভিন্ন মতাবলম্বী পুরোহিতকে প্রভেদশূন্য ভাবে দেখিতেন। শেষোক্ত দিগের মধ্যে মহাদেব নামক এক সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেন। যিনি তাঁহার খ্যাতির কথা অবগত হইতেন তিনিই তাঁহার সংসর্গে যাইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইতেন। রাজা অশোক সাধু ও সাধারণ মনুষ্যে প্রভেদ না বুঝিতে পারিয়া এবং বিশেষতঃ যাহারা রাজদ্রোহী তাহাদেরই আনুকূল্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া যতিগণকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন করাইবেন বলিয়া গঙ্গাতীরে এক সভা আহুত করিলেন।

অর্হৎগণ বিপদাশঙ্কা করিয়া নিজেদের ঐশ্বরিক শক্তিবলে আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া এই দেশে পৌঁছিয়া—পর্ব্বতে ও উপত্যকায় লুক্কায়িত রহিলেন। অশোক এই সংবাদে অনুতপ্ত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন এবং অর্হৎগণকে তাঁহাদের স্বদেশে প্রত্যা-গমনের অনুমতি দিলেন। কিন্তু অর্হৎগণ অস্বীকৃত হইলেন। রাজা অশোক, তৎপর, অর্হৎগণের জন্য পাঁচশত সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া এই দেশ তাঁহাদের দান করিলেন।

তথাগতের নির্ব্বাণের চারিশত বৎসর পরে রাজা কনিষ্ক রাজপদে আসীন হইয়া দেশ দেশান্তর জয় করেন। রাজকার্য্যের অবসর সময়ে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। প্রত্যহ তিনি প্রাসাদে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য আচার্য্য আহ্বান করিতেন কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন যে ভিন্ন ভিন্ন মতে যথেষ্ট পার্থক্য। ইহাতে তিনি সন্দিগ্ধ হইলেন কিন্তু কোন প্রকারেই সন্দেহ ভঞ্জনে সক্ষম হইলেন না। এইসময়ে মাননীয় পার্শ্ব বলিলেন যে "তথাগতের নির্ব্বাণের পর অনেক বৎসর এবং অনেক মাস অতি-বাহিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ গুরুর পুস্তকানুযায়ী মতের অনুসরণ করে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতের অনুসরণের জন্য এত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।" রাজা এই সংবাদে অত্যন্ত কাতর হইয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পার্শ্বকে বলিলেন "যদিও আমার নিজের কোন পুণ্যবল নাই তত্রাপি বুদ্ধদেবের জন্ম জন্মান্তরে যে পুণ্য সঞ্চিত করিয়াছি, তাহারই ফলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আমার স্বকীয় হীন জন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া সত্যধর্ম্ম রাখিবার চেষ্টা করিব। এই জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ানুযায়ী ত্রিপিটক চর্চ্চার ব্যবস্থা করিব।" পার্শ্ব তদুত্তরে বলিলেন যে, রাজার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এই উচ্চাবস্থা তিনি এই জন্মে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মপদ্ধতি বজায় রাখেন, ইহাই পার্শ্বের একান্ত ইচ্ছা। রাজা দূর দেশান্তর হইতে যতিগণকে আহ্বান করিলেন।

এই সংবাদে চতুর্দ্দেশ হইতে সকলে সমবেত হইতে লাগিলেন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অযুত লি দূর হইতে এই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। সপ্তদিবস ধরিয়া

রাজা নানা প্রকার উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সস্নেহ বাক্যে যতিগণকে বলিলেন যে তাহারা অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাহারা সাংসারিক মায়ায় বদ্ধ তাঁহারা প্রস্থান করুন। কিন্তু তত্রাপি অনেক যতি রহিয়া গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয় আদেশ প্রচার করিলেন যে যাহারা শ্রমণত্ব লাভের জন্য বিদ্যার্জ্জন করিতেছেন তাঁহারা প্রস্থান করুন। কিন্তু তত্রাপি লোক সংখ্যা যথেষ্ট রহিল। ইহাতে রাজা আদেশ করিলেন যে যাহারা ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী ও ষড়ভিজ্ঞ তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতেও লোকসংখ্যা যথেষ্ট কমিল না। পুনরায় তিনি অন্য আদেশ প্রচার করিলেন যে, যাহারা ত্রিপিটকে ও পঞ্চবিদ্যায় পারদর্শী তাঁহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলে প্রস্থান করিতে পারেন। এই প্রকারে মাত্র ৪৯৯ জন যতি রহিলেন। পরে রাজা স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলেন। তিনি রাজগৃহে, যেস্থানে কশ্যপ সম্মিলনী আহ্বান করিয়াছিলেন তথায় যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। মাননীয় পার্শ্ব ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে এই উপদেশ দিলেন যে "তথায় অনেক অবিশ্বাসী আছে এবং তথায় বিচার আরম্ভ হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের জন্য বিশেষ সুবিধা হইবে। সম্মিলনী এই স্থানই পছন্দ করিয়াছেন। এ দেশের চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত শ্রেণী। যক্ষগণ এই দেশ রক্ষা করে; ভূমি উর্ব্বরা ও উৎপাদিকাশক্তি বিশিষ্টা এবং এ স্থানে যথেষ্ট আহার্য্য পাওয়া যায়। এই স্থানে ঋষি ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বাস করেন এবং এই স্থানেই স্বর্গীয় ঋষিগণ ভ্রমণ করেন।'

সম্মিলনী বিবেচনা করিয়া রাজার সহিত একমত হইলেন। অর্হৎ সমভিব্যহারে রাজা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ করিলেন। বসুমিত্র এই সম্মিলনীর সভাপতি হইলেন। বিচারে যে সকল বিষয় দুর্ব্বোধ্য হইত তাহা তিনিই মীমাংসা করিতেন। এই পাঁচশত যতি প্রথমতঃ সূত্রপিটক ব্যাখ্যার জন্য একলক্ষ শ্লোক দ্বারা উপদেশ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। পরে অভিধর্ম্ম পিটক ব্যাখ্যার জন্য তাঁহারা লক্ষ শ্লোক দ্বারা অভিধর্ম্মবিভাগ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা ছয়শত ষাট অযুত শব্দ দ্বারা ত্রিশ অযুত শ্লোক রচনা করিয়া ত্রিপিটক ব্যাখ্যা করিলেন। এই পুস্তকের সহিত প্রাচীন কোন পুস্তকেরই তুলনা হয় না; ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সকল প্রশ্নের সমাধানই এই বিরাট গ্রন্থে হইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থ সকল দেশে সমাদৃত হইতে লাগিল।

কনিষ্করাজ লোহিত বর্ণের তাম্রপত্রে এইগুলি খোদিত করিয়া প্রস্তরাধারে তাহা রক্ষা করিয়া মোহর যুক্ত করিয়া এবং উহা মধ্যস্থলে রাখিয়া এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। যাহাতে অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই সকল শাস্ত্রে অধিকার না পায় তজ্জন্য তিনি যক্ষগণকে এদেশ রক্ষার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এই কার্য্য সমাপন করিয়া তিনি সসৈন্যে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

এই দেশ হইতে পশ্চিম দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া তিনি পূর্ব্বাস্য হইয়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইয়া, এই সমগ্র রাজ্য যতিগণকে দান করিলেন। কনিষ্কের মৃত্যুর পরে "ক্রীত"গণ পুনরায় রাজ্যাধিকার করিয়া যতিগণকে নির্ব্বাসন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিল।

টোহলো দেশীয় হিমতালের রাজা শাক্যবংশীয়। বুদ্ধের নির্ব্বাণের ছয়শত বৎসর পরে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের রাজত্ব পাইয়া পুনর্ব্বার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হন। ক্রীতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে এই সংবাদে তিনি সহস্র যোদ্ধাকে বণিকের বেশে সজ্জিত করিয়া গোপনে অস্ত্র সহ উহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর, ঐ দেশীয় রাজা তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। তিনি পাঁচশত যোদ্ধাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া উৎকৃষ্ট পণ্য সহ রাজার নিকট প্রেরণ করেন। পরে, হিমতালের রাজা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজসিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্রীতগণের রাজা ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। পরে রাজার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া হিমতালের রাজা

সভাসদগণকে বলিলেন যে "আমি হিমতালের রাজা। নীচ জাতীয় রাজা এই সকল অত্যাচার করিতেন বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম; এইজন্য আমি অদ্য তাহার মস্তকচ্যুত করিয়াছি। কিন্তু অধিবাসীদিগের কোনই অপরাধ নাই।" মন্ত্রীগণকে নানা দেশে নির্ব্বাসন করিয়া, তিনি যতিগণকে প্রত্যাগমনে আদেশ দিলেন। এবং সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের বাসের সুবন্দোবস্ত করিলেন। পরে তিনি পশ্চিম দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পূর্ব্বাস্ত হইলেন এবং রাজ্য যতিগণকে দান করিলেন। ক্রীতগণ এই প্রকারে কয়েকবার স্বাধিকার চ্যুত হইল কিন্তু পরে পুনরায় তাহারা এদেশ অধিকারে সক্ষম হইল। এই কারণে বর্ত্তমানে এই দেশে অবিশ্বাসী-গণেরই অধিক প্রভাব।

নূতন নগরের ১০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পুরাতন নগরের উত্তরে এবং বৃহৎ এক পর্ব্বতের দক্ষিণে সঙ্ঘারামে ৩০০ যতি বাস করেন। মঠ সংলগ্ন স্তূপে দেড় ইঞ্চি দীর্ঘ শ্বেতপীতাভবর্ণ বুদ্ধ-দন্ত আছে। পূজার দিন এই দন্ত জ্যোতিবিকীর্ণ করে। পূরাকালে ক্রীতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, যতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিল। এই সময়ে একজন শ্রমণ ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধদেবের যত স্মৃতিচিহ্ন আছে তাহা দর্শনে অভিলাষী হইয়া নিজ দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া প্রত্যা-গমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে হস্তীযূথ দেখিয়া তিনি এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। হস্তীযূথ জলপান করিয়া, ঐ বৃক্ষের মূল উৎপাটন করিয়া বৃক্ষকে ভূমিশায়ী করিল। তৎপরে শ্রমণকে পৃষ্ঠে করিয়া নিবিড় বনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তথায় আহত এক হস্তী ছিল। শ্রমণের হস্ত লইয়া পীড়িত হস্তী তাহার ক্ষত স্থান দেখাইয়া দিলে, শ্রমণ সেই স্থান হইতে ক্ষুদ্র বংশ খণ্ড বাহির করিলেন। পরে ঐ স্থানে ঔষধি প্রয়োগ করিয়া নিজ পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। অন্য একটী হস্তী একটী স্বর্ণাধার আনয়ন করিয়া উহা আহত হস্তীকে প্রদান করিলে, হস্তী উহা শ্রমণকে প্রদান করিল। শ্রমণ আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহাতে বুদ্ধদেবের দন্ত আছে। পরে সকল হস্তীগুলি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। পরদিন প্রত্যেক হস্তী তাঁহার মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য ফল আনয়ন করিলে, তিনি আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে তাহারা তাঁহাকে বহন করিয়া অনেক দূর আনয়ন করিয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

শ্রমণ ঐ দেশের পশ্চিম সীমায় এক বেগবতী নদী পার হইতে লাগিলেন। ঐ সময় নৌকা নিমজ্জনের সম্ভাবনা দেখিয়া অন্যান্য আরোহীগণ স্থির করিল যে শ্রমণের নিকট নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন আছে এবং ঐ চিহ্নের লোভেই দৈত্যগণ নৌকার এই দশা করিতেছে। নৌকাস্বামী শ্রমণের দ্রব্যাদি পরীক্ষা দ্বারা ঐ দন্ত দেখিতে পাইলেন। তখন শ্রমণ ঐ চিহ্ন ঊর্দ্ধে ধরিয়া মস্তক নত করিয়া নাগগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ইহা এই ক্ষণ তাহাদেরই নিকট ন্যস্ত রহিল; প্রত্যাগমন করিয়া তিনি উহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন। পরে তিনি নদী উত্তীর্ণ হইতে অস্বীকার করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া নদীকে সম্বোধন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে "এই দৈত্যগণকে দমন করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়াই আমার এই দুর্দ্দশা।" পরে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া দৈত্য-দমন শিক্ষা করিলেন এবং তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নদীতীরে বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। নাগগণ তাঁহার নিকট বুদ্ধদেবের দন্তাধার আনয়ন করিল। শ্রমণ উহা গ্রহণ করিয়া এই সঙ্ঘারামে আনয়নপূর্ব্বক সেই সময় হইতে পূজা করিতেছেন।

এই সঙ্ঘারামের ১৪।১৫ লি দক্ষিণে ক্ষুদ্র এক সঙ্ঘারামে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দণ্ডায়মান প্রতিমূর্ত্তি আছে। যদি কেহ অবলোকিতেশ্বরকে না দেখিয়া অনশনে দেহ ত্যাগ করে, তবে এই প্রতিমূর্ত্তি হইতে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব বহির্গত হয়। ক্ষুদ্র সঙ্ঘারামের দক্ষিণপূর্ব্বে ৩০ লি দূরে বৃহৎ পর্ব্বতে প্রাচীন সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্ত্তমানে

মহাযান মতাবলম্বী ৩০ জন যতি এই স্থানে বাস করেন। এই স্থানে স্তায়ানুসার শাস্ত্র প্রণয়ণকারী সঙ্ঘভদ্র বাস করিতেন। সঙ্ঘারামের দক্ষিণস্তূপে অর্হৎগণের শরীর রক্ষিত হইতেছে। পার্ব্বত্য পশু ও বানরগণ পুষ্পোপহার প্রদান করে। অনেক অনৈসর্গিক ব্যাপার এই পর্ব্বতে সম্পাদিত হয়। অনেক সময় পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে অশ্বের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় কিন্তু বস্তুতঃ অর্হৎ ও শ্রমণগণ যাহারা এই স্থানে সমবেত হন, তাঁহাদের অঙ্গুলি অঙ্কিত ছায়া দ্বারাই এই সকল মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

যে সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত আছে, তাহার দশ লি পূর্ব্বে পর্ব্বত মধ্যে ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম আছে। পুরাকালে স্কাণ্ডিল্য এই স্থানে বিভাস-প্রকরণপদশাস্ত্র প্রণয়ণ করেন। নিকটে পঞ্চাশ ফুট উচ্চ স্তূপে একজন অর্হৎ ছিলেন। তাঁহার হস্তীর ন্যায় পান ভোজন ছিল। লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত যে তিনি পেটুকের ন্যায় আহার করিতে পারেন কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে কি জানেন? নির্ব্বাণকালে সমবেত জনসাধারণকে অর্হৎ বলিলেন যে, "কিছুদিনের মধ্যেই আমি অণুপরিশেষ অবস্থায় উপস্থিত হইব। কি করিয়া ইহা সম্ভব তাহাই আমি এইক্ষণ ব্যাখ্যা করিব।" জনসাধারণ এই বাক্যে আরও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। পরে অর্হৎ এই প্রকারে নিবেদন করিলেন "পূর্ব্বজন্মে আমি হস্তী ছিলাম এবং আমি পূর্ব্বাঞ্চলে কোন রাজার হস্তীশালায় বাস করিতাম। এই সময়ে এই দেশে জনৈক শ্রমণ বাস করিতেন। রাজা আমাকে এই শ্রমণকে দান করেন। বুদ্ধদেবের পুস্তক বহন করিয়া আমি এই দেশে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হই। এই সকল পুস্তক বহন করিবার পুণ্যফলে আমি মরিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করি এবং পরজন্মে আবার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে সন্ন্যাসীর রঞ্জিত বসন পরিধান করি। পরে অনবরত চেষ্টা করিয়া আমি ষড়বিদ্যা লাভ করি। যদিও আমি পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ অত্যধিক আহার করি, কিন্তু তত্রাপি আমার যাহা আবশ্যক তাহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র গ্রহণ করি।" তাঁহার কথায় কেহই প্রত্যয় লাভ করিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি সমাধি দ্বারা আকাশে উঠিলেন। তাঁহার শরীর হইতে ধূম ও অগ্নি বাহির হইতে লাগিল এবং তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অস্থি নিম্নে পতিত হইল এবং সেই স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হইল।

রাজধানী হইতে প্রায় ২০০ শত লি পশ্চিমে যাইয়া আমরা মৈলিন সঙ্ঘারামে পৌঁছি। এই স্থানে পূর্ণ বিভাসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। নগরের ১৪০ কি ১৫০ মাইল পশ্চিমে মহাসঙ্ঘিকাগণের সঙ্ঘারাম আছে। তথায় একশত যতি বাস করেন। এই স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ বোধিনাতত্ত্বসকল্প শাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে আমরা পুণাচ দেশ ও রাজপুর রাজ্য হইয়া তক্ষদেশে পৌঁছি।

(তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

স্ত্রীসেনা।

নারী সৈন্যের বিবরণ যদিও পুরাতন বহু গ্রন্থে পাওয়া যায় তবুও অনেকে তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিতে চাহেন না, অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস তাহা গ্রন্থকর্ত্তাদিগের উর্ব্বর কল্পনা প্রসূত। সম্প্রতি নারী সৈন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নূতন এমন সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে সে বিষয়ে অবিশ্বাস করিবার আর কোন উপায় নাই। এই স্ত্রী স্বাধীনতা পক্ষপাতের দিনে, সুদূর অতীতেও যে নারীগণ পুরুষোচিত বলবীর্য্য প্রকাশ করিতেন,

এবং বীরের ন্যায় কঠোর কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইয়াছিলেন সে তথ্য সকলেরি নিকট প্রীতিজনক হইবে আশা করা যায়।

সম্প্রতি ইতালীর মধ্য প্রদেশে বেনমণ্ট নামক স্থানে সমাহিত কতকগুলি ইট্রস্কান ভাস্কর মূর্ত্তি আবিষ্কারদ্বারা নারী সৈন্যের অস্তিত্ব নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইট্সকানগণ এক রহস্যময় জাতি, রোমক অভ্যুত্থানের বহু শতাব্দি পূর্ব্বেই তাহারা সভ্যতার সর্ব্বোচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বেনমণ্ট ভূগর্ভউৎখাত দুইটি বহু প্রাচীন সমাধির বহিপ্রাচীর গাত্রে নারী সৈন্যের সংগ্রাম দৃশ্য খোদিত আছে। কোনও রমণী রথ চালনা করিতেছেন, কেহ সগর্ব্বে অশ্ব চালনা করিতে প্রবৃত্ত অপর কেহ বা বর্ষাহস্তে দ্বন্দ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল যুদ্ধদৃশ্যে তাঁহারা নিয়তই পুরুষদিগকে পরাজয় করিয়া জয় গৌরবে গর্ব্বিত। পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিশাল বক্ষে অকুতোভয়ে নিষ্ঠুর সাহসের সহিত অসি কিম্বা বল্লম প্রোথিত করিয়া দিতে উদ্যত, এবং পরাভূত পুরুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন। নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের দৃঢ় মাংসপেশী সম্বদ্ধ বাহুযুগল দেখিয়া স্বতই তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বলশালী মনে হয়। সমাধি মধ্যে দুইটি সবল কায় প্রকাণ্ড নারীকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে আর সেইখানেই তাঁহাদের ধাতুনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, তরবারি এবং বর্ষাখণ্ড রক্ষিত আছে। পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস ইহাদিগের মধ্যে একজন লাটিন কবি ভার্জ্জিন বর্ণিত অসীম প্রতাপশালী চিরকুমারী সাম্রাজ্ঞী কামিনা।

হার্কিউলিনিয়াসের ভগ্নাবশেষ মধ্য হইতে অল্পকাল পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত অনেকগুলি অতি সুঠাম যুদ্ধরতা নারীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, প্রত্যেকটিতেই নারীগণ যে জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আছেন তাহার সহিত রোমক কিম্বা গ্রীসীয় পরিচ্ছদের কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না—এবং এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁহাদের বাস্তবিকতার সাক্ষ্যস্বরূপ উল্লেখিত হইয়া থাকে। গ্রীসদেশীয় ভাস্কর এই মূর্ত্তিগুলি খোদিত করিয়াছেন, এগুলি যদি কেবল তাঁহার কল্পনা প্রসূত হইত তাহা হইলে স্বভাবতঃই সেগুলি তিনি স্বীয় জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিতেন।

গ্রীক পুরাণে দেখা যায় এই যোদ্ধা স্ত্রীজাতি আসিয়া মাইনরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু আধুনিক Boghany Kniএর ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে থার্মোডন নদীতীরে ক্যাপাডোসিয়া নামক স্থানে তাঁহাদের আদিম নিবাস। সেখান হইতে আসিয়া মাইনরবাসীদিগকে পরাভব করিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন অভিপ্রায়ে অভিযান করেন। এই রাজত্ব সম্পূর্ণ ই স্ত্রীশাসনের অধীন ছিল। কখনও যদি কোন নারী স্বয়ম্বরা হইতে ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজ্যের পুরুষকে তিনি মনোনীত করিতে পারিতেন—কিন্তু স্বামীটিকে বন্দী কিম্বা শিক্ষানবীশভাবে বাস করিতে হইত; পত্নী যেদিন ইচ্ছা সেইদিনই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিতেন। রাজ্যে পুরুষ সন্তান হইলেই

তাহাদিগকে রাজ্যান্তরে প্রেরণ করা নতুবা মারিয়া ফেলা হইত।

এই স্ত্রী সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাজ্ঞী পেন্‌থেসিনিয়ার বীরত্ব কাহিনী ইনিয়াডে বর্ণিত আছে। যখন বীরশ্রেষ্ঠ হেক্টর হত হইলেন, যুদ্ধ জয়ের আশা ক্ষীণ হইল, তখন ট্রোজানগণ এই সাম্রাজ্ঞীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। পেন্‌থেসিনিয়া পঞ্চ সহস্র সেনা লইয়া তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণ অনেকেই তাঁহাদের ভৈরব বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই স্ত্রী সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া গ্রীকগণ এমনই ভীত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহাদের উচ্চ তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার শুনিবামাত্র পলায়ন করিত। পেন্‌থেসিনিয়ার হস্তে গ্রীসীয় অনেক শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হয়েন; পরিশেষে আকিনিসের সহিত যুদ্ধে রাজ্ঞী প্রাণ হারান। যুদ্ধের পর আকিনিস তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্য এবং তরুণ বয়স দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ভাবে বালকের ন্যায় রোদন করায় কোনও অভদ্র গ্রীকযুবা তাঁহাকে উপহাস করে। এই কারণে তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্যে এই স্ত্রী সেনার বহুবিধ কৌতূহলজনক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত অমিত-বলশালী হার্কিউলিস বীরোচিত যে দ্বাদশ কার্য্যের জন্য চিরস্মরণীয় তাহার মধ্যে এই স্ত্রী রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হিপোলিটার মেখলা সংগ্রহ করিয়া আনা অন্যতম।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ব্রহ্মে বো-টো।

ব্রহ্মে যখন ইংরেজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সে দেশে বো-টো নামে এক প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। তাহার প্রভাবে সকলেই সশঙ্কিত থাকিত। তাহার এরূপ এক আশ্চর্য্য চতুরতা ছিল, যে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পর্য্যন্ত তাহাকে বহু চেষ্টাতেও ধরিতে পারেন নাই।

অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ইংরাজেরা তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করিলেন, এবং প্রচার করিলেন যে, যে কেহ বো-টোর মস্তক লইয়া আসিতে পারিবে সেই গবর্মেণ্টের নিকট দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিধাতা তাহার মস্তকটিকে যেস্থানে রাখিয়াছিলেন, তাহা নিরুপদ্রবে সেই স্থানেই থাকিয়া নিত্য নূতন উপদ্রবের কৌতুক সৃষ্টি করিতে লাগিল।

একদিন সংবাদ আসিল যে বোটো এক জঙ্গলের মধ্যে রহিয়াছে। সেই প্রদেশের সেনাপতি মনে করিলেন বন ঘিরিয়া তাহাকে বন্দী করিবেন। তিনি বহু লোক লইয়া সেই জঙ্গলটি ঘিরিলেন এবং প্রত্যেককে বলিয়া দিলেন যে বোটোকে যে ধরিতে পারিবে সেই দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।

সৈনিক, পুলিস, কুলি, কৃষক, গ্রামবাসী সকলেই আসিয়া এই ব্যাপারে যোগ দিল। সকলেই পুরস্কারের লোভে উৎফুল্ল। ক্রমে এত লোক আসিয়া জুটিল যে সেই লোকপ্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করা বো-টোর ন্যায় দস্যুর পক্ষেও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তখন ভাবিবার আর সময় নাই। যাহা হয় একটা কিছু অবিলম্বেই করিতে হইবে। কাজেই বোটো তৎক্ষণাৎ তাহার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া কুলির মত এক জীর্ণ চীর পরিল এবং একগাছি ছড়ি লইয়া অন্যান্য সকলের সহিত তাহারই অন্বেষণে যোগ দিল। পরিণামে ফল হইল এই বো-টো অপর লোকদের সহিত পারিশ্রমিক চারি

আনা আদায় করিয়া লইয়া হৃষ্ট মনে সে স্থান ত্যাগ করিল। তাহার পরেই সে সেই প্রদেশের সেনাপতিকে এক পত্রের সহিত দুই আনা ফিরাইয়া দিয়া এইরূপ লিখিল যে, সে অর্দ্ধেক দিন মাত্র খাটিয়া পুরা দিনের পারিশ্রমিক লইতে প্রস্তুত নহে।

কিছুকাল পরে একদিন বোটো এক প্রদেশের কমিশনর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমিই বোটো, আপনার নিকট ধরা দিতে আসিয়াছি।"

সাহেব একথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন—"বেশ কথা। এখন তুমি কে এবং কি চাও তাহা সত্য করিয়া বল। আজকের এ কাজের জন্য কত পাবার আশা কর?"

বোটো শান্তভাবে উত্তর করিল—"দশ সহস্র মুদ্রা।" সাহেব অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমি তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

বোটা উত্তর করিল—"কেন, ইহার মধ্যে দুর্ব্বোধ্য ত কিছুই নাই। গবমের্ণ্ট কোনদিনই সত্য ভঙ্গ করেন না তা ত' আপনি জানেন। গভর্মেণ্ট ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি বোটোর মস্তক লইয়া আসিবে সে দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে।"

সাহেব এতক্ষণে তাহার কৌশল বুঝিয়া বলিলেন—"কিন্তু তোমার মাথাটি খসিয়া পড়িবে আর তুমি এ টাকা পাইবে কি উপায়ে?"

"আমার স্ত্রী পুত্র ত' পাইবে।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু তোমার এ কৌশল চলিবে না। দশ সহস্র মুদ্রার তোমার অভাব কি?"

"অভাব না থাকিলে আপনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতাম না। আবার অনুচরেরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আজ এক পক্ষ ধরিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে আমি কখন ধরা পড়ি তাহার ঠিক নাই। তাই মনে করিলাম স্ত্রী পুত্রের জন্য যদি দশ সহস্র মুদ্রার সংস্থান করিয়া যাইতে পারি ত মন্দ কি।

"কিন্তু টাকাটা ত আমি নিজেও লইতে পারি। আমি তোমাকে ধরিয়া তোমার মাথা গবমের্ণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছি বলিলেই হইবে।"

"আপনি ভদ্র ইংরাজ, আপনি তা করিবেন না তা আমি জানি।

সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি যে বোটো নও তা আমি বেশ জানি। তুমি কে তা জানিবার জন্য আমি ব্যস্ত নহি। কিন্তু তুমি কি চাও তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল।"

মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্তত করিয়া বোটো বলিল—আপনি ঠিকই ধরিয়াছেন। কিন্তু আমার জীবনও বোটোর জীবনের ন্যায়ই বিপন্ন। আমি তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার জীবনও আর মুহূর্ত্তের জন্য নিরাপদ নহে। আমি তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া পলাইয়াছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মান্দালে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটি লোক দিন। এই নিন সহস্র মুদ্রা; আজ হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে আমি বোটোকে ধরাইয়া দিতে না পারিলে এ টাকা আপনার হইবে। যতদিন না বোটো ধরা পড়ে ততদিন এ টাকা আপনি নিজের কাছে রাখিতে পারেন।"

মিনিট দুয়েক চিন্তা করিয়া কমিশনর সাহেব দস্যুর প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন।

বোটো নিরাপদে মান্দালেতে উপস্থিত হইবার পর কমিশনর সাহেব তাহার নিকট হইতে এই পত্র পাইলেন—

"দ্বাদশ দিন পূর্ব্বে আমি—বোটো আপনার নিকটে যে টাকা রাখিয়াছিলাম, তাহা আপনিই রাখিয়া দিবেন। আমি আপনাকে সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া আমি মিথ্যা কথা বলিয়া উক্ত টাকা জমা রাখিয়াছিলাম। ইংরাজ গবমের্ণ্ট সত্য ও টাকা দুইই ভাল বাসেন। কিন্তু তাঁহারা দুইটা জিনিষই একসঙ্গে পছন্দ করেন না।"

শ্রীভঃ

প্রাচ্য-গৌরব।

(Earl of Ranaldshay হইতে)

বিশালকায় আসিয়া মহাদেশের মহীয়সী-মূর্ত্তি জগৎবাসীকে চিরদিনই এক অপূর্ব্বভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। পর্ত্তুগালের অসমসাহসিক নাবিকগণের অক্লান্ত অধ্যবসায় যে দিন দক্ষিণ-মহাসাগরের রহস্যজাল ভেদ করিল, সেই দিন হইতে সৈনিক ও বাণিজ্যজীবীর ক্রম-বর্দ্ধনশীল প্র... অবিচ্ছিন্ন ভাবে আসিয়ার প্রহেলিকাময়, বিশাল তটাভিমুখে বহিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার ঘাত প্রতিঘাতে কত মহা-জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে; প্রাচ্য-জগতের বিশাল রঙ্গমঞ্চে কত জাতি কিছু দিনের জন্য রাজ-অভিনয় করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। পর্ত্তুগাল, স্পেন, হলাণ্ড, ফ্রান্স সকলেই যথাক্রমে এই বিরাট দেশকে আশ্রয় করিয়াই উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল; এবং আজিও ইংলণ্ড ইহারই উপর নিজের গৌরবসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে বিজয়-অভিযানের দিন গত হইয়াছে। চারি শতাব্দী পূর্ব্বে যে রহস্য যবনিকার অন্তরালে আসিয়া অস্পষ্ট আলোকে প্রতিভাত হইত, সে যবনিকাও অপসারিত হইয়াছে। আসিয়া আজ উন্মুক্ত, আলোকোদ্ভাসিত। কিন্তু যে ইন্দ্রজালের অপরূপ কুহকচ্ছটায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বের বাণিজ্যব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক ব্যক্তিবৃন্দ আকৃষ্ট হইত আজিও তাহার মোহিনী শক্তি কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই; তাহা কেবল রূপান্তর গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে মাত্র।

এ কথা সত্য যে এখনও যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও আবিষ্কর্ত্তাদিগের জন্য যথেষ্ট ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বণিক এখনও তাহার বাণিজ্য-জাল দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিতে পাবেন। কিন্তু আসিয়ায় ইউরোপীয় প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বণিক ও সৈনিকের একাধিপত্য অন্তর্হিত হইয়াছে; এবং এই সকল যুদ্ধার্থী ও বাণিজ্যকামীর স্থান পর্য্যটক ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রবর্গ দিন দিন অধিকার করিতেছে। প্রাচ্য জগতের গবেষণা ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের সীমাহীন ও বিমোহন সাধনাকে এই বিশাল ভূমিতে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে।

প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যরাজ্যে এই ভার-কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন-ব্যাপার খুবই ঘটনা পূর্ণ; কিন্তু অবোধ্য কিংবা অনৈসর্গিক নহে। প্রাচ্যদেশ সমূহ ও তাহাদের অধিবাসীবর্গের বিশালত্ব এবং বৈচিত্র্য আসিয়া মহাদেশকে এক বিপুল অনন্ত সৌন্দর্য্যে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক, সাহিত্য-সেবী ও শিল্পী, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও পরিব্রাজক, রাজনীতিবেত্তা ও বিপ্লবপন্থী সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা পরিচালন ও জ্ঞান প্রয়োগের পথ আসিয়ার এই বিরাট ক্ষেত্রের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন।

যে মহান্ ধর্ম্মত্রয়ের সুমধুর শাসন দণ্ডের নিকট আজ সমগ্র জগৎ স্বেচ্ছায় অবনতমস্তক,

যাহাদের মধুময় উৎসের অমৃত প্রবাহ জগতের মানবকুলের ধর্ম্মপিপাসা নিবারণ করিতেছে, সেই বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম এই আসিয়া-জননীর পবিত্র ক্রোড়েই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। দার্শনিক প্রবর এমার্সনের উক্তি—"ইউরোপ চিরদিনই উচ্চতর ধর্ম্মভাবের জন্য প্রাচ্যপ্রতিভার নিকট ঋণী"। * *

সাহিত্য ও শিল্প জগতেও আসিয়ার দান তাহার সন্তানবর্গের সর্ব্বাভিসারিণী ও বৈচিত্র্যময়ী প্রতিভার জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। আসিয়ার সাম্রাজ্যসমূহ ও নরপতিবৃন্দের বিচিত্র ইতিবৃত্ত জগতের ইতিহাসে কতকগুলি মোহময়ী পৃষ্ঠা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। তাহার বিজেতৃবর্গের কীর্ত্তিগাথা ধরিত্রীর ভূপালবৃন্দের অবদান সমূহের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। দিগ্‌বিজয়ী সাইরাস, ডেরিয়াস ও জারক্সেস্, মোগলবীর জঙ্গিস খাঁ, তাতাররাজ তৈমুরলঙ্গ, গজনীর মামুদ, মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বাবর, রাজনীতি বিশারদ আকবর —ইতিহাসপাঠজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইঁহাদের নাম কে না অবগত আছেন? ইঁহাদের বীরকাহিনী লোমাঞ্চ শরীরে ও স্তম্ভিত হৃদয়ে পাঠ করিয়া কে না ভীত ও চকিত হইয়াছেন?

প্রাচ্য সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে বুধমণ্ডলীর জ্ঞান ক্ষুধা মিটাইবার কত বিচিত্র উপকরণ পড়িয়া রহিয়াছে। চীন সাধু কন্‌ফুকাসের উপদেশাবলী কি গভীর তত্ত্বপূর্ণ! পারস্য কবি সাদী ও ফার্দ্দুসীর হৃদয় কন্দরোত্থিত আবেগময়ী কবিতা কি মধুময়ী! Old Testament লেখকদিগের শব্দ-চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা কি বিস্ময়করী!

শিল্প জগতে নেত্রপাত করিলে দেখিতে পাই, আসিয়ার মস্‌জিদ, মন্দির এবং হর্ম্ম্যাবলী তাহার সন্তানদিগের অনুপম সৌন্দর্য্যজ্ঞানের মূর্ত্তিমান্ সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পিকিংএর "ত্রিদিব-মন্দির" (Temple of Heaven) কি সুন্দর! নিকো এবং টোকিয়োর জাপানী মন্দিরসমূহের পরিকল্পনা কত উচ্চ! আবুশৈলের শিখরদেশস্থ জৈন মন্দিরগুলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এবং নির্ম্মাণকৌশল কোথায় দেখিতে পাইব? চারু-শিল্প-কম আগ্রার তাজ অপেক্ষা প্রাণস্পর্শী কি? 'কামকুর'স্থ বুদ্ধদেবের বিরাটমূর্ত্তি কি মহিমাময়ী! সমরখণ্ড দেশের গৌরবস্বরূপ যে সকল বিশালকায় হর্ম্ম্যরাজি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের বিরাটত্ব কত বিস্ময়জনক!

আসিয়ার প্রতি ধূলিকণায় ইতিহাসের কত নিগূঢ় কাহিনী লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের বিমোহনক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, 'আসিরিয়া' এবং 'ক্যালডিয়া'র দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, 'মুসা' এবং 'পার্সিপোলিস্' রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, জঙ্গলাবৃত 'অনার্য্যপুর' এবং 'পোলানারুয়া' নগরীদ্বয়, অতীতের বিস্মৃত রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া কত রত্নাদি উপহার দিয়াছে। এখনও 'তাকলামাকামে'র অগম্য মরুগর্ভে কিংবা 'আঙ্করতোমের' অতিকায় হর্ম্ম্যরাজির অনুদ্ভিন্ন প্রহেলিকা-গহ্বরে তত্ত্বানুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়ার কি বিশালক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে!

নিনেভা ও প্রাচীন বাবিলনের ভগ্ন পাষাণ-স্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অতীতের রহস্য যবনিকা উত্তোলন করিবার

দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এই সকল বিস্মৃত জনপদ ও বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে সেই সুদূর এবং অতীতের বিপুল কীর্ত্তিগাথার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যেন আমাদের শ্রুতিপথে আসিয়া আঘাত করে। কিন্তু হায়! মহাকাল একে একে সকল কীর্ত্তিই নাশ করিয়া ফেলিতেছে। বিস্মৃতির অতলজলে সকলই ডুবিয়া যাইতেছে। বাস্তব স্বপ্নে পরিণত হইতেছে কালের এই তাণ্ডব নৃত্যের বিশ্ববিধ্বংসিনী গতির রোধ কে করিবে?

শ্রীদীনবন্ধু সেন বি এ।

আন্দামান দ্বীপ।

বর্ত্তমান কালে আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জের নাম শুনিলে আমাদের মনে যে খুব সুখকর ভাবের উদয় হয় তাহা নহে। স্থানটি নির্ব্বাসিত অপরাধীর সহিত আজকাল এরূপ একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা ইহাকে একটা ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়াই মনে করি, ইহার ইতিহাসের মধ্যে যে কোন প্রকার বিশেষ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার আছে তাহা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু স্থানটি বহুযুগ হইতে ভারতের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রাচীনতম যুগ হইতে বঙ্গদেশ শস্যশ্যামল এবং শিল্প সম্পদে ভারতের গৌরবস্থল ছিল। বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরগুলি সমগ্র উত্তর ভারতের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। এই বন্দরগুলি হইতে অর্ণবপোতের সাহায্যে ভারতের বাণিজ্যদ্রব্যগুলি নানাস্থানে প্রেরিত হইত এবং সেই সকল স্থান হইতে বণিকগণ তদ্দেশীয় দ্রব্যাদি লইয়া ভারতে বাণিজ্যকল্পে আগমন করিতেন। এইজন্য অতি প্রাচীনযুগ হইতে নাবিক-দিগের নিকটে এই দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত ছিল। গ্রীক নাবিকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই দীপপুঞ্জের উল্লেখ দেখা যায়। চীন, জাপান ও আরব্য দেশের বণিকগণ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসেও প্রায় ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কো পোলো ১২৯২ সালে যে 'অঙ্গনানায়েন' দ্বীপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বর্ত্তমান আন্দামান। পরবর্ত্তী পরিব্রাজকগণ ইহার যে নামের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকটা ইহার বর্ত্তমান নামের অনুরূপ। ১৪৩০ সালে কণ্টি ইহাকে 'আন্দামানিয়া, বলিয়া গিয়াছেন। ১৭৯০ সালে ব্লেয়ার সাহেব তাঁহার মানচিত্রে এই দ্বীপের চিত্র দিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার এক স্থানের নাম পোর্ট ব্লেয়ার হইয়াছে।

ইয়ুরোপের অনেকে মনে করেন গ্রীকগণই সর্ব্ব-প্রথম এই দ্বীপের নামকরণ করেন। ম্যান সাহেব বলেন টলেমি ইহাকে 'আগামাউ ডাইমনোস্' অর্থাৎ সৌভাগ্যদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, ক্রমে তাহার অপভ্রংশ হইয়া আন্দামান দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ গেরিনি তাঁহার প্রাচ্যভূগোলে নিকোচর দ্বীপকেই সৌভাগ্যদ্বীপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আন্দামানকে 'পাশা-কাটা' বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 'আগামাউ ডাইমনোস্' বলিতে নিকোচর দ্বীপকে বুঝানই সম্ভব।

যাহা হউক এই দ্বীপপুঞ্জ যে বহুদিন হইতে বিদেশী ও ভারতবাসীর নিকট পরিচিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কর্ম্মচারীগণ ইহার চতুর্দ্দিকের সমুদ্র পরীক্ষা করিয়া একটি জরিপের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। পরে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস আর্চিবল্ড ব্লেয়ার সাহেবকে এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করিতে আদেশ করেন। বোধ হয় বঙ্গোপসাগরের

জলদস্যুদিগকে শাসিত করা এবং জলমগ্ন নাবিকগণকে এই দ্বীপের বর্ব্বর অধিবাসীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করাই কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল। এই বনসঙ্কুল স্থানকে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রথম কয়েদীগণকে তথায় শ্রমজীবী রূপে পাঠান হয়। সে সময়ে ইহাকে অপরাধীগণের নির্ব্বাসনস্থল করিবার কল্পনা পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। যাহা হউক ব্লেয়ার সাহেব একটি উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া তথায় বসতি স্থাপন করা স্থির করিলেন। এই স্থানটি আজিও পোর্ট ব্লেয়ার নামে পরিচিত। কিছুকাল আয়োজনের পর স্থির হইল যে পোর্ট ব্লেয়ার ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে বসতি স্থাপন করা আবশ্যক। ফলতঃ ১৭৯২ সালে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তর আন্দামান দ্বীপে বসতি স্থাপন করা হইল। কিন্তু এই স্থানের জলবায়ু এরূপ ভয়ঙ্কর যে অবশেষে বাধ্য হইয়া এস্থলে বাসের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পরে বহুকাল আর এই দ্বীপের প্রতি কেহ মনোযোগ দেন নাই। পরে ১৮২৪ সালে ব্রহ্মদেশ আক্রমণে প্রেরিত নৌবাহিনী এই দ্বীপ তাহাদের আশ্রয় স্থল করিল। তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে পুনরায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৮ সালে এমিলি নামে একখানি জাহাজ ইহার পশ্চিম উপকূলে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যাত্রী ও নাবিকগণের রক্ষা করিবার জন্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বীপবাসীরা তাহাদের অধিকাংশকেই নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত প্রায়ই এইরূপ নরহত্যার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। পরে গবর্মেণ্ট পুনরায় এই দ্বীপ অধিকার করিলেন। তাহার পর বৎসরেই ভারতে বিদ্রোহ হয়, গবর্মেণ্ট যে সকল বিদ্রোহীকে বন্দী করিলেন তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য কোন একটা স্থানের বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িল। সেই জন্য ১৮৫৭ সালের শেষ ভাগেই এই স্থান সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাসন স্থল রূপে ব্যবহৃত হইল। এই সালেই পোর্ট ব্লেয়ার হইতে মুক্ত এক কয়েদী লর্ড মেয়োকে হত্যা করে।

আন্দামান বাসীর সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্য ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তথায় এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই আশ্রমে যে কোন দ্বীপবাসী আসিয়া যতদিন ইচ্ছা বিনাব্যয়ে বাস করিতে পারে। তাহাদিগকে থাকিতে নিষেধ করা দূরে থাক, বরং আরও দীর্ঘকাল থাকিবার জন্য উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে বিনামূল্যে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হয়। এখানে তাহাদের মাছধরা বা কচ্ছপধরা ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মই করিতে হয় না। এই কর্ম্মটুকুও তাহাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, ইচ্ছা না করিলে তাহারা ইহাও করিতে বাধ্য নহে। অনেকে আশ্রমে থাকিয়া কেবল আনন্দ ও বন্যপশু শীকার করিয়া বেড়ায়। তবে আশ্রমের নিয়ম এই যে এই সকল লোক আশ্রমে অবস্থান কালে যাহা কিছু সংগ্রহ করিবে তাহা আশ্রমের সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। এই উপায়ে এক্ষণে আশ্রমের সমস্ত ব্যয় গবর্মেণ্টের বিনা সাহায্যে চলিয়া যায়।

আন্দামান বাসীরা বন্যজীবনই ভালবাসে। সভ্যতার প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণই দেখা যায় না। ইহারা আশ্রমে আসিয়া যখন বাস করে তখনও নিজেদের সেই চিরাভ্যস্ত ভাবেই কালাতিপাত করে এবং যখন পুনরায় অরণ্যের মধ্যে চলিয়া যায় তখন যেন একটা অভিনব আনন্দ ও সুখ অনুভব করে বলিয়া বোধ হয়। গভীর বনের মধ্যে হিংস্র পশু ও শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া দুরন্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করাই তাহারা যথার্থ সুখ ভোগ বলিয়া মনে করে।

বারাণসী।

(ফেলিসিয়া-শালের ফরাসী হইতে)

এই বারাণসী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের 'রোম্' (Rome), অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পীঠস্থান! ইহার দৃশ্য-সমূহ যেরূপ চিত্তবিক্ষোভকারী, যেরূপ অদ্ভুত, ইহার পাগ্‌লামি-কাণ্ডগুলা যেরূপ সংক্রামক এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

ইহার গলিগুলা গঙ্গাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে; গলির রাস্তায়, পিঁপ্‌ড়ার সারির ন্যায় লোকের জনতা; ভারতের সকল দিক হইতেই লোক আসিয়াছে। এই পুণ্যনগরী একটা তীর্থস্থান, এখানে আসিলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। উত্তর-প্রদেশের গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ,—নিগ্রো সদৃশ কৃষ্ণকায় দক্ষিণী হিন্দুর গা ঘেঁসিয়া পাশাপাশি চলিয়াছে। জটিল-শ্মশ্রু, জটাধারী, নগ্নপ্রায় ভস্মাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীরা চলিয়াছে, অথবা রাস্তার ধারে ধ্যান মগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে; —মনে হয় যেন উহারা কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না, চতুষ্পার্শ্বস্থ চঞ্চল জনতার সহিত যেন উহাদের কোন সংস্রব নাই। শাদা ও শীর্ণকায় ধর্ম্মের গরু দেখিবা-মাত্র লোকেরা ভক্তিভাবে তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছে—বাড়ীর ছাদ,—পায়রা, কাক, ময়ুর, টিয়াতে আচ্ছন্ন। দেয়ালের গায়ে, দেবতার মূর্ত্তি ও পৌরাণিক দৃশ্য-সকল চিত্রিত।

এখানে দুই সহস্র মন্দির, অসংখ্য দেবালয়, পাঁচ লক্ষ দেবতার মূর্ত্তি। আমি গাভীগণের মন্দির দেখিতে গেলাম; ভক্তেরা এই পবিত্র গাভীদিগকে আদর করিতেছে; তাহাদিগকে তৃণ ও পুষ্প প্রদান করিতেছে। একজন বৃদ্ধা রমণী, একটা গরুর পুচ্ছ-প্রান্ত আপনার মুখের উপর ধীরে ধীরে বুলাইতেছে। যে তরুণ হিন্দু-অধ্যাপক আমার সঙ্গে ছিলেন তিনি আমাকে বলিলেন,—কোন গরুকে বিপন্ন দেখিলে তাহার জন্য প্রাণ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। আর একটা বানরের মন্দির আছে; শত-শত বানর সেখানে মুক্তভাবে বাস করিতেছে; কেবল মঙ্গলবারেই তাহাদিগকে খাওয়াইবার সুবিধা হয়। আমি এই সকল ক্ষুদ্র দেবতাদিগের ফোটো তুলিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া অনুমতি পাইলাম।—একটি নেপালী দেবালয় আছে, তাহার ছাদের চতু-প্পার্শ্বে ভয়ানক অশ্লীল খোদাই-মুর্ত্তি; আমার ভৃত্য বলিল, এই ইমারৎটিকে বজ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এইরূপ মূর্ত্তি সকল খুদিয়া রাখা হইয়াছে। লজ্জাশীলা সৌদামিনী এই সকল বিভীষিকা দর্শনে সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিয়া যান!—

প্রতি পদক্ষেপেই, শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। নবযুবতীরা এই সকল লিঙ্গ-মূর্ত্তিকে ফুলে-ফুলে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং উহাদের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করে।

সর্ব্বত্রই পূজা-সামগ্রীর দোকান; এই দোকানে পুষ্পমাল্য, জুঁই ও গাঁদার মালা, ছোট ছোট মূর্ত্তি ও দেবতাদের বিগ্রহ বিক্রীত হয়; সিংহ, বরাহ,মৎস্য প্রভৃতি বিষ্ণুর বিবিধ অবতার-মূর্ত্তি; নীলবর্ণ দেবতা কৃষ্ণ, তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত একত্র রহিয়াছেন; সিদ্ধির দেবতা

গণেশ গজমুণ্ডধারী, লম্বোদর, গোলাপী-রং; কৃষ্ণবর্ণ বিকট দর্শনা কালীদেবী, বক্ষের উপর শোণিতাক্ত নরমুণ্ডমালা ধারণ করিয়া আছেন।

প্রভাতে, গঙ্গার ধারে শতসহস্র স্ত্রী ও পুরুষ স্নান করিতেছে, স্নানের সঙ্গে কত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছে; কেহ বা, শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে শরীরেব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলে প্রক্ষালন করিতেছে; প্রক্ষালন কালে,শরীরের মধ্যে যে অবয়বটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র সেই দক্ষিণ কর্ণকেও ভুলিতেছে না; কেহ বা অঞ্জলীতে জল লইয়া, সম্মুখভাগে যতদূর সম্ভব দূরে ছিটাইয়া ফেলিতেছে; কেহ বা বৃক্ষশাখা লইয়া, জল-তরঙ্গের উপর তালে-তালে আঘাত করিতেছে; কেহ বা মল্লিকা কিংবা গোলাপের পাপ্ড়ি জলে নিক্ষেপ করিতেছে;—সেই সব ফুল, স্থানে-স্থানে গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; কেহ বা কয়েক বার ঘোর-পাক খাইয়া আপনার নাকে চিম্‌টি কাটিতেছে,বুক চাপ্‌ড়াইতেছে; কেহ বা নিশ্চল-ভাবে দাঁড়াইয়া, নীল-আকাশে সূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তীর্থযাত্রীরা পবিত্র গঙ্গাজলে তাহাদেব কমণ্ডলু ভরিতেছে—পবে সেই জল ছিটাইয়া তাহাদের গৃহকে পবিত্র করিবে।

নদীর ধারে, চিতার উপর শব দাহ হইতেছে; মৃতজনের আত্মীয়েরা, শুভ্র শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়া, মৃতজনের প্রিয় ভস্ম গঙ্গাদেবীর পবিত্র জলে নিক্ষেপ করিতেছে… এক দিন, একটু সহর ছাড়াইয়া, আমি নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়াইতেছি, নদীর তটের উপর হইতে একটা মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিতে পাইলাম; নিকটে গিয়া দেখিলাম, একজন হিন্দু একটী মৃত শিশুকে উঠাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সে এত দরিদ্র যে সে চিতার খরচ দিতে পারে না, তাই ঐ শিশুর মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু নদী শিশুটিকে গ্রহণ করিতেছে না,—নদী-কিনারায়, স্রোতের এতটা জোর নাই যে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সেই হতভাগ্য ব্যক্তি,—নৌকা করিয়া গঙ্গার মাঝখানে গিয়া মৃতশিশুটিকে ফেলিয়া দিবে—এই জন্য অতি কাতর-স্বরে নৌকা-ভাড়ার কিছু পয়সা, আমার নিকট চাহিল। যখন অনুষ্ঠান পদ্ধতির নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, শিশুটির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সে সম্পন্ন করিতে পারিল, তখন তাহার মুখে যে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমি কখনও ভুলিবে না।

এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মানুষকে হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় করিয়া ফেলে। যেমন একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম জীবন্ত ও গভীর, তেমনি আবার অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিশ্চল ও উদ্ভট-কল্পনাময়। তথাপি, এই সমস্ত গূঢ়-রহস্যময় সাঙ্কেতিক মূর্ত্তির আবরণের মধ্যে, এই সব অসঙ্গত অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের অন্তরালে, একটা বিরাট তত্ত্বের ধারণা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পৃথিবীব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুবাতন এই যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম,—ইহার মধ্যে,সত্য ও মঙ্গলেব একটা মূল-আদর্শ আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যেমন একদিকে সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ জিনিসগুলাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে; যেমন একদিকে, গ্রহনক্ষত্র, নদনদী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, দেব মনুষ্য—এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া একটা অদ্ভুত খিচুড়ী প্রস্তুত

করিয়াছে, তেমনি আবার হিন্দুরা যেরূপ আপনাদের মধ্যে অসীমের অনুশীলন করিয়াছে, সেরূপ আর কোন জাতিতে করে নাই। বহু রূপের অতীত তাহারা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যকে গভীরভাবে দর্শন করিয়াছে; তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে, সমস্ত সত্তাই এক মহাসত্তা হইতে উৎপন্ন এবং সেই মহাসত্তারই অংশ। সমুদ্র এক হইলেও, যেমন তাহার উত্থান-পতনশীল তরঙ্গরাজি, সমুদ্রকে বহুভাবে প্রদর্শন করিয়া বহুত্বের বিভ্রম উৎপাদন করে, সেইরূপ জন্ম মরণশীল সমস্ত জীব ও সমস্ত পদার্থ বিশ্ব-জীবনেরই বিচিত্র ও ক্ষণস্থায়ী রূপ মাত্র। যে মহাপ্রকৃতি, আমাদের মনোবৃত্তি দিয়াছেন, তাঁহা হইতেই যাহা কিছু এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে; আমরা সমস্ত মনুষ্যের ভ্রাতা, সমস্ত জীবজন্তুর ভ্রাতা, সমস্ত বৃক্ষলতার ভ্রাতা, গ্রহ নক্ষত্রের ভ্রাতা, মেঘ বিদ্যুতের ভ্রাতা।

গভীরতত্ত্বদর্শী দার্শনিক Maurice Maeterlinck বলেন,—"যে স্থানে, আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি, আমাদের সমস্ত হৃদয়-বৃত্তি বিকাশ লাভ করিতেছে, সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানকে যতদূর সম্ভব বিশাল করাই উচিত।" আমাদের সসীম সত্তাকে বিশ্ব-সত্তার অসীমতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম,—নীতিধর্ম্ম রহস্যের বেশ একটি উদারব্যাখ্যা দিয়াছেন। জগতের একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর উপর, আমাদের দেহ বিচরণ করিতেছে; আবার মৃত্যু আসিয়া আমাদের জীবনের দ্রুতগতি দিনগুলাকে অতি শীঘ্রই শেষ করিয়া দিতেছে। আমরা অসীম বিশ্বের সন্তান—আমরা এই সসীম জীবন-কারাগারে বদ্ধ থাকায় আমাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে। আমরা অহংএর সীমাগুলাকে ভাঙ্গিতে চাই; এবং বিশ্বজগৎ হইতে জীবন লাভ করিয়া বিশ্ব-জগতেরই জন্য জীবন ধারণ করিতে চাই। ইহাই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা,—সমস্ত অসীম বিশ্বকে আমাদের সসীম অহংএর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য একটা গভীর অভাব আমরা অনুভব করিয়া থাকি। যে চেষ্টার প্রভাবে আমারা পাশবতার গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া, ক্রমে পাশবতার উর্দ্ধে উত্থিত হই, সেই চেষ্টার উপরেই নীতিধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষকেই ভালবাসা, সকল প্রাণীকেই শ্রদ্ধা করা, বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সত্যকে জানিবার চেষ্টা করা, চিরপরিবর্ত্তনশীল পদার্থ সমূহের পরিবর্ত্তন-দৃশ্য শিল্পীর অনুরাগ দৃষ্টিতে দর্শন করা—ইহাই নীতিধর্ম্ম। সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হওয়া—ইহাই নীতিধর্ম্ম। নীতিধর্ম্ম,—বিশ্বাত্মার জ্ঞান ও প্রেমের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত। সমস্তকে বুঝিতে পারা ও সমস্তকে ভালবাসা—ইহা অপেক্ষা বিশালতর আদর্শ আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উইলিয়ম রদেন্‌ষ্টাইন।

মিঃ উইলিয়াম রদেনষ্টাইন ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার চিত্র সাদরে সুরক্ষিত। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করেচেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিশেষরূপ পরিচয় ঘটেচে। আমরা সকলেই তাঁর স্বভাবসুলভ সরল ও অকপট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েচি! তাঁর শান্ত ও মৃদু মিষ্টালাপ বাস্তবিকই উপভোগ্য! তিনি আমাদের দেশকে যে কত ভালবাসেন তাঁর প্রত্যেক কথা থেকে তা' বোঝা যায়।

তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে অজন্তার প্রাচীন শিল্প কীর্ত্তি দেখতে গিয়েছিলেন। রাজপুতানা বারাণসী, পুরী প্রভৃতি ভারতের দর্শন যোগ্য নানা রমণীয় স্থানেও তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

মিঃ উইলিয়ম রদেনষ্টাইন আমাদের দেশের শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, পুরাণ, উপপুরাণ আর আর যাবতীয় ধর্ম্ম পুস্তকেরই ইংরাজী অনুবাদ পড়েচেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বল্লেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা পুস্তক পাঠে তোমাদের দেশের ঋষি তপস্বীদের তপজপাদির যে সব মহৎ কাল্পনিক চিত্র মনে এঁকে থাকি তোমাদের এ দেশে সেই সকল চিত্র চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। যেখানে যাই, সেখানেই দেখি—রোমান শিল্পীর সযত্নগঠিত স্তবকুঞ্চিত বসন পরিহিত মনুষ্যমূর্ত্তি! তোমাদের বসন ভূষণ, ভাব ও ব্যবহার যেন ঠিক প্রকৃতির শোভার সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে ছবির ভাবে গড়া! তিনি আমাদের উত্তরীয়ের সুকুঞ্চিত ভাঁজকে নির্ঝরের শিথিল জলরাশির স্তরের সঙ্গে উপমা দেন। কিছুদিন হ'ল তিনি হাই-কোর্টের কাছে কোন গাছের তলায় সবুজ ঘাসের উপর একটি লোককে নিরুদ্বেগে ঘুম'তে দেখেছিলেন। তার শোয়ার ভঙ্গীটা তাঁর এতই ভাল লেগেছিল যে, ৫ মিনিট কাল ধরে তিনি তাকে নিরীক্ষণ ক'রেও শ্রান্তবোধ করেন নি। তিনি বল্লেন,—কই এমনতর ভঙ্গীতে ইংলণ্ডে ত কাউকে কখনো শুতে দেখিনি—এ যেন ঠিক একখানি গ্রীক ছবির গঠিত মূর্ত্তি।—তিনি তাঁর স্বদেশীয় মহিলাদের 'লেস' বহুল 'আঁটা-সাঁটা' সজ্জা আদৌ পছন্দ করেন না,—বরং শিল্পীর চক্ষে তা বর্ব্বর আদর্শ বোলে মনে করেন। আমাদের দেশের শিল্প-বিদ্যার্থিদের বিলাতে শিল্প শিক্ষার জন্যে যাওয়ার তিনি একেবারেই পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন, তোমাদের ভারতে শিল্পের উপকরণের কোনই অভাব নাই। তোমরা শিল্পের আব-হাওয়ায় বাস করচো; তোমরা ইচ্ছে করলে অতি সহজেই উৎকৃষ্ট শিল্পী হ'তে পার। তোমরা এটা জেনো যে, We have many painters in Europe but few artists—অর্থাৎ "আমাদের ইউরোপে অনেক চিত্রকর আছে বটে; কিন্তু শিল্পী খুব অল্পই।" ঠিক ঐ একইরূপ উক্তি অকপট হৃদয়া মিসেস হ্যারিংহাম প্রভৃতি বিলাতের কতিপয় শিল্পীর কাছে আরও অনেকবার শুনেছি। আমার বিলাত-প্রবাসী বন্ধু "লণ্ডন রয়েল কলেজ অব আর্টের" ছাত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় রায় চৌধুরী বিলাত থেকে আমাকে যে

চিঠি লিখেছেন তাতেও ঠিক ঐ রকমই কথা। তিনি লিখেছেন, * * * "ভাই, এখানে আসিস্ না। আমরা মনে করি, না জানি ওরা কত জানে। আর ওরা যা ক'রে তাই বুঝি ভাল!—এই খানেই আমরা আমাদের নিজেকে হারিয়ে "হাঁ ক'রে ওদের দিকে চেয়ে থাকি! ভাই! এতদিন ত এখানে আছি, এদের "আর্ট" আমাদের প্রাণে মোটেই

উইলিয়ম রদেনষ্টাইন

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত চিত্র হইতে

লাগে না। সত্যি বল্‌ছি! এদের সব চক্‌চকানি। এখন দেখচি আমাদের ঐ আঁধারে-ছবির মধ্যে ধ্রুবতারা লুকিয়ে আছে। দেখ, এক আশ্চর্য্যের বিষয়! এদের দেশের অধিকাংশ ফুলে আদৌ গন্ধ নেই। এ পর্য্যন্ত আমি যত ফুল দেখলুম, একটীতেও গন্ধ পেলুম না।—বুঝি ছবিও সেই রকম! একেবারেই নেই কি?—তা' নয়, আছে—তবে, এখানকার 'আর্ট' physical beauty নিয়েই আছে।—তার প্রাণ নেই! জড় তনু-খানি রেখে প্রাণ যেন উড়ে গেছে!" * * *

হিরণ্ময় যেমন বিলাতে শিল্পের দৈহিক (physical) সৌন্দর্য্যের উন্নতির কথা লিখেছেন, রদেনষ্টাইনও ঠিক্ সেই কথাই আমাদের বল্লেন। তিনি বল্লেন,—আমাদের দেশে (ইউরোপে) শিল্পের যে প্রধান সম্পদ ভাব তা থাক্ বা নাই থাক্ হুবহু ফোটোর মত ক'রে প্রকৃতির ছবি আঁক্‌তে পার্‌লেই শিল্পীরা সম্মানিত হন। তিনি তাঁদের পরিকল্পিত চিত্রাঙ্কনের (originl design) রীতি যা' বল্‌লেন তা'তে ভারত ও বিলাতের শিল্প পদ্ধতির পার্থক্য বেশ সুন্দর ভাবে বোঝা যায়। আমাদের দেশের রীতিতে যেমন কোন চিত্র আঁক্‌তে হ'লে প্রথমত চিত্রকর সেই চিত্রের ভাব, ধ্যানে বা মনে ঠিক করে নিয়ে—কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে অনায়াসে স্বাধীন ভাবে চিত্র আঁকতে পারেন—এ' তা' নয়। উঁহারা চিত্রের বিষয় ভাববার পূর্ব্বে প্রথমত, কতকগুলি মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসা অবস্থার ছবি দেখে দেখে এঁকে নেন। পরে, ঐ ছবিগুলি একত্রে কিরূপে সাজালে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক বেশ একটা জমকালো চিত্র হ'তে পারে সেইটি দেখেন। এইরূপে যে ছবিটীতে মূর্ত্তি সন্নিবেশ সব চেয়ে সুন্দর দেখায় সেই রেখাঙ্কিত চিত্রটী চিত্রপটে (canvas) আঁকেন। তারপর, রং দেবার সময় একজন লোককে 'মডেল' রূপে পূর্ব্বাঙ্কিত ভিন্ন ভিন্ন লোকদের চিত্রের বেশে সাজিয়ে এবং সেই ভঙ্গিতে বারংবার বসিয়ে পুনঃপুনঃ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন কার্য্য করে থাকেন। রদেন-ষ্টাইন বলেন, ইউরোপে সকল চিত্রকরেরাই উক্ত নিয়মে পরিকল্পিত চিত্র এঁকে থাকেন।

তিনি ভারত প্রদক্ষিণকালে নানা স্থানে যে সকল সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতির রেখাঙ্কিত চিত্র এঁকেছিলেন, সেই সব চিত্র এবং বিলাতে আঁকা তাঁর স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির চিত্রের অনেক-গুলি ফোটো আমাদের দেখালেন। ছবিতে তাঁর স্ত্রীপুত্রের পরিচ্ছদ এত সাদাসিধে, যে দেখে আশ্চর্য্য মনে হয়! বিলাতের শ্রমজীবী পরিবারে যেমন "লেস," "ফ্রিল," প্রভৃতির বাহুল্য নেই, এও ঠিক্ সেই রকম। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন,—"আমার এই পছন্দ, এই জন্যেই আমাকে সাধারণ লোকের গালাগালি ও বিদ্রূপ সহ্য কর্‌তে হয়।"

আমরা তাঁর আঁকা ছবির যতগুলি ফোটো দেখ্‌লুম সমস্ত গুলিতেই তাঁর উদার ধর্ম্মভাব ও সরল অন্তঃকরণের ভাবটী বিশেষ ভাবে যেন ফুটে আছে। তাঁর ছবিতে আমরা বিলিতি perspective বা ছায়া আলোর (light and shade) আচার গত অত্যাচার লক্ষ্য করলুম না।—অর্থাৎ, চিত্রের রেখা এবং ভাব নিয়েই তিনি ছবি আঁকেন। তাঁর মতে,—ব্রহ্ম যেমন এক, তেমনি শিল্পও

এক। সকল দেশের সমস্ত ভাল শিল্প জগতের সকল শিল্পের সঙ্গেই মিল্‌বে। কিন্তু, সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে কথাটা ঠিক নয়।—জন-সাধারণ চায়, চিত্র লিখিত মূর্ত্তির সুন্দর মুখ ও সুন্দর গঠন, আর শিল্পী চান্ মুখের সুন্দর ও কমনীয় ভাবটী এবং গঠনের সুঠাম ভঙ্গী! —সাধারণ চায়, নাট্যালয়ের সজ্জিতা রূপসী—শিল্পী চান, অন্তঃপুরের মলিনা গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্ভাব'।

আমরা তাঁর আঁকা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি রেখাঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখেছি। এই ছবিখানিতে রবীন্দ্রের উপাসনা কালীন মুখের এবং অঙ্গের ভক্তি-পুলকসঞ্চারিত প্রকৃতির গম্ভীর ভাবটী সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। ভারতীতে তাঁহার চিত্রের যে প্রতিলিপিখানি প্রকাশিত হচ্ছে এখানি "ধর্ম্মপ্রাণ য়িহুদিদের ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম বিধির নিকট উপাসনান্তে বিদায় সময়ের প্রার্থনা।"

তাঁর আঁকা শিশুপুত্র কোলে তাঁর সহধর্ম্মিণীর ছবিটী আমাদের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তা'তে জননীর পুত্র-বাৎসল্য মধুর ভাবটী যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আছে! দুঃখের বিষয় ছবিখানি এত মৃদু রেখাপাতে আঁকা যে তার প্রতিলিপি হওয়া অসম্ভব! এখানে রদেন্‌ষ্টাইন সাহেবের যে একটী সামান্য প্রতিকৃতি দিলুম সেটী—আমাদের গভমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ে তিনি যখন শিল্পগুরু পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রেখাঙ্কন প্রতিকৃতি আঁক্‌ছিলেন, সেই অবকাশে আঁকা।

অনেকে হয়ত জানেন না, বিলেতে ভারত-বর্ষীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের ভারত-শিল্পের উন্নতির জন্যে সাহায্য এবং উৎসাহ দেবার ইচ্ছায় সেখানকার অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শিল্পী-মহাত্মারা মিলে একটী শিল্প-সমিতি গঠিত করেচেন। মিঃ রদেনষ্টাইন সেই সমিতির একজন প্রধান সভ্য! এখানে হাইকোর্টের উড্‌রফ সাহেব, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পোৎসাহী মহোদয়েরা Indian Society of Oriental art নামে যে একটী সমিতি গঠিত করেচেন বিলাতের উক্ত সমিতিও ঐ একই উদ্দেশ্যে স্থাপিত।

শ্রীঅসিতকুমার হাল্‌দার।

বণ্টন।

২। বেতন।

উৎপাদিত অর্থের যে অংশ শ্রমজীবি-দিগকে তাহাদের পরিশ্রমের জন্য দিতে হয়, তাহাকেই বেতন বলে। বেতনও খাজনার ন্যায় কোন কোন দেশে দেশাচারের উপর কোথায়ও বা প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। ডাক্তার, কবিরাজ, ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃতিকে পারিশ্রমিক বলিয়া যাহা দেওয়া হয় তাহা অনেক পরিমাণে দেশাচার নিয়ন্ত্রিত। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে পুরাতন ভৃত্য বা কর্ম্মচারী অন্যত্র অধিক বেতন পাইলেও পুরাতন মনিবকে

পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকুরী লইতে ইচ্ছা করে না। অনেক মনিবও সুবিধা দরে বা অধিক কর্ম্মঠ ভৃত্য পাইলেও পুরাতন ভৃত্য পরিত্যাগে ইচ্ছুক হন না। সাধারণতঃ, এই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় অপর সকল স্থানেই প্রতিযোগিতাই বেতনের হার নির্দ্ধারণ করে। কর্ম্মকর্ত্তা শ্রমজীবী চাহেন, শ্রমজীবিগণ পরিশ্রম বিক্রয় করিতে চাহে। কর্ম্মকর্ত্তা কম বেতনে লোক রাখিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রমজীবিগণ বেতনের হার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন—এই দুই পক্ষের প্রতিযোগিতায় বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। মনে করুন তিন জন কর্ম্মঠ এবং সমান অভিজ্ঞ চাকুরী-প্রার্থী কোন কর্ম্মকর্ত্তার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনায় উপস্থিত। এ ক্ষেত্রে যে প্রার্থী সর্ব্বাপেক্ষা কম বেতনে কার্য্য করিতে চাহিবে কর্ম্মকর্ত্তা তাহাকেই নিযুক্ত করিবেন। একজন প্রার্থী বেশী বেতন দাবী করিলে অপর দুইজন কম বেতনে নিযুক্ত হইতে চাহিবে এবং সেইজন্য এই তিনজন প্রার্থীর প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ কর্ম্মের বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। পক্ষান্তরে তিনজন কর্ম্মকর্ত্তা যদি কোন একজন শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে চাহেন, তবে তিনজনের মধ্যে যিনি অধিক বেতন দিবার প্রস্তাব করিবেন, তিনিই এই শ্রমিককে নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইবেন।

উপরে আমরা যে বিষয়টি বিবৃত করিলাম উহাকে অর্থনীতির ভাষায় শ্রমিকের "গ্রাহকতা" ও শ্রমিকের "সরবরাহতা" বলে। গ্রাহকতা ও সরবরাহতার উপরেই বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে বেতন লোকসংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে। উভয়েরই অর্থ এক। যাহারা শ্রমিকের বেতন দিতে পারেন তাহারাই শ্রমিকের গ্রাহক। শ্রমিককে যে বেতন দিতে হয় তাহা মূলধনেরই অংশ বিশেষ; সেইজন্য যাহারা শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবত মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম, তাঁহারাই কেবল গ্রাহকতা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং যত মূলধন এই কার্য্যে ব্যয় হইবে, ততই শ্রমিকের গ্রাহকতা বাড়িবে। সুতরাং গ্রাহকতা অর্থে "যে মূলধন শ্রমিক নিযুক্তের জন্য ব্যয় করিতে পারে"—ইহাও বলা যাইতে পারে। আবার যাহারা পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত তাহারাই শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে এবং সেইজন্য অধিক শ্রমিক সরবরাহ হইলেই বুঝিতে হইবে যে এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই হেতু যাহারা বলেন যে বেতনের হার লোক সংখ্যা ও মূলধনের উপর নির্ভর করে তাঁহারা প্রকারান্তরে এই কথারই পুনরুক্তি করেন যে বেতন গ্রাহকতা ও সরবরহতার উপর নির্ভর করে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি, যন্ত্রাদির উৎপত্তি ও উন্নতি এবং মূলধনের রপ্তানীর জন্য অনেক দেশের বেতনের হার বৃদ্ধি হয় নাই।

বেতনের হার জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে, এ কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ ম্যালথাস নামক ইংলণ্ডদেশীয় জনৈক অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া ইহার বিচার করেন। ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Essay on Population নামক সুলিখিত প্রবন্ধে লোকসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায় এই সব

আলোচনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, মড়ক, যুদ্ধ প্রভৃতি লোকসংখ্যা হ্রাসের দৈব উপায়, এবং অল্প বয়সে এবং কার্য্যক্ষম না হইলে বিবাহ না করা, লোকবৃদ্ধি নিবারণের স্বেচ্ছাধীন উপায়। আমাদের দেশে প্রথমোক্ত কারণ অর্থাৎ ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা যায় সত্য কিন্তু বাল্য-বিবাহে আমাদের দেশে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বাল্যবিবাহের ফল স্বরূপ রুগ্ন পীড়িত সন্তান সন্ততি দ্বারা সংসারের ও দেশের যে কোন কার্য্যই হয় না, একথা আমাদের সকলেরই বিশেষরূপে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। (১)

ভিন্ন ভিন্ন দেশে কি কি কারণে বেতনের হারের তারতম্য হয় তাহার কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ পাঁচটী হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুসারে বেতনের তারতম্য দেখা যায়। কয়লার খনিতে যে সকল মজুর কার্য্য করে, তাহারা অন্যান্য মজুরাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন পায় কিন্তু ঐ প্রকার স্থানে কার্য্য করা কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক। সেইজন্যই ঐ সব স্থানে মজুরগণ অধিক বেতন পায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক সেই শিক্ষার ব্যয়ের উপর বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয়। বিলাতে বড় বড় ব্যবসা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কয়েকবৎসর ধরিয়া—২।৩ এমন কি৪ বৎসরও শিক্ষানবিশী করিতে হয়। শিক্ষা শেষ হইলে অধিক বেতন পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও দেখা যায়, উকীলকে আইন পরীক্ষা পাশ করিতে যে অর্থব্যয় করিতে হয়, মোক্তারদের সেরূপ অর্থব্যয় করিতে হয় না। সেইজন্য উকীলগণ মোক্তার দের অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলেই অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন। তৃতীয়তঃ যে যে কার্য্যের স্থায়িত্ব অধিক দিন, সে সব কার্য্যে বেতনের হার কিছু কম। বারমাসই রাজমিস্ত্রীরা বা ঘরামীরা কায পায় না; অনেক সময় তাহাদের বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু রাখাল বা অন্যান্য যাহারা ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বার মাসই কাজ পায়; এইজন্য রাজমিস্ত্রীদের বেতনের হার সাধারণ চাকর অপেক্ষা বেশী। চতুর্থতঃ, কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্বের উপর বেতন হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যে সকল কার্য্য অধিক দায়িত্ববিশিষ্ট, সে সকল কার্য্যের বেতন বেশী। ক্যাসিয়ার, খাজাঞ্চী প্রভৃতি শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের বেতন অন্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা, তুলনায় অধিক। পঞ্চম কারণ স্বরূপ আদম স্মিথ লিখিয়াছেন যে, কার্য্যে সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার উপর বেতনের ন্যূনাধিক্য যথেষ্ট নির্ভর করে। আদম স্মিথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কেহ যদি জুতা

(১) অনেক ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, of the children belonging to the upper and middle classes, only 20 p. c., die before the age of five. This proportion is more than doubled in the case of children belonging to the labouring classes." আমাদের দেশের সকলেরই এই সব বিষয় বিবেচনা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। পূজ্যপাদ ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও রায় সুরেন্দ্রনাথ বাহাদুর প্রমুখ যে "হিন্দু বিবাহসংস্কার সমিতি" সংস্থাপিত হইয়াছে, এরূপ সমিতি দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে হওয়া বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

প্রস্তুত বা মেরামতের কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে ঐ কার্য্য যে শিক্ষা করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু আইন, ডাক্তারী ও অন্যান্য সুকুমার বিদ্যায় শিক্ষিত কেহ কেহ অধিক উপার্জ্জন করেন, এবং কেহ কেহ অপরের তুলনায় কম উপার্জ্জন করেন। এই দুই শ্রেণী অর্থাৎ যাহারা বেশী পান ও যাহারা কম পান—ইহাদের পাওনার তারতম্যে একের বেশী পাওয়া ও অপরের কম পাওয়া এ দুটীই সমান দাঁড়ায়।(২) মিঃ ফসেট তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কশায়ারের শ্রমজীবিগণ ১৬।১৭ শিলিং সপ্তাহে উপার্জ্জন করে কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে একই প্রকারের কার্য্যে নিযুক্ত ডর্সেটশায়ার বা উইল্টশায়ারের শ্রমজীবীগণ ১১ কি ১২ শিলিংয়ের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। এগেট সাহেব ইহার কারণস্বরূপ লিখিয়াছেন যে ডর্সেটসায়ারের শ্রমজীবিগণের অজ্ঞতাই এই নিম্ন হারের কারণ। অশিক্ষিত বলিয়াই উহারা একস্থান হইতে নড়িয়া অন্যস্থানে অধিক বেতনেও যাইতে চাহে না। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশে বেতনের হারের তারতম্য দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বেতনের হার অধিক। যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই বেতনের হার নিম্ন। কিন্তু যে সকল জেলায় লোকসংখ্যা কম, সেই সেই স্থলে বেতনের হার বেশী। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বর্দ্ধমানে বেতনের হার বেশী। বিহারে বেতনের হার কম। যে সকল নগরে বা বা নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কল বা ফ্যাক্টরী তথায় বেতনের হার অধিক। যে সকল স্থলে আকর বা খনির কার্য্য হইতেছে তথায়ও বেতন বেশী। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এসকল স্থলে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবি আবশ্যক হয় এবং সেইজন্য বেতনও বেশী। ১৮৭১ হইতে ১৯০৩ সনের বঙ্গদেশে, আসামে এবং পঞ্জাব প্রদেশে বেতনের হার বেশী হইয়াছে। টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে ১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ সনের সাধারণ শ্রমজীবির বেতনের তালিকা আমরা প্রবন্ধের শেষভাগে যোজিত করিয়া দিলাম।*

দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনের হার সকল সময়েই বৃদ্ধি হয় না। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষকালীন যখন খাদ্যদ্রব্যাদি মহার্ঘ হয়, তখন অল্প বেতনে লোক পাওয়া যায়। শস্য নষ্ট হইলে লোকের বেতন দিবার ক্ষমতা থাকে না এবং সেইজন্য শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী হয় এবং তাহাদের বেতনও কম হয়। আবার যখন কৃষিজাত দ্রব্যের অধিক গ্রাহকতার জন্য মূল্য বৃদ্ধি হয় তখন

(২) আদমস্মিথের এই পঞ্চম কারণ অনেকে স্বীকার করেন না। "A clergy man who is obtaining £100 a year, may feel assured that if he were engaged in some other occupation his income would be far larger; but such a man may be prompted by a high sense of duty to enter the church or he may be influenced by the social position he obtains for being in it and therefore he choose his profession independently of pecuniary consideration."

* পৃঃ ১০৩৪ দেখ।

কৃষকগণ এবং ভূম্যধিকারীগণ অধিক লাভ করে এবং সেইজন্য ঐ সময়ে বেতনের হার বৃদ্ধি হয়।

কি করিয়া শ্রমজীবীগণের বেতনের হার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে—ইহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আইনদ্বারা বেতনের হার নির্দ্ধারণেরও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এক শিক্ষার অধিক প্রচলন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই ইহা সম্ভবপর নহে। জাতীয় শিক্ষা যতই বিস্তৃত হইবে, ততই অন্যান্য উপকারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীগণের বেতন বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের প্রভূত উপকার হইবে। সর্ব্বত্রই ৮।১০ বৎসরের বালককে পাঠশালা বা স্কুল ছাড়াইয়া তাহাদের পিতামাতা তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেন। ইহাতে দেশের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা বর্ণনাতীত। (৩) শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে চৌর্য্যাদি অপরাধও কম হইবে এবং দেশের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। দেশান্তরে যাইয়া কার্য্যের চেষ্টাও শ্রমজীবীগণের বেতন বৃদ্ধির অন্য উপায়। কিন্তু ইহা বলাই বাহুল্য যে ইহাও শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

৩। লাভ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খাজনা, বেতন ও লাভ, উৎপাদিত অর্থ এই ৩ অংশে বিভক্ত হইয়া সাধারণতঃ তিনজনের ভাগে পড়ে। যাহাদের ভূমি আছে তাহারা অপরকে ভূমি ভোগ দখল করিতে দেন এবং সেইজন্য এক অংশের অধিকারী হন। এই অংশকে খাজনা বলে। যাহারা অর্থোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করে তাহারা তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ বেতন পায়। যাহারা মূলধন সরবরাহ করে, সেই কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে অংশ পান তাহাকে লাভ বলে।

সঞ্চয় না করিলে মূলধন সংগ্রহ হয় না এবং মূলধনের অধিকারী ব্যয় না করিয়া যে সঞ্চয় করেন, তজ্জন্য অবশ্যই তাঁহার কিছু প্রাপ্য হয়। এই সংযম বা বীতস্পৃহতার জন্য অধিকারী যে পুরস্কার পান তাহাকেই লাভ বলে। মনে করুন, একজন কৃষক নিজের জমি ১০০৲ শত টাকার মূলধন লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই মূলধন অবশ্যই শুধু কয়েকটী টাকা নয়। ইহাতে মাল মশলা, যন্ত্রাদি, শ্রমজীবীগণের বেতনের

(৩) "A child, who is taken from school when 8 or 9 years old rapidly forgets almost the whole of the little he has learnt. Widespread ignorance therefore, is a sure indication that a considerable proportion of the population has had inflicted upon it the manifold evils which result from premature employment. Health is sacrificed, physical vigour is diminished and strength often becomes exhausted at an age when men ought still to be in the prime of life. The mischief which thus results is not confined to the labourers themselve, the whole community suffers a severe pecuniary loss if the industrial efficency of those to whom wealth is primarily produced is impaired." Fawcet : National Education to the Remedis for Low wages.

টাকা সবই ধরিতে হইবে। (৪) চাষের পরে ঐ জমি হইতে যে অর্থ উৎপাদিত হইবে, ঐ অর্থ হইতে একশত টাকার মূলধন উদ্ধৃত রাখিয়া যাহা বাদ থাকিবে, তাহাই কৃষকের লাভ। কিন্তু এক্ষেত্রে কৃষকের মূলধনের যথেষ্ট প্রতিদান হইবে না; কৃষক নিজে ও শ্রমজীবীগণের সঙ্গে পরিশ্রম করিয়াছে অথবা তাহাদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিয়াছে। এই পরিশ্রম বা তত্ত্বাবধানের জন্য সেও অবশ্যই পারিশ্রমিক পাইবে এবং সেইজন্য সে যে লাভ পাইবে তাহা হইতে তাহার বেতন স্বরূপ কিছু বাদ দিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রত্যেক কার্য্যেই অল্পবিস্তর বিপদ আছে। কৃষক তাহার জমি হইতে ফসল উৎপাদন করিবার জন্য যে মূলধন প্রয়োগ করিবে, যদি জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপাদিত না হয় তবে মূলধন লোকসান হইবে। এই যে ভাবী বিপদ ঘাড়ে লইয়া কাজ করা, তজ্জন্য কৃষক মোট যে লাভ পাইবে তাহা হইতে এই বাবদও কিছু বাদ যাইবে। এই সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তি তাহার ব্যবসায় বা অন্য যে কোন কার্য্যেই লিপ্ত হউক না কেন সেই কার্য্যে যে লাভ পায় তাহা তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম সঞ্চয় ইহাকে সাধারণ কথায় সুদ বলে। দ্বিতীয় মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জনিত ক্ষতিপূরণ। তৃতীয় তত্ত্বাবধানের বেতন। বিশদভাবে এই তিনটী আলোচনা আবশ্যক!

মনে করুন, রামমিস্ত্রী তাহার কাজের সুবিধার জন্য একটি রেঁদা প্রস্তুত করিয়াছে! শ্যাম মিস্ত্রী রেঁদার সুবিধা দেখিয়া রামের নিকট এক বৎসরের জন্য রেঁদাটি ধার চাহিল। রাম বলিল যে, "রেঁদাটী সে নিজের ব্যবহার ও সুবিধার জন্যই প্রস্তুত করিয়াছে। একবৎসরান্তে শ্যাম শুধু রেঁদাটী ফেরত দিলে রামের কোনই লাভ হইবে না।" সুতরাং বাধ্য হইয়া বৎসরান্তে একটিনূতন রেঁদা ও তৎসঙ্গে একখণ্ড তক্তা ক্ষতিপূরণস্বরূপ রামকে দিতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

বৎসরান্তে শ্যাম যখন রামকে একটি নূতন রেঁদা ও একখণ্ড তক্তা দিল; তখন রাম পুনর্ব্বার ইহা ধার দিল; এই প্রকারে সে রেঁদাটী ৪ বার ধার দিয়া ৪ বারে ৪ খণ্ড তক্তা লাভ করিল। বর্ত্তমানে তাহার পুত্রও রেঁদাটী ধার দিতেছে। এই গল্প পাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এক্ষেত্রে রেঁদাটী মূলধনের প্রতিরূপ এবং তক্তাখণ্ড সুদের প্রতিরূপ। শ্যাম ধার করিয়া এবং সুদ দিয়া সুবিধা পায় তাই রেঁদাটী রামের নিকট হইতে ধার লয়—তাহার সুবিধা না হইলে সে রেঁদাটী আর ধার লইত না। এই যে সুদ ইহা সঞ্চয়ের প্রতিদান। রাম রেঁদাটী নিজে যদি ব্যবহার করিত, তবে আর সুদস্বরূপ তক্তাখণ্ড পাইত না।

প্রত্যেক দেশেই টাকা খাটানোর এরূপ উপায় আছে যাহা নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কাগজের সুদের হার কম কিন্তু উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই বাবত যে

(৪) "Capital is that part of wealth which is set aside to assist future production" ভাবী অর্থোৎপাদনের জন্য অর্থের যে অংশ আলাহিদা করিয়া রাখা যায় তাহাকেই মূলধন বলে। মূলধন অর্থে শুধু টাকা নয়, গরু, মাল মসলা, যন্ত্রপাতি যাহা কিছু ভবিষ্যৎ অর্থোৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহাই মূলধন।

সুদ পাওয়া যায় তাহা সঞ্চয়ের পুরস্কার। সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে ঐ টাকার সুদ পাওয়া যাইত না। যাঁহারা এই ভাবে টাকা খাটান তাঁহাদের লাভের অংশ এই একটী মাত্র উপাদান—সুদ। ইহাদের মূলধনহানির সম্ভাবনা নাই এবং উহার জন্য কোনরূপ তত্ত্বাবধানও করিতে হয় না।

আমাদের দেশে সুদের হার অত্যন্ত বেশী। গভর্ণমেণ্টের কাগজের সুদের হার ৩৷৷০ টাকা কিন্তু প্রচলিত সুদের হার ২৫৷৩০ টাকা এবং কখন কখন চক্রবৃদ্ধি হারে যে সুদ পড়ে তাহা একশত টাকায় দেড়শত টাকা হয়। ইহার কারণ মূলধন হানির আশঙ্কা। যে সকল ব্যবসায়ে মূলধন হানির আশঙ্কা বেশী, সেই সকল ব্যবসায়েই লাভ বেশী। এ সকল ক্ষেত্রে "চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একদিন।" কয়লার খনির কথা ধরুন। অন্যান্য ব্যবসায়ের অংশে যেরূপ ডিভিডেণ্ট বা লাভ পাওয়া যায় কয়লার খনিতে সাধারণতঃ তদপেক্ষা বেশী লাভ পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, যে খনি হইতে প্রচুর কয়লা পাইবার সম্ভাবনা, হঠাৎ সে খনিতে আর কয়লা নাই। এইরূপ আশঙ্কার কথা থাকে বলিয়াই এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধন হানির আশঙ্কা ও তজ্জনিত ক্ষতিপূরণও বেশী। স্থূল লাভ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তত্ত্বাবধানের বেতন বলা যাইতে পারে। যে সকল কারণে বেতনের তারতম্য হয় সেই প্রকার কারণে লাভের অংশেরও তারতম্য হয়। অনেক কার্য্য পরিদর্শনে অধিকতর নৈপুণ্য এবং সহিষ্ণুতা আবশ্যক; অনেক কার্য্য তত্ত্বাবধান বিপজ্জনক। এই সকল ক্ষেত্রে এই সকল কার্য্য তত্ত্বাবধানে লাভের অংশ অপরাপর কার্য্যাপেক্ষা বেশী থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসেস ফসেট কসাইয়ের ও বস্ত্রবিক্রেতার কার্য্য তুলনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে বস্ত্র-বিক্রেতা অপেক্ষা কসাই অধিক লাভ করে। তাহার প্রথম কারণ, কসাইয়ের কার্য্য পরিদর্শন তত পছন্দনই নহে। দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে কসাইয়ের অনেক পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন বিনষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে এবং পরিদর্শনের অসুবিধা ও মূলধন বিনষ্টের আশঙ্কার জন্য লাভের অংশ অন্যান্য ব্যবসাপেক্ষা অধিক।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে সুদের হার কম হয়। আমরা খাজনার বিষয় আলোচনা করিবার সময় রিকার্ডোর নিয়মের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষেত্রেও ঐ নিয়ম অন্য ভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে। পরিশ্রম ও মূলধনের পুরস্কার উৎপাদিত অর্থের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি কোন কারণে সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধনপ্রয়োগ করিয়া এবং অন্যান্য বিষয় ঠিক থাকিয়া উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হয়, তবে বেতন ও সুদও বেশী হইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন কারণে সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া অল্প অর্থ উৎপাদিত হয়, তবে সুদ ও বেতন কম হইবে। এক বস্তা চাউল "ধ্বংস" করিয়া যদি কোন

লোক দেড়বস্তা চাউল উৎপাদন করিতে পারে, তবে তাহার পরিশ্রম ও মূলধনের সে দেড়গুণ অর্থ উৎপাদন করে। কিন্তু যদি সে সও ১¼ বস্তা উৎপাদন করে, তবে বেতন এবং লাভ শতকরা ২৫ কমিয়া যায়। কর্ষণের শেষ মাত্রা যতই নামিতে থাকে অর্থাৎ যতই কম উর্ব্বর ভূমি কর্ষিত হইতে থাকে ততই বেতন ও লাভের অংশও কমিতে থাকে এবং জমির খাজনা বৃদ্ধি পায়; কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিকৃষ্ট জমি হইতে উৎকৃষ্ট জমি যে পরিমাণ অর্থ উৎপাদন করে, সেই অধিক অর্থই হইতেছে খাজনা। রিকার্ডো সত্যই বলিয়াছেন যে যতই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ততই খাদ্যদ্রব্যের গ্রাহক বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্পোৎপাদিকা জমি কর্ষিত হইতে থাকে। আবশ্যকীয় খাদ্য সেইজন্য অধিক ব্যয়ে উৎপাদিত হয় অর্থাৎ সমপরিমাণ পরিশ্রম ও মূলধনব্যয়ে অল্প অর্থ উৎপাদিত হয় এবং সেইজন্য বেতন ও সুদের হার কম হয়।

অর্থবিৎগণ বলেন যে, লাভের রেট পরিশ্রমের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রমজীবীগণ যে বেতন পায় এবং তাহারা যে অর্থ উৎপাদন করে এই উভয়ের তুলনায় পরিশ্রমের ব্যয় নির্ভর করে। এইজন্য যদি পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় কমিয়া গেল; কেন না হয় সেই পরিমাণে বেতন দিয়া অধিক অর্থ উৎপাদিত হয় অথবা অল্প বেতনে সেই পরিমাণ অর্থ উৎপাদিত হয়। পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হইলে লাভও বেশী হইবে এবং সেইজন্য শ্রমজীবীর বেতন এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক থাকিলেও উৎপাদিত অর্থের পরিমাণ বেশী হইবে। যদি কোন উপায়ে পরিশ্রম অধিক ফলোৎপাদক হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবিগণের বেতনের হার স্থির থাকিলে লাভের হার বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য অর্থনীতিবিৎ মিল বলেন যে পরিশ্রমের ব্যয় ও লাভের হার তিনটী উপাদানে গঠিত (১) পরিশ্রমের কার্য্যকারিতা (২) শ্রমজীবীগণের বেতন (অর্থাৎ শ্রমজীবীগণের প্রকৃত পুরস্কার) (৩) বেশী বা কম খরচে যাহাতে এই প্রকৃত পুরস্কারের উপাদানসমূহ উৎপাদিত বা ব্যয় করা যাইতে পারে। যদি পরিশ্রমের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু বেতন ও সাংসারিক খরচের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য বেশী না হয় তবে পরিশ্রমের ব্যয় কম হয়। যদি বেতন বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি না পায়, তবে পরিশ্রমের ব্যয় অধিক হয়। যদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সস্তা হয়, তাহা হইলে বেতন কম হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তার পরিশ্রমের ব্যয় কম পড়ে।

আমরা এই কয়েক পৃষ্ঠায় অর্থের বণ্টন সম্বন্ধীয় কয়েকটী স্থূল বিষয় আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থনীতির অধিক আলোচনা নাই। অধিক কেন—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আবশ্যক।(৬)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

(৬) I am firmly convinced that we need to devote large sums to the founding of chairs of economics in our colleges "And again Let our people, as rapidly as possible be educated in the principles of economics." H. H. The Gaekwar of Baroda.

টাকার হিসাবে ভারতবর্ষে বেতনের তালিকা।

প্রদেশ	মোট—							১৮৭৩ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের বেতন বৃদ্ধির অনুপাত *
	১৮৭৩-৭৩	১৮৭৬ ৮০	১৮৮১-৫	১৮৮৬-৯০	১৮৯১-৫	১৮৯৬-১৯০০	১৯০১-৩	
বঙ্গদেশ	৫.০-৫.৩	৫.২-৫.৭	৫.৫-৬.০	৬.০-৬.৬	৫.৮-৬.৫	৬.৩-৭.৩	৯.৫-৭.১	৩৯.৩
আসাম	৬.৫-৬.৮	৭.৭-৮.৫	৭.০-৭.৯	৬.?-৭.২	৭.১-৮.২	৮.০-৯.৪	৮.০-১০.৭	৪০.৬
যুক্ত প্রদেশ — আগ্রা	.৪.১	৪.২	৩.৮-৪.১	৪.৩-৪.৪	৪.৪-৪.৮	৩.৯-৪.৪	৪.১-৪.৭	২২.৭
যুক্ত প্রদেশ — অযোধ্যা	৩.২-৩.৪	২.৯-৩.৩	২.৮-৩.১	৩.৪	৩.২-৩.৭	২.৮-৩.৫	৩.?-৩ ৭	—২.০ (কম)
পাঞ্জাব	৫.৩	৫ ৮	৬.২	৬.৬	৬.৭	৭ ৫	৮.০-৮.১	৪৯.৪
মাদ্রাজ	৪.০	৪.৩	৪.৩	৪.৩-৪.৬	৪.১	৪ ২	৫.৩	৯.৮
বোম্বাই	৭.৫-৭.৮	৭.১-৭.৬	৭.৪-৮.১	৭.৪-৭.৮	৭.৬-৮.০	৭.১-৭.৫	৭.৬	১১.৬
মধ্যপ্রদেশ	৩.৯	৪.৩	৪.৩-৪.৪	৩ ৮-৪.১	৪.২-৪.৬	৪.১	৪.৪	১২.৫
বর্ম্মা	১৬.৬-১৭.৩	১৭.২-১৯.০	১৪.৩-১৫.১	১৫.৩-১৬.৫	১৪.০-১৪.৭	১৪.৫-১৫.২	১৪.১-১৫.১	৮.৫
	৬.২-৬.৪	৬.৫-৭.০	৬.২-৬.৬	৬.৪-৬.৮	৬ ১ ৬ ৮	৬.৫-৭.০	৬.৭-৭.৩	২০.৬

* ১৮৭৩ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রভেদ

কাব্যে নিদাঘ-চিত্র।

(২)

মোটামুটি সংস্কৃতকাব্যে নিদাঘের ইতিহাসের কতকটা ছায়া পাওয়া গেল। সম্প্রতি পশ্চিমের কাব্য দেখা যাক্।

গোড়াতেই সেক্ষপীয়রের মধ্যনিদাঘের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে। এই নাট্যের লঘু কল্পনা মায়াবী ঊর্ণনাভের ন্যায় নিবিড় হাস্য সৃজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে।

নাটকটির প্রাথমিক সূচনায় ট্র্যাজিডির যাবতীয় উপকরণ সজ্জিত ছিল। নারীর প্রেম, পিতার নিষেধ, প্রেমপ্রার্থীর সংখ্যাধিক্য, কন্যার প্রেমসঙ্ঘর্ষ-রজ্জুর একদিকে পিতার মৎলব, অপরদিকে ঈর্ষাকলুষিতা উপেক্ষিতা দ্বিতীয়া নারীর উত্তপ্ত চিত্ত—এ সমস্ত ষোল আনাই ছিল।

হঠাৎ কোথা হইতে নিদাঘের এক দমকা স্বপ্নমাখা হাওয়ায় এসব উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ পরীরাজ্যের দাম্পত্যকলহ পাঠকের মন জুড়িয়া বসিল। তার পর অলস প্রেমপুষ্পের রসে ভালবাসারাজ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল! মানুষ, গর্দ্দভ, পরী, কোন পার্থক্য রহিল না! কে কাহাকে ভালবাসে হিসাব নাই—সব এলোমেলো প্যাচের মাঝে পড়িয়া স্বপ্নবিভোর হইয়া গেল। ইহার নিবিড় কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তাহা আলোচনার পূর্ব্বে নিদাঘের প্রাণকথাটি একবার দেখা যাক্।

প্রেমরাজ্যের ধূর্ত্ত অধীশ্বর বসন্ত অপেক্ষা নিদাঘে কম তৃপ্ত নহে। বসন্তের মুগ্ধ অন্ধতা, রৌদ্রপীড়িতচিত্তে মত্ততায় পরিণত হয়। পাগলের ধর্ম্ম হচ্চে সে সব দিক্ সামলাইয়া চলিতে পারে না, হিসাব কেতাবে যথেষ্ট ভুল হইয়া যায়; একটা ঠিক করিতে গেলে আরও পাঁচটা ভুল হইয়া বসে। আতপ-ক্লান্ত মানবের গ্রীষ্মঋতুতে সহজেই কার্য্যকারণের শৃঙ্খলটি সব দিক বাঁচাইয়া চলিবার উৎসাহ থাকে না। বিলাত এজন্যই একালে লোককে বোকা বলিবার সুযোগ খুঁজিয়া April Fool সৃষ্টি করিয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রেমসম্রাটটি এজন্য এই ঋতুতে অনুরাগমূলক নানা কৌতুক সৃজন করিয়া উল্লসিত হয়। বসন্তের মিলন প্রকৃতির সহজ মিলন;—গ্রীষ্মেও মিলন আছে—কিন্তু কাহার সহিত কে সম্মিলিত হইতেছে উক্ত স্বপ্ন-উত্তেজিত চিত্ত তাহা ঠাহর করিতে পারে না। এজন্য "কিউপিড্" বসন্তসহায় না হইয়া, নিদাঘের অতিরিক্ত উত্তেজিত হৃদয়ের ভিতর তাহার কারিগরী ও নষ্টামীর যেন বিশেষ সুযোগ পায়। কারণ বসন্তে অসম্বদ্ধ, অসংযুক্ত, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গম সম্ভব নহে—তাহা বসন্তের ধর্ম্ম নহে। কিন্তু নিদাঘের হৃদয়সাহারায় মরীচিকারূপে বসন্তের যাবতীয় স্বপ্নস্মৃতি ছুটাছুটি করে,—কিন্তু হায়, তাহা বালুকারাশির অলীক সৃষ্টি—তাহার সহিত সামাজিকতা সম্ভব নহে। যে তাহার পশ্চাতে ছোটে সে পাগল কিম্বা বোকা। নিদাঘে বসন্তের ছায়া অন্তর্হিত হইয়া যায় না—কিন্তু দেশে একটু অতিরিক্ত উষ্ণতা, এবং ইউরোপে খররৌদ্রের কাঙ্ক্ষিত মাদকতা মস্তিষ্কের সন্ধিস্থল হইতে কোন প্যাঁচ খুলিয়া ফেলে। তাহাতে ব্যক্তি

বিশেষকে কৃপার পাত্র করিয়া তোলে। ফলে নানারূপ হাস্যের উপকরণ লইয়া কবিগণ নিদাঘের রহস্য কাব্য-স্বপ্ন গ্রথিত করেন।

বটম্ গর্দ্দভের সহিত মানুষের বা পরীর মিলন ব্যাপারে মূর্চ্ছিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ কবি বলেন, প্রেমের দেবতা হিসাবকেতাব খুলিয়া বিচার করে না। নরগর্দ্দভরূপী অবতার Bottom কেন, একেবারে নিখুঁত গর্দ্দভের সহিতও সুন্দরী Titania রাণীর গ্রীষ্মপীড়িত মস্তক যুক্ত হইতে পারিত।

অপরশ্রেণীর মিলন অভাবাত্মক। কালিদাস গ্রীষ্মঋতুকে সংহরণ করিয়া কাব্যে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন গ্রথিত করিয়াছেন।

মিলন যে কেবল প্রেমের ভিতর দিয়াই সম্ভব, তাহা ঠিক নহে। অভাবাত্মক দিক্ হইতেও তাহা সংঘটিত হয়। জিঘাংসা, নিষ্ঠুরতার অভাব হইতেও যেমন মিলন সম্ভব ভাবাত্মক দিক হইতেও তেমনি ঘটে।

ঋতুসংহারে কালিদাস হিংস্রপশুগণের মাঝে দিবালোকে যে অপূর্ব্ব মিলন সম্ভব করিয়াছেন তাহা অভাবাত্মক। তাহা হিংস্রতার অভাবসঞ্জাত—প্রত্যক্ষ প্রেমের আকর্ষণমূলক নহে। ইহার মাঝেও একটি বিশেষ উপভোগ্য নিবিড় হাস্য লুক্কায়িত আছে। সিংহকে ছায়াসিংহে পরিণত করা, খাদ্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও খাদকের স্পন্দনহীন ব্যর্থতা যেন দুর্ব্বল প্রাণীজগৎ হইতে একটি অট্টহাস্য, বিদ্রূপরাগিণী—অরণ্যময় ছুটাইয়া দেয়। দন্ত—স্খলিতগতি, শক্তি—আশ্রয়হীন, রোষ ঔদাস্যে পরিণত হয়!

যাহাই হোক্ না কেন দৃশ্যটি যথার্থতঃ সুন্দর। বিপরীত ধর্ম্মীগণকে অভিন্ন বেদীতে আহ্বান ব্যাপারটিই দুরূহ। মানুষের মাঝে নানা কবি Utopia কল্পনা করিয়াছে কিন্তু আরণ্যজগৎ তাহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তের পরিসরে স্থান পায় নাই। ভারতীয় চিত্তে, মানব কেন, যাবদীয় প্রাণী ও অপ্রাণী রাজ্যের স্থান আছে—এজন্য কল্পনার লীলায় তাহাদেরও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে।

কেবল কবির পক্ষেই এই অভিনব মিলন-মন্ত্র ধ্বনিত করা সম্ভব। তাহার অঘটন ঘটন পটীয়সী ছায়াতুলিকা দ্বারা সৃষ্টির নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়—ইহাতে কবিরও আনন্দ-আমাদেরও নিতান্ত কম নহে। কলিযুগে বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় কবিই এই ললিত রাজ্য সৃজন করেন।

এই খানেই কাব্যকলা বা আর্ট স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতর রাজ্যে অগ্রসর হয়। চিত্তের সুন্দরমুখী বৃত্তি যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন এই রাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি হইবে।

নানা দার্শনিক, নানা পন্থায় হিংসা নির্ম্মুক্ত এই মঙ্গলপথের ধ্যান করিয়াছেন। ইহারই ছবি পীড়িত ধরার মুক্তির জন্য দ্বারে দ্বারে বিবৃত করিয়াছে!

একটি পলকে এই মহাদৃশ্যটি দেখান সম্ভব হইলে তাহার প্রলোভন সম্বরণ নিষ্প্র-য়োজন! এই জন্য সংস্কৃত কবি নিদাঘকে শুভলগ্নে এই পথে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়াছেন।

ভারতের কবি এই মিলনে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। ব্যাপারটি কাব্যের দিক হইতে বা কল্পনার দিক্ হইতে অসত্যও নহে। দেশ

কাল নিমিত্তের মৌলিক ধর্ম্ম অনাহত থাকিলেও সাময়িক শৃঙ্খলার বন্ধন সৌন্দর্য্যের খাতিরে অনেক সময় ছাড়িতে হয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির গোড়াকার কথাও অনেকটা তাহাই; নতুবা কল্পনার ফানুষগুলি দেশকালের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া অন্তরীক্ষে ছুটিতে পারিত না।

ঋতুমাল্যে গ্রীষ্মের স্থানটি বড়ই রহস্যময়। সদ্য অন্তর্হিত বসন্তের স্বপ্নস্মৃতি চম্পক গন্ধের ন্যায় গ্রীষ্মের মস্‌লিনদেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হয়! অপরদিকে মনোজ্ঞ, লোভনীয় বর্ষাঋতুর নিবিড় বেদনা ও ভবিষ্যতের দূর ক্ষেত্র হইতে হৃদয় পল্বলে আনন্দছায়া নিক্ষেপ করে।

এই উভয় ঋতুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিদাঘ অনাদিকাল হইতে উভয়ের বৈচিত্র্য ও সজ্জা বিধান করিয়াছে। রক্ত পুষ্পাভরণ বসন্ত ও ও কুন্দ-শিরিষ, মাধবী-কদম্বে সজ্জিত বর্ষা—উভয়ই গ্রীষ্মের সান্নিধ্যে পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

পশ্চিম দেশের কবিরাও সেক্ষপীয়রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গ্রীষ্ম কাব্যকে সুদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। কিট্‌স্ "মানব ঋতু বা Human Seasons নামক কবিতায় গ্রীষ্মের ধর্ম্মটি বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।—

"He has his summer ; when luxuriously
Spring's honeyed end of youthful
thought, he loves
To ruminate and by snch dreaming high
Is nearest unto heaven"

মহিলা কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং গ্রীষ্মবিদায় ও হেমন্তের আগমন উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন তাহাতে নিদাঘের আর একটা দিক্ দেখি। গ্রীষ্মোপভোগের পর সমাগত তুষারশীতল হেমন্তে গ্রীষ্মের স্মৃতিটি বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয় বোধ হয়—বিশেষতঃ শৈত্যের লীলাভূমির অধিবাসীগণের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। আমরাও শীতের উপদ্রবে গ্রীষ্মের উপভোগ্য উষ্ণতা যে কামনা করিনা এমন নহে।

" The summer sun is faint on them
The summer flowers depart ;
Sit still—as all transformed to stone
Except your musing heart.
How there you sat in summer time
May yet be in your mind
And how you heard the green wood sing
Beneath the freshening wind !"

কোকিল-কবি শেলির তুলিকায় গ্রীষ্মের আনন্দহিল্লোল চিত্রিত হইয়াছে। নিদাঘের এই আনন্দমর্ম্মর, পশ্চিমের সর্ব্বত্র শোনা যায়—তাহাতে পৌরস্ত্য উগ্রতা নাই—নিদাঘের প্রাণরসে যেন লোকালয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠে:—

All things rejoiced beneath the sun
the weeds
The river the cornfields and the reeds
The willow leaves that glanced in the
light breeze
And the firm foliage of the larger trees !

পূর্ব্বদেশীয় উপাখ্যানমূলক কাব্য Lalla Rook প্রণেতা আইরিষ্ কবি মুর্ প্রণীত নিদাঘোৎসব বা Summer Fete নামক কাব্যটি বড়ই রমণীয়। নিদাঘের উদ্দাম কল্পনার উচ্ছ্বাস তাহাতে পাওয়া যায়।

তাঁহার "Irish melodies নামক কাব্যেও এতৎসম্বন্ধে উপভোগ্য কবিতা আছে।

স্কচ্ কবি বার্ণসের নিদাঘসঙ্গীতটি কি সুন্দর!

" Summer's a pleasant time
Flowers of every colour
The water rins over the heugh
And I long for my true lover
Aye waukin O
Waukin still and wearie
Sleep I can get nane
For thinking of my dearie."

Dearie যদি এ দেশেও গরমে ছট্‌ফট করিবার সময় উৎপাত আরম্ভ করে তবে গ্রীষ্মের রুদ্রত্ব কিছু উৎকট হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলা সাহিত্যে নিদাঘের কথা নীড়ভ্রষ্ট ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় লেখকের কর্ণে বাজিতেছে। বৈষ্ণব-কবির—

মাধব মাস বাদ বিধি সাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দারুণ দখিন পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ।
জৈঠ হি মিঠ কহত সব রঙ্গিনী
চন্দন চান্দনী রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী।

বৈষ্ণব কবির অন্তর্গূঢ় বেদনা ও কারুণ্যের সুর অজেয়। সংস্কৃত কবিদের গ্রীষ্মপীড়া বাংলা দেশে একেবারে জ্বরে পরিণত হইয়াছে—জ্বরের সহিত বাঙ্গালীর ঘন-পরিচয়ের ফল যে ইহা নহে কে বলিবে? চণ্ডীদাসের ধন্বন্তরি বলিতেছে:—

"শিরে শিরশূল পীড়িতির জ্বর
হায় থাকে যে রোগীর
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর।"

ধন্বন্তরী জ্বর পরীক্ষা করিল:—

বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মেলি
দেখে ধাতু কিবা বয়।
পীরিতের জ্বরে জরেছে ইহারে
পরাণ রয় কিনা রয়।

বিদ্যাপতির বিরহজ্বরে ধূর্ত্ত ডাক্তারের প্রয়োজন হয় নাই। শীতল সলিল এবং চন্দনপঙ্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে:—

শীতল সলিল কমলদল লেপহি
লেপহু চন্দনপঙ্কা।
সো সব যতহু আনল সব হোয়ল
দশগুণ দহই মৃগঙ্কা।

বর্ত্তমান যুগের জটিল বহুমুখী চিত্তচর্চ্চার কবিদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যনিদাঘের মায়াতরঙ্গ-গুলি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে বাঁধা রাগিণীর চাপল্য ও শীর্ণতা নাই, রসময়ী নিদাঘলক্ষ্মীর রুদ্র চেহারার মাঝে লুক্কায়িত উৎসটি মুক্তালোক রাজপথে তৃষ্ণার্ত্ত নরনারীর হৃদ্‌বহ্নি নিবাইতেছে।

"খেয়া"য় মুদ্রিত তাঁহার এ সম্বন্ধে শেষ কবিতাটি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলা গাছের কচি পাতায়।
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেও কোথা নেই মাঠের পরে
কেও কোথা নেই শূন্য ঘরে
আজ দুপুরে আকাশ তলে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জ সুরে
কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে
রক্তে আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে !"

নিদাঘলক্ষ্মীর এই অমূর্ত্ত অলসমধুর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন নৃত্য আর কোথায়ও পাই নাই। আমরা যেন ছন্দের মাঝেই নূপুর শিঞ্জন শুনিতে পাইতেছি !

শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল।

সার্থক দান।

এ সংসারে সবার সাথে অনেক কথা কই
একটি কথা আছে তোমার তরে,
নয়নপাতে নীরবে কত অশ্রুবোঝা বই
তোমার লাগি একটি ফোঁটা ঝরে।
কত না সুরে গাহি যে কত গান
কত বেদনা কত যে অভিমান,
তাহার মাঝে একটি সুর ক্ষণে ক্ষণে বাজে
সে সুর শুধু তোমায় খুঁজে মরে।
আশার কত কুসুম মনে ফুটায়ে তুলি নিতি
একটি আছে তোমার পদতলে,
কত বাসনা প্রদীপে মোর উজলি উঠে প্রীতি
একটি দীপে আরতি শিখা জ্বলে।

কত না রসে হৃদয় উঠে ভরি
প্রকাশে রূপে নব মুরতি ধরি
একটি রূপ রাঙিয়া রহে সে যে তোমার রঙে
একটি মণি ললাটে শুধু ঝলে।
আঁধার পটে কত কত না তারা ফোটে নিবিড় রাতে
সেথায় একা তুমি জোছনা ধারা,
আলো আঁধার মিলেছে যেথা উষার আঁখিপাতে
সেথায় তুমি জাগিছ শুকতারা।
কত ভাবনা নামে হৃদয়তীরে
একটি থাকে চরণ তব ঘিরে
জাগরণে জাগিয়া ছোটে কর্ম্মধারা কত
একটি হ'য়ে তোমাতে হয় হারা।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান।

এই বাসন্তী বাতাসের মতন
প্রাণ কেন মোর হয় না ;
কেন এপার হ'তে ওপার সোজা
ভুবন ভরি বয় না ?
এই মনোবনের পুষ্পগাছে
যা কিছু মোর গন্ধ আছে,
সবার কাছে বিলিয়ে দিবার
ভার কেন সে লয় না !

ধনীর যেথা বিরাম ভবন
ভক্ত যেথায় পূজে,
দুঃখী যেথা বিছায় শয়ন
প্রণয়ী প্রেম খুঁজে,—
সেই সবার সেবার সেবক হয়ে
সফল কেন রয় না !
কেন উদারতায় উদাস হয়ে
সকল বাধা সয় না !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সমালোচনা।

নদীয়া-কাহিনী। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত। প্রকাশক, গ্রন্থকার, সাহিত্য সভা। গ্রে ষ্ট্রীট কলিকাতা। ওলিম্পিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা বারো আনা। প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন ইতিকথা, প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। আগাগোড়া একটা সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা না থাকিলেও বহু তথ্যের সমাবেশে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষায় যেন একটি প্রবাহ নাই, তাহারই ফলে এই সুদীর্ঘ গ্রন্থ স্থানে স্থানে একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল সামান্য ত্রুটি সত্বেও রত্নসঙ্কলনের জন্য গ্রন্থকার বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই কাগজ বেশ পরিপাটি হইয়াছে।

সহজ সংস্কৃত শিক্ষা। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য নয় আনা মাত্র। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে। এমন সহজ ও সরলভাবে গ্রন্থখানি লিখিত যে শিক্ষার্থী অনায়াসেই সকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন, শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। ছাপা কাগজ ভালো।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত। ভারত-মহিলা প্রেসে মুদ্রিত। ঢাকা। মূল্য দেড় টাকা; কাপড়ে বাঁধাই সাতসিকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বেশ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সাধু-চরিত্রটি বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও অনাবশ্যক টীকা টিপ্পনী নাই, গোঁড়ামি নাই। এরূপ গ্রন্থপাঠে মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন হয়, হৃদয় পবিত্র মন উন্নত হয়। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

বঙ্গের কবিতা। প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত। কলিকাতা সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। জুনো প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের আলোচনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য। রচনাটি আগাগোড়া হেঁয়ালির ছাঁচে ঢালা। বিশেষত্ব দেখিলাম না।

বৈজ্ঞানিক পাকপ্রণালী। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি, প্রণীত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থকার অল্পের মধ্যে খাদ্যবিচার খাদ্যপাক প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, আমাদের সংসারের নিত্য অপব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং তাঁহার নবাবিষ্কৃত 'ইকনমিক্ কুকার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে রন্ধন করিলে কিরূপ সুবিধা হইতে পারে তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকার বলেন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে রাঁধিলে অনেক সস্তায় অর্দ্ধেক খরচে খাওয়া চলে। ভাতের ফেন ফেলিতে হয় না, কুঁড়া বাদ দিতে হয় না। কমদামী আ-ছাঁটা মোটা চাউল বাষ্পে বেশ গলে বলিয়া তাহারও ব্যবহার চলে। জ্বালানির খরচও অনেক কম। ভাত সুসিদ্ধ হয়। বাষ্পের রন্ধনে পুড়িয়া বা ধরিয়া যাইবার ভয় নাই—রাঁধিতে রাঁধিতে বিদেশে যাওয়া চলে। কয়লার মত হাতে কালি নাই, ধোঁয়া নাই, দুর্গন্ধ নাই ইত্যাদি। সকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীশ্রীফলাহারতত্ত্বম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিতম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুমেন বঙ্গানুদিতম্। যশোহর। মূল্য দুই আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রহস্য-চিত্র হিসাবে মন্দ নহে। ফলাহার সম্বন্ধে নানাবিধ

কৌতুক কবিতা সংস্কৃতে ও তাহার মর্ম্ম বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতার টুকরাগুলিতে মূলের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় নাই। রসিকতাটুকু তেমন ধারাল নহে।

The Present State of Sanskrit Learning in Bengal. Vanamali Chakravarti, M. A. Published by Bhattacharya & Sons. College Street. Price Eight Annas. 1910 এ দেশে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে টোলের শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ ও কার্য্যকরী। আলোচনাটুকু উপভোগ্য।

আরবজাতির ইতিহাস। (প্রথম খণ্ড) শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক-মফিজ উদ্দীন আহমদ, দলগ্রাম, তুষভাণ্ডার। রংপুর। মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থখানি স্বনামধন্য আমীর আলি রচিত History of the Saracens গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা সর্ব্বত্র সরল ও প্রাঞ্জল না হইলেও গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে। অনুবাদে মূলের ভাব সর্ব্বত্র বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার—সৌন্দর্য্যহানি হইবার পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। যতদূর দেখিলাম, অনুবাদক মূলের ভাব, তথাপি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অনুবাদক মহাশয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভালো।

শাহাজলাল। শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব, বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশশিভূষণ দাস, শিক্ষক, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুল, শ্রীহট্ট। মূল্য ছয় আনা। 'হজরত শাহাজলাল কোন সময়ে শ্রীহট্টে আগমন করেন' তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, গ্রন্থকার বিভিন্ন মতাদির সমালোচনা করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার শিলালিপি ও অনেক প্রাচীন ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "শাহাজলাল ১৩৫৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট আগমন করেন।" গ্রন্থখানি মন্দ লাগিল না।

ঊষা। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা মাত্র। এখানি উপন্যাস। কালাপাহাড়, সুলেমান, মুকুন্দদেব প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণই লেখকের উদ্দেশ্য—তথাপি লেখকের কথায় ইহা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে।' লেখকের ভাষাটুকু মন্দ নহে,—স্বচ্ছ ও সরল। তবে উপন্যাসে কোন আর্ট নাই। লিপিকুশলতারও একান্ত অভাব।

নবযুগের সাধনা। শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি,এ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত, লোটাস লাইব্রেরী, ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লেখকের মতে "একদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে অনেক বিরোধ অনেক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। * * * উহা মানবজাতির শৈশবের চপলতা মাত্র। এখন * * এই বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে বালকসুলভ চপলতা ও অজ্ঞানতার ফল বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।" এই বিশ্বধর্ম্ম-মহামিলনের প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রয়াস ও উদ্যম অপরিসীম। 'দেবালয়'-প্রতিষ্ঠাতেই তাহার পূর্ণ পরিচয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে শশিপদবাবুর সাধু-জীবনী-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ সরল, গম্ভীর ও উপভোগ্য।

কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা মাত্র। 'দেবালয়ে'র একটি অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহাই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'—কাব্যগ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। লেখক বক্তব্যটুকু ভালো করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই—অনেক স্থলেই জটিল রহিয়া গিয়াছে—ভাষা ভালো।

THE HERALD. Edited by Krishna Charan Ghosh, Vedanta-Chintamani. January 1911. Annual Subscription Rs. 6. Office 64/1 Sukeas Street Calcutta. এখানি সচিত্র ইংরাজী মাসিক পত্রিকা। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ কবিতা ও গল্পে অনেকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত "ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের" ও কুমার মিত্র চীনা হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যে দুইটি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন,তাহা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের ইংরাজী অনুবাদ বেশ হইতেছে। "ব্রহ্মসূত্র শঙ্কর-ভাষ্যমে"র অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত "আত্মহত্যা" গল্পটি নিতান্তই উদ্ভট। বর্ত্তমান্ সংখ্যায় অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। পত্রিকাখানিতে প্রবন্ধ বৈচিত্র্যের একটু অভাব লক্ষিত হইল। কেবলই প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ—একটু 'একঘেয়ে" মনে হয়। যাহা হউক,এ সামান্য ত্রুটি, ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পত্রিকাখানির উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। কাগজ কভার ছাপা চমৎকার হইয়াছে। সমালোচক।

মরণ-রহস্য। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি,এল প্রণীত। কলিকাতা ইণ্টারন্যাশান্যাল কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে মরণ কাহাকে বলে এবং মরণের পর আমাদের গতি কি হয় ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমেই গীতার মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন 'আমি' আত্মা—অজর, অমর—সুতরাং 'আমি' মরিতে পারি না। তাহার পর, তিনি চার্ব্বাকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তাহার খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি যে দার্শনিক হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। গ্রন্থকার বেদান্তদর্শন লইয়াও একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি "ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধিবৎ" সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট বেশ সন্তোষজনক বোধ হইল না। এখানে 'উপলব্ধি' শব্দের অর্থ কি—ইহা কি Mill ও Bainএর 'Bundle of sensations.'? আমাদের বোধ হইল গ্রন্থকার ইহার এইরূপ অর্থই লইয়াছেন—তাহা যদি হয় তাহা হইলে বাহ্য জগতের অস্তিত্বই ত প্রতিপন্ন হইল। মরণের পর আমাদের কিরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে গ্রন্থকার তাহা 'বিশদ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা এত 'বিশদ' হইয়াছে যে তাহা পড়িতে পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। হইতে পারে যে ইহাতে গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস আছে—কিন্তু একখানি দার্শনিক গ্রন্থে কোনও যুক্তি তর্কের অবতারণা না করিয়া—এরূপ dogmatically একটা মত লিখিয়া যাওয়া কোনমতেই সমীচীন নহে। ভূত প্রেতের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা পাঠকবর্গকে না শুনাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। "এ দেহ ছাড়িয়া যখন আমরা আকাশে বা বায়ুস্তরে থাকি, তখনই আমরা ভূত প্রেত হই", "কোন কোন ভূতপ্রেত যে আমাদিগকে বিভীষিকা দেখায়, তাহা মিথ্যা নহে।" ভূতপ্রেত সম্বন্ধে এরূপ মৌলিক, দার্শনিক ব্যাখ্যা বড় একটা শুনা যায় না। 'দেবযান' ও পিতৃযানের বিবরণে এবং চন্দ্রলোকে 'অভিযানেও' যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। গ্রন্থকারের মনে রাখা উচিত ছিল যে তিনি বিংশ-শতাব্দীতে গ্রন্থ লিখিতেছেন। এই বর্ত্তমান যুগে উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত প্রলাপবাণী অপেক্ষা যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অধিক আদর, তাহা প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থকারকে স্মরণ করাইয়া দিতে লজ্জা ও ক্ষোভ হয়। উপসংহারে বক্তব্য, গ্রন্থকার আচার্য্যের মত মরণভয়গ্রস্ত বিশ্ববাসীর নিকট এক অমৃত-বাণীর আশ্বাস লইয়া আসিয়াছেন—কিন্তু অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় তাঁহার সে আশ্বাস বাতাসেই মিলাইয়া যায়—কাহাকেও অভয়দান করে না।

লক্ষ্মণ সেন।

লক্ষণ সেনের রাজত্ব তিরভুক্তি বা ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিরভুক্তি কোন দেশ? সীতাদেবীর যে দেশে জন্ম, নির্ম্মলা বাগ্মতী বা বাগ্‌মতী যথায় প্রবাহিতা, যে দেশে মীমাংসা, ন্যায় ও বেদাধ্যায়নপটু বটুগণের বাস, ভূদেব যথায় পৃথিবী শাসন করিয়াছেন, ভৈরব যথায় বিরাজমান এবং গঙ্গা যাহার সন্নিকটে সেই দেশই তীরভুক্তি; যথা:—

যাতা সা যত্র সীতা সরিদ্‌মালা জলা
বাগ্মতী যত্র পুণ্যা।
যত্রান্তে সন্নিধানা সুর নগর নদী
ভৈরবো যত্র লিঙ্গম্‌॥
মীমাংসান্যায় বেদাধ্যায়ন পটুতরৈঃ
পণ্ডিতৈঃ মণ্ডিতায়া।
ভূদেবো যত্র দেবো যযন বসুমতী সাস্তি মে
তীরভুক্তিঃ॥

তথায় লক্ষণ সেনের দানশীলতা সম্বন্ধে এক মনোহর শ্লোক প্রচলিত আছে। চক্রবাক্‌ আপন বধূকে কহিতেছে "প্রিয়ে, আর আমাদিগকে বিরহ যাতনায় অধীর হইতে হইবে না; কারণ আর অল্প দিবস গত হইলেই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির বিনাশ হইয়া যাইবে"। চক্রবাকী কহিল "তাহাও কি সম্ভব? আমাদিগের কি এরূপ সুখের দিন আসিবে? চক্রবাক্‌ কহিল "আসিবে বৈ কি? কনক গিরি অস্তাচলই যে লোপ পাইতেছে; তাহা হইলে সূর্য্যদেব আর কি করিয়া অস্তমিত হইবেন?" চক্রবাক ঔৎসুক্যের সহিত কহিল "সে কেমন, সে কেমন?" চক্রবাক উত্তর করিল "বীর লক্ষণ সেন যেরূপ উন্মুক্ত হস্তে দানরত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্রমে ক্রমে সমুদয় কনক গিরিই নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবেন"। যথা—

কতিপয় দিবসৈ ক্ষয়ং প্রয়ায়াৎ
কনক গিরিঃ কৃত বাসরাবসানঃ।
ইতি মুদ মুপযাতি চক্রবাকী
বিতরতি লক্ষণ সেন দেব বারে॥

ত্রিহুতে লক্ষণ সেনের অব্দ অধুনাও প্রচলিত। উহাকে সংক্ষেপে লসং বলে। পণ্ডিতগণ এখনো এই অব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সন হইতে শকাব্দা ও লসং বাহির করিবার তথায় তিরহুতীয়া ভাষায় যে সঙ্কেত-সূচক শ্লোক ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

সনমহ লিখহুঁ শর শশী বান।
সো শাকে জানহুঁ পরমাণ॥
পুনি সন বান ইন্দ্র শর খোএ।
বাঁকি বাত্রে লসং বিলোএ॥

অর্থাৎ—

সনের অঙ্কের সহিত—শর (৫) শশী (১) বান (৫) যোগ দিলে শাক প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সন হইতে বান (৫) ইন্দ্র (১) শর (৫) বিয়োগ করিলে লসং প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্কস্য বামা গতিঃ ধরিলেও তাহাই হয়।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

বর্ষশেষ।

আর একটি বৎসর চলিয়া গেল। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সুখ দুঃখের তরঙ্গ সমভাবেই তাহার বক্ষ আলোড়িত করিয়াছে! কিন্তু সে সুখ দুঃখের দিকে চাহিয়া ভাবিবার আমাদিগের সময় নাই—আমরা কাজ করিতে আসিয়াছি, কাজ করিয়া যাইব। সুখদুঃখ প্রকৃতির দান—তাহা চিরদিনই সমভাবে মানবসমাজকে আঘাত করিবে। আমাদিগের নিকট ইহা সহিষ্ণুতার একখানি পরখপাথর মাত্র। তবু আজ এই বর্ষের শেষ দিনে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া সংক্ষেপে একবার—আমরা কি হারাইলাম আর কি-ই বা পাইলাম, তাহার আলোচনা করিয়া লইলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাপদ সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডকে বর্ষারম্ভেই আমরা হারাইয়াছি। ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার অম্লান স্নেহ ও অক্ষুণ্ণ সহানুভূতির সীমা ছিল না। কিন্তু নদী তরঙ্গে যেমন এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়িয়া উঠে, তেমনি তাঁহার পুত্র নবীন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে আমরা রাজাসনে পাইয়া তাঁহার সস্নেহ সহানুভূতি লাভে নূতন আনন্দে সে দুঃখ ভুলিয়াছি। দুঃখ ক্ষণিকের, ঝটিকার ন্যায় তাহার প্রভাব অচিরস্থায়ী; ইহাই জগতের নিয়ম।

লর্ড মিণ্টো ভারত শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার স্থানে আমরা সদাশয় মহানুভব লর্ড হার্ডিংকে পাইয়াছি। লর্ড মর্লির আসনে আজ লর্ড ক্রু! মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের স্থানে সৈয়দ আমির আলি প্রতিষ্ঠিত।

লর্ড হার্ডিং মহোদয় ইতিমধ্যেই প্রজাবর্গের হৃদয়ে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ছদ্মবেশে ছাত্রাবাস সমূহ পরিদর্শন করিয়া তিনি ছাত্রগণের সহিত অসঙ্কোচে বন্ধুভাবে মিশিয়াছেন, তাহাদিগের সুখদুঃখের সংবাদ লইয়াছেন, এদৃশ্যে ভারতবাসী আজ আনন্দে উল্লসিত! বর্ত্তমান ভারত ইতিহাসে এ এক নূতন যুগের সূচনা দেখা দিয়াছে। লেডি হার্ডিং তাঁহারই যোগ্য সহধর্ম্মিনী। আমাদের দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তাঁহারও স্নেহ ও সহানুভূতির আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছি। ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সকল বাধা বন্ধ তাঁহার সাদর ব্যবহারে আজ টুটিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

লেডি হার্ডিং মহোদয়া ইংরাজ মহিলাগণের সহিত বাঙ্গালী মহিলাগণকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করেন।—অভ্যাগতাদিগের প্রতি সাদর সমাদরে রাজাপ্রজার সুদূর সম্পর্ক সেদিন যেন ডুবিয়া যায়;—আতিথ্যের প্রীতিমধুর আপ্যায়নে অভ্যাগতাগণ যে আনন্দ লাভ করেন, যেন তাহা বর্ণনাতীত! তিনি সেদিন প্রতি নিমন্ত্রিতার নিকট স্বহস্তে মিষ্টান্ন থাল ধরিয়া আতিথ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই আদর্শ অতিথিসৎকার ভারত মহিলাগণের পক্ষেও অনুকরণীয়। এইরূপ আদর ব্যবহারে ভারতবাসীর চিত্তে আজ শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান নহে, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে!

জর্ম্মণ-যুবরাজ এ বৎসর ভারতে আসিয়া আমাদিগের সুখদুঃখের পরিচয় লইয়াছেন! তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে, সুমধুর আপ্যায়নে তাঁহার হৃদয়ের আমরা যে পরিচয় পাইয়াছি; তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহার হৃদয় রাজারহৃদয়েরই মত—অপূর্ব্ব মহিমায় মহীয়ান! সম্প্রতি তিনি শিকারোদ্দেশ্যে সুন্দরবন গিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী জনৈক শিকারী ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত ও আহত হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ সেখানে তাঁহাকে দেখিতে যান! এই ঘটনা তাঁহার সহৃদয়তার ক্ষুদ্র পরিচয়মাত্র।

জর্ম্মানীর যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী।

বর্ষশেষের একটি নিদারুণ দুঃখের কথা,—কিছুকাল পূর্ব্বে যে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ জর্জ্জরিত হইয়াছিল, আমরা ভাবিয়াছিলাম তাহার শেষ হইয়াছে—কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্ম্মচারীর হত্যা ও লালদীঘির ধারে এক দুর্বৃত্ত যুবকের বর্ব্বর আচরণে তাহার পুনরভিনয় দেখিয়া আমরা যারপরনাই নিরাশ। ব্যথিত হইয়াছি। এ কি উন্মাদ দুষ্প্রবৃত্তি! কি বলিয়া এই সকল কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবককে তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার পরিমাণ বুঝাইব, তাহা জানি না। ইহারা এইরূপ কার্য্যে দেশেরও কিরূপ অকল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা বুঝিবার শক্তিটুকুও যে তাহাদের নাই ইহাপেক্ষা অধিকতর ক্ষোভের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? সুখের বিষয় এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত বালকের দল নিতান্তই নগণ্য।

রাজনীতির ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রেও আমরা

এইবর্ষে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছি। এই এক বৎসরে বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। নানা স্থানের ইতিহাস সঙ্কলিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। নূতন লেখকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে! বহু উদীয়মান লেখক সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষার উপযোগী হইয়া উঠিয়াছেন। চারিধারে একটা আন্তরিক সাধনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে!

এই সুখের দিনে দুঃখের হস্ত হইতেও আমরা নিস্তার পাই নাই। অক্লান্তশ্রম সাহিত্যসেবী চন্দ্রনাথ, ভোলানাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, সুকবি রজনীকান্ত, মনস্বী কালীপ্রসন্ন, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক শিশিরকুমারকে আমরা হারাইয়াছি।

এ বৎসর অসাধারণ প্রতিভাশালী আচার্য্য কাউণ্ট লিও টলষ্টয়, ও সহৃদয়া কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ইহজগত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, তাঁহাদিগের প্রভাব সমগ্র জগতের পক্ষে কল্যাণজনক। তাই তাঁহাদিগের মৃত্যুতে জগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনো পূরণ হইবে কি না জানি না!

অতঃপর অতীত দুঃখ শোকের জন্য বৃথা অনুশোচনা না করিয়া নববর্ষে নূতন দিবসে আমরা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইব। ভগবান আমাদিগের সহায় হউন!

বর্ষ-বিদায়।

আমের মুকুল ঝরিয়া আজিকে মিশেছে নিমের ফুলে,
ম্লান হাসিটুকু কাঁপিছে অধরে অশ্রু আঁখির কূলে!
নীরবে কে ওই যায়,—
ফুল-পুলকিত কাননের পথে নিশীথের প্রায় !
কত না তারার খণ্ড-জোছনা, কত স্নেহ, কত প্রীতি,
কত ক্ষীণ আঁখি চেয়ে আছে কত তিক্ত-মধুর স্মৃতি!
কত আশা, কত ভয়,
কতই গরব, কত সে কুণ্ঠা—ফুল-কণ্টকময়!
বকুল মরিয়া সুরভি-স্বর্গ ভুবনে রেখেছে পাতি;
সারা যামিনীর যে আলো নিবিল কোথা গেল তার ভাতি
বুক ভরে হাহাকারে,
লূতার লালায় লিপ্ত কুঁড়িটি পাপড়ি মেলিতে নারে।
কিশোর আশার কিশলয় ... আজ বাঁধে নীড়?
শুষ্ক হৃদয়ে সংশয় আর দুর্ভাবনার ভিড়!
ব্যসন, কলহ, ক্লেশ
ব্যথিছে আজিকে সারা বরষের অপমান বিদ্বেষ।
অঞ্জলি ভরি' সুন্দরী ঊষা যে সোনা গেছিল ঢালি,
নিশীথের কালো নিকষে কষিতে ... কি হ'ল কালি?
জগতের আনাগোনা
সে কি হ'ল তবে নয়ন জলের মত আগাগোড়া লোণা!

অতসী অশোক গাঁথিতে কি হায় গেঁথেছি অপরাজিতা
প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি মিঠার সঙ্গে তিতা?
বিশ্ব কি বিস্বাদ?
একি ভুল নয়?—নহেক ক্ষণিক—এই মোহ অবসাদ?
ঝরা ফুল পাতা মাটি হ'য়ে যায় জাগে তায় অঙ্কুর,
মৃত্যু প্রবল করে ... জীবনের ক্ষীণ সুর
ওরে! নাই নাই শোক,
ত্যজিছে আবার অনন্ত তরু বরষের নির্ম্মোক!
বিশ্ব-নাট্যে নূতন অপটী নাবে কে নায টান'!
শামুকের দেহ-নীড়ে বাড়িল গো কক্ষ আরেকখানি!
পুরাতন অবসান!
তারার কিরণ-সঙ্গমে ফিরে আজিকে পুণ্য স্নান!
নব জীবনের বিদ্যুৎ—সে যে বেদনার বুকে খেলে,
শিকড় কাটিয়া সকল করে গো নিষ্ফলে অবহেলে!
ভাঙা গড়া আসা-যাওয়া,
ফুল ফোটাবার, ফুল ঝরাবার, অপরূপ এই হাওয়া!
নিম ফুল আর আমের মুকুল চুমে আজি ধূলিকণা,
তিক্ত আভাসে বক্ষে ধরিছে মধুর সম্ভাবনা!
পুরাণ চলিয়া যায়,
অশ্রু সরস ক্ষীণ হাসি একা নূতনের পথ চায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।